banglabooks.in

জুল ভের্ন অমনিবাস

দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

আরো বাংলা বইয়ের জন্য
নিচের লিংকে
ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

banglabooks.in

জুল ভের্ন (১৮২৮-১৯০৫)

banglabooks.in

জুল ভের্ন অমনিবাস

১

দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা

অনুবাদ

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০ ০৭৩

banglabooks.in

প্রথম প্রকাশ :
বৈশাখ ১৩৯৯
এপ্রিল ১৯৯২

স্বত্ব :
কৌশল্যা বন্দ্যোপাধ্যায়

ISBN-81-7079-051-4

প্রচ্ছদ :
পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক :
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০৭৩

ষাট টাকা

banglabooks.in

পৃথিবী ছাড়িয়ে

জুল ভের্ন-এর আগে চমকপ্রদ কল্পবিজ্ঞান গল্প লিখেছেন লেওনার্দো দা ভিঞ্চি, ওল্‌স্টোনক্র্যাফ্‌ট্‌ শেলি বা এডগার অ্যালান পো—অথচ তবু কল্পবিজ্ঞান গল্পের কথা উঠলেই আজ জুল ভের্নকেই সাহিত্যের এই শাখার জনক ব'লে যে ধ'রে নেয়া হয়, তার কারণ এ-রকম বিচিত্র ও বিভিন্ন এতগুলো কল্পবিজ্ঞান গল্প তাঁর আগে আর-কেউ লেখেননি। দুশোর ওপর বই লিখেছিলেন জুল ভের্ন, আর তার সবই যে ছিলো কল্পবিজ্ঞান কাহিনী তাও নয়—লিখেছিলেন সমকালীন দেশবিদেশের ইতিহাসের পটভূমিকায় রোমাঞ্চকর, রগরগে ও রুদ্ধনিশ্বাস উপন্যাস, আর তাদের পটভূমি হিশেবে এসেছে মার্কিন মুলুকের দাসপ্রথা রোধের গৃহযুদ্ধ, ভারতবর্ষের সিপাহি-বিদ্রোহ, বিভিন্ন স্লাভদেশের জাগরণ, চিনের তাইপিং বিদ্রোহ, অথবা রুশ দেশের সাধারণ মানুষের অভ্যুত্থান ; গোড়ায় লিখেছিলেন নাটক, কাব্যনাটক বা অপেরার কাহিনী, তার কোনো-কোনোটা সফল ও জনপ্রিয়ও হয়েছিলো তখন, কিন্তু তাদের জন্যে তাঁকে কেউ মনে রাখেনি—সারা বিশ্বে এখন তাঁর একটাই পরিচয় : জুল ভের্ন—অর্থাৎ কল্পবিজ্ঞান গল্পকে যিনি সাহিত্যে জাতে তুলেছেন, সিরিয়াসভাবে লিখে গেছেন এতগুলো দুর্বার অভিযান, যাকে তিনি নিজে নাম দিয়েছিলেন 'আশ্চর্য অভিযান গ্রন্থমালা', কেননা ইতিহাসের পটভূমিকায় ফাঁদা কাহিনীগুলোও ছিলো অ্যাডভেনচারেরই বই, কাহিনীর দুর্বার গতি, রুদ্ধনিশ্বাস সাসপেন্স, শেষমুহূর্তে তাক-লাগিয়ে-দেয়া তথ্যের উন্মোচন আজও আমাদের সে-সব গল্পে চুম্বকের মতো আটকে রাখে।

ব্যবহারজীবী পিয়ের ভের্ন-এর ছেলে জুল ভের্ন-এর জন্ম হয়েছিলো বিস্কে উপসাগরের কাছে ফ্রান্সের ছোটো একটি মফস্বল শহরে (আর মৃত্যু ২৪ মার্চ, ১৯০৫ আমিয়েন্স শহরে)। মফস্বলের এই ছোট্ট গণ্ডি থেকে বেরিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে বেড়াবেন ব'লে ছেলেবেলায় একবার জাহাজে ক্যাবিন-বয় হ'য়ে সাগর পাড়ি দেবারও চেষ্টা করেছিলেন জুল ভের্ন, বাবার কাছে ধরা প'ড়ে গিয়ে পৃথিবী চ'ষে বেড়াবার সাধ আর তাঁর মেটেনি, মফস্বল থেকে বেরিয়ে এসে তরুণ জুল ভের্ন কুড়ি-একুশ বছর বয়সে রাজধানী পারিতে আস্তানা পেতেছিলেন, মনের মধ্যে

banglabooks.in

যদি-বা গোপন ইচ্ছে থেকেও থাকে জীবনে আর-কখনওই ফ্রান্সের বাইরে পা দেয়া হয়নি তাঁর—কিন্তু কল্পনায় দেশবিদেশে পাড়ি দিতে আপত্তি কী? আর তাই কল্পবিজ্ঞান গল্পগুলোর মধ্য দিয়েই কল্পনায় তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন পাঁচ মহাদেশে, দুই মেরুতে, কত মরুভূমির দেশে, দুর্গম অরণ্যে, দুরারোহ পর্বতচূড়ায়, জনমানবহীন নানা দ্বীপে—শুধু তা-ই নয়, পাড়ি দিয়েছেন আকাশে ও অন্তরিক্ষে, কল্পনা করেছেন চাঁদে কীভাবে যাওয়া যায়, গেছেন সমুদ্রের তলায়, পৃথিবীর একেবারে নিচে (তার কেন্দ্রে, তাঁর মনে হয়েছিলো পৃথিবীটা বুঝি ফাঁপা—মাটির কঠিন ত্বক ভেদ ক'রে সেই ফাঁপা পৃথিবীর তলায় মাঝখানকার ফাঁকা জায়গাটায় চ'লে যাওয়া যায়)।

পারি আসার পর থেকে লেখাই তাঁর ধ্যানজ্ঞানজীবিকা হ'য়ে উঠেছিলো, কিন্তু তাঁর দুর্বার ও আশ্চর্য অভিযানের মধ্য দিয়ে ঘরকুনো গৃহবন্দী জুল ভের্ন পৃথিবী ছাড়িয়েও দূরে—বহুদূরে—চ'লে গিয়েছিলেন। তাঁর কল্পনার এই বাহাদুরিতে আমাদের তাক না-লেগে পারে না। তাঁর উদ্ভাবিত অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারই পরে ঘটেছে—হয়তো তিনি যেভাবে ভেবেছিলেন সেভাবে নয়—তবু সম্ভাবনা-গুলো আজ আর নিছক সম্ভাবনার স্তরেই নেই, বাস্তব ও সত্য। জুল ভের্ন-এর কৈশোরে ইয়োহান হ্বিস-এর 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন' হৈ-হৈ ফেলে দিয়েছিলো—এখনও ছোটোদের কাছে যে-বইয়ের কদর এককোঁটাও কমেনি। এই বই থেকে প্রেরণা পেয়ে কতবার যে অজানা নির্জন দ্বীপে আমাদের নিয়ে গেছেন জুল ভের্ন—কখনও কেউ গেছে একা, রবিনসন ক্রুসোর মতো, কখনও দল বেঁধে, অনেকে—কিন্তু এইসব অজানা অচেনা দ্বীপ কত যে রহস্য ও রোমাঞ্চ লুকিয়ে রাখতো যে তাঁর লেখা প্রতিবারই নতুন হ'য়ে উঠতো, কখনও একটা আরেকটার পুনরাবৃত্তি হ'তো না। এমনকী একবার 'সুইস ফ্যামিলি রবিনসন'-এরও উপসংহার লিখেছিলেন জুল ভের্ন।

আর সবসময়েই ছিলেন সমাজসচেতন। উপনিবেশবাদের বিপক্ষে লিখেছেন, দাসপ্রথার বিরুদ্ধে আগুন ঝরিয়েছেন, যেখানেই শোষকশাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান, সেখানেই ছিলো তাঁর সমর্থন। সেদিক থেকে তিনি ফরাশি বিপ্লবেরই সন্তান। গোড়ার দিকে তাঁর কল্পবিজ্ঞানকাহিনী ছিলো বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার নানা সম্ভাবনার জয়গানে ভরা—সেগুলো ছিলো তাঁর 'ব্লুমস-ডে বুক'; কিন্তু মোহভঙ্গ হবার পর, বিজ্ঞানকে লোকে কীভাবে জীবনবিরোধী মানবতা-বিরোধী শক্তি হিশেবে ব্যবহার করছে এটা দেখবার পর, তিনি যে নিরাশাজটিল

banglabooks.in

ও ক্রুদ্ধ বইগুলো লিখেছিলেন সেগুলো ছিলো তাঁর 'ডুম্‌স-ডে বুক'—শুধু-যে খ্যাপা বৈজ্ঞানিকের অধঃপতনই দেখিয়েছেন তা নয়, দেখিয়েছেন পুঁজিবাদ ও একনায়ক-তন্ত্রের বিভীষিকাও।

অমনিবাসের বিভিন্ন খণ্ডে আমরা এই ভিন্ন-ভিন্ন জুল ভের্নকেই উপস্থাপিত করবো, আর এটাই দেখাবার চেষ্টা করবো যে তাঁর কল্পবিজ্ঞান গল্প ছকে-লেখা একই কাহিনীর ধরাবাঁধা পুনরাবৃত্তি ছিলো না—বরং সাহিত্যের এই নবীন শাখায় তিনি নিত্য-নূতন রূপকল্প ও সম্ভাবনার কথা ভেবেছিলেন, আর সেগুলো প্রতিবারই হ'তো দুর্বার ও আশ্চর্য।

২২ ফাল্গুন ১৩৯৮
তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগ
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় : কলকাতা

মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

banglabooks.in

টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগ্‌স আণ্ডার দি সী

অ্যাড্রিফ্‌ট্‌ ইন্‌ দি প্যাসিফিক

পারচেজ অব্‌ দি নর্থ পোল

জার্নি টু সেণ্টার অব্‌ দি আর্থ

এ সায়াণ্টিস্ট কিডন্যাপ্‌ড

banglabooks.in

টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লিগ্‌স আণ্ডার দি সী

banglabooks.in

১

তিমিঙ্গিল, না ডুবোপাহাড় ?

১৮৬৬ সালে হঠাৎ য়ুরোপ আর আমেরিকার নাবিকদের মধ্যে হুলুস্থুল বেঁধে গেলো। অদ্ভুত-সব ব্যাপার ঘটছে সমুদ্রে—রহস্যময় ও বিপজ্জনক ; প্রায়ই নাকি 'মস্ত কী-একটা' জন্তু দেখা যাচ্ছে জলের মধ্যে। লম্বা ছুঁচোলো ঝকমকে একটা বিকট ব্যাপার—কেবল যে আকারেই তিমিমাছের চেয়ে ঢের বড়ো তা-ই নয়, গতিবেগেও তিমির চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র। অতিকায় কোনো সিন্ধুদানব, বিজ্ঞান যার কোনো হদিশ রাখে না ? কোনো মস্ত শৈলশ্রেণী, ভূগোলবিদ্যায় যার উল্লেখ নেই ? এ-সব প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না ব'লেই নাবিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও জনরব শুরু হ'লো প্রবলভাবে ; খবরের কাগজগুলোও ফলাও ক'রে নানা সত্যিমিথ্যে প্রবন্ধ ছাপতে শুরু করলে ; আর শেষটায় এমন কতকগুলো ভয়ংকর ব্যাপার ঘ'টে গেলো যার ফলে নানা দেশের সরকার শুদ্ধ এই 'মস্ত কী-একটা'কে নিয়ে বিষম বিচলিত হ'য়ে পড়লেন।

এই অতিকায় বস্তুটিকে প্রথম দেখেছিলো 'গবর্নর হিগিনসন' জাহাজটি। 'গবর্নর হিগিনসন' ক্যালকাটা অ্যাণ্ড বার্নাক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ ; ১৮৬৬ সালের ২০শে জুলাই জাহাজটি ছিলো অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে, ডাঙা থেকে পাঁচ মাইল দূরে ; হঠাৎ দেখা গেলো জলের উপর অতিকায় চুরুটের মতো লম্বাটে গড়নের আশ্চর্য একটা জিনিশ ভাসছে। ক্যাপ্টেন বেকার গোড়ায় ভেবেছিলেন বুঝি কোনো ডুবোপাহাড়ই আবিষ্কার ক'রে ফেলেছেন তিনি ; কাঁটা-কম্পাস দিয়ে সবে তিনি মানচিত্রে তার অবস্থান নির্ণয় করতে যাচ্ছেন, অমনি হঠাৎ, বলা-নেই কওয়া-নেই, হুড়মুড় ক'রে ওই ডুবোপাহাড় থেকে ভীষণ দুটি জলস্তম্ভ উঠলো প্রচণ্ড-বেগে—প্রায় দেড়শো ফুট অবধি। সেই জলস্তম্ভ থেকে আবার—কিমাশ্চর্য !—ধোঁয়া আর বাষ্পও উঠছে ! উষ্ণ প্রস্রবণ আছে তাহ'লে ওই ডুবোপাহাড়ে ? না কি আদৌ কোনো ডুবোপাহাড়ই নয়, বরং মস্ত কোনো তিমিঙ্গিল ? কিন্তু তিমিঙ্গিল থেকে বাষ্পময় জলস্তম্ভ ওঠে, এ-কথা তো কদাপি শোনা যায়নি। ক্যাপ্টেন বেকার কিঞ্চিৎ হতভম্ব হ'য়ে পড়লেন।

banglabooks.in

তিন দিন পরে—২৩শে জুলাই—ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড প্যাসিফিক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ 'কলম্বাস' ঠিক এই অদ্ভুত তিমিঙ্গিলটিকেই দেখলো প্রশান্ত মহাসাগরে—অর্থাৎ প্রায় ২১০০ মাইল দূরে। আরেকটা অতিকায় সিন্ধু-দানব? না কি সেটাই তিন দিনের মধ্যে এত-দূরে চ'লে এসেছে? তা যদি হয় তাহ'লে এই ভাসমান গিরিশৃঙ্গটির গতিবেগ অবিশ্বাস্য বলতে হয়! তা-যে রয়েছে, তা বোঝা গেলো যখন পনেরো দিন পরে তাকে দেখা গেলো ৬০০০ মাইল দূরে অতলান্তিক মহাসাগরে। ফরাশি জাহাজ 'হেলভেটিয়া' আর ব্রিটিশ জাহাজ 'শ্যানন' ঠিক তার মুখোমুখি পড়লো। এই জাহাজ দুটি আবার মাপটাপ নিয়ে দেখলো যে এই অতিকায় সিন্ধুদানব কিছুতেই সাড়ে-তিনশো ফুটের কম হবে না। কিন্তু এ-যাবৎ কেউ ষাট ফুটের চেয়ে বড়ো তিমি দেখেছে ব'লে শোনা যায়নি। ফলে পরপর এই 'মস্ত কী-একটা'র খবর পেয়ে য়ুরোপ-আমেরিকার নৌ-জগতে সাড়া প'ড়ে গেলো। এ আবার নতুন কোন 'মবি ডিক'—হুজুগ পেয়ে ফলাও ক'রে প্রশ্ন তুললো কাগজগুলো।

সমস্ত জল্পনারই উত্তর এলো ১৮৬৭ সালের ১৩ই এপ্রিল যখন 'স্কটিয়া' নামে মস্ত-একটি জাহাজ এই সিন্ধুদানবের প্রথম বলি হ'লো। অতলান্তিক মহাসাগরে কেপ-ক্লিয়ারের তিনশো মাইল দূরে তরতর ক'রে দিব্যি ছুটে চলছিলো 'স্কটিয়া'। আচমকা কীসের সঙ্গে যেন ছোট্ট-একটু ধাক্কা লাগে তার—এত-আস্তে ধাক্কাটা লাগে যে গোড়ায় কেউ-কিছু টেরও পায়নি। কিন্তু নাবিকদের একজন হঠাৎ দেখতে পেলে যে ছ-ফুট চওড়া একটা মস্ত ফুটো দিয়ে হু-হু ক'রে জল ঢুকছে জাহাজের খোলে। সেই অবস্থাতেই ডুবু-ডুবু সেই জাহাজটিকে তক্ষুনি কোনোরকমে লিভার-পুল বন্দরে নিয়ে আসা হ'লো। তারপর মেরামত করার জন্য জাহাজটিকে ড্রাই-ডকে তুলেই তো সবাই স্তম্ভিত! লোহার পুরু চাদরে পরিষ্কার একটা তেকোণা গর্ত; যেন কোনো চোখা তুরপুন চালিয়ে জাহাজটিকে কেউ জখম ক'রে দিয়েছে!

ব্যাস, আর দেখতে হ'লো না! হুলুস্থুল বেঁধে গেলো সর্বত্র। পৃথিবীর প্রত্যেকটা খবরের কাগজে এই রহস্যময় দানবের গল্প ছাপা হ'তে লাগলো। নানা রকম থিয়োরি আর আজগবি তথ্যে বন্দরগুলি আতঙ্কে ও উত্তেজনায় থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। কেউ বললে জানোয়ারটা আসলে একটা অতিকায় সামুদ্রিক সরীসৃপ—পুরাণ আর কিংবদন্তি থেকে তারা নিজেদের মতের সপক্ষে নানা নজির দিলে। কেউ আবার বললে ওটা মোটেই কোনো ডুবোপাহাড় বা গিরিশৃঙ্গ নয়, বরং মবি ডিকের মতোই কোনো দানোয়-পাওয়া মস্ত তিমি; আর তা না-হ'লে—

banglabooks.in

আরেক দল বললে—নিশ্চয়ই কোনো শক্তিশালী ডুবোজাহাজ। 'ডুবোজাহাজ যদি হয়,' কাগজগুলো রব তুললো, 'তাহ'লে বিষম ভয়ের কথা। কেননা চুপিসাড়ে লোকচক্ষুর আড়ালে এ-রকম একটা বিপুল যন্ত্র তৈরি করতে গেলে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা কেবল কোনো দেশের গবর্মেণ্টেরই থাকতে পারে। আর, কোনো দেশের সরকারের হঠাৎ গোপনে ডুবোজাহাজ বানাবার প্রয়োজন হ'লো কেন? কী তার উদ্দেশ্য?'

তক্ষুনি খবর নেয়া হ'লো সর্বত্র। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জর্মানি, এস্পানিয়া, ইতালি, আমেরিকা, এমনকী তুরানদেশে পর্যন্ত খবর নেয়া হ'লো নানাভাবে। কিন্তু সব দেশেরই সরকার একবাক্যে অস্বীকার করলে—এ-রকম ডুবোজাহাজ যে সত্যি আছে, তা-ই নাকি তারা জানে না। আর এই সম্ভাবনাটাও যখন মিথ্যে ব'লে জানা গেলো, তখন গুজব ও জনরব আরো অস্থির-বিপুল আকার ধারণ করলে। নাবিকরা আল্লার এমনিতেই খুব কুসংস্কার মানে; ফলে এমন-একটি দানবের মুখোমুখি পড়ার ভয়ে তারা যেন প্রায় শিঁটিয়ে গেলো।

এই অদ্ভুত জুজুর আতঙ্কে নাবিকরা যখন ভয়ে কাঁপছে, আমি তখন নিউ-ইয়র্কে প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছি।

২

আমি, পিয়ের আরোনা

আমার নাম পিয়ের আরোনা। পারী মিউজিয়ামের প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক আমি। সেই সূত্রেই আমাকে কিছুকাল আগে নেব্রাস্কা যেতে হয়েছিলো অতীব দুষ্প্রাপ্য কিছু উদ্ভিদ্ প্রাণীসংগ্রহের অভিযানে। ফ্রান্সে ফেরার পথে নিউ-ইয়র্কে এসে আমি যখন সংগৃহীত জিনিশগুলির একটা তালিকা তৈরি করছি, তখনই এই অতিকায় সিন্ধুদানবের জনরব বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো।

সত্যি এটা কোনো সামুদ্রিক প্রাণী কিনা প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক ব'লে এ-সম্বন্ধে মতামত চাওয়া হ'লো আমার কাছে। 'নিউ-ইয়র্ক হেরাল্ড' কাগজের প্রতিনিধির অনুরোধে ৩০শে এপ্রিল আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলুম। সমুদ্রতল যে এখনো কৌতূহলী ও উন্মুখ মানুষের কাছে বিষম রহস্যের আধার,

banglabooks.in

এটাই ছিলো আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। পৃথিবীর মাত্র একভাগ স্থল, বাকি তিন-ভাগই জল—আর সেই জলের তলায় কী আছে, তার কতটুকুই বা আমরা জানি। আমরা কেবল কতগুলো অনুমান ও ধারণা করতে পারি মাত্র। যদি সমুদ্রতলের সমস্ত জীবদের কথাই আমরা এতদিনে জানতে পেরে থাকি, এবং যদি বিভিন্ন দেশের সরকার সত্যিই কোনো প্রবল ও গোপন ডুবোজাহাজের অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে থাকেন, তাহ'লে-বলা বাহুল্য—আমি প্রবন্ধে বললুম—জিনিশটি আসলে একটি অতিকায় নারহোয়াল—অর্থাৎ বিকট খড়্গের মতো দন্তময় সেই মহাকায় সামুদ্রিক ড্রাগন, মেরুবলয়ের হিমজল যার গোপন আবাস। অবশ্য নারহোয়াল যে ষাট ফুটের বেশি লম্বা হয়, তা এতকাল আমরা জানতুম না—অথচ নানা তথ্য থেকে জানা গেছে যে এই হিংস্র ও খুনে নারহোয়ালটি প্রায় সাড়ে-তিনশো ফুট লম্বা। এমন হ'তে পারে যে আদিকালের একটি নারহোয়াল প্রকৃতির কোনো অদ্ভুত খেয়ালে এই ঊনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কালেও কোনোক্রমে বেঁচে ছিলো—সে-ই হঠাৎ সমুদ্রতল আলোড়িত ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে নারহোয়াল বা সী-ইউ-নিকর্ন ব'লে মনে করার কারণ 'স্কটিয়া' জাহাজের লোহার পুরু চাদরের খোলের মধ্যে ওই বিপুল ও আকস্মিক ছ্যাঁদাটি—কারণ কেবলমাত্র নারহোয়ালেরই মাথায় ইস্পাতের মতো কঠিন ও সুদৃঢ় খড়্গ থাকে, যার এক ধাক্কায় এমনকী লোহার পুরু চাদর শুদ্ধু ফুটো হ'য়ে যেতে পারে। অবশ্য আমার এই আন্দাজ যে পুরোপুরি সত্যি, তা বলি না। কারণ এই অতিকায় জীবটি সম্বন্ধে হয়তো সমস্ত তথ্য এখনও আমরা জানি না।

আমার প্রবন্ধের সারমর্ম মোটামুটি এই। কিন্তু এই প্রবন্ধ বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই চারদিকে নানারকম জল্পনা শুরু হ'য়ে গেলো। এদিকে আবার আরো জাহাজডুবির খবর আসতে লাগলো; সবাই যে এই নারহোয়ালের খড়্গের আঘাতের ফল, তা নয়। তবু চারদিকে একটা বিষম আতঙ্কের রেশ প'ড়ে গেলো। সবাই ভাবলে যে এই অতিকায় খুনে জীবটিই বুঝি সব সর্বনাশের মূল।

অবস্থা যখন এইরকম, তখন মার্কিন নৌ-বহর স্থির করলে যে এই সামুদ্রিক আতঙ্ক দূর করার জন্যে তারা একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে: সমুদ্রের এই বিভীষিকার সঙ্গে সরাসরি লড়াই করবে এই জাহাজ; মস্ত কামানওলা এই জাহাজটির নাম 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'। অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটের ওপর; তাঁর অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা এই বিভীষিকাটি নিপাত করার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

banglabooks.in

ব্রুকলিন জাহাজঘাটা থেকে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' ছেড়ে যাওয়ার ঠিক তিন ঘণ্টা আগে আমার কাছে নিচের চিঠিটা এসে পৌঁছুলো।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক আপনি "অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনের" সামুদ্রিক অভিযানে যোগদান করিলে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আপনার মাধ্যমে ফরাশি দেশকে ইহাতে লাভ করিতে পারিয়া অনুগৃহীত ও আনন্দিত হইবে। ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট আপনার জন্য একটি কেবিন নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

বশম্বদ

মার্কিন নৌ-বহরের সম্পাদক

জে. বি. হবসন।'

এই চিঠি পাবার আগে, চাঁদে পাড়ি দেবার মতো, এই সামুদ্রিক অভিযানে বেরোবার সম্ভাবনাটা স্বপ্নেও আমার মনে জাগেনি। কিন্তু হঠাৎ এই চিঠিটা পাবার পরই মনে হ'লো পৃথিবীর সব সম্পদের বিনিময়েও এই সোনালি সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে পারবো না।

তক্ষুনি অধীরভাবে আমার পরিচারক কোনসাইলকে ডাক দিলুম। কোনসাইল আসলে ওলন্দাজ, সাহসী বিশ্বস্ত ও অনুগত। আমার সমস্ত অভিযানেই সে সঙ্গী হয়, কোনো প্রশ্ন তোলে না, নীরব কর্মীর মতো সমস্ত ক'রে ফ্যালে মুহূর্তে, কোনো কিছুতেই তার বিস্ময় নেই। ফলে ক্ষিপ্রহাতে জিনিশপত্র গোছাতে-গোছাতে কোনসাইল যখন শুনলো যে আমরা এবার এই সিন্ধুদানবের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরোচ্ছি, সে মোটেই অবাক হ'লো না; আমার কথার ফাঁকে-ফাঁকেই চটপট সে সব গুছিয়ে নিলে। আমার অভিযানের নিদর্শন ও সংগ্রহগুলো আমি পারী বিচিত্রা-ভবনে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দিলুম। অতঃপর যখন কোচবাক্সে ব'সে আমরা নিউ-ইয়র্কের জাহাজঘাটায় পৌঁছোলুম, তখন দেখি 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' তার সামুদ্রিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে আছে—তার মস্ত দুটি চিমনি দিয়ে ভলকে-ভলকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

তক্ষুনি আমাদের মালপত্র জাহাজে তুলে ফেলা হ'লো। আমরাও জাহাজে গিয়ে উঠলুম। একজন নাবিককে জিগেস করতেই সে আমাকে এক হাসি-খুশি অফিসারের কাছে নিয়ে এলো। তিনি আমাদের দেখেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। জিগেস করলেন, 'মঁসিয় পিয়ের আরোনা?'

'আমি স্বয়ং,' উত্তর দিলুম আমি, 'আপনি ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট তো?'

'সশরীরে বর্তমান। আপনার কামরা তৈরি আছে, প্রফেসর।'

banglabooks.in

তাঁকে ডেকের উপরে রেখেই কোনসাইলকে নিয়ে আমি আমার কেবিনে গিয়ে ঢুকলুম।

লং-আইল্যাণ্ডের হলদে বেলাভূমি ছেড়ে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' যখন তার অভিযানে বেরোলো, তখন তিনটে বাজে। তীরে হাজার-হাজার নরনারী দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে আমাদের বিদায় জানালে। এমনকী মস্ত একটা বড়োপাল্লার কামান থেকে তোপধ্বনিও করা হ'লো আমাদের বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে। রাত যখন আটটা, তখন ফায়ার-আইল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব দিয়ে অতলান্তিক মহাসাগরের ফেনিল, কালো ও রহস্যময় জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো, 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'।

তিমি শিকারের যাবতীয় শরঞ্জাম টাল ক'রে রাখা ছিলো জাহাজে। কেবল যে হাতে ছোঁড়ার শাদাশিধে হারপুনই ছিলো তা নয়, এমনকি অতি-আধুনিক হারপুন-বন্দুক শুদ্ধু বাদ যায়নি। আর ছিলো নেড ল্যাণ্ড—হারপুন ছোঁড়ার রাজা। বয়েস তার চল্লিশের মতো—আমারই প্রায় সমান— ; ঢ্যাঙা, অসুরের মতো চেহারা, ছ-ফুটের উপর লম্বা, গম্ভীর অথচ দিলদরিয়া, কিন্তু যখন তখন ভয়ংকর হ'য়ে উঠতে পারে ; ক্ষিপ্রতায়, দুঃসাহসে ও কৌশলে তার জুড়ি নেই বলেই কোনো অতি চালাক তিমির পক্ষেও তার হারপুনকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তীক্ষ্ণ-প্রবল দৃষ্টিশক্তি তার মুখের মধ্যে দৃঢ়তার রেশ এনে দিয়েছে। এই অকুতোভয় মানুষটিকে নিয়োগ ক'রে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট অবশ্য আরেকটি কাজও করেছিলেন। ওই খুনে জানোয়ারটাকে যে সবচেয়ে আগে দেখতে পাবে, তাকে দু-হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে ব'লে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। ফলে সকলেরই উৎসাহ খুব বেড়ে গিয়েছিলো। প্রত্যেকেই দিনরাত ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অথৈ জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকতো।

কিন্তু কোথায় কী? সেই অতিকায় সিন্ধুদানবের কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না। শেষকালে কেপ হর্ন পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়লুম আমরা। কিন্তু তবু সেই সিন্ধুদানবের কোনো চিহ্নই নেই। তবে কি সমস্ত জনরব আসলে কোনো অমূল কল্পনা? কোনো অলীক স্বপ্নবিলাস? তা কেমন ক'রে হয়? কারণ 'স্কটিয়া'র সেই মস্ত ছিদ্রটি তো মিথ্যে নয়!

তাহ'লে?

banglabooks.in

৩

'ওই যে, ওখানে'

কোনসাইল-এর যে দু-হাজার ডলার পুরস্কারের প্রতি কোনো লোভ ছিলো না, তা নয়। কিন্তু আমার বেলায় ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণ অন্য রকম। পুরস্কারের তোয়াক্কা রাখি না আমি। কিন্তু তবু কিসের টানে আমিও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকতুম। আমি নিজের চোখে এই সিন্ধুদানবকে দেখতে চাই। জানতে চাই সে আসলে কোনো অতিকায় নারহোয়াল বা কিংবদন্তির সিন্ধুড্রাগন কিনা। কিন্তু দিনের পর দিন একটানা তাকিয়ে থেকে কেবল চোখ দুটিই টনটন করতে লাগলো —হঠাৎ ঢেউয়ের মধ্যে ভেসে-ওঠা কালো তিমির বিশাল পিঠ ছাড়া আর-কিছুই চোখে পড়লো না, কোনো সাদা তিমি বা কোনো বিপুল মবি ডিক পর্যন্ত না।

সাতাশে জুলাই আমরা বিষুবরেখা ছাড়িয়ে এলুম। জাপানের দিকে এগিয়ে চললুম আমরা। কিন্তু নাবিকেরা ততক্ষণে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। তারা কিছুতেই আর এই অর্থহীন কল্পনাবিলাসের পিছনে ঘুরে বেড়াতে চায় না। শেষকালে তাদের চাপে প'ড়ে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটকেও ক্রিস্টোফার কলম্বাসের মতো বলতে হ'লো যে আর তিনদিনের মধ্যে যদি এই সিন্ধুদানবের সন্ধান না পাওয়া যায় তাহ'লে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'কে তিনি আবার নিউ-ইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কে কোথায় নেশার ঘোরে কোন আজব ও অতিকায় একটি জীব দেখেছে, সেই জন্যে সেই বন্য হংসের পিছনে হুড়মুড় ক'রে ছুটে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না। খামকাই এত পথ এলো 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'—কোনো অলীক বুনো হাঁসের পিছন পিছন।

দু-দিন কেটে গেলো। টোপ ফেলে সিন্ধুদানবটাকে কাছে আনার জন্য বড়ো-বড়ো মাংসের টুকরো ফেলা হ'তে লাগলো জলের মধ্যে, এবং তার ফলে হাঙরদের মধ্যে ভোজ শুরু হ'লো বটে, কিন্তু সেই সিন্ধুদানবের রহস্য পূর্ববৎ সেই একই অনন্ত তিমিরে ঢাকা র'য়ে গেলো।

জাপান তখন আর মাত্র দু-শো মাইল দূরে। আরেকটা দিনও যদি এমনিভাবে কেটে যায়, তাহ'লে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' আর মিথ্যে বুনো হাঁসের পিছনে না-ছুটে দেশে ফিরে যাবে। ঢং-ঢং ক'রে রাত্রি আটটা বাজলো। আমরা অনেকেই উদ্‌গ্রীবভাবে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছি; যদি শেষমুহূর্তে দানবটির দর্শন পাওয়া যায়, এই প্রত্যাশায়।

banglabooks.in

কোনসাইলের স্নায়ু ব'লে কোনোকিছু কোনোকালে ছিলো ব'লে আমি টের পাইনি। কিন্তু এখন তাকেও কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত দেখা গেলো। হেসে বললুম, 'কোনসাইল, ওই দু'হাজার ডলার পকেটস্থ করার এই শেষ সুযোগ তোমার। ছাখো, পারো কিনা।'

'মঁসিয় কি দয়া ক'রে আমাকে এ-কথা বলার সুযোগ দেবেন যে আমি কোনো দিনই পুরস্কারের প্রত্যাশা করিনি—যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যদি লাখ ডলারও পুরস্কার ঘোষণা করতেন, তাহ'লেও তাঁদের কিছুতেই ওই টাকাটা হারাতে হ'তো না। কারণ ওই রকম কোনো সিন্ধুদানব কদাচ ছিলো কি না তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'তুমি ঠিকই বলেছো, কোনসাইল। আমরা যে কেবল ছ-মাস সময় খামকা নষ্ট করলুম, তা-ই নয়—ফিরে গিয়ে দেখবো লোকের কাছে রীতিমতো হাস্যাস্পদ হ'য়ে উঠেছি—'

ঠিক তক্ষুনি নেড ল্যাণ্ডের প্রবল চীৎকার শোনা গেলো! 'ওই-যে! আমরা যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, অবশেষে সেই-তিনি সশরীরে হাজির! ওই-যে, ওখানে!'

৪

অতল জলের আহ্বান

নেডের চীৎকার শুনে জাহাজের সব লোক তার দিকে ছুটে গেলো। এবার কিন্তু সিন্ধুদানব আর-কারো অগোচর রইলো না। দেখতে পেলুম জাহাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রের জল আলো হ'য়ে উঠেছে; জলের উপর ভেসে উঠেছে সেই রহস্যময় দানবটির প্রকাণ্ড পিঠ, আর তার গা থেকেই এই উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। কিন্তু তখন আর ভালো ক'রে ধীরে-সুস্থে তাকে অবলোকন করার অবস্থা ছিল না; কারণ সচমকে আমরা দারুণ আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, দানবটা প্রচণ্ড বেগে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

জাহাজের মধ্যে যে-সমস্বর শোরগোল উঠলো, তাতে আমার সভয় চীৎকার ঢাকা প'ড়ে গেলো। কিন্তু তারই ভিতর অবিচল রইলেন শুধু ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট। তাঁর নির্দেশমতো বোঁ-ক'রে অর্ধবৃত্তাকার পথে ঘুরে গিয়ে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'

banglabooks.in

ধাবমান দানবটির কাছ থেকে স'রে যেতে লাগলো। কিন্তু দ্বিগুণ বেগে আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে লাগলো সমুদ্রের সেই প্রজ্বলন্ত বিভীষিকা। কিন্তু তারপরেই —আবার আশ্চর্য!—হঠাৎ এক জায়গায় সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর আস্তে জাহাজটার চারপাশ একবার প্রদক্ষিণ ক'রে নিলো—যেন কোনো শিকারী জন্তু চড়াও হবার আগে তার শিকারের ক্ষমতা ও সাধ্য আন্দাজ ক'রে নিতে চাচ্ছে। কলের জাহাজ যেমন যাওয়ার সময় পেছনে লম্বা ও কুণ্ডলিত ধোঁয়ার রেখা রেখে যায়, ঠিক তেমনি পুঞ্জীভূত আলোকিত কুয়াশার রেখা এঁকে গেলো জলের মধ্যে, তারপর অবিশ্বাস্য গতিতে তার পরিক্রমা সম্পূর্ণ ক'রে জানোয়ারটা আচম্বিতে জাহাজ লক্ষ্য ক'রে উল্কার মতো ধেয়ে এলো।

'শামাল। শামাল!' রব উঠলো জাহাজে। কিন্তু জাহাজের একেবারে মুখোমুখি এসেই আচমকা সেই তীব্র আলোর চ্ছটা মিলিয়ে গেলো। পরক্ষণেই জাহাজের অন্যধারে দেখা গেলো সেই প্রজ্বলন্ত বিভীষিকা। রাতের অন্ধকারে আমরা ঠাহরই করতে পারলুম না জানোয়ারটা ডুব দিয়ে ওধারে গেলো, না জাহাজটিকে নিছকই প্রদক্ষিণ ক'রে গেলো।

'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' তখন ঝপাঝপ আলো নিভিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। অবাক হ'য়ে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটকে জিগেস কললুম, 'ব্যাপার কী?'

'রাতের অন্ধকারে ওই অদ্ভুত জানোরারটার সঙ্গে লড়াই ক'রে তো আর আমার জাহাজ আর লোকজনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারি না,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'কাল দিনের বেলায় দেখবো সমুদ্রের ওই শত্রু কত শক্তি ধরে।'

সে রাতে কারো চোখেই একফোঁটা ঘুম নামলো না। উত্তেজনায় ও আতঙ্কে সবাই কেমন টান-টান হ'য়ে আছে—তীর ছোঁড়ার আগে ধনুকের ছিলা যেমন টান হ'য়ে যায়। সবাই রুদ্ধশ্বাসে জানোয়ারটার গতিবিধি লক্ষ্য করার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝরাত্রে হঠাৎ সেই সিন্ধুদানব যেন কোন অতলে মিলিয়ে গেলো। যেন দপ ক'রে কোনো অতিকায় জোনাকি নিভে গেলো অকস্মাৎ। কিন্তু শেষরাতের দিকে আবার সেই বিচিত্র আলো দেখা গেলো সামনে। সেই সঙ্গে শোনা গেলো জলে ল্যাজ আছড়ানোর আক্রোশ ফোঁস-ফোঁস নিশ্বেস ছাড়ার ভয়ংকর ও অলক্ষুণে আওয়াজ।

আক্রমণ শুরু হ'লো প্রাতঃকালে। সকাল হ'তে না হ'তেই হারপুন বাগিয়ে নেড তার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর পুরোদমে ইঞ্জিন চালিয়ে দেয়া হ'লো।

banglabooks.in

জ্বলন্ত লাল বলের মতো তখন সূর্য উঠছে দিগন্তে, আর জানোয়ারটার সেই উগ্র আলো যেন নিভে গেছে মন্ত্রবলে। মাইল দু-এক দূরে ঢেউয়ের উপরে তার অতিকায় কালো শরীর ভেসে আছে। তিমিমাছের মতো স্তম্ভের আকারে জলের ধারা সে ছুঁড়ে দিচ্ছে—প্রায় চল্লিশ ফুট উঠে গেছে সেই জলস্তম্ভ। আমাদের জাহাজ ক্যাপ্টেনের নির্দেশ অনুযায়ী পুরোদমে জন্তুটির দিকে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, দিগন্ত যেমন ক'রে পিছিয়ে যায়, মরীচিকা যেমন ক'রে স'রে যেতে থাকে, তেমনিভাবে জন্তুটিও কেবল পিছিয়ে যাচ্ছে তখন—দূরত্বটা আর কিছুতেই কমছেনা।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট আরো জোরে জাহাজ চালাতে নির্দেশ দিলেন, ইঞ্জিনের প্রচণ্ড নির্ঘোষ উঠলো সবকিছুকে ছাপিয়ে ; কোনো-এক অতিকায় হৃৎপিণ্ডের মতো আস্ত জাহাজটা যেন ধ্বক-ধ্বক ক'রে বেজে উঠছে, থরোথরো কেঁপে উঠছে আস্ত পাটাতনটি। কিন্তু দূরত্বটা সমান রেখে ঠিক ততখানি বেগেই জানোয়ারটা দূরে চলে যাচ্ছে— যেন কোনো মজার খেলায় সে মেতে উঠেছে।

দূরত্ব যখন একটুও না-ক'মে একই থেকে গেলো আগের মতো, ক্যাপ্টেন তখন কামান দাগার আদেশ দিলেন।

কামানের নির্ঘোষ মেলাবার আগেই দেখা গেলো জন্তুটির মসৃণ কঠিন চামড়ার উপর গোলাটা পিছলে গিয়ে সমুদ্রের জলে ঠিকরে পড়লো।

এই পশ্চাদ্ধাবন চললো সারাদিন ধ'রে। শেষকালে বেলা প'ড়ে এলো ধীরে ধীরে, ডুবে গেলো সূর্য, নেমে এলো অন্ধকার ; আর সেই অন্ধকারে অদ্ভুত এই জন্তুটারও আর-কোনো হদিশ পাওয়া গেলো না। কিন্তু রাত যখন এগারোটা, হঠাৎ মাইল তিনেক দূরে গত রাত্রির মতোই সমুদ্রের বুকে আবার জ্ব'লে উঠলো সেই চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো—তাছাড়া আর-কোনো সাড়াশব্দ নেই তার। সারা দিনের পরিশ্রমে তাহ'লে কি অবসন্ন দানবটি ঘুমিয়ে পড়েছে ?

অন্তত ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটের তা-ই ধারণা হ'লো। সুবর্ণ সুযোগ মনে ক'রে সন্তর্পণে জাহাজটিকে তার দিকে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি। ইঞ্জিন বন্ধ ক'রে দিয়ে নিঃশব্দে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন' সেই প্রজ্বলন্ত কালো দানবটির দিকে এগিয়ে গেলো।

আর মাত্র বিশ ফুট দূরে প'ড়ে আছে দানবটা, নিঃসাড়, কালো ও উজ্জ্বল। লেড ল্যাণ্ড আর একটুও দেরি না ক'রে প্রচণ্ড বেগে তার হারপুন ছুঁড়লো জন্তুটির দিকে। ঠক্ ! একটা চাপা শব্দ উঠলো—হারপুনটা দানবটার গায়ে আছড়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে।

banglabooks.in

অমনি, নিমেষের মধ্যে, সেই উজ্জ্বলপ্রবল আলো নিভে গেলো। প্রচণ্ড দুটি জলের ধারা এসে পড়লো জাহাজের উপর, যেন কোনো সিন্ধু-ঐরাবত তার শুঁড় দিয়ে জল ছুঁড়ে মারছে। প্রচণ্ড তোড়ে মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেলো। মাস্তুল ভেঙে পড়লো মুহূর্তে, ছিঁড়ে গেলো দড়ি-দড়া, নাবিকরা আছড়ে পড়লো এ ওর গায়ে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলুম আমি, তারপরেই রেলিঙের উপর দিয়ে সমুদ্রে ছিটকে পড়লুম।

এত জোরে ছিটকে পড়েছিলুম যে তলিয়ে গিয়েছিলুম প্রথমটায়! কিন্তু সাঁতার জানা ছিলো ব'লে ভেসে উঠতে পারলুম। সাঁতার দিতে-দিতে তাকিয়ে দেখি পুব-দিকে ধীরে-ধীরে 'অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন'-এর আবছা ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে।

থ্যাপার মতো চীৎকার করতে লাগলুম আমি—কিন্তু জাহাজের কেউ আমার সেই চীৎকার শুনতে পেলো ব'লে মনে হ'লো না। প্রাণপণে হাত-পা চালিয়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলুম কেবল; কিন্তু সেটাও মস্ত ভুল হ'লো—তার ফলে অল্পেতেই ভয়ানক ক্লান্ত লাগলো নিজেকে; নিশ্বেস বন্ধ হ'য়ে আসছে ক্রমশ; বুঝতে পারছি যে ডুবে যাচ্ছি কিন্তু কিছুই করার নেই; ভিজে ভারি পোশাকে হাত-পা যেন লোহার মতো ভারি হ'য়ে উঠেছে।

কয়েক ঢোক নোনাজল খেয়ে যখন তলিয়ে গেছি, তখন শক্ত মুঠোয় আমার জামার কলার চেপে ধ'রে যে আমাকে টেনে তুললো, সে আমার অনুগত ভৃত্য কোনসাইল।

'কোনসাইল! তুমি!' অনেক চেষ্টা ক'রে এই দুটি কৃতজ্ঞ ও বিস্মিত কথাই আমি উচ্চারণ করতে পারলুম।

'হ্যাঁ, মঁসিয়, আমি। আপনি জলে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও আপনার পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।'

'কিন্তু "অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন"? আমাদের জাহাজ? সে যে চ'লে গেলো—'

'কিছুই করার নেই তাদের, মঁসিয়। জন্তুটার দারুণ কামড়ে জাহাজের হাল আর চাকা খণ্ড-খণ্ড হ'য়ে গেছে! কাজেই অথৈ জলে নিরুপায়ভাবে নিয়ন্ত্রণবিহীন ভেসে-যাওয়া ছাড়া তাদের আর-কিছুই করার নেই। জলে পড়ার আগেই নাবিক-দের চ্যাঁচামেচিতে এই খবরটা জানতে পেরেছিলাম ব'লেই আমি আর খামকা ওদের ডাক দিই নি।'

'তাহ'লে উপায়?' বুদ্ধিভ্রংশের মতো অসহায়ভাবে কোনসাইলকে আমি জিগেস করলুম।

banglabooks.in

আমার কথার কোনো উত্তর না-দিয়ে, ছুরি বার ক'রে আমার পোশাক কেটে কোনসাইল আমাকে ভারমুক্ত ক'রে দিলে। তারপর নিজের পোশাকও অমনিভাবে ছুরি দিয়ে কেটে সে বিসর্জন দিলে। অতঃপর শুরু হ'লো পালা ক'রে একজনের সাঁতার কাটা আর অন্য জনের ভাসমান দেহকে ঠেলে-নিয়ে-যাওয়া। অকূল সমুদ্রের মধ্যে এ-ভাবে সাঁতার দিয়ে লাভই বা কী? কতক্ষণ আর এভাবে জলের উপর ভেসে থাকতে পারবো? কিন্তু একেবারে হাল না-ছেড়ে দিয়ে কিছু-একটা করা ঢের ভালো—এই কথা মনে রেখে আমরা পালাবদল ক'রে সাঁতার দিতে লাগলুম।

কিন্তু তাও আর কতক্ষণই-বা সম্ভব? অল্পক্ষণের মধ্যেই এমনি অবসাদে ভ'রে গেলুম যে দেহের শেষ শক্তিবিন্দুটুকু পর্যন্ত হারিয়ে গেলো। হাত-পা সব অবশ, দৃষ্টি আচ্ছন্ন, মাথার ভিতর তাজ্মিম-মাজ্মিম করছে, বোধহয় উদ্ধারের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই—এমন সময়ে হঠাৎ একটা কঠিন জিনিশের গায়ে ধাক্কা খেলুম। আর অমনি কে যেন সবল হাতে আমাকে আঁকড়ে ধ'রে জলের উপর থেকে তুলে নিলে। তারপর আর-কিছু মনে নেই।

চেতনা ফিরে আসতেই দেখি দুটি উদ্বিগ্ন মুখ আমার উপর ঝুঁকে আছে—নেড ল্যাণ্ড আর কোনসাইল। তৎক্ষণাৎ ধড়মড় ক'রে উঠে বসবার চেষ্টা করলুম। 'নেড ল্যাণ্ড! তুমি?'

'হ্যাঁ, প্রফেসর আরোনা, আমি। পুরস্কারের টাকার মায়াটা কিছুতেই ছাড়তে পারলুম না, তাই এবার একেবারে জানোয়ারটার পিঠেই চেপে বসেছি। অত জোরে হারপুন ছোঁড়া সত্ত্বেও নেড ল্যাণ্ডের হারপুন কেন ঠং ক'রে লেগে ঠিকরে গিয়েছিলো, তা এবার বুঝতে পারছি, প্রফেসর। কোনো হারপুন কি আর ইস্পাতের বর্ম ভেদ করতে পারে?'

'তার মানে?'

'তার মানে অত্যন্ত সরল, প্রফেসর। আপনি যার উপর ব'সে আছেন, সেটা যে আসলে অতিকঠিন একটি ধাতুনির্মিত খোল, তা আপনি হাত বুলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর যার পিছনে আমরা সর্বকর্ম ছেড়ে তেড়ে গিয়েছিলাম, সেটা আসলে তিমি নয়, তিমিঙ্গিলও নয়, অথবা অতিকায় ও অজ্ঞাত কোনো সিন্ধুদানবও নয়, সেটা আসলে একটি—'

'ডুবোজাহাজ!' বিমূঢ় আমি কলের পুতুলের মতো তার মুখে কথা জুগিয়ে দিলুম।

banglabooks.in

'ঠিক তাই।'

ততক্ষণে আস্তে পুবদিকে লাল ছোপ দিচ্ছে ; গোল একটা আগুনের চাকার মতো টকটকে সূর্য উঠে আসছে সমুদ্রের জল থেকে। হঠাৎ এমন সময়ে পায়ের তলার বিশাল ভাসমান বস্তুটা ন'ড়ে উঠলো। তারপরেই সেটা ডুবতে শুরু করলো আস্তে-আস্তে।

আমরা সবাই আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলুম। থ্যাপার মতো ডুবো-জাহাজটার গায়ে পদাঘাত করতে-করতে নেড ল্যাণ্ড প্রচণ্ড ও নিরর্থক চীৎকার শুরু ক'রে দিলে।

হয়তো নেডের ওই চীৎকার একেবারেই নিরর্থক ছিলো না। কারণ আচমকা সেই বিচিত্র ডুবোজাহাজটি নিশ্চল হ'য়ে গেলো, তারপর ঢাকনি খুলে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি লোক। কী-এক দুর্বোধ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠেই সে আবার ভিতরে ঢুকে গেলো। তারপরেই পরপর উঠে এলো আটজন মুখোশ-পরা পুরুষ মূর্তি ; আমরা কোনো-কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের টেনে হিঁচড়ে সেই ডুবোজাহাজের ভিতরে নিয়ে গেলো তারা।

৫

'কোথাকার জংলি, এরা ?

অন্ধকারের মধ্যেই পায়ের তলায় একটা লোহার সিঁড়ি অনুভব করতে পারলুম। তারপরেই টাল সামলাতে না-পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম ঘুটঘুটি অন্ধকার একটি ঘরে ; শব্দ শুনে বোঝা গেলো মুহূর্তে পিছনের দরজা ঘটাং ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেলো।

বেশিক্ষণ কিন্তু অন্ধকারে থাকতে হ'লো না। খানিক পরে মাথার উপর একটি ফানুশের লণ্ঠনে বৈদ্যুতিক আলো জ্ব'লে উঠলো, তারপর নিরেট ও মসৃণ দেয়ালের একটা অংশ দরজার মতো খুলে গেলো। একটু পরেই দুটি লোক ঘরে ঢুকলো।

তাদের মধ্যে একজন যে স্বয়ং নেতা, তা মুহূর্তেই বোঝা গেলো। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময় তাঁর শরীর, যেন তা অস্মিতার প্রতিমূর্তি। শান্ত মুখের মধ্যে অদ্ভুত একটি দৃঢ়তার ছাপ রয়েছে, চোখের তারায় দুর্জয় সাহসের দীপ্তি। ঋজু তাঁর ভঙ্গি, চলাফেরায় আভিজাত্যের স্বাক্ষর ; মনে হয় বুঝি কোনো শেষ সম্রাটের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালুম। পাণ্ডুর মুখবর্ণ, ঈষৎ বিষাদময় ; দীর্ঘদেহী এই মানুষটিরও চওড়া

banglabooks.in

কপাল আর কম্পমান আঙুল যেন কোনো গোপন আবেগের পরিচয় দেয়। স্বচ্ছ মর্মভেদী চোখে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন—যেন ওই দৃষ্টি দিয়েই তিনি আমাদের ভিতরটা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে নিতে চাচ্ছেন।

ঘরের ভিতরকার থমথমে স্তব্ধতা আমিই ভাঙলুম। ফরাসী ভাষাতেই আমি আমাদের দুর্দশার কাহিনী ব'লে গেলুম। কোনো কথা না ব'লে তা তারা শুনে গেলো। সেই অভিজাতমণ্ডিত মানুষটির চোখে মুখে আগ্রহ ও কৌতূহলের ছাপ দেখতে পেলুম, কিন্তু তবু কেন যেন মনে হ'লো আমার ভাষা বোধহয় তাঁর দুর্বোধ ঠেকছে।

আমি তাতে মোটেই দ'মে গেলুম না। আমার অনুরোধে নেড সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করলে ইংরেজিতে, তারপর কোনসাইল আলেমান ভাষায়। তখনও তাদের কোনো উচ্চবাচ্য করতে না দেখে শেষে ভাঙা-ভাঙা লাতিন ভাষারই শরণ নিলুম আমি। কিন্তু তারা তেমনি নির্বাকভাবে আমাদের লক্ষ্য ক'রে গেলো কেবল। তারপর কি-এক অদ্ভুত ও অচেনা ভাষায় কথা বলতে-বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

তারা চ'লে যেতেই নেড বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো। কোথাকার জংলি এরা যে পৃথিবীর কোনো সভ্য ভাষাই বোঝে না?'

নেডের গজরানি শেষ হবার আগেই আবার দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো একটি পরিচারক। অন্যদের মতো এরও মাথায় সিন্ধু-ভোঁদড়ের লোমের টুপি, সীলমাছের চামড়ার জুতো, আর কোনো অচেনা কাপড়ের পোশাক! হুবহু সেই রকমই কতকগুলি কুর্তা ও পাতলুন সে রাখলে আমাদের সামনে। পোশাকগুলো যে আমাদের জন্যই, তা সে না-বললেও বুঝতে পারলুম; তৎক্ষণাৎ আমরা ভিজে পোশাক ছেড়ে এই নতুন ও অদ্ভুত পোশাক প'রে নিলুম।

এর মধ্যে পরিচারকটি টেবিলের উপর খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে দিয়ে গেছে! চিনেমাটি আর রুপোর রেকাবিতে সারি-সারি সাজানো সে-সব খাবার দেখে নেড ব'লে উঠলো! 'শাবাশ! এবার তা'হলে কচ্ছপের যকৃৎ হাঙরের মুড়িঘণ্ট আর কুকুর-মাছের ডিম ভাজা খেয়ে নিন—তা'হলেই তোফা হয়!'

কিন্তু নেডের এই গজরানির কোনো কারণ ছিলো না। খাবারের মধ্যে কয়েকটা কেবল অচেনা মাছ আছে। রুটি আর মদ না-থাকায় নেডের বিরক্তি চীৎকৃতভাবে প্রকাশ পেলো। আমার কিন্তু রান্নাটা সত্যি তোফা লাগলো। খাবার জলটাও বেশ টলটলে পরিষ্কার। ভোজবাড়ির খাওয়া হ'লো যেন আমাদের। আর

banglabooks.in

খাওয়ার পরেই চোখ ভ'রে ঘুম নেমে এলো। শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়লুম তিনজনে।

কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিলুম আন্দাজ নেই। ঘুম ভাঙার পর দেখলুম নেড আর কোন-সাইল তখনো ঘুমে অচেতন। ঘরের ভিতরটা কেমন যেন গুমোট-মতো, নিশ্বেস নিতে কষ্ট হয়। কেমন ক'রে যে এরা ঘরের মধ্যে অক্সিজেন সরবরাহ করে তা-ই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ এক ঝলক টাটকা সমুদ্রের হাওয়ায় মুহূর্তে ঘরের দম-বন্ধকরা ভাবটা কেটে গেলো।

শুয়ে-শুয়ে কত অদ্ভুত ও বিচিত্র কথা ভাবছি, এমন সময়, নেড আর কোন-সাইলেরও ঘুম ভেঙে গেলো। খুব খিদে পেয়েছিলো আমাদের। কিন্তু এই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটির অত্যদ্ভুত লোকগুলো আবার আমাদের খেতে দেবে কি না জানি না। নেড আর কোনসাইল তো খিদেয় রীতিমতো কাতর হ'য়ে পড়েছিলো। নেড তা ঘুম ভাঙার পর থেকেই ছটফট করছে, আর কোনসাইলও যথোচিত চেষ্টা সত্ত্বেও তার কাতর ভাবটা কিছুতেই গোপন রাখতে পারছে না। নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে আমি ওদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু খিদের জ্বালায় নেড তখন উন্মত্তপ্রায়; ঘরময় দাপাদাপি শুরু ক'রে দিয়েছে সে, ক্রমাগত লাথি মারছে সেই দেয়ালে, আর সমানে চীৎকার ক'রে ডুবোজাহাজের প্রত্যেকটা আরোহীকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে। শেষটায় ওর রকমশকম আমাকে রীতিমতো আতঙ্কিত ক'রে তুললো।

আমার এই আশঙ্কা যে মোটেই অমূলক নয়, একটু পরেই তা টের পাওয়া গেলো। কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা খুলে একটি পরিচারক ঢুকতেই নেড আচমকা তার উপর খ্যাপা নেকড়ের মতো লাফিয়ে পড়লো। অমন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পরিচারকটি একটা পাক খেয়েই মেঝেয় ছিটকে পড়লো। অমনি নেড তার বুকের উপর চেপে ব'সে টুঁটি টিপে ধরলো। কেলেঙ্কারি হয় দেখে আমি আর কোনসাইল নেডকে টেনে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন

banglabooks.in

পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ফরাশিতে ব'লে উঠলো। 'শান্ত হও, মিস্টার ল্যাণ্ড। প্রফেসর দয়া ক'রে আমার কয়েকটি কথা শুনবেন কি আপনি ?'

বক্তা আর-কেউ নন—সেই অভিজাত পুরুষ, যাঁকে দেখেই আমার দলপতি ব'লে বোধ হয়েছিলো।

নেড তো এ-কথা শুনেই লাফিয়ে উঠলো। তাকিয়ে ছাখে টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, বুকের উপর হাত দুটি আড়াআড়িভাবে ভাঁজ-করা, সমস্ত ভঙ্গিমাটির মধ্যে কর্তৃত্বের ছাপ।

বিস্মিত আমার তখন স্তব্ধতা ভেঙে কথা বলার ক্ষমতা ছিলো না। তিনিই আবার বিশুদ্ধ ফরাশিতে বলতে লাগলেন, 'আমি ফরাশি, আলেমান, ইংরেজি ও লাতিন ভাষা বলতে পারি। কিন্তু তখন আমি কথা বলিনি এই জন্যেই যে আমি বুঝতে পারছিলুম না আপনারা সত্যি কথা বলছেন কিনা। পরে যখন দেখলুম চার ভাষায় বলা চারটে গল্পই এক, তখন বুঝলুম আপনারা মিথ্যে বলেননি। আমি তো আর পৃথিবীর বাসিন্দা নই, আপনাদের ওই জগৎ থেকে নিজেকে আমি সম্পূর্ণ সরিয়ে এনেছি এই জলের তলায়, তবুও আপনারা এসেছেন আমাকে উত্ত্যক্ত করতে···'

'আমরা কিন্তু স্বেচ্ছায় আসি নি।'

'এই-যে "অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন" হন্যে হ'য়ে সাত সমুদ্রে আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে সে কি আপনাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও ? আমার জাহাজ লক্ষ্য ক'রে যে কামান ছোঁড়া হয়েছে, তা কি অনিচ্ছার সাক্ষী ? নেড ল্যাণ্ড যে এই জাহাজ লক্ষ্য ক'রে হারপুন ছুঁড়েছিলো তাও কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ?' রোষে তাঁর গলা গমগম ক'রে ওঠে। স্পষ্ট গম্ভীর স্বরে তিনি বলতে থাকেন, 'যাক, এ সম্বন্ধে আমি কোনো বাদ-প্রতিবাদ করতে চাই নে। আপনারা এখন যুদ্ধবন্দী। নেহাত দয়া ক'রে আপনাদের আমি সলিল-সমাধি থেকে বাঁচিয়েছি। নয়তো আমার জাহাজ জলের তলায় নিয়ে গিয়ে আপনাদের অকূল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে মেরে ফেলাই কি আমার উচিত ছিলো না ?'

'তা'হলে সেটা বর্বরোচিত হ'তো, কেননা কোনো সভ্যমানুষ এমন পাষাণ হ'তে পারে না,' আমি বললুম।

'প্রফেসর,' তাঁর গলার স্বর তীব্র হয়ে উঠলো, 'আপনারা যাকে সভ্য বলেন, আমি তা নই। ওই তথাকথিত সভ্যতার আগাপাশতলা দেখেছি আমি, জানি তার হাম্‌বড়া বুলি ও নৃশংস ক্রিয়াকলাপের অর্থ কী। আমাদের ওই সভ্যজগতের সঙ্গে

banglabooks.in

সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি আমি, আপনাদের কোনো নিয়মকানুনই আমি মানি না। আপনাকে আমি স্পষ্ট ক'রে জানিয়ে দিচ্ছি, প্রফেসর, ভবিষ্যতে কখনো ওই সভ্যজগতের নজির আমার কাছে তুলবেন না।'

প্রচণ্ড রোষে তাঁর চোখ ঝকঝক ক'রে উঠলো। সেই গম্ভীর গমগমে গাল শুনে বুঝতে পারলুম, নিশ্চয় এই মানুষটির জীবনে কোনো ভীষণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে। তথাকথিত আইনকানুন তিনি মানেন না; সিন্ধুতলের কোনো গভীর আইনের বাধানিষেধও তাঁকে শাসন করতে অক্ষম। বোধহয় একমাত্র বিবেক, আর ঈশ্বর ছাড়া আর-কারো সংহিতাকেই তিনি গ্রাহ্য করেন না।

"এই জাহাজে আপনাদের স্থান দিতে পারি কেবল কয়েকটি শর্তে,' আবার কঠিন স্বরে বললেন তিনি, 'মাঝে-মাঝে এমন-সব ঘটনা ঘটবে যা আপনাদের দেখতে দেয়া হবে না। তখন আপনাদের আমি এই ঘরে বন্দী ক'রে রাখবো। আর, জীবদ্দশায় আপনারা আর সভ্যজগতে ফিরে যেতে পারবেন না।'

'অর্থাৎ আমরা বন্দী হ'য়েই থাকবো?'

'এক অর্থে তা-ই। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই আপনারা আমার মতোই এখানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবেন।'

'তার মানে, জেলখানায় কোনো বন্দী ইচ্ছে করলে যেমনভাবে পায়চারি করতে পারে, আমাদেরও কেবল সেই অধিকারটুকু থাকবে?'

'সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অর্থ আপনি যদি তা-ই করেন, তা'হলে আমি কোনো প্রতিবাদ করতে চাই না। তবে আপনাদের আমি কখনোই পৃথিবীতে ফিরে যেতে দেবো না, কেননা আপনারা আমার গোপন অস্তিত্বের কথা জেনে গেছেন, আসলে আপনাদের এখানে রেখে আমি নিজেকেই রক্ষা করার চেষ্টা করছি।'

'অর্থাৎ আপনার শর্ত মেনে না নিলে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।'

'অগত্যা।'

'এ-কথার কোনো উত্তর নেই। তবে এই জাহাজের নেতার কাছে আমরা কোনো-কথার সূত্রে বদ্ধ নই।'

'না, তা নন।' তারপর মানুষটি অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বললেন, 'মঁসিয় আরোনা, আপনার অন্তত এই প্রস্তাবে আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না। সমুদ্রের রহস্য সম্বন্ধে আপনি একাধিক বই লিখে থাকলেও আপনার জ্ঞান ও নানা অনুমান মূলত অসম্পূর্ণ। এই জাহাজে থাকলে আপনি সেই অজ্ঞাত জগৎ দেখার সুযোগ পাবেন, যার রহস্য বস্তুত এত কাল কেবল অনুমাননির্ভর ছিলো। আমাকে

banglabooks.in

আপনার ধন্যবাদ দেয়া উচিত, কারণ আমার জন্যেই সিন্ধুতলের বিপুল রহস্য ভেদ করার সুযোগ পাবেন আপনি।'

প্রকৃতিবিজ্ঞানের উল্লেখ যে আমাকে দুর্বল ক'রে ফেললো, এ-কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই; মুহূর্তের জন্য এ-কথা ভুলে গেলুম যে স্বাধীনতার বিনিময়ে আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করার কোনো অর্থ হয় না। আস্তে তাঁকে জিগেস করলুম, 'আপনাকে কী ব'লে সম্বোধন করবো আমি।'

কাপ্তেন নেমো।···আপনি আর আপনার সঙ্গীরা আমার কাছে 'নটিলাস' জাহাজের যাত্রী ছাড়া আর-কেউ নন।' তারপর নেড আর কোনসাইলের দিকে ফিরে বললেন, 'এখানে, এই কেবিনেই—আপনাদের খাবার দেয়া হয়েছে। এই পরিচারকটি আপনাদের দেখাশুনো করবে।···আর মঁসিয় আরোনা, আমাদের ছোটোহাজরি প্রস্তুত। আসুন, আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।'

দীর্ঘ করিডর পেরিয়ে আমাকে নিয়ে তাঁর খাবার-ঘরে এলেন কাপ্তেন নেমো। বিলাসবহুল মূল্যবান আশবাবপত্রে সাজানো কেবিনগুলো দেখে রীতিমতো তাজ্জব হ'য়ে যেতে হয়। যেন জলের তলায় নতুন এক অমূল্য জগতের উপর থেকে পর্দা উঠে গেলো।

বিস্তর খাবার সাজানো ছিলো টেবিলের উপর, কিন্তু সবই আমার অচেনা। আমার চোখমুখে কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠতে দেখে কাপ্তেন নেমো বললেন, 'বেশির ভাগ খাবারই আপনার অচেনা ঠেকবে, মঁসিয় আরোনা। কারণ যা-কিছু দেখছেন, সবই সিন্ধুতলের অবদান। পৃথিবীতে আপনারা যে-খাদ্য গ্রহণ করেন, বহুদিন হ'লো আমি তা ত্যাগ করেছি, কিন্তু এই খেয়েই বেশ সুস্থ ও শক্ত আছি—কোনো অস্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করি না।'

'এইসব খাবারই তবে সমুদ্রের দান?'

'হ্যাঁ, প্রফেসর। সমুদ্রই আমার যাবতীয় চাহিদা মেটায়। কখনো জাল ফেলে সব জোটাই আমি, কখনো দলবল নিয়ে জলের তলায় বেরোই শিকারে। ওটা কচ্ছপের মাংস ভাজা, আর এটা শুশুকের যকৃৎ—খেতে অনেকটা শুয়োরের মাংসের মতো লাগবে। আর এটা হ'লো তিমিমাছের দুধ থেকেতৈরি পনির। চিনি বানিয়েছি উত্তর সাগরের সমুদ্রের শ্যাওলা থেকে।' কাপ্তেন নেমো বলতে থাকেন, 'প্রফেসর, সমুদ্র কেবল আমাকে আহার্যই জোগায় না, বসনভূষণও দেয়। আপনি তো জানেন ঝিনুক শামুক শুগলি প্রভৃতি কতগুলো সামুদ্রিক প্রাণী এক ধরনের সূক্ষ্ম রেশমের মতো তন্তু দিয়ে নিজেদের বেঁধে রাখে—এই আঁশকে বলে বাইসাস।

banglabooks.in

আপনি যে-পোশাক প'রে আছেন, তা এই বাইসাস থেকে তৈরি। ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি কঠিন বর্ম প্রাণীর দেহের রঙে এই পোশাক রঙ করা হয়েছে। আপনার শয্যায় পাতা আছে সমুদ্রের সবচেয়ে নরম ঘাস। লেখার জন্য পাবেন তিমিমাছের হাড়ের কলম, আর যে-কালি দিয়ে আপনি লিখবেন তা কালামারির দেহ-নিংড়োনো কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ।'

'সমুদ্রকে আপনি ভালোবাসেন, কাপ্তেন?'

বাসি। সমুদ্রেই আমার সব, সর্বস্ব। তার হাওয়া শুদ্ধ, স্বাস্থ্যময়। সমুদ্র হচ্ছে বিপুল একটা মরুভূমির মতো, যেখানে মানুষ কখনোই একা বোধ করে না, কারণ তার চারপাশে সে অনুভব করে প্রাণের স্পন্দন—এক অনিঃশেষ প্রাণস্রোত সেখানে অনন্ত বহমান। সমুদ্রে স্বৈরাচারীর স্থান নেই—তারা হানাহানি ক'রে মরে ডাঙায়, জলের উপরে; ত্রিশ বাঁও নিচে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই। প্রফেসর, জলের মধ্যে থাকুন দেখবেন স্বাধীনতা কেবল এই সিন্ধুতলেই আছে। এই সিন্ধুতলে কোনো স্বৈরাচারী প্রভু নেই, সেখানেই আমি আমার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারি, সেখানেই আমি স্বাধীন, আত্মপ্রভু!' কথা বলতে-বলতে প্রবল আবেগে উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন কাপ্তেন নেমো; উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু একটু পরেই আবার নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আসুন মঁসিয় আরোনা, চলুন—আপনাকে আমার "নটিলাস" ঘুরিয়ে দেখাই।'

৭

রাজা ও সন্ন্যাসী

কাপ্তেন নেমো আমাকে কী দেখিয়েছিলেন 'নটিলাস'-এ? সব-কিছু। হয় এই ছোট্ট উত্তরটিতে পাঠকদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, আর নয়তো এ-তথ্যটা মনে রাখতে হবে যে পাতার পর পাতা জুড়ে লিখলেও এই বিচিত্র ডুবোজাহাজটির ভিতরকার স্বয়ম্পূর্ণ পৃথিবীর বর্ণনা কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না। দেখেছিলুম মস্ত গ্রন্থাগার—সব ভাষার সব রুচির বই সাজানো আছে থরে-থরে, তবে সংখ্যায় বিজ্ঞানের বই-ই বেশি; দর্শন, পুরাণ, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস—এদেরও তাই ব'লে অবহেলা করা হয়নি। দেখেছিলুম এমন-এক বিচিত্রভবন বা সংগ্রহশালা, সারা ইয়োরোপে যার

banglabooks.in

কোনো তুলনা মিলবে না, যা এমনকী কল্পনাকেও অনায়াসে ছাড়িয়ে যায়। যাবতীয় দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু তো আছেই, তাছাড়াও ছিলো এমন অনেক বস্তু, যার সন্ধান পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানীই এখনো পায়নি। আর দেখেছিলুম রত্নশালা —যেখানে নানা রঙের নানা আকারের ছোটো-বড়ো অসংখ্য মূল্যবান মুক্তো জমিয়ে রাখা হয়েছে।

এই সংগ্রহের পিছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, তার সামান্য এক-ভাগও সাত রাজাকে ফতুর ক'রে দিতে পারে। অথচ এই অসীম ধনবান মানুষটির শয়নকক্ষ আমাকে আশ্চর্য করেছিলো সবচেয়ে বেশি। এ যেন কোনো সন্ন্যাসীর ঘর —নিরাবরণ ও নিরাভরণ ; একটা লোহার খাট, একটা ছোট্ট টেবিল, আর হাত ধোবার একটা বেসিন ছাড়া আর-কিছুই নেই। এই অতুল ঐশ্বর্যের পাশেই এই সুকঠোর তপশ্চর্যা তাঁর সম্বন্ধে কি রকম যেন দুর্বল ক'রে ফেললে আমাকে

তারপরে এই বিদ্রোহী মানুষটি আমাকে 'নটিলাস'-এর সব যন্ত্রপাতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নাবিকরা যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তার কোনোটা তাঁর সংগ্রহ থেকে বাদ যায়নি।

'নটিলাস'-এর যে-দানবিক শক্তি সাত সমুদ্রকে কাঁপিয়ে তুলেছে, তার মূল হ'লো বিদ্যুৎ। সমুদ্রজল থেকে সোডিয়াম নিষ্কাশন ক'রে অত্যন্ত অনায়াসে ও শস্তায় অফুরন্ত বিদ্যুৎ-শক্তি বানিয়ে নেয় 'নটিলাস।' তার প্রচণ্ড গতিবেগ, আলো আর উত্তাপের উৎসই হচ্ছে এই অফুরান বিদ্যুতের ভাণ্ডার—সিন্ধুতল। শক্তিশালী পাম্প দিয়ে বাতাস-ঘরে প্রচুর ঘন-বাতাস জমিয়ে রাখতেন কাপ্তেন নেমো, যাতে জলের তলায় একটানা অনেকদিন থাকতে হ'লেও কোনো অসুবিধে না-হয়। বিদ্যুৎচালিত ঘড়ি, জাহাজের গতিমাপক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, জলস্তরের তাপমাত্রা মাপবার তাপমান যন্ত্র, বহু অতিরিক্ত গীয়ার প্রভৃতি নানাবিধ জিনিশ তিনি এক-এক ক'রে দেখালেন আমাকে।

'নটিলাস'-এর ঠিক মাঝখানে একটা কুয়োর মতো খাড়া সুরঙ্গ দেখতে পেলাম। কুয়োর উপরে ঘোরানো-সিঁড়ি উঠে গেছে। এটা যে কী, বা কেন এটা আছে—কিছুই আমি বুঝতে পারছিলুম না। আমার কৌতূহলী চাহনি দেখে কাপ্তেন নেমো জানালেন, 'উপরে আমার নৌকো আছে প্রফেসর।'

'তাই নাকি ?' কিন্তু নৌকোয় চড়তে হ'লে নিশ্চয় "নটিলাস"কে জলের উপর নিয়ে যেতে হয়।'

'মোটেই না। নৌকোর উপরে-নিচে দুটি ঢাকনি আছে। নিচেরটা বন্ধ ক'রে

banglabooks.in

বাঁধন খুলে দিলেই, ছিপির মতো, নৌকো জলের উপর ভেসে ওঠে। তারপর পাটাতনের উপরকার ঢাকনি খুলে মাস্তুল লাগিয়ে পাল তুলে দাঁড় টানলেই হ'লো।'

'কিন্তু ফিরে আসেন কী ক'রে ?'

'আমি আসি না, বরং "নটিলাস"ই আমার কাছে যায়। বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে বার্তা পাঠালেই জাহাজ চ'লে যায় আমার কাছে।'

'নটিলাস'-এর আরেক দিকে গিয়ে সমুদ্রের নোনাজল পরিস্রুত ক'রে টলটলে পানীয় জল তৈরি করার ব্যবস্থা দেখলুম। ইঞ্জিন-ঘরটা ছিলো সবচেয়ে পিছনে। এখান থেকেই প্রচণ্ড বেগ লাভ ক'রে 'নটিলাস'-এর প্রপেলার ঘুরিয়ে ঘণ্টায় এমন-কী পঁয়তাল্লিশ নট বেগেও জাহাজ চালানো যায়।

সব দেখে-শুনে আমরা আবার গ্যালারি-ঘরে ফিরে এলুম। একটি সোফায় বসতে-বসতে বললুম, 'কাপ্তেন নেমো, সবই দেখতে পেলুম, কিন্তু এখনো অনেক তথ্য আমার কাছে গোপন ও রহস্যময় থেকে গেলো।'

আমার দিকে একটি সিগার বাড়িয়ে দিলেন কাপ্তেন নেমো। 'নিন, আপনি নিশ্চয়ই ধূমপান করেন।'

'সে কি ! আপনারা এখানে চুরুটও খান নাকি ?'

'নিশ্চয়ই !'

'তাহ'লে এখনো নিশ্চয়ই হ্যাভানার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন আপনি ?'

'না, তা রাখি নি। চুরুটটা যদিও হ্যাভানার নয়, তবু তা আপনার ভালো লাগবে ব'লে আশা করি।'

সোনালি রঙের চুরুট জ্বালিয়ে বুক ভ'রে ধোঁয়া নিলুম আমি। 'চমৎকার চুরুট। কিন্তু তামাক আছে ব'লে তো মনে হয় না।'

'না। এই তামাক হ্যাভানারও নয়, ব্রহ্মদেশেরও নয়। আসলে এটা সমুদ্রেরই একরকম শ্যাওলা—নিকোটিনে ভর্তি। অবশ্য এই শ্যাওলা খুব-যে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, তা নয়। আপনার যদি এই চুরুট ভালো লেগে থাকে, তাহ'লে আপনি যত-ইচ্ছে তা খেতে পারেন।'

চুরুট খেতে-খেতেই আমি আবার বললুম, 'নটিলাস'-এর রহস্য এখনো আমার কাছে গোপন থেকে গেলো, ক্যাপ্টেন।'

ক্যাপ্টেন নেমো আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বললেন, 'কোনো রহস্যই আপনার গোপন থাকবে না, মঁসিয় আরোনা ; সবই আপনাকে খুলে বলবো,

banglabooks.in

কারণ 'নটিলাস' থেকে আমার এই গোপন খবর নিয়ে কোনোদিনই আর সভ্যজগতে ফিরে যেতে পারবেন না আপনি !'

একটু থেমে তিনি সব বিশদ করলেন, 'ম'সিয় আরোনা, "নটিলাস"-এর দৈর্ঘ্য পঁচাত্তর গজ। পুরো জাহাজটা দু-দুটো ইস্পাতের খোলে মোড়া আছে, একটা ইস্পাতের পাতের উপর আরেকটা ইস্পাতের পাত বসানো ব'লে যে-কোনো ভীষণ আঘাতও অনায়াসে প্রতিহত ও উপেক্ষা করতে পারে "নটিলাস"। জাহাজের ভিতরে মস্ত কয়েকটা ট্যাঙ্ক আছে—ডুব দেবার সময় পাম্প ক'রে ওই জলাধারগুলো ভ'রে নিই। কখনো খুব গভীরে নামতে হ'লে "নটিলাস" অবশ্য হাইড্রোপ্লেনের সাহায্যে কোণাকুণিভাবে জল কেটে নামতে পারে।'

'কিন্তু জলের তলায় চালক পথ দেখবে কেমন ক'রে ? সিন্ধুতলে তো আর সূর্য ওঠে না !'

'মস্ত একটা ঘুলঘুলি বসানো স্তম্ভের মধ্যে চালক আর হুইল থাকে—দেয়ালের গায়ে আবার টেলিস্কোপও বসানো আছে। দু-পাশ থেকে তীব্র বিদ্যুতের আলোয় সমুদ্রের জল দিনের মতো ঝলমল করতে থাকে।'

'ও, তাহ'লে এই আলোকেই আমরা সিন্ধুদানবের গা থেকে ছড়িয়ে-পড়া ফসফরাসের দীপ্তি ব'লে মনে করেছিলুম। কিন্তু "স্কটিয়া" জাহাজকে আপনি খামকা হঠাৎ জখম করতে গেলেন কেন ?'

'সেদিন "নটিলাস" মাত্র এক বাঁও তলা দিয়ে যাচ্ছিলো। তাহতেই হঠাৎ "স্কটিয়ার" খোলে ধাক্কা লেগে যায়।'

'আর "অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন" ?'

'ম'সিয় আরোনা, এটা ভুলে যাবেন না যে "অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন" আমাকে আক্রমণ করেছিলো, তাই আত্মরক্ষার জন্যই আপনাদের জাহাজকে কেবল বিকল ক'রে দিয়েছিলুম, ডুবিয়ে দিই নি।'

আমি তক্ষুনি প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললুম। তাছাড়া 'নটিলাস'-এর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা ও বিস্ময় তখন অসীমে পৌঁছেছিলো। জিগেস করলুম, 'আচ্ছা, এত বড়ো জাহাজটা এত গোপনে আপনি তৈরি করলেন কোথায় যে কাকপক্ষীও তার কথা টের পেল না ?'

'একটা নির্জন দ্বীপে। টুকরো-টুকরো অংশগুলো আমি এক জায়গায় কিনি নি—তাহ'লে লোকের সন্দেহ হ'তে পারতো। নানা দেশ থেকে নানা অংশ আনিয়েছিলুম আমি—খোলটা এসেছে ফ্রান্স থেকে, লণ্ডন থেকে চাকার রড, লিভারপুল

banglabooks.in

থেকে ইস্পাতের বর্ম, গ্লাসগো থেকে আস্ত চাকাটা, ট্যাঙ্কগুলো বানিয়েছিলুম পারীতে, জার্মানিতে ইঞ্জিন, সুইডেনে সামনের অংশটা, আর নিউ-ইয়র্কে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলো। প্রত্যেকটা কারখানায় ভিন্ন-ভিন্ন নামে নক্সা আর খশড়া পাঠিয়েছিলুম। তারপর একটা নির্জন দ্বীপে সব জুড়ে দিয়ে তৈরি হ'লো "নটিলাস"। তারপর "নটিলাস" নিয়ে অকুল পাথারে ভেসে-পড়ার আগে আগুন দিয়ে সব-কিছু একেবারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিয়েছিলুম, যাতে কোনোদিন আপনাদের সভ্যজগৎ এর-কিছু টের না-পায়।'

'আপনার ঐশ্বর্যের নিশ্চয়ই সীমা নেই—'

'সত্যি সীমা নেই, প্রফেসর। ফরাশিদের জাতীয়-ঋণ আমি অনায়াসে—নিজের একটুও অসুবিধে না-করে—মিটিয়ে দিতে পারি।'

ক্যাপ্টেন নেমো কথাটা এমন নির্বিকারভাবে বললেন যে আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। তিনি কি তাহ'লে আমাকে উজবুক বানাতে চাচ্ছেন?

'এবার, প্রফেসর,' ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, 'আমাদের সমুদ্র যাত্রা শুরু হবে; আবার একবার আস্ত পৃথিবী ঘুরে আসবে "নটিলাস" সমুদ্রের তলা দিয়ে। আমাকে গিয়ে যাত্রার ব্যবস্থা করতে হয়। এখন আমরা পারীর মধ্যরেখার ৩৭°১৫´ পশ্চিম দ্রাঘিমা আর ৩০°৭´ অক্ষরেখায় আছি। এখান থেকেই আজ নভেম্বরের আট তারিখে দ্বিপ্রহরে আমাদের সমুদ্রতল অভিযান শুরু হবে। আসলে আমরা এখন জাপানের উপকূল থেকে তিনশো মাইল দূরে রয়েছি। আপনি বরং এখানেই বসুন, আমি ইঞ্জিনঘর থেকে ঘুরে আসি।'

ক্যাপ্টেন নেমো চ'লে গেলেন। আমি একা ব'সে-ব'সে এই রহস্যময় মানুষটির কথা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লুম। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অতীতের স্মৃতি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বেদনাময়; তাঁর আর্ত পাণ্ডুর মুখচ্ছবিতে বিষণ্ণ অথচ উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন অত্যন্ত সযত্নে কোনো দূর দিনকে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছে। মানুষটি স্বাধীনচেতা; যতক্ষণ কথা হ'লো ততক্ষণই কেবল স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছেন বারে-বারে। তবে কি তিনি কোনো পরাধীন দেশের মানুষ? কোন

banglabooks.in

দেশের মানুষ তিনি আসলে ? কেন তিনি পৃথিবীকে এমন ঘৃণা করেন ? কেন এই মানবজাতি সম্বন্ধে তাঁর অবজ্ঞা ও ঘৃণার শেষ নেই ? কেন তাঁর গলার স্বর মাঝে মাঝে অমন তীব্র ও ভীষণ হ'য়ে ওঠে ?

কতক্ষণ ধ'রে যে এ-সব কথা ভাবছিলুম বলতে পারবো না। হঠাৎ অন্যমনস্ক-ভাবে চোখ গিয়ে পড়লো টেবিলের উপরকার মস্ত ভূগোলকটার উপর। তারপর ভালো ক'রে তাকিয়ে আঙুল রেখে দেখলুম আমরা কোনখানে রয়েছি—কোন-খানে ওই দ্রাঘিমা আর অক্ষরেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে।

ডাঙায় যেমন নদী থাকে, তেমনি থাকে সিন্ধুতলেও। তাপমাত্রা আর বর্ণলেপের তারতম্য থেকেই এই বিশেষ স্রোতগুলোকে শনাক্ত করতে হয়। এদের ভিতর সবচেয়ে বিখ্যাত হ'লো গালফ স্ট্রিম। এই স্রোত ধ'রেই আমরা এখন ছুটে চলেছি। নিপ্পনীরা এই সিন্ধু-নদীকে বলে কুরো-শিভো অর্থাৎ কালো নদী। বঙ্গোপসাগর থেকে বেরিয়ে এই স্রোত মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম ক'রে এশিয়ার উপকূল ধ'রে এগোতে-এগোতে একেবারে উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়ে। এই সামুদ্রিক স্রোতটির রঙ এত গাঢ়-নীল যে প্রায় কালো ব'লেই বোধ হয়। আর এই স্রোত যে শুধু কালো তা-ই নয়, বেশ উষ্ণও বটে। ভূগোলকটির উপর আঙুল রেখে এই কালো নদীর গতিপথ দেখছি এমন সময়ে ঘরে ঢুকলো নেড আর কোনসাইল।

সংগ্রহশালাটি দেখেই দুজনে বিস্ময়ে হতবাক। কিন্তু নেড ল্যাণ্ড ডাকাবুকো একরোখা লোক ; তা-দেখে সহজে ভুলবে কেন ? কী ক'রে এই 'নটিলাস' নামক জেলখানা থেকে পালানো যায়, সেই চিন্তাই তখন তার কাছে একমাত্র চিন্তা। কথাবার্তার মধ্যেও বারে-বারে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন করছে।

এমন সময় হঠাৎ সব অন্ধকার হ'য়ে গেলো। নেড-ল্যাণ্ড কী-একটা কথা বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ এই গভীর অন্ধকার নেমে এলো ব'লে তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো। কী যে করবো কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। এই অন্ধকার কি কোনো ভীষণ অমঙ্গলের সংকেত, না কি 'নটিলাস'-এর যাত্রার সূচনা—তা আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিলো না। শুধু একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ ছাড়া আর-কোনো সাড়া-শব্দ নেই। নেড ল্যাণ্ড শুধু বললে, 'এবার সব শেষ !'

আচমকা সেলুনের দু-পাশে দুটি আয়তাকার কাচের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল আলো দেখা দিলো। অমনি সিন্ধুতল ঝলমলে হ'য়ে উঠলো, ওই পুরু কাচ ছাড়া আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের আর-কোনো ব্যবধান রইলো না।

banglabooks.in

এই কাচের ওপাশে যে-অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠলো, তা কোনোদিনই ভোলবার নয়। প্রকৃতির হাতে-গড়া এক বিপুল জলাধারে আলো এসে পড়লো, আর উদ্ঘাটিত ক'রে দিলো এক বিস্ময়কর দৃশ্য, যেখানে প্রাণের স্রোত ব'য়ে চলেছে অবিশ্রাম, যেখানে সবুজ শ্যাওলার ফাঁকে ফাঁকে স্বচ্ছন্দ ও স্বাধীন মাছেরা খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে—কত বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন রূপের, বিভিন্ন আকারের মাছ। আলোর রেখা যেন তাদের টান দিয়েছিলো। তাই আকৃষ্ট হ'য়ে ছুটে এসেছিলো অগুন্তি মাছের ঝাঁক। যেন কোনো তৃতীয় নয়ন চোখের সামনে থেকে কোনো-এক বিশ্রী পর্দা তুলে দিয়ে আশ্চর্যকে উন্মোচন ক'রে দিল। আমি যখন মুগ্ধ বিস্ময়ে এই আশ্চর্য দৃশ্যে তন্ময় হ'য়ে আছি, নেড কিন্তু তখন এই মৎস্যকুলের মধ্যে কোনটা সুখাদ্য এবং কোনটা অখাদ্য তা-ই নিয়ে মহা-সমস্যায় পড়েছে।

প্রায় দু-ঘণ্টা ধ'রে এই আশ্চর্য মৎস্যবাহিনীকে দেখে গেলুম আমি। চেনা-অচেনা মাছের বাহিনী 'নটিলাস'-এর আলোর রেখা ধ'রে ছুটে এলো তার পিছন-পিছন : ম্যাকারেল, স্যালাম্যাণ্ডার, সারমুলেট, সিন্ধুসাপ—কত কি। তারপর হঠাৎ সেই পুরু কাঁচের জানলা বন্ধ হ'য়ে গেলো, আর সেলুনের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্ব'লে উঠলো। সে অপরূপ দৃশ্য হারিয়ে গেলো মুহূর্তে। কিন্তু অনেক পরেও আমার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে হানা দিলো সেই সব উজ্জ্বল মসৃণ বিকট-সুন্দর মৎস্য-বাহিনী—সমুদ্রের সেই স্পন্দমান বাসিন্দারা, 'নটিলাস'-এর কাঁচের জানলা দুটি কোনো তৃতীয়-নয়নের মতো হ'য়ে আমার সামনে যাদের চাঞ্চল্য, স্পন্দন ও খেলা উন্মোচিত ক'রে দিয়েছিলো।

সিন্ধুতলের মৃগয়া

পর-পর সাতদিন ক্যাপ্টেন নেমোর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না। একবারও তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লো না আমাদের, কোনো কথা হ'লো না; একা-একা ঘুরে বেড়ালুম তাঁর গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায়; আর 'নটিলাস' ছুটে চললো সেই সিন্ধুতলের চঞ্চল স্রোতের মধ্য দিয়ে তার নির্দিষ্ট পথ ধ'রে।

ক্যাপ্টেন নেমোর কোনো দেখা না-পেয়ে নেড আর কোনসাইল বেশ বিচলিত হ'য়ে পড়লো। তাহ'লে এই আশ্চর্য মানুষটি হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন? না কি

banglabooks.in

আমাদের সম্বন্ধে তাঁর মত আর সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়েছে ? আমার মনে হ'লো হঠাৎ আড়ালে চ'লে যাওয়াটাও বুঝি তাঁর রহস্যময় স্বভাবের একটা বিশেষ দিক —নিজের চারপাশে কোনো দেওয়াল তুলে দিতেই তিনি বুঝি ভালোবাসেন। জানি না কেন এই মানুষটি আমার সমস্ত চেতনাকে যেন নাড়িয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ ষোলোই নভেম্বর আমার কামরায় টেবিলের উপর তাঁর একটি চিরকুট পেলুম। অনেকটা আলেমান হরফের ধরনে লেখা চিঠিটা, গথিকভঙ্গির হস্তলিপি। চিরকুটে লেখা :

'অধ্যাপক আরোনা সমীপেষু, "নটিলাস" জাহাজ।

ক্রেসপো অ্যাইল্যাণ্ডের জঙ্গলে আগামী কাল প্রাতঃকালে ক্যাপ্টেন নেমো শিকারে যাবেন ব'লে স্থির করেছেন। এই মৃগয়ায় তিনি অধ্যাপক আরোনা ও তাঁর সঙ্গীদের সাহচর্য পেলে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করবেন।'

নেড আর কোনসাইল তো এই আমন্ত্রণ পেয়ে উল্লসিত হ'য়ে উঠলো। অনেক-দিন পরে পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাওয়া যাবে—এটা কি কম আনন্দের কথা!

কিন্তু তাদের এই আনন্দ পরের দিনই মিলিয়ে গেলো, যখন পরদিন সকালে ছোটোহাজরির সময় খাবার-টেবিলে ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হ'লো তখন স্পষ্ট ক'রে জানা গেলো, আমরা ক্রেসপো অ্যাইল্যাণ্ডে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তা দ্বীপের উপরে নয়, নিচে জলের তলায়। সিন্ধুতলের সেই সুন্দর বনের অধীশ্বর ক্যাপ্টেন নেমো ; সেখানেই আমরা বন্দুক নিয়ে পায়ে হেঁটে শিকারে বেরোবো।

'জলের তলায় ? পায়ে হেঁটে শিকার ? বন্দুক নিয়ে ?' আমার বিস্ময় অস্ফুট কতগুলি কথায় মুখর হ'য়ে উঠলো।

'প্রফেসর, আপনি ভাবছেন যে লোকটা বুঝি পাগল, তাই না ? তা যদি ভেবে থাকেন তাহ'লে আপনি আমার সম্বন্ধে ভুল ভেবেছেন। আমার মতো আপনিও নিশ্চয়ই জানেন যে জলের তলাতেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে যদি সে নিজের সঙ্গে শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ হাওয়া নিয়ে যেতে পারে। আমাদের সঙ্গে প্রচুর হাওয়া থাকবে—সিলিণ্ডারের মধ্যে সংনমিত বাতাস নিয়ে যাবো আমরা। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই বাতাস তৈরি হবে, একটা বিশেষ ধরনের ছাঁকনি দিয়ে ছেঁকে এই ঘন বাতাসকেই হালকা করা হবে, এবং তাই আপনার নাকে পৌঁছোবে। মাথাটা ঢাকা থাকবে ডুবুরিদের মতো পিতলের বর্তুল শিরস্ত্রাণে। এই বন্দোবস্তে অন্তত ন-দশ ঘণ্টা বাতাস সরবরাহ করা যাবে।'

'কিন্তু জলের তলায় আপনি দেখতে পাবেন কী ক'রে ?'

banglabooks.in

'কেন ? কোমরবন্ধে বৈদ্যুতিক মশাল বাঁধা থাকবে।'

'আর বন্দুক ? জলের তলায় বন্দুক কাজে লাগবে কী ক'রে ?'

'প্রফেসর, এ সাধারণ বন্দুক নয় ! সংনমিত বাতাসের চাপে এর গুলি ছুটে চলে —গুলিগুলো সব বৈদ্যুতিক। শিকারের গায়ে লাগলেই বোমার মতো ফেটে যায়। একেকটা বন্দুকে এরকম দশটা ক'রে গুলি থাকে।'

ছোটোহাজরি শেষ ক'রে আমরা ডুবুরি-পোশাকের ঘরে গেলুম। ঘরটা ইঞ্জিন ঘরের পিছনে। সেখানে দেয়ালে গোটা বারো পোশাক ঝুলছে। এই ডুবুরি-পোশাকের পরিকল্পনা যিনি করেছেন, তাঁর সৃজনী-প্রতিভার তারিফ না-ক'রে পারা যায় না। তামার পাতার উপর খুব পুরু রবারের প্রলেপ লাগানো এই পোশাকের আগাগোড়া কোথাও শেলাই নেই। পা দুটো ক্রমশ সরু হ'য়ে নেমে এসেছে শিশে-দিয়ে-ভারি-করা পুরু দুটো জুতোর মধ্যে ; হাতে দস্তানাও ওইভাবেই পরতে হয়। ক্যাপ্টেন নেমোর অনুচরদের সাহায্যে কোনোরকমে এই মস্ত ভারি পোশাক পরা গেলো। তারপর পিতলের শিরস্ত্রাণ আঁটার পালা : পিতলের কলারের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে ওই ভারি শিরস্ত্রাণ এঁটে দেয়া হ'লো। শিরস্ত্রাণের মধ্যে তিনটে পুরু কাচের জানলা রয়েছে, যাতে আশেপাশে বা সামনে তাকাতে কোনো অসুবিধে না-হয়। নিশ্বেস নিতেও কোনোরকম কষ্ট হ'লো না। তারপরে আমরা এক অদ্ভুত ধরনের বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে জলের তলায় শিকারে বেরোবার জন্য তৈরি হ'য়ে নিলুম।

পোশাকটা এতই ভারি যে নড়াচড়ার কোনো ক্ষমতাই ছিলো না। আমাদের ওরা ঠেলেঠুলে পাশের ছোট্ট কোঠাটায় ঢুকিয়ে দিলে ; ক্যাপ্টেন নেমোও আরেক-জন ডুবুরি-পোশাক পরা অনুচর নিয়ে আমাদের সঙ্গে এলেন। তারপর ঘরটা অন্ধকার হ'য়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে শোঁ-শোঁ ক'রে একটা শব্দ উঠলো অন্ধকারে ; অনুভব করলুম যে পায়ের তলা থেকে একটা ঠাণ্ডা স্রোত উপরে উঠে আসছে। বুঝতে পারলুম, ছোট্ট কোঠাটিতে জল ঢুকছে ; দেখতে-দেখতে ঘরটা জলে ভ'রে গেলো। তারপরেই খুলে গেলো একটা ভারি ঢাকনার মতো দরজা। উজ্জ্বল সবুজ আলো জ্ব'লে উঠলো পাশে। পরক্ষণেই ডুবো-জাহাজের ভিতর থেকে আমরা বেরিয়ে এসে সমুদ্রের তলায় এসে নামলুম।

ক্যাপ্টেন নেমোই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। মাঝখানে রইলুম আমি আর কোনসাইল—সকলের পিছনে রইলো ক্যাপ্টেন নেমোর সেই অনুচর। নীলচে আলোয় একশো ফুট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। তারপরেই নীল কুয়াশায় সব ঢাকা

banglabooks.in

প'ড়ে আছে। এত ভারি পোশাক প'রে জলের নীচে হাঁটতে মোটেই অসুবিধে হচ্ছিলো না, বরং বেশ হালকা লাগছিলো—আর কেমন যেন নতুন-এক মজার অনুভূতি হচ্ছিলো। বেলা তখন দশটা হবে। সূর্যের আলো জলের মধ্যে প্রতি-সরিত হ'য়ে মসৃণ বালির উপর থেকে ঠিকরে পড়ছিলো। তারও কিছুক্ষণ পরে সূর্য-কিরণ টেরচাভাবে জলের মধ্যে প্রবেশ করলো—আর তেফলা কাচের মধ্য থেকে যেমন সাত রঙে ভেঙে আলো বিচ্ছুরিত হয় তেমনিভাবে বর্ণালির মতোই তা সাত রঙে ভেঙে গেলো। এর সেই সাত রঙের স্নিগ্ধ সুষমা সিন্ধুতলের এই আশ্চর্য জগতে যেন কোনো অপূর্ব স্বপ্নলোক সৃষ্টি ক'রে গেলো। কত বিচিত্র উদ্ভিদ, গুল্ম, কঠিন আঁশে ঢাকা প্রাণী—যেন বর্মাবৃত, আর কত অদ্ভুত ধরনের মাছ যে চোখে পড়লো, তার কোনো ইয়ত্তা নেই! সেই নীল আলো-অন্ধকারের মধ্যে, 'নটিলাস'কে ধীরে-ধীরে অনেক পিছনে ফেলে আমরা স্বপ্নের মতো সুন্দর এক অস্পষ্ট দেশে অনেক-বাঁও জলের তলায় এগিয়ে গেলুম, যেখানে শ্যাওলা-শামুক-হাড়ের পাকে-পাকে আশ্চর্য ও ঐশ্বর্যময় সিন্ধু-রূপান্তরে কালক্রমে সমস্ত কিছুই বদলে যায়।

বেলা একটা নাগাদ ক্রেসপো অ্যাইল্যাণ্ডের জঙ্গলে প্রবেশ করা গেলো। সিন্ধুতলের সেই আশ্চর্য অরণ্যের মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে। মস্ত গাছপালার মতো বিরাট-বিরাট উদ্ভিদ সোজা উঠে গেছে উপরে; ছোটখাটো গুল্ম থেকে শুরু ক'রে গাছের ডাল-পালারও এই ঊর্ধ্বমুখ বৃদ্ধি সত্যি লক্ষ্য করার মতো! ডাঙার উপরে জঙ্গলে যেমন কত জানা-অজানা ফুল পাপড়ি ছড়িয়ে দেয় তেমনি ফুটে উঠেছে সামুদ্রিক উদ্ভিদ সী-অ্যানিমোন—পাপড়ির মতো ছড়িয়ে-পড়া ডালপালায় যেমন গুঞ্জন ক'রে খেলা করে পাখিরা, তেমনি সেখানে খেলা করছে নানা রঙের চঞ্চল মাছেরা। ক্যাপ্টেন নেমোর নির্দেশে বিশ্রাম করার জন্য সেখানেই আমরা ব'সে পড়লুম। কখন যে ক্লান্তির মধ্যে তন্দ্রা নেমে এসেছিলো জানি না; ঘুম ভাঙতেই দেখি, আমার সামনেই ক্যাপ্টেন নেমো টান হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আড়মোড়া ভাঙতে গিয়েই চোখে পড়লো প্রথমে। দেখি, এক গজ উঁচু একটি অতিকায় সামুদ্রিক মাকড়শা গনগনে চোখে রাজ্যের ক্রূরতা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওৎ পেতে থাকার ভঙ্গি ডাঙার হিংস্র প্রাণীদের মতোই—এই মূর্তিমান বিভীষিকাটি যে কোনো মুহূর্তে প্রচণ্ড ভাবে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তা বুঝতে আমার মোটেই দেরি হ'লো না—আর তাতেই আমার চটকা ভেঙে গেলো। ধড়মড় ক'রে উঠে দাঁড়ালুম। কোনসাইল আর ক্যাপ্টেন

banglabooks.in

নেমোর অনুচরটিও তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালে। ক্যাপ্টেন নেমোর ইঙ্গিতে তাঁর অনুচরটি তার বন্দুকের কুঁদো দিয়ে এক বিষম আঘাত হানলে এই অষ্টভুজ মাকড়শাটিকে, বাস, পরমুহূর্তেই সেই দানবিক কীটটার আট বাহু কিলবিল ক'রে কুণ্ডলী পাকিয়ে গেলো যন্ত্রণায়—প্রচণ্ডভাবে ছটফট করতে লাগলো সে।

আবার এগিয়ে চললুম আমরা। ক্রমশ ঢালু হ'য়ে নেমে যাচ্ছে সিন্ধুতলের জমি। সেই গাঢ়-নীল কুয়াশাও ক্রমশ সব-কিছু ঢেকে ফেলেছে। এখানে এসেই ক্যাপ্টেন নেমো বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিলেন। বল্লমের মতো আলোর ফলা অন্ধকারকে আক্রমণ ক'রে হঠিয়ে দিলে। তারপরেই সামনে তাকিয়ে দেখি গ্র্যানিট পাথরের খাড়া দেয়াল। বোঝা গেলো, ক্রেসপো অ্যাইল্যাণ্ডের তলায় আসা গেছে।

ক্যাপ্টেন নেমো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এটাই তাঁর রাজ্যের সীমা—তারপরেই প্রবলকঠিন ডাঙা। এবার ফিরে যেতে হয়। ফেরার সময় নেমো আমাদের অন্য পথে নিয়ে এলেন। বেশ খানিকটা চড়াই বেয়ে ওঠবার পর হঠাৎ একটি সামুদ্রিক শ্যাওলার ঝোপ লক্ষ্য ক'রে বন্দুক ছুঁড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো। অমনি ছটফট করতে-করতে একটি সিন্ধু-ভোঁদড় ছিটকে পড়লো। লম্বায় প্রায় পাঁচফুট হবে এই সিন্ধু-ভোঁদড়, রুপোলি আর বাদামী রঙের চামড়াটা নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান হবে—বোধ করি সেই জন্যেই মরা ভোঁদড়টিকে নেমোর অনুচরটি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিলে।

ক্রমে আবার বালির রাজ্যে চ'লে এলুম। জল এখানে এতই কম যে মাঝে-মাঝে আমাদের উল্টো-প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিলো জলের উপরে। দূরে 'নটিলাস'-এর আলো ঝাপশাভাবে দেখা যাচ্ছে। 'নটিলাস'কে দেখে তাড়াতাড়ি এগোতে যাবো, অমনি এক ধাক্কায় নেমো আমাকে গুল্মরাশির উপরে ফেলে দিলেন। তাঁর সঙ্গীটিও কোনসাইলকে তেমনি জোর ক'রে ওই ঝোপের আড়ালে শুইয়ে দিলে। হঠাৎ এই আক্রমণের কারণ কী, তা বোঝবার আগেই দেখি ক্যাপ্টেন নেমোও মাথা নিচু ক'রে আমার পাশে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর সঙ্গীটিও তা-ই করলে।

তারপরেই যা চোখে পড়লো তাতে আমার বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হ'য়ে গেলো। দেখি দুটো প্রকাণ্ড আকৃতির হাঙর মাথার উপর দিয়ে মন্থরভাবে ভেসে যাচ্ছে। জলের এই নেকড়ে দুটির সামনের দিক থেকে ফসফরাসের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো ব'লে চিনতে মোটেই অসুবিধে হয় না। হাঙর! স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো চোখ, বিকট মুখে সারি-সারি প্রবল-ভীষণ দাঁত. আর রুপোর মতো পেট নিচে থেকে স্পষ্ট দেখা

banglabooks.in

গেলো। প্রায় ছুঁয়ে গেলো তারা আমাদের, তবু যে দেখতে পেলো না এটা আমাদেরও পরম সৌভাগ্য। না-হ'লে এই ভীষণ সিন্ধু-নেকড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কী ফলাফল হ'তো কে জানে।

আধ ঘণ্টা পরে 'নটিলাস'-এ পৌঁছোলুম। বাইরের ঢাকনাটা তখনো খোলা; ভিতরে ঢোকার পর ঢাকনাটা বন্ধ ক'রে ক্যাপ্টেন নেমো একটা বোতাম টিপে দিলেন। আস্তে-আস্তে ঘরের জল নেমে গেলো।

ডুবুরি-পোশাক খুলে রেখে যখন নিজের কামরার দিকে এগোচ্ছি, তখন অবসাদে আমার সর্বাঙ্গ ভারি হ'য়ে এসেছে।

১০

সিন্ধুরোল

পরের দিন সকালে জেগে উঠতেই দেখি শরীরটা বেশ হালকা আর ঝরঝরে লাগছে। প্ল্যাটফর্মের উপরে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলুম! স্বচ্ছ সুন্দর আবহাওয়া, দিগন্তে কোনো জাহাজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ফেনিল নীল জলের উপর সূর্যের আলো প'ড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। শান্ত সমুদ্রের মধ্যে কোন অনন্ত ছন্দে ঢেউ উঠছে আর পড়ছে, খানিকক্ষণ পরেই যে-ছন্দ রক্তের মধ্যে নেশা ধরিয়ে দেয়।

সমুদ্রের এই নেশা-ধরানো ছন্দ যেন আমার বুকের মধ্যেই ঢেউ তুলে দিলে। সমুদ্রের এই অনন্ত কলরোল শুনছি কান পেতে, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমো এসে দেখা দিলেন। আমার উপস্থিতি তাঁর চোখেই পড়লো না। সমুদ্র পর্যবেক্ষণ ক'রে কী-এক দুর্বোধ ভাষায় তিনি কতগুলো নির্দেশ দিলেন।

ডেকের চারধারে আগের রাতে জাল পেতে রাখা ছিলো—সকালে তাতে অনেক মাছ ধরা পড়েছে। বিশজন নাবিক উঠে এসে সেগুলি তুলে নিতে লাগলো। এই নাবিকদের মধ্যে পৃথিবীর সব জাতের লোকই বোধ করি আছে। আইরিশ, ফরাশি, স্লাভ, গ্রীক—ইয়োরোপের প্রায় সব দেশের লোকই দেখতে পেলুম আমি। কিন্তু তারা সবাই কথা বলে সেই দুর্বোধ বিদঘুটে ভাষায়, যার একবর্ণও আমি বুঝি না; আর তার ফলে এদের জাতিগত পরিচয়ও বুঝে-ওঠা মুশকিল। নাবিকরা কেউ আমাকে যেন লক্ষই করলে না, সবাই নিজেদের কাজেই ব্যস্ত হ'য়ে রইলো।

banglabooks.in

'নটিলাস' একটানা দক্ষিণ-পুব দিকে ছুটে চলেছে। পয়লা ডিসেম্বর আমরা বিষুবরেখা পেরিয়ে এলুম। মাঝে-মাঝে কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের অরণ্যময় অজ্ঞাত দ্বীপ ছাড়া আর কোনো চেনাঅচেনার ভূখণ্ডই কখনো চোখে পড়ে না। সমুদ্র এখানে চোরা পাহাড়ে বিপজ্জনক। জলের তলায় কত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ যে দেখা গেলো, তার সংখ্যা নেই। কামানে-বন্দুকে শ্যাওলা গজিয়েছে; জাহাজের, কামরায় কাঁকড়ার রাজত্ব, পাটাতনের খোলে হাঙর ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণ সমুদ্রের রক্তলাল প্রবাল দ্বীপ পেরিয়ে আসার সময় দেখতে পেলুম অনেক বছর আগে ডুবে-যাওয়া বহু জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। কাঠের খোল আর পাটাতন প'চে গিয়েছে, জীর্ণ ও নরম হ'য়ে আছে তারা। মাঝে মাঝে ওই সব জাহাজের উদ্দেশ্যে 'নটিলাস'-এর বাহিনী বেরোয়; জীর্ণ জাহাজের মধ্য থেকে যাবতীয় মূল্যবান সম্পত্তি উদ্ধার ক'রে নিয়ে এসে জাহাজে তোলে।

শেষকালে প্রবাল সমুদ্রও পেরিয়ে গেলো 'নটিলাস'। আমার এখন আর ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে বেশি দেখা হয় না। মাঝে-মাঝে আসেন তিনি, অল্পক্ষণ কথাবার্তা হয়, তারপরেই আবার তিনি 'নটিলাস'-এর পরিচালনায় ব্যস্ত হ'য়ে চ'লে যান। একদিন ক্যাপ্টেন নেমোর কাছ থেকে শোনা গেলো, অষ্ট্রেলিয়া আর নিউ-গিনির মধ্যকার টোরেজ প্রণালী দিয়ে আবার আমরা ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়বো। এখানে চোরা পাহাড়ের সংখ্যা এত বেশি যে যে-কোনো মুহূর্তে বিষম-কোনো দুর্ঘটনা ঘ'টে যেতে পারে। নিজের হাতে 'নটিলাস' চালাবার ভার নিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 'নটিলাস' জলের উপর ভেসে উঠলো। যেন তিনি ইন্দ্রজাল জানেন, এমনিভাবে ভোজবাজির মতো চোরা পাহাড়ের বিপদসংকুল রন্ধ্রপথ দিয়ে অত বড়ো ডুবোজাহাজটিকে সন্তর্পণে পার ক'রে নিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। একটা দ্বীপের কাছ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো, আমি ছিটকে প'ড়ে গেলুম ডেকের একপাশে।

আসলে চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছিলো 'নটিলাস'; পাহাড়ের খাঁজে আটকে গিয়েছে ওই ধাক্কায়। এমনিতে কোনো বিপদ হয়নি, তবে পুরো ভরা-জোয়ারের সময় ছাড়া এই খাঁজ থেকে উদ্ধার পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। পাঁচদিন পরে পূর্ণিমা; তখন জোয়ারের জলে 'নটিলাস' ভেসে উঠবে। ততদিন এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই।

ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হ'লে জিগেস করেছিলুম, 'কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে বুঝি?'

banglabooks.in

'না, দুর্ঘটনা নয়, ঘটনা—'

'এমন ঘটনা যে আপনাকে তার ফলে ডাঙায় আশ্রয় নিতে হবে ?'

অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো। তারপর আস্তে বললেন, ' "নটিলাস"কে আপনি এখনো চেনেননি, প্রফেসর।'

তক্ষুনি আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন ক'রে ফেললুম। 'নেড আর কোনসাইলের বড়ো ইচ্ছে এই ক-টা দিন জাহাজে না-থেকে সামনের দ্বীপটায় ঘুরে আসে। কত দিন ডাঙায় পা দেয়নি ওরা। আপনার কোনো আপত্তি আছে কি ?'

আসলে প্রবল আপত্তিরই প্রত্যাশা করছিলুম আমি। কিন্তু আমাকে অবাক ক'রে দিয়ে ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, 'নিশ্চয়ই না। ইচ্ছে করলে আপনিও যেতে পারেন, মঁসিয় আরোনা।'

পরের দিন 'নটিলাস'-এর কুলুঙ্গি থেকে নৌকো নামানো হ'লো। আটটার সময় বন্দুকে-কুড়ুলে সজ্জিত হ'য়ে রওনা হলুম আমরা। নেড হাল ধ'রে বসলো, আমি আর কোনসাইল প্রাণপণে দাঁড় টানলুম। নেড ল্যাণ্ডের ফুর্তির আর শেষ নেই। এতদিনে ওই জেলখানা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে, আর-কোনোদিন সেখানে ফিরে যাবার মতলব তার নেই।

জিলবোয়া দ্বীপের বালিতে 'নটিলাস'-এর নৌকো গিয়ে যখন ঠেকলো, তখন সাড়ে-আটটা বাজে!

১১
জিলবোয়ার জংলিরা

সত্যি বলতে, ডাঙায় পা দেবার সঙ্গে-সঙ্গে কেমন অদ্ভুত একটা মুক্তির আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো আমার মধ্যে। আসলে 'নটিলাস'-এ যে কখনো কষ্টে ছিলুম তা নয়—বরং কোনো রকম অস্বাচ্ছন্দ্যেরই অবকাশ ছিলো না সেখানে। যখনই যা চাই, তৎক্ষণাৎ তা হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। এমনকী ক্যাপ্টেন নেমোর বিরাট গ্রন্থাগারে আমার পড়াশোনার কোনো অসুবিধে হ'তো না। উপরন্তু 'নটিলাস,-এর কাচের জানলা দিয়ে এই আশ্চর্য সিন্ধুতলের অভিজ্ঞতা হয়েছিলো আমার, পৃথিবীর অন্য-কোনো বিজ্ঞান-সাধকের যে-সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু সব সত্ত্বেও শক্ত মাটিতে পা দেয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পারছিলুম আসলে আমরা ডাঙারই

banglabooks.in

জীব—সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিকের ক্রীতদাস। অথচ আমরা মাত্র দু-মাস ধ'রে 'নটিলাস'-এর যাত্রী হিশেবে সিন্ধুতলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমাদের অভিযান তাই আনন্দে ও উৎসাহে ভ'রে গেলো। নেডের ফুর্তি আর উৎসাহের তো আর শেষ নেই। তার নাকি মাছ খেয়ে-খেয়ে অরুচি ধ'রে গেছে; ডাঙার জগতের পশুপক্ষীর মাংস ভক্ষণ না করা অবধি তার মুখে নাকি আর কখনোই রুচি ফিরবে না। তাই টো-টো ক'রে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ালুম আমরা। শিকারের উদ্দেশ্যে। রাত্রে সমুদ্রের তীরে ব'সে মাংস পুড়িয়ে আর চেনা-অচেনা সুস্বাদু ফলে আমাদের নৈশভোজ সাঙ্গ হ'লো। কাছেই আমাদের নৌকো বাঁধা; একটু দূরে 'নটিলাস' কোনো মস্ত পাথরের মতো সমুদ্রের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নেড ল্যাণ্ডের প্রচণ্ড ফুর্তি আমাদের নৈশভোজকে আরো চঞ্চল ও আনন্দময় ক'রে তুললো। তার তৃপ্তি এইখানেই সবচেয়ে বেশি যে ' "নটিলাস"-এর নরাধমেরা' কিছুতেই এই উপাদেয় খাদ্যের আস্বাদ পাচ্ছে না।

দ্বিতীয় দিনও সন্ধ্যার পরে দ্বীপের উপকূলে আমাদের নৈশভোজ সাঙ্গ হ'লো। আর খেতে-খেতে এই প্রথম আমি কোনসাইলের মুখে তার গোপন ইচ্ছার প্রকাশ শুনতে পেলুম, 'আহা! আজ সন্ধ্যায় যদি ওই "নটিলাস-"এ ফিরতে না-হ'তো!'

'যদি কোনোদিনই না-ফিরি', নেড ল্যাণ্ড যোগ ক'রে দিলে। কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই আচম্বিতে আমাদের পায়ের কাছে একটা মস্ত পাথর এসে পড়লো। সচমকে জঙ্গলের দিকে তাকালুম আমরা।

'আকাশ থেকে তো আর পাথর পড়ে না,' কোনসাইল বললে, 'অন্তত উল্কা না-হ'লে।' ব'লে কোনসাইল তার হাতের পায়রার ঠ্যাংটায় কামড় বসাতে যাবে, এমন সময় দ্বিতীয় আরেকটা পাথর এসে পড়লো—পড়লো ঠিক তার হাতেই, এবং পায়রার ঠ্যাংটা তার হাত থেকে খ'শে প'ড়ে গেলো।

তিনজনেই উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুলে ধরলুম; কেউ কোনো আক্রমণ করলে তাকে সমুচিত উত্তর দিতে হবে।

'বাঁদরের কাণ্ড নয় তো?' নেড ল্যাণ্ড জিগেস করলো।

'বনমানুষই বটে,' কোনসাইল বললে, 'তবে তাদের জংলি বলা হয়।'

'নৌকোয়—শিগগির নৌকোয় চলো।' ব'লেই দৌড়োতে লাগলুম আমি। এ-সব দ্বীপে সে চতুষ্পদ শ্বাপদের চেয়ে দ্বিপদ নারখাদকের ভয়ই বেশি, তা আমার জানা ছিলো।

banglabooks.in

তৎক্ষণাৎ গাছপালার আড়াল থেকে তীরধনুক নিয়ে জলাকুড়ি জংলির আবির্ভাব ঘটলো। আমরা যেখানে বসে নৈশভোজ সারছিলুম, নৌকোটা সেখান থেকে প্রায় ষাট ফিট দূরে বাঁধা ছিলো। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলুম আমরা নৌকো লক্ষ্য ক'রে। নেড কিন্তু এই বিষম বিপদের মধ্যেও তার ফলমূল আর মাংসের সংগ্রহ আনতে ভুললো না। আরো কয়েকটা ঢিল এসে পড়লো আশেপাশে। ঝপাঝপ ক'রে দাঁড় টেনে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা 'নটিলাস'-এ পৌঁছে গেলুম।

'নটিলাস'-এ পৌঁছেই আমি সেলুনের দিকে ছুটলুম। কারণ অর্গ্যানের প্রবল-গম্ভীর সুর থেকে বোঝা যাচ্ছিলো যে ক্যাপ্টেন নেমো সেলুনে ব'সে অর্গ্যান বাজাচ্ছেন।

'ক্যাপ্টেন,' উত্তেজিতভাবে ডাক দিলুম আমি।

সুরের মধ্যে ডুবে আছেন যেন তিনি, আমার কথা তাঁর কানেই পৌঁছালো না। তাঁর হাত ধ'রে আবারও আমি বললুম, 'ক্যাপ্টেন নেমো!'

যেন ছন্দ কেটে গেলো, কেঁপে উঠে ফিরে তাকালেন নেমো। 'ও আপনি! তা শিকার কেমন লাগলো? উদ্ভিদবিদ্যার কোনো নতুন তথ্য যোগাড় হ'লো?'

'হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা একদল দ্বিপদকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, বংশপরম্পরায় যাদের বেশ বিপজ্জনক ব'লে খ্যাতি আছে।'

'তা সেই দ্বিপদগুলো কী?'

'জংলি!'

'জংলি?' ক্যাপ্টেন নেমোর কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গে ভ'রে গেলো, 'পৃথিবীর এক জায়গায় পা দিয়ে বর্বর জংলি দেখে আপনি অবাক হচ্ছেন, প্রফেসর? একটা জায়গার নাম করুন তো যেখানে বর্বরদের বাস নেই? আর তাছাড়া আপনি যাদের বর্বর জংলি বলেন তারা কি অন্য কারো চেয়ে কোনো অংশে নিকৃষ্ট?'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন—'

'জংলিরা কোথায় নেই, প্রফেসর? আমার কথা যদি ধরেন, মঁসিয়, তো জানাই : আমি এই বর্বরদের পৃথিবীর সর্বত্র দেখেছি।'

'তা আপনি যদি "নটিলাস"-এর মধ্যে তাদের না-দেখতে চান তো আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।'

'সে-সম্বন্ধে আপনাকে ভাবতে হবে না, প্রফেসর। এতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।'

'কিন্তু ওরা যে সংখ্যায় অগুন্তি।'

banglabooks.in

'কতজনকে দেখেছেন আপনি ?'

'অন্তত একশো তো হবেই।'

'ম'সিয় আরোনা,' ক্যাপ্টেন নেমো আবার অর্গ্যানের চাবিতে হাত দিলেন, যদি পাপুয়ার সমস্ত বর্বর এসে চড়াও হয় তবু "নটিলাস"-এর গায়ে একটা আঁচড় কাটার ক্ষমতা কারো নেই,' ব'লেই আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আবার তিনি অর্গ্যানের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

পরের দিন কাতারে-কাতারে পাপুয়ার জংলিরা চারপাশ থেকে 'নটিলাস'কে ঘিরে ধরলে, কিন্তু জাহাজের উপরে উঠতে বা জাহাজের খুব কাছে আসতে তাদের কারো সাহসে কুলোলো না। সারাদিন তারা তীরে ভিড় ক'রে রইলো; রাতে তীরে-জ্ব'লে-ওঠা অজস্র অগ্নিকুণ্ড দেখেও বোঝা গেলো অচিরে 'নটিলাস'-এর সঙ্গ ত্যাগ করার মতলব তাদের নেই।

তার পরের দিন ডেকের উপর উঠতেই দেখা গেলো গোটাকুড়ি ফাঁপা গাছের ক্যানো জলে ভাসিয়ে বিস্তর পাপুয়া যোদ্ধা 'নটিলাস' লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে আসছে। আমাকে আর কোনসাইলকে দেখেই তারা চ্যাঁচামেচি ক'রে উঠলো। তার পরেই আমাদের আশপাশে এক ঝাঁক তীর এসে পড়লো।

এবারে তাহ'লে সত্যি তারা আক্রমণ করার জন্য উৎসুক। অথচ জোয়ার না-এলে একচুলও নড়ানো যাবে না 'নটিলাস'কে। তাহ'লে আর রক্ষে নেই। হন্তদন্ত হ'য়ে নিচে গিয়ে ক্যাপ্টেন নেমোকে খবর দিলুম। নেমো কিন্তু আদৌ কিছুমাত্র বিচলিত না-হ'য়ে 'নটিলাস'-এর বহির্দ্বার বন্ধ ক'রে দেবার আদেশ দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, 'মিথ্যেই আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন, প্রফেসর। আপনাদের যুদ্ধ জাহাজের কামানের গোলাই যদি "নটিলাস"-এর গায়ে আঁচড়টি কাটতে না-পারে, তাহ'লে কয়েকশো পাপুয়াই বা তীর-ধনুক নিয়ে কী করবে, বলুন ?'

'কিন্তু ক্যাপ্টেন, কাল বাতাস নেবার জন্য আপনাকে তো "নটিলাস"-এর ঢাকনি বা বহির্দ্বার খুলতেই হবে—তখন যে জংলিরা ভিতরে ঢুকে পড়বে।'

'ম'সিয় আরোনা,' ঠাণ্ডা গলায় বললেন ক্যাপ্টেন নেমো, 'বহির্দ্বার খোলা থাকলেও কি "নটিলাস"-এর ভিতরে ঢোকা এতই সহজ ? আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না।···হ্যাঁ, ভালো কথা। "নটিলাস" কিন্তু কাল দুটো চল্লিশের সময় জোয়ারের জলে ভেসে উঠবে।' জংলিদের প্রসঙ্গে আর কোনো কথাই বললেন না ক্যাপ্টেন নেমো। এই ক-দিন এই অদ্ভুত মানুষটিকে যতটুকু

banglabooks.in

চিনেছিলুম, তাতে আমিও আর কোনো উচ্চবাচ্য না ক'রে নিজের ঘরে ফিরে এলুম।

ফিরে এলুম বটে, কিন্তু সে রাতে জংলিদের উৎপাতে ভালো ক'রে ঘুমোনো গেলো না। সারা রাত তারা 'নটিলাস'-এর উপর উন্মাদের মতো দাপাদাপি করলে, আর থেকে-থেকে রক্ত-জল-করা রণহুংকার দিলে।

পরের দিন বেলা যখন দুটো পঁয়ত্রিশ, ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে ডেকে ওঠার সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি নেড আর কোনসাইলও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেন নেমোর নির্দেশ মতো একটি নাবিক বহির্দ্বারটি খুলে দিলে।

তৎক্ষণাৎ বিকট উল্কি-কাটা একটি বিশ্রী মুখ দেখা গেলো ফোকর দিয়ে; পর মুহূর্তে সে সিঁড়ির রেলিঙে হাত রাখলে নিচে নামবে ব'লে, আর পরক্ষণেই কান-ফাটা আর্ত চীৎকারে জংলিটা লাফিয়ে উঠলো। আরো কয়েকটি জংলি কৌতূহল-ভরে রেলিঙে হাত দিতেই তাদেরও ওই একই ভাবে চীৎকার ক'রে লাফিয়ে উঠতে হ'লো। তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে ওরা গিয়ে নামতে থাকলো ক্যানোয়। ডেকের উপর একটা দারুণ হট্টগোল শুরু হ'য়ে গেলো। ব্যাপার দেখে কোনসাইল তো হেসেই লুটোপুটি।

কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে আমি হতভম্ব হ'য়ে তাকিয়ে রইলুম। নেডের আবার কৌতূহল আর বুকের পাটা দুটোই কিঞ্চিৎ বেশি, তাই সেও সিঁড়ির রেলিঙে হাত রেখে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলো। সঙ্গে-সঙ্গে সেও বিকট চীৎকার ক'রে আমাদের দিকে ছিটকে এলো।

'বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! বাজ পড়েছে আমার উপর!'

নেডের চ্যাঁচানি শুনেই সমস্ত রহস্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। ক্যাপ্টেন নেমো রেলিঙের মধ্যে বিদ্যুৎ চার্জ ক'রে দিয়েছেন—এমন মাত্রায় দিয়েছেন যে প্রবল ধাক্কা লাগবে কেবল, তাছাড়া আর কোনো ক্ষতিই হবে না; কিন্তু তাতেই মন্ত্রের মতো কাজ হ'লো। সমস্ত ব্যাপারটা ভৌতিক বা অপার্থিব ভেবে উন্মাদের মতো পাপুয়ারা পালাতে লাগলো, দেখতে-দেখতে তাদের চীৎকার দূরে মিলিয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে জোয়ারের জলে 'নটিলাস' ভেসে উঠেছিলো। ঠিক দুটো চল্লিশের সময় ইঞ্জিন জেগে উঠলো সশব্দে; শুরু হ'লো চাকার আন্দোলন; ধীরে-ধীরে সেই ভয়ানক টোরেজ প্রণালীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলো 'নটিলাস'।

banglabooks.in

১২

ভয়ংকরের গান

পরের দিন সকাল বেলা 'নটিলাস'-এর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি ফার্স্ট অফিসার সমুদ্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ক'রে যথোচিত নির্দেশ দিচ্ছেন। 'নটিলাস' তখন ১০৫° দ্রাঘিমা আর ১৫° দক্ষিণ অক্ষরেখায় প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে—সম্ভবত এই ক-দিন টোরেজ প্রণালীতে আটকে থাকতে হয়েছে ব'লেই এত জোরে সে যাচ্ছে।

আমি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াবার পরক্ষণেই ক্যাপ্টেন নেমোও সেখানে এসে দাঁড়ালেন, তারপর দুরবিন দিয়ে কিছুক্ষণ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পাথরের মূর্তির মতো কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো, তারপর দুরবিন নামিয়ে কী এক দুর্বোধ ভাষায় ফার্স্ট অফিসারকে কয়েকটি কথা বললেন তিনি ; ফার্স্ট অফিসারকে অত্যন্ত অস্থির ও উত্তেজিত দেখালো, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর শান্ত সংযত মূর্তি দেখে কোনো কিছুই বোঝবার জো ছিলো না। আমার দিকে দৃকপাত পর্যন্ত না ক'রে কিছুক্ষণ ইতস্তত পায়চারি করলেন ক্যাপ্টেন, মাঝে-মাঝে কেবল একটু থেকে-থেকে দিগন্তের সেই বিশেষ দিকটাতে তাকাতে লাগলেন। ফার্স্ট অফিসারও তাঁর দুরবিন দিয়ে বারে বারে সেই দিকে তাকাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি সেদিকে তাকিয়ে কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। সূর্য আর সমুদ্রের মিলনমন্দিরে কিছুই দেখা গেলো না। এই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কী দেখতে পেয়েছেন তাঁরা? হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো ফার্স্ট অফিসারকে কী একটা নির্দেশ দিতেই 'নটিলাস'-এর গতি আরো বেড়ে উঠলো।

আমার আর এই রহস্য ভালো লাগলো না। অধীরভাবে সেলুনে ফিরে গিয়ে একটা দুরবিন নিয়ে চোখে দিলুম। কিন্তু কিছু নিরীক্ষণ করার আগেই এক হ্যাঁচকা টানে তা হাত থেকে খ'সে পড়লো।

পিছন ফিরে তাকিয়ে যাঁকে দেখলুম তিনি ক্যাপ্টেন নেমো হ'লেও তাঁকে আমি চিনি না। সম্পূর্ণ বদলে গেছেন তিনি। কোঁচকানো ভুরুর তলায় চোখের তারা দপদপ ক'রে জ্বলছে ; দৃঢ় বিন্যস্ত ঠোঁটের ভিতর দাঁতে দাঁত চেপে আছেন তিনি ; কেমন যেন শক্ত হ'য়ে গেছে তাঁর শরীর ; কঠিন হ'য়ে উঠেছে মুখচ্ছবি, আর তাঁর আস্ত প্রতিচ্ছবি থেকে কী-এক প্রচণ্ড ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে।

banglabooks.in

তাহ'লে কি না-জেনে এমন-কোনো অপরাধ করেছি যাতে রোষে তাঁর সমগ্র মূর্তি এমন বদলে গেছে ? কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম তাঁর রোষ ও ঘৃণার উৎস আমি নই, কারণ কঠিনভাবে তখনও তিনি দিগন্তের সেই বিশেষ কোণটিরই দিকে তাকিয়ে আছেন। ফার্স্ট অফিসারকে কোনো বিদেশি ভাষায় অল্প কয়েকটি কথায় নির্দেশ দিতে দিতে নিজেকে তিনি সামলে নিলেন।

'ম'সিয় আরোনা, "নটিলাস"-এ আশ্রয় দেবার সময় আপনাদের যে-শর্ত দিয়ে-ছিলুম, তা মান্য করার সময় এসেছে এখন।'

'কী বলতে চাচ্ছেন, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।'

'আপনাদের তিনজনকেই একটি ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হবে। পরে অবিশ্যি আবার যথাসময়ে চলাফেরার স্বাধীনতা ফিরে পাবেন।'

'আপনি "নটিলাস"-এর সর্বময় কর্তা, কাজেই আপনি যা বলবেন তা-ই হবে। কিন্তু একটা কথা আমি জিগেস করবো ?'

'না, ম'সিয়, একটাও না।'

এ-কথার পর তাঁর নির্দেশ মান্য করা ছাড়া আর-কিছুই করার রইলো না। নিচে আসতেই চারজন নাবিক আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেলো সেই ঘরটিতে, যেখানে সর্বপ্রথম আমাদের বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিল। টেবিলের উপর ছোটোহাজরি সাজানো হয়েছিলো। নেড গোড়ায় খুব খানিকটা চোটপাট ক'রে তাই খেতে শুরু ক'রে দিলে। যদিও আমি সাত-পাঁচ নানা কথা ভাবছিলুম, তবু আমিও দেরি না-ক'রে হাত লাগালুম। কোনসাইলও কোনো বাক্য ব্যয় না-ক'রে দক্ষিণ হস্তের ব্যবহারে তন্ময় হ'য়ে পড়লো। খাওয়া শেষ হবার পরেই নেড আর কোনসাইল দিব্যি শুয়ে প'ড়ে ঘুম লাগালো। হঠাৎ এমন অসময়ে ওদের ঘুমিয়ে পড়ার কোনো কারণ বুঝলুম না। আমারও বেজায় ঘুম পাচ্ছিলো। চোখের পাতায় কে যেন আঠা মাখিয়ে দিয়েছে, কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারছি না। সেই আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে চকিতে একটা কথা মাথার মধ্যে খেলে গেলো। বুঝতে পারলুম যে ক্যাপ্টেন খাবারের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছেন। 'নটিলাস' তখন আর দুলছিলো না, সম্ভবত জলের তলায় ডুব দিয়েছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

পরের দিন ঘুম ভাঙলে কিন্তু আশ্চর্য ঝরঝরে লাগলো নিজেকে। তাড়াতাড়ি উঠে ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো। তাহ'লে এখন আমি স্বাধীন। তাহ'লে আমার চলাফেরার এখন আর কোনো বাধা-নিষেধ নেই।

করিডরে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে যাবার দরজা খোলা দেখে সোজা সেখানে গিয়ে

banglabooks.in

হাজির হলুম। নেড আর কোনসাইলও সেখানে ছিলো তখন। সমুদ্র তেমনি শান্ত-নীল, আকাশ ফেটে শাদা রোদ চুঁইয়ে পড়ছে, কোনো উপদ্রব বা কিছুরই কোনো চিহ্ন নেই। আর এই শান্ত সমুদ্রের মধ্যেই 'নটিলাস' ভেসে যাচ্ছে তার সমস্ত গোপন রহস্য সমেত। নিচে নেমে এলুম। 'নটিলাস'ও জলের তলায় ডুব দিলে। খানিক পরেই আবার ভেসে উঠলো। কয়েকবার এমনি ওঠা-নামা করলো ডুবো-জাহাজ—যেন কোনো কারণে বড্ড অশান্ত, বড্ড অস্থির হ'য়ে পড়েছে সে।

বেলা তখন দুটো হবে, আমি সেলুনে ব'সে আমার দিনলিপি লিখছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমো এসে ঢুকলেন। আমার শুভেচ্ছার উত্তরে সামান্য মাথা নুইয়ে চুপ ক'রে অভিবাদন জানালেন, কোনো কথাই বললেন না। তাঁর সমস্ত শরীরে ক্লান্তির ছাপ, চোখ দুটি রক্তবর্ণ—সারা রাতে বোধ হয় এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি। অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন তিনি ঘরের মধ্যে। দু-চারটে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে, যন্ত্রপাতির দিকে মোটেই তাঁর মন নেই। যেন কি একটা বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করছেন, কিন্তু কিছুতেই আর মনস্থির করতে পারছেন না। শেষকালে হঠাৎ আমার সামনে এসে সোজাসুজি জিগেস করলেন, 'মঁসিয় আরোনা, আপনি কি কখনো ডাক্তারি করেছেন?'

প্রশ্নটা এমনি আকস্মিক যে প্রথমটায় আমি অবাক হ'য়ে ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলুম।

ক্যাপ্টেন নেমো আবার জিগেস করলেন, 'আপনি কি ডাক্তারি জানেন? আমি এটা জানি যে আপনার কয়েকজন সহকর্মী চিকিৎসা বিদ্যালয় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন—কিন্তু আপনি?'

'আমিও আসলে ডাক্তার ছিলুম। পারী বিচিত্রাভবনে যোগ দেবার আগে আমি ডাক্তারি করতুম।'

'তাহ'লে আমার একজন লোককে আপনি একটু পরীক্ষা ক'রে দেখবেন কি?'

'কেন দেখবো না? তার কি খুব অসুখ করেছে হঠাৎ?'

কোনো কথা না-ব'লে ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে সঙ্গে ক'রে একটা ছোটো কামরায় নিয়ে গেলেন। লোকটি যে মুমূর্ষু, তা বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হ'লো না। কী একটা ভোঁতা হাতিয়ারের মারাত্মক আঘাতে তার মাথার খুলি চৌচির হ'য়ে মগজটা বেরিয়ে এসেছে। রক্তমাখা পট্টিটা খোলার সময় টু-শব্দটি পর্যন্ত করলে না সে, শুধু ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। মুখ দেখে মনে হ'লো

banglabooks.in

লোকটা বোধ হয় আসলে ইংরেজ।

দেখার কিছুই ছিলো না বস্তুত। এর মধ্যেই মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিলো তার সর্বাঙ্গে—হাত-পা ঠাণ্ডা হ'তে শুরু করছিলো।

'এমন মারাত্মক চোট ও পেল কোত্থেকে?' ক্যাপ্টেন নেমোকে আমি জিগেস করলুম।

'তা শুনে আপনার কি হবে? হঠাৎ একটা দারুণ ঝাঁকুনিতে ইঞ্জিনের একটা কীলক ভেঙে যায়—লাফিয়ে গিয়ে চোটটা সম্পূর্ণ নিজের মাথায় নিয়ে ও ওর সঙ্গীকে বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু অবস্থা কী-রকম দেখলেন, বলুন? আপনি নিঃসংকোচে বলতে পারেন—কারণ ও ফরাশি জানে না।'

'বলার কিছুই নেই। বেশি হ'লে বোধকরি আর মাত্র ঘণ্টা-দুই ওর পরমায়ু।'

'কিছুতেই কি ওকে আর বাঁচানো যায় না?'

'না, কিছুতেই না।'

ক্যাপ্টেন নেমোর হাত দুটি হঠাৎ কী একটা প্রচণ্ড আবেগে মুঠি হ'য়ে গেলো। তারপরেই তাঁর চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো জলের ধারা।

কী ক'রে মানুষের দেহে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ নিভে আসে, আরো কিছুক্ষণ তা-ই দেখে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

সে-রাত্রে আমার আর ভালো ঘুম হ'লো না। সারা রাত ধ'রে ক্যাপ্টেন নেমোর চঞ্চল ও স্পর্শাতুর আঙুলের তলায় গম্ভীর অর্গ্যান কেঁদে উঠলো। মানুষের কোনো আবেগ যেখানে পায়ে হেঁটে যেতে পারে না, সেখানে এই বিষণ্ণ, মর্মন্তুদ, চাপা কান্নার মতো সংগীত যেন কোনো একা পাখির মতো বারে-বারে পাখা ঝাপটে পৌঁছোতে চাচ্ছে।

পরের দিন সকালবেলায় সমুদ্রের অনেক নিচে নিঃশব্দ এক শোকযাত্রা বেরোলো একটি কফিন কাঁধে। প্রবালস্তূপে অন্ত্যেষ্টি হ'লো লোকটির, আর লাল ফুলের মতো প্রবাল ছড়িয়ে রইলো তার কবরের উপর। সেই স্তব্ধ শোকাতুর শেষ যাত্রার সঙ্গী ছিলুম আমিও। ফিরে আসার পর ক্যাপ্টেন নেমোকে বলেছিলুম, 'সত্যি হাঙরের খপ্পর থেকে অনেক দূরে আপনাদের এই কবরখানা—।'

'হ্যাঁ তাই,' গম্ভীরভাবে বললেন ক্যাপ্টেন নেমো, 'শুধু হাঙর নয়, মানুষেরও কাছ থেকে অনেক দূরে।'

banglabooks.in

১৩

সিন্ধুতলে মুক্তো কুড়ুনো

এই রহস্যময় মানুষটির কথা যত ভাবি, তত মনে হয়, এঁকে ছুঁতে পারি এমন সাধ্য আমার নেই। কে ইনি ? কোন দেশের মানুষ ? কোন গভীর ক্ষত তিনি লুকিয়ে রেখেছেন বুকের ভিতর ? কেন সমস্ত মনুষ্য-সমাজের প্রতি তাঁর বিরাগ আর বিতৃষ্ণা এমন প্রবল ?* অথচ তাঁর বুকের মধ্যে যে ভালোবাসার এক অফুরন্ত প্রস্রবণ আছে তা তো কাল সারা রাত অর্গ্যানের অফুরন্ত কান্নায় উপচে উঠছিলো ! কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, বিদ্রোহী, যোদ্ধা—কোমলে ও কঠোরে তুলনাহীন এই মানুষটিকে কোনোদিনই আমি বুঝতে পারবো ব'লে মনে হয় না। আর তাই আমাদের মাপ-কাঠিতে তাঁকে বিচার করবার কথাও আমি ভাবতে পারি না।

পরের দিন ভোরবেলায় একটি পরিচারক এসে আমাকে ক্যাপ্টেন নেমোর কাছে ডেকে নিয়ে গেলো। সমুদ্রের নিচে মুক্তোর খেত দেখতে যেতে ইচ্ছুক কি না, তিনি জিগেস করলেন। দেখে কে বলবে এই মানুষটিই কাল অমন আর্ত ও ব্যথিত হ'য়ে উঠেছিলেন।

নেড আর কোনসাইল তো এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনেই আনন্দে নৃত্য ক'রে উঠলো। সেই ডুবুরি-পোশাক প'রে ছুরি সম্বল ক'রে শুরু হ'লো আমাদের অভিযান। নেড কিন্তু কিছুতেই হারপুন না-নিয়ে যেতে রাজী হ'লো না। হারপুন ছাড়া জলের প্রাণীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে সে নাকি কিছুতেই রাজী নয়।

ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে এমন অনেক সামুদ্রিক জীব দেখা গেলো, যাদের কোনো দিন এভাবে দেখতে পাবো ব'লেও কল্পনা করিনি। তার মধ্যে মস্ত ও ভীষণ একটি কাঁকড়াকে দেখে যে-ভয় পেয়েছিলুম, তাও কোনো দিন ভুলবো না।

সমুদ্রতলের মতো রোমাঞ্চকর জায়গা আর নেই। পাহাড় গম্ভীর, বিস্ময়কর, অচঞ্চল—কিন্তু সমুদ্র যেন পৃথিবীর অশান্ত হৃৎপিণ্ড—কোন-এক অধীর আবেগে প্রতি মুহূর্তেই চঞ্চল হ'য়ে আছে। কোন-এক রহস্যময় ভাষায় সে যেন সবসময়েই কী বলতে চাচ্ছে অসীমকে।

---

* এ-সব প্রশ্নের উত্তর জুল ভের্ন-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'মিষ্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড'-এ দেওয়া হয়েছে, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুবাদে বাংলায় এই সুবৃহৎ উপন্যাসটি সহজলভ্য।

banglabooks.in

অনেকক্ষণ হাঁটার পর মুক্তো খেতে গিয়ে পৌঁছোলুম। খেতই বটে। যেখানে-সেখানে ঝিনুক প'ড়ে আছে; বাদামি তন্তুর বাঁধনে বন্দী তারা—বন্দী, মৃত, ব্যাধিগ্রস্ত। কোন-এক অদ্ভুত রোগে যখন তাদের দেহ থেকে ক্ষরণ হ'তে থাকে অবিরাম, তখন তা-ই জ'মে জ'মে ক্রমে এই অমূল্য সিন্ধু-রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়; শুক্তির মধ্যে কোনো অধীর অশ্রুর মতো ঝকমক ক'রে ওঠে মুক্তোর দানা। কত যে ঝিনুক প'ড়ে আছে তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। নেড তো দু-হাতে লুঠ করতে লাগলো—দেখতে দেখতে তার থলি বোঝাই হ'য়ে গেলো।

ক্যাপ্টেন নেমো তারপরে আমাদের পথ দেখিয়ে মস্ত একটা গুহায় নিয়ে গেলেন। সিন্ধুতলের এই গুহার খোঁজ যে তিনি ছাড়া আর-কেউ রাখে না তা স্পষ্ট বোঝা গেলো। বড়ো-বড়ো থামের উপর গুহার ছাদটা দাঁড়িয়ে আছে, আর আশপাশে সমুদ্রের জীবরা যেন অনধিকার প্রবেশে ক্ষুব্ধ হ'য়ে অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য ক'রে যাচ্ছে আমাদের। এক জায়গায় এসে ক্যাপ্টেন নেমো থেমে প'ড়ে আঙুল বাড়িয়ে যা দেখালেন তাতে দস্তুরমতো তাজ্জব হ'য়ে গেলুম।

গুহাটা সেখানে কুয়োর মতো গভীর হ'য়ে গেছে, আর তারই একেবারে তলায় শুয়ে আছে বিশাল একটি শুক্তি। এত বড়ো ঝিনুক আমি এমনকি 'নটিলাস'-এর সংগ্রহশালাতেও দেখিনি। স্থির শান্ত জলে কত বছর ধ'রে যে এই ঝিনুকটি বেড়ে উঠেছে তা কে জানে—ক্যাপ্টেন নেমো যে এই বিশেষ ঝিনুকটির কথা আগে থেকেই জানতেন, তা তক্ষুনি বোঝা গেলো। ঝিনুকের বিশাল ডালা দুটি বন্ধ হ'য়ে আসছিলো কিন্তু চকিতে ক্যাপ্টেন নেমো তাঁর ছোরাটা তার ফাঁকে রাখতেই ডালা দুটি আর পুরোপুরি বন্ধ হ'তে পারলো না। আর সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে ভিতরের জিনিশটি দেখেই আমি হতবাক হ'য়ে গেলুম।

মুক্তো যে কোনো নারকোলের মতো এত বড় হ'তে পারে, তা আমি নিজের চোখে না-দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না! 'নটিলাস'-এর সিন্দুকেও এত বড়ো মুক্তো আমি দেখিনি। আমি হাত বাড়াতে যেতেই নেমো বাধা দিয়ে ছোরাটা টেনে নিলেন, অমনি ঝিনুকের ডালা দুটি বন্ধ হ'য়ে গেলো। বছরের পর বছর ধ'রে এই গোপন গুহায় এইভাবেই বড়ো হ'য়ে চলবে মুক্তোটা, তারপর এক-দিন ক্যাপ্টেন নেমো তা সংগ্রহ ক'রে এনে তাঁর বিচিত্রাভবনে সাজিয়ে রাখবেন।

সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এসে অনির্দিষ্টভাবে এদিক ওদিক ঘুরছি, হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে টান দিয়ে একটা পাহাড়ের আড়ালে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

banglabooks.in

একটু দূরেই জলের মধ্যে চলমান একটি ছায়ামূর্তি দেখে তার কারণ বোঝা গেলো। হাঙর ; না ওই জাতীয় কোনো হিংস্র সিন্ধু-প্রাণী ? না, কিছুই নয়। আসলে সে সিংহলের একটি মুক্তো-ডুবুরি, জলের উপরে তার ছোট্ট ডিঙি নৌকো ভাসছে। লোকটা একেকবার নিচে নেমে দ্রুত হাতে ঝুলিভর্তি ক'রে মুক্তো তুলছে, তারপর চট ক'রে উপরে উঠে যাচ্ছে ; পরক্ষণেই আবার নতুন ঝুলি নিয়ে আসছে।

হঠাৎ লোকটা যেন কোনো দারুণ ভয়ে আঁৎকে উঠলো। পরক্ষণেই তার মাথার উপরে ভেসে এলো মস্ত একটা রুপোলি ছায়া—হাঙরের পেট। হাঙরের উন্মুক্ত দাঁতের সারি আর ক্রূর নিষ্ঠুর চোখ দেখেই সে বুঝতে পারলে কেন তাকে সিন্ধুনেকড়ে বলে। প্রথম আক্রমণটা লোকটা কৌশলে এড়িয়ে গেলো বটে, কিন্তু পরের বারেই হাঙরটির ল্যাজের ঝাপটে সে উল্টে প'ড়ে গেলো নিচে। অমনি হাঙরটা তীব্রবেগে ঘুরে নিচে নেমে এলো—এই বুঝি তার ওই চোখা লোভী নিষ্ঠুর দাঁতের ফাঁকে লোকটা টুকরো টুকরো হ'য়ে যায় !

এক লাফে সামনে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন নেমো। হঠাৎ নতুন শত্রু দেখে তাঁর দিকে তেড়ে এলো হাঙরটা। উদ্যত ছোরা হাতে তিনি তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। যেই রাক্ষুসে মাছটা কাছে এগিয়ে এলো, অমনি চট ক'রে এক পাশে স'রে গিয়ে ছোরাটা তিনি আমূল তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

কে যেন লাল রঙ ছিটিয়ে দিলে জলে। হাঙরটার একটা পাখনা আঁকড়ে তখনো বারে-বারে ছোরা চালাচ্ছেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁকেও এক ঝাপটায় ছিটকে পড়তে হ'লো—হাঙরটা হাঁ ক'রে তাঁর দিকে নেমে গেলো তৎক্ষণাৎ।

এই বুঝি সব শেষ হ'য়ে গেলো।

কিন্তু হঠাৎ কোথেকে একটা হারপুন এসে বিঁধলো সেই সিন্ধুনেকড়ের হৃৎপিণ্ডে—ক্যাপ্টেন চট ক'রে একপাশে স'রে গেলেন।

নেড—নেড ল্যাণ্ডই তার হারপুন ছুঁড়ে ক্যাপ্টেন নেমোকে বাঁচিয়ে দিলে।

তৎক্ষণাৎ ক্যাপ্টেন নেমো সেই সিংহলী ডুবুরিকে নিয়ে জলের উপর ভেসে উঠলেন। ডিঙির উপরে উঠে অল্প চেষ্টাতেই তার জ্ঞান ফিরে এলো। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে এতগুলো অদ্ভুত পোশাকপরা লোককে তার উপরে ঝুঁকে থাকতে দেখে লোকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। ক্যাপ্টেন নেমো তাকে একখানি মুক্তো উপহার দিলেন।

banglabooks.in

'নটিলাস'-এ ফিরে এসে নাবিকদের সাহায্যে এই বিষম পোশাক খুলে ফেলে ক্যাপ্টেন নেমো প্রথম কথাটিই বললেন নেড-এর উদ্দেশে : 'ধন্যবাদ, নেড ল্যাণ্ড। তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।'

'শোধবোধ হ'লো, ক্যাপ্টেন,' নেড ল্যাণ্ড বললে, 'প্রথম ধন্যবাদটা আমারই জানানো উচিত ছিলো।'

ক্যাপ্টেনের মুখে সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা খেলে গেলো।

পৃথিবী থেকে, মানবজাতির কাছ থেকে, নিজেকে যিনি অমনভাবে বিচ্ছিন্ন ক'রে এনেছেন, নিজের জীবন বিপন্ন ক'রেও তারই একজন প্রতিনিধিকে তিনি যে কেন বাঁচাতে গেলেন, তার কোনো উত্তর পাওয়া সত্যি কঠিন। ক্যাপ্টেন নেমো যা-ই বলুন না কেন, তিনি নিজের হৃদয়কে এখনো সম্পূর্ণ হত্যা করতে পারেননি। বাইরে থেকে তাঁকে পাষাণ মনে হ'তে পারে, কিন্তু আসলে তিনি ঠিক তার উল্টো, এই কথাটি তাঁকে বলতেই ঈষৎ আবেগভরে তিনি বললেন, 'প্রফেসর, ওই ভারতীয়টি অতি শোষিত ও অত্যাচারিত দেশের অধিবাসী। আর আমিও, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত, তা-ই থাকবো।'

এ-কথার অর্থ কি এই যে তিনি একটি পরাধীন জাতির প্রতিনিধি? আর সেই জন্যেই ওই সিংহলীটির প্রতি তাঁর এত দরদ? না কি আক্ষরিকভাবেই তিনি ভারত নামক উপমহাদেশের অধিবাসী? রহস্যটা মোটেই পরিষ্কার হ'লো না বটে, কিন্তু এটা বোঝা গেলো এই বিদ্রোহী মানুষটি যে-কোনো পরাধীন জাতির জন্য আত্ম-বিসর্জন করতে পারে।

নীল সাগর ভূমধ্য

ফ্রেব্রুআরি মাসের নয় তারিখে 'নটিলাস'-এর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন নেমোর দেয়া চুরুট টানছি, আর দেখছি লোহিত সাগরের উপর দিয়ে 'নটিলাস' কেমন ক'রে আস্তে ভূমধ্য সাগরের দিকে ভেসে যাচ্ছে, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমো আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

'মঁসিয় আরোনা,' হঠাৎ হাসিমুখে তিনি জিগেস করলেন, 'জানেন পরশু দিন আমরা ভূমধ্য সাগরে পৌঁছবো?'

banglabooks.in

'তাহ'লে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসার জন্য "নটিলাস"কে বাতাসের চেয়েও দ্রুত ছুটতে হবে।'

'উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরতে হবে কেন? আফ্রিকার পাশ দিয়েই যে যাবো তা কে বললে?'

'"নটিলাস" যদি ডাঙার উপর দিয়ে না-যায়—'

'কেন? ডাঙার নিচে দিয়েও তো যেতে পারে।'

'নিচে দিয়ে?'

'লোকে এখন সুয়েজ খাল কাটছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি ঠাকরুন অনেক আগেই সে-কাজ সেরে রেখেছেন। সুয়েজের তলা দিয়ে পোর্ট সয়ীদ পর্যন্ত মাটির নিচ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ গেছে, আমি তার নাম করেছি আব্রাহাম সুড়ঙ্গ।'

'সত্যি? সুড়ঙ্গটা কি দৈবাৎ আপনার চোখে প'ড়ে যায়?'

'অবশ্য একটু কাণ্ডজ্ঞানও খাটাতে হয়েছে। ওই সুড়ঙ্গ না-থাকলে আমি লোহিত সাগরে ঢুকতুম না।'

'সুড়ঙ্গটাকে কীভাবে আবিষ্কার করলেন, জানতে পারি? অবশ্য যদি আপনার কোনো আপত্তি না-থাকে?'

'ভাগ্য যাদের চিরকালের মতো এক সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তাদের মধ্যে কোনো কথাই গোপন থাকা উচিত নয়।' ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, সুড়ঙ্গটার খোঁজ পেয়েছিলুম মাছ দেখে।'

'অর্থাৎ?'

'লক্ষ্য করেছিলুম যে একই জাতের কতগুলো মাছ ভূমধ্য সাগরে আর লোহিত সাগরে পাওয়া যায়—অথচ আমরা জানতুম এই দুই সমুদ্রের কোনো যোগসূত্রই নেই। তাহ'লে এরা এই দুই সমুদ্রে যাতায়াত করে কীভাবে? এ-রকম কোনো সুড়ঙ্গ থাকলে লোহিত সাগর থেকেই তা উত্তরমুখো যাবে, কারণ লোহিত সাগরের উচ্চতাই বেশি। আমার অনুমান ঠিক কিনা বোঝবার জন্য রাশি-রাশি মাছ ধ'রে ল্যাজে পিতলের আংটি বেঁধে আবার সমুদ্রে ছেড়ে দিলুম। কয়েক মাস পরে সিরিয়ার কাছে এই আংটি বাঁধা মাছগুলোকেই খুঁজে পেলুম। তখন আর আমার কোনো সন্দেহই রইলো না। ফলে "নটিলাস" জলের তলায় সরেজমিনে তদন্তে বেরোলো, আর সহজেই সন্ধান পাওয়া গেলো। আপনিও শিগগিরই সুড়ঙ্গটা দেখতে পাবেন, আমি ছাড়া যার হদিশ আর-কেউ জানে না।'

পরের দিন সন্ধেবেলায় 'নটিলাস' সুয়েজের কাছে পৌঁছেই জলের তলায়

banglabooks.in

ডুব দিলে।

সেই আরব্য সুড়ঙ্গ দেখতে পাবার প্রত্যাশায় আমি চঞ্চল ও অধীর হ'য়ে উঠেছিলুম। বোধহয় আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য ক'রেই ক্যাপ্টেন নেমো জিগেস করলেন, 'প্রফেসর, আপনি কি আমার সঙ্গে চালকের ঘরে যেতে রাজী আছেন?'

'এই কথাটিই জিগেস করবো কিনা ভাবছিলুম, কিন্তু কিছুতেই আর সাহস পাচ্ছিলুম না।'

'তাহ'লে আসুন।'

ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে নিয়ে চালকের খাঁচায় গিয়ে হাজির হলেন। চৌকো একটি ঘর, লম্বায়-চওড়ায় ছ-ফুট—মিসিসিপি কিংবা হাডসন নদীর জাহাজের সারেঙের ঘরটা যেমন হয় তেমনি দেখতে। ঘরটার ঠিক মধ্যখানে রয়েছে চাকাটা, চারদিকের দেয়ালে চারটে কাঁচের জানলা, যাতে সারেঙের পক্ষে চারপাশ দেখা সম্ভব হয়।

সারেঙের কামরাটা অন্ধকার, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার চোখ আবছায়ায় অভ্যস্ত হ'য়ে গেলো। কামরার পিছনে যে লণ্ঠনটা জ্বলছিলো তার আলো এসে পড়েছে জলে, আর ঝলমল ক'রে উঠেছে সিন্ধুতল।

'এবার সুড়ঙ্গের মুখটা খুঁজে বার করতে হবে', ব'লে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে ইঞ্জিন-ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন ক্যাপ্টেন নেমো, যাতে একই সঙ্গে 'নটিলাস'-এর বেগ আর দিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। একটি ধাতু-নির্মিত হাতলে চাপ দিয়ে চাকার গতিটা অনেক কমিয়ে ফেললেন তিনি।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে চোখের সামনেই আধো-আলো আধো-আবছায়ার মধ্যে সুয়েজের তীরের খাড়া পাথুরে দেয়াল দেখতে পেলুম। দিগ্‌দর্শিকায় সজাগ চোখ রেখে ক্যাপ্টেন নেমো একের পর এক নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন ইঞ্জিন-ঘরে।

রাত সোয়া দশটার সময় ক্যাপ্টেন নেমো এসে নিজেই হাল ধরলেন। হঠাৎ দেওয়াল স'রে গিয়ে সামনে গভীর-কালো এক বিকট গহ্বরকে হাঁ করে থাকতে দেখলুম, 'নটিলাস' সেই পাথুরে মুখের ভিতর নির্ভয়ে ঢুকে পড়লো। চারপাশ থেকে প্রবল জলকল্লোল উঠছে—ঢালু বেয়ে লোহিত সাগরের জল ছুটে চলেছে ভূমধ্য সাগরের দিকে, আর তারই জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে থরো থরো 'নটিলাস' দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো।

টেরচাভাবে আলো পড়ে পাথরের দেয়ালে, মাঝে-মাঝে দেয়ালগুলো যেন দ্রুত এগিয়ে আসে 'নটিলাস'-এর দিকে, আর আমার বুকে যেন দুমদাম ক'রে হাতুড়ির

banglabooks.in

বাড়ি পড়ে। শেষকালে এই পাথরের দেয়ালে প্রচণ্ড ঘা খেয়ে যদি 'নটিলাস'-এর সলিল সমাধি হয়।

দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় সারেঙের চাকা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নেমো, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ভূমধ্য সাগর।'

বিশ মিনিটও লাগলো না, প্রবল জলোচ্ছ্বাস 'নটিলাস'কে বহন ক'রে নিয়ে এলো ভূমধ্য সাগরে, সুয়েজ যোজক তার কাছে কোনো বাধা ব'লেই গণ্য হ'লো না।

১৫

সোনার সিন্দুক

ক্যাপ্টেন নেমো যে কেমন লোক, বোঝা শক্ত। এই বেশ হাসিখুশি, তারপরেই আবার গম্ভীর ও নিজের মধ্যে তন্ময়। যেমন চোদ্দোই ফেব্রুআরিতে তাঁকে দেখলুম তাঁর সেলুনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হ'য়ে আছেন। তাঁর সেই ব্যাকুল, গম্ভীর ও সমাহিত মূর্তি দেখে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করলুম না। 'নটিলাস' তখন গ্রীসের সমুদ্রে, ক্রীট দ্বীপের পাশে রয়েছে। আর সেই জন্যই হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছিলো। আমি যখন 'আব্রাহাম লিঙ্কন'-এ আমেরিকা ত্যাগ ক'রে অতিকায় সিন্ধুদানবের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরোই, তখন ক্রীটের বাসিন্দারা তুর্কি শাসন-কর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। এই বিদ্রোহ কি আদৌ সফল হয়েছে, না কি তা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে, তা আমি জানতুম না। সেদিন ক্যাপ্টেন নেমোকে দেখেই কেন যেন এই বিদ্রোহের ফলাফল জানবার জন্য কৌতূহল বোধ করলুম। কিন্তু তাঁর ওই গম্ভীর মূর্তি দেখে কোনো প্রশ্ন জিগেস করার সাহস আর হ'লো না।

মানুষটিকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি, ততই আমার মূল ধ'রে টান দিচ্ছেন তিনি। গোপন সাধক ব'লে মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁকে—যেন লোক-চক্ষুর আড়ালে কোনো-এক দুশ্চর তপশ্চর্যায় লিপ্ত। যুগপৎ সারল্য আর জটিলতার প্রতীক—যাবতীয় বিরোধের সমন্বয়েই যেন তাঁর আশ্চর্য অস্মিতা গ'ড়ে উঠেছে। আমার পরিচিত কোনো লোকের সঙ্গেই তাঁর কিছু মেলে না, কোনো কিছু না।

হঠাৎ উঠে গিয়ে একটি জানলা খুলে বাইরের চঞ্চল জলের দিকে তাকিয়ে

banglabooks.in

রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো, আর ওই জলের পাশে তাঁকে দণ্ডায়মান দেখে আমার হঠাৎ মনে হ'লো একমাত্র সমুদ্রের সঙ্গেই বুঝি তাঁর তুলনা হ'তে পারে। সমুদ্রের মতোই অতলস্পর্শী তাঁর ব্যক্তিত্ব—তেমনি রহস্যময় ও জটিল ; তেমনি চঞ্চল অধীর ও ক্ষিপ্র, তেমনি শান্ত সুনীল ও দিগন্তচুম্বী ; সমুদ্রের মতোই যেন হিংস্র, সমুদ্রের মতোই যেন প্রবল, আবার সমুদ্রের মতোই স্নিগ্ধ-সুষমায় সমাকুল।

হঠাৎ পাশের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি জলের মধ্যে একজন ডুবুরি নেমে এসেছে। প্রবল বেগে সাঁতার কাটছিলো লোকটি, আবার মাঝে-মাঝে নিশ্বাস নেবার জন্যে ভেসে উঠছিলো জলের উপর। তারপরেই আবার ডুব দিয়ে নেমে আসছিলো জানলার কাছে।

ক্যাপ্টেন নেমো দাঁড়িয়েছিলেন অন্য-একটি জানলার কাছে। আমার চিৎকার শুনে এই জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ডুবুরিটি আরো-কাছে এগিয়ে এলো। অবাক হ'য়ে লক্ষ করলুম, জানলার এ-পাশ থেকে হাত তুলে কী-একটা ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন, উত্তরে লোকটা হাত নেড়ে উপরে উঠে গেলো—আর ফিরে এলো না। এবার আমার দিকে ফিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন, বললেন, 'ভয় পাবেন না। ও হচ্ছে মাটাপান অন্তরীপের নিকোলাস—যদিও সবাই ওকে "পেস্‌কে" বা মাছ বলে ডাকে। আশপাশের সব কটা দ্বীপ ওর চেনা। অমন সাহসী ডুবুরি বোধহয় আর নেই।'

'আপনি ওকে চেনেন, ক্যাপ্টেন ?'

'কেন চিনবো না, মঁসিয় আরোনা ?'

এই কথা ব'লে ঘরের এক কোনায় গিয়ে একটা মস্ত সিন্দুকের ডালা খুললেন ক্যাপ্টেন নেমো। ডালার উপর তামার পাতে 'নটিলাস'-এর নাম লেখা, আর লেখা তার মূলমন্ত্র, 'চলার মধ্যে চলা'।*

সিন্দুকটার ভিতরে রাশি-রাশি সোনার ডেলা সাজানো। এত সোনা তিনি পেলেন কোত্থেকে ? তা ছাড়া এখন এত সোনা দিয়ে কীই বা করবেন তিনি ?

কোনো কথা না-ব'লে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখলুম একটা-একটা ক'রে সোনার ডেলা তুলে তিনি একটি বাক্সে বোঝাই করতে লাগলেন। যখন পুরো বাক্সটা বোঝাই হ'য়ে গেলো তখন শক্ত তালা লাগিয়ে বাক্সটার উপর আধুনিক গ্রীক হরফে কার যেন ঠিকানা লিখলেন তিনি। তারপর একটা হাতল ঘোরাতেই বাইরে ঘুষ্টির আওয়াজ হ'লো, অমনি চারজন অনুচর এসে অতি কষ্টে বাক্সটাকে টেনে-টেনে

* Mobilis in Mobili.

banglabooks.in

সেলুনের বাইরে নিয়ে গেলো। তারপরে কপিকল দিয়ে বাক্সটাকে লোহার সিঁড়ি দিয়ে টেনে তোলার শব্দও পেলুম।

এতক্ষণ পরে বোধহয় হঠাৎ আমাকে নেমোর মনে পড়লো। 'আপনি কিছু বলছিলেন, প্রফেসর ?'

'কই, না তো।'

'তাহ'লে শুভরাত্রি রইলো !'

ক্যাপ্টেন নেমো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমিও অত্যন্ত কৌতূহলী হ'য়ে নিজের ঘরে ফিরে এলুম। ওই ডুবুরিটির ইঙ্গিত আর বাক্সভর্তি সোনার ডেলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক আছে কি না, ভাবতে লাগলুম আমি। অনেক রাত্রেও আমি যখন জেগে-জেগে এ-সম্বন্ধে নানা কথা ভাবছি, তখন নানা আন্দোলন ও আওয়াজ শুনে বুঝলুম 'নটিলাস' ধীরে-ধীরে জলের উপর ভেসে উঠলো। তারপরে প্ল্যাটফর্মে অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেলো। আওয়াজ শুনে বুঝলুম নৌকো নামানো হ'লো সমুদ্রে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার প্ল্যাটফর্মে নৌকো টেনে-তোলার শব্দ শোনা গেলো। 'নটিলাস' আবার জলের তলায় ডুব দিলে।

সোনা তাহ'লে যথা-ঠিকানায় পৌঁছে গেলো ? কোন সে ঠিকানা ? কার কাছে এত সোনা পাঠালেন ক্যাপ্টেন নেমো ?

হিংটিংছট প্রশ্নের মতো এই সব কথা ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, জানি না। সকালে উঠে দেখি আমরা গ্রীসের উপকূল পিছনে ফেলে এসেছি !

যে প্রবল বেগে 'নটিলাস' ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে এলো, তাতে মনে হ'লো ক্যাপ্টেন নেমো কোনো কারণে বোধহয় এই অঞ্চলকে পছন্দ করেন না। হয়তো সমুদ্রের এই অঞ্চলে অনেক দুঃখের স্মৃতি জড়ানো আছে, তাই 'নটিলাস'-এর গতি তিনি মন্থর করতে চাননি। শুধু সিসিলির কাছে একটু সময় ডুবোপাহাড়ের প্রাচুর্যের জন্য মন্থর হয়েছিলো গতি, তারপর আবার জিবরাল্টার প্রণালীতে প'ড়েই গতি অনেক বৃদ্ধি পেলো। যাবার সময় কেবল চকিতে একটুক্ষণের জন্য দেখা গেলো হারকিউলিসের সেই প্রাচীন মন্দির, এখন যা সিন্ধুতলের শ্যাওলায়-সমাকীর্ণ। আর তারপরেই আমরা অতলান্তিক মহাসাগরে এসে পৌঁছোলুম।

banglabooks.in

১৬

সিন্ধুতলের কোষাগার

'নটিলাস' আমাদের যত স্বাচ্ছন্দ্যই দিক, তবু বন্দী তো। ফলে নেড ল্যাণ্ড যখন পলায়নের পরিকল্পনা করলে, আমাকে রাজী হ'তেই হ'লো।

মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টায় ভূমধ্য সাগর অতিক্রম ক'রে আমরা তখন অতলান্তিক মহাসাগরে এসে পড়েছি, ইস্পাহানের উপকূল ধ'রে আস্তে জলের তলা দিয়ে চলেছে 'নটিলাস'। ঠিক হয়েছে রাত নটার সময় 'নটিলাস'-এর নৌকোয় ক'রে আমরা পালাবো।

এই ক'দিন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হয়নি। 'নটিলাস' ছেড়ে যাবার আগে শেষবার সব ভালো ক'রে দেখে যাবার ইচ্ছে হ'লো খুব। তাই রাত আটটার সময় আমি সন্তর্পণে ক্যাপ্টেন নেমোর ঘরের কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। ভিতর থেকে কোনো শব্দ আসছে না দেখে সাহস সঞ্চয় ক'রে আস্তে একটু ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো।

তপস্বীর শাদাশিদে ঘরের মতো এই নিরাভরণ ঘরটিতে আমি আগেও গেছি। দেয়ালে নানা দেশের নেতাদের ছবি ঝুলছে ; পোল্যাণ্ডের বীর নেতা কোসকিয়ুস্কো আয়ারল্যাণ্ডের ডানিয়েল ও' কনেল, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন আর জন ব্রাউন। এঁরা প্রত্যেকেই স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। ক্যাপ্টেন নেমোর রহস্যের সূত্র কি তবে এই ছবিগুলি ? ইনিও কি দুর্ভাগা দেশের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত মানুষদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন ? কোন সে আত্মীয়তার বাঁধন, যা বোটৎসারিস, ও' কনেল, আব্রাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে তাঁকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে ? আমেরিকার সাম্প্রতিক গৃহযুদ্ধের কোনো নায়ক ইনি ? এই শতাব্দীর বৃহত্তম বিপ্লবের কোনো নেতা কি তিনি আসলে ?

হঠাৎ এমন সময়ে ঢং-ঢং ক'রে আটটা বাজলো ঘড়িতে। অমনি যেন আমি মূর্ছা থেকে জেগে উঠলুম। মনে পড়লো যে এ-ঘরে আসলে ঢুকেছিলুম দিগ্‌দর্শিকা দেখে আমাদের গতিপথ নির্ধারণ করতে। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ধড়াচুড়ো প'রে তৈরি হ'য়ে নিলুম আমি, 'নটিলাস'-এরই দেয়া নাবিকের পোশাকে নিজেকে সজ্জিত ক'রে নিলুম।

banglabooks.in

পালাবার মুহূর্ত যত এগিয়ে আসতে লাগলো আমার বুকের স্পন্দনও ততই যেন বেড়ে চললো। সমস্ত 'নটিলাস-'এ কোনো সাড়া শব্দ নেই, কেবল একটা ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে; আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে যন্ত্রের এই গুঞ্জন যেন মিশে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আমার উৎকর্ণ অস্তিত্ব প্রতীক্ষা করতে লাগলো চ্যাঁচামেচি ও হট্টগোলের; এই বুঝি নেড ল্যাণ্ড পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে যায়!

ন-টা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, এমন সময় হঠাৎ যেন বুকের ভিতরটা ফাঁকা ক'রে দিয়ে ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন মিলিয়ে গেলো। ছোট্ট ধাক্কা দেখে বুঝলুম 'নটিলাস' আস্তে-আস্তে গভীর সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। তাহ'লে কি আমাদের পলায়নের পরিকল্পনা আর গোপন নেই?

এমন সময়ে ঘরের দরজা খুলে হাসিমুখে ভিতরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নেমো। 'এই-যে, প্রফেসর, আপনাকেই খুঁজছিলুম। ইস্পাহানের ইতিহাস আপনি জানেন তো?'

এমন অবস্থায় কাউকে তার স্বদেশের ইতিহাসের কথাও জিগেস করলে সে কোনো উত্তর দিতে পারতো কিনা সন্দেহ।

আমাকে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নেমো আবার জিগেস করলেন, 'কী? জানেন নাকি?'

'যৎসামান্য,' কোনো রকমে এই কথাটিই বলতে পারলুম শুধু।

'ঠিক পণ্ডিতদের মতোই জবাব,' বললেন ক্যাপ্টেন, 'পণ্ডিত ব'লে তারা কিছুই জানে না—বসুন, আপনাকে ইস্পাহানের ইতিহাসের একটা কাহিনী শোনাই।'

ডিভানের উপর হেলান দিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন নেমো। তারপর গুনগুন ক'রে বলতে শুরু করলেন ইস্পাহানের জাতীয় সংগ্রামের দীর্ঘ কাহিনী।

সত্যি দীর্ঘ কাহিনী শুনিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। ইংরেজ ওলন্দাজ আর আলেমান জাতিপুঞ্জের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য রাজা চতুর্দশ লুই-এর নেতৃত্বে ফ্রান্স ইস্পাহানের সঙ্গে মৈত্রী রচনা করলে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য যে-বিপুল অর্থ চাই, তা কে জোগাবে! দক্ষিণ আমেরিকায় ইস্পাহানের তখন অঢেল ঐশ্বর্য। মায়া আর ইনকাদের সোনারুপোয় অনেক ইস্পাহানি জাহাজ বোঝাই করা হ'লো, আর তেইশটা ফরাশি যুদ্ধজাহাজ তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চললো ক্যাডিজের দিকে। খবর পেয়ে ইংরেজ নৌবাহিনী ক্যাডিজ অবরোধ ক'রে পথ আটকে ব'সে রইলো। ফলে বিপদ এড়াবার জন্য ফরাশি সেনাধ্যক্ষ আর

banglabooks.in

ইস্পাহানি অধিনায়ক পরামর্শ ক'রে সোনাভর্তি জাহাজ নিয়ে চললেন ভিগো উপসাগরে, কিন্তু কোনো কারণে জাহাজ থেকে মাল খালাশ করতে বড্ড দেরি ক'রে ফেলেছিলেন তাঁরা—সেই সুযোগে ইংরেজ বাহিনী এসে তাদের আক্রমণ ক'রে বসলো। নীল জল লাল হ'য়ে গেলো সেই দারুণ যুদ্ধে, আর ফরাশি সেনাধ্যক্ষ যখন দেখলেন ইংরেজ বাহিনী সঙ্গে কিছুতেই এঁটে-ওঠা যাবে না, তখন তাঁর আদেশে গোলাবারুদ দিয়ে সোনারুপোভরা ইস্পাহানি জাহাজগুলো জলে ডুবিয়ে দেয়া হ'লো। এই অতুল ঐশ্বর্য শত্রুর হাতে পড়ার চেয়ে সলিল-সমাধি হওয়া ঢের ভালো।

সাল-তারিখ-সংবলিত এই মস্ত গল্প শেষ হ'লো, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না ক্যাপ্টেন নেমো হঠাৎ আমাকে এই কাহিনী শোনালেন কেন। 'তো কী!' আমি জিগেস করলুম।

'মঁসিয় আরোনা,' ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, "নটিলাস" এখন এই ভিগো উপসাগরেই নেমে পড়েছে।'

ক্যাপ্টেন নেমো উঠে দাঁড়িয়ে একটি জানলার পাশে নিয়ে গেলেন আমাকে। জানলা দিয়ে দেখলুম ডুবুরির পোশাক প'রে 'নটিলাস'-এর মাল্লারা বালি খুঁড়ে তোবড়ানো, ভাঙাচোরা, শ্যাওলা-পড়া বাক্স উদ্ধার করছে। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে অজস্র জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। সেই ভাঙা বাক্সগুলো থেকে রাশি-রাশি সোনারুপোর ডেলা, পুরোনো ইস্পাহানি মোহর ও মূল্যবান দীপ্ত পাথর ছড়িয়ে পড়লো সিন্ধুতলে, আর 'নটিলাস'-এর মাল্লারা তা দিয়ে বোঝাই করতে লাগলো মস্ত সব সিন্দুক। সিন্ধুতলের বালুরাশির উপর তারার মতো ঝিকিয়ে-ওঠা এই অকল্পনীয় ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে সব স্পষ্ট বুঝতে পারলুম আমি। শূন্য সিন্দুক আবার ভ'রে নেবার জন্যই ভিগো উপসাগরে এসেছে 'নটিলাস'—ইনকাদের অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর এখন এই মানুষটিই।

হাসিমুখে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নেমো। 'এখন বুঝতে পারছেন তো কেমন ক'রে আমি ক্রোড়পতি হয়েছি?'

'বুঝলুম। কিন্তু এত ঐশ্বর্য, সব কিনা এমনিভাবে নষ্ট হচ্ছে—কোনো কাজেই লাগছে না?'

বলতে-বলতেই বুঝতে পারলুম অজান্তে আমি ক্যাপ্টেন নেমোকে আঘাত ক'রে বসেছি।

'নষ্ট হচ্ছে?' আহত বাঘের মতো রুষ্ট স্বরে ব'লে উঠলেন নেমো, 'আপনি কি

banglabooks.in

ভাবছেন এত কষ্ট ক'রে এই সম্পদ আমি উদ্ধার করছি নষ্ট করার জন্য, নিজের ভোগের জন্য ?' আমি যে এই ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার করছি না, তা আপনাকে কে বললে ? আপনি কি মনে করেন আমি খবরটুকুও রাখি না পৃথিবীর কোথায়, কোন কোন দেশে, মানুষ নিপীড়িত লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছে ? এটা কি কিছুতেই বোঝেন না যে—

হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো থেমে গেলেন। বোধ হয় এত কথা তিনি বলতে চান-নি। বোধ হয় এত উত্তেজিত না-হ'লে এ-সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি বলতেন না। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

সমুদ্রের তলায় এই স্বাধীন নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নেবার পিছনে যে-কারণই থাক না কেন, ক্যাপ্টেন নেমো যে এখনো মানুষেরই সন্তান, এই তথ্য আমার অগোচর রইলো না। এখনো মানবজাতির দুঃখে ও লাঞ্ছনায় তাঁর বুক কাঁদে, এখনো অত্যাচারিত দীন জাতিদের উদ্দেশে তাঁর অঢেল ঐশ্বর্য ব্যয় হয়। আর অমনি আমি বুঝতে পারলুম বিপ্লব-জ্বলা ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় কাদের উদ্দেশে তিনি ওই সোনাভরা সিন্দুক পাঠিয়েছিলেন।

১৭

লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ

পরের দিন, উনিশে ফেব্রুআরি, সকালবেলায় নেড ল্যাণ্ড সবেগে আমার ঘরে এসে ঢুকলো। তারই প্রত্যাশা করছিলুম আমি। বড্ড হতাশ দেখালো তাকে।

'হ'লো তো! হতাশভাবে সে বললে আমায়।

'তা কী করবে, বলো ? ভাগ্য বিরূপ ছিলো কাল।'

'কিন্তু ঠিক ওই সময়টাতেই কিনা ক্যাপ্টেন জলের তলায় নামলো।'

'হ্যাঁ, নেড। ব্যাংকে গিয়ে টাকা তোলা দরকার ছিলো তাঁর।'

'ব্যাংকে ?'

'ব্যাংক ছাড়া আর কী বলি ? কোনো ব্যাংকের লোহার সিন্দুকের চেয়েও সমুদ্রের তলা অনেক বেশি নিরাপদ তাঁর কাছে—আর এখানেই তিনি তাঁর সব সম্পদ জমা রাখেন।' এই ব'লে কাল রাতের সব ঘটনা আমি তাকে খুলে বললুম।

banglabooks.in

এত কথা তাকে বলার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে যদি তাতে নেডের মতি ফেরে, যদি এর পর ক্যাপ্টেন নেমো সম্বন্ধে সে আর বিরূপ না-হয়। কিন্তু সব শুনে নেড কেবল আপসোস ক'রে বলতে লাগলো যে—হায় রে!—সে কিনা ওই ইনকাদের সোনা আনতে যেতে পারলে না!

'ঠিক আছে। কোনো পরোয়া নেই,' যাবার আগে নেড বললে, 'পরের বারে ঠিক পালাবো, দেখবেন। দরকার হ'লে আজ রাতেই পালাবো—'

'"নটিলাস" কোন দিকে যাচ্ছে, জানো?'

'না।'

'আচ্ছা, দুপুরবেলা ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আমি জেনে নেবো।'

নেড কোনসাইলের খোঁজে চ'লে গেলো।

পালাবার পরিকল্পনা কিন্তু সেদিন তাকে বাদ দিতে হ'লো। প্রথমত আশপাশে কোথাও ডাঙার চিহ্ন দেখা গেলো না; উপরন্তু আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখে ঝড়ের সম্ভাবনাটা আর আগোচর রইলো না। নেড রাগে এমন ভাব করতে লাগলো যে পারলে সে যেন মেঘেদের ছিঁড়ে খায়। আমি কিন্তু গোপনে বলি যে মেঘ দেখে আমার অতটা দুঃখ হয়নি—পালাবার জন্য আমি আর অতটা উৎসুক ছিলুম না।

ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হ'লো রাত এগারোটায়। আমাকে দেখেই জিগেস করলেন আমি ক্লান্ত কিনা। আমি মাথা নাড়তেই সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন নেমো। 'মঁসিয় আরোনা, আপনি তো কখনো রাত্রিবেলায় সমুদ্রের নীচে বেরোননি। চলুন না, একটু ঘুরে আসা যাক। অবশ্য খুব ক্লান্ত লাগবে পরে, এ-কথা আগে থেকেই ব'লে রাখি কারণ প্রথমত আমাদের অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, উঠতে হবে এমন কি একটি পাহাড়ের চুড়োয়, দ্বিতীয়ত রাস্তাঘাট তেমন ভালো নয় —অনেকদিন মেরামত হয়নি কিনা।'

'আপনার কথা শুনে দ্বিগুণ কৌতূহল জাগছে। চলুন, যাই।'

ডুবুরি-পোশাক প'রে নিলুম দুজনে, সঙ্গে নিলুম লোহার আংটা-লাগানো লাঠি। কিন্তু দেখি বৈদ্যুতিক লণ্ঠন নেবার কোনো উদ্যোগই করলেন না ক্যাপ্টেন নেমো। জিগেস করতেই বললেন, 'ও-লণ্ঠন আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না।'

আমরা দুজনেই কেবল রাতের সিন্ধুতলে বেড়াতে বেরোবো— নেমো সঙ্গে কোনো অনুচর নিলেন না, বা নেড ও কোনসাইলকেও নেবার কোনো প্রস্তাব করলেন না। আমরা যখন সমুদ্রতলে পা দিলুম তখন রাত বারোটা বাজে। অনেক

banglabooks.in

দূরে কোথায় যেন সমুদ্রের তলায় একটা লালচে আলো জ্বলছে, সেই দিকে আঙুল তুলে দেখালেন ক্যাপ্টেন প্রথমে, তারপর ওই লাল আলো লক্ষ্য ক'রে এগিয়ে চললেন। আমিও তাঁর পাশাপাশি হাঁটতে লাগলুম।

ওই লোহার লাঠিটা কেন সঙ্গে নিতে হয়েছিলো, হাঁটতে গিয়ে তার কারণ বেশ স্পষ্টই বোঝা গেলো। সামুদ্রিক গুল্ম আর শৈবালে বারে বারে পা পিছলে যাচ্ছিলো, হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে সামলে নিলুম প্রতিবারেই। এই পিছল উদ্ভিজ্জ সত্ত্বেও মনে হ'লো পায়ের তলার পাথুরে মাটির মধ্যে যেন কোনো সচেতন প্রকল্প রয়েছে, যেন নিসর্গসুন্দরীর স্বাভাবিক সৃষ্টি নয়, কারো পরিকল্পনা অনুসারেই রচিত ও বিস্তৃত। মধ্যে-মধ্যে মনে হ'লো আমার শিশের জুতোর তলায় রাশিরাশি হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যাচ্ছে শব্দ ক'রে।

ক্রমশ পিছনে 'নটিলাস'-এর আলো যতই ক্ষীণ ও দূরবর্তী হ'য়ে এলো, সামনের সেই লাল দীপ্তিও যেন ততই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠতে লাগলো। আরো খানিকটা এগোবার পর বুঝতে পারলুম ওই আরক্তিম আলোর উৎস হ'লো সামনের একটি পাহাড়ের চুড়ো। রাত যখন প্রায় একটা বাজে, তখন আমরা সেই পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়ালুম।

এখানে সামুদ্রিক গাছপালা গজিয়েছে নিবিড় ও ঘন-ভাবে, আর সেই ঘন অরণ্যের মধ্যে দিয়েই পথ ক'রে নিয়ে এগোতে লাগলেন ক্যাপ্টেন নেমো। সবই যেন তাঁর অতি চেনা ; একটুও ইতস্তত না করে কোনো রকম দোটানায় না প'ড়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন! দু' পাশে তাকিয়ে দেখলুম, সত্যি, পাইন গাছের জঙ্গল চ'লে গেছে সারিবদ্ধভাবে—প'চে গেছে গাছগুলো, কোনো সবুজের চিহ্ন নেই, না পাতা, না অন্য কিছু ; সোজা দাঁড়িয়ে আছে তারা, কয়লার খনির মধ্যে যেমনভাবে দূর অতীতের গাছের প্রতিভাস দেখা যায়—আর ডালপালার মধ্য দিয়ে রঙ-বেরঙের বিচিত্র মাছের দল সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে—যেন পাখি উড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বনে।

জঙ্গল যেখানে শেষ হ'লো পাহাড়ের চুড়ো সেখান থেকে বেশ-কিছু ফুট দূরে ; এবড়ো-খেবড়ো বন্ধুর পার্বত্যপথ ধ'রে আমরা উঠতে লাগলুম। কালো-কালো গর্তের মধ্যে, আনাচে-কানাচে, ঘুলঘুলির মতো পাহাড়ের ফাটলে কত সিন্ধুদানবের উজ্জ্বল চক্ষু দেখতে পেলুম, তাদের নড়াচড়ার শব্দ কানে এলো কতবার। পায়ের তলা থেকে কতবার স'রে গেলো বিকট দাঁড়-ওলা কাঁকড়া আর অতিকায় চিংড়ি। নেমো দৃক্‌পাত না-ক'রে সোজা ওই চুড়োর দিকে এগিয়ে চললেন।

banglabooks.in

পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছে যে-আশ্চর্য দৃশ্য চোখের সামনে উন্মোচিত হ'লো তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে অগুন্তি প্রাসাদের ভগ্নস্তূপ—সবই কোনো পুরাকালীন মানুষের কীর্তি। শ্যাওলা-পড়া গুল্মেভরা প্রাসাদ আর মন্দিরগুলো চিনতে আমার সত্যি অনেকক্ষণ লাগলো। মানে কী এই ভগ্নস্তূপের? এ কোন জনপদ এই সমুদ্রগর্ভে বিলীন হ'য়ে গেছে? এই বিশাল হর্ম্যরাজি কারা গড়েছিলো, কোন যুগে?

বহু যুগের ওপার হ'তে যেন জলমর্মর ভেসে এলো। আমি যা ভাবছি সত্যি কি তবে তাই? সাগ্রহে ক্যাপ্টেন নেমোর হাতটা চেপে ধরলুম আমি; নেমো কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ না-ক'রে শুধু আরো এগিয়ে চললেন। কিছুক্ষণ পরে আরো-উঁচু একটা চুড়োয় ওঠবার পর সেই কোন দুরন্ত রক্তচক্ষুর মতো লাল আলোর উৎস চোখে পড়লো আমার: প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচেই পাহাড় হাঁ ক'রে আগুন ওগরাচ্ছে—আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখি দিয়ে তপ্ত লাল লাভার স্রোত গলগল ক'রে বেরিয়ে আসছে। কোনো শিখা নেই—অক্সিজেন না-থাকলে শিখা থাকে না। শুধু লাল গনগনে সেই তরল আগুন পাহাড়ের গা বেয়ে জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়েছে।

মহাকালের এই প্রচণ্ড রক্তচক্ষু আর এই জনপদের ভগ্নস্তূপ একটা জাতির পুরো ইতিহাস ব'লে দিচ্ছে। দূরবিস্তৃত সমতল ভূমি জুড়ে এই পাহাড়ের তলায় যে-সুন্দর নগর গ'ড়ে উঠেছিলো, সভ্যতার কোলাহল জেগেছিলো যেখানে একদা, এখন সেখানে ছাদ, মন্দিরের চুড়ো, মস্ত থামগুলির মধ্য দিয়ে লাভার স্রোত ব'য়ে যাচ্ছে। দূরে একটা বন্দরের নিদর্শনও চোখে পড়লো। এখানে একদিন কত পাল-তোলা জাহাজ ফেনিল জলের উপর দিয়ে ভেসে যেতো।

আমার মাথার ভিতরটায় যেন আবর্ত খেলে গেলো। কোথায় আছি আমি, কোনখানে? আমার উন্মাদনা এতই প্রবল হয়েছিলো যে শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলে জিগেস করতে যাচ্ছিলুম আমি, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে বাধা দিলেন। নিচু হ'য়ে খড়িমাটি তুলে তিনি সেই হারানো জগতের পাথরের গায়ে ছোট্ট একটি নাম লিখলেন: 'আটলান্টিস'।

যেন তড়িৎ খেলে গেলো আমার মধ্যে। চকিতে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো এই লুপ্ত নগরীর রহস্য। যাকে এতকাল কিংবদন্তি ব'লে ভেবেছি, ওরিগেন, ইয়ানাক্লথুস, ছ্যানভিল, নাণ্টে-ব্রুন, হুম্বোল্ট যার কথা বিশ্বাস করেননি, প্লাতোর সেই আটলান্টিস নগরী, তোয়োগোস্পুসের সেই বিখ্যাত দেশ। শৌর্যে বীর্যে একদিন যারা উন্নতির

banglabooks.in

চরম শিখরে উঠেছিলো. প্রাচীন গ্রীকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও যারা একদিন পেছপা হয়নি, রাতারাতি এক প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে তারা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেলো, সমস্ত কীর্তিধ্বজা সমেত নিঃশেষে হারিয়ে গেলো পৃথিবীর উপর থেকে।

আর আমি, সামান্ত পিয়ের আরোনা, পারী বিচিত্রাভবনের কর্মচারী—আমি কি না এই লুপ্ত মহাদেশের বুকে দাঁড়িয়ে আছি এখন! যেন বহুযুগের ওপারের কোনো হারানো দেশের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেলুম আমি। আর ক্যাপ্টেন নেমো সারাক্ষণ শ্যাওলাজমা একটি পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে পাথরের মতোই নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন। কী স্বপ্ন দেখছেন এই কবিমানুষটি এখানে? তিনি কি সেই হারানো মানুষদের কাছ থেকে জেনে নিতে চাচ্ছেন মানবভাগ্যের পরম রহস্য? যে-মানুষটি তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আধুনিক পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে কি বারে-বারে এখানে এসে অতীতের ছায়ার মধ্যে নিজেকে ফিরে পায়!

প্রায় একঘণ্টা ছিলাম সেখানে। সারাক্ষণ পায়ের তলায় মাটি কাঁপিয়ে সেই গনগনে রক্তিম তরল আগুন ব'য়ে গেলো এই হারানো মহাদেশের উপর দিয়ে। আর তারপর জলের উপর উঠে এলো কম্পমান পাণ্ডুর চাঁদ। চাঁদ ঠিক নয়, চাঁদের উজ্জ্বল প্রতিভাস শুধু। আর চাঁদের সেই ছায়ার মধ্যেই আমরা ফিরে চললুম।

যখন ক্লান্ত অবসন্ন দেহটিকে 'নটিলাস'-এ টেনে তুললুম, তখন আলো হ'য়ে এসেছে পুবদিক।

সূর্য উঠবে এবার।

১৮

লক্ষ্য : অবাচী

ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে ছুটে চলতে থাকে 'নটিলাস', লক্ষ্য তার অবাচী। আমরা পেরিয়ে এলুম সারাগোসা সাগর, পেরিয়ে এলুম তিমিঙ্গিলের দেশ, সিন্ধুতলের কয়লাখনি। ধীরে-ধীরে তুহিন অবাচীর দিকে এগোচ্ছি আমরা।

পঞ্চান্ন অক্ষরেখার কাছেই জলের উপর বরফের চাঙড় ভেসে থাকতে দেখে-ছিলুম, ষাট অক্ষরেখার কাছে এসে দেখি সামনে এগোবার পথ বন্ধ। হঠাৎ কে যেন আঙুল তুলে চঞ্চল সমুদ্রকে 'তিষ্ঠ' ব'লে থামিয়ে দিয়েছে এখানে, শুরু হয়ে গেছে ধূ-ধূ বরফের রাজ্য—শুভ্র, নিরেট, দিগন্তবিসারী।

banglabooks.in

ইচ্ছে করলেই 'নটিলাস'-এর মুখ ঘুরিয়ে নেয়া যেতো, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমো কিছুতেই দ'মে যাবার মানুষ নন। খুঁজে-খুঁজে ঠিক একটা সংকীর্ণ পথ বার করলেন তিনি, তারপর তার ভিতর দিয়েই আশ্চর্য কৌশলে নিজে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন 'নটিলাস'। চারপাশে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই—ঠাণ্ডা হিম শাদা মরু-ভূমি ছড়িয়ে আছে দিগন্ত পর্যন্ত—স্তব্ধ নিশ্চল পরিবর্তনহীন এই শূন্যতার সঙ্গে কিছুরই বোধ হয় তুলনা হয় না। বৈদ্যুতিক চুল্লি জ্বালিয়ে 'নটিলাস'-এর ভিতরটা গরম রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, পশু-লোমের মোটা পোশাক চাপিয়েছিলুম আমরা গায়ে, তবু তারই মধ্যে ঠাণ্ডা তার লোভী দাঁত বসাতে চাচ্ছিলো বারে-বারে।

মার্চ মাসের ষোলো তারিখে আমরা কুমেরু বলয় পেরিয়ে এলুম। নির্ভয় ক্যাপ্টেন নেমো তুহিন প্রাচীরের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এলেন 'নটিলাস'। কোনো-দিকে দৃক্‌পাত না-ক'রে পাৎলা বরফের স্তর ভেদ ক'রে এগিয়ে চললেন সামনে; যে-পথ দিয়ে আমরা আসছি, সে-পথ দেখতে দেখতে জ'মে বরফ হ'য়ে যাচ্ছে—এখন আর ইচ্ছে হ'লেও ফেরবার পথ রুদ্ধ। এগোবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হ'লো আঠারোই মার্চ—কোনোক্রমেই আর এগোনো সম্ভব হ'লো না 'নটিলাস'-এর পক্ষে। মস্ত সব তুহিন পাহাড় উঠেছে সামনে, আকাশ আড়াল ক'রে স্তব্ধ ও হিম তারা দাঁড়িয়ে আছে, তাপমাত্রা নেমে এসেছে শূন্য থেকে পাঁচ ডিগ্রি নিচে! চার-পাশের বরফের মধ্যে আমরা বন্দী হলুম এতদিনে, যেন আস্ত গিলে ফেলেছে আমাদের বরফেরা। এতদিন হাঁ ক'রে ছিলো বরফের দেশ, এইবার আস্তে-আস্তে আমাদের জঠরে পুরে ফেলেছে।

এটা কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর গোয়ার্তুমি। বেপরোয়াভাবে এই বরফের মধ্য দিয়ে না-এলেই হ'তো!

আমি বড্ড বিমর্ষ আর মলিন হ'য়ে পড়েছিলুম, তাই ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে জিগেস করলেন, 'এই যে মঁসিয় আরোনা, কী ভাবছেন অমন গম্ভীরভাবে?'

'ভাবছি সামনে যাওয়ার পথ তো বন্ধই, এবার ফিরে যাবার পথ পেলেই হয়—তারও তো কোনো চিহ্ন দেখছি না।'

'"নটিলাস"কে অতটা অসহায় ভাববেন না, প্রফেসর,' বিদ্রূপের হাসি খেলে গেলো ক্যাপ্টেনের মুখে, 'আমার তো ইচ্ছে একেবারে কুমেরুতে গিয়ে থামি।'

'কুমেরুতে?' কিছুতেই আর অবিশ্বাস চেপে রাখতে পারলুম না আমি।

'হ্যাঁ, কুমেরুতে—পৃথিবীর দক্ষিণতম বিন্দুতে—যেখানে এখনো কোনো মানুষ পদার্পণ করেনি।'

banglabooks.in

'তাহ'লে কি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেছেন নাকি আপনি ?'

'না, এখনো করিনি—তবে আমি আর আপনি, আমরা দুজনে মিলে করবো। বরফের বাধা কোনো বাধাই নয়। আমরা এই বরফের তলা দিয়েই চ'লে যাবো।'

'তলা দিয়ে ?'

'নিশ্চয়ই। এটা তো জানেন যে বরফের একভাগ জলের উপর ভাসে, আর তিনভাগ থাকে জলের তলায়। সামনের ওই বরফের পাহাড়গুলো যদি তিনশো ফুট উঁচু হয়, তাহ'লে জলের তলায় রয়েছে ন'শো ফুট—তার তলা দিয়ে গেলেই তো হ'লো। আপনি তো এতদিনে এটা জেনেছেন যে "নটিলাস"-এর পক্ষে সমুদ্রের আরো-তলা দিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।'

'তা ঠিক।'

'অবশ্যি কোনো অসুবিধে যে নেই, তা বলি না। কতদিন জলের তলায় থাকতে হবে, তা জানি না। সঞ্চিত বাতাস ফুরিয়ে যাবার পরেও যদি কুমেরুবিন্দুতে ওঠবার পথ না-পাই, তাহ'লে শ্বাস রোধ হ'য়ে মরবো আমরা সবাই।'

তক্ষুনি নশো ফুট নিচে নামার আয়োজন শুরু হ'য়ে গেলো। নাবিকেরা কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে, চারপাশে বরফ কাটতে লাগলো তারা, আর চাড় দিয়ে-দিয়ে একটু একটু পথ ক'রে নিচে নামতে লাগলো 'নটিলাস'। নশো ফুট নামবার পর জল পাওয়া গেলো, কিন্তু 'নটিলাস' নামতে লাগলো আরো নিচে—কারণ এর পরে কত ফুট উঁচু বরফের পাহাড় আছে, কে জানে। প্রায় আড়াই হাজার ফুট নিচে নেমে আসার পর আবার শুরু হ'লো এগিয়ে যাওয়া।

পরের দিন উনিশে মার্চ 'নটিলাস'-এর গতি ক'মে আসছে দেখে বোঝা গেলো জাহাজ এবার ধীরে ধীরে উপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন ভীষণ ধাক্কা লাগলো 'নটিলাস'-এর—অত বড়ো জাহাজটা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো। বুঝলুম উপরে উঠতে গিয়ে বরফের গায়ে ঘা খেলো 'নটিলাস'। সর্বনাশ ! দু-হাজার ফুট বরফ ভেদ ক'রে উপরে ওঠার ক্ষমতা তো 'নটিলাস'-এর নেই—তা'-হলে এই তুহিন জলেই তার সমাধি হবে ! জাহাজ কিন্তু তবু নির্বিকারভাবে দক্ষিণ মুখো চললো, তারপর আবার আরেক ধাক্কা লাগলো বরফের সঙ্গে। এমনি ক'রে বারে-বারে ধাক্কা মারতে-মারতে এগোতে লাগলো 'নটিলাস', পরীক্ষা ক'রে দেখতে চাইলো বরফের স্তর কোথায় পাৎলা হ'য়ে এসেছে, কোথায় সে খোলা সমুদ্রে ভেসে উঠতে পারবে ! সারা রাত দুশ্চিন্তায় কেটে গেল আমার ; যদি বরফের স্তর পাৎলা না-হয়, তাহ'লে ? কিন্তু সকালবেলাতেই ক্যাপ্টেন নেমো এসে সুখবরটা

banglabooks.in

দিয়ে গেলেন আমাকে, 'খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছি !'

প্ল্যাটফর্মে ছুটে এলুম। সত্যি, খোলা সমুদ্রই ! যদিও ইতস্তত বরফের চাঙড় ছড়িয়ে আছে আশপাশে, তবু শান্ত নীল জলের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে 'নটিলাস'। আকাশে পাখির গান, জলে খেলা করছে মাছের ঝাঁক, 'নটিলাস'-এর চাকার শব্দ উঠছে ছলো ছলো। কে বলবে যে ওই বরফের প্রাচীরের আড়ালে এমন একটি স্পন্দমান সপ্রাণ জগৎ লুকিয়েছিলো !

আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেলো। 'মেরুদেশে এসে পড়েছি তাহ'লে !'

'এখনো তা বলি না'। ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, 'সূর্য উঠলে দুপুরবেলা কম্পাস দেখে "নটিলাস"-এর অবস্থান স্থির করবো।'

ধূসর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললুম, 'এই কুয়াশার মধ্যে সূর্যের দেখা পাবেন ব'লে ভাবছেন ?'

'যতটুকু পাই তাই যথেষ্ট।'

মাইল দশেক দূরে ছোট্ট একটা দ্বীপ দেখতে পেলুম আমরা। 'নটিলাস' এর নৌকোয় ক'রে ক্যাপ্টেন নেমো আমাদের দ্বীপে নিয়ে গেলেন। নৌকো তীরে ভিড়তেই কোনসাইল লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিলো, আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'ক্যাপ্টেন নেমো, আপনি আগে নামুন। এখানে সর্বপ্রথম পদার্পণ করার গৌরব আপনারই প্রাপ্য।'

ক্যাপ্টেনের পিছন পিছন আমরাও নামলুম, কিন্তু দুপুর বারোটার সময়ও কুয়াশা ও ঘন বাষ্প ছিঁড়ে সূর্য দেখা দিলো না। তাই দ্বীপটার সঠিক অবস্থান না-জেনেই আমাদের ফিরে আসতে হ'লো।

পরের দিন বেলা নটার সময় যন্ত্রপাতি নিয়ে আবার আমরা ওই ছোট্ট দ্বীপে হাজির হলুম। বেলা বারোটার সময় কুয়াশার মধ্য দিয়ে আবছা দেখা গেলো সূর্যকে—ক্রনোমিটার এগিয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ঘোষণা করলুম, 'দুপুর বারোটা।'

'হ্যাঁ, দক্ষিণ মেরুই !' ব'লে দূরবিনটা আমার হাতে তুলে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য ঠিক আধখানা ফালি হ'য়ে আছে।

একটা কালো নিশেন উড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। কালোর মধ্যে সোনালি হরফে তাঁর নামের আদ্যক্ষর লেখা; সূর্যের শেষ শিখা প'ড়ে সেই সোনার অক্ষরটি জলজল করতে লাগলো।

তারপর সূর্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে শেষ রশ্মিটুকু লক্ষ্য ক'রে বললেন, 'বিদায় সবিতা, বিদায় ! এবার তুমি বিশ্রাম নাও এই স্বাধীন সমুদ্রের তলায়, মিলিয়ে

banglabooks.in

যাক তোমার নক্ষত্র হ্যাতি। তারপর আমার নতুন দেশে নেমে আসুক যাগ্মাষিক তমিস্রা।'

১৯

বনাম তুষারমরু

পর'দিন, বাইশে মার্চ, সকাল ছটা থেকেই ফেরবার আয়োজন শুরু হ'লো। সন্ধ্যালোকের শেষ ঝলশানিটুকু যেন নিকশ কালো রাত্রির মধ্যে গ'লে যাচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডায় আমরা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছি। আকাশে ক্রমশ তারাদের দীপ্তি বেড়ে যাচ্ছে. আর তারই মধ্যে ঝলমল করছে কুমেরুর সেই আশ্চর্য মেরুতারা।

জলাধারগুলি ভর্তি ক'রে জলের তলায় ডুব দিলে 'নটিলাস'। হাজার ফুট নিচে আস্তে. ঘণ্টায় পনেরো মাইল বেগে, ফিরে চললো উত্তর দিকে। সন্ধ্যা-বেলাতেই সে হিমশৈলের তলা দিয়ে ফেরা শুরু করলো।

রাত যখন তিনটে, এক দারুণ ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে বসতে-না-বসতেই আবার এক ঝাঁকুনির চোটে মেঝেয় ছিটকে পড়লুম আমি। কোনোরকমে দেয়াল ধ'রে-ধ'রে সেলুনে গিয়ে দেখি তখনো আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু সারা ঘরে যেন প্রলয় হ'য়ে গেছে একটু আগে। দেওয়ালের ছবিগুলো বেঁকে গেছে, ট্যারাবাঁকা হ'য়ে ঝুলছে তারা, আশবাবপত্র এলোমেলো ছিটকে পড়েছে। বোঝা গেলো 'নটিলাস' হঠাৎ কোনো-কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হ'য়ে প'ড়ে গেছে। বাইরে মস্ত শোরগোল শোনা গেলো, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর দেখা পাওয়া গেলো না। গভীরতা মাপবার যন্ত্রে দেখা গেলো তখনও এক হাজার ফুট নিচেই রয়েছি।

ক্যাপ্টেন নেমো এলেন একটু পরেই ; চোখমুখে দারুণ উদ্বেগের ছাপ। হঠাৎ একটি হিমশৈল নাকি উল্টে যাওয়ার সময় 'নটিলাস'-এর উপর এসে পড়েছে। এখন অবশ্য আস্তে-আস্তে ভেসে উঠছে পাহাড়টা, সেই সঙ্গে 'নটিলাস'কেও তুলে ধরছে একটু-একটু ক'রে. তার সেই জন্যেই 'নটিলাস' নাকি এখনো কাৎ হ'য়ে প'ড়ে আছে বরফের উপর। জলাধারগুলো খালি ক'রে ফেলে মাল্লারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে 'নটিলাস কে মুক্ত করতে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা তাতে একটুও কমছে না। 'নটিলাস'কে যে আস্তে-আস্তে তুলে ধরছে সেই হিমশৈল, তা গভীরতা মাপবার যন্ত্র দেখেই বোঝা গেলো, কারণ যন্ত্রে একটু-একটু ক'রে গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে। এই

banglabooks.in

তুলে-ধরা যদি বন্ধ করা না-যায় তাহ'লে জাঁতিকলের মধ্যে পড়বে 'নটিলাস', জাঁতার মধ্যে গম যেমন থেঁৎলে যায় তেমনিভাবে উপরের আর নিচের বরফের মধ্যে থেঁৎলে চ্যাপ্টা হ'য়ে যাবে।

কিন্তু আপাতত এই আশঙ্কাকে নস্যাৎ ক'রে একটা মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে আবার ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো দেয়ালগুলো। দশ মিনিটের মধ্যেই আগের মতো আবার জলের মধ্যে ভাসতে লাগলো জাহাজ। কিন্তু জানালা দিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়লো, তা আমাকে আতঙ্কে ভ'রে দিয়ে গেলো। উপরে-নীচে ডাইনে-বাঁয়ে চারপাশে বরফের অবরোধ, আর তারই মধ্যে এতটুকু সংকীর্ণ জলের মধ্যে ভাসছে 'নটিলাস'। হিমশুভ্র বরফের উপর তীব্র আলো এসে পড়েছে জাহাজ থেকে, আর প্রতিফলিত হ'য়ে তীব্র বিচ্ছুরণে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

আস্তে-আস্তে সামনে এগোতে থাকে 'নটিলাস'। কিন্তু তক্ষুনি যেন তীব্র আলোয় চোখ অন্ধ হ'য়ে গেলো। 'নটিলাস' চলছে ব'লেই সেই তীব্র শুভ্র প্রবল আলো যেন আরো বেশি ক'রে চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেলো। জানালা বন্ধ ক'রে দিয়েও প্রথমটায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না। যেন এই প্রবল বিচ্ছুরণ দৃষ্টিশক্তি হরণ ক'রে গেছে।

প্রাতঃকালে আবার ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি লাগলো; বুঝতে পারলুম বরফের দেয়ালে ঘা খেয়েছে 'নটিলাস'। এবার 'নটিলাস' ধীরে-ধীরে পিছোতে লাগলো খোলা জলের পথ পাবার জন্য। কিন্তু সাড়ে-আটটার সময় যখন পিছনেও আবার প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো, তখন বুঝতে পারলুম দক্ষিণে যাবার পথও আর নেই।

আর সেই কথাই গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন ক্যাপ্টেন নেমো। জানালেন, 'প্রফেসর আরোনা, আমরা আটকা পড়েছি। এবার তুষারমরুর সঙ্গে সরাসরি লড়াই ঘোষণা হ'লো।'

নেড আর কোনসাইল তখন সেখানে ব'সে ছিলো। ক্যাপ্টেন নেমোর কথা শেষ হবার আগেই নেড টেবিলের উপর এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলে। কোনসাইল টু শব্দটিও না-করে বিবর্ণ মুখে ব'সে রইলো। আমি কোনো কথা না-ব'লে ক্যাপ্টেন নেমোর দিকে তাকিয়ে রইলুম। বুকের উপর আড়াআড়িভাবে দু-হাত ভাঁজ ক'রে গম্ভীরভাবে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন তিনি—মুখবর্ণ পাণ্ডুর, শুধু চোখ দুটি অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলছে।

একটু পরেই ক্যাপ্টেন আমাদের এই বিপন্ন অবস্থার সব ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা ব্যাখ্যা ক'রে বললেন। পরিস্থিতি যে-রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে যদি চারপাশের

banglabooks.in

বরফের বিস্তার 'নটিলাস'কে চূর্ণ নাও করে, বাতাসের ট্যাঙ্কে যতখানি হাওয়া ধরে, তাতে দু'-দিন চলে 'নটিলাস'-এর। একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা জলের তলায় আছে 'নটিলাস', আর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বাতাসের ভাঁড়ারও ফুরিয়ে যাবে। ফলে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টাই সময় আছে হাতে—তারই মধ্যে যেমন ক'রে হোক এই বরফের অবরোধের মধ্যে পথ কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে 'নটিলাস'কে।

এর মধ্যেই 'নটিলাস'-এর বারোজন ডুবুরি একেকটা কুড়ুল হাতে বরফের মধ্যে নেমে পড়েছিলো। নেড ল্যাণ্ড আর ক্যাপ্টেন নেমোও গিয়ে কুড়ুল হাতে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এখানকার বরফ প্রায় তিরিশ ফুট পুরু : 'নটিলাস' যাতে গ'লে যেতে পারে, সেই জন্য যত বড়ো গর্ত খুঁড়তে হবে তার জন্য ৭০০০ ঘন-গজ বরফ সরানো দরকার। ক্ষিপ্রহাতে বরফ কাটা শুরু হ'লো। একেকটা বরফের চাঙড় মূল স্তূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে ডিগবাজি খেয়ে ভেসে উঠতে লাগলো উপর দিকে, আর একটু-একটু ক'রে পথ হ'তে লাগলো।

ঘণ্টা দুয়েক পর নেড ল্যাণ্ড ও অন্যান্যরা ক্লান্ত হ'য়ে বিশ্রামের জন্য ফিরে এলো ; এবার যাদের হাতে বরফ কাটার ভার পড়লো, তাদের মধ্যে আমি আর কোনসাইলও রইলুম। দু'-ঘণ্টা পরে বিশ্রামের জন্য 'নটিলাস'-এ ফিরে এসে শিরস্ত্রাণ খুলতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ইতিমধ্যেই 'নটিলাস'-এর বাতাস আস্তে-আস্তে ভারি আর দূষিত হ'য়ে উঠছে।

কিন্তু এভাবে কাজ ক'রে কোনো ফল হবে বলে মনে হ'লো না। প্রথমত ৭০০০ ঘন-গজ বরফ সরাতে হ'লে অন্তত পাঁচদিন ধ'রে একটানা বরফ কাটতে হবে আমাদের। অথচ হাওয়া ফুরিয়ে যাবে দু' দিনেই। আর, দ্বিতীয়, বরফ খুঁড়েই বা কি লাভ? কারণ এই নিদারুণ ঠাণ্ডায় কিছুক্ষণের মধ্যেই টলমলে জলও বরফ হ'য়ে জ'মে যাচ্ছে— যেখানটাই খুঁড়ছি, সেখানটায় পরক্ষণেই আবার বরফের রাশি নিরেট কঠিন ধবল অট্টহাসির মতো জ'মে যাচ্ছে—যেন কোনো তুহিনদন্তিল নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ ক'রে, যেন এই পাষাণ তুষারমরু আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদ্দেশ করেই ধবল হাস্যে ফেটে পড়ছে!

আর নিষ্ফল চেষ্টার মধ্যেই পরদিন উপস্থিত হ'লো বাতাসের অভাবে শ্বাসকষ্ট। সেই সঙ্গে আরো ভয়ংকর বিপদের পূর্বাভাস হিসাবে দেখা গেলো বরফের ছাদ ও দু'পাশের দেওয়াল রাতারাতি আরো পুরু হ'য়ে উঠেছে আর অনেকখানি এগিয়ে এসেছে 'নটিলাস'-এর দিকে। জাহাজের সামনে পিছনে বোধহয় দশ ফুট ক'রেও জল নেই।

banglabooks.in

ক্যাপ্টেন নেমো আর-একটি সমাধান বের করলেন মাথা খাটিয়ে। 'নটিলাস,-এর বড়ো-বড়ো চুল্লিতে জল গরম করে সেই টগবগে জল পিচকিরির মতো চার-পাশের দেয়ালে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলো তাপমাত্রা, অবস্থা ঈষৎ নিয়ন্ত্রণে এলো। রাত্রির মধ্যেই তাপমাত্রা উঠে এলো শূন্যাঙ্কের এক ডিগ্রি নিচে। শূন্যাঙ্কের দু'-ডিগ্রি নিচে জল জ'মে বরফ হয় ব'লে আপাতত আর বরফের দেয়ালের চাপে পিষ্ট হ'য়ে মরার ভয় রইলো না। কিন্তু ভীষণ হয়ে উঠলো শ্বাসকষ্ট।

মাত্র চার ঘন-গজ বরফ খুঁড়লেই 'নটিলাস' পথ পাবে, সাতাশে মার্চ আমরা এই অবস্থায় পৌঁছুলুম। আরো দু'-দিন দু'-রাত একটানা পুরো খাটলে হয়তো এই চার-গজ বরফের মধ্যে ছ্যাঁদা করা যাবে। কিন্তু আর যে মোটেই বাতাস নেই। বেলা তিনটের সময় আমার চেতনা যেন বিলুপ্ত হ'য়ে এলো। অন্যদের অবস্থাও কিছু ভালো নয়। তবু তারই মধ্যে পুরোদমে কাজ চললো। হাঁশফাঁশ ক'রে নিশ্বাস নিচ্ছি আমরা, ঘূর্ণিরোগাক্রান্তের মতো টলছি, প্রচণ্ড ব্যথায় মাথার ভিতরটা ছিঁড়ে পড়তে চাচ্ছে ; তবু তারই মধ্যে অনেকটা কাজ এগিয়েছে আমাদের : আর মাত্র দু'-গজ বরফ কাটতে হবে।

ছ'দিন হ'লো এই ভাবে বন্দী হ'য়ে আছি। ক্যাপ্টেন নেমোরও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তিনি এমন অবিচল আছেন যে তাঁকে দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই। যখন আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, তখন নেমো মরিয়া হ'য়ে স্থির করলেন শেষ স্তরটুকু তিনি 'নটিলাস'কে পূর্ণবেগে চালিয়ে বরফের দেয়াল ভেঙে চুরমার ক'রে বেরিয়ে যাবেন। 'নটিলাস'-এর জলাধারে জল ভরা হ'লো, ক্রমশ ভারি হ'য়ে উঠলো 'নটিলাস'। তারপরেই প্রচণ্ড শব্দে, বিস্ফোরকের মতো, বরফের স্তর কাটিয়ে 'নটিলাস' নিচে ডুবে গেলো।

পূর্ণবেগে উত্তরদিকে ছুটে চললো 'নটিলাস'। কিন্তু আর কতক্ষণ এভাবে থাকবে ? আরো একটা দিন ? পুরো একটা দিন ? ততক্ষণ আমরা বেঁচে থাকতে পারবো ?

আমার আর হুঁশ ছিলো না, আচ্ছন্নের মতো প'ড়ে আছি 'নটিলাস'-এর সেলুনে, আর কোনসাইল ও নেড তাদের জীবন বিপন্ন ক'রে আমার নাকের কাছে ছোট্ট একটা অক্সিজেনের টিউবের শেষ বাতাস-টুকু ধ'রে আছে।

মাত্র বিশ ফুট বরফের তলা দিয়ে যাচ্ছিলো তখন 'নটিলাস'। হঠাৎ জাহাজের পিছন দিকটা হেলে পড়লো, মাথা উপর দিক ক'রে মস্ত ছুরমুশের মতো প্রচণ্ড

banglabooks.in

বেগে 'নটিলাস' আছড়ে পড়লো বরফের ছাদে। তারপর একটু পিছিয়ে আবার সেই আগের জায়গাতেই হাতুড়ির মতো ধাক্কা খেয়ে বরফ ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে গেলো 'নটিলাস'। আর তক্ষুনি হু-হু ক'রে উনপঞ্চাশ পবনের বেগে ভিতরে ঢুকলো খোলা হাওয়া।

'নটিলাস'-এর বহির্দ্বার খুলে দেয়ায় খোলা হাওয়া এসে ঢুকছে বাঁধভাঙা বন্যার মতো।

২০

গরগনের নাগকুণ্ডলী

উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে আমাজন পর্যন্ত চঞ্চল 'নটিলাস' ছুটে এসেছে; কিন্তু আমেরিকার উপকূলের কাছে যাচ্ছে না কখনোই; হয়তো তীরের কাছে যাওয়া বা উপকূলের জাহাজের মুখোমুখি পড়ার কোনো দৈব সুযোগ করে দেয়াও ক্যাপ্টেন নেমোর অভিপ্রেত নয়।

বিশে এপ্রিল বাহামার কাছে দিয়ে সাতশো ফ্যাদম জলের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলো 'নটিলাস,' আর তার বৈদ্যুতিক আলোয় কালো জল আলো হ'য়ে উঠে-ছিলো।

নেড ল্যাণ্ড যখন আমাকে জানলায় ডেকে নিয়ে গেলো, তখন বেলা এগারোটা বাজে।

'দেখুন, কী ভীষণ জানোয়ার?'

ভীষণই বটে! যেন কিংবদন্তির পাতা থেকে উঠে এসেছে সমুদ্রের এই অষ্টবাহু ড্র্যাগন। অতিকায় একটা কালামারি সে, বোধ হয় বত্রিশ ফিট হবে দৈর্ঘ্যে। প্রচণ্ড বেগে সে ছুটে আসছিলো 'নটিলাস'-এর দিকে। রোষে জ্ব'লে উঠেছে তার সবুজ চোখ দুটি, মাথা থেকেই বেরিয়েছে তার আটটি কদাকার ও ভয়ানক পাশ, গরগনের নাগকুণ্ডলীর মতো মাথা থেকেই তা কিলবিল ক'রে জলে আছড়াচ্ছে। তার কঠিন চঞ্চুটা কেবলি খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে—আর ধারালো দাঁতে সাজানো তার কঠিন জিভটি লকলক ক'রে বেরিয়ে আসছে। অন্তত পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড ওজন হবে এই সিন্ধুদানবের। ভীষণ রোষে মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছে তার গায়ের রঙ—এই ধূসর, আবার পরমুহূর্তেই লালচে বাদামি।

'নটিলাস'-এর উপস্থিতিই যে তার এই প্রবল রোষের কারণ তা বুঝতে

banglabooks.in

আমাদের দেরি হ'লো না। আট হাতে সে জড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে 'নটিলাস'কে ; কাচের ওপাশে বিষম রোষে সে প্রচণ্ডভাবে আছড়াচ্ছে তার অষ্ট পাশ। আর ইস্পাতে-মোড়া জাহাজকে মোটেই আঁকড়ে ধরতে পারছে না ব'লে আরো ক্রুদ্ধ ও প্রচণ্ড হ'য়ে উঠছে প্রতিমুহূর্তে।

দৈবই আমাকে এই ভীষণ দানবের সম্মুখীন ক'রে দিলে। এই সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করা উচিত হবে না। ভয় জয় ক'রে তাই কাগজ পেন্সিলে তার একটা ছবি আঁকতে ব'সে গেলুম আমি। ততক্ষণে জানলার ওপাশে আরো কতগুলি সিন্ধু-দানবের আবির্ভাব হয়েছে, যেন কোনো বিক্ষুব্ধ মিছিল ক'রে তারা জলের এই নূতন জন্তুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এলো। লোহার চাকায় তাদের চঞ্চুর মুহুর্মুহু আঘাত শোনা গেলো। গুণে দেখি সংখ্যায় তারা সাত : সবাই ক্ষিপ্তের মতো 'নটিলাস'কে আক্রমণ করতে চাচ্ছে।

হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠেই 'নটিলাস' নিশ্চল হয়ে গেলো।

'কল খারাপ হ'য়ে গেলো নাকি ?' জিগেস করলুম আমি।

'বোধ হয় না,' নেড বললে, 'কারণ "নটিলাস" তো ভেসেই আছে।'

ভেসে আছে বটে, কিন্তু এগোচ্ছে না। চাকা ঘুরছে না আর। পরক্ষণেই ফার্স্ট অফিসারকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নেমো। অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তাভারাতুর তাঁর মুখ। আমাদের দিকে দৃকপাত না-ক'রেই সোজা জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন তিনি—সেই অক্টোপাসগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর সেই দুর্বোধ্য জটিল ভাষায় কতগুলো নির্দেশ দিলেন তিনি। তারপর জানলার উপর লোহার পর্দা ফেলে দেয়া হ'লো। ফার্স্ট-অফিসার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মাঝখানে অনেকদিন ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। অত্যন্ত বিমর্ষ দেখালো তাঁকে, ঈষৎ শোকাকুল।

তখনও ভয়ংকর বিপদটা সম্বন্ধে সচেতন হইনি আমি।

'অনেকগুলো অক্টোপাস জড়ো হয়েছে দেখছি।'

'হ্যাঁ, প্রফেসর। আর এদের সঙ্গেই হাতাহাতি লড়তে হবে আমাদের।'

'হাতাহাতি ?'

'হ্যাঁ, কারণ ওদের শুঁড়ে পেঁচিয়ে গিয়েই "নটিলাস"-এর চাকা বন্ধ হ'য়ে গেছে।'

'কিন্তু—'

'ওদের শরীর এত নরম যে আমার বৈদ্যুতিক গুলি কোনো কাজেই আসবে

banglabooks.in

না—কারণ কোনো বাধা না-পেলে, ধাক্কা না-লাগলে, ওই গুলি ফাটে না। কাজেই কুড়ল দিয়েই লড়াই করতে হবে আমাদের।'

'আর হারপুন?' নেড যুদ্ধের সম্ভাবনায় লাফিয়ে উঠলো। 'অবিশ্যি যদি আমার সাহায্য সম্বন্ধে আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।'

'কোনোই আপত্তি নেই, মিস্টার ল্যাণ্ড।'

'নটিলাস' ততক্ষণে জলের উপর ভেসে উঠেছে। 'নটিলাস'-এর একটি মাল্লা বহির্দ্বার খুলে দিলে। সঙ্গে-সঙ্গে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কিলবিল ক'রে নেমে এলো একটা মস্ত সাপের মতো শুঁড়—কিংবা তাকে বাহুও হয়তো বলা যায়; আর মাথার উপর আরো কতগুলো শুঁড় দুলতে লাগলো। কুড়ুলের এক ঘায়ে সেই ভয়ংকর বাহুটা দু-টুকরো ক'রে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো।

প্ল্যাটফর্মে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় ভীষণ কাণ্ড হ'লো। আচম্বিতে একটা শুঁড় নেমে এসে সিঁড়ির কাছের সেই মাল্লাটিকে পাকে পাকে পেঁচিয়ে নিয়ে এক হ্যাঁচকা টানে বাইরে তুলে নিয়ে গেলো। চীৎকার ক'রে উদ্যত কুঠার হাতে ক্যাপ্টেন নেমো তার অনুসরণ করলেন। আমরাও পিছন পিছন উঠে এলুম।

সেই ভীষণ দৃশ্য ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। শুঁড়ে পেঁচিয়ে সেই হতভাগ্য লোকটাকে শূন্যে দোলাচ্ছে সেই ভয়ংকর অক্টোপাস আর সেই অবস্থাতেই আর্তকণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠছে: 'বাঁচাও! বাঁচাও!' ফরাসি ভাষায় সেই আর্তনাদ শুনে আমি চমকে উঠলুম। 'নটিলাস'-এ এতদিন তাহ'লে আমি ছাড়া আরো-একজন ফরাসি ছিলো, আর আজ মৃত্যু তার উদ্দেশে থাবা বাড়িয়েছে!

আট বাহুর ভীষণ বাঁধনে লোকটা হারিয়ে গেলো। কে তাকে ওই মরণ-আলিঙ্গন থেকে বাঁচাব?

ক্যাপ্টেন নেমো কুঠার তুলে লাফিয়ে পড়লেন অক্টোপাসটার উপর, আরেকটা বাহু ছিন্ন ক'রে দিলে তাঁর কুঠার। ফার্স্ট-অফিসারটি তখন অন্য অক্টোপাসগুলোর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ ক'রে চলেছেন। তিনজনে—নেড, কোনসাইল আর আমি পাগলের মতো কুঠার চালাচ্ছি তখন। সাতটা বাহু কেটে ফেলার পরও শেষ বাহুটায় লোকটাকে শূন্যে তুলে ধ'রে নাড়াচ্ছে সেই সিন্ধুদানব। কিন্তু যেই ক্যাপ্টেন নেমো তার দিকে ছুটে গেলেন, অমনি তার পেটের থলি থেকে ঘন কালো রঙের একরকম কালি উগরে দিলে সেই অক্টোপাস, আমাদের চোখ যেন অন্ধ হ'য়ে গেলো। যখন দৃষ্টি ফিরে পেলুম ততক্ষণে সেই কালামারি জলের তলায় পালিয়েছে, আর সেই হতভাগ্য মাল্লাটির কোনো চিহ্নই নেই আশপাশে

banglabooks.in

রাগে ক্ষোভে জ্ঞানশূন্যের মতো বাকি কালামারিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম আমরা। সেই সর্পকুণ্ডলীর মতো বাহুগুলো ছিটকে পড়তে লাগলো কুঠারের ঘায়ে, রক্তে আর কালো কালির স্রোতে প্ল্যাটফর্ম ভেসে গেলো। কিছুতেই যেন সেই ভীষণ শুঁড়ের অরণ্য ফুরোয় না—যেন ছিন্ন বাহুমূল থেকেই নতুন বাহু গজাচ্ছে বারে-বারে। নেড ল্যাণ্ড তার হারপুন আমূল বসিয়ে দিচ্ছে কালামারিগুলোর সবুজ চোখে। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে একটা শুঁড় তাকেও পেঁচিয়ে ধরলো কঠোর-ভাবে, আতঙ্কে ও বিভীষিকায় আমার বুক যেন তখন ফেটে যাবে, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর কুঠার তড়িৎবেগে দু-টুকরো ক'রে ফেললো সেই ভীষণ শুঁড়, আর মৃত্যু-পাশ থেকে বেরিয়ে এসে নেড তার হারপুন আমূল বসিয়ে দিলে সেই কালামারির তিন হৃৎপিণ্ডে।

'শোধবোধ হ'লো,' ক্যাপ্টেন নেমো বললেন নেড ল্যাণ্ডকে।

নেড কোনো কথা না-ব'লে হারপুন চালাতে-চালাতেই একটু নুয়ে তাঁকে অভিবাদন করলে।

কেউ যদি জিগেস করে তোমার জীবনে ভীষণতম পনেরো মিনিট কবে এসে-ছিলো, তাহ'লে এই ভয়ংকর যুদ্ধের কথাই বলবো আমি। পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব তছনছ হ'য়ে গেলো। অক্টোপাসগুলো বিধ্বস্ত হ'য়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লো, আর ঢেউয়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলো তাদের ছিন্ন দেহ। আর ক্যাপ্টেন নেমো রক্ত মেখে ঘেমে নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন প্ল্যাটফর্মে, যে-সমুদ্র তাঁর একজন অনুচরকে গিলে খেলো তার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখ বেয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়লো।

২১

'নটিলাস'-এর রোষ

ভিক্তর য়ুগো ছাড়া আর-কারো লেখনীই বোধ করি বিশে এপ্রিলের এই ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে অক্ষম। অন্তত আমি যে যা ঘটেছিলো তার কিছুই ফুটিয়ে তুলতে পরি নি তা খুব ভালো ক'রেই জানি। আর ক্যাপ্টেন নেমোর বিষাদ, বিলাপ ও অস্থিরতা ফোটাবার ক্ষমতাও কবি ছাড়া আর-কারো নেই; আর সেই কবিকেও নিশ্চয়ই মহাকবি য়ুগোর মতোই নিপুণ হ'তে হবে।

banglabooks.in

ইতিমধ্যে আমেরিকার সিন্ধুসলিল ছাড়িয়ে এসেছে 'নটিলাস' ; য়ুরোপের উপকূল ধ'রেই চলেছি এখন আমরা। 'নটিলাস' কখনো জলের উপর ভেসে ওঠে, কখনো ডুব দিয়ে যায় অনেক দূর অবধি। পয়লা জুন 'নটিলাস' যখন ভেসে চলেছে এমন সময় হঠাৎ যেন গুমগুম ক'রে মেঘ ডেকে উঠলো। স্বচ্ছ নীল আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই ; অথচ তাহ'লে এ কীসের শব্দ ?

নেড, কোনসাইল আর আমি তখন প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়েছিলুম। হঠাৎ পুবদিকে তাকাতেই দেখি মস্ত একটা কলের জাহাজ পূর্ণবেগে আমাদের দিকে ধাবমান— কয়েক মাইল দূর থেকেও দেখা গেলো তার চিমনি দুটো দিয়ে ভলকে-ভলকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

'কিসের শব্দ হ'লো, নেড ?' আমি জিগেস করলুম।

'কামানের।'

'কীসের জাহাজ ওটা, জানো ?'

'দূর থেকে দেখে তো যুদ্ধজাহাজ ব'লেই মনে হয়। বোধ হয় আমাদের ডুবিয়ে দিতে চায়। এই জঘন্য "নটিলাস"-কে যদি ওরা জখম করতে পারে তো আমার কোনো ক্ষোভ নেই।'

'কোন দেশের জাহাজ, বুঝতে পেরেছো ?'

ভুরু কুঁচকে একটু তাকিয়ে নেড বললে, 'কোনো নিশেন তো দেখতে পাচ্ছি না। কোন দেশের জাহাজ বলা মুশকিল।'

জাহাজটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে, বেশ দ্রুত তার গতি, কিন্তু তবু কোনো নিশানেরই হদিশ পাওয়া গেলো না। নেড ব'লে উঠলো, '"নটিলাস"-এর এক মাইল দূর দিয়ে গেলেও আমি সাঁৎরে গিয়ে উঠবো জাহাজটায়। আপনাদেরও তা-ই করতে পরামর্শ দিই।'

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই জাহাজের গলুয়ের কাছে খানিকটা শাদা ধোঁয়া জেগে উঠলো। পরক্ষণেই 'নটিলাস'-এর পাশে জলে কী একটা যেন বিপুল শব্দে আছড়ে পড়লো—বিস্ফোরণের শব্দটা কানে এলো তার পরেই।

'কী সাংঘাতিক ! তাহ'লে ওরা যে আমাদের দিকে কামান দাগছে !'

'ভালোই তো ! তাহ'লে ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে—জাহাজডুবির পর ভেলায় ভাসছি ব'লে ভুল করেনি—এই মস্ত তিমিঙ্গিলকে দেখেই তারা কামান দাগছে !'

নেড ভুল বলে নি ! সত্যি, এতদিনে সারা জগৎ নিশ্চয়ই এই ডুবোজাহাজের

banglabooks.in

কথা জেনে গেছে। 'আব্রাহাম লিঙ্কন' থেকে নেড যে-হারপুন ছুঁড়েছিলো, তা যে 'নটিলাস'-এর ইস্পাতের খোল ভেদ করতে পারে নি তা দেখেই নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট বুঝতে পেরেছিলেন কীসের পিছনে তিনি ছুটেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের যুদ্ধজাহাজ নিশ্চয়ই এতদিনে এই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটার খোঁজে হন্যে হ'য়ে উঠেছে।

আমাদের চারপাশে তখন বৃষ্টির মতো কামানের গোলা এসে পড়ছে! এখনো বেশ দুরে আছে ব'লেই কোনো গোলাই 'নটিলাস'-এর গায়ে এসে পড়ছে না। কিন্তু আশ্চর্য! গোলার শব্দ শুনেও 'নটিলাস'-এর লোকজনেরা কোনো কৌতূহল প্রকাশ করছে না কেন? ক্যাপ্টেন নেমোই বা কী করছেন?

নেড চেঁচিয়ে উঠলো, 'এই সুযোগে "নটিলাস" থেকে পালাতেই হবে আমাদের। আসুন, ওদের সংকেত করি। হয়তো ওরা বুঝতে পারবে যে আমরা নির্বিরোধী সৎ মানুষ।' ব'লে পকেট থেকে রুমাল বের ক'রে নেড নাড়তে যাবে, এমন সময় কার কঠিন হাতের ধাক্কায় নেডের মতো পালোয়ানও ছিটকে পড়লো প্ল্যাটফর্মে!

'পাষণ্ড!' বাজের মতো ফেটে পড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো। 'তুমি কি চাও যে "নটিলাস"-এর খড়্গ দিয়ে ওই জাহাজটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করার আগে তোমাকেই আমি গেঁথে ফেলি!' সেই কণ্ঠস্বর যত না ভীষণ, তার চেয়েও ভীষণ তাঁর দেহচ্ছবি। রক্তহীন শাদা তাঁর মুখ, চোখের তারা দুটি মশালের মতো উজ্জ্বল। নেডের কাঁধ ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন ক'রে উঠলেন তিনি। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে ওই জাহাজকে উদ্দেশ্য ক'রে মেঘের মতো গ'র্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন নেমো: 'তুমি তা'হলে জানো আমি কে! তুমি তা'হলে জানো "নটিলাস" কোন অভিশপ্ত জাতির জাহাজ! তোমাকে চিনতে আমার দেরি হয় নি, তোমার পতাকা না-দেখেও তোমাকে আমি চিনি। কিন্তু এই ছাখো আমার নিশেন—তোমাকে আজ দেখাই।' বলেই দক্ষিণমেরুতে তিনি যে-নিশেন উড়িয়েছিলেন ঠিক তেমনি একটি কালো নিশেন উড়িয়ে দিলেন 'নটিলাস'-এর উপর।

বোধ হয় তাঁর কথার উত্তরেই 'নটিলাস'-এর হালের উপর দারুণ শব্দে একটা গোলা এসে পড়লো—প'ড়েই ছিটকে তাঁর পাশ দিয়ে সমুদ্রের জলে আছড়ে পড়লো। কাঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন নেমো। আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, 'নিচে যান আপনি, সঙ্গীদের নিয়ে নিচে চ'লে যান।'

'আপনি কি জাহাজটাকে আক্রমণ করবেন ক্যাপ্টেন?' আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

'আক্রমণ নয়—আমি ওকে ডুবিয়ে দেবো।'

banglabooks.in

'না, না, তা করবেন না—'

'করবোই।' ঠাণ্ডা হিম তাঁর গলা, 'এ-সম্বন্ধে আপনাকে কোনো মতামত দিতে হবে না। যা আপনার কোনোদিনই দেখার কথা নয়, নিয়তি আজ তারই মুখো-মুখি করেছে আপনাকে। আক্রমণ ওরা করেছে—প্রত্যুত্তর হবে ভয়ংকর। নিচে চ'লে যান।'

'কোন দেশের জাহাজ ওটা? কোথাকার?'

'আপনি জানেন না? আরো ভালো—অন্তত জাহাজটা কোন দেশের, এই রহস্য আপনার কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে। নিচে যান।'

এই আদেশ মান্য না-ক'রে উপায় ছিলো না। ততক্ষণে 'নটিলাস'-এর আরো পনেরোটি মাল্লা এসে ক্যাপ্টেন নেমোকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে—সেই ধাবমান জাহাজটির দিকে সেই একই প্রতিহিংসার দৃষ্টি নিয়ে অপলকে তাকিয়ে আছে তারা, কোনো পরম ঘৃণায় আর রোষে তারা যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে প্রত্যেকে। নিচে নামতে নামতে শুনলুম আরো একটি গোলা এসে আছড়ে পড়লো 'নটিলাস'-এর উপর, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন নেমো রোষে গর্জন ক'রে উঠলেন: 'আরো হানো তোমার গোলা, আরো। যত পারো নষ্ট করো তোমার ব্যর্থ গোলা। কিন্তু এটা জেনে রেখো, "নটিলাস"-এর খড়্গকে এড়াবার ক্ষমতা তোমার নেই!'

আর সহ্য হ'লো না, ছুটে চ'লে এলুম আমার ঘরে। 'নটিলাস'-এর গতি বৃদ্ধি পেলো, বোঝা গেলো 'নটিলাস' কামানের পাল্লা থেকে দূরে স'রে যাচ্ছে। ওই যুদ্ধজাহাজ হন্যে হ'য়ে ঘুরুক 'নটিলাস'-এর পিছনে, তারপর 'নটিলাস' এক সময় তার অমোঘ উত্তর দেবে—প্রচণ্ড সেই উত্তর চুরমার ক'রে ফেলবে ওই জাহাজ।

এই পরিণতি অনিবার্য। আমি জানি। ক্যাপ্টেন নেমো যেন আদিম দেবতা-দের মতো গ'র্জে উঠেছেন এখন, কোনো বন্য দেবতা—চরম তাঁর রোষ যখন খড়্গের মতো নামে, তখন নিস্তার নেই। তাঁর চোখ অলাতচক্রের মতো জ্ব'লে উঠেছে, আর তাই দেখেই বুঝেছি আমি। প্রকৃতির আদি শক্তিগুলো যখন জেগে ওঠে, বাজ বরুণ আগুন যখন ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, তখন কে তাদের ঠেকাবার সাধ্য রাখে।

এই উন্মাদ জাহাজ ছেড়ে পালাতেই হবে আমাকে। এতদিন নেডের প্রস্তাব আমার সম্পূর্ণ মনঃপূত হয়নি, কিন্তু এখন আর কোনো সংশয় নেই।

আর সঙ্গে-সঙ্গে কানে এলো জলাধারে জল ঢোকার শব্দ। 'নটিলাস' জলে ডুব দিচ্ছে। আক্রমণটা তাহ'লে জলের তলা থেকেই হবে? রাতের অন্ধকারে 'নটিলাস'-এর খড়্গ আক্ষরিকভাবে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দেবে ওই জাহাজকে! হঠাৎ

banglabooks.in

অনুভব করলুম 'নটিলাস' যেন পাগল হ'য়ে উঠলো—প্রচণ্ড হ'য়ে হ'য়ে উঠলো তার গতিবেগ, থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো সমস্ত জাহাজ। তারপর একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি লাগলো শুধু—আর কিছু নয়।

উন্মাদের মতো সেলুনে গিয়ে ঢুকলুম। গিয়ে দেখি জানলার পাশে ক্যাপ্টেন নেমো দাঁড়িয়ে আছেন—একা, গম্ভীর, নিশ্চুপ, অদ্ভুত দুর্ভেদ্য, বিষণ্ণ। তাকিয়ে দেখছেন কেমন ক'রে অত বড়ো যুদ্ধজাহাজটা ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে।

আস্তে ডুবছে জাহাজটা ; একটু-একটু ক'রে জল ঢুকছে তার পাটাতনে—তার-পরেই মস্ত একটা বিস্ফোরণে গোটা পাটাতনটা চৌচির হ'য়ে উড়ে গেলো। তার-পর জাহাজটা দ্রুত নেমে এলো সিন্ধুতলে। আর্ত মানুষ, সমরসজ্জা, মস্ত হাল, ঘূর্ণমান চাকা—সব তলিয়ে গেলো অথৈ জলে, সেখানে সিন্ধুতলের বালি তাদের জন্য সমাধি রচনা ক'রে অপেক্ষা ক'রে আছে।

ক্যাপ্টেন নেমোর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি অকম্পিত তিনি লক্ষ্য করলেন সব কিছু। সব যখন শেষ হ'য়ে গেলো নিজের সেই সন্ন্যাসীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। দেয়ালে সারি-সারি ঝুলছে চিরযুগের বীরপুরুষদের ছবি : আর তারই তলার আরো-একটা ছবির তলায় দুই হাত প্রসারিত ক'রে আর্ত মানুষের মতো নতজানু হ'য়ে ব'সে পড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো।

ছবির ফ্রেমের মধ্য থেকে এক তরুণী মহিলা আর দুটি ছেলেমেয়ে অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন দেখলো এই মস্ত মানুষটির দেহ কোন প্রবল কান্নার বেগে বারে-বারে দুলে উঠলো।

২২

পাগল হে নাবিক !

ঝপঝপ ক'রে বন্ধ হ'য়ে গেলো সবগুলি জানলা। 'নটিলাস'-এর ভিতরটা অন্ধকার আর থমথমে ! পাগলের মতো এই ভয়ংকর পাতাল ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছে 'নটিলাস' —কিন্তু বিবেকের হাত থেকে সে পালাবে কোথায় ?

খ্যাপা জানোয়ারের মতো কখনো সে ভেসে ওঠে, কখনো সে ডুব দেয়, আর সারাক্ষণ প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলে। যেন অমোঘ বিবেকের দংশন এড়িয়ে পালাতে চাচ্ছে কোনো আর্ত, ব্যর্থ, ব্যাকুল মানুষ।

banglabooks.in

এক-এক ক'রে কুড়ি দিন কেটে গেলো একই ভাবে। দিন নেই, রাত্রি নেই, শুধু এক ভয়ংকর গতি সর্বক্ষণ। কারো দেখা মেলে না। আমরা তিন দৈবাহত যাত্রী শুকনো মুখে ব'সে থাকি। আর রাতের বেলায় শুনি পাগল অর্গ্যানের আর্ত কলরোল। সময় নেই, অসময় নেই ঝমঝম ক'রে কেবল আর্ত হৃৎপিণ্ডের মতো কাঁদে ওই অর্গ্যান। যেন কোনো শনিতে-পাওয়া দিনরাত্রি হানা দিয়েছে এখানে।

আর নয়। পালাতেই হবে।

স্বপ্নের ঘোরে শুনি নি কথা কটি ; ধড়মড় ক'রে উঠে ব'সে দেখি নেড আমার উপর ঝুঁকে প'ড়ে ফিশফিশ ক'রে বলছে, 'আর নয়। পালাতেই হবে। এবং আজ রাতেই।'

'কখন ?' আস্তে শুধোলুম।

'রাত্রে। ওরা পাহারা সরিয়ে নিয়েছে। অথচ ডাঙা এখান থেকে কাছেই। কুয়াশার মধ্যে ঝাপসা দেখতে পেয়েছি আমি—কয়েক মাইল দূরে কালো তীরের রেখা।'

'তা-ই হবে। আজ রাতেই পালাবো।'

'নটিলাস' তখন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উপকূল ধ'রে যাচ্ছে। সারা দিন ধ'রে আমি শেষবার ঘুরে বেড়ালুম 'নটিলাস'-এর ঘরে-ঘরে। তার গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা, রত্নগৃহ —সমস্ত এই দশ মাসের স্মৃতিতে ভ'রে আছে। আমার দিনলিপিতে প্রতিদিনের কথা লেখা আছে, কিন্তু তবু কেমন অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে সারা দিন কেটে গেলো।

রাত্রে খাবার সময় নেড চুপিচুপি জানিয়ে দিলে যে সাড়ে দশটায় চাঁদ উঠবে, তার আগেই অন্ধকার থাকতে-থাকতে পালাতে হবে আমাদের।

আর রাতের অন্ধকারেই আবার কোন অফুরন্ত কান্নার প্রস্রবণ খুলে গেলো—বেজে উঠলো বিষণ্ণ অর্গ্যান।

সর্বনাশ !

ক্যাপ্টেন নেমো সেলুনে আছেন এখন—অথচ ওখান দিয়েই যে আমাকে যেতে হবে। ভয় করি আমি তাঁকে, তাঁর মুখোমুখি দাঁড়ালে আমি দুর্বল হ'য়ে যাবো—এই আর্ত মানুষটিকে ছেড়ে তাহ'লে আর আমার পালানো হবে না।

সেলুনের ভিতরে সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখি নিশমিশে অন্ধকারে ভূতের মতো ব'সে আছেন তিনি অর্গ্যানে—ঝমঝম সেই আর্ত ক্রন্দনের মধ্যে যেন কোনো-এক তৃতীয় ভুবন হাৎড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। আস্তে সেলুন পেরিয়ে এলুম আমি, পা টিপে-টিপে, সন্তর্পণে।

banglabooks.in

লাইব্রেরির দরজা খুলে বেরিয়ে পড়বো, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমোর বুক চিরে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। কে যেন আমাকে পেরেক ঠুকে আটকে দিলে সেখানে। দেখলুম উঠে দাঁড়ালেন তিনি আস্তে; নিঃশব্দে, বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ ক'রে, প্রেতের মতো এগিয়ে এলেন তিনি। আর তাঁর আর্ত হৃদয় ছিঁড়ে এই কটি যন্ত্রণাহত কথা বেরিয়ে এলো। 'হা ভগবান! যথেষ্ট! যথেষ্ট। আর নয়!'

মরিয়া হ'য়ে লাইব্রেরির মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে কয়েক লাফে সিঁড়ি টপকে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেলুম। সেখানে নৌকোর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়তেই দেখলুম নেড আর কোনসাইলও আগে থেকে এসে ব'সে আছে সেখানে। আমার চেতনা তখন আচ্ছন্ন। সেই অনুতপ্ত কথা কটি এখনো যেন গুমরে উঠছে আমার দুই কানে।

'শিগগির। বেরিয়ে পড়ো, এক্ষুনি!' রুদ্ধশ্বাসে ব'লে উঠলুম আমি।

নেড হালে বসলো, আর কোনসাইল আংটা খুলে দিলে সন্তর্পণে। আর তক্ষুনি এক দারুণ কোলাহল উঠলো জাহাজে।

তবে কি ওরা জেনে ফেলেছে যে আমরা পালাচ্ছি! নেড তাড়াতাড়ি আমার হাতে একটা ছোরা গুঁজে দিলে। আর তখনই একটা প্রবল শোরগোল কানে এলো। 'মেলস্ট্রম! মেলস্ট্রম!'

কী সর্বনাশ! মেলস্ট্রম!

আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ হিম হ'য়ে এলো। শেষকালে নরোয়ের উপকূলের সেই ভীষণ ঘূর্ণিপাকে এসে পড়লুম, যার হাত থেকে এমনকি মস্ত জাহাজেরাও রেহাই পায় না সচরাচর। কিন্তু পরক্ষণেই বোঁ ক'রে ঘুরপাক খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো নৌকোটা, আর লোহার ফ্রেমে দারুণভাবে ঘা খেয়ে আমি আর্তনাদ ক'রে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেলুম!

২৩

পুনশ্চ

চেতনা ফিরে এলো নরোয়ের উপকূলের এক ধীবরের গৃহে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি নেড আর কোনসাইল উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে ঝুঁকে আছে।

কী ক'রে যে সে-রাতে ওই ভীষণ ঘূর্ণিপাকের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি, তা আমরা কেউই জানি না।

banglabooks.in

লোফোডেন আইল্যাণ্ডের এই ধীবরের গৃহে ব'সে-ব'সে দু'-মাস ধ'রে ফ্রান্স-গামী জাহাজের প্রতীক্ষা করতে-করতে আমার এই দশমাস জোড়া অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখে ফেললুম। এখানে একটা কথাও নেই যা অতিরঞ্জিত, কি বিকৃত, কি অলীক কল্পনা। বরং বোধ হয় ঊনকথনের দোষই হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু 'নটিলাস'-এর কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। বারেবারে ওই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটি হানা দেয় আমার মনের মধ্যে।

'নটিলাস'-এর কী হ'লো? মেলস্ট্রমের ওই ভীষণ মরণ-আলিঙ্গন থেকে সে কি বেরিয়ে যেতে পেরেছে? আর ক্যাপ্টেন নেমো? তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন? এখনো তিনি কি তাঁর প্রচণ্ড ও আর্ত হৃদয় নিয়ে প্রতিহিংসার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? না কি আবর্তমান সিন্ধুজলের অবিরাম ঢেউ তাঁর অন্তঃকরণ থেকে ঘৃণা আর রোষ মুছে দিয়ে তাঁকে শুদ্ধ সুন্দর ও মহান ক'রে দিয়ে গেছে? কে তিনি, কোন দেশের মানুষ, কী তাঁর পুরো নাম—এ-সব তথ্য কি কোনো দিনই জানতে পারবো আমি?

জানি না।

আমি শুধু সেই আর্ত, প্রবল, শুদ্ধ মানুষটির জন্য প্রার্থনা করতে পারি। আমার বাড়ির সামনে দিয়ে বেলাভূমি দেখা যায়, যেখানে একের পর এক ঢেউ ভেঙে পড়ে বারে-বারে। তাদের সেই অবিরাম ও ছন্দোময় স্পন্দনের মধ্যেও হয়তো সেই একই প্রার্থনা বেজে-বেজে ওঠে।

—

banglabooks.in

অ্যাড্রিফ্‌ট্‌ ইন্‌ দি প্যাসিফিক

অ্যাড্রিফ্‌ট্‌ ১

banglabooks.in

প্রথম পর্ব

অকূল পাথার

১

ঝড়ের রাতে

১৮৬০ সাল, তারিখ ৯ই মার্চ।

সেদিন রাত এগারোটার সময় সীমাহারা এক মহাসমুদ্রে প্রচণ্ড ঝড়বাদল চলছিলো। একে দুর্যোগের রাতের ভয়ানক অন্ধকার, তার উপর অমন ঝড়বৃষ্টি আর রাজ্যের যত কুয়াশা! সে এমন নিরেট অন্ধকার যে মনে হয় যেন হাত দিয়ে ছোঁয়া যাবে; মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ না-চমকালে তাকে কোনো কালো দেয়াল ব'লেই বুঝি ভুল হ'তো। সেই অন্ধকারে এমনকী দু-হাত দূরের কোনো জিনিশ পর্যন্ত চোখে পড়ে না। আর সেই অন্ধকারের মধ্যেই ঢেউ উঠছে উদ্দাম ও পর্বতপ্রমাণ, গ'র্জে উঠছে রাগে কতগুলো প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জন্তুর মতো। একেকটা ঢেউ উঠছে, লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে পড়ছে একে-অন্যের উপর, তারপর সহস্রচির হ'য়ে চারদিকে ফেটে পড়ছে।

আর এই ভয়ংকর দুর্যোগের মধ্য দিয়েই একটা নিতান্ত ছোটো জাহাজ স্রোতের মুখে সামান্য কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছিল। মস্ত-সব ঢেউ এসে জাহাজের উপর ভেঙে পড়ছে, তবু কেমন ক'রে যে জাহাজটি ভেসে আছে, সেটাই পরম আশ্চর্য। ঝড়ের দাপটে জাহাজখানা একবার ক'রে দাঁড়িয়ে পড়ে, আবার পরক্ষণেই তীব্র স্রোতের মুখে প'ড়ে তীরের মতো ছুটে চলে। প্রতি মুহূর্তেই মনে হয় এই বুঝি একরত্তি জাহাজটা টুকরো-টুকরো হ'য়ে ভেঙে যাবে।

সত্যি, জাহাজটা একরত্তি একটা দু-মাস্তুলওলা স্কুনার। এ-রকম স্কুনার কখনও মহাসমুদ্রে পাড়ি জমায় না, ছোটো-ছোটো সমুদ্রের উপকূল ঘ'রেই চলাফেরা করে। কেমন ক'রে যে এটা এই সুদূর মহাসাগরে এসে পড়েছে তা এই জাহাজের আরোহীরা পর্যন্ত ভালো ক'রে জানে না। আর আরোহীরাও বেশ-একটু অসাধারণ জাহাজটা যেমন ছোটো, তেমনি এর আরোহীরাও নিতান্তই ছেলেমানুষ।

জাহাজের পিছনের দিকে একান্ত অসহায়ের মতো চুপ ক'রে ব'সে ছিলো তিনটি ছেলে। তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড়ো তারই বয়েস মাত্র চোদ্দ বছর। অন্য দু'জনের বয়েস আরো-কম—বোধ করি তেরো হবে। এই তিনজন ছাড়া জাহাজের

banglabooks.in

চাকার কাছে ব'সে ছিলো আরেকজন ; সে নিউজীল্যাণ্ডের আদিম অধিবাসী মাওরিদের ছেলে। তারও বয়েস মাত্র তেরো বছর। এই চারটি ছেলে মিলে প্রাণপণে জাহাজটিকে ঢেউয়ের হাত থেকে রক্ষা করবার চেষ্টা করছিলো। প্রতি মিনিটেই একেকটি পর্বতপ্রমাণ ঢেউ এসে জাহাজের উপর আছড়ে পড়ে, আর সেই সাহসী মাওরি ছেলেটি অসীম চেষ্টার সঙ্গে ঠিকভাবে হাল ধ'রে থেকে ঢেউ কেটে চলতে থাকে। হালখানা যে কেন এখনও খুলে গেলো না, তা-ই আশ্চর্য !

রাত দুটোর পর থেকে ঝড়, জল আর ঢেউয়ের প্রতাপ দ্বিগুণ হ'য়ে উঠলো। একেকটা ঢেউ এসে জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ে, আর ছেলেরাও হুড়মুড় ক'রে ডেকের উপর শুয়ে পড়ে। ছেলেদের মনে অপরিসীম সাহস বলতে হবে। নইলে সাধারণ ছেলে হ'লে এতক্ষণে হয়তো ভয়েই ম'রে যেতো। তাছাড়া যদি ঠিকভাবে রেলিং ধ'রে থাকতে না-পারতো তো এতক্ষণে জাহাজ সোজা সমুদ্রের নিচে চ'লে যেতো।

এখানে ছেলে ক-টির নাম ব'লে নেয়া ভালো। প্রথম তিনটি ছেলের নাম যথাক্রমে ব্রিয়ঁা, গরডন আর ডনাগান। মাওরি ছেলেটির নাম মোকো।

ছেলেদের মুখে অনেকক্ষণ ধ'রে কোনো কথা নেই। হতবাক হ'য়ে তারা ঝড়ের সেই তাণ্ডব দেখছিলো। আচমকা কোনো আঘাত পেলে যেমন প্রথম কিছুক্ষণ কিছুই অনুধাবন ক'রে দেখার অবস্থা থাকে না, এদের দশাও এখন ঠিক তেমনি। ভিতরটা যেন একেবারে ফাঁকা হ'য়ে গেছে—এখনও যে ঝড়ের সঙ্গে তারা যুদ্ধ ক'রে চলেছে, তা কিন্তু কোনো-কিছু অনুধাবন না ক'রেই—কেবল যেন অভ্যাস-বশত, হাত-পাগুলো নড়ছে যেন কলের পুতুলের মতো।

অনেকক্ষণ পরে প্রথম কথা বললো গরডন। ব্রিয়ঁাকে সে শুধু জিগেশ করলে, 'জাহাজ চলছে না থেমে আছে, কিছুই যে বুঝতে পারছি না, ব্রিয়ঁা !'

ব্রিয়ঁার বয়েস চোদ্দ বছর—সে-ই সকলের চেয়ে বড়ো। গম্ভীরভাবে সে গরডনের কথার উত্তর দিলে, 'জাহাজ চলছে ব'লেই তো মনে হচ্ছে—এ কেবল ঢেউয়ের দুলুনিই নয়। ডনাগান, খুব সাবধান, সামনে কিন্তু প্রকাণ্ড এক ঢেউ ! মোকো, মোকো—দেখো—জাহাজের মুখ যেন ঠিক থাকে !'

ব্রিয়ঁার কথা শেষ হবার আগেই মস্ত-একটা ঢেউ জাহাজের উপর এসে আছড়ে পড়লো। সারেঙের চাকা ধ'রে বসে ছিলো মোকো—কেমন ক'রে যে সে ঢেউয়ের আঘাত সামলে উঠলো, তা এরা কেউ জানে না—নিজেই হয়তো তা জানে না

banglabooks.in

মোকো—কিন্তু তারই দক্ষতায় জাহাজ সেই ঢেউ কেটে ভেসে উঠলো। পরমুহূর্তেই ডেকের একটা কামরার দরজা খুলে দুটি নতুন মুখ বেরিয়ে এলো। তারাও বয়সে নিতান্তই ছেলেমানুষ—সত্যি-বলতে, বরং এদের চেয়েও ছোটো। তাদের সঙ্গে আবার একটা কুকুর ছিলো, ভয়ে সে ল্যাজটাকে পিছনের পায়ের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে একবার কেবল ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডেকে উঠলো। তাদের দেখেই ব্রিয়ঁা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'ইভারসন! ডোল! তোমরা বাইরে এসেছো কেন? যাও, শিগগির ঘরের ভেতর চ'লে যাও! ডোল, ঘাবড়ে যেয়ো না, কোনো ভয় নেই। যাও, চোখ বুজে ভেতরে ব'সে থাকো গে, যাও!'

ব্রিয়ঁার কথা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গে বিশাল-একটা ঢেউ সশব্দে জাহাজের পাশে এসে ভেঙে পড়লো। একবার কাৎ হ'য়েই জাহাজটা আবার সোজা হ'য়ে উঠলো, আর অমনি আবার ঘরের দরজা খুলে আর-একটি ছেলে বেরিয়ে এলো। ছেলেটির নাম বাক্সটার : বয়েসে আগের ছেলেটির চেয়ে একটু-বড়ো বটে, কিন্তু ব্রিয়ঁা আর গরডনের চেয়ে সে ছোটো। বাক্সটার বাইরে এসে অন্ধকারের মধ্যে চীৎকার ক'রে জিগেশ করলে, 'ব্রিয়ঁা, আমি কি খামকা ভেতরে ব'সে না-থেকে তোমাদের ওখানে গিয়ে সাহায্য করবো?'

ব্রিয়ঁা চেঁচিয়ে উত্তর দিলে, 'না বাক্সটার, তুমি ভেতরেই যাও, তোমার সাহায্যের এখন কোনো দরকার নেই। আর ক্রস, ওয়েব, সারভিস, উইলকক্স—তোমরা সব ভেতরে ব'সে কী করছো? ছোটোরা যে ভয়ে কাঁদছে! তোমরা কি ওদের একটু থামিয়েও রাখতে পারছো না?'

ভিতর থেকে অবিশ্যি কোনো উত্তর এলো না, এবং বাক্সটারও কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে আবার কামরার মধ্যে প্রবেশ ক'রে সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে।

আশ্চর্য! এই সুদূর মহাসমুদ্রে, এই ঝড়-গর্জানো অন্ধকার মধ্যরাতে, এতগুলো ছেলেমানুষ কোত্থেকে এলো? জাহাজের যাত্রীরা যে সবাই এমনকী বালকও নয়—কেউ-কেউ যে আরো-ছোটো, শিশু!

আরোহীদের সংখ্যা সবশুদ্ধ পনেরো : বাইরে চারজন, আর কামরার ভিতরে এগারো। এই পনেরোজন ছোটো ছেলে ছাড়া জাহাজে আর-কোনো পুরুষ বা অন্য-কোনো নাবিক নেই। তার উপর আরো আপশোশের কথা এই যে, ছেলেদের মধ্যে একজনও জাহাজ চালানোর অ-আ-ক-খ-ও জানে না। অথচ জাহাজটি নিয়ে তারা কিনা একেবারে সীমাহারা মহাসমুদ্রের মধ্যে এসে পড়েছে! তার উপরে তারা আবার আদৌ জানেই না পৃথিবীর কোন অংশে এখন তাদের জাহাজ চলছে।

banglabooks.in

শুধু এইটুকুই তারা বুঝতে পেরেছে যে তারা এক মহাসমুদ্রের উপর এসে পড়েছে—তাও আবার যে-সে সমুদ্র নয়, একেবারে প্রশান্ত মহাসাগর !

প্রশান্ত মহাসাগর ! অস্ট্রেলিয়া ও নিউজীল্যাণ্ডের এক উপকূল থেকে দক্ষিণ আমেরিকার আরেক উপকূল পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। এই ছয় হাজার মাইলব্যাপী নীলকান্ত মহাসমুদ্রের মধ্যে কেমন ক'রে এসে পড়লো এই অদ্ভুত জাহাজটা ? জাহাজের অন্য-সব লোকজন ও নাবিকদেরই বা কী হ'লো ? তারা কি ঢেউয়ের মুখে প'ড়ে ভেসে গেছে ? না কি কোনো জলদস্যুর হাতে প'ড়ে এদের এমন দুর্দশা হয়েছে ? আর, এই জাহাজটাই বা কোন দেশের ? জাহাজ যখন প্রশান্ত মহাসাগরের উপর দিয়ে চলেছে তখন হয়তো অস্ট্রেলিয়ার কোনো বন্দর থেকে এসেছে। শুধু অস্ট্রেলিয়াই কেন, প্রশান্ত মহাসাগরে তো জানা-অজানা দ্বীপের কোনো অভাব নেই—তাদেরই কোনো-একটা বন্দর থেকে যে জাহাজটা আসেনি, তাই-বা কে বলতে পারে ? তাছাড়া, এমনিভাবে ক-দিন ধ'রে সমুদ্রের উপর ভাসছে জাহাজটা ?

সমুদ্রের এই অংশটা অত্যন্ত নিরালা—বোধহয় এখান দিয়ে কোনো জাহাজ যায় না। অন্তত কোনোদিকেই তো কোনো জাহাজ, স্টীমার বা জনমানবের চিহ্নটুকু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। তাই ব্রিয়ঁা আর বন্ধুরা জাহাজটিকে প্রাণপণে সামনের দিকেই চালিয়ে নিচ্ছিলো, আরো-কিছুদূর গেলে যদি কোনো ডাঙার চিহ্ন মেলে।

রাত্রি ক্রমশ গভীরতর হ'তে লাগলো। আর এরই মধ্যে অকস্মাৎ সেই ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি ও সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে আরেকটি তীক্ষ্ণ কর্কশ শব্দ শোনা গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে ডনাগান চীৎকার ক'রে উঠলো, 'জাহাজের সামনের মাস্তুলটা ভেঙে পড়লো !'

তার কথার প্রতিবাদ করলে মোকো। বললে, 'মাস্তুল ভাঙেনি, মাস্তুলের বড়ো পালটা ফেঁসে গিয়েছে !'

তৎক্ষণাৎ ব্রিয়ঁার কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'গরডন, তুমি শক্ত ক'রে হাল ধ'রে থাকো। আর মোকো ও ডনাগান—তোমরা দুজনেই শিগগির আমার সঙ্গে এসো। পাল ফেঁসে যাওয়ায় জাহাজ হয়তো এক্ষুনি বানচাল হ'য়ে যাবে। দেখো, অন্ধকারে ঢেউয়ে ভেসে যেয়ো না—সাবধান, ধ'রে-ধ'রে এসো।'

ব্রিয়ঁা আর মোকো ছাড়া এদের মধ্যে আর-কেউই সমুদ্র সম্পর্কে কিছুই জানে না। ভরসা যা-কিছু তা কেবল এই দু'জনেরই উপর। ব্রিয়ঁা আর মোকো কুড়ুল দিয়ে ভাঙা মাস্তুলটাকে কেটে নামিয়ে ফেললে। অন্ধকারের মধ্যেই পালগুলো আর লোহার তারগুলো তারা কোনোরকমে একদিকে সরিয়ে রাখলে। বড়ো

banglabooks.in

মাস্তুলদুটি অনেক জায়গাতেই ভেঙে গিয়েছিলো—এখন যা রইলো, তা নিতান্তই ছোটো। কিন্তু তাতেই কোনোরকমে পাল খাটিয়ে তারা জাহাজের গতি ঠিক রাখবার চেষ্টা করলে।

এতক্ষণ মনে অন্তত যেটুকুও আশা ছিলো, বড়ো মাস্তুলদুটির অকেজো দশা দেখে ব্রিয়ঁার মনে এখন আর তার লেশমাত্রও রইলো না। কিন্তু সে-ই যেহেতু বয়েসে সকলের চেয়ে বড়ো, সেইজন্য ছোটোদের নির্ভয়ে রাখার দায়িত্বটা স্বভাবতই তার উপরেই এসে বর্তেছিলো—ভয়ে সবাই কেমন জুজু হ'য়ে গিয়েছে দেখে সে নিজেই কাঁধের উপর সব দায়িত্ব তুলে নিয়েছিলো। তাই ব্রিয়ঁা আর তার আশঙ্কার কথা প্রকাশ না-ক'রে বিনাবাক্যব্যয়ে ছোটো মাস্তুলগুলোয় পাল খাটাবার ব্যবস্থা করলে।

আর সেই ভাঙা মাস্তুল আর ছেঁড়া পাল নিয়েই জাহাজটা ঝড়ের মুখে তীরের মতো পুবদিকে ছুটে চললো। 'তবু রক্ষা, স্কুনারটা খুবই মজবুত ছিলো', মনে-মনে ভাবলে ব্রিয়ঁা, 'না-হ'লে এতক্ষণে যে কী হ'তো···', ব্রিয়ঁা আর-কিছু ভাবতে চাইলো না। অন্ধকার একটুও কমেনি। আকাশও মেঘলা হ'য়ে আছে। ঝড় যেন ক্রমশ বেড়েই চলেছে—কস্মিনকালেও যে এই তাণ্ডব থামবে, তার কোনো লক্ষণ পর্যন্ত কোথাও দেখা যাচ্ছে না। শুধু এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে কখনও-কখনও শোনা যাচ্ছে সামুদ্রিক পাখির তীক্ষ্ণ আর্তস্বর। পাখির ডাক যখন শোনা যাচ্ছে তখন ডাঙা কি কাছেই? না, তাও অনুমানও করা যায় না। কারণ ব্রিয়ঁা তার জ্ঞানবুদ্ধি ও অধ্যয়ন দিয়ে জানে যে এইসব সামুদ্রিক পাখিদের অনেক সময় ডাঙা থেকে কয়েকশো মাইল দূরের সমুদ্রেও দেখা যায়।

ছোটো মাস্তুলে পাল খাটিয়ে ফিরতে-না-ফিরতেই আবার জোরে একটা শব্দ হ'লো। বাকি পালগুলোও বুঝি ফেঁসে গেলো!

ডনাগান হতাশ গলায় বললে, 'যাক, আপদ গেলো! আর-কোনো পালও আস্ত নেই, আর রক্ষাও নেই!'

'ভয়ের কিছু নেই, ডনাগান', বললে ব্রিয়ঁা। সে-যে নিজে ভয় পায়নি তা নয়, কিন্তু তবু সে তাকে আশ্বাস দিতে চাইলে—আসলে বোধহয় নিজেকেই তার আশ্বস্ত করার দরকার ছিলো। বললে, 'ঝড়ের যেমন বেগ আর সমুদ্রের যেমন স্রোত, তাতে আমাদের জাহাজ এখনও বেশ জোরেই চলবে। তবে আগের মতো জোরে নয়, এই-যা।'

এমন সময় মোকো চেঁচিয়ে উঠে তিনজনকে সাবধান ক'রে দিলে: 'সাবধান! খুব সাবধান! ঢেউ আসছে!'

banglabooks.in

সঙ্গে-সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঢেউ এসে জাহাজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তক্ষুনি সবাই শুয়ে প'ড়ে হাতের কাছে যে যা শক্ত জিনিশ পেলে তা-ই প্রাণপণে আঁকড়ে ধ'রে থাকলো। সব লণ্ডভণ্ড ক'রে ঢেউ চ'লে গেলে পরে দেখা গেলো, জাহাজের ভাঙা মাস্তুলের অংশ ও অন্যান্য কাঠ সমস্তই ঢেউয়ের মুখে কুটোর মতো ভেসে গিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সেইসঙ্গে আরেকটি জিনিশও অদৃশ্য হয়েছে—সে মোকো। মোকোকে আর ডেকের উপর দেখা গেলো না।

ব্রিয়ঁার হৃৎপিণ্ড যেন ধক ক'রে লাফিয়ে উঠলো! 'মোকো! মোকো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডাক দিলে সে।

ডনাগানও লাফিয়ে উঠলো, 'কী সর্বনাশ! মোকো কোথায় গেলো?'

পাগলের মতো চ্যাঁচাতে লাগলো তিনজনে। কিন্তু কোনো-দিক থেকে মোকোর কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না। 'গরডন', ব্রিয়ঁার গলার স্বর ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো, 'যেমন ক'রেই হোক ওকে আমাদের বাঁচাতেই হবে! শিগগির সমুদ্রে একটা লাইফ-বেল্‌ট ফেলে দাও! আর ডনাগান, তুমি একটা লম্বা দড়ি ফেলে দাও সমুদ্রে!'

ভীত ও উত্তেজিত গলায় তারা ডাকতে লাগলো, 'মোকো! মোকো!'

এমন সময় হাওয়া আর ঢেউয়ের শব্দ ছাপিয়ে অতি-ক্ষীণ একটি আর্তস্বর ভেসে এলো: 'বাঁচাও—বাঁচাও!'

আর্তনাদ শুনে ব্রিয়ঁা তক্ষুনি সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর-কি! কিন্তু গরডন তাকে আটকালে;—বাধা দিয়ে বললে, 'কোথায় মোকো? ও-শব্দ তো সমুদ্র থেকে আসছে না!'

কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে ব্রিয়ঁা: স্পষ্ট মোকোর গলার স্বর: 'বাঁচাও, বাঁচাও!' ঝড়ের আর ঢেউয়ের শব্দ যে-রকম ভীষণ, তাতে মোকো যে কোথেকে ডাকছে, তা সহজে বোঝা গেলো না। আন্দাজে ভর ক'রে ব্রিয়ঁা কোনোরকমে জাহাজের সুমুখদিকে এগুতে থাকলো। শেষে দেখা গেলো, জাহাজের সামনের দিকে এক গলুইয়ের ভিতর মোকো আটকে রয়েছে। ঢেউয়ের ঘায়ে শেষটায় সে নিশ্চয়ই সমুদ্রে গিয়ে পড়তো, কিন্তু ভাগ্যিশ গলুইটায় আটকে গিয়েছিলো—ঠিক আটকে অবিশ্যি যায়নি, প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেছিলো বরং বলা যায়—হাত ফসকে গেলে যে কী-সর্বনাশ হ'তো তা ব্রিয়ঁা কল্পনাও করতে চাইলে না।

ওকে উদ্ধার করতে গিয়ে ব্যাপারটা আরো স্পষ্ট হ'লো। দেখা গেলো, একটা প্রকাণ্ড পিপে সেই গলুইয়ের মধ্যে ঢুকে মোকোকে চেপ্টে ধরেছে। তখন বহু কষ্টে

banglabooks.in

সেই গিপেটাকে সরিয়ে তিনজনে মিলে টেনে-হিঁচড়ে তাকে গলুইয়ের ভিতর থেকে বার ক'রে আনলে। ঝোড়ো কাকের দশা তখন মোকোর, চোখেমুখে আতঙ্কের ছাপ, গায়ে কেমন কাঁটা দিয়ে উঠেছে। কিন্তু একটু যে হাঁফ ছাড়বে, তারই বা সময় কই? পিছনে তখন একটার পর একটা ঢেউ আসছে। তাই সে তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ফের হাল ধ'রে বসলো।

ভোর পাঁচটার সময়ে ঝোড়ো সমুদ্রে ফিকে একটু আলোর রেখা ফুটলো। আর তেমন অন্ধকার নেই বটে, কিন্তু চাপ-চাপ কুয়াশার দরুন তখনও আধ মাইলের বেশি দূরের জিনিশ চোখে দেখা যায় না। আস্তে-আস্তে বেলা যত বাড়লো, আলোর রেখাও ততই স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগলো। মেঘ তখনও আছে, তবে ঝড়ের প্রতাপ আর তেমন নেই। কিন্তু আকাশ আর সমুদ্র তখনও কেমন ঝাপশা আর নির্মম। চারজনে বসে অপলক নয়নে প্রকৃতির সেই ধূসর চেহারার দিকে তাকিয়ে রইলো।

হঠাৎ সারেঙের চাকার কাছ থেকে মোকো চেঁচিয়ে উঠলো, 'ডাঙা! ডাঙা! ওই দ্যাখো, ডাঙা দেখা যাচ্ছে!'

মোকোর চীৎকার শুনে তিনজনে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখলো। হ্যাঁ, সত্যিই দূরে, পুবদিকে, দিগন্তের প্রান্তে ক্ষীণ একটি ঘনশ্যামল রেখা ফুটে উঠেছে। আকাশ এত মেঘলা, আর চারদিকে কুয়াশাও এত চাপ বেঁধে আছে যে সত্যি-সত্যি বোঝা গেলো না ওই ঘনশ্যামল রেখাটা আসলে কী—ডাঙা, না মেঘ!

দুরবিন তুলে নিয়ে চোখে লাগালে ব্রিয়ঁ। ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে শেষকালে ব'লে উঠলো, 'হ্যাঁ, সত্যিই পুবদিকে ডাঙা দেখা যাচ্ছে!'

মিনিট পনেরো পরে দিগন্তের সেই সবুজ রেখাটা আরো স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো, ততক্ষণে আস্তে-আস্তে সরতে শুরু করেছে কুয়াশা। জাহাজও হাওয়ার ধাক্কায় পুব-দিকে অনেকখানি এগিয়ে গেছে ততক্ষণে। ব্রিয়ঁ। আবার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে ঘোষণা করলে, 'ডাঙা! পুবদিকে স্পষ্টই ডাঙা দেখা যাচ্ছে!'

'ডাঙা যে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই,' গরডনও সায় দিলে, কিন্তু বড়ো নিচু জমি ব'লে মনে হচ্ছে।'

নিচুই হোক আর উঁচুই হোক, ওই শ্যামল রেখাটি যে ডাঙা, কালো মাটি ও সবুজ গাছপালার দেশ—এইটুকুই ওদের কাছে যথেষ্ট। প্রায় দু-মাইল দূরের এক স্থলভূমি তার ঘন বনানী নিয়ে ছেলেদের দিকে যেন সস্নেহে হাসিমুখে তাকিয়ে আছে। এতদিন তারা যেন জানতেই পারেনি মাটি, গাছপালা, আলো-হাওয়া কী

banglabooks.in

অসীম সুন্দর ! যেভাবে জাহাজটা ছুটছে, তাতে মনে হয় আর মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যেই সে সেই ডাঙার উপর গিয়ে পড়বে।

আধ ঘণ্টা পরে আরো স্পষ্ট ক'রে দেখা গেলো তীর। উপকূলের ঠিক পিছনেই সার বেঁধে উঠেছে পাহাড়—প্রায় দুশো ফুট উঁচু। আর সেই পাহাড়ের নিচেই শ্যামল সমতল ভূমি আর তারই কোণ ঘেঁষে আবছা দেখা যায় বেলাভূমির হলুদ বালি। জাহাজ সোজা সেই বালির দিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এখন দ্বীপের সামনেটায় কোনো প্রবাল-প্রাচীর বা কোর‍্যালরীফ না-থাকলেই সর্বরক্ষে।

গরডন, ডনাগান আর মোকোকে জাহাজ সামলাবার ভার দিয়ে ব্রিয়ঁ গিয়ে জাহাজের সামনের দিকের ডেকের উপর দাঁড়ালে। চারদিকে তাকিয়ে সেই ডাঙার আশপাশে এমন একটা নিরাপদ জায়গা দেখা গেলো না যেখানে জাহাজ ভেড়ানো যায়। সুবিস্তৃত বালির রাজ্যের এদিকটায় সমুদ্র-জল থেকে মাথা তুলেছে মস্ত-এক প্রবাল পর্বত। প্রবালের সেই দেয়ালের গায়ে গিয়ে তুমুল শব্দ ক'রে ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সেই পাথরের স্তূপের উপর গিয়ে পড়লে আর দেখতে হবে না—তক্ষুনি জাহাজ চুরমার হ'য়ে যাবে।

কিন্তু ভীতচকিত চোখে তাকিয়ে ব্রিয়ঁ আবিষ্কার করলে, কোন-এক অমোঘ টানে জাহাজ কেবল সেইদিকেই এগিয়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ মহাসমুদ্রে ঝড়ের সঙ্গে যুঝতে গিয়েও সে কিছুতেই আশা হারায়নি—কোথায় যেন দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে উদ্ধার তারা কখনও-না-কখনও পাবেই। কিন্তু এখন সেই ভয়ংকর প্রাচীর দেখে তার মুখ একেবারে শুকিয়ে গেলো।

তাড়াতাড়ি ফিরে গিয়ে সে সবাইকে বললে ব্যাপারটা, তারপর সবাই মিলে প্রাণপণে চেষ্টা করলে জাহাজের মুখ ফেরাতে। কিন্তু পবন আর বরুণ এই দুই আদি দেবতাই যেন বিমুখ তাদের উপর—ঢেউয়ের ধাক্কায় আর হাওয়ার তোড়ে জাহাজ সোজা সেই প্রবাল-প্রাচীরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো—লোহাকে যখন চুম্বক টান দেয় তখন যেমন হয়, ঠিক তেমনি যেন ওই প্রবাল-প্রাচীর জাহাজকে টান দিয়েছে।

সেইজন্যেই সকাল যখন ঠিক ছটা, তখন তাদের সব চেষ্টা ব্যর্থ ক'রে প্রচণ্ড নিনাদ ক'রে সেই পাথরের স্তূপের উপর গিয়ে পড়লো জাহাজ। ভয়ে ওরা তখন কুঁকড়ে গিয়েছে, শিউরে উঠে আপনা থেকেই চোখ বুজে ফেলেছে—কে কোথায় ছিটকে পড়বে কে জানে ! কিন্তু আশ্চর্য কাণ্ড ! জাহাজ মোটেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো না—প্রবাল-প্রাচীরের সামনেকায় সেই ভয়ানক ঘূর্ণির মাঝখানে বোঁ ক'রে

banglabooks.in

চর্কির মতো একবার ঘুরপাক খেয়েই হঠাৎ কেমন ক'রে যেন কীসের গায়ে আটকে গিয়েছে।

না, জাহাজ পাহাড়ের গায়ে আছাড় খায়নি, তলাকার বালির মধ্যে আটকে গিয়েছে। কিন্তু সে কেবল ক্ষণিকের জন্যে, তারপরেই জাহাজটা আবার থর-থর ক'রে কেঁপে উঠলো একবার : পিছন থেকে আরেকটা বিশাল ঢেউ এসে জাহাজটাকে আরো-কিছু দূরে ঠেলে নিয়ে গেলো। সেখানে নিরেট পাথরের শ্রেণীর মধ্যে জল ঘুরে-ঘুরে পাক খাচ্ছে কেবল—জাহাজ সেই ঘূর্ণিজলে কাৎ হ'য়ে পড়লো।

সামনের বেলাভূমি তখন মাত্র সিকি মাইল দূরে। এটুকু পথ এখন পেরুতে পারলেই হয়। কিন্তু এই ঘূর্ণিজলের মধ্যে দিয়ে কী ক'রে তারা তীরে গিয়ে উঠবে?

২

ঢেউ এলো

কুয়াশার পর্দা আর নেই তখন, কিন্তু ঝড়ের বেগ ও সমুদ্রের উত্তালতা তখনও তেমন কমেনি। অল্প দূরেই সেই অজ্ঞাত রহস্যময় স্থলভূমি : প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে সে কি কোনো দ্বীপ, না দেশ—তা কিছুই জানা নেই।

ব্রিয়ঁা আর গরডন জাহাজের নিচের ডেকে দাঁড়িয়ে চারদিক পরীক্ষা ক'রে দেখতে লাগলো। ঘণ্টা দু-এক কেটে গেলে পর ব্রিয়ঁা হঠাৎ একসময় বললে, 'আর-কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেই বোধহয় ঝড় থেমে যাবে, সমুদ্রের ঢেউও শান্ত হ'য়ে যাবে। তাছাড়া ভাঁটার টানে জলও স'রে যাবে আস্তে-আস্তে। তখন আমরা সামনের ডাঙার দিকে যাবার চেষ্টা করবো।'

'অপেক্ষার আর দরকার কী?' ডনাগান প্রতিবাদ ক'রে উঠলো, 'আমরা তো এখুনি তীরে যাবার উদ্যোগ করতে পারি।'

ডনাগানের কথায় সায় দিয়ে উঠলো আরেকটি ছেলে : তার নাম উইলকক্স, বয়েস বারো বছর। 'ঠিক কথা' বললে সে, 'আবার ও-সব অপেক্ষা করা-টরা কেন? এখুনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক।'

আসলে ছেলেদের মধ্যে ডনাগানের তিনজন চেলা ছিলো—তাদের নাম ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স। ফরাশি ব'লে ব্রিয়ঁাকে তারা দেখতেই পারতো না। এই

banglabooks.in

চারজন ছাড়া জাহাজের অন্য-সব ছেলেই কিন্তু ব্রিয়ঁাকে বেশি পছন্দ করে। আসলে অন্য-সবাই ব্রিয়ঁাকে পছন্দ করে ব'লেই ডনাগানের তীব্র ঈর্ষা—সেইজন্যেই সে সব-সময় ব্রিয়ঁার কথার প্রতিবাদ ক'রে থাকে—তাতে তার কথায় যুক্তি থাক বা না-থাক, সে তার পরোয়া করে না।

ব্রিয়ঁার যুক্তিসিদ্ধ কথা অগ্রাহ্য ক'রে ডনাগান ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা জাহাজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালে। জাহাজ থেকে মূল ডাঙার দূরত্ব মাত্র সিকি মাইল বটে, কিন্তু যে-রকম প্রবল ঢেউ আর ঘূর্ণি, তার উপর কঠিন-বন্ধুর প্রবালশ্রেণী তাদের চোখে পড়লো যে সে-সবের উপর দিয়ে নৌকো চালাতে তখন তাদের আর সাহসে কুলোলো না। তবে মুখে তারা সে-কথা আদৌ প্রকাশ করলে না, বরং এমন ব্যস্ত-সমস্ত ভাবভঙ্গি করতে লাগলো যে যেন তারা তক্ষুনি রওনা হ'য়ে পড়বে।

ব্রিয়ঁা ভালো মনে ক'রে আরেকবার তাদের বারণ করতেই ডনাগান একেবারে ঝাঁঝিয়ে উঠলো। ঠোঁট বাঁকিয়ে বললে, 'তুমি এত উপদেশ দেবার কে? আমরা যা ভালো বুঝি তাই করবো—তোমাকে কেউ ফোঁপরদালালি করতে ডাকেনি!'

ব্রিয়ঁার মুখচোখ অপমানে একটু রাঙা হ'য়ে উঠলো। কিন্তু নিজেকে সে সামলে রাখলে। সে-ই তো সকলের বড়ো—কথায়-কথায় মেজাজ খারাপ করলে তার চলবে কেন? তাছাড়া ডনাগান তাকে মুখে দু-কথা শুনিয়ে দিলে বটে, কিন্তু যাবার কোনো লক্ষণই দেখালে না। তার ওই মিথ্যে অহংকার দেখে ব্রিয়ঁার বরং একটু হাসিই পেলো। হাসি চেপে সে একপাশে স'রে গেলো। এ-সব তুচ্ছ ব্যাপারে নজর দেয়ার মতো অবসরও অবশ্য তার ছিলো না। কারণ সামনের ওই স্থলভূমি আসলে কোনো ছোটো দ্বীপ না মহাদেশের অংশ, তা-ই এখনও জানা যায়নি।

স্থলভাগের দু-দিকে দুটো অন্তরীপের মতো। উত্তর ভাগ উঁচু, বন্ধুর ও পর্বত-বহুল, দক্ষিণ ভাগ নিচু ও সমতল। যদি এটা সত্যিই কোনো দ্বীপ হয়, আর দ্বীপটা যদি একেবারে উষর মরুভূমির মতো মরা ধুলোয় ভরা থাকে, যদি পুরো দ্বীপটাই বন্ধ্যা ও অনুর্বর হয়, তাহ'লে এতগুলো ছেলে কী খেয়ে বাঁচবে? দেশে ফিরবেই বা কেমন ক'রে? আর যদি এটা কোনো মহাদেশের অংশ হয়, তবে অবশ্যি অনেকটা নিরাপদ। এখানে না-হোক, কিছু-দূরে নিশ্চয়ই লোকালয় পাওয়া যাবে। কিন্তু অঞ্চলটা মহাদেশের এমন-কোনো অংশও তো হ'তে পারে যেখানে আশপাশে মানুষজনের বসতি নেই, আছে কেবল শত-শত বুনো জানোয়ারের ভয়াবহ বাসস্থান!

banglabooks.in

কিন্তু এ-সব তো পরের কথা। আপাতত ডাঙায় পৌঁছুনো যায় কী ক'রে সেটাই প্রধান বিবেচ্য।

অত্যন্ত অভিনিবেশ সহকারে চারদিকে নিরীক্ষণ করলে ব্রিয়ঁা। কিন্তু কোথাও মানুষের কোনো বসতি দেখা গেলো না, এমনকী একটা কুঁড়েঘর পর্যন্ত না। অনেকক্ষণ পরে কিঞ্চিৎ নিস্তেজ গলায় আপন মনেই সে বললে, 'কোথাও যে ধোঁয়াও দেখা যায় না একটুও!'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো মোকো। সে বললে, 'নদী রয়েছে, কিন্তু নদীতে কোনো নৌকো বা ভেলা নেই।'

'লোক না-থাকলে ধোঁয়াই বা উঠবে কোত্থেকে', ডনাগানের তির্যক মন্তব্য শোনা গেলো, 'আর নৌকোই বা আসবে কোন চুলো থেকে?'

লোক না-থাকার মানে যে কী, সেটা ডনাগানের মাথায় ঢুকেছে কি না ব্রিয়ঁা বুঝতে পারলে না। হয়তো তাদের অবস্থার গুরুত্ব এখনও তার মাথায় ঢোকেনি। কিন্তু ব্রিয়ঁা আর এ নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করলে না।

আস্তে-আস্তে সমুদ্রে ভাঁটা দেখা দিলো। বেলা তখন প্রায় সাড়ে-তিনটে। ব্রিয়ঁা গোড়াতেই ঠিক ক'রে রেখেছিলো যে ভাঁটার সুযোগে ডাঙায় গিয়ে উঠবে। এবার জল সরতে শুরু করতেই গরডন, বাক্সটার প্রভৃতি কয়েকজনকে নিয়ে জাহাজের খোল থেকে দরকারি জিনিশপত্র সব বার ক'রে ডেকের উপর নিয়ে আসতে লাগলো। জাহাজে জিনিশও কম ছিলো না। হরেকরকমের খাবার-দাবার ও অন্যান্য জিনিশপত্র একেবারে প্যাক-করা বাক্সে বন্ধ ছিলো। আগে সেগুলোকে সাবধানে ডাঙায় নিয়ে যেতে হবে : বাকি জিনিশপত্তর পরে নিলেও চলবে।

জাহাজে নৌকো ছিলো মাত্র একটা, বাকি সবগুলি ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছে। যেটা আছে সেটাও আবার নেহাৎই ছোটো। একবারে পাঁচ-ছয়জনের বেশি লোক ধরবে না। এই নৌকোতেই দু-তিনবার যাওয়া-আসা করতে হবে আর-কি!

যা-হোক, নৌকোয় কিছু-কিছু জিনিশ বোঝাই ক'রে তারা সেটাকে জলে নামালে। তারপর কী-একটা কাজে ব্রিয়ঁা ও গরডনরা একবার ভিতরে গিয়েছিলো, ফিরে এসে দ্যাখে, চমৎকার! ডনাগান, ক্রুশ, ওয়েব আর উইলকক্স ততক্ষণে নৌকোয় চ'ড়ে ব'সে নৌকো ছাড়বার আয়োজন করছে! দেখেই ব্রিয়ঁার সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠলো! ডনাগানের মৎলব মোটেই সুবিধের নয়: একবার তারা ডাঙায় উঠতে পারলেই হয়, তারপর জাহাজের অন্যান্য ছেলেদের দিকে হয়তো ফিরেও তাকাবে না।

banglabooks.in

তীব্র স্বরে ব্রিয়ঁা বলে উঠলো, 'ও কী হচ্ছে, ডনাগান ? সবাই প'ড়ে রইলো, আর তোমরা দিব্বি আগে চ'লে যাচ্ছো !'

'আমাদের যা-খুশি করবো,' উত্তর দিলে ডনাগান, 'তুমি বারণ করবার কে ?'

'বটে ? দেখি, তোমরা কী ক'রে যাও !' ব'লেই ব্রিয়ঁা লাফিয়ে উঠলো নৌকোয়।

এবার ওয়েব রুখে উঠলো। শার্টের আস্তিন গুটিয়ে বললে, 'ওটার সঙ্গে এতক্ষণ ধ'রে কী বকছো ? চলো ডনাগান, আমরা বেরিয়ে পড়ি ! ওহে ব্রিয়ঁা, তুমি চটপট স'রে যাও দেখি !' এই ব'লে ওয়েব সজোরে একটা ধাক্কা মারলে তাকে।

পড়তে-পড়তে সামলে নিলে ব্রিয়ঁা, নৌকো থেকে পাশের একটা পাথরের উপর লাফিয়ে পড়লো সে। দলের মধ্যে তার গায়েই সবচেয়ে বেশি জোর। পাথরের উপর পা রেখে নৌকোর গলুই দু-হাতে কঠিনভাবে ধ'রে বললে, 'যাও দেখি, কেমন ক'রে যাবে !'

বিন্দুমাত্র ইতস্তত না-ক'রে ওয়েব তৎক্ষণাৎ একটা দাঁড় তুলে নিয়ে ব্রিয়ঁার মাথায় মারবার উপক্রম করলে। ব্যাপার ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাচ্ছে দেখে গরডন চোখের নিমেষে নৌকোয় লাফিয়ে প'ড়ে ওয়েবের দু-হাত চেপে ধরলে। এদিকে অন্যান্য ছেলেরাও ততক্ষণে ব'সে নেই : ডনাগানদের স্বার্থপরতায় তারা যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও বিচলিত। বাক্সটার, সারভিস, ইভারসন প্রভৃতিরা নৌকোয় উঠে প'ড়ে যথোচিত উৎসাহের সঙ্গে মারামারি করার আয়োজন করলে। গরডন তখন আর-কোনো উপায়ান্তর না-দেখে মরীয়া হ'য়ে গিয়ে এই যুযুধান ছেলেদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু-দিকে দু-হাত বাড়িয়ে চ্যাঁচাতে শুরু করলে : 'কী হচ্ছে তোমাদের ? এই কী তোমাদের ঝগড়া করবার সময় ? এদিকে এই বিপদ, কোথায় তোমরা সবাই এক হ'য়ে পরস্পরের সাহায্য করবে, না এই সময় করছো মারামারি ? লজ্জা করে না তোমাদের ? সব বুদ্ধিশুদ্ধি একেবারে লোপ পেয়েছে ?'

অবশেষে গরডনের ধমক খেয়ে তাদের কাণ্ডজ্ঞান হ'লো। শান্ত হ'য়ে সকলে একে-একে নৌকো থেকে নেমে পড়লো। ডনাগানও দ্বিরুক্তি না-ক'রে নেমে এলো বটে, কিন্তু অন্য-সকলের মতো তার মুখের ভাব আর স্বাভাবিক হ'লো না। গোমড়া মুখে সে ডেকের উপর পায়চারি করতে লাগলো।

ভাঁটার টানে জল তখন অনেকটা ক'মে গেছে বটে, কিন্তু পাহাড়ের আশপাশে ঘূর্ণি দিয়ে ফেনিয়ে উঠছে সমুদ্র। শেষকালে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধানের পর পাহাড়ের

banglabooks.in

মাঝখান দিয়ে নৌকো চালিয়ে নেবার মতো একটা বেশ সংকীর্ণ প্রণালীও দেখা গেলো। কিন্তু সেখানটায় যে-রকম ঘূর্ণি আর স্রোত, তাতে নৌকো চালানো বিষম দুঃসাধ্য হবে। ভাঁটা শেষ হয়ে জল একেবারে শান্ত স্থির হ'তে একেবারে বিকেল হ'য়ে যাবে।

গরডন বললে, 'এসো, ততক্ষণে আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নিই।'

এ-কথায় অবিশ্যি কারুই কোনো আপত্তি দেখা গেলো না। সবাই মিলে টিন ভেঙে বিস্কুট, জ্যাম আর শুকনো মাংস খেয়ে নিলে।

কিন্তু ভাঁটার টান যেন আর শেষ হয় না! স্রোত তেমনি বিষম র'য়ে গেলো। গরডন চিন্তিত হ'য়ে ব্রিয়ঁকে বললে, 'কী হবে এখন? ভাঁটা তো এখনো কমলো না!'

'হুঁ, তাই তো ভাবছি,' বললে ব্রিয়ঁ, 'আবার জোয়ার এসে পড়লে আমাদের আর-কোনো আশা নেই!'

'ঠিক বলছো,' গরডন তখনও কী করবে ভাবছে, 'জোয়ার আসবার আগেই আমাদের জাহাজ ছেড়ে নেমে যেতে হবে, কারণ এই নতুন জোয়ারে পাথরে ধাক্কা খেয়ে জাহাজ একেবারে চুরমার হ'য়ে যাবে।'

'সে-তো বুঝি। কিন্তু এখন সবাই মিলে ডাঙায় পৌঁছুই কী ক'রে?' ব্রিয়ঁ। সব দেখেশুনে সত্যিই খানিকটা হতাশ হ'য়ে পড়েছিলো। 'একটা ভেলা বানাবারও উপায় নেই। জাহাজের ভাঙা কাঠকুটো সব জলে ভেসে গেছে। আর তাছাড়া হাতেও আমাদের তেমন সময় নেই!'

'তাহ'লে উপায়?' জিগেশ করলে গরডন।

'উপায় শুধু আমাদের এই নৌকোখানা', ব্রিয়ঁ। উত্তর দিলে। 'কিন্তু এতে তো আর সবাই পেরুতে পারবো না! তাই ভাবছি আরেকটা কাজ করলে কেমন হয়! জাহাজের এই মোটা দড়িটা কেউ যদি একবার ওই প্রবালগুলির ওদিকে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে আসতে পারে, তাহ'লে কোমরে লাইফবেল্ট পরে এই দড়ি ধ'রে-ধ'রে আমরা সকলেই এইটুকু পথ পেরিয়ে যেতে পারি। এখানকার ঢেউ যদিও অত্যন্ত ভয়ানক, তবু জল বোধকরি এক-গলার বেশি হবে না। দড়ি ধ'রে যেতে পারলে পাথরের উপর প'ড়ে মরবারও ভয় থাকবে না।'

'কিন্তু প্রবালগুলোর ওপাশে গিয়ে দড়িটাকে বেঁধে আসবে কে?' গরডন জিগেশ করলো, 'যে যাবে সে তো আর নাও ফিরতে পারে! জলে যে-রকম ঘূর্ণি দেখছি, তাতে ডুবে মরারই সম্ভাবনা বেশি।'

banglabooks.in

অকম্পিত স্বরে ব্রিয়ঁা বললে, 'আমি যাবো।'

'তুমি?' গরডন একেবারে অবাক। একটু থেমে তারপর সে বললে, 'ঠিক আছে। তাহ'লে আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

'না, আমি একাই যাবো।' গরডনের প্রস্তাবে কোনো কানই দিলে না ব্রিয়ঁা, 'তুমি বরং জাহাজে থেকে বাকি সব দিক সামলাও।'

একবার যখন মনস্থির ক'রে ফেলা গেছে, তখন আর খামকা দেরি ক'রে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। একটা মোটাশোটা শক্ত-গোছের দড়ি বেছে নিয়ে ব্রিয়ঁা খুব আঁটো ক'রে নিজের কোমরের সঙ্গে বাঁধলে। তারপর গরডনকে ডেকে বললে, 'গরডন, আমি এই দড়ি নিয়ে সমুদ্রে নামলুম। আমি যেমন সাঁতার কেটে এগুতে থাকবো, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে দড়ি ছাড়বে। দেখো, দড়ি ছাড়তে যেন দেরি কোরো না। কী-রকম প্রবল ঘূর্ণি ও ডুবো পাথরের মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হবে তা তো বুঝতেই পারছো!'

ছেলেরা সবাই ডেকের রেলিঙের ধারে এসে ভিড় করে দাঁড়ালে। সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে যাচ্ছে ব্রিয়ঁা। বড়ো-বড়ো ঢেউ সেই নিরেট পাথরের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে চারদিকে ভয়ানক ঘূর্ণির সৃষ্টি করছিলো। সিন্ধুজলের সেই বিষম দাপট দেখে জাক তো ভয়েই অস্থির : কিছুতেই সে তার দাদাকে সমুদ্রে নামতে দেবে না—চোখ ছলছল ক'রে উঠছে, মুখ-চোখ শুকনো ও আতঙ্কিত, শেষকালে হাপুশ নয়নে কেঁদেই ফেললো। ভাইটিকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে আর দেরি না-ক'রে চটপট সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লো ব্রিয়ঁা। তারপর ওই বিষম ঢেউয়ের সঙ্গে যুঝতে-যুঝতে কোনোরকমে এগুতে লাগলো তীরের দিকে। ছেলেরা সবাই রুদ্ধশ্বাসে তার দিকে তাকিয়ে রইলো। উত্তেজনায় তাদের সমস্ত শরীর টান-টান হ'য়ে গিয়েছে—ব্রিয়ঁার দুঃসাহস দেখে কীরকম একটু সম্ভ্রম লাগলো তাদের, মাঝে-মাঝে নিজেরাই সজোরে রেলিঙ চেপে ধ'রে নিজেদের সামলাতে লাগলো।

হঠাৎ দেখা গেলো, সামনে একটা প্রবল ঘূর্ণি। এই বুঝি পাক খেতে-খেতে জল তাকে ডুবিয়ে ফ্যালে! ব্রিয়ঁা প্রাণপণে সেটা পেরুবার জন্য লড়াই করছে, কিন্তু পারছে না। চক্ষের পলকে ব্রিয়ঁা সেই ঘূর্ণির মধ্যে ডুবে গেলো, শোনা গেলো একটা ক্ষীণ আর্তনাদ : 'গরডন!'

গরডন তৈরিই ছিলো। প্রাণপণে সে দড়ি ধ'রে টান দিলে—অন্য ছেলেরাও এসে তাকে সাহায্য করলে, তারাও গায়ের জোরে দড়ি ধ'রে টান দিতে লাগলো। ভাগ্যিশ দড়ি বাঁধা ছিলো কোমরে : কোনোরকমে হতচেতন ব্রিয়ঁাকে জাহাজে

banglabooks.in

টেনে তোলা হ'লো। আর এই পুরো ব্যাপারটা যখন ঘটছে, তখন জাক সজোরে রেলিঙ চেপে ধ'রে জড়িয়ে ধ'রে ছিলো।

কিন্তু এখন উপায় কী হবে তাদের? দড়ি তো বাঁধা হ'লো না, এখন কেমন ক'রে তারা ডাঙায় গিয়ে উঠবে? দেখতে-দেখতে বেলা প'ড়ে এলো, আর ভাঁটা শেষ হ'য়ে ফের জোয়ার এসে পড়লো। ছেলেরা ডেকের উপর জড়ো হ'য়ে হতাশ, শূন্য চোখে, নির্বাক হ'য়ে জোয়ারের জলোচ্ছ্বাস দেখতে লাগলো। কেমন ক'রে ঢেউ আরো বেড়ে উঠলো, জল ফুলে উঠলো, আর ফেনিল ধাবমান জলরাশি প্রবাল-প্রাচীর ঢেকে দিলো, সব দেখতে-দেখতে তাদের সব আশা-ভরসা ধীরে-ধীরে নির্মূল হ'য়ে গেলো। খানিকক্ষণের মধ্যেই জোয়ারের টানে জাহাজ ফের জলে ভেসে উঠে ঢেউয়ের উপর দুলতে-দুলতে চারদিকের পাথরের গায়ে ঠোকাঠুকি করতে লাগলো আর তারা ক্লান্ত, বিমর্ষ ও চুপচাপ ভাবে ডাঙার এত কাছে এসেও কেমন ক'রে ডাঙায় পৌঁছুনো গেলো না তাই ভেবে-ভেবে আরো-হতাশ হ'য়ে পড়তে লাগলো।

হঠাৎ সবাই চীৎকার ক'রে পরস্পরকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরলো। সামনেই পাহাড়ের সমান উঁচু এক মস্ত ঢেউ! কোনো অতিকায় জন্তুর মতো বিকট গর্জন করতে-করতে ঢেউটা একেবারে তাদের মাথার উপর এসে পড়লো। সঙ্গে-সঙ্গে জাহাজ প্রায় কুড়ি ফুট উপরে লাফিয়ে উঠলো এবং···

এবং মুহূর্তের মধ্যেই জাহাজ সেই সিকি মাইল জোড়া শিলাস্তৃত প্রবালশ্রেণী পেরিয়ে একেবারে উপলবন্ধুর বালুময় উপকূলে গিয়ে ছিটকে পড়লো।

ঢেউ স'রে যেতেই দেখা গেলো জাহাজ শুকনো বেলাভূমিতে কাৎ হ'য়ে পড়েছে। আশ্চর্যের বিষয়, ছেলেরা কেউ তেমন আহত হয়নি।

সামনেই সেই সুদূরবিস্তৃত স্থলভূমি।

৩

গোড়ার কথা

আমাদের এই কাহিনী যখনকার, চারম্যান বোর্ডিং স্কুল তখন নিউজীল্যাণ্ডের অকল্যাণ্ড শহরের বড়ো ইস্কুলগুলোর অন্যতম। উপনিবেশের প্রায় সব সম্ভ্রান্ত

banglabooks.in

পরিবারের ছেলেরাই এই ইশকুলে পড়তো। ইয়োরোপের যে-কোনো সেরা পাবলিক স্কুলের সঙ্গেই এর তুলনা করা যায়। শুধু-যে লেখাপড়ার মানই উঁচু ছিলো তা-নয়, পাঠ্যতালিকার বহির্ভূত নানা বিষয়েও ছাত্রদের এমনভাবে উৎসাহ দেয়া হ'তো যে এখান থেকে পাস ক'রে বেরুবার পর ছাত্ররা প্রায় সব অর্থেই মানুষ হ'য়ে যেতো।

ওলন্দাজ নাবিকেরা যখন প্রথম নিউজীল্যাণ্ড দ্বীপে পদার্পণ করে, তখন তারাই এই সুন্দর নামটি দেয়, যার অর্থ হ'লো 'নব সিন্ধু-সৈকত'। নিউজীল্যাণ্ডের মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অমন সুন্দর-সুন্দর বরফ-মোড়া সারি-সারি পাহাড়, মায়ালোকের মতো অমন অপূর্ব সব হ্রদ, অতীত হিম-যুগের সব বরফের নদী ও হিমবাহ, অমন উষ্ণ জলের প্রস্রবণ পৃথিবীর কটা দেশেই বা আছে? দেশের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আবার দুর্গম্য অরণ্য, তার মূল দ্বীপের চারদিকে আরো-কত ছোটো-ছোটো সোনালী দ্বীপ।

১৮৬০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি একদল ছেলে আর তাদের আত্মীয়স্বজনেরা হই-চই করতে-করতে স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়লো। ছুটি শুরু হ'লো কিনা: ছেলেদের হাতে এখন দু-মাসের স্বাধীনতা, আস্ত দুটি মাস জুড়ে অখণ্ড অবসর। কোনো-কোনো ছেলের আবার এই ছুটিতে সমুদ্র পাড়ি দেবার কথা। কত মাস ধ'রে ক্লাসের মধ্যে পড়াশুনোর ফাঁকে-ফাঁকে এই সমুদ্র-পাড়ির প্রত্যাশায় উদাস হ'য়ে গিয়েছে তাদের চোখ, কতদিন তারা এরই প্রতীক্ষায় তন্ময় হ'য়ে রয়েছে ইশকুলে। তারা অন্য ছেলেদের ঈর্ষার কারণ হ'য়ে উঠেছিলো: আহা, এই ছুটিতে ওরা নিউজীল্যাণ্ড দ্বীপের চারধারে একটা ছোটো জাহাজে ক'রে ঘুরে দেখবে। ছেলেদের অভিভাবকেরা দেড় মাসের জন্য একটা স্কুনার ভাড়া করেছেন। স্কুনারটা স্কুলেরই একটি ছেলের বাবার—ক্যাপটেন উইলিয়াম গারনেটের।

এই ভাগ্যবান ছেলেদের মধ্যে যেমন স্কুলের সবচেয়ে উঁচু ক্লাসের ছেলে ছিলো, তেমনি ছিলো একেবারে নিচু ক্লাসের ছেলেও। বয়েস তাদের আট থেকে চোদ্দর মধ্যে। ব্রিয়ঁ আর জাক দুই ভাই, তারা আসলে ফরাশি, আর গরডন মারকিন, এছাড়া আর-সবাই ইংরেজ।

যে-জাহাজে ক'রে ছেলেরা ঘুরে বেড়াবে ব'লে ঠিক হয়েছিলো, সেটি একটি পালতোলা 'স্কুনার'-জাতীয় জাহাজ। একদা অবিশ্যি এই জাহাজ অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড আর তাসমানিয়া দ্বীপের চারদিকে অনেক টহল দিয়েছে, এমনকী টরেস প্রণালী পর্যন্ত ঘুরে এসেছে। সেকেলে ধরনের হ'লেও জাহাজটি কিন্তু খুব

banglabooks.in

মজবুত। জাহাজের জন্যে একজন কাপ্তেন, দু-জন মেট, ছ-জন নাবিক আর একজন বাবুর্চি ঠিক করা হয়েছিলো। আর ফাইফরমাশ টুকিটাকি কাজ সারবার জন্য নিয়োগ করা হয়েছিলো আমাদের পূর্বপরিচিত বালক ভৃত্য মাওরি মোকোকে।

সমস্ত ঠিকঠাক ক'রে যাত্রার দিন ঠিক হ'লো ফেব্রুয়ারী মাসের ১৫ তারিখ। সেদিন সকালবেলায় অকল্যাণ্ড থেকে জাহাজ ছাড়বে। তাই আগের দিন সন্ধেবেলায় জাহাজের কাপ্তেন, মেট আর নাবিকেরা বিশ্বস্ত মোকোর হাতে জাহাজের ভার রেখে শহরে গিয়েছিলো একটু আমোদপ্রমোদ ও ফুর্তি করতে। পরদিন ভোরবেলায় ফিরে এসে তারা জাহাজ ছাড়বে। এদিকে অভিভাবকদের সম্মতিক্রমে ও কাপ্তেনের অনুমতি নিয়ে চোদ্দটি ছেলে আগের দিন বিকেল-বেলাতেই জাহাজে এসে চড়েছিলো। ঠিক হয়েছিলো, তাদের অভিভাবকেরা পরদিন ভোরবেলায় এসে অভিযানে যোগ দেবেন।

সঙ্গে কোনো বয়স্ক অভিভাবকও নেই, কাপ্তেনও নেই, তাই ছেলেরা প্রাণভ'রে জাহাজের উপর হই-হল্লা শুরু ক'রে দিলে। মোকো জাহাজের লোক হ'লে কী হবে, তারও তো বয়স খুব-একটা বেশি নয়, মাত্র চোদ্দ বছর, তাই সেও তাদের হুল্লোড়ে ও শোরগোলে যোগ দিতে ছাড়লে না। তাছাড়া জাহাজটা তো একটা বয়ার সঙ্গে খুব মজবুত করে বাঁধা আছে, কাজেই ভয়ের আর-কী ?

রাত দশটা অবধি ছেলেরা জাহাজের উপর নৃত্য, হট্টগোল, লম্ফঝম্প ও চীৎকার ক'রে অবশেষে নেহাৎই ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো। সেলুনের আলো নিভিয়ে যে-যার বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলে, আর ক্লান্তি ও উত্তেজনার দরুন যেমনি শোয়া অমনি ঘুম। মোকো কেবল একবার বাইরে এসে চারদিক ভালো ক'রে পরীক্ষা ক রে দেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে শুতে গেলো। যদিও বেশ একটা ঝোড়ো হাওয়া বইছিলো, তবু আশঙ্কার কিছুই ছিলো না।

তারপরে যে কী হয়েছিলো, তা আর কেউ জানে না। কোনো অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ জাহাজের দড়ি ছিঁড়ে যায়, আর বাতাসের টানে জাহাজ বন্দরের বাইরে এসে পড়ে। গভীর অন্ধকার রাত্রি, তার উপর তীব্র ঝোড়ো হাওয়া, এদিকে জোয়ারও তখন হু-হু ক'রে ক'মে যাচ্ছে : এমন-সব অনুকূল অবস্থার আবেষ্টনে প'ড়ে যে জাহাজ সারারাত সমুদ্রে ভেসে চললো, তা তার ঘুমন্ত আরোহীরা জানতেও পারেনি।

প্রথমে ঘুম ভেঙেছিলো মোকোর। ব্যাপার দেখে তার তো চোখ প্রায় কপালে ওঠে আর-কি ! জাহাজ যে কোথায়, কতদূরে এসে পড়েছে, তা সে কিছুই হদিশ

banglabooks.in

ক'রে উঠতে পারলে না। কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে শেষকালে সে ছেলেদের ডেকে তুললে। কিন্তু তারাই বা কী করে? সে অন্ধকার রাত্রে ঝড়-ওঠা মাঝ-দরিয়ায় কে কোথায় আছে যে সাহায্য করবে? তখন তারা নিউজীল্যাণ্ড থেকে অনেক মাইল দূরে চ'লে এসেছে। হতভম্ব যাত্রীদের নিয়ে অভিশপ্তের মতো জাহাজ সোজা পুবদিকে ভেসে চললো।

আকাশে বেশ গাঢ় মেঘ জ'মে উঠেছে ততক্ষণে; ঝোড়ো হাওয়া পরিণত হয়েছে প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে, চারদিকে যেন তাণ্ডব শুরু হ'য়ে গেছে। দিনের বেলাতেও চারদিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন র'য়ে গেলো: ঘন মেঘের আবরণে আকাশের মুখও ঢাকা প'ড়ে গেছে।

বিপদের সময়েই মানুষের সত্যিকার পরিচয় পাওয়া যায়, সময়ই উদ্‌ঘাটিত করে মুহূর্তের মানুষের পরিচয়। সবাই যখন ভীত ও হতভম্ব, তখন ব্রিয়ঁাই চটপট কর্তব্য স্থির ক'রে নিয়েছিলো। মুহ্যমান হ'য়ে ব'সে না-থেকে সে মোকোর সাহায্যে মাস্তুলে পাল টাঙিয়ে জাহাজের গতি ঠিক করে রাখার চেষ্টা করলে। ব্রিয়ঁা বুদ্ধি ক'রে এ-সব না-করলে জাহাজটা হয়তো ওই ঝড়ের পাল্লায় প'ড়ে একেবারে ডুবে যেতো।

কেবল যে হাল ধ'রে, পাল টাঙিয়ে, জাহাজ চালনার ব্যবস্থা করেই ব্রিয়ঁা ক্ষান্ত হ'লো তা নয়, কাগজে সমস্ত বিবরণ লিখে অনেকগুলো বোতলের মধ্যে ভ'রে ভালো করে ছিপি এঁটে জলে ভাসিয়ে দিলে। যদি একটা বোতল কারু হাতে গিয়ে পড়ে, যদি সেই খবর পেয়ে কোনো জাহাজ তাদের হদিশ পায় ও উদ্ধারের জন্যে এগিয়ে আসে! কিন্তু সেই অথই অপার মহাসমুদ্রের মধ্যে ওইটুকু ছোটো বোতল আর-কারই বা চোখে পড়বে!

এই ঝড়ের মধ্যেই এ-রকমভাবে সীমাহীন মহাসমুদ্রে তাদের দিন-রাত্রি কেটে গেলো!

ওদিকে ১৫ই ফেব্রুয়ারি ভোরবেলায় যখন জানা গেলো যে জাহাজখানা যেন কেমন ক'রে অকল্যাণ্ড ছেড়ে বারদরিয়ায় গিয়ে পড়েছে, এবং জাহাজে একজনও অভিজ্ঞ নাবিক বা বয়স্ক মানুষ নেই, তখন সেখানকার সকলের মনের অবস্থা কী-রকম হ'য়ে উঠলো, তা বেশ সহজেই অনুমান করা যায়।

তক্ষুনি বেতারে চারিদিকে খবর পাঠানো হ'লো, কত জাহাজ নিরুদ্দিষ্ট ছেলে-দের সন্ধানে সমুদ্র তোলপাড় করে বেড়ালো, কিন্তু সব চেষ্টাই মিথ্যে হ'লো যখন একের পর এক দিন কেটে গেলেও কেউই সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেদের কোনো খবর

banglabooks.in

আনতে পারলে না। ছেলেদের অভিভাবকদের এটা বুঝতে আর বাকি রইলো না যে সমুদ্র নিশ্চয়ই এতদিনে তাদের গ্রাস ক'রে নিয়েছে।

দিনের পর দিন কেটে গেলো, তবুও কোনো দিক থেকে তাদের কোনো খবর এলো না। শেষকালে সকলেই তাদের আশা ছেড়ে দিলে। দু-মাস পরে যখন চারম্যান বোর্ডিং স্কুল আবার খুললো তখন সেই চোদ্দটি ছেলে আর ক্লাসঘরে ফিরে গেলো না।

৪

ডাঙায়

ধু-ধু করে বালুরাশি।

ঝাঁকুনি সামলে উঠেই ছেলেরা হুড়মুড় ক'রে সেই সুদূরবিস্তৃত বেলাভূমির উপর নেমে পড়লো। মাটিতে পা দিয়েই ছোটোরা তো প্রথমে ধেই-ধেই ক'রে উঠলো, এতদিন জল দেখে-দেখে তারা রীতিমতো বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলো। একটু যারা বড়ো কেবল তারাই মাটির উপর নেমে চারদিক ভালো ক'রে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলো।

কোনোদিকেই জনমানবের কোনো চিহ্ন নেই—এমনকী জংলিদের কুঁড়েঘর পর্যন্ত দেখা গেলো না কোথাও। পাহাড়ের তলায় কিংবা গাছের নিচে—কেউ-যে কোনোদিন এ-সব জায়গায় ছিলো, তা পর্যন্ত মনে হ'লো না। অনতিদূরেই দেখা গেলো একটি নদীর মোহনা, জোয়ারের জলে টইটুম্বুর ও আবর্তমান। কিন্তু সেখানেও না-আছে কোনো নৌকো, না-বা কোনো ছোটো ডিঙি। এমনকী বেলাভূমির সোনালি বালির উপর কারু কোনো পায়ের ছাপ পর্যন্ত দেখা গেলো না। দূরে-কাছে কোথাও ধোঁয়ার চিহ্নটুকু নেই—অন্তত যা দেখে বোঝা যেতো যে এখানে না হ'লে দূরে কোনোখানে নিশ্চয়ই মনুষ্যবসতি রয়েছে।

এই অবস্থায় তাদের কর্তব্য কী, ব্রিয়ঁ। আর গরডন প্রথমে তা-ই নিরূপণ করার চেষ্টা করলে। পরামর্শ ক'রে সব স্থির ক'রে নেয়া উচিত। গরডনকে গম্ভীর ও চিন্তান্বিত দেখে ব্রিয়ঁ। কিঞ্চিৎ ভরসা দেবার চেষ্টা করলে, 'না-হয় এ-অঞ্চল জনহীন, কিন্তু তাতে হয়েছে কী? এখানে আমাদের সঙ্গে যথেষ্ট রসদ রয়েছে—আছে প্রচুর

banglabooks.in

খাদ্য ও গুলিবারুদ। অতএব আপাতত এ-সম্বন্ধে বিশেষ-কোনো ভাবনা নেই। বরং এখন আমাদের প্রথম এবং প্রধান কর্তব্য হচ্ছে মাথা গোঁজবার মতন একটা আশ্রয় ঠিক করা। তারপর ধীরেসুস্থে সরেজমিন তদন্ত ক'রে না-হয় দেখা যাবে আমরা পৃথিবীর কোন জায়গায় এসে উঠেছি। যদি এটা কোনো মহাদেশের অংশ হয়, তা'হলে এখনও আমাদের রক্ষা পাবার সম্ভাবনা আছে। আর যদি এটা সত্যি-সত্যি একটা দ্বীপই হয় এবং এখানে যদি কোনো মনুষ্যবসতি না-থাকে, তা'হলে তা নিয়ে আপাতত ভাবিত হওয়ার কিছু দেখছি না। উপর্যুপরি এতগুলো বিপদের হাত থেকে যখন রেহাই পেয়েছি, তখন এত শিগগির আমরা মরবো না নিশ্চয়ই—এ-তো আর ভীষণ সমুদ্র নয়, ডাঙা, পায়ের তলায় অন্তত শক্ত মাটি আছে। একটা উদ্ধারের পথ নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।'

সবাই মিলে আলোচনা ক'রে প্রথমে স্থির করা হ'লো—যতদিন-না দ্বীপের উপর একটা-কোনো ভালো আশ্রয় মিলছে, ততদিন তারা জাহাজেই থাকবে। জাহাজটা যদিও অল্প কাৎ হ'য়ে পড়েছে, তবু তাতে অসুবিধের কিছু নেই। ডেকের সামনের দিকটা উড়ে গেছে বটে, কিন্তু সেলুনের ভিতরটা তখনও রীতিমতো মজবুত ছিলো। জাহাজের মালপত্তরও আর কষ্ট ক'রে দ্বীপে ব'য়ে আনতে হবে না এখন। জাহাজে জিনিশ তো আর নেহাৎ কম ছিলো না! এতজন লোকের প্রমোদ ভ্রমণের জন্যে যা-কিছু দরকার হ'তে পারে, সবই তাতে মজুত করা ছিলো। খাদ্য ছিলো যথেষ্ট পরিমাণ ও নানা ধরনের—টিনে-ভরা নোনা মাংস, বিস্কুট, কিছু ফলমূল, আরো কত-কী। তাছাড়া জামা-কাপড়, আশবাবপত্র, বাসনকোশন, অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক, বারুদ, যন্ত্রপাতি, ওষুধপত্তর প্রভৃতি কোনো জিনিশেরই অভাব নেই। শক্ত মাটিতে ঠোক্কর খেয়ে জাহাজটার এখন যে-দশা হয়েছে, তাতে তাকে আর সমুদ্রে ভাসানো যাবে না সত্যি, কিন্তু এখনও অনেকদিন এটা বাসের উপযোগী থাকবে। উঠতে-নামতে যাতে কোনো কষ্ট না-হয়, সেইজন্য একটা দড়ির মই তারা ব্যবহার করলে। মোকোর উপর দেয়া হ'লো রান্নাবান্নার ভার। আর চীফ-বাবুর্চি মোকোকে সাহায্য করার জন্য নিজে থেকেই এগিয়ে এলো বাক্সটার, বললে যে রান্নার ব্যাপারে সে তাকে সাহায্য করতে পারবে। বাড়িতে সে দিদির কাছে হরেক রকম শৌখিন সুখাদ্য তৈরি করতে শিখেছিলো।

এইসব আলোচনার মধ্যে আস্তে-আস্তে সকলেরই মনের ভার হালকা হ'য়ে যাচ্ছিলো। আগের মতো ভয় আর উত্তেজনার সেই টান-টান ভাবটা আর ছিলো না, বরং সকলেই বেশ হাসিখুশি ও উল্লসিত। কে জানতো যে তারাই 'স্যুইস

banglabooks.in

ফ্যামিলি রবিনসন' বা 'রবিনসন ক্রুসো'র মতো একটা দ্বীপে গিয়ে এমনভাবে দিন কাটাবে ? কিন্তু এদের মধ্যে কেবল একজনের মুখেই কোনো হাসির রেখা ফুটলো না, সে ব্রিয়ঁার ছোটো ভাই, জাক।

আস্তে-আস্তে রাত ক'রে এলো। আজ কতদিন তারা নির্ভাবনায় ঘুমুতে পারেনি। আজ বেশ তাজা ও হালকা লাগছে, চটপট খেয়ে নিয়ে তারা যে-যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাই একসঙ্গে ঘুমুতে যেতে সাহস করলে না। ছোটোরা শুতে গেলে পর ব্রিয়ঁা, গরডন আর ডনাগান পালা ক'রে রাত জেগে পাহারা দিতে লাগলো। কে জানে, অজানা জায়গায় কখন-কী বিপদ আসে !

রাতটা কিন্তু নির্বিঘ্নেই কেটে গেলো। ভোরের আলো দেখা দিতেই ঘুম ভেঙে গেলো সকলের। আর সকাল হ'তেই ওদের কাজকর্ম শুরু হ'য়ে গেলো : এখন ওদের কাজের আর অন্ত নেই। প্রথমে জাহাজের সব জিনিশের একটা তালিকা তৈরি ক'রে নেয়া উচিত—কী-কী আছে না-আছে, তা জানা থাকা ভালো। কত জিনিশ রয়েছে জাহাজে, কত বিচিত্র যন্ত্রপাতি। আশা করা যায় সহজে কোনো-কিছুর জন্যেই তাদের কষ্টে পড়তে হবে না। অভাব হবে শেষ পর্যন্ত শুধু খাদ্যের। ভাঁড়ারে যতই জমা থাক, তাতে নিশ্চয়ই খুব বেশি দিন চলবে না—অথচ এখানে যে কতদিন তাদের কাটাতে হবে কে জানে !

খাদ্যের প্রসঙ্গ উঠতেই গরডন একবার জাহাজের খাবার-দাবারের পুঁজি দেখে বললে, 'এ-সব খাবারে এখন আমাদের হাত দিয়ে কাজ নেই। তার চেয়ে বরং পাহাড়ের ফাটলে একবার পাখির ডিমের সন্ধান ক'রে দেখলে মন্দ হয় না। এ-খাবার যতক্ষণ পারা যায় স্পর্শ না-করাই উচিত আমাদের—কখন কোন কাজে লাগবে কে জানে।'

গরডনের কথা শুনে ইভারসন একেবারে নৃত্য ক'রে উঠলো। 'ঠিক কথা ! চলো, এক্ষুনি পাহাড়ে গিয়ে পাখির ডিম জোগাড় ক'রে নিয়ে আসি।'

সারভিস আবার আরো সেয়ানা। সে বললে, 'নদীতে ছিপ ফেলে ব'সে যাই বরং—কী বলো ! জাহাজে তিন-চারটে ছিপ আছে, আমি দেখেছি। তোমাদের মধ্যে কে-কে আমার সঙ্গে মাছ ধরতে যাবে বলো।'

সারভিসের কথায় ডোল, কোস্‌টার প্রভৃতি কয়েকজন চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমি যাবো, আমি যাবো।'

কিন্তু ব্রিয়ঁা সবাইকে থামিয়ে দিয়ে বললে, 'এখন অমন খেলা করতে গেলে চলবে না। যারা সত্যি-সত্যি মাছ ধরতে পারবে, তারাই শুধু মাছ ধরতে যাবে।

banglabooks.in

আপাতত বরং সমুদ্রতীর থেকেই কিছু ঝিনুক কুড়িয়ে আনা যাক। এই দ্বীপে ঝিনুকই আমাদের প্রথম খাদ্য হোক—ঝিনুক কুড়োতে হাঙ্গামাও নেই বিশেষ, খেতেও খুব মুখরোচক।'

এ-কথা শুনে ছোটোরা হই-হই ক'রে সমুদ্রতীরে ঝিনুক কুড়োতে ছুটলো।

ইতিমধ্যে বড়োরা ব'সে-ব'সে জাহাজের জিনিশপত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত ক'রে ফেললো। দরকার হ'লে যাতে চটপট খুঁজে পাওয়া যায়, সেইজন্য জিনিশগুলো কোথায়-কোথায় আছে, তাও পাশে লিখে রাখতে ভুললো না। ব্যারোমিটার, কম্পাস, স্টর্ম-গ্লাস প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ছাড়া জাহাজে ছোটো-বড়ো পাল ছিলো অনেকগুলি। তাছাড়া রশি ও দড়িরও কোনো অভাব ছিলো না। আর ছিলো লোহার কাঁটা-তার, নদীতে মাছ ধরার জন্যে তিনটে ছিপ, আর সমুদ্রের গভীর জলে মাছ ধরবার জন্যে সরু তার। আগ্নেয় অস্ত্রের মধ্যে ছিলো আটটা পাখি-মারা বন্দুক, বুনো জানোয়ার শিকার করার জন্যে একটা রাইফেল, তাছাড়া ছিলো বারোটা রিভলভার। টোটা ছিলো তিনশোরও বেশি, বারুদ ছিলো দুই পিপে; আর শিশের গুলি ছিলো অসংখ্য। এছাড়া রাতের অন্ধকারে বা কুয়াশায় নিশানা দেবার জন্যে হাউইও ছিলো কতকগুলো।

আরো-দুটি জিনিশ ছিলো—দুটো সুন্দর পেতলের কামান আর তাদের উপযোগী গোলা। ঝড়ের মধ্যে বা রাতের বেলায় সংকেত জানাবার জন্যে ব্যবহার করা হ'তো কামানদুটি—কিন্তু এখন অবিশ্যি সে-সবের আর প্রয়োজনীয়তা নেই। যদি এটা কোনো অজ্ঞাত দ্বীপ হয়, আর যদি এখানে জঙলিদেরই বাস থাকে, তাহ'লে ভবিষ্যতে জঙলিদের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় হয়তো কামানদুটি কাজে লাগবে।

দুপুরবেলায় সারভিস, ডোল আর কোস্‌টার প্রচুর ঝিনুক কুড়িয়ে ফিরে এলো। এসেই উত্তেজিতভাবে হাত-পা নেড়ে তড়বড় ক'রে যা বললো, তার সারমর্ম হ'লো যে, ঝিনুক কুড়োতে গিয়ে তারা ওদিকে অনেক বুনো পায়রা দেখে এসেছে। তাদের কথা শুনে ব্রিয়ঁ বললে, 'বেশ, একদিন গিয়ে দেখে আসা যাবে। এইসব পাহাড়ি কবুতরের ডিম খেতে মন্দ হবে না।'

ডনাগান বললে, 'আর দু-চারটে কবুতর গুলি ক'রে মারলেই হবে।'

'কিন্তু,' বললে গরডন, 'তাদের বাসা থেকে ডিম আনা কী কষ্টকর হবে, সেটা কেউ ভেবে দেখেছো? পাহাড়ে উঠে ওপর থেকে দড়ি ঝুলিয়ে তাই ধ'রে নেমে পাহাড়ের ফাটল থেকে ডিম আনতে হবে। এইসব পাখি থাকে পাহাড়ের মাঝামাঝি।'

banglabooks.in

'তা আমি জানি,' বললে ডনাগান, 'তবু গোটা-কয়েক পাখি শিকার ক'রে আনলেই হয়। ক্রস, ওয়েব, আর উইলকক্স—তোমরা কি আমার সঙ্গে যাবে?'

ওরা যাবার উদ্যোগ করতেই ব্রিয়ঁা বললে, 'ডনাগান, বেশি গুলি নষ্ট কোরো না যেন। গোটা চারেক পাখি মারলেই হবে।'

এমন সময়ে মোকো এসে সংবাদ দিলে, 'রান্না তৈরি। তোমরা সবাই খাবে এসো।'

অগত্যা তখন পাখি মারার প্রস্তাব স্থগিত রেখে সবাই মিলে খেতে চললো। খেতে ব'সে সকলের কী খুশি, যেন পিকনিকে এসেছে। জাহাজের ডেকের উপর সার বেঁধে ব'সে নানা কথা বলতে-বলতে সবাই মিলে হল্লা ক'রে খাওয়া শুরু করলে।

জাহাজের জিনিশপত্তর ঠিক ক'রে রাখতে-রাখতেই বিকেলটা কেটে গেলো। সারভিস, ইভারসন, ডোল আর কোস্‌টার ছিপ নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেলো। সন্ধ্যার আগেই তিনটে বড়ো-বড়ো মাছ নিয়ে জাহাজে ফিরলো ওরা। রাত্তিরে সবাই পেট ভ'রে সেই তাজা মাছভাজা খেয়ে বিছানায় শুতে গেলো। ওয়েব আর উইলকক্স দু-জনে পালা ক'রে সারারাত পাহারা দিলে—যদিও এ-যাবৎ ডাঙায় কোনো বিপদের সম্ভাবনা দেখা যায়নি, তবু কখন কী হয় বলা তো যায় না।

৫

মনুষ্যকঙ্কাল

গরডন, ব্রিয়ঁা আর ডনাগানের মনে এখন দিনরাত কেবল একটাই প্রশ্ন: এটা কী কোনো দ্বীপ, না মহাদেশ?

বুদ্ধিতে ও বয়েসে এই তিনজনই দলের মধ্যে যা-একটু বড়ো। তাই এই তিনজনই কেবল ভবিষ্যতের ভাবনায় মগ্ন হ'য়ে থাকতো। গাছপালার চেহারা আর আবহাওয়ার রকমশকম দেখে তারা এটা বুঝেছিলো যে দ্বীপই হোক আর মহাদেশই হোক—জায়গাটা যে আদৌ গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত নয়, এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকা উচিত নয়। সম্ভবত জায়গাটা নিউজীল্যাণ্ডের চেয়ে আরো-নিচে দক্ষিণ মেরুর কাছে কোথাও অবস্থিত।

banglabooks.in

শেষকালে ব্রিয়ঁা একদিন পরামর্শ দিলে, 'চলো, একদিন আমরা তিনজনে পাহাড়ের উত্তর দিকটা ঘুরে আসি। ওদিকে একটা অন্তরীপের মতো আছে—জাহাজ থেকে আমি তা দেখতে পেয়েছিলুম। তখন মনে হয়েছিলো অন্তরীপের পাহাড়টা অন্তত তিনশো ফুট উঁচু হবে।'

কিন্তু বৃষ্টি আর কুয়াশার উৎপাতে কয়েকদিনের মধ্যে তাদের আর এই পরিকল্পনা কাজে-খাটানো হ'য়ে উঠলো না—বেশ-কিছুদিন আর জাহাজ থেকে বেরুতে পারলে না তারা। অভিযানে না-বেরুলেও অবশ্য এদিকে তাদের এটা-ওটা কাজের অন্ত ছিলো না। এরই মধ্যে অবিশ্যি ফাঁক পেলেই বা মেঘ স'রে গেলেই ডনাগান তার তিন শাগরেদকে নিয়ে দু-বেলা বন্দুক নিয়ে বুনো পাখি মারতে যেতো। দ্বীপের উপর প্রচুর বুনো পায়রা থাকে—খেতেও বেশ সুস্বাদু।

একদিন মাছ ধরতে গিয়ে বেশ একটা মজার ব্যাপার ঘ'টে গেলো। ছেলেরা সেদিন মোহানার কাছে মাছ ধরতে গিয়েছিলো। সারা সকাল আর দুপুর ধ'রে একটানা বৃষ্টি হবার পরে বিকেলের দিকে আকাশ তখন দিব্যি পরিষ্কার। ডনাগানের দল গেছে পায়রা শিকারে। জাহাজের কাজে ব্যস্ত শুধু ব্রিয়ঁা, গরডন, বাল্কটার আর মোকো।

হঠাৎ কিছুক্ষণ পরে দূর থেকে ছেলেদের শোরগোল ভেসে এলো। হঠাৎ অমন চ্যাঁচামেচি শুনে ব্যাপার কী দেখবার জন্যে ব্রিয়ঁারা নদীর দিকে ছুটে গেলো। ওদের দেখেই জেনকিন্স চীৎকার ক'রে উঠলো, 'শিগগির দেখবে এসো, ইভারসন কেমন ঘোড়ায় চড়েছে! শিগগির ছুটে এসো, নইলে ঘোড়া এখুনি জলে পালাবে—সমুদ্দুরের ঘোড়া কিনা!'

কাছে এসে ব্রিয়ঁারা ছাখে, কোস্‌টার আর ইভারসন কী-একটা জানোয়ারের পিঠের উপর চেপে বসেছে, আর জানোয়ারটাও ধীরে-ধীরে সমুদ্রের দিকে যাবার জন্যে আকুলিবিকুলি করছে। আরো-কাছে এসেই ব্যাপারটা তাদের কাছে স্পষ্ট হ'লো। জানোয়ারটা আর-কিছুই নয়—একটা অতিকায় সমুদ্দুরের কাছিম। ইভারসন আর কোস্‌টার তার পিঠে ব'সে শক্ত ক'রে তাকে আঁকড়ে আছে, আর অন্য ছেলেরা একটা মস্ত দড়ি কাছিমটার মুখের দু-পাশ দিয়ে লাগামের মতো ক'রে ওটাকে টেনে রাখবার চেষ্টা করছে, কিন্তু কার সাধ্যি ওটাকে থামায়! সেই অতিকায় কাছিম অনায়াসে ছেলেদের টেনে নিয়ে চললো।

ব্রিঁয়ার মনে হ'লো এই কাছিমটাকে পাকড়াও করলে মন্দ হয় না—অন্তত কয়েকদিনের জন্য আর-কোনো খাদ্যের ভাবনা থাকবে না। কিন্তু এই অতিকায়

banglabooks.in

সমুদ্দুরের ঘোড়াকে কী ক'রে ধরা যায় ? গুলি ক'রে মারবার চেষ্টা করলেও তার কিছু হবে না। পাথরের মতো শক্ত আর নিরেট তার খোলা।

'কী ক'রে কাছিমটাকে আটকানো যায়, গরডন ?' ব্রিয়ঁা জিগেশ করলে।

গরডনের মাথায় কিন্তু ততক্ষণে একটা মৎলব খেলে গেছে। সে বললে, 'ওটাকে ধরবার একমাত্র উপায় হচ্ছে ওটাকে উল্‌টে চিত ক'রে ফেলা।'

'কিন্তু অত-বড়ো দশাসই আর ভারি জন্তুকে উল্‌টে ফেলবেই বা কী ক'রে ?' জিগেশ করলে সারভিস, 'ওজনে এটা হয়তো দশ মণ হবে—যা বিরাট দেখতে !'

'উল্‌টে ফেলা হয়তো যাবে,' বললে ব্রিয়ঁা। 'শিগগির কতগুলো বাঁশ নিয়ে এসো। যাও, দেরি কোরো না।'

মোকো আর সারভিস জাহাজ থেকে বাঁশ আনতে ছুটলো। সমুদ্র তখন মাত্র পঞ্চাশ হাত দূরে। ব্রিয়ঁা আর দেরি না-ক'রে চটপট ছুটে গিয়ে ইভারসন আর কোস্‌টারকে নামিয়ে নিলে—তারপর সবাই মিলে প্রাণপণে দড়ি ধ'রে টান লাগালে। অতগুলো ছেলে মিলে টান দিচ্ছে, তবু সেই কচ্ছপমশাই নির্বিকারচিত্তে অবলীলাক্রমে একটু-একটু ক'রে এগুতে লাগলো—এই অদ্ভুত টাগ-অভ-ওয়ারে তার যে আদৌ হারবার সম্ভাবনা আছে, তা মোটেই মনে হ'লো না, বরং সবাইকে টেনে নিয়ে সে চললো। আর বুঝি রাখা যায় না, কচ্ছপটা বুঝি জিতেই গেলো ! এমন সময় মোকো আর সারভিস হাঁপাতে-হাঁপাতে বাঁশ নিয়ে এসে হাজির। সকলের সম্মিলিত চেষ্টায় শেষকালে অনেক কষ্টে তাকে চিত করা গেলো, আর চিত ক'রে ফেলতেই তার সব প্রতিরোধের অবসান হ'লো। চিৎপাত কচ্ছপটা তার বেচারিমতো মুখ বার ক'রে চার-পা শূন্যে তুলে অসহায়ের মতো তাকিয়ে রইলো।

মোকো বললে, 'এই কচ্ছপের মাংস ভারি মিষ্টি আর নরম। চলো, আজ তোমাদের রেঁধে খাওয়াবো।'

হাতে কুড়ুল ছিলো, কাজেই কচ্ছপ-শিকারে আর-কোনো অসুবিধে হ'লো না।

ওরা ঠিক করলে, সবটুকু মাংসই নিয়ে যাবে। নুন মাখিয়ে রেখে দিলে ভবিষ্যতে খাবারের অভাব হবে না। কিন্তু অত-বড়ো কচ্ছপটা তো আর আস্ত ব'য়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, তাই সেটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে সবাই মিলে হই-হই করতে-করতে জাহাজে ফিরে এলো। সারভিস অবিশ্যি বেশ অতিরঞ্জন করে-ছিলো—দশ মণ নয়, মণ চারেক হবে হয়তো কচ্ছপটা। কিন্তু তাই-বা নেহাৎ কম কী ?

banglabooks.in

দেখতে-দেখতে এপ্রিল মাস এসে গেলো।

ঝাড়বাদলও অনেকটা ক'মে এসেছে ইতিমধ্যে, আগের মতো আর একটানা দিবারাত্রি বর্ষণ নেই। ব্যারোমিটারের পারদও অনেকটা উঠেছে। আশা করা যায় এখন আর কিছুদিন তেমন প্রবলভাবে ঝড়বৃষ্টি হবে না। আর এটাই সুযোগ: এরই মধ্যে যেমন ক'রেই হোক শীত আসবার আগে মাথা গোঁজবার মতো একটা আশ্রয় তাদের খুঁজে বার করতেই হবে।

সেদিন ডনাগান বললে, 'চলো ব্রিয়ঁ, কাল আমরা ক'জনে গিয়ে পুবদিকটা নিরীক্ষণ ক'রে আসি। বনের মধ্য দিয়ে বেশ শর্টকাট ক'রে যাওয়া যাবে, অতটা ঘুরতে হবে না।'

ব্রিয় । ঘাড় নাড়লে, 'বেশ, চলো।'

গরডন তাদের পরিকল্পনা শুনে বললে, 'তোমরা যদি কাল সকালে যাত্রা করো, তাহ'লে নিশ্চয়ই কাল সন্ধের মধ্যেই ফিরবে?'

'তা না-ফিরতেও পারি,' জানালে ব্রিয়ঁ, 'কোনো কারণে যদি দু-দিন দেরিও হয়, তাহ'লে তোমরা যেন খামকা ভেবে মোরো না।'

সঙ্গে দিন-চারেকের উপযোগী খাবার নিয়ে ব্রিয়ঁ, ডনাগান, সারভিস আর উইলকক্স পরদিন সূর্যোদয়ের সঙ্গে-সঙ্গেই যাত্রার জন্যে তৈরি হ'য়ে নিলে। চারটে রিভলভার, কিছু গুলিগোলা, দুটি কুড়ুল—এইসব নিয়ে তারা রীতিমতো সশস্ত্র হ'য়েই অভিযানে বেরুলো। সঙ্গে আরো নিলে একটা কম্পাস ও একটা শক্তিশালী ছুরবিন। উপরন্তু সঙ্গে চললো কুকুর ফ্যান।

সেদিন আকাশ ছিলো স্বচ্ছ, নীল; হালকা শাদা মেঘ ভেলার মতো ভেসে যাচ্ছে মন্দমধুর বাতাসে। পনেরো মিনিটের মধ্যেই এই চতুরঙ্গ বাহিনী সমুদ্রতীরের পাথরগুলো পেরিয়ে সেই গভীর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

মস্ত-সব গাছের ডালপালা মাথার উপরে: কত রকমের পাখির কাকলি আর কত ধরনের ছোটো-ছোটো বুনো জানোয়ারের ভীত চকিত ও বিস্মিত চলাফেরার শব্দ। গোড়ার দিকে ফ্যান কোনো জানোয়ার দেখলেই নিশানের মতো ল্যাজ তুলে ঘেউ-ঘেউ ক'রে তাড়া ক'রে যাচ্ছিলো, কিন্তু তাদের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু শিকার নয়, সেইজন্যে দেরি হ'য়ে যাচ্ছে দেখে ফ্যানকে তারা নিরস্ত করলে। তাদের ইচ্ছে প্রথমে অন্তরীপের সেই পাহাড়টার ওদিকে পৌঁছে পুবদিকে একেবারে সমুদ্রতীর অবধি যাওয়া। এতে অবিশ্যি অনেকটা ঘুরে যেতে হবে, কিন্তু সব মিলিয়ে তাতে এই অঞ্চলটার একটা স্পষ্ট ছবিও পাওয়া যাবে।

banglabooks.in

ডালপালা সরিয়ে ঝোপঝাড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে-যেতে অবশেষে তারা একটা ছোটো পাহাড়ের কাছে পৌঁছুলো। ঘুরে পাহাড়টার পাশ কাটিয়ে না-গিয়ে তার উপরে ওঠাই তারা সমীচীন ব'লে স্থির করলে। কারণ সেখান থেকে চার-দিকে তাকিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যাবে।

অনেক কষ্টে শেষকালে তারা পাহাড়ের উপরে গিয়ে উঠলো। ডানাগান চোখে দুরবিন লাগিয়ে চারদিক নিরীক্ষণ ক'রে দেখলে। কই, আশপাশে কোথাও সমুদ্রের চিহ্ন পর্যন্ত নেই—কেবল পিছন দিকে তাকালে প্রবাল-প্রাচীরের পাশে জলোচ্ছ্বাস দেখা যায়। উইলকক্সও দুরবিন লাগিয়ে দেখবার চেষ্টা করলে, কিন্তু না, কাছাকাছি কোথাও সমুদ্র আছে ব'লে মনে হ'লো না।

'কিন্তু এটা ঠিক যে কোনো মহাদেশের অংশ, তা আমার মনে হয় না, উইলকক্স। নিশ্চয়ই আশপাশে কোথাও সমুদ্র আছে—আমার কেন যেন মনে হচ্ছে এটা একটা ছোটো দ্বীপ ছাড়া আর-কিছুই নয়। প্রশান্ত মহাসাগরে তো কত ছোটো দ্বীপ আছে, তার সবগুলিই যে মানচিত্র বা ভূগোল বইতে আছে, তা নয়। এটা হয়তো তেমনি কোনো অজ্ঞাত দ্বীপ।' ব্রিয়ঁা চিন্তিত স্বরে তার অভিমত ব্যক্ত করলে, 'বরং এসো, সামনের জঙ্গলটা পেরিয়ে যাই—সোজা পুবদিকে গেলে আমরা নিশ্চয়ই সমুদ্র দেখতে পাবো। আমার তো অন্তত তাই বিশ্বাস।'

'সেই ভালো,' সারভিস এ-কথায় সায় দিলে, 'আরেকটু এগিয়ে গিয়ে দেখলেই নিশ্চিত হওয়া যাবে। তবে বনের মধ্যে ঢোকবার আগে কিছু খেয়ে নেয়া দরকার, নইলে পা দুটো আর চলতে চাইবে না।'

তখন সবাই পাহাড় থেকে নেমে প্রথমে পেট ভ'রে সেই নুন-মাখানো কচ্ছপের মাংস খেয়ে নিলে, তারপর একটু বিশ্রাম ক'রেই আবার বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। এবার একেবারে সোজাসুজি পুবদিকে যেতে হবে।

এতক্ষণ পাহাড়ি রাস্তায় চলতে তাদের তেমন কষ্ট হয়নি, কিন্তু এখন বনের মধ্যে চলতে তাদের রীতিমতো কষ্ট হ'তে লাগলো। ঝোপঝাড় নিবিড় ও ঘন, কোনো রাস্তা নেই ব'লে এই বন্ধুর জমির উপর দিয়ে কখনো মাথা নুইয়ে, কখনো ডালপালা সরিয়ে, কখনো-বা কুড়ুল দিয়ে ঝোপঝাড় সাফ ক'রে যেতে তাদের কেবল অনেক সময়ই লাগলো না, বেশ অসুবিধেও হ'তে লাগলো।

শেষকালে সেই ঘন ঝোপ যখন তারা পেরিয়ে এলো তখন সন্ধে ক'রে এসেছে। এখানে ঝোপঝাড় অনেক কম, গাছপালারও ততটা ঠেশাঠেশি ভিড় নেই; একটা ফাঁকা জায়গা দেখে বেছে শুকনো ডালপালা কুড়িয়ে জড়ো ক'রে তাতে আগুন

banglabooks.in

ধরিয়ে দিলে তারা। এই আগুনের কুণ্ডের পাশেই তারা সারা রাত কাটাবে—ভোরবেলায় আবার ছোটোহাজরি সেরে এখান থেকে পাততাড়ি গুটোবে।

পরদিন বেলা দুটোর সময় তারা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছুলো—সেখান দিয়ে একটা ছোট্ট পাহাড়ি নদী ব'য়ে চলেছে। বড়োজোর হাঁটু-জল নদীতে, কিন্তু স্বচ্ছ যেন কাচ—এত টলটলে! তাকালে নিচের নুড়ি-পাথর দেখা যায়। পাহাড়ি নদী ব'লেই হোক কিংবা নিচে রাশি-রাশি পাথর ব'লেই হোক, এইটুকু ছোটো নদীর স্রোত কিন্তু বেশ প্রখর।

নদীর পাড় ধ'রে তারা খুব সহজেই অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এলো। কিন্তু একটা জায়গায় এসে তারা যখন দেখলে যে কে যেন নদী পেরুবার জন্যে জলের মধ্যে সারি-সারি বড়ো-বড়ো পাথর সুন্দরভাবে সাজিয়ে রেখেছে, তখন তারা সন্ত্রস্ত ও বিস্মিত হ'য়ে পড়লো। প্রকৃতিঠাকরুনের কি এতই দয়া যে কবে কোনকালে একদল ছেলে এই দ্বীপে এসে আশ্রয় নেবে ব'লে তাদের সুবিধের জন্যে এখানে এ-রকম ভাবে নদী পেরুবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন? না কি এটা মনুষ্য নামক বুদ্ধিমান জীবের কাণ্ড? তবে কি এখানে মানুষ থাকে?

হঠাৎ এই পাথরগুলো দেখে তারা আরো সাবধান হ'য়ে গেলো। চোখ-কান খোলা রেখে ভালো ক'রে চারপাশ দেখে-দেখে এগুতে লাগলো তারা।

কিন্তু সেদিনও সারাদিন অবিরাম হণ্টনের পর না দেখা গেলো সমুদ্র, না-বা কোনো মনুষ্যমূর্তি। সন্ধেবেলায় সারাদিনের পথশ্রমে ও ধকলে তারা অতি ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত তখন। তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে পড়ার মতো একটা আশ্রয় খুঁজতে লাগলো তারা।

বেশিক্ষণ অবশ্য খুঁজতে হ'লো না তাদের। একটুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেলো একটা প্রকাণ্ড গাছ—তার একটা মস্ত ডাল প্রচুর শাখা-প্রশাখা লতাপাতা নিয়ে মাটি পর্যন্ত এমনভাবে নুয়ে পড়েছে যেন সেটা একটা কুঁড়েবাড়ি। এখানেই তারা সে-রাত্রির মতো আশ্রয় নেবে ব'লে স্থির করলে।

সকালবেলাটা সোনালি হ'য়ে দেখা দিলে। আকাশ ঝলমল করছে, চারদিক জ্যোতির্ময়। সবচেয়ে আগে ঘুম ভাঙলো সারভিসের। আড়মোড়া ভাঙতে-ভাঙতে উঠে বসলো সে চটপট, তারপর ম্যাজমেজে ভাবটা কাটাবার জন্যে আস্তে-আস্তে সেই কুঁড়েবাড়ির বাইরে এসে দাঁড়ালে।

তারপরেই শুরু হ'লো তার চীৎকার; 'ব্রিয়ঁ, ডনাগান, উইলকক্স! শিগগির এদিকে এসো।'

banglabooks.in

সকলে তাড়াহুড়ো ক'রে বেরিয়ে আসতেই উত্তেজিত সারভিস হাত-পা নেড়ে বললে, 'ওই দ্যাখো, সারা রাত আমরা কীসের তলায় কাটিয়েছি !'

সবাই তখন তাকিয়ে যে-দৃশ্য দেখতে পেলে, তাতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে কারু কোনো বাক্যস্ফূর্তি হ'লো না—কিয়ৎক্ষণ অন্তত সবাইকেই স্তম্ভিত হ'য়ে থাকতে হ'লো। যার তলায় তারা রাত্তিরটা ঘুমিয়ে কাটিয়েছে, সেটা কোনো শাখাবহুল গাছ নয়, একটা ছোট্ট কুটির। এই অদ্ভুত কুটিরের বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে এর কোনো দেয়াল নেই। গাছের গায়ে ঠেকানো চালটা চারধারে ঢালু হ'য়ে নেমে গিয়েছে। আমেরিকায় রেড-ইণ্ডিয়ানরা এই ধরনের ঘরে বাস করে। এই ধরনের কুঁড়েবাড়িকে তারা বলে 'অ্যাজুপা'।

অবশেষে প্রথম মন্তব্য করলে ডনাগান, 'দ্বীপে তাহ'লে লোক আছে !'

'আপাতত না-থাকলেও,' বললে ব্রিয়ঁ, 'অতীতে যে কখনও ছিলো সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।'

'এইবার বোঝা গেলো', উইলকক্স মন্তব্য করলে, 'নদীর উপর কেন অমনভাবে পাথর সাজানো রয়েছে।'

দস্তুরমতো চাঞ্চল্য বোধ করা সত্ত্বেও সেখানে আর দেরি না-ক'রে তক্ষুনি আবার তারা রওনা হ'য়ে পড়লো। কয়েক ঘণ্টা হাঁটবার পর দেখা গেলো বনের চেহারা একটু পালটে গেছে, এখন আর আগের মতো তেমন বড়ো-বড়ো গাছ চোখে পড়ে না—কেবল মাথা-সমান উঁচু ঝোপঝাড়। একটু পরেই সেই ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে তারা একটা বালুচরে এসে পৌঁছুলো। বালুচরের অল্প দূরেই এক তরঙ্গময় উত্তাল সমুদ্র তার অজস্র ফেনা নিয়ে বেলাভূমির উপর আছড়ে পড়ছে।

ব্রিয়ঁার অনুমানই তবে সত্যি হ'লো। জায়গাটা তাহ'লে কোনো মহাদেশের অংশ নয়, সত্যি-সত্যিই একটা দ্বীপ !

এক অর্থে উদ্ধারের আশা অনেক ক'মে গেলো বটে, তবে অনিশ্চয়তা ও অস্বস্তির হাত থেকে তো রেহাই পাওয়া গেলো ! অন্তত তারা যে কোথায় আছে সে-সম্বন্ধে তাদের আর কোনো বিভ্রম রইলো না। যাক, শেষ পর্যন্ত এটা তো জানা গেলো তারা কোথায় এসে উঠেছে—তাদের তদন্ত তো আর ব্যর্থ হয়নি, তবে আর খামকা দেরি ক'রে কী লাভ ?

অল্প একটু জিরিয়ে নিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে ফিরে যাবে ব'লে স্থির করলে তারা। হঠাৎ এমন সময় ব্রিয়ঁার চোখ পড়লো ফ্যান-এর দিকে। কুকুরটা হঠাৎ

banglabooks.in

কী মনে ক'রে যেন সমুদ্রতীর ধ'রে ছুটে চলেছে। ত্রিয়ঁার দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে সারভিস ঘুরে তাকিয়ে ফ্যানের কাণ্ড দেখে চেঁচিয়ে হাঁক পাড়লে, 'ফ্যান, ফ্যান, এদিকে আয় !'

ফ্যান কিন্তু আদৌ তার হাঁকডাকে পাত্তা দিলে না, একেবারে সোজা জলের ধারে গিয়ে দাঁড়ালে। তারপর ফ্যান যে কাণ্ড করলে, তাতে তাদের বিস্ময়ের আর সীমা রইলো না : ফ্যান তীরে দাঁড়িয়ে জলে মুখ ডুবিয়ে চকচক ক'রে জল খাচ্ছে। সমুদ্রের জল তো লোনা, ফ্যান তা কী ক'রে পান করছে ?

বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই চারজনে অবাক হ'য়ে তীরে ছুটে গেলো। উইলকক্স এক আঁজলা জল নিয়ে মুখে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ; 'এ-কী কাণ্ড ! সমুদ্রের জল এত মিষ্টি, এত পরিষ্কার হ'লো কেমন ক'রে ?'

তখন অন্যরাও সেই জল পান ক'রে দেখলো—অতি পরিষ্কার, টাটকা, মিষ্টি জল। যে-সুবিস্তৃত জলরাশিকে তারা এতক্ষণ সমুদ্র ব'লে মনে করেছিলো, তা তবে সমুদ্র নয়, একটি দিগন্তবিসারী হ্রদ !

সঙ্গে-সঙ্গেই আবার তাদের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হ'লো। দ্বীপ, না মহাদেশ সে-সম্বন্ধে এখনও কোনোভাবে নিশ্চিত হওয়া গেলো না। তাহ'লে আরো-কিছু অনুসন্ধান না-ক'রে ফিরে যাওয়ার মানে হয় না।

খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে আবার তারা অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়বে ব'লে ঠিক করলো।

রাত্তিরটা এক জায়গায় কাটিয়ে পরদিন ভোর থেকেই আবার তাদের চলা শুরু হ'য়ে গেলো।

অনেকক্ষণ পরে একটা পাহাড়ের কাছে গিয়ে পৌঁছুলো তারা ; ছোটো একটা নদীর কিনার ঘেঁষে উঠেছে পাহাড়টা। নদীর দক্ষিণ পাড়ে মস্ত জলাভূমি—সেটা এত-বড়ো যে তার কোনো কূলকিনারা দেখা গেলো না। নদী এখানে যেমন চওড়া, তেমনি গভীর।

ওরা অবিশ্যি পাহাড়টায় ওঠবার চেষ্টা করলে না, বরং তার পাশ কাটিয়ে নিয়ে অল্পক্ষণ পরেই একটি সমতল ভূমির উপর গিয়ে পৌঁছুলো—আর এমন সময়েই হঠাৎ কী-একটা জিনিশ দেখতে পেয়ে সারভিস বিস্মিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো।

সকলে তাকিয়ে দেখলে, কতগুলো বড়ো বড়ো পাথরের আড়ালে একটা জীর্ণ নৌকো প'ড়ে আছে। নদীর তীর থেকে জায়গাটা খুব দূরে নয়। বছরের পর বছর একটানা রোদে-বৃষ্টিতে প'ড়ে থেকে নৌকোটার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

banglabooks.in

শ্যাওলা-লাগা কাঠগুলো প'চে জীর্ণ হ'য়ে পড়েছে, কতদিন আগে যে নৌকোটা ব্যবহার্য অবস্থায় ছিলো তা পর্যন্ত তার এই দশা দেখে বোঝবার উপায় নেই।

ওই ভাঙা নৌকোটা দেখে ওদের মনের অবস্থা কী-রকম হয়ে উঠলো, তা সহজেই অনুমান করা যায়। তাদের মনে হ'লো কাছেই কোথাও নিশ্চয়ই বুনোরা ওৎ পেতে আছে, এই বুঝি হুড়মুড় ক'রে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে!

এদিকে ফ্যানের রকমশকমও হঠাৎ কী-রকম অদ্ভুত হ'য়ে উঠেছে। ঝোলা কান-দুটো খাড়া-খাড়া, ল্যাজটা নিশানের মতো শূন্যে তোলা, সমস্ত শরীরটা টান-টান। গরর্-গরর্ ক'রে চাপা গর্জন ক'রে একটু ছুটে যায় সে সামনে, পরক্ষণেই যেন ভয় পেয়ে ল্যাজ গুটিয়ে ছুটে পালিয়ে আসে তাদের কাছে—গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। হঠাৎ কেন সে অমন অদ্ভুত ব্যবহার করছে, তা তারা বুঝতে পারলে না।

এমন সময় হঠাৎ কাছের একটা পুরোনো বীচ গাছের গুঁড়ির উপর চোখ পড়লো ডনাগানের। সেই গাছের গায়ে কে যেন ছুরি দিয়ে পরিষ্কারভাবে দুটি ইংরেজি হরফ খোদাই ক'রে রেখেছে, যেন কারু নামের আদ্য অক্ষর, আর তারই নিচে আরবি হরফে কতগুলো সংখ্যা খোদাই করা—সম্ভবত সালটা লিখে রাখা :

F. B.

1827

ভূতে-পাওয়ার মতো চারজনে সেই হরফগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলো। ফ্যান কিন্তু তখনও তেমনি অস্থির হ'য়ে আছে। তার ভাবভঙ্গিতে আশ্বস্ত হবার মতো কিছু নেই। রকমশকম দেখে ব্রিয়ঁ উদ্বিগ্ন গলায় বললে, 'খুব সাবধান, সামনে নিশ্চয়ই কোনো বিপদ আছে! ফ্যানের ভাবগতিক দেখে ব্যাপার খুব সুবিধের ঠেকছে না।'

চারজনে তখন বন্দুক উঁচিয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে ফ্যানের পিছন-পিছন এগুতো লাগলো। খানিক দূর এগিয়ে একটা ঘন ঝোপের কাছে দাঁড়িয়ে ফ্যান কেবল চাপা গর্জন করতে লাগলো। ব্রিয়ঁ একটু উঁকি মেরে দেখে বললে, 'ভিতরে কোনো গুহা আছে ব'লে মনে হয়!'

ডনাগানও ভালো ক'রে দেখেশুনে চাপা গলায় বললে, 'তা-ই তো মনে হচ্ছে।'

তক্ষুনি ব্রিয়ঁ মনস্থির ক'রে ফেললে! বললে, 'ভিতরটা একবার দেখা যাক।'

তখন দু'জনে কুড়ুল নিয়ে ঝোপঝাপ সাফ ক'রে ভিতরে ঢোকবার পথ ক'রে নিলে, আর বাকি দু'জন বন্দুক হাতে তৈরি হ'য়ে রইলো। পথ ক'রে নিলেও তক্ষুনি ঝোপের মধ্যে না-ঢুকে ভিতরে কী আছে, তা তারা কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, কেবল ফ্যানের চাপা গর্জন শোনা যাচ্ছে গরর্-

banglabooks.in

গরর্। এখনও ফ্যান তেমনি চঞ্চল, ত্রস্ত ও উত্তেজিত। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শেষটায় সাহসে বুক বেঁধে নিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লো। খানিকটা গিয়ে সবাই আবার সেই পাহাড়ের তলদেশে এসে হাজির।

এসে দ্যাখে, পাহাড়ের গায়ে বেশ বড়ো-একটা গুহা। তবে গুহার ভেতরে ঢোকবার পথটা নিতান্তই ছোটো ও সংকীর্ণ। গুহাটা দেখে চারজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। কী-রকম একটা অস্বস্তি হচ্ছিলো সকলের, ভয়ও যে হয়নি তাও নয়। কিন্তু জুজুর ভয়ে ডরাবার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া ভিতুর মতো জুবুথবু হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই বা চলবে কেন? গুহার ভিতরটা পরীক্ষা ক'রে দেখা খুব দরকার; হয়তো এই গুহাই ওদের ভবিষ্যতের আশ্রয় হবে।

কিন্তু তাই ব'লে কোনো অন্ধকার বায়ুশূন্য গহ্বরে তো আর গোঁয়ার্তুমি ক'রে ঢুকে পড়া যায় না। ভিতরটা যদি বিষাক্ত গ্যাসে ভরা থাকে, তাহ'লে যে একটুতেই প্রাণসংশয় হবে। অযথা বেপরোয়াভাবে শূন্যে ঝাঁপ খাওয়ার কোনো অর্থ নেই।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে কী করবে ভাবছে, এমন সময় ব্রিয়ঁার মাথায় একটা চমৎকার ফন্দি খেলে গেলো। চটপট কিছু শুকনো পাতা জড়ো ক'রে গুহার ভিতরে ফেলে দিলে সে, তারপর তাতে আগুন ধরিয়ে দিলে। সেই স্তূপীকৃত শুকনো পাতা আগুনের স্পর্শেই দাউদাউ ক'রে জ্ব'লে উঠলো। তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো ব্রিয়ঁা: 'যাক, ভেতরটা তবে বিষাক্ত গ্যাসে ভরা নয়।'

উইলকক্স এতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে ব্রিয়ঁার কাণ্ডকারখানা দেখছিলো। এবার সে ভয়ে-ভয়ে জিগেশ করলে, 'এই অন্ধকার অজানা গহ্বরের মধ্যে এক্ষুনি ঢুকবে নাকি?'

'নিশ্চয়ই', ঘাড় নাড়লে ব্রিয়ঁা।

'কিন্তু বিষাক্ত গ্যাস না-থাকলেও ভিতরে তো কত বুনো জীবজন্তুও থাকতে পারে?' বললে ডনাগান, 'আরেকটু অপেক্ষা ক'রে সব দেখেশুনে নিলে হয় না কি?'

'কী দরকার? ওই বড়ো ডালটায় আগুন ধরিয়ে মশাল বানিয়ে নিচ্ছি। সঙ্গে তো আমাদের অস্ত্রশস্ত্র আছে—একেবারে খালি হাতে তো আর ভিতরে ঢুকছি না!' ব'লে ব্রিয়ঁা মস্ত একটা শুকনো ডাল জ্বালিয়ে নিয়ে মশালের মতো হাতে তুলে নিলে।

মুখে খুব বেপরোয়া ও ডাকাবুকো কথা বললে কী হয়, এটা ঠিক যে ব্রিয়ঁারও

banglabooks.in

বেশ ভয় করছিলো। তবু সে গুহার মধ্যে মশাল হাতে ঢুকে পড়লো—অন্যরা চুপচাপ তাকে অনুসরণ করলে। ফ্যানও ল্যাজটকে পায়ের ভিতর গুটিয়ে নিয়ে আস্তে-আস্তে সঙ্গে চললো।

সকলেরই বুকে ভয়। কেমন-একটা ছমছমে ভাব গুহাটার মধ্যে। বেশ বুক দুরুদুরু করছে। একেবারে অজানা একটা পাহাড়ের অন্ধকার গুহার মধ্যে কী তাদের জন্যে প্রতীক্ষা করছে কে জানে! হয়তো এটা আসলে তাদের মৃত্যুপুরী: অজস্র অচেনা ভয় ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বে আচমকা।

গুহার প্রবেশ-পথটি চার ফুট উঁচু, ও দুই ফুট চওড়া। কিন্তু ভিতরটা বেশ সুপরিসর, একটা হলঘরের মতো বড়ো। উচ্চতায় বারো ফুট, আর লম্বায় চওড়ায় পঁচিশ ফুটেরও বেশি—প্রায় একটা বর্গক্ষেত্রের মতো। মেঝেটা বালি আর শক্ত পাথরে ঢাকা।

মশালটা কিছুতেই ভালো জ্বলছিলো না। শিখাটা দপদপ ক'রে লাফাচ্ছিলো, আর সেইসঙ্গে মেঝেয় আর দেয়ালে তাদের ছায়াও। কিম্ভূত সব মূর্তির মতো দেখাচ্ছে তাদের ছায়াগুলো। হঠাৎ উইলকক্স সেই আবছায়ায় না-দেখতে পেয়ে কীসের উপর যেন হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলো। অন্যরা আলো নিয়ে হেঁট হ'য়ে দেখলো উইলকক্স যার গায়ে ধাক্কা খেয়েছে সেটা একটা কাঠের বেঞ্চি। বেঞ্চিটাকে দেখে তাদের আর বাক্স্ফূর্তি হ'লো না। এবার ভালো ক'রে আশপাশে তাকাতেই একটু দূরে একটা পুরোনো কাঠের টেবিল চোখে পড়লো তাদের। কাছে গিয়ে দেখলো টেবিলের উপরে রয়েছে একটা মাটির কলসি, দুটো থালা, একটা বড়ো ছুরি, একটা এনামেলের পেয়ালা, একটা পিতলের জগ ও মাছ ধরবার কিছু সরঞ্জাম। ওপাশের দেয়ালের কাছে একটা বড়ো কাঠের সিন্দুকও দেখা গেলো। টান দিতেই নড়বোড়ে ডালাটা খুলে গেলো, দেখা গেলো ভিতরে কয়েক প্রস্থ অতি জীর্ণ জামাকাপড় রয়েছে।

অতীতে কখনও যে এই গুহায় কোনো মানুষ থাকতো, তাতে আর কোনো সন্দেহই রইলো না। কিন্তু সে কতকাল আগের কথা? কে থাকতো এই গুহায়—কে বা কারা? সেই লোকটি বা লোকজনদেরই বা কী হ'লো?

প্রশ্নগুলোর কোনো উত্তর জানে না ব'লেই কেউ কোনো কথা বলছিলো না। চুপচাপ সব দেখতে-দেখতে হলঘরের অন্য প্রান্তে এসে পড়লো তারা। পাথরের দেয়ালের গায়ে কেউ সমুদ্রের শুকনো শ্যাওলা বিছিয়ে একটা শয্যা প্রস্তুত করেছিলো বোধহয়—শিয়রের কাছে একটা টুল, তার উপর একটা কাঠের বাতিদান, মোম গ'লে-গ'লে তলায় গিয়ে জমা হ'য়ে আছে।

banglabooks.in

বিছানার উপর একটা চাদর বিছোনো। ব্রিয়ঁা হাত বাড়িয়ে চাদর সরাতে গিয়ে কী মনে ক'রে হঠাৎ থমকে গেলো। হয়তো চাদর সরালেই একটা মৃতদেহ চোখে পড়বে। পরক্ষণেই বুকে বল এনে টান মেরে সে ছেঁড়া চাদরটা তুলে ফেললে। না, বিছানার উপর কোনো মৃতদেহ প'ড়ে নেই।

এতক্ষণে হঠাৎ তাদের খেয়াল হ'লো যে ফ্যান তাদের সঙ্গে নেই। গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে সে সমানে চ্যাচামেচি ক'রে চলেছে। কোনো কথা না-ব'লে চারজনে এবার বাইরে বেরিয়ে এলো।

সামনে কিছু দূরেই নদী। দুয়ার থেকে নদীর তীর অবধি একটা ঘন ঝোপের সারি। ঝোপজঙ্গল সাফ ক'রে-ক'রে নদীর দিকে এগুবার চেষ্টা করলে তারা। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, অমন সময় একটা ভয়াবহ দৃশ্য দেখে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সবাই ভয়ে চেঁচিয়ে উঠেই, পাথরের মূর্তির মতো, নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

একটা মস্ত বীচ গাছের গোড়ায় একরাশ হাড়গোড় প'ড়ে আছে। অস্থিসংস্থান দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে মানুষের কঙ্কাল!

৬

ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁ

সেই ভীষণ নরকঙ্কাল দেখে চারজন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলো। এ-রকম একটা আশঙ্কা যে তারা মনে-মনে করেনি, তা নয়—কিন্তু তবু তাদের আশঙ্কাকে সত্য হ'তে দেখে কিছুক্ষণ তারা কোনো কথা বলতে পারলে না। একটু পরে, ঘোর খানিকটা কমলে, ধীরে-ধীরে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় ক'রে আরেকটু এগিয়ে দাঁড়ালে তারা। লোকটা হাত-পা ছড়িয়ে চিত হ'য়ে শুয়ে মারা গিয়েছিলো, গোটা কঙ্কালটা এখনও তাই আস্ত আছে। তখনও ভয়ে তাদের বুক দুরুদুরু করছে।

কে এই হতভাগ্য যে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে এই নির্জন দ্বীপে মৃত্যু বরণ করেছে! সে কি কোনো ডুবে-যাওয়া জাহাজের নাবিক? না কি কোনো সত্যান্বেষী অভিযাত্রী? কোন দেশের লোক সে? বয়েসই বা কত ছিলো তার তখন? কত দিন কত মাস কত বছর না-জানি এই জনহীন অজ্ঞাত দ্বীপে সে কাটিয়েছিলো!

banglabooks.in

হয়তো যৌবনে কোনো-একদিন এই দ্বীপে এসে উঠেছিলো সে, তারপর বছরের পর বছর একা কাটিয়ে একেবারে বুড়ো হ'য়ে ফেলেছে শেষ নিশ্বাস !

এই নরকঙ্কালটি দেখে ব্রিয়ঁার সন্দেহই সত্য ব'লে মনে হয়। সত্যিই যদি এটা কোনো মহাদেশের অংশ হয়, তাহ'লে এই হতভাগ্য নাবিক কেন একই জায়গায় সারা জীবন কাটিয়েছিলো ! কেন সে পুবদিকে এগিয়ে গিয়ে কোনো শহর বা জনপদে যাওয়ার চেষ্টা করেনি ? সেদিকে যাওয়ার এমন-কী দুর্লঙ্ঘ্য বাধা আছে যা সে অতিক্রম করতে পারেনি ? না কি সে কোনো জায়গা থেকে পালিয়ে এসে এখানে লোকালয়ের বাইরে আশ্রয় নিয়েছিলো ? হয়তো মনুষ্য জাতির উপর বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে মানুষের সংস্রব ত্যাগ ক'রে একা সারা জীবন কাটাবার সংকল্প নিয়ে সে এখানে এসে হাজির হয়েছিলো !

প্রশ্ন আরো অনেক ভিড় ক'রে আসছে মনের মধ্যে, কিন্তু কোনো সদুত্তর পেতে হ'লে সব-আগে বোধহয় সেই গুহার ভিতরটা খুব ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার। হয়তো সেখানে এমন-কিছু নিদর্শন বা এমন-কোনো কাগজপত্র পাওয়া যাবে, যা থেকে এই হতভাগ্য নাবিক ও তার জীবন সম্পর্কে অনেক দরকারি খবর পাওয়া যাবে। সেইসব খবর তাদের পক্ষেও কম জরুরি নয়। আর সামনে যে-রকম প্রচণ্ড শীত আসন্ন, তাতে এই গুহাও তাদের ভবিষ্যতের আশ্রয় হ'তে পারে।

এইসব কথা ভেবে চারজনে ফের সেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করলে। অন্য-কোনো সময় হ'লে ডনাগান হয়তো ব্রিয়ঁার কোনো নির্দেশই মান্য করতো না, কিন্তু এখন সবকিছু দেখেশুনে সে যেন কী-রকম ঘাবড়ে গিয়েছিলো, তাই এই সংকটের সময় সে আর-কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রে ব্রিয়ঁার নির্দেশ মেনে চলতে লাগলো।

এবার তারা গুহার ভিতরটা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে লাগলো। একদিকে দেয়ালের গায়ে একটা কাঠের শেল্‌ফ্‌, তার উপর অনেকগুলো মোমবাতি। মোম-বাতিগুলো চর্বি আর মোম দিয়ে হাতে তৈরি—খুব সম্ভব ওই লোকটারই কাজ। সারভিস একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে টেবিলের উপর রাখলে।

গুহাটা বেশ বড়ো। প্রাচীর শক্ত গ্র্যানাইট পাথরের, মেঝেও বেশ শুকনো খটখটে—মোটেই ভিজে বা স্যাঁতসেঁতে নয়। বেরুবার দরজা কিন্তু সেই একটাই—নদীর দিকে মুখ। গুহার মধ্যে হাওয়া চলাচলের জন্যে আর-একটি দুয়ার থাকলে ভালো হ'তো—ব্রিয়ঁা মনে-মনে ভাবলে। তাহ'লে বিপদের সময়ে এই গুহাটিই তাদের নিরাপদ আশ্রয় হ'তে পারবে, তাতে পনেরো জনের এখানেই কুলিয়ে যাবে।

banglabooks.in

গুহার জিনিশপত্রের একটি তালিকা তৈরি করলে ব্রিয়ঁা। নিতান্তই সামান্য জিনিশপত্র। কী নিদারুণ অভাব আর দৈন্যের ভিতর এই হতভাগ্য লোকটিকে দিন কাটাতে হয়েছে! কতগুলি ভাঙা তক্তা, একটা কুড়ুল, একটা শাবল, একটা কোদাল, রান্নার দু-চারটে পাত্র, একটা হাতুড়ি—এই ছিলো তার সম্বল।

সব দেখে-শুনে ব্রিয়ঁা মনে-মনে সংকল্প স্থির ক'রে ফেললে। সঙ্গীদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই গুহাই এখন থেকে আমাদের আশ্রয় হবে। একদা যখন এর মধ্যে লোক থাকতো তখন আমরাই বা পারবো না কেন?'

মুখে এ-কথা বললে বটে, কিন্তু তবু একবার তার বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। বাইরের সেই নরকঙ্কালটির ভয়ংকর করোটি যেন সেই গুহার আবছায়ার মধ্যে তার দিকে তাকিয়ে এক ভীষণ শুভ্র মরা হাসিতে ভ'রে উঠেছে। সেই লোকটির মতো তারাও কি এই অজানা দেশে একে-একে মারা যাবে? শেষ অবধি যে বেঁচে থাকবে, তার তখন কী-ভয়াবহভাবে দিন কাটবে!···আচ্ছা, লোকটা মরেছে কীভাবে? কতদিন আগে? নিশ্চয়ই অনেক দিন আগে—গাছতলার সেই শুকনো, শুভ্র, মরা হাড়গুলো তো স্পষ্টই সে-কথা বলে। হয়তো পঁচিশ-তিরিশ বছর আগে। কেননা গাছের গায়ে তো ১৮২৭ খ্রিষ্টাব্দের উল্লেখ করা আছে। এই পঁচিশ-তিরিশ বছরের মধ্যে কেউ কি আর এই গুহায় পদার্পণ করেনি? এই তিরিশ বছরের মধ্যে কেউ কি আর এ-দ্বীপে এসে আশ্রয় নেয়নি?

খুঁজতে-খুঁজতে আরেকটা বড়ো ছুরি পাওয়া গেলো। তারপর পাওয়া গেলো একটি বহু পুরোনো কম্পাস। অবশেষে একটি চায়ের কেটলিও আবিষ্কার করা গেলো। কিন্তু জাহাজ চালাবার বা দিকনির্ণয় করবার আর-কোনো যন্ত্রই তারা সেখানে খুঁজে পেলে না। এমনকী একটা বন্দুক পর্যন্ত তাদের চোখে পড়লো না।

হঠাৎ ঘরের এক কোণে চোখ পড়তেই সারভিস চেঁচিয়ে উঠলো, 'ছাখো, ছাখো, ওটা কী?'

সেই অদ্ভুত জিনিশটা যে কী তারা প্রথমটায় বুঝতে পারলে না। তার পাশেই আবার সেইরকমই আরেকটি জিনিশ। অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা ক'রে দেখে ব্রিয়ঁা অবশ্যি শেষটায় জিনিশটা কী তা বুঝতে পারলে। প্রথম জিনিশটার নাম 'বোলা'। বইয়ে পড়েছিলো, আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা এই বোলা-র সাহায্যে নানা বুনো জানোয়ার ধ'রে থাকে। একটা প্রকাণ্ড লম্বা দড়ির দু-দিকে দুটো বল বাঁধা; সেটা ছুঁড়ে তারা যে-কোনো জানোয়ার ধরতে পারে। এমনি তাদের অভ্যস্ত ও ক্ষিপ্র হাত যে তা ছুঁড়ে কোনো জানোয়ারের উপর নিক্ষেপ করলে জানোয়ারটি তক্ষুনি

banglabooks.in

মাটিতে প'ড়ে যায় ও তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিমেষের জন্যে অবশ হ'য়ে পড়ে। তখন কাছে গিয়ে তাকে আয়ত্তে আনা কিছুই নয়। অন্য জিনিশটার নাম 'ল্যাসো'। ল্যাসোর সাহায্যে এমনকী বড়ো-বড়ো বুনো ঘোড়া পর্যন্ত পাকড়ানো যায়। এই-বারে বোঝা গেলো লোকটা কী ক'রে বনের জীবজন্তু শিকার করতো। এই বোলা আর ল্যাসোর সাহায্যে লোকটার বন্দুকের অভাব কিছুটা দূর হয়েছিলো নিশ্চয়ই।

বিছানার বালিশপত্র সরাতেই একটা ছোট্ট সুন্দর ঘড়ি দেখতে পেলে তারা। রুপোর ঢাকনা ঘড়িটার, সঙ্গে রুপোর চেন আর রুপোর চাবি। অনেক কষ্টে ব্রিয়ঁা ঘড়িটার ঢাকনা খুলতে পারলে। ভিতরে সোনার কাঁটা—কোনো-এক তারিখে তিনটে কুড়ি মিনিটের সময় তার দম ফুরিয়েছে। ব্রিয়ঁা চাবি ঘুরিয়ে দম দেবার চেষ্টা করলে, কিন্তু ঘড়ি তবু চললো না। ভিতরে কতদিন তেল পড়েনি কে জানে!

ডনাগান বললে, 'ঘড়ির ভিতরে নিশ্চয়ই ঘড়ি-নির্মাতার নাম লেখা আছে। দ্যাখো-তো ভালো ক'রে!'

হ্যাঁ, ব্রিয়ঁা লক্ষ ক'রে দেখতে পেলে ঘড়ির ডালার উপর খুদে-খুদে হরফে লেখা রয়েছে, 'দ্যলপঁশ, সাঁৎ মালো'। ফরাশি নাম। বোঝা গেলো ফ্রান্সের কোনো কারখানায় ঘড়িটা তৈরি হয়েছিলো। লোকটি যে কোথাকার, তা কিন্তু তখনও অজ্ঞাত র'য়ে গেলো। সম্ভবত ফরাশি। স্বদেশি জিনিশ ছাড়া সে কি আর কোনো ভিনদেশী জিনিশ ব্যবহার করবে? কিন্তু এ-সম্বন্ধে—বলাই বাহুল্য—নিশ্চয় ক'রে কিছুই বলা যায় না।

অবশ্য তাদের সমস্ত সন্দেহ অল্পক্ষণের মধ্যেই দূর হ'লো। খুঁজতে-খুঁজতে শেষ-কালে তাদের হাতে পড়লো একটা নোটবই। ভিতরের কাগজগুলো একেবারে হলদে হ'য়ে গেছে। তাতে ফরাশি ভাষায় কী যেন লেখা। ব্রিয়ঁা প'ড়ে দেখলে, নোট-বইয়ের প্রথম পাতায় নাম লেখা রয়েছে: 'ফ্রঁাসোয়া বদোয়ঁা'। যাক, লোকটা যে ফরাশি ছিলো, এবং আমৃত্যু এই গুহাতেই বাস করেছিলো, এ-বিষয়ে আর-কোনো সংশয় নেই।

ফ্রঁাসোয়া বদোয়ঁা! এই নামের আদি অক্ষর দুটিই তো তারা সেই গাছের গায়ে খোদিত দেখেছে!

খাতাটার পাতা উলটেপালটে ব্রিয়ঁা বুঝতে পারলে যে এটি আসলে বদোয়ঁার দিনলিপি। যে-দিন সে প্রথম দ্বীপে এসে উঠেছিলো, সেইদিন থেকে মৃত্যুর কয়েক-দিন আগেকার ঘটনা পর্যন্ত সেই রোজনামচার পাতায় লেখা। তবে অনেকদিন আগেকার পেনসিলের লেখা ব'লে অনেক জায়গায় একেবারে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

banglabooks.in

এক জায়গায় স্পষ্ট লেখা রয়েছে একটা জাহাজের নাম : 'দুগুয়ে ত্রুয়ঁ'। নিশ্চয়ই এই জাহাজে সে কাজ করতো, আর জাহাজটা ডুবে গিয়েছিলো প্রশান্ত মহাসাগরে। খাতার গোড়ার দিকে আবার সেই ১৮২৭ সালের উল্লেখ দেখা গেলো, ঠিক যে-সাল গাছের গায়ে খোদাই করা আছে। অর্থাৎ প্রায় তেত্রিশ বছর আগে ফ্রাঁসোয়া বদোয়ঁা এই দ্বীপে পদার্পণ করে। সেই জাহাজডুবির পর বেচারি বাইরে থেকে উদ্ধারের কোনো সাহায্যই আর পায়নি, তাই মৃত্যুর শেষদিন পর্যন্ত এই দ্বীপে তাকে একা কাটাতে হয়েছিলো কোনো নতুন রবিনসন ক্রুসোর মতো। এইসব কথা জেনে তাদের মনেও রীতিমতো দুশ্চিন্তা ও হতাশা জেগে উঠলো। হয়তো তাদের জন্যেও এই দুর্দশা ভবিষ্যতের বাক্সে তোলা আছে !

খাতাটা নাড়াচাড়া করতে ভিতর থেকে একটা মস্ত ভাঁজ-করা কাগজ মেঝেয় প'ড়ে গেলো। উইলকক্স সেটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখলো, হাতে-আঁকা একটা বিরাট মানচিত্র। অতি-বিশ্রী জঘন্য কালিতে আঁকা, কিন্তু অনুপুঙ্খগুলো বেশ স্পষ্ট। বদোয়ঁা নিশ্চয়ই দ্বীপে আসবার পর এখানকারই কোনো লতাপাতার রস দিয়ে এই কালি তৈরি করেছিলো।

উইলকক্স বললে, 'বদোয়ঁা যখন ম্যাপ তৈরি করতে পারতো, তখন সে তো নিশ্চয়ই কোনো সাধারণ নাবিক ছিলো না। সম্ভবত জাহাজের কোনো উঁচুদরের অফিসার ছিলো সে।'

'আমারও তাই মনে হয়,' বললে ডনাগান। 'কিন্তু ম্যাপটা কোন দেশের, তা বুঝতে পারছো, ব্রিয়ঁা ?'

কিছুক্ষণ পরীক্ষা ক'রে ব্রিয়ঁা বললে, 'আমার তো মনে হচ্ছে এটা এখানকারই ম্যাপ। এই ছাখো, এখানটায় আমাদের জাহাজ আছে। এই সেই উপসাগর, এখানটায় ছাখো সেই প্রবালশ্রেণী। এই ছাখো সেই হ্রদটা, যাকে আমরা সমুদ্র ব'লে ভুল করেছিলুম। এটা হচ্ছে দ্বীপের মাঝখানকার সেই গভীর অরণ্য, যার মধ্য দিয়ে আমরা এসেছি। হ্রদটা কিন্তু যতটা বড়ো ভেবেছিলুম, তেমন নয়। হ্রদের ওপারেই ভীষণ জঙ্গল আঁকা রয়েছে—আর তার ওপারেই এই ছাখো নীল রঙে সমুদ্র আঁকা।'

'তাহ'লে তো পুবদিকে আর-বেশি এগুনো সম্ভব হবে না,' সব শুনে সারভিস বললে, 'আর এইবারে বেশ বোঝা যাচ্ছে ব্রিয়ঁার অনুমানই ঠিক—আমরা যার উপর উঠেছি সেটা একটা সামান্য দ্বীপ। মহাদেশ মহাদেশ ক'রে আমরা মিথ্যেই এতদিন কেবল মাথা ঘামালুম।'

banglabooks.in

ম্যাপ থেকে আরো-একটা জিনিশ স্পষ্ট হ'লো : দ্বীপটা বর্তুল নয়, আয়ত—ঠিক যেন একটা প্রজাপতি জলে ডানা ছড়িয়ে ভাসছে। দ্বীপের মাঝখানে এক গভীর অরণ্য—আর অরণ্যের ঠিক মাঝামাঝি সেই হ্রদটা। অর্থাৎ হ্রদের এপারেও যেমন গভীর বন, ওপারেও তেমনি। হ্রদটা নিতান্ত ছোটো নয়, দৈর্ঘ্যে পনেরো মাইল, চওড়ায় পাঁচ-ছ মাইলের মতো। এত-বড়ো হ্রদকে সমুদ্র ব'লে ভ্রম হওয়াই স্বাভাবিক।

ম্যাপ দেখে আরো বোঝা গেলো, দ্বীপটা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় পঞ্চাশ মাইল, আর পূর্ব-পশ্চিমে ঠিক তার অর্ধেক। কিন্তু দ্বীপটা যে প্রশান্ত মহাসাগরের কোনখানে অবস্থিত, তা ম্যাপ থেকে বোঝা গেলো না। কোনো অক্ষাংশ বা দ্রাঘিমা রেখার উল্লেখ নেই।

তবে সবকিছু দেখে-শুনে এটা তারা বেশ অনুধাবন করতে পারলে যে, এই সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দ্বীপের উপর এখনও অনেক দিন তাদের কাটাতে হবে। দ্বীপটা সম্ভবত সমুদ্রের এমন জায়গায় অবস্থিত যার কাছ দিয়ে কোনো জাহাজ যাতায়াত করে না। এখন এই গুহার মধ্যে এসে সদলবলে আশ্রয় নেয়া ছাড়া তাদের আর-কোনো উপায় নেই। সুতরাং অযথা আর কালক্ষেপ না-ক'রে জাহাজ থেকে সব জিনিশপত্র গুহার মধ্যে নিয়ে আসাই হবে তাদের প্রথম কর্তব্য।

আজ তিন দিন হ'লো ব্রিয়ঁারা জাহাজ ছেড়ে অনুসন্ধানে বেরিয়েছে। নিশ্চয়ই গরডন ওদিকে এতক্ষণে তাদের জন্যে খুব চিন্তিত হ'য়ে উঠেছে। সুতরাং আর দেরি না-ক'রে এবারে সত্যি ফেরা উচিত।

ম্যাপটা দেখতে দেখতে ব্রিয়ঁা বললে, 'এখন আর বনের মধ্য দিয়ে গিয়ে কাজ নেই—কারণ ম্যাপে স্পষ্টই বলেছে এই নদীর তীর ধ'রে গেলে সবচেয়ে আগে আমরা সমুদ্রতীরে গিয়ে পৌঁছবো। বড়োজোর সাত মাইল পথ হবে। এটুকু রাস্তা আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পেরুতে পারবো। কিন্তু রওনা হওয়ার আগে আমাদের আরেকটা কর্তব্য আছে। যাঁর কল্যাণে আমরা এই দ্বীপ সম্বন্ধে এত তথ্য জানতে পারলুম, তাঁর আত্মার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শন করাই আমাদের আশু কর্তব্য।'

চারজনে মিলে সেই বীচ গাছের তলায় একটা কবর খুঁড়ে ফ্রাঁসোয়া বদোয়ঁার কঙ্কালটি টেনে এনে সমাহিত করলে। কবরের উপরে একটা কাঠের ক্রুশ পুঁতে দিতেও তারা ত্রুটি করলো না। তারপর তারা গুহার সামনে ফিরে এসে গুহার দুয়ার ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে, যাতে কোনো বুনো জানোয়ার পথ খোলা

banglabooks.in

পেয়ে ভিতরে ঢুকে আস্তানা গাড়তে না-পারে। এখন থেকে এই গুহাই তো হবে তাদের প্রধান আশ্রয়।

সেখান থেকে নদীর ধারে গিয়ে তারা নদীর ডান তীর ধ'রে পশ্চিমমুখো রওনা হ'য়ে পড়লো।

চলতে-চলতে দিনের আলো নিভে গেলো, অন্ধকার ক'রে এলো চারদিক, রাত হ'লো। ক্রমে রাত বেড়ে চললো। চারদিকে বনের মধ্যে কত ভয়-ধরানো শব্দ। রাত্তিরে আবার সামান্য শব্দও অনেক ছমছমে সম্ভাবনা জাগিয়ে দেয়। ডনাগানরা ব্রিয়ঁাকে অনেক বারণ করেছিলো, কিন্তু ব্রিয়ঁা তাদের সমস্ত নিষেধ উপেক্ষা ক'রে সোজা পশ্চিম দিকে এগিয়ে চলতে লাগলো।

এখন আর বন তেমন নিবিড় নয়। চারদিক বেশ ফাঁকা, কিন্তু কী-ভীষণ অন্ধকার! হঠাৎ ব্রিয়ঁার চোখে পড়লো, গাছপালার আড়ালে দূর দিগন্তে একটা আগুন দাউ-দাউ ক'রে জ্বলছে। সেই নিরেট অন্ধকারের মধ্যে অমন টকটকে লাল আলো দেখে প্রথমে সে বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো।

সারভিস রুদ্ধ স্বরে জিগেশ করলে, 'ব্রিয়ঁা, ওটা কী?'

ফিশফিশ ক'রে চাপা গলায় ডনাগান জানালে, 'আকাশের উল্কা ব'লে মনে হচ্ছে। দেখছো না কত উপরে জ্বলছে!'

সত্যি, আলোটা আকাশেই জ্বলছিলো। ব্রিয়ঁা কিন্তু আদৌ বিচলিত হয়নি, ভালো ক'রে দেখে খুব সহজ গলায় বললে, 'তোমাদের এত ভয় কেন, ডনাগান? ও-আগুন তো জাহাজের ছেলেরা জ্বেলেছে—নিশ্চয়ই গরডনের কাজ। আমাদের পথ দেখাবার জন্যে হাউই ছেড়েছে।'

ব্রিয়ঁার আন্দাজ যে মিথ্যে নয়, তা তারা একটু পরেই বুঝতে পারলে। তখন ডনাগান সংকেত ক'রে বন্দুকের শব্দ করলে। এক মিনিট পরেই জাহাজ থেকে পালটা ফাঁকা আওয়াজ হ'লো, সংকেতের উত্তর হিশেবে।

যাক, গরডন তবে বুঝতে পেরেছে যে ওরা এত রাতে ফিরছে। গরডনদের দুর্ভাবনা নিশ্চয়ই অনেকটা কমবে।

হনহন ক'রে চ'লে আর এক ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজের কাছে এসে পৌঁছুলো তারা।

banglabooks.in

আশ্রয় বদল

চার মূর্তির পুনরাবির্ভাবে অবশেষে জাহাজের অন্য ছেলেরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলে। এই ক-দিন কী দুশ্চিন্তাতেই যে কেটেছে ওদের !

সকলেরই কৌতূহল চরিতার্থ করলে ব্রিয়ঁা। তদন্তের ফলাফল জানবার জন্যে তারা হাঁশফাঁশ করছিলো। ব্রিয়ঁা তাদের খুঁটিনাটি সমেত এ ক-দিনের পুরো বিবরণ শোনালে। তখন সবাই মিলে একটা পরামর্শসভা বসলো: কী ক'রে জাহাজের সব মালপত্র পাহাড়ের সেই গুহায় নিয়ে যাওয়া যায়, এটাই তাদের প্রধান আলোচ্য।

প্রথমেই গরডন বললে, 'দেরি-টেরি ক'রে আর-কোনো লাভ নেই। চটপট আমাদের সব কাজ সেরে ফেলতে হবে। এদিকে জাহাজের যা হাল হয়েছে, তাতে খুব-একটা ভরসা পাওয়ার কিছু নেই। একটানা বৃষ্টির জলে ভিজে আর এ-কদিন রোদে পুড়ে সমস্ত তক্তা একেবারে ফাঁক-ফাঁক হ'য়ে গেছে—ঝড়ের পাল্লায় প'ড়েও বা যেটুকু অবশিষ্ট ছিলো, এখন আর তাও নেই। শীতের সময় এখানে থাকলে কাউকে আর প্রাণে বাঁচতে হবে না। ওদিকে আবার জাহাজটা দিনের পর দিন আরো কাৎ হ'য়ে পড়ছে।'

'এখন একটা ঝড় উঠলে আর দেখতে হবে না,'—বললে গারনেট, জাহাজটার মালিক আসলে তারই বাবা, 'জাহাজের সব তক্তাগুলো দশ দিকে উড়ে যাবে, আর আমরাও প্রাণে মরবো। জাহাজটা বাবার খুব প্রিয় ছিলো—তার যে শেষ-কালে এমন দশা হয়েছে, তা যদি তিনি চোখে দেখতেন তাহ'লে আর দুঃখের সীমা থাকতো না। আমরা বরং এখুনি যদি জাহাজের সব তক্তা, কাঠ, কড়ি, লোহালক্কড় সমস্তই সেই গুহায় নিয়ে যাই, তাহ'লেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেখানে এ-সব দিয়ে বেশ ঘর আর আশবাবপত্তর বানানো যাবে—তবু তো জিনিশ-গুলোর একটা সদ্গতি হবে !'

জেনকিন্স বললে, 'আমাদের ভবিষ্যৎ আশ্রয়ের জন্যে কিন্তু গুহাটার একটা নাম ঠিক করা উচিত।'

'ঠিক বলেছো,' ডনাগান সায় দিলে, 'সেই ফরাশি নাবিকের স্মৃতিচিহ্ন হিশেবে গুহার নাম হোক ফরাশি গুহা।'

ব্রিয়ঁা আর গরডন সমস্বরে সম্মতি প্রকাশ করলে, 'বেশ, আজ থেকে তার তাই নাম হ'লো।'

banglabooks.in

ডনাগান বললে, 'কিন্তু সব মালপত্তর সরাতে তো আর কম দিন লাগবে না ; তত দিন আমরা রাত কাটাবো কোথায় ?'

'কেন ? তাঁবু খাটিয়ে।' গরডন বাতলালে, 'নদীর ধারে কোনো গাছতলায় তাঁবু খাটালেই চলবে।'

ব্রিয়ঁা উঠে দাঁড়িয়ে সোৎসাহে বললে, 'সেই ঠিক। আর দেরি না-ক'রে কাল সকাল থেকেই যাত্রার আয়োজন করা যাবে। এখন সবাই গিয়ে শুয়ে পড়ো—কাল অনেক কাজ, ভালো ক'রে বিশ্রাম না-করলে এত ধকল তোমরা সইতে পারবে না।'

পরদিন সকালে প্রথমেই গরডন সাময়িক প্রয়োজন মেটাবার জন্যে বুদ্ধি ক'রে নদীর তীরে একটা তাঁবু খাটাবার ব্যবস্থা করলে। জাহাজের অত জিনিশ জঙ্গলের পথে বা নদীর তীর ধ'রে কাঁধে ক'রে বয়ে-নিয়ে-যাওয়া একেবারেই অসম্ভব, কেবলমাত্র নদীপথ ছাড়া অন্য-কোনো উপায় নেই। বর্ষার পরে নদী তখন কানায়-কানায় ভরা—অনায়াসেই ভেলায় ক'রে সব জিনিশ নিয়ে যাওয়া যাবে।

সবাই মিলে লেগে থেকে অবশেষে এক-এক ক'রে জাহাজ থেকে সব মালপত্তর নামিয়ে ফেললে। এইবারে জাহাজটা ভাঙতে হবে। নেহাৎ সহজ নয় কাজটা। অনেক কষ্টে সাঁড়াশি, শাবল, গাঁইতি আর হাতুড়ির সাহায্যে প্রথমে জাহাজের তলার পেতলের পরদাটা খুলে ফেলা হ'লো। বড়ো-বড়ো হুক আর ইস্ক্রুপগুলো খুলতে বেশ বেগ পেতে হ'লো অবিশ্যি, কিন্তু অনেক চেষ্টার পর সে-কাজটাও সম্পন্ন করা গেলো। তারপর জাহাজের খোলের তক্তাগুলো আস্তে-আস্তে খোলা হ'তে লাগলো। সে-যে কত অসংখ্য তক্তা, একটা গোটা জাহাজ দেখে তা কিছুতেই আন্দাজ করা যায় না—বোঝা-ই যায় না যে এত কাঠ এতে লেগেছিলো। এই তক্তাগুলো খুলতেই তাদের অনেক দিন লেগে যেতো, যদি-না প্রকৃতি হঠাৎ তাদের সহায় হ'তো।

এপ্রিলের শেষ দিকে একদিন বিকেল থেকেই আকাশ কালো হ'য়ে আসছিলো। বলা-নেই কওয়া-নেই চারদিক থেকে যত-রাজ্যের মেঘ এসে সেই দ্বীপের উপর জমা হচ্ছিলো, দিন থাকতেই অন্ধকার ক'রে ছিলো চারদিক। তারপর সন্ধে নামবার আগেই বিষম ঝড়বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গিয়েছিলো।

গতিক আদৌ সুবিধের ঠেকছিলো না। ছেলেরা জাহাজ থেকে নেমে তাড়া-তাড়ি তাঁবুর মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলে। নদীর তীরে কতগুলো গাছের নিচে তারা তাঁবু ফেলেছিলো। গাছের ডালে-ডালে তাঁবুর দড়ি বাঁধা। সেইজন্যেই বোধহয়

banglabooks.in

সে-রাতে তারা ঝড়ের দাপট ঠিক ক'রে বুঝতে পারেনি। ভোর রাত পর্যন্ত সমানে ঝড় গরজালো। তারপর সকালবেলায় হঠাৎ ঝড় থেমে গেলো। বৃষ্টিও রইলো না। সবাই তখন এসে দ্যাখে—কী সাংঘাতিক! ঝড় পুরোপুরি থেমে গেছে বটে, কিন্তু গোটা দ্বীপের উপর ধ্বংসের কী-চিহ্নই না রেখে গেছে! জাহাজের তক্তাগুলো সব খুলে চারদিকে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে আছে—আস্ত কাঠামোটাই ভেঙে চুরমার।

এই ধ্বংসের দৃশ্য অবশ্যি তাদের মনে আনন্দই সৃষ্টি করলো। ভাগ্যে ঝড় এসেছিলো, তাইতেই তো অনেক পরিশ্রমের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেলো!

এইবারে ভেলা তৈরি করবার পালা। জাহাজের কাঠগুলো সব এই কাজেই লাগলো। অনেক চেষ্টার পর একটা বিরাট ভেলা তৈরি করলে তারা। লম্বায় প্রায় তিরিশ ফুট, চওড়ায় তার অর্ধেক। বেশ সুন্দর ভেসে থাকলো জলের উপর।

ভেলাটাকে যখন তারা জলে ভাসিয়েছিলো, তখন জোয়ারের টান শুরু হয়েছে। চঞ্চল জলের উপর ভেলাটাও যেন ভেসে যেতে চেয়ে অস্থির হ'য়ে উঠছিলো বারে-বারে। তাই তারা একগাছা শক্ত দড়ি দিয়ে ভেলাটাকে একটা গাছের গুঁড়িতে বেঁধে রাখলো।

পরের দিন সকালবেলায় তারা ভেলার উপর একটা উঁচু প্ল্যাটফর্ম তৈরি করলে। ডেকের হালকা (কিন্তু মোটেই পলকা নয়) তক্তাগুলো দিয়ে সহজেই সেই প্ল্যাটফর্মটি তারা তৈরি করতে পারলে। তারপর বড়ো-বড়ো পেরেক মেরে আর মোটা-মোটা দড়ি দিয়ে বেঁধে সমস্ত ভেলাটাকেই খুব মজবুত করা হ'লো।

তৃতীয় দিনে শুরু হ'লো ভেলার উপর মাল বোঝাই করার কাজ: সেদিন দারুণ ঠাণ্ডা পড়েছিলো, তারই মধ্যে শীতে হি-হি করতে করতে সবাই একে-একে সব জিনিশ ভেলায় তুলে ফেললে।

বিকেলে সব মালপত্র ভেলায় চাপানো হ'লে পর ব্রিয়ঁ বললে, 'সবই তো হ'লো—চলো, আমরা পরশুই নতুন আস্তানার উদ্দেশে রওনা হ'য়ে পড়ি।'

'আবার পরশু কেন?' জিগেশ করলে গরডন, 'ভেলায় তো সবকিছুই তোলা হয়েছে—এদিকেও আর-কোনো কাজ নেই। ইচ্ছে করলে কালকেই ভেলা ছাড়া যায়।'

'না, কাল আমাদের যাওয়া হ'তে পারে না।' বললে ব্রিয়ঁ, 'কারণ পরশু দিন অমাবস্যা। সেদিন নদীতে খুব জোর জোয়ার আসবে। ভেলা তো আর কম ভারি

banglabooks.in

হয়নি—দাঁড় টেনে নিয়ে যেতে বেশ সময় লাগবে—তাছাড়া খামকা ক্লান্তও হ'য়ে পড়বে সবাই। জোয়ারের টানে এদিকে ভেলা সহজেই ভেসে যাবে। কাজেই'—

'সে-কথা ঠিক', বললে গরডন, 'তাহ'লে পরশুই রওনা হ'য়ে পড়বো, কী বলো!'

কিন্তু পরদিন ব্রিয়ঁা হঠাৎ এমন-একটা জিনিশ আবিষ্কার করলে যাতে তার মুখ কাগজের মতো শাদা হ'য়ে গেলো।

সকালবেলায় নদীর ধারে গিয়েছিলো ব্রিয়ঁা। হঠাৎ দেখলে নদীর তীরের সমুদ্রশৈবালের মধ্যে চাপ-চাপ শাদা বরফ ভাসছে। কে জানে, হয়তো ফরাশি গুহায় পৌঁছুবার আগেই সমস্ত নদী বরফে জ'মে যাবে! হয়তো এটা সুদূর অ্যাণ্টার্কটিক মহাসাগরের কোনো দ্বীপ। কিন্তু এখন তো আর সে-সব নিয়ে ভাববার সময় নেই—এক্ষুণি রওনা হ'য়ে পড়তে হবে।

রওনা হওয়ার আগে অবিশ্যি ছোটো একটা অধিবেশন হ'লো। ব্রিয়ঁা সবাইকে ডেকে বললে, 'সমুদ্রতীর ছেড়ে আমরা এখন ফরাশি গুহায় থাকতে চলেছি—কত দিন সেখানে থাকতে হবে জানি না—হয়তো দীর্ঘকাল। অত-দূর থেকে বনের ভিতর দিয়ে যখন-তখন আমরা এই সমুদ্রতীরে আসতে পারবো না—আর ফরাশি গুহা থেকে আবার সমুদ্রও চোখে পড়ে না। কাজেই দ্বীপের কাছ দিয়ে কোনো জাহাজ গেলেও আমরা জানতে পারবো না। অথচ এই দ্বীপ থেকে পরিত্রাণ পেতে হ'লে আমাদের এখন এমনিতর কোনো সাহায্যের ওপরই পুরো-পুরি নির্ভর করতে হবে। তাই আমার মতে, সমুদ্রতীরে সবচেয়ে লম্বা মাস্তুলটা পুঁতে তার উপর জাহাজের বড়ো নিশানটা উড়িয়ে রাখা যাক—ওই নিশান দেখে হয়তো কোনো জাহাজের লোকেরা বুঝতে পারবে দ্বীপে এসে কারা আশ্রয় নিয়েছে।'

কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রেই সকলে এই প্রস্তাবে সম্মতি দিলে। আর যেই সিদ্ধান্ত নেয়া, অমনি আর দেরি নয়—হুড়মুড় ক'রে সবাই মিলে জাহাজের সবচেয়ে লম্বা মাস্তুলটাকে সমুদ্রতীরে টেনে নিয়ে গেলো, আর তার উপর জাহাজের একটা মস্ত নিশান উড়িয়ে দিলে। সমুদ্রের হাওয়ায় সেই বিশাল পতাকা পৎপৎ ক'রে উড়তে লাগলো।

ততক্ষণে বেলা সাতটা বেজে গিয়েছে। অথচ তবু জোয়ারের কোনো দেখা নেই। নদীর জল শান্ত, ঠাণ্ডা, কানায়-কানায় ভরা। জোয়ার না-আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ব'লেই তারা ঠিক করেছিলো, কিন্তু ক্রমে বেলা আটটা বেজে

banglabooks.in

গেলো, রোদও বেশ কড়া হ'য়ে উঠলো, কিন্তু জোয়ারের কোনো চিহ্ন মিললো না। ছোটোরা ক্রমশ অধৈর্য হ'য়ে উঠলো, এ-রকম হাত-পা গুটিয়ে ব'সে থাকতে কারই-বা ভালো লাগে ?

কিন্তু হঠাৎ ন-টার সময়ে ভেলার কাঠগুলোয় হিশ-হিশ শব্দ হ'তে থাকলো। নদীতে জোয়ার শুরু হয়েছে। তক্ষুনি ব্রিয়ঁা চেঁচিয়ে সবাইকে তৈরি থাকতে ব'লে ভেলা থেকে তীরে লাফিয়ে পড়লো, তারপর গাছের দড়ি খুলে দিয়ে দ্রুতপায়ে আবার ভেলার উপর লাফিয়ে উঠলো। বন্ধনমুক্ত হ'তেই ভেলা আস্তে-আস্তে ভেসে চললো। তখনও যেহেতু ভালো ক'রে জোয়ার শুরু হয়নি, জলে যেহেতু তখনও তেমন চাঞ্চল্য জেগে ওঠেনি, সেইজন্যে ভেলার গতি তেমন বাড়তে পেলো না। ব্রিয়ঁারা চারজনে চার কোণে দাঁড় হাতে দাঁড়িয়ে রইলো যাতে ডাঙায় গিয়ে ধাক্কা না-খায় ভেলা।

পর-পর কয়েক দিন কয়েক রাত অবিরাম ভেলা চালিয়ে একদিন বেলা তিনটের সময় তারা ফরাশি গুহার কাছে নদীর তীরে এসে পৌঁছোলো। সামনেই সেই দিগন্ত-ছোঁয়া তুষারশীতল গভীর হ্রদ : একটার পর একটা ঢেউ উঠছে-ভাঙছে, বড়ো-বড়ো ঢেউগুলো সশব্দে এসে ভেঙে পড়ছে বেলাভূমিতে।

ছেলেরা হুড়মুড় ক'রে ফরাশি গুহার সামনে লাফিয়ে নামলো।

ডাঙায় নেমে ছেলেদের আনন্দের সীমা ঘ্যাখে কে ? তাদের জন্যে যেন একটা নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে, আজ তাদের গৃহপ্রবেশের উৎসব !

তাদের কোলাহলে সেই নির্জন বেলাভূমি মুখর হয়ে উঠলো। কলরোল তুলে তারা এসে ঢুকলো ফরাশি গুহায়। বিশেষ ক'রে যারা এখনও গুহাটা ঘ্যাখেনি, তারা এই কয়েক দিন ভিতরটা একবার ভালো ক'রে দেখবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে ছিলো। বুদ্ধি ক'রে মোকো ভেলা থেকে একটা বাতি নিয়ে এসেছিলো। সেই বাতির আলোয় গুহার চারদিক ঝলমল ক'রে উঠলো। আগে মশাল জেলে তারা তেমন ভালোভাবে সবকিছু পর্যবেক্ষণ ক'রে যেতে পারেনি। এখন মনে হ'লো তারা যেন একটা মস্ত হলঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

'এতগুলো লোক এই চোর-কুঠুরির মধ্যে কী ক'রে থাকবে ?' গুহার ভিতরটা দেখেই বাল্সটার ঘ্যান-ঘ্যান ক'রে উঠলো, 'আমার যে এর মধ্যেই দম বন্ধ হ'য়ে আসছে! এখানে পনেরোটা বিছানা পড়লে আমরা নড়াচড়াই বা করবো কী ক'রে ?'

'এর চেয়ে একটা ভালো ঘরের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারো ?' হেসে জিগেশ করলে ব্রিয়ঁা : 'পারো তো বলো, আমরা সেখানে গিয়েই থাকবো।'

banglabooks.in

'কিন্তু এর মধ্যে রান্না-বান্না চলবে কী ক'রে ?' তবু খুঁতখুঁত করলে ডনাগান, 'ধোঁয়ায় যে দম আটকে মরতে হবে !'

'ভিতরে রান্নার ব্যবস্থা না-করলেই হ'লো,' বললে মোকো, 'দুয়ারের পাশে বাইরে রান্না করলেই চলবে।'

'আপাতত তা চলতে পারে,' ব্রিয়ঁা বললে, 'কিন্তু বৃষ্টি-বাদলার দিনে তো আর তা চলবে না। তাছাড়া আমার মনে হয় বাইরের সংস্রব একেবারে ছেড়ে দেয়াই ভালো। আমাদের রান্নাবান্না হবে স্টোভে—তাতে তো আর ধোঁয়ার ভয় নেই। সঙ্গে আমাদের চার-পাঁচটা স্টোভ আছে, তাছাড়া স্পিরিট আর কেরোসিনও আছে যথেষ্ট।'

'কিন্তু যদি মাথা ধরে ?' বললে ডনাগান।

সারভিস বললে, 'লর্ড ডনাগান, মাথা ধরলে স্মেলিং সল্ট ব্যবহার কোরো।'

'করবোই তো,' ডনাগান চ'টে উঠলো, 'তাতে তোমার কী, খানশামামশাই ?'

ঝগড়া প্রায় বেধে ওঠে দেখে গরডন মাঝখানে পড়লো। বললে, 'থাক, এখন ঝগড়া করবার সময় নয়। আর এটাও সত্যি—এইটুকু জায়গায় রান্না-বান্না খাওয়া-দাওয়া শোয়া-বসা চালানো খুবই কষ্টের কাজ হবে। পরে আমাদের একটা আলাদা রান্নাঘরের ব্যবস্থা করতেই হবে। আশপাশের দেয়াল খুঁড়ে দেখতে হবে কোনো দিকে কোনো নতুন আশ্রয় পাওয়া যায় কি না। সামনে এখন লম্বা শীতকাল। ঠাণ্ডার মধ্যে তো আর বেরুবার কোনো উপায় থাকবে না আমাদের, তখন সারা দিন ধ'রে শাবল আর গাঁইতি নিয়ে তদন্ত চালানো যাবে'খন।'

'কিন্তু এখন আমাদের সামনে অনেক কাজ,' বললে ব্রিয়ঁা, 'প্রথম, ভেলা থেকে জিনিশপত্তরগুলো নিয়ে আসতে হবে গুহায়। তারপর সেগুলো গুছিয়ে রাখতে হবে আমাদের—'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো,' বললো গরডন।

তখন সবাই মিলে হৈ-চৈ করতে-করতে আবার ভেলায় গিয়ে উঠলো।

প্রথমে ভেলা থেকে নিয়ে আসা হ'লো বিছানাপত্র, তারপর কিছু হালকা তক্তা। গুহার পাথরের মেঝের উপর প্রচুর শুকনো বালি বিছানো, তার উপর তক্তা বিছিয়ে তারা পাশাপাশি সকলের বিছানা পাতলো। জাহাজের বড়ো টেবিলটা এনে রাখা হ'লো গুহার মাঝখানে। টেবিলের উপর একটা চাদর বিছিয়ে দিয়ে টেবিল-ঢাকার ব্যবস্থা করলো তারা। তারপর অন্যান্য শরঞ্জাম আনলো তারা ভেলা থেকে। এক কোণে কিছু কাঠ সাজিয়ে একটা চুল্লি বানানো হ'লো। রাত্রে ভয়ানক

banglabooks.in

ঠাণ্ডা পড়বে—এই ক-দিনে ভেলায় তারা ঠাণ্ডার কাঁপুনি বেশ মর্মে-মর্মে টের পেয়েছে। সেইজন্যে গুহার মধ্যে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বালিয়ে রাখা ভালো। গুহার বাইরে গাছতলায় প্রচুর শুকনো ডালপালা প'ড়ে আছে—কাজেই জ্বালানি কাঠের অভাব তাদের সহজে হবে না। রাত্রে মোকোর হাতে রান্না, মুখরোচক বাস্টার্ডের মাংস! ঠিক যেন সত্যিকার গৃহপ্রবেশ!

ছেলেরা ফরাশি গুহায় এসেছে মে মাসের আট তারিখে। তারপরে তিন-চার দিন ধ'রে তারা আর অন্য কোনো কিছুর দিকে মন দেয়ার অবসর পায়নি। ভেলা থেকে সমস্ত জিনিশপত্র গুহায় এনে তুলতেই তাদের এই ক-দিন কেটে গেছে। ওদিকে আকাশ-বাতাস হিমেল কুয়াশায় ভ'রে উঠতে শুরু করেছে। হাওয়া যেন ঠাণ্ডা কনকনে কোনো ছুরি—কেটে-কেটে বসে গায়ে। ঠাণ্ডায় বেশ কষ্ট হচ্ছে সকলের—গাল ফেটে যাচ্ছে, রক্ত পড়ছে তাদের—গ্লিসারিন আর গ্রীজ মালিশ ক'রেও গা-ফাটা থেকে রেহাই পাওয়া যাচ্ছে না। শিগগিরই যে মহোল্লাসে তুষারপাত শুরু হবে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। অথচ এত ঠাণ্ডা সত্ত্বেও বরফ পড়বার আগেই সব জিনিশপত্তর গুহায় নিয়ে আসা দরকার—তাই দু-বেলা না-বেরিয়েই বা উপায় কী?

একেকদিন ডনাগান, ক্রস, ওয়েব, উইলকক্স আর বাক্সটার বন্দুক নিয়ে শিকার করতে বেরুতো। প্রত্যেকদিনই তাদের ভাগ্যে প্রচুর শিকার জুটতো। স্নাইপ, বালিহাঁস, জলপিপি, বুনোমুরগি। একদিন তারা একটু বেশি দূরে গিয়েছিলো সেখানে কেবল বার্চ আর বীচ গাছের ঝাঁক। তারা অবাক হ'য়ে দেখতে পেলো, চারদিকে স্পষ্ট মনুষ্যবাসের চিহ্ন। কোথাও একটা ভাঙা চালাঘর, কোথাও-বা মাটিতে বড়ো-বড়ো গর্ত খোঁড়া; গর্তের উপর সরু-সরু ডালপালা বিছানো। সেগুলো যে বুনো জানোয়ার ধরবার ফাঁদ তাতে কোনো সন্দেহ নেই। খুব গভীর গর্ত, ভিতরে কোনো জানোয়ার পড়লে আর উঠে পালাতে পারবে না। একটা গর্তের মধ্যে তারা একটা বড়ো জানোয়ারের আস্ত কঙ্কাল দেখতে পেলে। কিন্তু কঙ্কাল দেখে বোঝা গেলো না সেটা কী, বা কোন জাতের জানোয়ার।

উইলকক্স তক্ষুনি সেই গর্তের মধ্যে নেমে গিয়েছিলো সরেজমিন তদন্ত করতে। ভালো ক'রে কঙ্কালটা পরীক্ষা ক'রে সে বললে, 'উঁহু, কিছুতেই তো বুঝতে পারছি না কী জানোয়ার! তবে, এটা কী জন্তু তা বোঝা না-গেলেও প্রকাণ্ড কোনো জন্তু যে ছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। হাড়গোড় এমন ঝাঁঝরা হ'য়ে গেছে যে মনে হচ্ছে জানোয়ারটা ফাঁদে পড়েছিলো বেশ কয়েক বছর আগে।'

banglabooks.in

ডনাগান বললে, 'জানোয়ারটা নিশ্চয়ই খুব শক্তিশালী ছিলো।—দেখছো না মাথার হাড়টা কী প্রকাণ্ড! চোয়াল আর দাঁতগুলোও কী-রকম বড়ো আর ছুঁচলো, লক্ষ্য করেছো?'

ক্রস ডনাগানের মুখের পানে তাকিয়ে জিগেশ করলে, 'তোমার কী মনে হয়, ডনাগান? জন্তুটা মাংসভুক?'

'নিশ্চয়! আমিষখোর না-হ'লে কি আর দাঁতের গড়ন ও-রকম হয়?' তারপর বিজ্ঞের মতো গম্ভীরভাবে সে যোগ করলে, 'জাগুয়ার কিংবা কাউগার হবে বোধকরি।'

'তবে তো ভয়ের কথা!' বললে বাক্সটার।

'সাবধান হ'য়ে চলতে হবে আর কী!' উদ্ধত গলায় বললে ডনাগান, 'জানোয়ারের ভয়ে তো আর শিকার ছেড়ে গুহার মধ্যে ব'সে থাকলে চলবে না! অত যাদের জুজুর ভয়, তারা শিকারে না-বেরুলেই পারে!'

ফ্যান তখন তাদের সঙ্গে ছিলো। হঠাৎ সে বনের দিকে মুখ ক'রে ঘেউ-ঘেউ ক'রে ডাকতে শুরু ক'রে দিলে।

ওয়েব বললে, 'লক্ষণ তো ভালো দেখছি না, ডনাগান। ধারে-কাছে বোধহয় কোনো বুনো জানোয়ার এসেছে। দেখছো তো ফ্যানের রকমশকম! আজ আর বেশি ঝুঁকি নিয়ে কাজ নেই। চলো, বরং ফিরেই যাই গুহায়।'

এবার আর ডনাগান কোনো চোটপাট করলে না। সাবধানে চারপাশে তাকাতে-তাকাতে সবাই গুহার দিকে রওনা হ'লো। যাবার আগে কী মনে ক'রে উইলকক্স গর্তটিকে আবার আগের মতো ডালপালা দিয়ে ঢেকে রাখলে।

তারপর প্রায়ই তারা সেই গর্তের ডালপালা সরিয়ে দেখে আসতো গর্তের মধ্যে কোনো বুনো জানোয়ার পড়লো কি না। কিন্তু হা হতোস্মি, গর্ত থাকতো যেমন ফাঁকা তেমনি ফাঁকা—কোনোদিন কিছু পড়তো না। শেষকালে উইলকক্সের মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। টোপ হিশেবে সে একদিন সেই ডালপালার উপর বড়ো এক টুকরো মাংস রেখে দিয়ে এলো।

ব্রিয়াঁ আর অন্য কয়েকজন বনের ভিতর দিয়ে কিছু দূরের একটা পাহাড় দেখতে গিয়েছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো, যদি আরেকটা গুহার সন্ধান মেলে তো সেটাকে গুদোমঘর বানানো—কিছু-কিছু জিনিশ তাহ'লে সেই গুহায় রেখে আসার ব্যবস্থা করা যাবে।

ফেরার পথে হঠাৎ বনের মধ্যে মস্ত কোলাহল শুনতে পেলো তারা। কী ব্যাপার

banglabooks.in

দেখবার জন্যে তারাও বনের মধ্যে ঢুকে পড়লো। কাছে এসে দ্যাখে সেই গর্তের চারধারে জড়ো হ য়ে ছেলেরা ভীষণ হৈ-চৈ করছে, সকলেই খুব উত্তেজিত, সকলেই তড়বড় ক'রে হাত-পা নেড়ে কথা কইছে। এমনকি ফ্যান সুদ্ধ তিড়িং-তিড়িং ক'রে লাফ দিচ্ছে আর ঘেউ-ঘেউ করছে, ল্যাজটা তার নিশানের মতো উপরে তোলা, আর সমস্ত শরীর উত্তেজনায় টান-টান—গর্তের দিকে তাড়া ক'রে যাচ্ছে সে বারে-বারে, কিন্তু সাহস ক'রে কিছুতেই আর ভিতরে ঢুকছে না।

ব্রিয়ঁা আরো কাছে এসে দেখলে গর্তের উপর তখনও ডালপালা ঢাকা রয়েছে, তবে ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে ভিতরে একটা জানোয়ার পড়েছে। 'নিশ্চয়ই জাগুয়ার, নয়-তো কাউগার', বলেছিলো ডনাগান, আমিষখোর ভীষণ জন্তু কোনো কিছু।' কিন্তু ব্রিয়ঁা তখন ডালপালা একটু সরিয়ে হেঁট হ'য়ে জন্তুটাকে নিরীক্ষণ ক'রে হাসতে-হাসতে বললে, 'এ জাগুয়ারও নয়, কাউগারও নয়, গর্তের মধ্যে পড়েছে একটা উটপাখি।'

উটপাখির নাম শুনে সবাই আনন্দে হাততালি দিয়ে হৈ-চৈ ক'রে উঠলো। ছোটোদের উৎসাহই সর্বাধিক। 'কী মজা! পাখিটাকে বেশ পোষ মানানো যাবে!' আর শেষটায় যদি পোষ না মানে তখন মোকোর রান্নাঘরে চালান ক'রে দিলেই বেশ ভোজসভার আয়োজন করা যাবে।

এতক্ষণ কেউই ঝুঁকে প'ড়ে জন্তুটাকে দেখে নেবার সাহস পাচ্ছিলো না। কিন্তু এবার ডালপালা সব সরিয়ে ভালো ক'রে তারা পাখিটাকে দেখে নিলে। বেশ বড়ো পাখি; প্রকাণ্ড পিঠ, প্রকাণ্ড ডানা; মাথাটা মুরগির মাথার মতো, সারা গায়ে বড়ো বড়ো শাদা পালক। পাখিটা কিন্তু আসলে ঠিক উটপাখি নয়, উটপাখি কেবল আফ্রিকাতেই দেখতে পাওয়া যায়। অস্ট্রেলিয়ায় এই জাতের পাখিকে বলে এমু, আর দক্ষিণ আমেরিকায় এর নাম নান্ডু। পাখিটা সেই নান্ডু জাতের।

'খুব সাবধানে থেকো কিন্তু তোমরা,' বললে ব্রিয়ঁা, 'এর একটা ঠোকর খেলে আর রক্ষে নেই—মাংস খুবলে নিয়ে যাবে একেবারে! কিন্তু তবু এটাকে জ্যান্তই ধরতে হবে।'

গর্তটা বেশ গভীর। পাখিটা এতক্ষণ কেবলই লাফিয়ে উঠে ডানা মেলবার চেষ্টা করছিলো, কিন্তু উঠতে পারছিলো না। এই বিশাল পাখিটাকে কী ক'রে জ্যান্ত ধরা যায়, এইটেই হ'লো সমস্যা!

উইলকক্সের বুকে একেবারে ভয়ডর নেই। বেপরোয়াভাবে শেষটায় সে গর্তের

banglabooks.in

নয়। কিন্তু পাখির আয়তনের তুলনায় গর্তটা ছোটো বলে পাখিটা বেশি কিছু করতে পারলো না। উইলকক্স গা থেকে কোটটা খুলে নিয়ে চক্ষের পলকে পাখিটার মাথা ঢেকে ফেললে। তারপর তিন-চারটে রুমাল নিয়ে পাখির ঠ্যাং দুটো আঁটো ক'রে বেঁধে ফেললে—গলাটাও বাদ গেলো না। পাখিটা এখন একেবারে অন্ধ।

উইলকক্স যেমন ডাকাবুকো, সারভিস আবার তেমনি নাছোড়বান্দা। তাছাড়া সব সময়েই তার মাথায় আজগবি সব ফন্দি ঘুরছে। ফস্ ক'রে সে বললে, 'একে আমি পোষ মানাবো!'

'বনের উটপাখি কি পোষ মানবে?' বললে ডনাগান।

'কেন মানবে না?' তক্ষুনি সারভিস নজির তুলে ধরলে, 'আমি "সুইস ফ্যামিলি রবিনসন"-এ পড়েছি বুনো উটপাখি বেশ পোষ মানে। আমি বলছি, একে শুধু পোষ মানাবো না, এর পিঠের ওপর চড়বো!'

বই-পোকা সারভিসের কথায় কেউ বিশ্বাস করলো না, কিন্তু তবু তার শাকরেদ জুটে গেলো গারনেট। দু'জনে চটপট গুহা থেকে একগাছা বড়ো দড়ি নিয়ে গেলো। সবাই মিলে পাখিটার পা দুটি আর গলা সেই দড়িতে বেঁধে তাকে উপরে টেনে তুললো। কী ভয়ানক জোর পাখিটার গায়ে! কেবল ডানা ঝাপটায়, লাফায় আর চীৎকার ক'রে ওঠে। কিন্তু যার পা আর গলা দড়িতে বাঁধা, আর মাথা কোট দিয়ে ঢাকা, সে আর শুধু গায়ের জোরে কী করতে পারবে? সকলে তাকে টেনে-হিঁচড়ে গুহার মধ্যে নিয়ে এলো।

উইলকক্স আর সারভিস পাখিটার পা দুটো ফাঁক ক'রে বেঁধে গুহার মধ্যে এক কোণে রেখে দিলে।

কিছুদিন পরে পোষা উটপাখির পিঠে চ'ড়ে বেড়াতে যেতে পারবে শুনে কোসটার, ডোল আর ইভারসন তো মহা খুশি!

৮

উপনিবেশ

এমনিতে গুহাটা মস্ত হ'লে কী হবে, এতজন লোকের পক্ষে সত্যি সেখানে থাকা খুব কষ্টকর। একটুতেই হাঁফ ধ'রে যায়। কেমন মনে হয় দম বন্ধ হ'য়ে আসবে।

banglabooks.in

শেষকালে কয়েকদিন পরে একটা অধিবেশন ক'রে ছেলেরা ঠিক করলে, ফরাশি গুহার একটা দেয়াল খুঁড়ে ভিতরে আরেকটা ঘর ক'রে নেবে।

কাজটা অবিশ্যি খুব কঠিন নয়, কারণ এদিকের দেয়াল চুনাপাথরে তৈরি, আর চুনাপাথর অত্যন্ত নরম। সামনের দীর্ঘ শীতকালে তারা শাবল আর গাঁইতি নিয়ে সেই দেয়াল খুঁড়ে অনায়াসেই আরেকটা ঘর তৈরি ক'রে নিতে পারে। কিন্তু খুব সাবধানে কাজ করতে হবে, হুড়মুড় ক'রে কিছু করতে গেলেই উপর থেকে পাথর ধ'সে পড়তে পারে।

প্রথমে তারা জাহাজের একটা মজবুত দরজা এনে গুহার প্রবেশমুখে লাগালো। দুয়ারের দু-পাশের দেয়াল খুঁড়ে প্রস্তুত করলো দুটো বড়ো-বড়ো ঘুলঘুলি, যাতে গুহার দরজা বন্ধ ক'রে দিলেও ভিতরে বেশ আলো-হাওয়া চলাচল করতে পারে।

ইতিমধ্যে এক-এক করে পনেরো দিন কেটে গেছে গুহায় আসবার পর। হঠাৎ সেদিন, কথা নেই, বার্তা নেই, ঘুম থেকে উঠে তারা দেখতে পেলে ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি শুরু হ'য়ে গেছে। তুষারঝড়, তুষারবৃষ্টি। সত্যিকার শীতকাল শুরু হ'য়ে গেলো —যাকে বলে, কুমেরু অঞ্চলের কনকনে হাড়-কাঁপানো শীত।

'শীত যখন পড়লো, তখন বাইরে বেরুনোও বন্ধ—একেবারে নট নড়নচড়ন, নট কিচ্ছু। ইচ্ছে থাকলেও বাইরের কাজকর্ম করার কোনো উপায় নেই। ফলে গুহায় ব'সে খামকা অকারণে সময় নষ্ট না ক'রে এবারে আমরা গুহার দেয়াল খুঁড়তে শুরু করলেই পারি', বললে ব্রিয়ঁা। 'আমরা যদি গড়েন দিকের দেয়াল খুঁড়তে শুরু করি, তাহ'লে খুঁড়তে-খুঁড়তে শেষকালে হ্রদের কাছে গিয়ে পড়বো, কারণ হ্রদের দিকেই এখানকার গড়েন। তাতে আমাদের হ্রদের দিকে আরেকটা দরজা হবে—এবং তাতে উপকারও হবে যথেষ্ট। কোনো কারণে যদি একদিকের পথ হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে যায়, তাহ'লে অন্য দিক দিয়ে আমরা বাইরে বেরুতে পারবো।'

সুতরাং সেদিন থেকেই খননকর্ম শুরু হ'য়ে গেলো।

যে-কোনো কাজেই গোড়ার দিকে সকলেরই খুব উৎসাহ থাকে, তারপর হয়তো আস্তে আস্তে উৎসাহে ভাঁটা পড়ে। প্রথমে তিন দিন কাজ খুব সুন্দরভাবে এগুলো তাদের। চুনাপাথর এত নরম যে তা যেন ছুরি দিয়েও কাটা যায়। তবে ভিতরে জায়গা বড়ো অল্প। সকলে একসঙ্গে কাজ করার কোনো সুবিধে নেই। তাই পালা ক'রেই কাজ করতে লাগলো তারা। তারপর সুড়ঙ্গটা যখন প্রায় চার-পাঁচ ফুট লম্বা হয়েছে তখন একটা আশ্চর্য ও ভুতুড়ে কাণ্ড ঘ'টে গেলো। ভুতুড়ে কাণ্ড মানে, বুদ্ধিতে তার আর কোনো ব্যাখ্যা মিললো না।

banglabooks.in

কয়লাখনির ভিতরে লোকে যেমন ক'রে কয়লা কাটে, সেদিন বিকেলবেলায় ব্রিয়ঁাও তেমনিভাবে চুনাপাথর কেটে চলছিলো। হঠাৎ তার মনে হ'লো—না, মনে হ'লো নয়, সে স্পষ্ট শুনতে পেলো—পাথরের মধ্যে যেন কিসের শব্দ হচ্ছে। গাঁইতি থামিয়ে সে কান খাড়া ক'রে রইলো। না, মনের ভুল নয়। ওই তো, আবার সেই একই ধরনের শব্দ! ঠিক যেন কার চাপা কান্নার আওয়াজ।

ব্রিয়ঁা তক্ষুনি দেয়াল খোঁড়া বন্ধ ক'রে গরডনের কাছে গিয়ে সেই ভুতুড়ে আওয়াজের কথা জানালে। ব্যাপারটা শুনেই কেন যেন সকলের গা ছমছম ক'রে উঠলো। কাগজের মতো শাদা মুখে গরডন ব্যাপারটা উড়িয়ে দিলে, 'ও কিছু না। কী শুনতে কী শুনছো—তারও ঠিক নেই…'

ব্রিয়ঁা হাঁপাতে হাঁপাতে চাপা গলায় বললে, 'আমি কিছু ভুল শুনিনি। স্পষ্ট শুনতে পেলুম পাহাড়ের মধ্য থেকে শব্দ আসছে। এসো না, তুমিও একবার নিজের কানে শুনবে, এসো।'

গরডন জানতো ব্রিয়ঁা মিথ্যে ভয় দেখাবে না। তবু সে ব্যাপারটা চাপা দেবার চেষ্টা করছিলো, কারণ ছেলেরা শুনতে পেলে বিষম ভয় পেয়ে যাবে কিন্তু ব্রিয়ঁার কথায় তাকেও এবার ভিতরে যেতে হ'লো। একটু পরে বেরিয়ে এসে ফ্যাকাশে মুখে বললে, 'তাই তো, ব্যাপারটা তো সত্যি! আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারছি না।'

ও-রকম ভিতুভাবে চাপা গলায় তাদের কথা বলতে দেখে দেখতে না দেখতে কৌতূহলী হ'য়ে ছেলেরা চারপাশে ভিড় ক'রে এসেছিলো। ডনাগানের হাতে যথারীতি একটা বন্দুক ছিলো। পুরো ব্যাপারটা শুনে আর গরডনের ভয়-পাওয়া মুখের ভাব দেখে, তাচ্ছিল্যভরে সে বন্দুক নিয়ে বুক ফুলিয়ে ভিতরে ঢুকলো। কিন্তু মিনিট পাঁচেক পরে সে যখন ফিরে এলো তখন তার দশা এক ভিরু খরগোশের মতো। তারপর একে একে বাক্সটার, ক্রস, উইলকক্স আর সারভিসও গিয়ে শব্দটা শুনে এলো। সকলেরই মুখ ভয়ে তখন বিবর্ণ, সেই চাপা গর্জন সকলেরই কানে গেছে।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। কাজকর্ম বন্ধ রেখে সবাই দল বেঁধে খেতে ব'সে গেলো। সান্ধ্যভোজের পর আবার ভয়ে-ভয়ে সবাই তদন্ত করবার জন্য একজন একজন ক'রে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে শব্দরহস্য ভেদ করবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কী আশ্চর্য, এখন আর কোনো শব্দই শোনা গেলো না। আস্তে-আস্তে রাত ন-টা বেজে গেলো—সবাই একসঙ্গে শলাপরামর্শ করছে। গলার স্বর নিস্তেজ, কী-রকম

banglabooks.in

একটা ছমছমে ভাব সকলের মধ্যে। শব্দটা মোটেই তাদের মনের ভুল নয়, কারণ সে-সময়ে অনেকেই স্বকর্ণে শুনে এসেছে—অথচ, কী আশ্চর্য, এখন আর টুঁ-শব্দটিও শোনা যাচ্ছে না। শেষটায় ব্রিয়ঁা সভাভঙ্গ ক'রে দিলো। বললো, 'যাও, যে-যার শুয়ে পড়ো গিয়ে। কাল আমরা ভালো ক'রে তদন্ত ক'রে দেখবো। দিনের বেলায় ব্যাপারটা ভালো ক'রে বোঝা যাবে নিশ্চয়ই।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই জল্পনা-কল্পনা বন্ধ ক'রে সবাই গিয়ে শুয়ে পড়লো। অনিচ্ছা এইজন্যে যে, সবাই এক জায়গায় ব'সে কথাবার্তা কইলে ভয় থাকে না, একা-একা বিছানায় শুলেই কেমন যেন বুক দুরুদুরু করে। ভূত, না অন্য কিছু? ভুতুড়ে কাণ্ডই তো বটে, না-হ'লে পাথরের মধ্য থেকে চাপা কান্নার আওয়াজ আসে কখনও? এমনকি ডনাগান সুদ্ধু জুজুর ভয়ে বেশ কাবু হ'য়ে পড়েছিলো।

রাত তখন দুটো, হঠাৎ ফ্যানের গর্জনে সকলের ঘুম ভেঙে গেলো। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো সবাই : সম্ভবত সেই ভুতুড়ে কাণ্ডর অভিজ্ঞতা সকলেরই বুকের উপর কোনো বিষম অস্বস্তির মতো চেপে ব'সেছিলো, সেইজন্যেই একসঙ্গে সকলের ঘুম ভেঙে গেলো। তাড়াতাড়ি উঠে তারা দ্যাখে, ফ্যান সেই ভীষণ অন্ধকারে একবার ক'রে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকছে, আবার পর মুহূর্তেই রাগে ফুলতে-ফুলতে বেরিয়ে আসছে। ব্রিয়ঁা, গরডন আর ডনাগান তখন আবার একে-একে সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করলে। প্রবেশ করতেই শোনে সেই চাপা গর্জন, এখন সেই ক্ষুব্ধ আওয়াজ যেন আরো স্পষ্ট, আরো ভয়ংকর। সে-শব্দ যেন অনেক দূর থেকে আসছে, অথচ আবার পরক্ষণেই মনে হচ্ছে শব্দটা আসছে পাহাড়ের ভিতর থেকে। 'কী ব্যাপার?' সবাই আতঙ্কিতভাবে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলো। সত্যি কোনো ভুতুড়ে ব্যাপার নয় তো? কোনো অতৃপ্ত আত্মা হয়তো এই গুহার আশপাশে কাঁদুনি গেয়ে ঘুরে বেড়ায় রাতে! ভাবনাটা তাদের মাথার মধ্যে এলেও মুখ ফুটে কেউ উচ্চারণ করলে না।

হঠাৎ ডনাগান জিগেস করলে, 'আচ্ছা, এটা পাহাড়ের কোনো ঝরনার শব্দ নয় তো?'

'ঝরনার শব্দ কক্‌খনো নয়', বললে উইলকক্স, 'তাহলে মাঝে-মাঝে থেমে যাবে কেন?'

'ঠিক বলেছো', বললে গরডন, 'আমার তো মনে হয় ওপরের কোনো ফাটলে হাওয়া ঢুকে ও-রকম বিদঘুটে আওয়াজ হচ্ছে।'

সে-কথা শুনে সবাই তখনকার মতো চুপ ক'রে গেলো বটে, কিন্তু ইচ্ছে করলে

banglabooks.in

তারা ফ্যানের উত্তেজিত রকমশকমের দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারতো। নিশ্চয়ই হাওয়ার শব্দ হ'লে ফ্যান ও-রকম গর্‌গর্‌ আওয়াজ ক'রে লাফঝাঁপ দিতো না। বিশেষ ক'রে কুকুরদের স্পর্শাতুরতা তো অতি প্রবল, তারা অনেক অদ্ভুত জিনিশ টের পায়, এমন অনেক শব্দ তাদের কানে আসে বা এমন অনেক কিছু তারা দেখতে পায়, যা হয়তো মানুষের চক্ষুকর্ণে ধরা পড়ে না। এ-সব প্রসঙ্গ কেউ উত্থাপন করলো না, আবার গিয়ে যে যার শুয়ে পড়লো।

কোনো রকমে কাটলো সে-রাত্তিরটা। পরদিন ভোরবেলায় সবাই পাহাড়ে ওঠবার জন্যে গুহা থেকে বেরুলো। মিনিট দশেকের মধ্যেই সকলে সেই ফরাশি গুহার মাথার উপর গিয়ে উঠলো। কিন্তু চারদিকে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও তারা কোনো ফাটল দেখতে পেলো না। পাহাড়ের উপর নিবিড় ঝোপঝাড়, ভালো ক'রে খোঁজাও দুষ্কর। শেষে সবাই হতাশ হ'য়ে উপর থেকে নেমে এলো।

আবার সুড়ঙ্গ খোঁড়ার কাজ শুরু হ'লো। বেলা বারোটা পর্যন্ত বেশ নির্বিঘ্নে কাজ চললো। কিন্তু বারোটার সময় আরেকটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটলো। সে সময় গর্ত খুঁড়ছিলো বাক্সটার। হঠাৎ তার মনে হ'লো, গর্তের দেয়াল যেন কী-রকম ফাঁপা-ফাঁপা মনে হচ্ছে। গাঁইতির শব্দে মনে হয় যেন ওদিকে পাহাড়ের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা গহ্বর আছে। বাক্সটার তখন মহোৎসাহে নবোদ্যমে গাঁইতি চালাতে লাগলো।

বেলা দুটোর সময় সাময়িকভাবে কাজ বন্ধ ক'রে সবাই যখন খেতে বসেছে, তখন হঠাৎ গরডনের খেয়াল হ'লো, গুহার মধ্যে ফ্যানের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ফ্যান কোথায় গেলো? ফ্যান তো দিনরাত গুহার মধ্যেই থাকে, কেউ বাইরে না-গেলে সেও কখনও বেরোয় না। আর খাওয়ার সময় তো ফ্যানের নিয়ম হচ্ছে আগে থেকেই টেবিলের তলায় এসে বসা। এখন সে গেলো কোথায়? গরডন আর সারভিস দরজার কাছে গিয়ে ফ্যানের নাম ক'রে কত ডাকলো, আশপাশে কত খুঁজে দেখলো, কিন্তু কোনোখান থেকে তার কোনো সাড়া পাওয়া গেলো না।

রাত যখন দুটো, সকলে তখন মন খারাপ ক'রে ঘুমোতে গেছে। ফ্যানকে খুঁজে পাওয়া যায়নি, গুহার ভিতরে বাতির চাপা কাঁপা-কাঁপা আলোয় ঘুমের আমেজ লেগে আছে, হঠাৎ একটা গভীর আর্তনাদ শুনে তাদের তন্দ্রা ভেঙে গেলো। কে যেন অসহ্য যন্ত্রণায় থেকে-থেকে ককিয়ে উঠছে। একে গভীর থমথমে রাত্তির, তায় আবার ঘুমের ঘোর; সকলের মনে হ'তে লাগলো এবার নিশ্চয়ই গুহার মধ্যে কোনো দত্যি-দানা এসে ঢুকবে।

banglabooks.in

কারু মুখে কোনো সাড়া নেই, কেবল সেই একটানা ভুতুড়ে ডুকরানির মধ্যে বিমূঢ় ও আতঙ্কিত মুখে সবাই গোল-গোল চোখে তাকিয়ে বসে ব্যাপারটা কী অনুধাবন ক'রে দেখার চেষ্টা করছে, এমন সময় হঠাৎ ব্রিয়ঁা চেঁচিয়ে উঠলো, 'ওই শোনো, ঠিক সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে কান্নার শব্দ আসছে !'

বলে, আর এক মুহূর্তও দেরি না-ক'রে সে সুড়ঙ্গের দিকে ছুটে গেলো। বাকি সবাই তখন পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে হতভম্ব ও আতঙ্কিত—আর একেবারে ছোটোরা ভয়ে কম্বলের তলায় গিয়ে লুকিয়েছে। কেউ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না এখন তাদের কী করা উচিত।

ব্রিয়ঁা ফিরে এলো একটু পরেই। এসে বললে, 'কান্নাটা আসছে, মনে হয়, ওদিককার গহ্বর থেকে। নিশ্চয়ই হ্রদের দিকে গহ্বরের মধ্যে ঢোকার কোনো রাস্তা আছে—সেখান দিয়ে বুনো জানোয়ারেরা এসে গহ্বরের মধ্যে আস্তানা পেতেছে।'

হয়তো ব্রিয়ঁার অনুমানই ঠিক। কিন্তু এ-সম্বন্ধে আর-কোনো আলোচনা হ'লো না। এই নিশুতি রাত্রে ঠাণ্ডার মধ্যে বাইরে বেরিয়ে অনুসন্ধান করার ইচ্ছেও কারু তেমন দেখা গেলো না। সবাই আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। কাল দিনের বেলায় যা-হোক কিছু একটা ভেবে বার করা যাবে।

পরদিন সকালবেলায় কিন্তু তাদের ভিতু ভাবটা কেটে গেলো। রাতের ভুতুড়ে কান্না সম্বন্ধে কোনো কথাবার্তাই হ'লো না—ব্যাপারটা নিয়ে দিনের বেলায় হই-চই করতে কেমন যেন লজ্জা হ'লো। কত কারণেই তো ও-রকম আওয়াজ হ'তে পারে, তা নিয়ে মিথ্যে অমন ঘাবড়ে যাবার কী আছে ?

আবার দেয়াল খোঁড়া চললো। দুপুরের পর দেয়ালটাকে তাদের খুবই ফাঁপা ঠেকতে লাগলো—মনে হ'লো আর ইঞ্চি দু-এক খুঁড়লেই ওদিককার গহ্বরের দেখা পাওয়া যাবে। গহ্বরের মধ্যে না-জানি কোন আমিষখোর বুনো জানোয়ার লুকিয়ে আছে—গুহার সঙ্গে যোগাযোগ হ'লেই এসে হয়তো ছেলেদের আক্রমণ করবে। তাই ডনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স—চারজনে চারটি বন্দুক বাগিয়ে ধ'রে তৈরি হ'য়ে গুহার মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো।

তখনো দেয়াল খুঁড়ছিলো ব্রিয়ঁা। হঠাৎ শাবলের একটা চাড় দিয়েই সে চেঁচিয়ে উঠলো। আর শাবলের ঘায়ে যেমন দেয়াল থেকে একটা প্রকাণ্ড চাঙড় ভেঙে পড়েছে, হাতের শাবলটাও সঙ্গে-সঙ্গে হাত ফশকে ওদিককার গহ্বরের মধ্যে পড়ে অদৃশ্য হয়েছে। ব্রিয়ঁা তখন খালি হাতে তাড়াতাড়ি গুহার মধ্যে পেছিয়ে

banglabooks.in

এলো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই সেই ভাঙা ফাটলের মধ্য থেকে একটা জন্তু একলাফে গুহার মধ্যে এসে প্রবেশ করলো। বন্দুকের ঘোড়া টিপতে গিয়েও ডনাগানরা হঠাৎ থেমে গেলো। জন্তুটা আর-কেউ নয়, তাদেরই বড়ো আদরের ফ্যান। ফ্যান গুহায় ঢুকেই কারু দিকে না-তাকিয়ে প্রথমে ছুটে গেলো মেঝেয় বসানো একটা জলভরা পাত্রের দিকে। জলে মুখ ডুবিয়ে প্রথমে চকচক ক'রে সে পেট পুরে প্রচুর জল খেয়ে নিলে, তারপর ল্যাজ দুলিয়ে ফিরে এলো ছেলেদের কাছে, এসে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়তে লাগলো, মুখ তুলে বার-বার তাদের দিকে তাকাতে লাগলো—মুখে এখন তার এতটুকু রাগের চিহ্ন নেই।

এইবারে গহ্বর পরীক্ষার পালা। ভয়ে সকলেরই বুক দুরুদুরু করছে, কিন্তু তবু সাহস ক'রে একে-একে সবাই সেই অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে গিয়ে নামলো। ফ্যান যখন সারা রাত ওই গহ্বরের মধ্যে কাটাতে পেরেছে, অথচ গায়ে তার এতটুকু আঁচড় লাগেনি, তখন এত ভয় পাবার আর কী আছে—এই তারা ভাবলে।

প্রকাণ্ড গহ্বর। চওড়ায় ফরাশি গুহার মতো, কিন্তু লম্বায় তার ডবল; শক্ত অ্যাজিট পাথরের মেঝে। অন্ধকার গহ্বর দেখে ওরা ভেবেছিলো ভিতরের বাতাস হয়তো-বা বিষাক্ত। কিন্তু দেখা গেলো হাতের লণ্ঠন দিব্যি জ্বলছে। নিশ্চয়ই কোনো ফাটল দিয়ে বাইরে থেকে খোলা হাওয়া আসে। আর তা যদি না-ই থাকবে তো ফ্যানই বা তার ভিতরে গিয়েছিলো কেমন ক'রে? আলো হাতে তারা চারদিক ঘুরে-ঘুরে দেখতে লাগলো। এত বড়ো গুহায় হাতের একটা লণ্ঠনে কতটুকুই বা আলো হয়? অনেকটাই আছে অন্ধকারে ঢাকা।

হঠাৎ কিসে যেন হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে উইলকক্স ওয়েবের কাঁধ আঁকড়ে ধ'রে বেঁচে গেলো। তাড়াতাড়ি ঝুঁকে নিচে হাত দিয়ে ছাখে একটা ঠাণ্ডা, নিস্পন্দ রোমশ দেহ প'ড়ে আছে মেঝেয়। উইলকক্স ভয়ে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

উইলকক্সের আর্তনাদ শুনে ব্রিয়ঁ। তাড়াতাড়ি লণ্ঠন নিয়ে এসে ছাখে মৃতদেহটি অন্য-কিছুর নয়, একটা প্রকাণ্ড শেয়ালের। ব্রিয়ঁ। বললে, 'এ নিশ্চয়ই আমাদের ফ্যানের কাজ!'

'এখন বোঝা গেলো', বললে গরডন, 'এই দু-দিন আমরা কোন ভুতুড়ে কান্না শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলুম।'

কিন্তু এরা ভেবে পেল না এই গহ্বরের মধ্যে শেয়াল-কুকুর দুটি ঢুকেছিলো কী ক'রে? প্রবেশপথ তো দূরের কথা, কোথাও আলো-হাওয়া আসার একটা ছোট্ট

banglabooks.in

ফোকর অবধি দেখা যাচ্ছে না। ফ্যান তখন তাদেরই সঙ্গে পায়ে-পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। সারভিস তাকে লক্ষ্য ক'রে বললে, ফ্যান, বল্ দিকিন, তুই কী ক'রে ভিতরে ঢুকেছিলি ? আমরা যে খুঁজে খুঁজে হাঁপিয়ে উঠলুম !'

নিজের নামটা শুনে ফ্যান ছোট্ট দুটি ঘেউ-ঘেউ ক'রে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে মাথা দুলিয়ে তার আনন্দ প্রকাশ ক'রলো। সে যে তাদের সব তদন্তের সমাধান ক'রে দেবে, এমন কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না।

ব্রিয়ঁার মাথাটি ভারি উর্বর। এরই মধ্যে তার মাথায় একটি ফন্দি গজিয়েছে। সকলকে সেই নতুন গহ্বরের মধ্যে থাকতে ব'লে সে ফরাশি গুহা থেকে বেরিয়ে গিয়ে হ্রদের তীরের সেই পাহাড়ের কোল ঘেঁসে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে চললো। সে চীৎকার ক'রে সকলের নাম ধ'রে ডাকে, ছেলেরাও ভেতর থেকে চীৎকার ক'রে উত্তর দেয়।

এইভাবেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রবেশপথটা আবিষ্কার করা গেলো। পাহাড়ের কোলে একটা নিবিড় ঝোপের মধ্যে একেবারে মাটি বরাবর একটা গর্ত : সেই গর্ত দিয়েই শেয়াল আর কুকুর গহ্বরের মধ্যে ঢুকেছিল। কিন্তু ফ্যান কেন আর বেরিয়ে আসতে পারছিলো না ? এই প্রশ্নেরও উত্তর সহজেই পাওয়া গেলো। ফ্যান ভিতরে ঢোকবার পরে কোনোরকমে একটা আলগা পাথর ধ'সে পড়ে গহ্বরের প্রবেশপথ বন্ধ করে দিয়েছিলো—তাই ফ্যান ওই গহ্বরেই বন্দী হ'য়ে পড়েছিলো—আর বেরুতে পারছিলো না।

দ্বিতীয় গহ্বরটার নাম রাখা হ'লো হলঘর। এবার থেকে হলঘরেই সকলের শোবার ব্যবস্থা হবে, ফরাশি গুহাটা হবে ভাঁড়ার ঘর আর রন্ধনশালা। সব আশবাব-পত্তর এবার হলঘরে নিয়ে আসা হ'লো। হ্রদের দিকের প্রবেশপথে বসানো হ'লো একটা দরজা, আর দরজার দু-দিকে দুটি ঘুলঘুলি বানিয়ে আলো-হাওয়ার ব্যবস্থাও করা হ'লো। দুই গুহার মাঝখানের গলিটার দু-পাশে তারা দুটি চোরাকুঠুরিও তৈরি করলে—সেখানে তালা বন্ধ ক'রে রাখা হ'লো সব অস্ত্রশস্ত্র, বন্দুক ও গুলি-বারুদ।

একদিন সন্ধেবেলায় গোল হ'য়ে ব'সে তারা নানারকম গল্প করছে, হঠাৎ গরডন বললে, 'এই দ্বীপেই যখন আমাদের চিরদিন বাস করতে হবে—অন্তত যত-দিন না কোনো জাহাজ এসে আমাদের উদ্ধার করে ততদিন তো বটেই—তখন দ্বীপের বিভিন্ন অংশের একেকটা নাম দেয়া দরকার। অনেকগুলো নাম চাই। যে-উপসাগরে আমাদের জাহাজ ভেসে এসে ভিড়েছিলো, প্রথমেই চাই তার একটা

banglabooks.in

নাম। তারপর নদীর একটা নাম চাই। হ্রদের, ওই পাহাড়টার, জলাভূমির ওদিককার অন্তরীপের—সবকিছুর জন্যেই নাম ঠিক করতে হবে।'

উঠে দাঁড়িয়ে বক্তৃতার ভঙ্গিতে সারভিস বললে, 'গরডন ঠিক বলেছে। আমরা যে একেকজন খুদে রবিনসন ক্রুসো, তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। সুতরাং দ্বীপের প্রত্যেকটা অংশের নামকরণ করতে হবে আমাদের।'

ডনাগান বললে, 'আমাদের জাহাজটা স্কুনার জাতীয় ছিলো, সুতরাং উপসাগরের নাম হোক স্কুনার উপসাগর।'

'বেশ ভালো নাম', বললে ক্রস, 'কিন্তু উপসাগরের মধ্যে যে-নদীটা গিয়ে পড়েছে, তার নাম কী হবে?'

'কেন, জীল্যাণ্ড রিভার', বললে বাক্সটার, 'নামটা আমাদের দেশের কথা মনে পড়িয়ে দেবে।'

গারনেট বললে, 'তবে হ্রদের নাম কী হবে?'

'দেশের স্মৃতিতে যেমন নদীর নাম করা হ'লো', বললে ডনাগান, 'তেমনি আমাদের আত্মীয়স্বজনের স্মরণে হ্রদের নাম হোক ফ্যামিলি লেক।'

এইভাবে পাহাড়টার নাম রাখা হ'লো অকল্যাণ্ড হিল, অন্তরীপটার নাম ঠিক হ'লো ফল্‌স্ পয়েন্ট। বনের যেখানে ফাঁদ দেখা গিয়েছিলো সেখানটার নাম হ'লো ট্র্যাপ উড্‌স্। স্কুনার বে আর অকল্যাণ্ড হিলের মধ্যকার নাম রাখা হ'লো বসউড। জলাভূমিটা দ্বীপের গোটা দক্ষিণ দিক জুড়ে ব'লে তার নামকরণ হ'লো সাউথ মুর। ঝরনাটার নাম রাখা হ'লো ডাইক ক্রীক। দ্বীপের যে তীরে এসে জাহাজ ভিড়েছিলো, তার নাম হ'লো রেক কোস্ট। হ্রদের আর নদীর তীরের মধ্যবর্তী জায়গাটার নাম হ'লো গেম ফরেস্ট, কারণ সেখানেই ছেলেদের খেলাধুলো করতে সুবিধে হবে। বদোয়াঁর ম্যাপ থেকে জানা গিয়েছিলো দ্বীপের উত্তরে আর দক্ষিণে আরো দুটো অন্তরীপ আছে, পশ্চিমেও আরেকটা। ওই তিনটে অন্তরীপের নাম রাখা হ'লো ব্রিটিশ কেপ, আমেরিকান কেপ আর ফ্রেঞ্চ কেপ।

এইভাবে দ্বীপের নানা অংশের একেকটা নাম ঠিক করা হ'লে পর ব্রিয়াঁ বললে, 'তোমরা এত জিনিশের নাম দিলে, কিন্তু আসল জিনিশেরই কোনো নাম দিলে না! এই দ্বীপের একটা নাম হওয়া উচিত নয় কি?'

অমনি সারভিস বললে, 'এর নাম হোক বেবি আইল্যাণ্ড—আমরা এতগুলি ছেলে যখন এই দ্বীপের উপর এসে উঠেছি।'

banglabooks.in

তখন কোসটার বললে, 'কিন্তু আমরা সবাই যখন চারম্যান স্কুল থেকে এসেছি তখন দ্বীপের নাম হওয়া উচিত চারম্যান আইল্যাণ্ড।'

সবাই উল্লসিত হ'য়ে ব'লে উঠলো, 'বেশ নাম, খাশা নাম! বেশ একটা ভৌগোলিক গন্ধও আছে।'

কোসটার মুখটা গম্ভীর আর ভারিক্কি করার চেষ্টা করলে। নেহাত যে-সে ছেলে তো আর সে নয়—তার মাথা থেকেই তো দ্বীপের অমন সুন্দর নামটা বেরিয়েছে!

এত সব নাম দিতে-দিতে রাত অনেক হ'য়ে গিয়েছিলো—কারু-কারু বেশ ঘুম পাচ্ছিলো। দু-চারজন তো বেঞ্চি থেকে উঠেও দাঁড়িয়েছিলো। কিন্তু এমন সময় ব্রিয়ঁা এমন একটা কথা বললে যে সকলেই বেশ উত্তেজিত ও আনন্দিতভাবে আবার জমিয়ে ব'সে পড়লো, কেবল ডনাগান ছাড়া—তার মুখটা কেন যেন শুকিয়ে একেবারে আমশি হ'য়ে গেলো।

ব্রিয়ঁা বললে, 'দ্বীপের নামকরণ তো হ'লো, কিন্তু তার চেয়েও গুরুতর একটা কাজ আমাদের বাকি আছে। আমাদের এই ছোট্ট দ্বীপটার ওপর শাসন করবার জন্যে আমাদের একজন নেতা দরকার। তাতে আমাদের সুবিধে অনেক। কারণ সব বিষয়ে আমাদের মতের মিল কিছুতেই হবে না, মনোমালিন্য দেখা দেবেই। তাই একজন দলপতির দরকার, যার কথা সকলকে মাথা পেতে নিতে হবে। এখন কে সেই দলপতি হবে, তা তোমরাই ঠিক ক'রে নাও।'

ডনাগানের বুক দুরুদুরু করতে থাকলো। এতদিন সে বেশ স্বাধীনভাবে খেয়াল-খুশিমতো চলাফেরা করছিলো, কিন্তু ব্রিয়ঁা এখন আবার এ কী ফ্যাসাদ বাধালো! কিন্তু ব্রিয়ঁার কথা শুনে সকলেই তখন সমস্বরে মহোৎসাহে ব'লে উঠেছে, 'ঠিক কথা! একজন দলপতি আমাদের চাই।'

ডনাগানের ভারি ইচ্ছে সে নিজেই নেতা হয়। কিন্তু সেদিকে আশা খুব কম, কারণ ব্রিয়ঁারা দলে ভারি। কিন্তু ডনাগানের উপস্থিত বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ। চট ক'রে সে ব'লে উঠলো, 'বেশ, দলপতি একজন হোক, কিন্তু তার শাসনের সময় নির্দিষ্ট থাকা সরকার। ধরো, এখন এক বছরের জন্যে কেউ নেতা নির্বাচিত হ'লো, পরে একবছর পরে আবার আরেকজন হবে আরেক বছরের জন্যে।'

ব্রিয়ঁা কিন্তু ডনাগানের মতলব বুঝতে পেরেছিলো। তাই সে বললো, 'ডনাগানের কথা খুবই ঠিক, কিন্তু এক বছর পরেও আগের দলপতি আবার নির্বাচিত হ'তে পারবে—সে-বিষয়ে কোনো বাধা থাকবে না।'

এরপর আর ডনাগানের কিছুই বলার রইলো না। ব্রিয়ঁাও মতামত নিয়ে

banglabooks.in

আর বেশি সময় নষ্ট করলে না। বললে, 'এবারে দলপতি নির্বাচিত হোক। আমার মতে গরডনকে দলপতি করাই সবচেয়ে ভালো। এতে তোমাদের কারু কোনো আপত্তি আছে?'

সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো, 'মোটেই না। মোটেই না!'

'তাহ'লে আজ থেকে এক বছরের জন্যে গরডন আমাদের নেতা ও এই চার-ম্যান আইল্যাণ্ডের শাসনকর্তা নির্বাচিত হ'লো। এবার থি চিয়ার্স ফর গরডন!'

'হিপ-হিপ-হিপ্ হুর্‌রে' ধ্বনির মধ্যেই চারম্যান আইল্যাণ্ডের উপনিবেশের প্রথম নেতা গরডনের সম্মানে পরদিন দুপুরে মোকো এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করবে ব'লে জানিয়ে দিলে।

ছেলেরা হই-চই করতে-করতে যে-যার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

চিয়ার্স ফর বাক্সটার

গরডনের সুশাসনে শীতকালটা বেশ ভালোয়-ভালোয় কেটে গেলো। ছেলেরা ধ'রেই নিয়েছে যে এই দ্বীপেই তাদের দিন কাটাতে হবে—কাজেই যাতে দিন-গুলো খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে না-কাটে, যাতে আনন্দে আর স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যায়, সেই-জন্যে কেউই কাজেকর্মে কোনো গাফিলতি করে না। ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে ব'লেই বেশ সন্তুষ্ট আছে।

২৬শে অক্টোবর দ্বীপে বেশ একটা মজার কাণ্ড হ'য়ে গেলো। সারভিস আগের দিন ব'লে রেখেছিলো আজ সে উটপাখিটার পিঠের উপর চ'ড়ে বসবে, তাই সকালবেলাতেই তার কাণ্ড দেখতে ছেলেরা কোলাহল ক'রে তার চারপাশে ঘিরে দাঁড়ালো। প্রথমে সারভিস অনেক কসরত ক'রে, অ'নক কষ্টে, পাখিটার পিছনে গিয়ে তার গলায় একটা লাগাম আর মাথায় একটা ঢাকনি পরিয়ে দিলে। এগুলো সে অনেক পরিশ্রম ক'রে নিজেই তৈরি করেছিলো। গরডন অবশ্য প্রথমটায় অনেক বারণ করেছিলো, কিন্তু খুদে রবিনসন ক্রুসো এই সারভিস একেবারে নাছোড়-বান্দা। লাগাম পরাবার পরে সারভিস পাখিটার পায়ের দড়ি ধ'রে টেনে গুহার বাইরে নিয়ে এলো। সঙ্গে-সঙ্গে শোরগোল করতে-করতে অন্য ছেলেরাও চললো।

banglabooks.in

না-জানি উটপাখির পিঠে চড়তে কী মজা ! সারভিস যদি প্রথমে চ'ড়তে পারে, তাহ'লে তারাও এক-আধবার চেষ্টা ক'রে দেখবে। বাইরে নিয়ে এসে বাক্সটার আর গারনেট পাখিটাকে সজোরে চেপে ধ'রে রইলো, আর সারভিস হেঁট হয়ে তার পায়ের দড়ি খুলে দিলে।

এবারে পাখিটা সম্পূর্ণ মুক্ত। সামনেই আবার নিবিড় বন। কাজেই বাক্সটার আর গারনেট পাখিটার দু-পাশে দাঁড়িয়ে তাকে প্রাণপণে চেপে ধ'রে রইলো, যাতে পাখিটা কিছুতেই পালাতে না-পারে। এই ফাঁকে সারভিস অনেক কসরত ক'রে পাখিটার পিঠের উপর চ'ড়ে ব'সে লাগাম টেনে ধরলে। গারনেট আর বাক্সটারকে ছেড়ে দিতে বলতেই তারা ছেড়ে দেবে, কিন্তু 'ছেড়ে দাও' কথাটি আর সারভিসের মুখ দিয়ে কিছুতেই বেরোতে চায় না। কেমন যেন ভয় করছে। কী জানি, যদি পালাতে গিয়ে পাখিটা কোনো বিষম কাণ্ড ক'রে বসে ! শেষটায় অনেক কষ্টে বুকে কিঞ্চিৎ সাহস সঞ্চয় ক'রে সারভিস বললে, 'এইবার ছেড়ে দাও।'

অমনি বাক্সটার আর গারনেট পাখিটাকে ছেড়ে দিলে।

কিন্তু কী আশ্চর্য, ছাড়া পেয়েও পাখিটা নড়ে না কেন ? বোধহয় পাখির চোখদুটি বন্ধ ব'লেই পাখিটা নড়ছে না, এই ভেবে সারভিস হাতের ছড়ি দিয়ে তার মাথার ঢাকনিটা খুলে দিলে। যেই না ঢাকনি খোলা, অমনি পাখিটা দু-পাখা ছড়িয়ে একেবারে তীরের মতো বনের দিকে ছুটে চললো। সারভিস বেশ ভয় পেয়ে প্রায় তার পিঠের উপর শুয়ে দু-পায়ে তাকে আঁকড়ে ধ'রে দু-হাতে লাগাম চেপে থাকলো। পাখি তখন উল্কার মতো ধাবমান। পিছনে চীৎকার করতে-করতে ছেলেরা ছুটে আসছে। সারভিসকে নিয়ে এই সর্বনেশে রাক্ষুসে পাখি কোথায় চলেছে !

সকলেরই ভয় হ'তে থাকলো : সারভিসকে বুঝি তারা চিরকালের মতো হারালো ! পাখিটা যে ক্রমেই চোখের আড়ালে চ'লে যাচ্ছে ! হঠাৎ তারা দেখতে পেলে সারভিস কেমন ক'রে যেন পাখির পিঠ থেকে আচমকা মাটির উপর ছিটকে পড়লো, আর পাখিটা পরমুহূর্তেই লাগাম-সমেত দূর বনের আড়ালে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ছেলেরা সারভিসের কাছে এসে পড়লো। বেচারি তখনও মাটি থেকে উঠতে পারছে না। পাখির পিঠ থেকে প'ড়ে গিয়ে হয়তো তার কোমরটাই ভেঙে গেছে ! সবাই মিলে ধরাধরি ক'রে তাকে টেনে তুললো। দেখা গেলো তেমন-কিছু গুরুতর আঘাত তার লাগেনি।

banglabooks.in

কোনোমতে সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে-করতে সারভিস বললে, 'হায়-হায় ! আমার অমন সুন্দর পাখিটা চ'লে গেলো !···নচ্ছার, অকৃতজ্ঞ কোথাকার !'

ডনাগান হাসতে-হাসতে বললে, 'তুমি যে প্রাণে বেঁচেছো, এইজন্যই তোমার ভগবানকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত। পাখির কথা আর মুখেও এনো না !'

সারভিস তখন বনের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ওরে হতচ্ছাড়া বেইমান পাখি, তোকে অ্যাদ্দিন ধ'রে খাওয়ালুম, এত সেবা করলুম, আর তুই কিনা তার এমন প্রতিদান দিয়ে গেলি !'

উটপাখির অকৃতজ্ঞতা সম্বন্ধে সহাস্য আলোচনা করতে করতে সবাই ফরাশি গুহায় ফিরে এলো।

এদিকে নভেম্বর মাস আসন্ন। এতদিন তো শীতের ভয়ে সবাই কাবু হ'য়ে ছিলো—গুহা থেকে বিশেষ বেরুনো যায়নি। কিন্তু এবার দ্বীপটাকে একটু ভালো ক'রে দেখা দরকার। গোটা চারম্যান আইল্যাণ্ডের কোথায় কী আছে, সেটা তাদের নখদর্পণে থাকা উচিত। সময় নষ্ট না ক'রে ছেলেরা তখনই অভিযানের উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো।

নভেম্বরের পাঁচ তারিখে গরডন, ডনাগান, বাক্সটার, ওয়েব, ক্রস আর সারভিস —এই ছ-জন কুকুর ফ্যানকে সঙ্গে নিয়ে অভিযানে বেরুলো। জিনিশপত্রের মধ্যে গরডন, ডনাগান আর বাক্সটার এই তিনজনে নিলে তিনটে বন্দুক আর তিনটে পিস্তল। দলের অন্য সবাই নিলে একটা ক'রে বড়ো ছোরা। তাছাড়া নিলে দুটো কুড়ুল, একগাছা ল্যাসো, একগাছা বোলা আর একটা সুটকেসের মধ্যে সেই রবারের নৌকোটা। ভারি সুন্দর এই নৌকো, ওজনে বড়ো-জোর পাঁচ-ছ সের। ব্যাগের মধ্যে তা ভাঁজ ক'রে নেয়া যায়, আবার তাইতে ক'রে নদী পার হওয়াও যায়। গরডন আবার ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁর ম্যাপের একটা নকলও সঙ্গে নিলে।

কয়েক দিন ধ'রে একটানা হাঁটতে-হাঁটতে তারা অবশেষে সেই হ্রদের সীমানায় এসে পৌঁছোলো। এ-কদিন তারা বুনো খরগোস আর জংলি পাখির মাংস খেয়ে কাটিয়েছে। কখনও বা তাঁবু খাটিয়ে রাত কাটিয়েছে খোলা আকাশের তলায়, নতুন-নতুন দৃশ্যও দেখেছে অনেক। ডনাগানের ইচ্ছে ছিলো ফ্যামিলি লেকের ওপারটাও দেখে আসে। কিন্তু গরডন বললে, 'না, এবার ফিরতে হবে।' নেতার আদেশ, তাই ডনাগান আর-কোনো উচ্চবাচ্য না-ক'রে তার কথাই মেনে নিলো।

ফেরার পথে এক জায়গায় তারা দেখলে মস্ত একটা গাছ—প্রায় আশি ফুট উঁচু। আর কী প্রকাণ্ড তার শাখা-প্রশাখা ! এর পাশেই তারা আবার আবিষ্কার

banglabooks.in

করলে চা-বাগান। সঙ্গে নমুনা হিশেবে কয়েকটা গাছ তারা তুলে নিলে। পরে সুবিধে-মতো এসে আরো পাতা তুলে নিয়ে গেলেই চলবে।

চা-বাগান পেরিয়ে চ'লে আসছে, এমন সময় হঠাৎ গরডন থেমে গিয়ে বাক্স-টারের হাত ধরে ফিশফিশ করে বললে, 'বাক্সটার, ওই ছাখো, পাহাড়ের কোলে মাঠের উপর ছাগলের মতো কী সব জন্তু চরে বেড়াচ্ছে!'

বাক্সটার তাকিয়ে বললে, 'ছাগল হবে কি? না কি অন্য কোনো জানোয়ার?'

গরডনও ভালো করে তাকিয়ে বললে, 'না ঠিক ছাগল নয়—তবে ছাগল-জাতীয় কোন জন্তু নিশ্চয়ই। যাই হোক, এদের একটাকে তুমি কি পাকড়াতে পারবে?'

'চেষ্টা করে দেখতে দোষ কী?' বাক্সটার কেবল ছোট্ট ক'রে বললে।

বনের আড়ালে কিছু দূরে একটা বিস্তৃত মাঠ, সেই মাঠেই ছ-সাতটা ছাগল-জাতীয় জন্তু চ'রে বেড়াচ্ছিলো। তখনও পর্যন্ত তারা ছেলেদের দেখতে পায়নি, কাজেই বেশ নির্ভাবনাতেই তারা ঘাস খাচ্ছিলো। গরডন আর বাক্সটার অতি সাবধানে পা টিপে-টিপে তাদের দিকে এগুতে লাগলো। কোনো সাড়া-শব্দ কিছু নেই, হঠাৎ দেখা গেল সবচেয়ে বড়ো ছাগলটা শূন্যে মুখ তুলে নাক দিয়ে কী যেন শুঁকবার চেষ্টা করছে। পরমুহূর্তে সেটা পাহাড়ের দিকে ছুটে পালাবার উপক্রম করলো, আর তার দেখাদেখি বাকিগুলোও। তখন বাক্সটার চোখের নিমেষে তাদের সামনে ছুটে গিয়ে ক্ষিপ্র হাতে সেই সুদীর্ঘ বোলা একটার উপর ছুঁড়ে মারলে। অদ্ভুত তার হাতের টিপ, আর অব্যর্থ সেই বোলার নাগপাশ! কিছুতেই তাগ ফসকালো না, বোলাটা চোখের পলকে একটি ধাবমান ছাগলের উপর পড়ে তাকে জড়িয়ে ফেললো। বাকি ক-টা সঙ্গে-সঙ্গে গাছপালার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলো—আর একটু দেরি হ'লেই এটাকেও আটকানো যেতো কি না সন্দেহ।

গরডন আর বাক্সটার তখন দৌড়ে সেই ছাগলটার কাছে গিয়ে ছাখে, সেটা মাটির উপর পড়ে বোলার নাগপাশ থেকে মুক্ত হবার জন্যে বৃথাই চেষ্টা ক'রে চলেছে। তার দুটি বাচ্চাও মায়ের এই দুর্দশা দেখে সেখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে-ছিলো। গরডন তাড়াতাড়ি সেই হতভম্ব বাচ্চাদুটিকে ধ'রে ফেললে, ওয়েব তাদের ধ'রে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিলে।

'এগুলো কি সত্যিই ছাগল?' গরডনকে জিগেস করলে বাক্সটার, 'কী অদ্ভুত গড়ন এদের!'

banglabooks.in

গরডন বললে, 'না, এদের বলে ভিক্যুনা, শাদা কথায় অবিশ্যি এক ধরনের ছাগলই বলা চলে। এরা খুব দুধ দেয়।'

ভিক্যুনাগুলো দেখতে সত্যিই অদ্ভুত। ছাগলের মতো চেহারা হলেও তাদের পায়ের খুরগুলো ভয়ানক লম্বা, গায়ের লোম রেশমের মতো, মাথাটা দেহের তুলনায় নিতান্তই ছোটো, শিঙের কোনোই বালাই নেই।

পরদিন আবার আরেক ব্যাপার। ডনাগান, ক্রস আর ওয়েব ফ্যানকে নিয়ে আগে-আগে চলেছে, পিছনে-পিছনে আসছে গরডনরা—দু-দলের মধ্যে প্রায় একশো গজের ব্যবধান। গাছপালা এখানে খুবই ঘন, তাই একদল অন্যদলকে দেখতে পাচ্ছিলো না। হঠাৎ পিছনের ছেলেরা অতর্কিতে সামনে কিসের কোলাহল শুনে চমকে উঠলো। কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে কিঞ্চিৎ ভয়ই পেলো তারা। সামনের দলটির কোনো বিপদ-আপদ হ'লো না তো? তাড়াতাড়ি তারা সামনের দিকে ছুটলো। কিন্তু বেশিদূর তাদের যেতে হ'লো না—প্রায় পরক্ষণেই দেখতে পেল, আগাছা জঙ্গল সরিয়ে কী একটা প্রকাণ্ড জানোয়ার হুড়মুড় ক'রে তাদের দিকে ছুটে আসছে। একটু কাছে আসতেই ছাখে, ঘোড়ার মতো একটা প্রকাণ্ড জন্তু। দেখেই বাল্সটার আর ইতস্তত করল না, তক্ষুনি তার বোলা ছুঁড়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'গুলি কোরো না, গুলি কোরো না! ব্যাটাকে জ্যান্ত ধরবো!'

ওদিকে ডনাগানও ছুটে আসতে-আসতে বলতে লাগলো, 'আমার গুলিটা বড়ো-জোর ফশকে গেছে! ক্রস, আর দেরি করছ কেন? গুলি করো, চালাও···'

'খবরদার কেউ গুলি চালিও না', হাত নেড়ে বারণ করল গরডন, 'এটা আমাদের মাল-বওয়া কুলি হবে!'

বাল্সটারের বোলার নাগপাশে বন্দী হ'য়ে সেই অদ্ভুত জন্তুটা তখন মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়েছে। চার পা ছুঁড়ে সে কী অসহায় আর্তস্বরে নালিশ জানাচ্ছে! সকলে তফাতে দাঁড়িয়ে জন্তুটাকে দেখতে লাগলো।

সারভিস জিগেস করলে, 'এ আবার কী জন্তু, গরডন? খানিকটা ঘোড়ার মতো দেখতে, আবার খানিকটা উটের মতো? এমন কোনো জানোয়ারের কথা তো "রবিনসন ক্রুসো" বা "স্যুইস ফ্যামিলি"-তে নেই!'

গরডন বললে, 'এ নিশ্চয়ই গুঅনাকো। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম এলাকায় এদের পাওয়া যায়।'

গুঅনাকো অনেকটা উটের মতো দেখতে হলেও আসলে এক ধরনের ঘোড়াই। গায়ের রঙ আবার চিতল হরিণের মতো। বড়ো শান্ত আর নিরীহ হয় এরা।

banglabooks.in

মিনিট কয়েকের মধ্যেই তার পা ছোঁড়া শেষ হ'লো। এখন যেন করুণ চোখে ছেলেদের দিকে তাকিয়ে সাহায্য চাচ্ছে। তার মুখের ভাব দেখে বোঝা গেলো, এ সহজেই পোষ মানবে। তখন তাকে দিয়ে মাল বওয়ানো তো যাবেই, তার পিঠেও চড়া যাবে। বাক্সটার তার গলায় ল্যাসোর ফাঁস পরিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে বোলার পাশ খুলে দিলে। কী আশ্চর্য! ছাড়া পেয়েও গুঅনাকোটা একটুও পালা-বার চেষ্টা করলে না।

আর দেরি না করে সবাই ফরাশি গুহার দিকে ফিরে চললো। অভিযান বেশ সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। চা-বাগান আবিষ্কার করা গেছে, দুটো বাচ্চা-সমেত ভিক্যুনা আর সর্বোপরি একটা নিরীহ অথচ শক্তিশালী গুঅনাকো ধরা গেছে। ডনাগানের বন্দুকের চেয়ে আদিম যুগের ল্যাসো আর বোলা যে অনেক সময়ই বেশি কাজে আসে, এ-কথা সবাই—এমনকি ডনাগান স্বয়ং—স্বীকার করতে বাধ্য হ'লো। অবশ্য বাক্সটারের কৃতিত্বও কম নয়। কী রকম ওস্তাদের মতো এ-সব আদিম নাগপাশগুলো সে ব্যবহার করতে শিখেছে—কী ক্ষিপ্র আর কী তাগ! কিছুতেই তার লক্ষ্য ফসকায় না। বন্ধুরা সবাই একসঙ্গে বাক্সটারকে শাবাস দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'চিয়ার্স ফর বাক্সটার, হুর্‌রে!'

banglabooks.in

দ্বিতীয় পর্ব

দ্বীপে দুই বছর

১

সীল শিকার

ফরাশি গুহায় এই ক-দিন সকলেই বেশ ভালো ছিলো, কিন্তু জাকের হাবভাব ব্রিয়ঁাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুললে। সেই প্রাণখোলা হাশিখুশি হৈ-চৈ-করা জাকের মনে এ কী বিপর্যয় এলো! সারাক্ষণ কালো মুখ ক'রে ব'সে থাকে, কী যেন ভাবে সবসময়; মুখে সেই দীপ্তি নেই, কথায়-বার্তায় নেই ফুর্তির লেশটুকুও। একদিন জাককে আড়ালে ডেকে এনে ব্রিয়ঁা খোলাখুলি জিগেস করলে, 'জাক, তোর কী হয়েছে খুলে বল, আমার কাছে লুকোসনি।'

শুকনো হেসে জাক বললে, 'কী আবার হবে? কিছু না।'

'উঁহু, তা হ'তেই পারে না।' বললে ব্রিয়ঁা, 'আমি তো তোকে জানি—কোনো কারণ না থাকলে এমনিতে গোমড়ামুখে ব'সে থাকার ছেলে তুই নোস। বল, কী হয়েছে—দেখি কোনো ব্যবস্থা করা যায় কি না।'

জাক তো কিছুই বলতে চায় না, কেবলই এড়িয়ে যায়। কিন্তু ব্রিয়ঁাও নাছোড়বান্দা। শেষকালে অনেক পেড়াপিড়ির পর জাক বললে, 'আচ্ছা আরেক-দিন সে-কথা তোমায় বলবো, আজ নয়। আগে আমি একটু ভেবে নিই।'

কী ভেবে ব্রিয়ঁা আর তখনকার মতো তাকে কোনো কথা বললে না। কিন্তু বুঝতে পারলে যে জাক নিশ্চয়ই কোনো গুরুতর কথা লুকোতে চাচ্ছে—আর তার সেই গোপন কথা ভারের মতো তার বুকে চেপে ব'সে আছে ব'লেই সব সময় সে কেমন একা-একা শুকনো মুখে ঘুরে বেড়ায়।

ব্রিয়ঁা নিজেই কিছুটা উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছে।

গরডনরা যখন ভিক্ট্যনা ও গুঅনাকো নিয়ে সদলবলে ফিরে এলো, তখন আরেকটি সমস্যা দেখা দিলো, যার আশু সমাধান তাদের পক্ষে জরুরি হ'য়ে পড়লো।

জানোয়ারগুলির জন্যে এবার একটা ঘরের দরকার। দ্বীপে অবশ্যি গাছের অভাব নেই, আর ছেলেদেরও যন্ত্রপাতি সাজ-শরঞ্জামের অভাব নেই। কয়েকদিন ধ'রে অবিশ্রাম করাত, র‍্যাঁদা, বাটালি, হাতুড়ি, পেরেক ব্যবহার ক'রে ছেলেরা

banglabooks.in

জন্তুদের জন্য একটা কাঠের ঘর তৈরি ক'রে ফেললে। বেশ বড়ো-শড়োই করলে তারা ঘরটা, যাতে অন্তত গোটা-তিরিশেক জন্তু থাকলেও কোনো অসুবিধে না-হয়। ভবিষ্যতে তাদের সংখ্যা যে বাড়বে না তা-ই বা কে বলতে পারে? ওদিকে উইলকক্স রোজ ফাঁদ পেতে রাখে। সেদিন তার ফাঁদে আরেকটা গুঅনাকো ধরা পড়লো। তারপর সাতদিন যেতে-না যেতেই একদিন ফাঁদের মধ্যে একসঙ্গে এক-জোড়া ভিক্যুনা পড়লো। আরেকদিন পড়লো একটা উটপাখি—যদিও তাকে দেখে সবাই আগেরটা ব'লেই ভুল করলে, সারভিস বললে এটা নাকি নতুন। হবেও বা—আগেরটার মুখে তো লাগাম পরানো ছিল—এটার মুখে সে-সব কিছুই নেই। কিন্তু নতুনই হোক আর পুরোনোই হোক—ওই উটপাখি দেখেই সবার হাড়-পিত্তি জ্ব'লে গেলো। কিন্তু সারভিসের চোখ উৎসাহে আবার জলজল ক'রে উঠলো। এবারেও সে উটপাখিটাকে পুষবার জন্যে নিয়ে গেলো। তার এই প্রজ্বলন্ত উৎসাহ দেখে কেউ আর বাধা দিলে না, যদিও সবাই ধ'রেই নিলে যে এবারেও উটপাখির অকৃতজ্ঞতায় সারভিস তিন দিন ধ'রে বকবক করবে শেষটায়।

কিন্তু এ-ছাড়াও ছেলেদের ক্রিয়াকাণ্ডর পরিধি আরো বিস্তৃত হ'লো। ফাঁদ পেতে যখন বুনো জানোয়ার ধরা যায়, তখন আকাশের পাখিই বা ধরা যাবে না কেন? এ-বিষয়ে মোকোর সাহায্য নিয়ে মাওরিদের ধরনে তারা পাখি ধরার ফাঁদ পাতলে। এ-বেলা ফাঁদের উপর কিছু খাবার রেখে এসে ও-বেলা গিয়েই ছাখে ফাঁদে তিন-চারটে পাখি পড়েছে। এভাবে রোজ তারা হরেকরকম পাখি ধরতে লাগলো: গিনি-ফাউল, বুনো-পায়রা, বন-মোরগ, বাস্টার্ড। কতগুলোর আবার নামও তাদের জানা নেই।

জাহাজে প্রচুর লোহার তারের জাল ছিলো। তাই দিয়ে তারা একটা মস্ত পাখির বাসা তৈরি করলে। যে-সব পাখি এসে ফাঁদে পড়তো, তাদের এনে তোলা হ'তো সেই পাখির বাসায়। এক মাসের মধ্যেই তারা আবার ডিম পাড়তে শুরু ক'রে দিলে। কতক ডিম বাচ্চা হবার জন্যে রেখে দিয়ে কিছু ডিম তারা নিজেদের খাবার জন্যে নিয়ে আসতো।

এইসব কারণে এখন তাদের দিন বেশ ভালোই কাটে। বোঝাই যায় না যে কোনো নির্জন দ্বীপে সহায়সম্বলহীন অবস্থায় এসে তারা আশ্রয় নিয়েছে। খাবার কোনো অভাব নেই। মাংস, ডিম তো প্রায় প্রত্যেকদিনই। তার উপর গুহার দু'পাশে লাগানো শবজি-বাগান এখন তো প্রায় জঙ্গল হ'য়ে উঠেছে। কত আর খেয়ে শেষ করতে পারবে তারা?

banglabooks.in

একদিন মোকো তাদের আলোচনাচক্রে বললে, 'তোমরা গুলি ক'রে পাখি মারো কেন ? তীর-ধনুক ছুঁড়তে পারো না ?'

তীর-ধনুকের কথা শুনেই ডনাগান ছাড়া অন্য সকলেরই বুকের ভিতর প্রাগৈতিহাসিক একটা লুকোনো স্পন্দন জেগে উঠলো। রক্তের ভিতরে কোথায় যেন চাপা প'ড়ে ছিলো মানবজাতির আদিপুরুষদের ধ্যান ধারণা—এখন শোনা-মাত্র চঞ্চলভাবে তা ধমনীর মধ্যে ব'য়ে যেতে লাগলো।

জীল্যাণ্ড রিভারের দুই তীরে ছিলো নলখাগড়ার জঙ্গল—মহোৎসাহে তার বেত থেকে তীর, আর অ্যাশ গাছের ডাল থেকে ধনুক তৈরি করা হ'লো। দেখতে-দেখতে কয়েক দিনের মধ্যেই বাক্সটার, ক্রস আর উইলকক্স তীর ছুঁড়তে একেবারে ওস্তাদ হ'য়ে উঠলো—বলাই বাহুল্য সকলের সেরা হ'লো বাক্সটার। তার তাগ কখনও ফশকায় না, আর এ-সব বিষয় তার আসেও ভালো। গাছের ডালে কোনো পাখি ব'সে আছে দেখলেই তারা পাখি-শিকার করার জন্য নিশপিশ ক'রে ওঠে। গরডন তো এখন সকলের উপর কড়া হুকুম জারি করেছে, কেউ কোনো অজুহাতে মিছিমিছি আর গুলি-বারুদ নষ্ট করতে পারবে না।

ওদিকে কিন্তু তাদের সব মোমবাতি আর তেল ফুরিয়ে যাচ্ছিলো। জাহাজের পিপে-ভর্তি তেলও আর নেই, মোমবাতির সংখ্যাও ক্ষীয়মান। তাই ব্রিয়ঁ প্রস্তাব করলে, এবার একদিন সমুদ্রতীরে গিয়ে সীল শিকার ক'রে আনা হোক। আগামী শীতের জন্য এখন থেকেই আলোর ব্যবস্থা করা দরকার। পরামর্শমতো একদিন সবাই বন্দুক নিয়ে সমুদ্রতীরে সীল-শিকারে চললো। প্রথমে ঠিক হয়েছিলো, ছোটো-দের গুহায় রেখে যাওয়া হবে ; কিন্তু শেষটায় গরডন বললে, 'সবাই চলুক। ছেলেরা অনেকদিন সমুদ্রের ধারে বেড়াতে যায়নি—এবার ঘুরে এলে সকলেরই খুব ভালো লাগবে।'

শিকারে যেদিন বেরোলো আকাশ সেদিন খুব পরিষ্কার, স্বচ্ছ নীল ; আবহাওয়ার মেজাজও খুব ভালো, চারধারে যেন প্রসন্ন রৌদ্রের উৎসব লেগে গিয়েছে। ছেলেরা সঙ্গে দুটি গুঅনাকো আর সেই গাড়িটা নিয়ে চললো। গুঅনাকোগুলো এখন বেশ পোষ মেনে গিয়েছে, গাড়িতে জুড়ে দিলে বেশ সুন্দর গাড়ি টানে।

ছেলেরা গাড়ির উপর ডজনখানেক পিপে তুলে দিলে। ইচ্ছে : সমুদ্রের ধার থেকেই সীলগুলো থেকে চর্বি বার ক'রে পিপে ভর্তি করে গুহায় নিয়ে আসবে। গুহার কাছে সীলগুলোকে নিয়ে এলে পচা গন্ধে আর টেঁকা যাবে না।

জীল্যাণ্ড নদীর তীর ধ'রেই তারা সমুদ্রের দিকে চললো। গাড়িটা দিব্যি

banglabooks.in

চলেছে। মাইল চারেক এগুবার পর ইভারসন, ডোল আর কোসটার বায়না ধরলে, তারা আর হাঁটতে পারছে না, তারা গাড়িতে ক'রে যাবে। ব্রিয়ঁারা তাদের আব্দার মেনে নিলে—চটপট তাদের গাড়ির উপর চাপিয়ে নেওয়া হ'লো।

স্কুনার উপসাগরের তীরে এসে যখন পৌঁছোলো, বেলা তখন দশটা। দূর থেকেই চোখে প'ড়লো, সেই বিস্তীর্ণ বেলাভূমির উপর ছোটো-বড়ো অজস্র সীলমাছ খেলা করছে। কেউ-বা পাথরের উপর হাত-পা ছড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে, কেউ-বা বেড়াচ্ছে ছুটোছুটি ক'রে। জীবনে হয়তো এরা কখনও মানুষ চোখে দ্যাখেনি। তা নইলে কি আর অমন নিঃশঙ্কচিত্তে তারা খেলা করতে পারতো?

আক্রমণের সব প্ল্যান খাড়া করা হ'লো। তারপর সব বন্দোবস্ত ক'রে বন্দুক হাতে জনকয়েক এগুলো সমুদ্রের দিকে। আজ আর গুলি-বারুদের মায়া করলে চলবে না। এখন যত সীল মারা যাবে, ততই ভালো। সীলদের পক্ষে, বলাই বাহুল্য, দিনটা আদৌ শুভ ছিলো না।

প্রথমে তারা একে অন্যের মধ্যে পঞ্চাশ গজ ব্যবধান রেখে চাঁদের মতো গোল হ'য়ে দ্বীপের দিক থেকে সমুদ্রের দিকে এগুতে থাকলো, তারপর যেই সীলরা তাদের বন্দুকের নাগালের মধ্যে এলো, অমনি ডনাগান আগের ব্যবস্থামতো সংকেত করলে, আর সবাই এক নিশ্বাসে গুলি চালাতে শুরু ক'রে দিলে। বন্দুক যাদের হাতে ছিলো তাদের সকলেরই তাগ ভালো—কিছুতেই নিশানা ব্যর্থ হয় না। বেছে-বেছে তাদের হাতেই বন্দুক দেয়ার কারণ হ'লো, যাতে একটা গুলিও বাজে খরচ না-হয়। সত্যি, প্রায় কোনো গুলিই নষ্ট হ'লো না তাদের। বলতে গেলে, একেকটা গুলিতেই একেকটি সীল কাত—গুলি গায়ে লেগেছে আর সীল-গুলো সোনালি বালিতে চিৎপাত হ'য়ে প'ড়ে যাচ্ছে। যারা আহত হ'লো না, তারা মাথা তুলে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে হুড়মুড় ক'রে সমুদ্রে গিয়ে নামলো।

সীল-শিকারের নেতা ছিলো ডনাগান। বন্দুক ফেলে দিয়ে রিভলভার হাতে সে তখন চরকির মতো সীলদের পিছন-পিছন ঘুরতে লাগলো। সত্যি বলতে কি, সে তখন একাই একশো।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই শিকারপর্ব শেষ হ'লো। তখন গুনে দেখা গেলো, গোটা তিরিশেক সীল বালির উপর ম'রে প'ড়ে আছে। তখনকার মতো কেউ আর সীলগুলিকে স্পর্শ করলে না। জীল্যাণ্ড নদীর টলটলে স্বচ্ছ জলে স্নান সেরে সবাই একটু জিরিয়ে নিতে বসলো। তারপর বেলা দুটোর সময় তারা ছুরি আর কুঠার নিয়ে আবার সমুদ্রতীরে গিয়ে হাজির হ'লো।

banglabooks.in

এবারে শুরু হ'লো এক বীভৎস কাণ্ড ! কিন্তু যতই খারাপ লাগুক, এ-কাজটা না-করলে তাদের চলবেই না। সমস্ত বিকেল ধ'রে তারা সীলগুলোকে ছাড়িয়ে ভিতরকার মাংস টুকরো-টুকরো করলে। সকলে তখন রক্তে, চর্বিতে আর মাংসের টুকরোয় মাখামাখি। কিন্তু এখন আর ঘেন্না করলে চলবে কেন ?

ওদিকে কিছু দূরেই কতগুলো পাথর সাজিয়ে উনুনের মতো ক'রে মোকো তার উপর এক প্রকাণ্ড কড়াই চাপিয়েছে। কড়াইতে জল ঢেলে সে উনুনে আগুন ধরিয়ে দিলে। তারপর সীলগুলোকে টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে সেই কড়াইতে বড়ো-বড়ো মাংসের টুকরোগুলি চাপিয়ে দেওয়া হলো।

জল ফুটতে শুরু করতেই উপরে পরিষ্কার তেল ভেসে উঠতে লাগলো। একটু মোটা পরদার মতো হ'লেই তারা হাত দিয়ে সেই তেল ডেকচি থেকে পিপেয় ঢালতে লাগলো। দুর্গন্ধে তখন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকাই কষ্টকর—পেটের সব নাড়িভুঁড়ি যেন উলটে বেরিয়ে আসবে। কিন্তু সেই বদগন্ধের মধ্যে নাক টিপে তারা কোনোরকমে সেই দুরূহ কর্ম সাধন ক'রে যেতে লাগলো। রাত আটটা পর্যন্ত মাংস সেদ্ধ হ'লো, কিন্তু তখনও অর্ধেক মাটিতে প'ড়ে আছে। কাজেই পরের দিন সকালেও আবার মাংস সেদ্ধ ক'রে তেল বার ক'রে নেয়ার কাজ চলতে লাগলো। একটানা বিকেল পর্যন্ত সেই কাজ চললো। তেল-কালি মেখে বিকেল-বেলায় একেকজনকে দেখালো ঠিক ভূতের মতো।

সারাদিন সমুদ্রতীরে তারা কাজ করলো, আর আশ্চর্য হ'য়ে দেখলো যে আজ আর একটাও সীল বেলাভূমিতে ওঠেনি। নিশ্চয়ই সীলদের দেশে মস্ত রব উঠে গিয়েছে, 'সাবধান ! তীরে কেউ যেয়ো না, সেখানে মানুষ নামক দু-পেয়ে জন্তুরা রক্তারক্তি কাণ্ড করছে !' ভয়ানক ভয় পেয়েছে নিশ্চয়ই বেচারিরা।

সন্ধেবেলায় বারোটা পিপেতেই কানায় কানায় ভর্তি করা হ'লো তেল। সেই কয়েকশো গ্যালন তেলে তাদের সারা শীতকালটা ভালোভাবেই কেটে যাবে। বাতির জন্যে আর তাদের ভাবতে হবে না।

বড়োদিন এসে গেলো দেখতে-না-দেখতে।

কিন্তু বড়োদিন হলে কি হয়, চারম্যান আইল্যাণ্ডে তখন পুরোদস্তুর গ্রীষ্মকাল। দ্বীপটা যে কোন উলটো মুলুকে, কে জানে ! এখানে এপ্রিল মাসে বরফ পড়ে, ডিসেম্বরে কড়া রোদ। রাতের বেলায় তারা ওঠে—তারও ল্যাজে-মুড়োয় মস্ত গণ্ডগোল, তারাও ওঠে উল্টো।

বড়োদিন বলে সব কাজ বন্ধ রেখে ছেলেরা উৎসবের জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে

banglabooks.in

উঠলো। ফরাশি গুহার দরজা তারা রঙ-বেরঙের নিশান আর লতা-পাতার শেকল দিয়ে সাজিয়েছে, চারদিকে ঝুলিয়েছে রঙিন ফানুশ।

ফরাশি গুহার দুয়ারে দু-দিকের দুটো ঘুলঘুলির মধ্যে তারা কামানদুটোর মুখ ঢুকিয়ে রেখে দিয়েছিলো। বড়োদিনের দিন সকালবেলায় ডনাগান কামানে বারুদ পুরে পনেরোটা ফাঁকা আওয়াজ করলে। বড়োদিনের আগে-পরে ছেলেরা ভালো-ভালো পোশাক পরে চারদিকে হই-হল্লা ক'রে বেড়ালে, মোকোর রন্ধন-শালায় আয়োজন হ'লো ভুরিভোজের। বড়োদিনের দুপুরবেলায় খেলা হ'লো ক্রিকেট : চারম্যান আইল্যাণ্ড শাসনকর্তার একটা দল, ডনাগানের আরেকটা দল। গরডন মার্কিন আর ব্রিয়ঁারা ফরাশি, কিন্তু হ'লে কি হয়, লোঙ্গা বলে বেধড়ক পিটিয়ে রান করায় কেউ কম যায় না। বিকেলবেলায় আবার ফুটবল খেলাও হ'লো। রাত্তিরে এমনকি একটা নাটক পর্যন্ত অভিনয় করলে : শেক্সপীয়ারের 'জুলিয়াস সীজার' আর 'ভেনিসবাসী সদাগর' থেকে বাছাই-করা দৃশ্য অভিনীত হ'লো। তক্তা পেতে তারা একটা মঞ্চ বানিয়ে নিয়েছিল, আর জাহাজের পাল দিয়ে বানিয়েছিল যবনিকা। সব-শেষে ডনাগানের সুন্দর আবৃত্তি শুনে সবাই একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলো।

তারপর এলো নববর্ষ।

এই দ্বীপে তাদের আরো কতগুলো নববর্ষ উদ্‌যাপন করতে হবে, তা শুধু যীশুই জানেন। দশ মাসের উপর হ'লো তারা এই নির্জন দ্বীপে এসে আশ্রয় নিয়েছে—অথচ আজ পর্যন্ত উদ্ধারের কোনো উপায় খুঁজে পেলো না। জীবনযাত্রার সব দরকারি জিনিসপত্র তারা নিজেদের বুদ্ধিতে জোগাড় ক'রে নিয়েছে—এমন নয় যে দ্বীপে হই-হুল্লোড়ের মধ্যে থাকতে ভালো লাগে না। কিন্তু তাই ব'লে স্বদেশকে কি ভোলা যায় কখনও ? ভোলা যায় আত্মীয়স্বজনদের ?

ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি—কত দেশের কত শত জাহাজ দিনরাত্রি পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্র তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এমন এক দ্বীপে তাদের নির্বাসন হ'লো, যার ত্রিসীমানা দিয়েও কোনো জাহাজ যায় না।

তবু ভালো যে আজ অবধি কারু তেমন অসুখ-বিসুখ হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের কত রকম বিপদ আপদ হতে পারে। তখন ? তখন এই অতগুলো ছেলে কী করবে ? ওদিকে আর কয়েকমাস পরেই ঠাণ্ডা পড়তে শুরু করবে। কুমেরু অঞ্চলের সেই ভীষণ শীত কি আবার তাদের ভোগ করতে হবে ?

banglabooks.in

২

ফ্যামিলি লেক পেরিয়ে

কাউকে দেখে তো মনে হয় না যে কারু মনে কোনো দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগ আছে। সকলেই বেশ নির্ভাবনায় দিন কাটাচ্ছে, কিন্তু ব্রিয়ঁার মনে আর শান্তি নেই। কবে যে এই রাক্ষুসে দ্বীপ থেকে রেহাই পাবে, কিংবা আদৌ পাবে কি না কখনও তাই বা কে জানে।

এদিকে আবার শীত আসন্ন। পোষা জন্তুগুলি এখন সংখ্যায় অনেক বেড়ে উঠেছে ; শীতের সময় তাদেরও নিরাপদে রাখা দরকার।

ব্রিয়ঁা সকলকে নিয়ে তাদের জন্য আরো ভালো একটি বাসা তৈরি করার কাজে লেগে গেলো।

শীত আসবার আগে আরেকটি কাজও করা দরকার। ফ্যামিলি লেকের পুব তীরটা একবার ভালো করে দেখে আসা উচিত। সেদিকটায় কী আছে কিছুই জানা নেই, কেবল ফ্রঁাসোয়া বদোয়ঁার সেই মানচিত্রটিই নির্ভর।

একদিন ব্রিয়ঁা গরডনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললে, 'ছাখো গরডন, বদোয়ঁার ম্যাপ যতই বলুক না কেন দ্বীপের পুবদিকে সমুদ্রের উপরে ধারে-কাছে কোনো ডাঙা নেই, তবু আমাদের নিজেদের ওদিকটা একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। সঙ্গে আমাদের ভালো দুরবিন রয়েছে, অত্যন্ত শক্তিশালী দুরবিন—হয়তো বদোয়ঁার তা ছিলো না।'

গরডনের কোনো আপত্তি ছিলো না। বদোয়ঁার মানচিত্র মোটামুটি নির্ভরযোগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু ব্রিয়ঁার কথাতেও যথেষ্ট সারবত্তা রয়েছে। ঠিক হ'লো, এবারে শুধু ব্রিয়ঁা আর তার ভাই জাক যাবে—আর সঙ্গে থাকবে মোকো। যেহেতু নৌকোয় ক'রে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই, সেইজন্যে সঙ্গে মোকোর মতো একজন পাকা নাবিক থাকা উচিত।

সেই বন্দোবস্ত অনুযায়ী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সকাল আটটায় তিনজনে নৌকো ছেড়ে দিলে। তখন হাওয়া আসছিলো দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে—তাতে তাদের সুবিধেই হ'লো। নৌকোয় পাল তুলে দিয়ে মোকো হাল ধ'রে ব'সলো। আস্তে ভেসে কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকো এসে প'ড়লো ফ্যামিলি লেকের মাঝখানে।

হ্রদের মাঝখানটায় বেশ বড়ো-বড়ো ঢেউ। মনে হয়, এ যেন সামান্য হ্রদ নয়, যেন কোনো বিরাট নদীর উপর দিয়ে তাদের ছোট্ট ডিঙি ভেসে যাচ্ছে। বেলা

banglabooks.in

তিনটের সময় ব্রিয়ঁা দুরবিন দিয়ে হ্রদের অন্য পাড়টি দেখবার চেষ্টা করলে। ঝাপশা মনে হ'লো, দূরে যেন কুয়াশার মতো অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ডাঙা।

বেলা চারটের সময় হ্রদের তীরের গাছপালা বেশ স্পষ্ট দেখা গেলো। হ্রদের পশ্চিম অংশ বেশ গভীর, কিন্তু পুবদিকে হ্রদের জল অত্যন্ত কম। কাঁচের মতো স্বচ্ছ টলটলে জলের ভিতর দিয়ে এমনকি হ্রদের তলদেশ পর্যন্ত বেশ স্পষ্ট চোখে পড়ছিলো। নানা রকম আগাছা, শ্যাওলা ও জলের উদ্ভিদ তলায় তালগোল পাকিয়ে আছে, আর তারই মধ্য দিয়ে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে অজস্র ছোটো-বড়ো মাছ।

ব্রিয়ঁার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে উত্তর দিকে গেলে মানচিত্র-বর্ণিত সেই নদীটির খোঁজ পাওয়া যাবে। ব্রিয়ঁার অনুমানই যে ঠিক, তা একটু পরেই বোঝা গেলো, যখন তাদের নৌকো খানিক বাদেই নদীর মুখে এসে পড়লো। হ্রদ থেকে বেরিয়ে নদীটা পুবদিকে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

জাক বললে, 'নদীটার একটা নাম দেবো না আমরা? সব কিছুরই যখন নাম দেয়া হয়েছে, তখন এটাই বা বাকি থাকে কেন?'

'নিশ্চয়ই দেবো'। তক্ষুনি উত্তর দিলো ব্রিয়ঁা। 'আমি বলি কি, এর নামটা একেবারে সরাসরি ঈস্ট রিভার রেখে দেয়াই ভালো। কাল সকালে আমরা এই নদী দিয়েই নৌকো চালিয়ে যাবো।'

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে, কাজেই আর এগুবার চেষ্টা না ক'রে তারা সেখানেই নৌকো ভিড়িয়ে দিলো। তারপর নৌকো থেকে একটা প্রকাণ্ড ওক গাছের তলায় তারা তাঁবু খাটালো; তাঁবুর সামনে জড়ো করা হ'লো প্রচুর শুকনো ডালপালা, তারপর সেই শুকনো ডালপালায় তারা আগুন ধরিয়ে দিলে। রাতটা তারা এখানেই কাটাবে। অচেনা জায়গা, অন্ধকারে কখন কোন বুনো জন্তু গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসে কে জানে! তাদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যেই এই অগ্নিকুণ্ডের ব্যবস্থা করলে ব্রিয়ঁা।

রাত্রে কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটলো না। পরদিন একেবারে ভোর ছ-টায় মোকো আর জাককে ঘুম থেকে ঠেলে তুলে চটপট ছোটোহাজরি সেরে নিয়ে ব্রিয়ঁা নৌকো ছেড়ে দিলো। বেশ স্রোত আছে নদীতে, ছোট্ট কুলকুল আওয়াজ ক'রে জল ব'য়ে যাচ্ছে। এতক্ষণ হ্রদে ঢেউ যত ছিলো তত স্রোত ছিলো না, এখন হ্রদের প্রচুর জল তরতর করে নদী দিয়ে ব'য়ে চলেছে, তাই এখন আর তাদের দাঁড় টানতে হ'লো না।

banglabooks.in

মোকো বললে, 'এই এক জোয়ারেই আমরা নদীর এই ছ-মাইল পথ পেরিয়ে যাবো। খামকা দাঁড় টেনে আর কাউকে কষ্ট করতে হবে না।'

প্রথমটা নদীর দু-তীরে ছিলো ঘন জঙ্গল। কিন্তু বেলা এগারোটার পর থেকে দু-দিকের গাছপালা আস্তে-আস্তে ফাঁকা হ'য়ে এলো। বাতাসে বেশ-একটা কড়া লোনা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে—একটু যেন আমিষমাখা সেই গন্ধ। ঘণ্টাখানেক পরে দূরে দিগন্তের কাছে এক বাঁকা নীল রেখা জেগে উঠলো—অর্থাৎ সমুদ্র দেখা দিলো তাদের কাছে।

বাম তীরে নৌকো বেঁধে তিনজনে বেলাভূমির হলুদ-সোনালি বালিরাশির উপর গিয়ে নামলো। অবাক কাণ্ড! এখানে সমুদ্রের ধারে এত বেশি পাহাড় কেন? চারদিকেই পাহাড়ের পর পাহাড়, তবে সবগুলোই এত ছোটো যে পাহাড় না ব'লে হয়তো টিলা বলাই সংগত।

ঘুরতে ঘুরতে ব্রিয়ঁা সেই টিলাগুলোর মধ্যে প্রায় কুড়িটা গহ্বর আবিষ্কার করলে। আহা, তাদের জাহাজটা যদি এদিকে এসে ভিড়তো তো তাদের আর ভাবনা ছিলো না। এত কষ্ট ক'রে সমুদ্র থেকে অত দূরে ফরাশি গুহায় গিয়ে হয়তো আশ্রয় নিতে হ'তো না।

একটু পরে তারা নদীর তীর ধ'রে এগিয়ে সমুদ্রের ঠিক উল্টোদিকের বনের মধ্যে প্রবেশ করলে। বনের মধ্যে কত রকমের যে পাখি! ব্রিয়ঁা গুলি ক'রে দু-চারটে পক্ষী শিকার না ক'রে পারলে না; এত পাখি দেখে প্রথমত তার হাত নিশপিশ করছিলো, দ্বিতীয়ত নৌকোয় যে খাবার আছে তাতে আপাতত হাত না দেয়াই শ্রেয় কারণ এই অভিযানে যদি অভাবিতরূপে বেশি সময় লেগে যায়?

শিকার সঙ্গে ক'রে বন থেকে বেরিয়ে এলো তারা, আবার সেই বেলাভূমির টিলাগুলোর মধ্যে ঘুরতে লাগলো। টিলাগুলো যেন আসলে আদৌ টিলাই নয়—কে যেন কতগুলো মস্ত অতিকায় পাথর জড়ো ক'রে রেখেছে। আর এরই মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে ব্রিয়ঁা এক সময় ছোটো-বড়ো দশ-বারোটা ঘর আবিষ্কার করলে—সুন্দর-সুন্দর গ্র্যানাইট পাথরের ঘর। বলাই বাহুল্য ঘর নয়, কিন্তু এমনভাবে প্রকৃতিঠাকরুন পাথরগুলো সাজিয়ে রেখেছেন যে ঘর ব'লেই ভ্রম হয়।

বেলা প্রায় দুটো। বেশ কড়া রোদ উঠেছে, আলোও বেশ তপ্ত ও ঝলমলে।

একটা উঁচু টিলায় উঠে তারা দেখতে পেলে, দ্বীপের দক্ষিণ দিকে সুদূরবিস্তৃত বালির পাহাড়, আর উত্তর দিকে বেশ খানিকটা দূরে অনেকখানি জায়গা জুড়ে রুক্ষ উষর মরুভূমি। অর্থাৎ দ্বীপের মাঝখানটি ছাড়া আর সবকিছুই বাসের সম্পূর্ণ

banglabooks.in

অযোগ্য। মাঝখানে ওই বিশাল হ্রদটা আছে ব'লেই তার আশপাশে অমন গভীর জঙ্গল, অমন শ্যামল সমভূমি। আর পুবদিকে বালিয়াড়ি টিলায় ভরা, তারপরে সীমাহীন দুস্তর সাগর। কিন্তু সমুদ্রের ওদিকে কি কোনো ডাঙাই নেই? চোখে দুরবিন লাগিয়ে বারে বারে তিনজনে নিশ্চিত হবার চেষ্টা করলে। একবার ব্রিয়ঁা ছাখে, একবার জাক, আরেকবার হয়তো মোকো।

হঠাৎ মোকো চেঁচিয়ে উঠলো, 'ও কী! ওটা কী দেখা যাচ্ছে?'

তক্ষুনি ব্রিয়ঁা তার হাত থেকে দুরবিনটা ছিনিয়ে নিলে। চোখ দিয়ে দেখলে—অবাক কাণ্ড!—এতক্ষণ তাদের চোখে পড়েনি কেন?

দূরে, অনেক দূরে, সুদূর পুব-দিকচক্রবালে নীল আকাশের গা ঘেঁসে ঠিক যেন মেঘের মতো দেখা যাচ্ছে—হয়তো কোনো ধূসর পাহাড়ই বুঝিবা হবে। পাহাড়ই হোক আর যা-ই হোক, সমুদ্রের কোলে পুবদিকে যে আরেকটা কিছু ধূসরবর্ণ জিনিশ দেখা যাচ্ছে, তাতে কোনো সন্দেহই নেই।

দস্তুরমতো উত্তেজিতই হ'য়ে পড়লো তিনজনে। স্থির, অনড় ধূসর পদার্থ, সুতরাং বোঝা গেলো কোনো জাহাজ নয়। তাহলে কি ডাঙা? আরেকটা দ্বীপ? কোনো মহাদেশের ল্যাজের দিক—অন্তরীপের মতো সমুদ্রে ঢুকে পড়েছে? এমনি নানা কথা তারা আলোচনা করলে।

সন্ধ্যা নেমে আসতেই তিনজনে ঈস্ট রিভারের মোহানার কাছে ফিরে এলো। কিছু শুকনো ডালপালা জড়ো ক'রে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে, দিনের-বেলায়-শিকার-করা পাখির মাংস দিয়েই নৈশভোজ সমাপন করলে তারা।

তখনও জোয়ার আসেনি, জোয়ার আসতে অনেক দেরি। হাতে কোনো কাজ নেই ব'লে তিনজনে এদিক-ওদিক ঘুরতে লাগলো। ক্রমে রাত্রি সাতটা বেজে গেলো, চারদিকে অন্ধকার বেশ ঘন হ'য়ে এসেছে। মোকো নৌকোয় ফিরে এসে ছাখে ওরা দু-ভাই তখনও ফেরেনি।

বনের মধ্যে তারা কোনো বিপদে পড়েনি তো?

মোকো নৌকো থেকে তীরে নেমে পড়লো আবার। আর তীরে নামতেই হঠাৎ তার কানে গেলো কাছেই কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। কান্নার শব্দটা ভেসে আসছে বনের মধ্য থেকে। আরেকটু উৎকর্ণভাবে শুনলো মোকো: আরে—কান্নার সঙ্গে-সঙ্গে যে ব্রিয়ঁার কথাও শোনা যাচ্ছে!

মোকো তক্ষুনি বনের দিকে এগিয়ে গেলো।

খানিকটা গিয়েই ছাখে, কী আশ্চর্য, ব্রিয়ঁা খুব গম্ভীর মুখে একটা গাছের

banglabooks.in

গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ব'সে আছে আর তার সামনে নতজানু হ'য়ে ব'সে তার ছোটো ভাই জাক ; আকুল গলায় সে মাপ চাইছে তার দাদার কাছে।

মোকো কিছু বুঝতে পারলো না তার কী করা উচিত। দুই ভাইয়ের ব্যক্তিগত কথার মধ্যে গিয়ে পড়া উচিত, না এখান ছেড়ে চ'লে যাওয়াই ঠিক—তা সে কিছুতেই স্থির করতে পারছিলো না, ফলে সেই ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় গাছের আড়ালেই দাঁড়িয়ে রইলো সে, আর দুই ভাইয়ের কথাবার্তা শুনতে লাগলো।

একটু পরেই সমস্ত ব্যাপারটা মোকোর কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেলো। আগাগোড়া অনুধাবন করার সঙ্গে-সঙ্গে সেও প্রথমটা যেন পাথরের মূর্তিতে রূপান্তরিত হ'য়ে গেলো—কিন্তু তারপরে বহু কষ্টে নিজেকে সংবরণ ক'রে কী ভাবতে-ভাবতে নিঃশব্দে আবার ফিরে এলো নৌকোয়।

দুই ভাই যখন ফিরে এলো, তখনও জোয়ার আসেনি।

জাক নৌকোয় না-এসে তীরেই বালির উপর বসে গালে হাত দিয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইলো। তার মুখটা থমথমে—অন্ধকারের মধ্যেও বোঝা যাচ্ছিলো।

নৌকোর গলুইয়ের উপর কেবল ছোট্ট একটা লণ্ঠন জ্বলছে। নৌকোর উপর বসে আছে ব্রিয়ঁ। আর মোকো—কেউ কোনো কথা বলছে না—দু'জনেই যে যার ভাবনায় তন্ময়।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে হঠাৎ শেষে মোকো বললে, 'তোমাদের সব কথাই আমি শুনেছি।'

'কী শুনেছো, মোকো ?' ব্রিয়ঁ। চমকে উঠলো।

'জাক যে-কাণ্ড করেছে।'

'তুমি বুঝি আড়ালে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনেছো ?'

'হ্যাঁ।' মোকো জবাবদিহির কোনো চেষ্টাই করলে না : 'কিন্তু তাকে তোমার ক্ষমা করা উচিত।'

'আমি তো ক্ষমা করেছি মোকো, কিন্তু অন্য সবাই ? তারা কি ক্ষমা করবে ? তুমি কি করবে ?'

'আমার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। অন্যদেরও তাকে ক্ষমা করা উচিত। কিন্তু তারা এ-কথা না-ই বা জানলো ! কী দরকার তাদের জানিয়ে ?'

'মোকো ! মোকো !' ব্রিয়ঁ। আর সামলাতে পারলে না, মোকোর হাত নিজের দু-হাতের মধ্যে চেপে ধরলে। 'তুমি জাককে ক্ষমা করো—সে মারাত্মক অপরাধ করেছে !'

banglabooks.in

মোকো কোনো কথা না-ব'লে নিঃশব্দে ব্রিয়ঁার মাথায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে তার রেশমের মতো চুলগুলো কপালের দু-পাশে সরিয়ে দিতে লাগলো। যেদিন নোঙর-ছেঁড়া জাহাজটি ঝোড়ো সমুদ্রে কুটোর মতো ভেসে গিয়েছিলো, সেদিন থেকেই সে দেখে আসছে এই ফরাশি কিশোরটি কেমন ক'রে নিজের কাঁধে সকলের নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে নিয়েছে—বুদ্ধিতে, কৌশলে, সাহসে তার কোনো তুলনা সে দ্যাখেনি। আজ তাকে এমনভাবে ভেঙে পড়তে দেখে এই আদিবাসী মাওরি কিশোরটির বুকের ভিতরটা হু-হু ক'রে উঠলো। সে মনে-মনে নিজের ভাষায় মাওরি দেবতার কাছে এই কিশোরটির জন্যে প্রার্থনা করলো বারবার।

আস্তে-আস্তে রাত দশটা বেজে গেলো। জোয়ার এলো, জল টান দিলো নৌকোকে—জাককে নৌকোয় ডেকে তারা নৌকো ছেড়ে দিলো।

পরদিন বেলা দশটার সময় একেবারে ফরাশি গুহার কাছে গিয়ে তারা নৌকো বাঁধলে। ইভারসন তখন ছিপ ফেলে বসে মাছ ধরছিলো হ্রদে : ব্রিয়ঁাদের দেখেই সে চ্যাঁচামেচি ক'রে সকলকে ওদের আসার খবর জানিয়ে দিলো।

ব্রিয়ঁা তাদের অভিযানের সব কথাই সবিস্তারে বর্ণনা করলে, বললে না কেবল জাকের কথা।

সবাই বুঝতে পারলে, চারম্যান আইল্যাণ্ড পৃথিবীর সমস্ত সংস্পর্শ থেকেই সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। বাইরে থেকে কোনো সাহায্য না-পেলে তাদের পরিত্রাণের কোনো আশা নেই। কিন্তু এই পাণ্ডব-বর্জিত সমুদ্রে বাইরে থেকে সাহায্য কি আর আদৌ আসবে—এদিক দিয়ে তো কোনো জাহাজই যেতে দেখলো না তারা এতদিনে।

নতুন দলপতি

২৫শে এপ্রিল বিকেলবেলায় একটা তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ব্রিয়ঁা আর ডনাগানের মধ্যে বিশ্রী একটা ঝগড়া হ'য়ে গেলো।

দোষটা ডনাগানেরই বেশি।

বিশেষ ক'রে গণ্ডগোলটার উদ্ভব যেহেতু হ'লো খেলার মাঠে, সেইজন্যেই ডনাগানের দোষটা বেশ জলজল ক'রে উঠলো। খেলায় একদলের ক্যাপটেন

banglabooks.in

ছিলো ডনাগান, অন্যদলের ব্রিয়ঁা। ডনাগানের দল হেরে গেলে ডনাগান খামকা ব্রিয়ঁাকে যাচ্ছেতাইভাবে গালাগাল করলে। গালাগাল শুনে ব্রিয়ঁা প্রথমটা খুব উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে ভদ্রভাবে তার প্রতিবাদ জানালে।

ব্রিয়ঁার ভদ্র কথা শুনে ডনাগান বনবেড়ালের মতো ফোঁস ক'রে উঠলো, 'তোমাকে আর ধর্মের বুলি আওড়াতে হবে না, কাপুরুষ কোথাকার! ও-সব সুসমাচার আমি ঢের-ঢের শুনেছি!' ব'লে ডনাগান ঘুসি পাকিয়ে তার দিকে তেড়ে গেলো।

এক হাতে তাকে ঠেকিয়ে ব্রিয়ঁা বললে, 'আমি কাপুরুষ! তবে এই ছাখো, ডনাগান!' এই ব'লে অন্য হাতে তার মুখে এক প্রকাণ্ড ঘুসি কষিয়ে দিলো সে।

গোলমাল শুনে গরডন ছুটে এসে দু'জনকে দু'দিকে টেনে ধরলে।

ডনাগান হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'ব্রিয়ঁা আমাকে মিথ্যুক বলেছে, গরডন!'

ব্রিয়ঁাও তেমনি আকুল গলায় বললে, 'আর ও আমাকে ভণ্ড, জোচ্চোর, কাপুরুষ বলেছে!'

গরডন তখন অন্যদের কাছ থেকে সবিস্তারে সব শুনে বললে, 'ডনাগান, এক্ষেত্রে কিন্তু তোমারই দোষ বেশি।'

ডনাগান এবার ভয়ানক রেগে উঠলো। 'বটে? দোষ আমার? তা তোমরা একচোখো লোক তো আমার দোষ দেখবেই!'

এবার গরডন গর্জন ক'রে উঠলো, 'হ্যাঁ দোষ তোমার! তোমার মতো এ-রকম বদমেজাজি, হিংসুটে ছেলে বিশ্বে আর দুটো নেই!'

তার কথা শুনেই ডনাগান বিদ্রূপের ভঙ্গিতে হেসে উঠলো, 'ব্রিয়ঁা, তোমার উচিত গরডনকে অভিনন্দন জানানো! ওর অমন সব মধুর মতো কথা কি নিষ্ফল যাবে?' এই ব'লে সে আবার ব্রিয়ঁার দিকে এগিয়ে গেলো।

গরডন চটপট মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়লো: 'সাবধান, ব্রিয়ঁার গায়ে তুমি হাত দিয়ো না, ডনাগান! ওর গায়ে যদি আঁচড়টি লাগে, তবে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না। জানো, আমি তোমাদের দলপতি—আমার কথা তোমাদের মেনে চলতেই হবে। যে না-শুনতে চায়, সে এখান থেকে চ'লে যেতে পারে। ডনাগান, আমি তোমাকে আবার বলছি, তুমি যদি ঠাণ্ডাভাবে এখানে সকলের সঙ্গে মিলে-মিশে না থাকতে পারো তো তুমি চ'লে যাও এখান থেকে! তোমার দলবল নিয়ে অন্য কোনোখানে থাকোগে, যাও!'

banglabooks.in

গরডনের কঠিন অনুত্তেজিত, চাপা গলার ভর্ৎসনা শুনে ডনাগান আর-কোনো কথা না-ব'লে নীরবে মাথা নত ক'রে সেখান থেকে চ'লে গেলো।

আস্তে-আস্তে সন্ধে হ'য়ে এলো।

ফরাশি গুহায় একে-একে সবাই ফিরে এসেছে, ফেরেনি শুধু ডনাগান।

বিকেলের ঘটনার জন্যে সকলের খুব মন খারাপ। এমন একটা বিশ্রী অবস্থার যে সৃষ্টি হবে, এটা কেউ গোড়ায় ভাবতে পারেনি। বেশ তো হল্লোড় ক'রে খেলা হচ্ছিলো সবাই মিলে।

রাত আটটার সময় ডনাগান গুহায় ফিরে এসে খেয়ে-দেয়ে চুপচাপ শুতে গেলো, একটা কথাও বললে না। আর তার গুম হ'য়ে থাকাটাই ব'লে দিলে যে গরডনের উপর শিগ্‌গিরই সে একটা ভয়ানক প্রতিশোধ নেবে।

চারম্যান আইল্যাণ্ডে আরেকটা মে মাস এলো।

প্রথম সপ্তাহ থেকেই এমন ঠাণ্ডা পড়তে লাগলো যে, ঘরের মধ্যে আগুন জেলে না-রেখে রাতে ঘুমোনোই অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। শীতের প্রকোপ যত বাড়তে থাকে, যাযাবর পাখিরাও ততই ঝাঁকে-ঝাঁকে দ্বীপ ছেড়ে উত্তরের কোনো দেশে উড়ে যেতে থাকে। এদের মধ্যে ছোটো সোয়ালো পাখিগুলোই অনেক দূর-দূর দেশে উড়ে যায়। ব্রিয়ঁা জাল পেতে কতগুলো সোয়ালো পাখি ধ'রে কাগজে তাদের জাহাজডুবির কথা লিখে ভাঁজ ক'রে তাদের পায়ে সুতো দিয়ে বেঁধে দিলে: —যদি কোনোরকমে একটা পাখিও উত্তর দেশের কারু ফাঁদে পড়ে।

শীতের সূচনাতেই দ্বীপবাসীদের মধ্যে আরেকটা উত্তেজনার ব্যাপার ঘটলো। গরডনের নেতৃত্বকাল শেষ হবে জুন মাসের ১০ তারিখে—তখন তাদের নতুন দলপতি নির্বাচন করতে হবে। ব্রিয়ঁা আর গরডন—দু'জনেই এ-বিষয়ে খুব উদাসীন। কেবল একজন এই নির্বাচন উপলক্ষে একেবারে উঠে-প'ড়ে লাগলো—সে ডনাগান। তার একান্ত ইচ্ছে, এবার যেন সে দলপতি নির্বাচিত হয়। কিন্তু আশা তার খুবই কম। তার দলে মাত্র তিনজন—ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স। কিন্তু তাই ব'লে সে একেবারে নিরাশ হ'য়ে পড়লো না। তদ্‌বিরে কী না হয়? ভোটের জন্যে সে সবার কাছে রীতিমতো তদ্‌বির শুরু ক'রে দিলে।

শেষে একদিন সেই ১০ই জুন এসে পড়লো। নির্বাচন শুরু হবে সেদিন বিকেলে। ছেলেদের সবাইকে এক টুকরো কাগজে তার মনোনীত ব্যক্তির নাম লিখে দিতে হবে।

বেলা তিনটের সময় গরডন ভোটের বাক্স খুললো। খুবই গম্ভীরভাবে প্রাথমিক

banglabooks.in

কাজগুলো শেষ ক'রে ভোট গোনা শুরু হ'লো। শুনে দেখা গেলো নির্বাচনের ফল দাঁড়িয়েছে এইরকম :

ব্রিয়ঁা ভোট পেয়েছে ৮
ডনাগান পেয়েছে ৩
গরডন মাত্রই ১

ডনাগান আর গরডন কাউকে ভোট দেয়নি, ব্রিয়ঁা কেবল গরডনকে ভোট দিয়েছিলো।

নির্বাচনের ফল দেখে ব্রিয়ঁা নিজেই অবাক। আর ডনাগান ? সে তো রাগে-ক্ষোভে নিজের চুল নিজেই ছেঁড়ে ! ব্রিয়ঁা ভেবেছিলো, গরডনই আবার নির্বাচিত হবে. কিন্তু—কী আশ্চর্য—সে ছাড়া আর-কেউ গরডনকে ভোট দিলে না ! গরডন একটু কষ্ট পেলো—মনে মনে বুঝলো যে তাকে কেউ চায় না। কিন্তু পরক্ষণেই মনখারাপ ভাবটা সে ঝেড়ে ফেললে।

ব্রিয়ঁা গোড়ায় ভাবলে যে সে নিজে নেতৃত্ব নিয়ে শেষে আবার গরডনকেই নেতৃত্ব দেবে—কারণ সে-ই তো এখন সকলের প্রতিনিধি। কিন্তু এমন সময় তার চোখ পড়লো জ়াকের উপর। পরক্ষণেই কোনো কথা না-ব'লে সে গম্ভীর মুখে গরডনের কাছ থেকে সমস্ত দায়িত্ব বুঝে নিলে।

৪

ভয়ংকর ও রোমাঞ্চকর

দলপতি হওয়ার পর ব্রিয়ঁার প্রথম কাজ হ'লো স্কুনার উপসাগরে গিয়ে নিশানটির বদলে একটা উড়ো বেলুন টাঙিয়ে দেয়া। নিশানটাকে আর কতদূর থেকেই বা দেখা যাচ্ছে ? বেলুনটা বরং সমুদ্রের বহু দূরবর্তী অঞ্চল থেকেও স্পষ্ট দেখা যাবে। নল-খাগড়ার বেত থেকে ঝুড়ি, আর ক্যানভাস কাপড় দিয়ে বেলুনের খোল বানানো হ'লো—আর তাদের অনভ্যস্ত হাত সত্ত্বেও বেলুনটা হ'লো হালকা, মজবুত আর সুদৃশ্য।

ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডা পড়েছিলো, এবারে শুরু হ'লো ভয়ংকর শীত। গুহার বাইরে যাওয়াটাই প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। সকাল কি মধ্যদিন, বিকেল কি রাত্রি—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোনো সময়েই সেই হু-হু ঠাণ্ডা কমে না। বাইরে যেতে পারে

banglabooks.in

না ব'লে ছেলেরা গুহার মধ্যে এবার রীতিমতো ইশকুল বসিয়ে দিলো—পড়াশুনোয় মন দিলো সবাই। সঙ্গে বইয়ের অভাব ছিলো না। অসুবিধে হ'লে একে-অন্যকে জিজ্ঞেস ক'রে নেবারও সুযোগ ছিলো। তা ছাড়া বড়োরা ছোটোদের গল্প ক'রে সব শেখাতো। গল্পের ছলে জানাতো ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত, বিজ্ঞান-কাহিনী, আরো কত কী। এইভাবেই অগাস্ট মাস শেষ হ'লো। ঠাণ্ডা আস্তে আস্তে ক'মে আসছে বটে, তবু এখনও বরফ পড়ে বাইরে।

ঠাণ্ডা সেদিন অন্যদিনের চেয়ে অনেকটাই কম ছিলো। বাইরের মাঠ, বন, নদী—চারদিক বরফে ধবধব করছে। যেন কোনো শুভ্র, মসৃণ, নিরেট চাদরে জলস্থল কেউ মুড়ে রেখেছে।

ঠাণ্ডা কম দেখেই ব্রিয়ঁা ঠিক করলে, সবাইকে নিয়ে বাইরে বরফের উপর একটু স্কেটিং করতে বেরুবে। গুহার মধ্যে আটকা থেকে তারা সবাই একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছিলো।

গত বছর শীতের সময়েই তারা সকলে অল্পবিস্তর স্কেট করা শিখেছিলো—কারণ স্কেটিং-এর সব সাজশরঞ্জামই ছিলো জাহাজে—বাকিটা তো চর্চা, অভ্যাস ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আয়ত্তে আসে। কিন্তু স্কেট করায় ওস্তাদ বলতে ছিলো মাত্র তিনজন—ডনাগান, ক্রস আর জাক। আর এই তিনজনের মধ্যে আবার সেরা ছিলো জাক।

অনেকদিন পরে বাইরে বেরিয়ে ছেলেদের কী ফুর্তি! বিশেষ ক'রে যারা ভালো স্কেট করতে পারে, তাদের মন তো এই খোলা মাঠভরা বরফ দেখে উৎসাহে লাফিয়ে উঠলো। স্কেট করতে-করতে সেরা তিনজনে হয়তো শেষে অনেক দূরে গিয়ে পড়বে। কিন্তু কুয়াশা যে-রকম নিবিড় হ'য়ে আছে, তাতে দিনের বেলাতেই সব কেমন ঝাপশা ছায়াঢাকা দেখাচ্ছে—এই আবছায়ার মধ্যে বেশি দূরে যাওয়াটা আদৌ নিরাপদ নয়। অন্ধকারে পথ হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে—আর পথ হারিয়ে ঠাণ্ডার মধ্যে কেউ যদি ঘুরে বেড়ায় তাহ'লে তো তক্ষুনি ডবল-নিউমোনিয়া। তার উপরে আবার শীতকালের আমিষখোর জন্তুগুলো বেরোলে তো আর রক্ষা নেই—জানোয়ারের কবলে গিয়ে পড়লে ইষ্টনাম স্মরণ করা ছাড়া আর-কিছুই করার থাকবে না। তাই ব্রিয়ঁা সবাইকে পই-পই ক'রে বারণ ক'রে দিলে, কেউ যেন বেশি দূরে না-যায়। বললে, 'খুব-একটা দূরে যাবার চেষ্টা ক'রো না কিন্তু কেউ। আর সবাই পরস্পরের কাছাকাছি থেকো—অন্তত লক্ষ্যের মধ্যে থেকো। আমি আর গরডন তোমাদের জন্যে এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবো।'

মহোৎসাহে স্কেটিং শুরু করলে সকলে। কেউ-বা দু-পা গিয়েই খেলো আছাড়,

banglabooks.in

কেউ-বা আবার খানিকটা গিয়েই প'ড়ে গেলো পা পিছলে। কিন্তু তাতে এরা মোটেই দমে যাবার পাত্তর নয়। সবাই হাসতে-হাসতে কোলাহল করতে-করতে দূর থেকে দূরে এগিয়ে যেতে লাগলো।

সবচেয়ে সুন্দর চললো জ়াক। সাবলীল তার স্কেট করার ভঙ্গি, লাবণ্যময় ও ব্যক্তিত্বব্যঞ্জক। এতটুকু চেষ্টা বা আয়াসের চিহ্ন নেই তার স্কেট করায়—ভারি সুন্দর দেখায় যখন নানাভাবে সব বাধা অতিক্রম ক'রে যেতে থাকে। কখনও এক পায়ে, কখনও দু-পায়েই, কখনও সোজা হ'য়ে, কখনও-বা ঝুঁকে প'ড়ে, আবার কখনও-বা লাট্টুর মতো পাক খেতে-খেতে সে আশ্চর্য সুন্দরভাবে সকলের আগে-আগে চললো।

ক্রমে অনেক দূরে চ'লে এলো জ়াক, ডনাগান আর ক্রস। দলের অন্য সবাই তখন অনেক পিছিয়ে প'ড়ে।

হঠাৎ ডনাগান পরামর্শ দিলে, 'চলো, আমরা আরো ওদিকে যাই—ওদিকে অনেক বুনোহাঁসের বাসা আছে।'

ক্রস উত্তর দিলো, 'না, বড্ড অন্ধকার! শেষে কি জাগুয়ারের মুখে পড়বো?'

'আসল কথাটা বললেই হয়!' আঁতে ঘা দেবার চেষ্টা করলে ডনাগান: 'এটা সোজাসুজি বললেই হয় যে তোমার আসলে ব্রিয়ঁাকেই ভয়?'

এ-কথার উপর ক্রস বেচারি আর কী করে? ডনাগানের সঙ্গেই এগিয়ে চললো বিনা বাক্যব্যয়ে। দেখতে-দেখতে তারা আরো দূরে গিয়ে পড়লো। ততক্ষণে কুয়াশা আরো ঘন হ'য়ে এসেছে, অন্ধকার ক'রে এসেছে চারদিক। মাথার উপরে হাঁসের ডাক শোনা যায়, কিন্তু কুয়াশার জন্য কিছুই চোখে পড়ে না। এ যেন তাদের এত চেনা নীলোজ্জ্বল রৌদ্রময় চারম্যান আইল্যাণ্ড নয়—এ যেন এক আলাদা কুয়াশার দেশ।

ব্রিয়ঁা আর গরডন দাঁড়িয়ে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলো গুহার সামনে। বেলা তিনটের পর থেকে কুয়াশা ক্রমশ গাঢ় হচ্ছে—শেষে এমন অন্ধকার ক'রে এলো যে পাশাপাশি দাঁড়িয়েও তারা একে-অন্যকে ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছিলো না। সব কী রকম ঝাপশা, বিবর্ণ, আবছায়া হ'য়ে আসছে।

চিন্তিতভাবে ব্রিয়ঁা বললে, 'যা আশঙ্কা করেছিলুম, তা-ই হ'লো। এখন ছেলেরা কী ক'রে পথ চিনে ফিরবে?'

'তোমার শিঙাটা একবার বাজিয়ে ছাখো না', গরডন পরামর্শ দিলে, 'শিঙার শব্দ শুনেই ওরা সবাই ফিরে আসবে।'

banglabooks.in

কোনো কথা না-ব'লে ব্রিয়ঁা পর-পর তিনবার তার শিঙায় ফুঁ দিলো। সেই ঠাণ্ডা, কঠিন কুয়াশাস্তীর্ণ বরফের দেশে শিঙার আওয়াজ শোনালো কোনো প্রেতের চীৎকারের মতো।

দশ মিনিটের মধ্যেই একে-একে সবাই ফিরে এলো—জ়াক সুদ্ধু, শুধু ডনাগান আর ক্রসেরই কোনো দেখা নেই। বার-বার শিঙায় ফুঁ দিয়েও কোনো ফল হ'লো না। এদিকে বেলা গড়িয়ে আসছে, সন্ধ্যা আসন্ন। শীতকালে একে এমনিতেই তাড়াতাড়ি সন্ধে হয়, তার উপর আজ আবার এই কুয়াশা।

শেষকালে গরডন বললে, 'এক কাজ করা যাক। আমাদের মধ্যে একজন এখুনি শিঙা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুক। বাজাতে-বাজাতে গেলেই তারা শুনতে পাবে। এখন হয়তো দূরে গিয়ে পড়েছে ব'লেই শুনতে পাচ্ছে না।'

গরডনের কথা শুনেই বাক্সটার লাফিয়ে উঠলো, 'আমি যাচ্ছি।'

সারভিস বললে, 'উঁহু, আমি যাবো।'

উইলকক্স বললে, 'বরং আমিই যাই।'

গণ্ডগোল দেখে ব্রিয়ঁা বললে, 'কাউকে যেতে হবে না—আমি নিজেই যাবো।'

তখন জ়াক বললে, 'তুমি কেন যাবে? আমি যাচ্ছি। আমার মতো জোরে স্কেটিং ক'রে যেতে পারবে না।'

গরডন ঘাড় নেড়ে সায় দিলে, 'হ্যাঁ, জ়াকই এ-কাজে সবচেয়ে যোগ্য—ও-ই বরং যাক।'

'বেশ', বললে ব্রিয়ঁা, 'কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি যাবি, আর সারাপথ শিঙা বাজাবি। তারপর ওদের বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পেলেই ওদের ডেকে আনবি।'

পরমুহূর্তেই জ়াক সেই নিবিড় কুয়াশার মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

ওদিকে অন্ধকার যেন ওই বরফের মতোই ক্রমশ নিরেট হ'য়ে উঠছে—এত জমাট বেঁধে উঠেছে যে মনে হয় হাত দিলে যেন ছোঁয়া যাবে। জ়াকের শিঙার আওয়াজও এখন আর শোনা যায় না। ইতিমধ্যে প্রায় আধ ঘণ্টা কেটে গেছে। তিনজনের মধ্যে কারুরই কোনো পাত্তা নেই।

উদ্বেগে মাথা নেড়ে ব্রিয়ঁা বললে, 'না, আর অপেক্ষা করা যায় না। গরডন, তুমি বরং এক কাজ করো—শিগগির একটা কামান ছুঁড়ে ফাঁকা আওয়াজ করো—কামানের শব্দ অনেক দূরে গিয়ে পৌঁছবে।'

ফরাশি গুহার দুয়ারের দু-পাশে দুটো পেতলের কামান বসানো ছিলো—

banglabooks.in

ঘুলঘুলির ভিতর দিয়ে তাদের মুখ বাইরে বেরিয়ে এসেছে। তারই একটা কামানে বারুদ ভ'রে তক্ষুনি বাক্সটার কম্পিত হাতে তাতে আগুন দিলে।

সেই কুয়াশা-ঢাকা থমথমে ঠাণ্ডা অন্ধকারে বজ্রের মতো দারুণ শব্দে কামান গর্জন ক'রে উঠলো। আর যেহেতু তাদের উদ্বেগের মধ্যে অমন প্রচণ্ড শব্দে কামান গর্জন করলো, তাই তারা থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো কেন যেন। কম ক'রেও দশ মাইল দূর থেকে শোনা যাবে এই শব্দ। কিন্তু দশ মিনিট কেটে গেলো, তবু কোনো দিক থেকে কোনো সাড়া এলো না। তখন আবার কামান ছোঁড়া হ'লো, কিন্তু তবু কোনো দিক থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। আরো-কিছুক্ষণের মধ্যে পর-পর দু-বার কামান ছুঁড়লো ছেলেরা। আর তার পরেই হঠাৎ অনেক দূর থেকে যেন দু-তিনটে বন্দুকের শব্দ ভেসে এলো।

শুনেই সারভিস দিলো এক তিড়িং লাফ। 'ওই যে গুলির আওয়াজ! যাক—বাঁচা গেলো। যা ভাবনায় ফেলেছিলো এরা!'

তক্ষুনি একটা ফাঁকা আওয়াজ ক'রে বাক্সটার তার উত্তর দিলে। এবারে পূর্ব দিক থেকে আবার বন্দুকের শব্দ ভেসে এলো—শব্দটা এবার বেশ কাছে থেকেই এলো ব'লে মনে হ'লো।

অল্পক্ষণ পরেই দেখা গেলো দুটি ছায়ামূর্তি তীরবেগে তাদের দিকে স্কেটিং ক'রে আসছে। ওকি! ও যে কেবল ডনাগান আর ক্রস! জাক তো সঙ্গে নেই! জাককে নাকি তারা দ্যাখেওনি।

ব্রিয়ঁা দৃঢ় স্বরে বললে, 'আমি চললুম, গরডন। যদি জাককে পাই তবেই ফিরবো—নইলে আর আমাদের দেখা হবে না।'

অনেক কষ্টে শেষটায় ব্রিয়ঁাকে থামালো গরডন আর বাক্সটার।

আরো কয়েকবার তোপ দেগেও কোনো ফল হ'লো না দেখে একরাশ শুকনো পাতা, কাঠকুটো জড়ো ক'রে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করা হ'লো—অন্ধকারে দূর থেকে আগুন চোখে পড়বে সহজেই। কুয়াশাও যেন হঠাৎ এরই মধ্যে একটু পাতলা হ'য়ে এসেছে।

সকলে যখন আগুন জ্বালাবার কাজে ব্যস্ত, তখন গরডন হঠাৎ ব'লে উঠলো, 'ব্রিয়ঁা! দূরে—ওই যে—আবছা ছায়ার মতো কী একটা ন'ড়ে বেড়াচ্ছে!'

ছেলেরা তাকিয়ে দেখলে, দূরে অনেক দূরে, হ্রদের ধার থেকে একটি ছায়া-মূর্তি তীরের মতো গুহার দিকে ছুটে আসছে।

নিশ্চয়ই জাক!

banglabooks.in

সবাই প্রাণপণে চ্যাঁচামেচি ক'রে জ়াককে ডাকতে লাগলো।

উল্কার মতো বরফের উপর দিয়ে স্কেটিং ক'রে আসছে জ়াক, পায়ে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা, সারা গায়ে যেন পাখির লঘুতা।

ব্রিয়ঁা দুরবিন চোখে লাগিয়ে একদৃষ্টে জ়াকের দিকে তাকিয়েছিলো। হঠাৎ সে ভয়ার্ত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো, 'গরডন! ছাখো-ছাখো! জ়াকের পিছনে আরো দুটো লোক ছুটে আসছে! কারা ওরা?'

'কই লোক?' বাক্সটার আর্তনাদ করলো, 'ও যে দুটো ভীষণ জানোয়ার জ়াককে তাড়া ক'রে আসছে।'

ততক্ষণে কিন্তু সবাই বেশ স্পষ্টই দেখতে পেয়েছে: মানুষও নয়, জানোয়ারও নয়—দুটো প্রকাণ্ড ভালুক জ়াককে ধরবার জন্যে তার পিছন-পিছন ছুটে আসছে! সেই হিংস্র ক্ষুধার্ত ভয়ংকর ভালুকের হাতে পড়লে আর রেহাই নেই জ়াকের, নিমেষের মধ্যে তাকে ছিন্নভিন্ন ক'রে ফেলবে।

তখনও গুহা থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে রয়েছে জ়াক।

ডনাগান কোনো কথা না-ব'লে ধনুক-থেকে-ছিটকে-বেরোনো তীরের মতো জ়াকের দিকে ছুটে গেলো: পায়ে তার স্কেটিং-এর জুতো, হাতে বন্দুক। সেই ছুটন্ত অবস্থাতেই ভালুক দুটোকে লক্ষ্য ক'রে পর-পর দুটি গুলি ছুঁড়লে সে। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। গুলি খেয়ে ভালুকদুটির গায়ে যদিও আঁচড়টিও পড়লো না, তবু তারা তক্ষুনি হ্রদের দিকে ছুটে পালালো।

ভালুক দেখে সবাই অবাক হ'য়ে গিয়েছিলো। চারম্যান আইল্যাণ্ড তবে ভল্লুকদের বাসস্থল!

গুহায় ফেরবার সময় জ়াক নিচু গলায় তার দাদাকে বললে, 'আমাকে একটা সুযোগ দেয়ার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।'

নীরবে ব্রিয়ঁা তার হাতটা একটু চেপে ধরলে, তারপর ডনাগানের দিকে ফিরে তাকিয়ে বললে, 'ডনাগান, তোমার অবাধ্যতার জন্যেই আজ এমন কাণ্ডটা হ'লো। নিষেধ সত্ত্বেও কেন তুমি দল ছেড়ে অত দূরে গিয়েছিলে? কিন্তু তা'হলেও আজ তুমি যে-সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি আর মনের জোর দেখিয়েছো, সেজন্যে তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

'আমি কেবল আমার কর্তব্য করেছি,' ঠাণ্ডা গলায় এই কথা ব'লে ডনাগান ব্রিয়ঁার প্রসারিত উৎসুক হাতকে উপেক্ষা ক'রে গম্ভীর মুখে গুহায় গিয়ে ঢুকলো।

banglabooks.in

৫

বিচ্ছেদ

ওই ঘটনার পর প্রায় দেড়মাস কেটে গেছে।

তেমন ঠাণ্ডা আর নেই, শীতকাল অপস্রিয়মান। হ্রদ আর নদীর সমস্ত বরফ গ'লে গিয়েছে। মাটির উপরও বরফের আর-কোনো চিহ্ন নেই।

সেদিন ১০ই অক্টোবর।

চারম্যান আইল্যাণ্ডের চারটি ছেলে হাঁটতে-হাঁটতে একেবারে ফ্যামিলি লেকের দক্ষিণ প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। একটু পরেই দেখা গেলো, একটা গাছের নিচে আগুন জ্বালিয়ে গোল হ'য়ে ব'সে তারা দুটো বালি হাঁস ঝলশাতে শুরু ক'রে দিয়েছে। বোধহয় আসার সময় তারা এই পাখিদুটি শিকার করেছিলো। পরম তৃপ্তির সঙ্গে পোড়া মাংস খেয়ে তিনজনে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো, চতুর্থ ছেলেটি ব'সে ব'সে পাহারা দিতে লাগলো।

ফরাশি গুহা থেকে এত দূরে এসে রাত কাটাচ্ছে কেন এরা? কেন এসেছে? ছেলে চারটিই বা কে-কে?

তারা আর কেউ নয়—ডনাগান, ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স। আলাদাভাবে থাকার জন্যেই তারা ফরাশি গুহা ছেড়ে চ'লে এ ছে।

সম্প্রতি ব্রিয়ঁা আর ডনাগানের মধ্যে কথা-কথায় ঝগড়া বাধতো। ব্রিয়ঁা এখন দলপতি—তার নির্দেশ মেনে চলাটা স্বাধীনচেতা ডনাগানের কাছে ক্রমশই অসহ্য হ'য়ে উঠছিলো। ইদানীং সে যেন ইচ্ছে ক'রেই ব্রিয়ঁাকে পদে পদে অবহেলা ক'রে চলতো। ব্রিয়ঁাও সুযোগ পেলেই ডনাগানকে তিরস্কার করতে ছাড়তো না। শেষকালে এমন অবস্থা হয়ে উঠলো যে আর তাদের পক্ষে একসঙ্গে থাকা একেবারে অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ালো।

একদিন ব্রিয়ঁা গরডনকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে জিগেস করেছিলো, 'ওরা রাতদিন অত কি ফিশফিশ করছে? সব সময়েই তো দেখছি কী যেন ঘোঁট পাকাচ্ছে চারজনে।'

গরডন উত্তর দিয়েছিলো, 'বোধ হয় ওরা চারজনে আলাদা হ'য়ে যাবার মতলব আঁটছে।'

'আলাদা হ'য়ে যাবে? কেন? ফরাশি গুহায় ওরা থাকবে না আর?' ব্রিয়ঁা একেবারে স্তম্ভিত। 'আলাদা হ'য়ে গিয়ে ওরা থাকবে কোথায়?'

banglabooks.in

'তা জানিনে। তবে একদিন দেখলুম উইলকক্স বদোয়াঁর ম্যাপটার একটা নকল ক'রে নিচ্ছে।'

'বদোয়াঁর ম্যাপটা নকল ক'রে নিচ্ছিলো?' বলেছিলো ব্রিয়াঁ, 'তাহলে হয়তো সত্যিই ওরা আলাদা হবার আয়োজন করছে। কিন্তু···আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না, গরডন? ডনাগানকেই তোমরা নেতা ক'রে নাও, আমি না-হয় পদত্যাগ করছি। ওরা যদি আলাদা হ'য়ে যায়, তাহ'লে ছোটোদের মধ্যে তার একটা বিশ্রী প্রতিক্রিয়া হবে। তার চেয়ে আমার পদত্যাগ করাটা বোধ করি অনেক ভালো।'

'না তা হয় না। অবস্থা যে-রকম দাঁড়িয়েছে, তাতে বরং ওদের আলাদা হওয়াই ভালো। বরং একসঙ্গে থেকে কথায়-কথায় ঝগড়া বাধলে ছোটোদের উপর তার প্রতিক্রিয়া আরো খারাপ হবে, সকলের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়বে।'

যা তারা আন্দাজ করেছিলো, তা-ই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সত্য হ'লো। শীত চ'লে যেতেই, ৯ই অক্টোবর সন্ধেবেলায় খেতে ব'সে খাবার-টেবিলেই ডনাগান কথাটা উত্থাপন করেছিলো: 'ব্রিয়াঁ, কাল থেকে আমি, ক্রস, ওয়েব, আর উইলকক্স—এই চারজনে আলাদা থাকবো।'

ব্রিয়াঁ জানতো একদিন না একদিন কথাটা ডনাগান পাড়বেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ-কথা শুনে সে যেন কিরকম অসহায় বোধ করছিলো। একটু চুপ ক'রে থেকে শেষে বলেছিলো, তোমরা কি আমাদের ত্যাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছো, ডনাগান?'

'না ব্রিয়াঁ, ত্যাগ করছিনে। তবে আমরা চারজনে আর এখানে থাকবো না, দ্বীপের অন্য কোনোখানে গিয়ে আশ্রয় নেবো।'

'কেন? কীসের জন্যে তোমরা এই ব্যবস্থা করেছো?'

'তোমার কি এখনও কোনো খটকা আছে, ব্রিয়াঁ? কারণ তো তুমি ভালো ক'রেই জানো। আমরা আমাদের খুশিমতো থাকতে চাই। কারু হুকুম মেনে চলা আমার সহ্য হয় না।

'আমি কি তোমাদের হুকুম করি? সত্যি, আমার ব্যবহারে তেমন কোনো দোষ দেখেছো ডনাগান?'

'দোষ হয়তো আমাদের দু-তরফেরই, কিন্তু তোমার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো অভিযোগ হ'লো এই যে তুমি দ্বীপের দলপতি।'

ব্রিয়াঁ খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলেছিলো, 'বেশ, তোমরা যদি আলাদা হ'য়ে যেতে চাও, তো আমার কোনো আপত্তি নেই।'

'কিন্তু আমাদের ভাগের সমস্ত জিনিশ চাই। উইলকক্স সব জিনিশের একটা

banglabooks.in

তালিকা করেছে—তা থেকে ভাগ ক'রে আমাদের অংশগুলো আমরা নিয়ে নেবো।'

'তা নেবে বই কি, নিশ্চয়ই নেবে। কিন্তু তোমরা যাচ্ছো কবে?'

'কালই', উত্তর দিয়েছিলো ডনাগান, 'একবার যখন মতিস্থির ক'রে ফেলেছি, তখন আর দেরি করা ঠিক হবে না।'

ব্রিয়ঁা যখন ফ্যামিলি লেকের ওপারে গিয়ে সমস্ত দেখেশুনে ফিরে এসেছিলো, তখন সে ঈস্ট-রিভারের মোহানার কাছের সমুদ্রতীরের সেই সুন্দর গহ্বরগুলির গল্পও করেছিলো। এ-কথাও সে তখন বলেছিলো, ভবিষ্যতে কখনও কোনো দরকার হ'লে ফরাশি গুহার বাস তুলে দিয়ে সেই গহ্বরগুলোর মধ্যেই আস্তানা পাততে পারবে তারা। ঈস্ট-রিভারের জল খুব মিষ্টি, নদীর দু-তীরে গভীর বন, বনের মধ্যে অসংখ্য পাখি আর জীবজন্তু। এই সমস্ত শুনে ডনাগান তখনই মনে-মনে ঠিক করেছিলো, সুবিধে হ'লেই তারা হ্রদের ওদিকে গিয়ে বাসা করবে।

সেইজন্যেই এখন সেই গহ্বরের এই বনের মধ্যে তাদের দেখা গেলো—তিন-জনে ঘুমোচ্ছে, আর ডনাগান আগুনের ধারে ব'সে অন্ধকারের দিকে চেয়ে আছে গালে হাত দিয়ে, পাহারা দিতে-দিতে আকাশ পাতাল কত কী ভাবছে যেন সে। একটু পরেই উইলকক্সকে তুলে দিয়ে পাহারা দিতে ব'লে সে নিজেও চিৎপাত হ'য়ে পড়বে। এমনি পালা ক'রে এক-একজনে পাহারা দেবে সারা রাত।

ভোরবেলায় ঘুম ভাঙতেই চারজনে যাত্রার উদ্যোগ করতে লাগলো—তাদের রাত্রিবাসের চিহ্ন হিসেবে গাছতলায় প'ড়ে রইলো কেবল কিছু পোড়া কাঠ, ছাই আর মাংসের হাড়গোড়।

তখনও ভালো ক'রে সূর্য ওঠেনি, আগুনের কুণ্ডের মধ্য থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে তখনও। ডনাগান বন্ধুদের বললে, 'চারম্যান আইল্যাণ্ডের এই পুব এলাকাতেই আমাদের থাকা উচিত। আমার মনে হয় আমেরিকা এখান থেকে বেশি দূরে নয়। ম্যাগেলান প্রণালীর মধ্য দিয়ে যে-সব জাহাজ পেরু আর চিলির বন্দরে চলাফেরা করে, তারা এই পুব দিক দিয়েই যাবে। একদিন না একদিন কোনো জাহাজ আমাদের চোখে পড়বেই। সেইজন্যে আমরা এই ডিসেপশন বে ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো না।'

ডনাগান ভাবতে লাগলো, তাদের জাহাজটা যদি এখানে এসে উঠতো, তাহ'লেই সবদিক দিয়ে ভালো হ'তো। সমুদ্রতীরে পাহাড়ের গায়ে রয়েছে অসংখ্য গহ্বর। সেই পাহাড়গুলির পর থেকেই শুরু হয়েছে ঘন নিবিড় অরণ্যের বিস্তার।

চারদিক দেখে-শুনে ডনাগান শেষটায় নদীর ধারের একটা গুহাই থাকার জন্যে

banglabooks.in

পছন্দ করলে। গুহার দেয়াল শক্ত গ্র্যানাইট পাথরের, মেঝের উপর হলদে রঙের মিহি বালি। এই গুহাটি হবে তাদের 'লিভিং রুম', আশপাশের অন্যান্য গহ্বরও তারা নানা কাজে ব্যবহার করবে। পাহাড়টার আকৃতি দেখে তারা তার নাম রাখলে 'রিয়ার-ব্লক হারবার'।

পরের দিন তারা সমুদ্রতীর ধ'রে এগিয়ে গিয়ে উত্তর দিকটা ঘুরে দেখবে ব'লে ঠিক করলে। খুব ভোরবেলাতেই রওনা হ'য়ে পড়লো চারজনে। প্রথম মাইল-তিনেক পথ কেবল পাথর-ছাওয়া। সেই এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে রাস্তা দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পাহাড়ের সারি পেরুতেই বেলা দুপুর হ'য়ে গেলো। এবার পথে পড়লো ছোট্ট একটি খালের মতো নদী—তারা তার নাম রাখলো 'নর্থ-ক্রীক'।

বেলা তিনটের সময় তারা খুব ক্লান্ত হ'য়ে এক জায়গায় ব'সে জিরোবার আয়োজন করছে, হঠাৎ কী দেখে ক্রুস চীৎকার ক'রে উঠলো, 'ডনাগান, ছাখো-ছাখো, ওটা কী ন'ড়ে বেড়াচ্ছে?'

সকলে তাকিয়ে ছাখে, কাছেই, বনের মধ্যে একটা অদ্ভুত চেহারার জন্তু গাছতলায় ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। তক্ষুনি বন্দুক হাতে তারা সেদিকে ছুটে গেলো। কিন্তু গুলি ছুঁড়তে গিয়ে যখন ভালো ক'রে তারা জন্তুটিকে লক্ষ্য করলে, তখন ভয়ে কাঠ হ'য়ে গেলো একেবারে। একটা প্রকাণ্ড গণ্ডার নদীতীরের ঝোপঝাড়ের মধ্যে ঘোরাঘুরি করছে।

একটুক্ষণ গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে তারা ঠিক ক'রে নিলো কী করা উচিত। তারপর সাহস সঞ্চয় ক'রে চারজনেই একসঙ্গে তাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি করলো। জন্তুটার গায়ে চার-চারটে গুলি লাগা সত্ত্বেও সে হুড়মুড় ক'রে গভীর অরণ্যের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লো। জন্তুটা যখন ছুটে পালাচ্ছে তখন ডনাগান তাকে চিনতে পারলে। আসলে সেটা গণ্ডার নয়, একটা প্রকাণ্ড ট্যাপির। দক্ষিণ আমেরিকার নদীতীরেই এইসব জন্তুকে মাঝে-মাঝে দেখা যায়।

তাদের অনুসন্ধান চললো পরদিনেও। সেদিনও সূর্যোদয়ের আগেই তারা আবার সমুদ্রতীর ধ'রে এগুতে লাগলো। আকাশটা আবার হঠাৎ মেঘলা হ'য়ে গেছে। বেলা আটটা বেজে গেলো, তবু সূর্যের দেখা নেই। সমুদ্রের দিক থেকে জোরালো ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে।

হঠাৎ দেখতে-দেখতে সারা আকাশ মেঘে কালো হ'য়ে গেলো, সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'লো প্রচণ্ড ঝড়। গত্যন্তর না দেখে তারা ফিরে যাবার উদ্যোগ করলে। কিন্তু সেই দারুণ জোরের মধ্যে কত জোরেই বা তারা যেতে পারে? তবু হাওয়ার সঙ্গে

banglabooks.in

যুদ্ধ ক'রে-ক'রে তারা আস্তানার উদ্দেশ্যে এগুতে লাগলো। বেলা গড়িয়ে এলো ঝড়ের মধ্যে। বিকেল পাঁচটা নাগাদ আবার ঝড়ের সঙ্গে বজ্র-বিদ্যুতের হানাহানিও শুরু হ'য়ে গেলো। ওদিকে চোখে আর কিছুই দেখা যায় না। কালো অন্ধকারের গায়ে যেন কালো সমুদ্র একেবারে লেপ্টে দিয়েছে—কেবল কোনো অতিকায় আহত জন্তুর মতো আক্রোশে ফুঁশছে সমুদ্রের জল, আর সেই শব্দ থেকেই তারা বুঝতে পারলে সমুদ্র কোথায়। কোনোমতে সেই উপলবন্ধুর বেলাভূমির উপর দিয়ে তারা এগুতে লাগলো।

হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাতেই সমুদ্রতীরে কী-একটা প্রকাণ্ড কালো জিনিশ দেখে উইলকক্স আর্তস্বরে চীৎকার ক'রে উঠলো। কী যেন একটা বিরাট সামুদ্রিক প্রাণী সমুদ্রজল থেকে উঠে আসছে সেই ঝড়ের মধ্যে—যেন তাদের দিকেই এগিয়ে আসছে সেই বিভীষিকা।

দৃশ্যটা দেখে ভয়ে বিবর্ণ হ'য়ে পাথরের মূর্তির মতো তারা দাঁড়িয়ে রইলো। আর রক্ষে নেই, এইবারে জন্তুটা তাদের আক্রমণ করবে। বিদ্যুতের আলোয় পলকের মধ্যে সেই বিভীষিকাকে তারা দেখে নিয়েছে…

পরক্ষণেই আবার আকাশ ফেঁড়ে বাঁকা বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে গেলো। কই, জন্তুটা তো ঠিক একই জায়গায় প'ড়ে আছে—একটুও নড়েনি! কী ওটা তাহ'লে? সত্যি কোনো অতিকায় সামুদ্রিক জন্তু, না অন্য কিছু? এক পলক দেখেছে, কিন্তু তাতেই ডনাগানের মনে হয়েছে সেটা যেন একটা বড়ো নৌকো।

রাত তখন প্রায় নটা। বাজ ভীষণ গরজাচ্ছে মাথার উপর, আশেপাশে গাছপালাগুলো যেন মাটির বাঁধন ছিঁড়ে পালাবার জন্যে হন্যের মতো ছটফট করছে।

ভয়ে-ভয়ে সংশয়ব্যাকুল মনে তারা কালো জিনিশটার দিকে একটু এগিয়ে গেলো।

সত্যিই তো! একটা নৌকোই তো বটে!

কিন্তু কোনো জনহীন দ্বীপে সমুদ্রতীরে এমন জায়গায় নৌকো এলে কোথেকে? যে-রকম ঝড় উঠেছে, তাতে নিশ্চয়ই ধারে-কাছে কোনো জাহাজডুবি হয়েছে—না-হ'লে হঠাৎ এখানে এমন সময় নৌকো আসবে কোথা থেকে?

ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতেই তারা নৌকোটির দিকে এগুলো।

কাছে যখন এসেছে, তখন হঠাৎ ভীষণ শব্দ ক'রে বাজ ফাটলো কোথাও, সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ ঝিলিক, আবার বাজের আওয়াজ।

banglabooks.in

সেই বাঁকাচোরা আলোর ঝিলিকের মধ্যে যে-নতুন দৃশ্য তারা দেখতে পেলে, তাতে চারজনেই একসঙ্গে আর্ত চীৎকার ক'রে উঠলো।

সে কী বীভৎস, ভয়াবহ দৃশ্য!

বিদ্যুতের আলোয় তারা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, নৌকোর পাশে দুটি চিৎপাত মনুষ্যদেহ প'ড়ে আছে—তাদের কারু দেহেই প্রাণ নেই।

৬

আক্রমণ

একে অমন ঝড়, তায় ক্লান্ত অবসন্ন ও ভীতচকিত হ'য়ে আছে সবাই, উপরন্তু এমন অপ্রত্যাশিত ভয়াবহ দৃশ্য! নিজেদের অজান্তেই তারা চীৎকার ক'রে সবেগে পিছন ফিরে ছুট দিলে।

আর পিছন ফিরতেই আকাশ যেন বজ্র হ'য়ে মাথার উপর ভেঙে পড়লো। আর্ত ছেলেরা হাত-ধরাধরি ক'রে ঝড়ের মধ্যে সবেগে ছুটতে লাগলো। সারা রাত যে কেমন ক'রে কাটলো, সেদিকে কোনো হুঁশ রইলো না তাদের। কেমন একটা থমথমে ঘোরের মধ্যে কলের মতো তারা যেন ছুটে যাচ্ছে।

ততক্ষণে আস্তে আস্তে ঝড় থেমে আসছে, মেঘ কেটে যাচ্ছে, দেখা দিচ্ছে ভোরবেলাকার ময়লা মেঘ-ঢাকা আলো। এবার তাদের আস্তানার দিকে ফেরা উচিত। কিন্তু দিনের আলোয় একটু সাহস ফিরে পেয়েছে তারা—সেই চমকটাও আর নেই। তাই তারা ঠিক করলে যাবার আগে সেই মৃত লোকদুটির সদ্‌গতির একটা ব্যবস্থা ক'রে যাবে।

হাওয়ার ঝাপটা তখনও খানিকটা আছে। বহুকষ্টে সেই ভীষণ হাওয়ার মধ্যেই তারা একটু-একটু ক'রে এগিয়ে সেই নৌকোর কাছে এসে দাঁড়ালে।

আশ্চর্য! নৌকোটা ঠিক তেমনি প'ড়ে আছে, কিন্তু সেই মৃতদেহদুটি গেলো কোথায়? আশপাশে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও তারা মৃতদেহদুটির কোনো সন্ধান পেলে না।

'তবে কি লোকদুটি বেঁচে ছিলো, আমরা ভুল ভেবেছিলুম!' জিগেস করলে উইলকক্স, 'তবে কি তারা কেবল জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে ছিলো, এখন জ্ঞান ফিরতেই উঠে চ'লে গেছে?'

banglabooks.in

'কিন্তু আমরা চারজনেই একসঙ্গে ভুল করবো, এটা কি সম্ভব?' ডনাগান বললে, 'নিশ্চয়ই তারা ওই সমুদ্রের ঢেউয়ে ভেসে গিয়েছে—আদৌ বেঁচে ছিলো না।' এই ব'লে সে পকেট থেকে দুরবিন বার ক'রে সমুদ্রের চারদিকে তাকিয়ে দেখলে। কিন্তু না, মৃতদেহদুটিকে কোথাও ভাসতে দেখা গেলো না।

এদিক-ওদিক গিয়ে আরো খানিকটা খুঁজে দেখলো তারা, কিন্তু কোথাও জীবিত বা মৃত কোনো লোকের কোনো সন্ধান মিললো না।

ডনাগান মুখে বলেছে বটে তাদের ভুল হয়নি, কিন্তু তার মনেও সংশয় ছিলো। বিষণ্ণ, সন্দেহ-জাগা মনে তারা আবার নৌকোর কাছে ফিরে এলো। নৌকোর মধ্যেও কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা নৌকোটা, অত্যন্ত মজবুত; কোনো জাহাজের নৌকো ছিলো সম্ভবত। কিন্তু মজবুত হ'লে কী হবে, এখন আর সেটা আদৌ ব্যবহার-যোগ্য নেই, ডুবোপাথরের গায়ে ধাক্কা লেগে নৌকোর একটা দিক একেবারে ভেঙে গিয়েছে। নৌকোর ভিতরে আছে কিছু ছেঁড়া পাল, আর কয়েক-গাছা মোটা দড়ি। নৌকোর একপাশে একটা পেতলের ফলকের উপর ইংরেজিতে লেখা:

'সেভার্ন—সানফ্রান্সিস্কো।'

সানফ্রান্সিস্কো! ক্যালিফোর্নিয়ার সেই বিখ্যাত বন্দর সানফ্রান্সিস্কো! তাহ'লে এই নৌকোটা যে-জাহাজের ছিলো, সেটা মারকিন জাহাজ!

কিন্তু সেই নিঃসীম সমুদ্রে নীল জল আর ফেনা ছাড়া আর-কিছু দেখা গেলো না। দিগন্ত অবধি কেবল ঢেউ, ফেনা আর নীল জল। কোনো জাহাজের পাল দেখা গেলো না কোথাও।

ডনাগান তার দলবল নিয়ে ফরাশি গুহা ছেড়ে যাবার পর থেকে ব্রিয়ঁার মন ভারি খারাপ হ'য়ে আছে। গরডন অবিশ্যি সব সময়েই তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করছে: 'অত মনখারাপ করছো কেন, ব্রিয়ঁা? তোমার দোষ কী? তাছাড়া—আমি বলছি—ওরা শিগ্‌গিরই ফিরে আসবে। বর্ষা একবার নামুক না, তখনই বাছাধনেরা মুখ কালো ক'রে আবার এসে এই ফরাশি গুহাতেই উঠবে।'

কিন্তু সান্ত্বনায় তার উদ্বেগ মোটেই কমে না। তাছাড়া দ্বীপ থেকে উদ্ধারের ভাবনাতেও সে অস্থির হ'য়ে আছে। দলে ভাঙন ধরেছে, ছেলেদেরও এবার বেশ ক্লান্ত ও অবসন্ন লাগছে—নতুন-নতুন বেশ মজা লেগেছিলো, কিন্তু এখন আর সে

banglabooks.in

মজা নেই। আর-কিছুদিন দ্বীপে থাকলেই ছেলেদের মনের উপর একটা বিষম প্রতিক্রিয়া হবে। 'রবিনসন ক্রুসো'রও দ্বীপে শেষটায় খারাপ লাগতো। আর ইয়োহান হ্বিস্ যাই লিখুন না কেন, 'স্যুইজারল্যাণ্ডের রবিনসন-পরিবারের'ও শেষ দিকটায় দ্বীপে থাকতে সত্যি কি খুব মজা লাগতো ?

ব্রিয়ঁা ভাবলে, শূন্যে যেখানে তারা বেলুন উড়িয়ে রেখেছে, সেখানে একটি অতিকায় ঘুড়ি উড়িয়ে রাখতে পারলে কেমন হয়। সমুদ্রের ধারে সব সময়েই জোরালো হাওয়া থাকবে, দড়িরও কোনো অভাব নেই, তেমন উঁচুতে ওড়াতে পারলে আরো অনেক মাইল দূর থেকেই তা দেখা যাবে।

বনের বেত আর ক্যানভাস কাপড় দিয়ে দেখতে-দেখতে এক মস্ত ঘুড়ি বানানো হ'লো। ঠিক হ'লো পরদিন বিকেলে ঘুড়ি ওড়ানো হবে। কিন্তু পরদিন সকাল থেকেই আকাশের অবস্থা বেশ ঘোরালো হ'য়ে উঠলো। যে-ঝড় ডনাগান-দের মাথার উপর দিয়ে ব'য়ে গিয়েছিলো, এটা সেই ঝড়। কাজেই সেদিন আর ফরাশি গুহা থেকে ঘুড়িটাকে বার করাই গেলো না। তার পরদিনও বেশ ঝড়বৃষ্টি চললো। শেষে শুক্রবারে ঝড় থামলো। ব্রিয়ঁা ঠিক করলো, সেদিন দুপুরবেলাতেই সে ঘুড়ি ওড়াবে। রোদ উঠেছে দুদিন পরে, হাওয়াতেও বেশ টান আছে, ওই অতিকায় ঘুড়ি সহজেই উড়বে। তারপর সন্ধেবেলায় ঘুড়ি নামিয়ে তার ল্যাজে একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দেবে। তাহ'লে রাতের বেলাতেও অনেক দূর থেকে সেই আলো দেখা যাবে।

বেলা একটার সময়ে বাক্সটার আর গরডন ধরাধরি ক'রে সেই অতিকায় ঘুড়িটাকে তুলে ধরলে। জাহাজের একটা হুইলের সঙ্গে ঘুড়ির সুতো জড়িয়ে হুইলটাকে মাটিতে এঁটে দেয়া হয়েছিলো। ব্রিয়ঁা সেই হুইলের পাশে সুতো হাতে দাঁড়ালো। তার সংকেত পেলে বাক্সটার আর গরডন ঘুড়ি ছেড়ে দেবে। দু-পাশে বাকি ছেলেরা সবাই রুদ্ধ কৌতূহলে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ব্রিয়ঁার আর সংকেত করা হ'লো না।

ফ্যানও তাদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে তাদের কাণ্ড দেখছিলো—হঠাৎ সে পিছন ফিরে ভীষণ চীৎকার করতে-করতে তীরের মতো পাশের জঙ্গলের দিকে ছুটে গেলো।

তখনই বন্দুক নিয়ে ব্রিয়ঁা আর গরডনরা কম্পিত পায়ে বনের দিকে অগ্রসর হ'লো। গিয়ে দ্যাখে, প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটা গাছের গুঁড়ির উপর ফ্যান সুমুখের দু-পা তুলে দাঁড়িয়ে ঘন-ঘন ল্যাজ নাড়ছে, আর গাছের তলায় প'ড়ে আছেন এক ভদ্রমহিলা—পোশাক দেখে তাঁকে ইংরেজ ব'লেই মনে হয়।

banglabooks.in

আজ এতদিন পরে এই দ্বীপে প্রথম জীবিত মানুষ দেখে ছেলেদের মনের অবস্থা কেমন হ'লো, তা সহজেই অনুমান করা যায়। গরডন আর ব্রিয়ঁা হাঁটু মুড়ে ব'সে মহিলাটির হাতের নাড়ি পরীক্ষা ক'রে দেখলে—প্রথমটা জীবনের কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না। শেষটায় তাঁর নাকের কাছে একটা কাঁচ ধ'রে রেখে গরডন হঠাৎ সোল্লাসে ব'লে উঠলো, 'এই ছাখো, একটু-একটু নিশ্বাস পড়ছে!'

ধরাধরি ক'রে তারা মহিলাটিকে গুহার মধ্যে নিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে তাদের সম্মিলিত শুশ্রূষা ও চেষ্টায় ভদ্রমহিলার জ্ঞান ফিরে এলো। কিছু খেয়ে নেবার পর তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ বোধ করতে লাগলেন—কিন্তু তবু তাঁকে কোনো-রকম বিরক্ত না ক'রে তারা একটু বিশ্রাম ক'রে নিতে দিলো। কৌতূহলে ফেটে পড়লেও কোনো প্রশ্ন করলে না তারা।

সন্ধ্যার পর সবাই যখন খেতে বসলো, তখন খেতে-খেতে ভদ্রমহিলা তাঁর নিজের কাহিনী বলতে শুরু করলেন।

ভদ্রমহিলা আসলে মারকিন। তাঁর আসল নাম ক্যাথারিন রেডি, সবাই তাঁকে 'কেট' ব'লে ডাকে।

সানফ্রান্সিস্‌কো থেকে জাহাজে ক'রে চিলি যাচ্ছিলেন কেট, তাঁদের জাহাজটির নাম ছিলো 'সেভার্ন'। সমুদ্রযাত্রার প্রথম ভাগটা বেশ ভালোভাবেই শুরু হয়ে-ছিলো, কিন্তু মধ্য-সমুদ্রে ঘটলো এক ভয়ানক অঘটন।

ওই জাহাজের নাবিকদের মধ্যে ওয়ালস্টোন নামে একটা লোক ছিলো, আর ছিলো তার সাতটি সঙ্গী: ব্যান্‌ড্‌, রক, হেনলি, কুক, ফর্‌ব্‌স, কোপ আর পাইক। লোকগুলো যেন প্রত্যেকেই শয়তানের বিভিন্ন মূর্তি। চেহারাও একেকজনের দানবের মতো—স্বভাব ততোধিক ভীষণ। এই আটজনে হঠাৎ একদিন জাহাজের কাপ্তেনকে খুন ক'রে জাহাজটা দখল ক'রে বসলো। তারপর একে-একে যাত্রীদেরও তারা হত্যা করলে, জাহাজের ডেকে রক্তগঙ্গা ব'য়ে গেলো। শুধু দু'জনকে তারা রেহাই দিলে। এক, কেট—স্বয়ং ফর্‌ব্‌স সর্দারকে ব'লে-ক'য়ে তাঁকে বাঁচায়; আর অন্যজন হচ্ছে ইভান্‌স্‌, জাহাজের ফার্স্ট মেট—সে না থাকলে জাহাজ চালাবে কে, এই ভেবে তাকে হত্যা করা হয়নি। তবে তাকে তারা মোটেই সুনজরে রাখলে না। বেশ বোঝা গেলো, প্রয়োজন ফুরোলেই তারা ইভান্‌স্‌কে এবং হয়তো কেটকেও হত্যা করবে।

ওয়ালস্টোনের মতলব ছিলো জাহাজটিকে সোজা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে নিয়ে যাবে। সেখানে গিয়ে মধ্যযুগের বোম্বেটেদের মতো তারা ক্রীতদাসের ব্যবসা

banglabooks.in

চালাবে। ইভান্‌স্‌কে দিয়ে তারা জোরজবরদস্তি ক'রে সেইভাবেই জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করলে।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাদের সব মতলবই ফেঁশে গেলো। কয়েকদিন পরে কী ক'রে যেন হঠাৎ ভীষণ আগুন লেগে গেলো জাহাজে। অনেক চেষ্টা ক'রেও যখন কিছুতেই সে আগুন নেভানো গেলো না, তখন সবাই জাহাজের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে একটা বড়ো নৌকোয় চ'ড়ে সমুদ্রে নেমে পড়লো—সঙ্গে নিলে গোটাকয়েক বন্দুক, কিছু খাবার-দাবার ও অন্যান্য সরঞ্জাম। হেনলি নামতে গিয়ে জলে প'ড়ে যায়। তাকে আর উদ্ধার করা যায়নি, সঙ্গে সঙ্গে একদল হাঙর এসে তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ফ্যালে।

দু-দিন দু-রাত্রি ধ'রে নৌকো ভেসে চলে—কিন্তু তবু কোনোদিকেই ডাঙার কোনো চিহ্নই দেখা যায়নি। তারপর হঠাৎ সেই ভীষণ ঝড় উঠলো—সেই ঝড়ের মুখে প'ড়ে দিশেহারা নৌকোটা সোজা চারম্যান আইল্যাণ্ডে এসে ওঠে। তীরে ওঠবার আগেই একটা ডুবো পাথরের গায়ে ভীষণ ধাক্কা লেগে নৌকোর একটা দিক একেবারে চুরমার হ'য়ে যায়।

ওয়ালস্টোন আর তার স্যাঙাতরা একটানা ঝড়-বাদলের সঙ্গে লড়াই ক'রে মৃতপ্রায় হ'য়ে পড়েছিলো—আর তাদের যুঝবার কোনো সামর্থ্য ছিলো না।

তীরের কাছাকাছি এসেই নৌকো এক প্রচণ্ড ঢেউয়ের তোড়ে একেবারে উলটে যায়। ফলে পাঁচজন আরোহী সমুদ্রের জলে ভেসে যায়, আর বাকি দু'জন বালির উপর গিয়ে ছিটকে পড়ে। আর কেট নৌকোর বিপরীত দিকে ছিটকে প'ড়ে যান।

অনেকক্ষণ হতচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন কেট। জ্ঞান হবার পর তিনি ওঠবার চেষ্টা করতে গিয়ে ছাখেন, ক্লান্তিতে তাঁর সারা শরীর একেবারে অসাড় হয়ে গেছে। ওই অবস্থায় এক সময়ে তিনি শুনতে পান ওয়ালস্টোনের গলা, তার সঙ্গে ব্র্যান্‌ড্‌ আর রকও ছিলো। কেট বুঝতে পারলেন যে তারা মোটেই ভেসে যায়নি, ডাঙায় উঠেছে, আর এখন সঙ্গীদের খুঁজতে বেরিয়েছে।

ওয়ালস্টোনেরা কেটতে দেখতে পায়নি। তাদের কথাবার্তা থেকে কেট বুঝতে পারলেন, ইভান্‌স্‌ বেচারি ছাড়া পায়নি, কোপ আর কুকের পাহারায় তাকে বেঁধে রাখা হয়েছে। বন্দুক আর টোটাগুলিও বোম্বেটেরা জলে ভেসে যেতে দেয়নি। তারপর ফর্‌ব্‌স্‌ আর পাইককে তুলে নিয়ে নৌকোটা ভালো ক'রে পরীক্ষা ক'রে বোম্বেটেরা কোথায় যেন চ'লে গেলো। তারা চ'লে গেলেই কেট সেই অবসন্ন দেহেই পাগলের মতো ছুটতে থাকেন।

banglabooks.in

তারপর যে কী হয়েছিলো, তা তিনিই কিছুই জানেন না।

কেটের এই রোমাঞ্চকর উপাখ্যান শুনে ছেলেরা যেমন অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী পড়ার আমোদ পেলে, তেমনি আবার বেশ ভয়ও পেয়ে গেলো। এতদিন চারম্যান আইল্যাণ্ডে তারা বেশ নিরাপদে ছিলো, আজ সেই দ্বীপে এমন সাতজন নিষ্ঠুর বোম্বেটে পা দিয়েছে যারা যে-কোনো রকম বিবেকহীন কুকর্ম থেকে বিরত হবে না —যদি বোঝে কিছু লাভ হবে, তাহ'লে যা খুশি তাই তারা ক'রে বসতে পারে। ফরাশি গুহার সন্ধান একবারটি পেলে তারা কি আর ছেলেদের ছেড়ে দেবে? কক্‌খনো না। গুহার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, খাবারদাবার তারাই দখল ক'রে নেবে—কেড়ে নিতে গিয়ে রক্তপাত করতেও তাদের বুকে একটুও বাধবে না।

এদিকে আরেকটা ভয়ানক বিপদ আসন্ন। ছেলেরা না হয় সাবধানে গুহার মধ্যে লুকিয়ে রইলো, কিন্তু ডনাগানেরা? তারা তো এই বোম্বেটেদের কথা কিছুই জানে না! তারা হয়তো নিশ্চিন্তমনে চারদিকে ঘুরে বেড়াবে, হয়তো তাদের বন্দুকের আওয়াজ শুনে বোম্বেটেরা তাদের হদিশ জানতে পেরে তাদের খুঁজে বার করবে। তারপর···

না না, ডনাগানদের ফিরিয়ে আনা চাই-ই চাই। এখন সকলের দলবদ্ধ হ'য়ে থাকা দরকার। নিজেদের মধ্যকার যাবতীয় ঈর্ষা, বিরোধ, দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে একজোট হ'য়ে দস্যুদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করা উচিত।

ব্রিয়ঁ। বললে, 'মোকোকে নিয়ে আমি না-হয় এক্ষুনি বেরিয়ে পড়ি। রাতের অন্ধকারে বেশ গা-ঢাকা দিয়ে যাওয়া যাবে।'

গরডন অবাক হ'য়ে বললে, 'এই আঁধার রাতেই বেরুবে? কাল সকাল অবধি অপেক্ষা করলে হ'তো না?'

'না গরডন, অপেক্ষা করার সময় আর নেই। প্রতিটি মুহূর্ত এখন মূল্যবান। এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই আমাদের।'

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে তর-তর ক'রে জল কেটে চলেছে একটি নৌকো—নৌকোয় ব'সে আছে দুটি মাত্র কিশোর, ব্রিয়ঁ। আর মোকো। ব্রিয়ঁ। চারপাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। হঠাৎ কী দেখে সে আস্তে মোকোর হাতে একটু চাপ দিলে।

অস্ফুট স্বরে মোকো বললে, 'কী?'

ব্রিয়ঁ। ফিশ-ফিশ ক'রে বললে, 'ওই দ্যাখো!'

banglabooks.in

দেখা গেলো, ঈস্ট-রিভারের তীর থেকে কয়েকশো গজ দূরে বনের মধ্যে এক জায়গায় গনগনে আগুন জ্বলছে।

কারা ওখানে আগুন জ্বালিয়ে ব'সে আছে? বোম্বেটেরা? না ডনাগানের দল?

তীরে নৌকো ভিড়িয়ে কোমরবন্ধে রিভলভার এঁটে ব্রিয়ঁ হাতে একটি কুঠার নিয়ে ডাঙায় নামলো।

চারদিকে ঝোপঝাড়, আগাছা। হাতে উদ্যত কুঠার থাকলে কী হবে, ভয়ে আশঙ্কায় তার বুক বেশ দুরুদুরু করছে। খানিকটা গিয়ে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। প্রায় কুড়ি হাত দূরে একটা মস্ত কালো ছায়া অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ধাবমান। পরমুহূর্তেই শোনা গেলো এক গভীর ক্ষুধিত হিংস্র গর্জন, আর সঙ্গে সঙ্গে কি একটা মস্ত কালো জিনিশ লাফিয়ে পড়লো। সেই কালো মূর্তিটি আর কিছু নয়, একটা প্রকাণ্ড জাগুয়ার।

আর ঠিক তখনই শোনা গেলো কার করুণ আর্তনাদ।

চীৎকার শুনেই ব্রিয়ঁ চমকে উঠলো: 'এ যে ডনাগানের গলা!'

মুহূর্তেকও দেরি না ক'রে ব্রিয়ঁ কুঠার হাতে সামনের দিকে ছুটে গেলো। ডনাগান তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিলো, হঠাৎ জাগুয়ারের আক্রমণে সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে চ্যাঁচাচ্ছে, কিছুতেই বন্দুকটাকে আর হাতের নাগালে পাচ্ছে না।

চক্ষের পলকে ব্রিয়ঁর কুঠার ভীষণ বেগে জাগুয়ারের মাথার উপর নেমে এলো। অব্যর্থ লক্ষ্য। তক্ষুনি জাগুয়ারটি মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কম্বলে জড়ানো ছিলো ব'লে ডনাগান খুব জোর বেঁচে গেলো—শুধু তার ডান কাঁধে সামান্য আঁচড় লেগেছে—তাছাড়া আর কিছুই তার হয়নি।

ততক্ষণে ডনাগানের অন্য বন্ধুরাও সেখানে এসে পড়েছে। প্রত্যক্ষ মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পেয়ে ডনাগান ব্রিয়ঁকে যে কী বলবে, তা ভেবে পাচ্ছিলো না। কিন্তু ব্রিয়ঁ তাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোনো সুযোগই দিলে না, তাড়াতাড়ি তাদের টেনে এনে নৌকোয় বসালে। তৎক্ষণাৎ মোকো নৌকো ছেড়ে দিলো। নৌকোয় ব'সে ব্রিয়ঁ ধীরে-ধীরে ডনাগানদের সব কথা খুলে বললে। কেট, সেভার্ন জাহাজ, ওয়ালস্টোন, দ্বীপে জলদস্যুদের আবির্ভাব—কোনো তথ্যই সে বাদ দিলে না।

এই ঘটনার পর থেকে কেবল ডনাগান নয়, ক্রুস, ওয়েব আর উইলকক্স—সকলের মধ্যেই এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেলো, এখন আর দলের মধ্যে কোনো ঝগড়া-বিবাদ নেই—সবাই সকলের জন্যে সমান ব্যাকুল। বিপদের মুখোমুখি

banglabooks.in

দাঁড়িয়ে এটা তারা আবিষ্কার করেছে একে অন্যকে তারা কতখানি ভালোবাসে। ঈর্ষা, উচ্চাশা, বিরোধ—এ-সব যেন মন্ত্রবলে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

কেটও এরই মধ্যে ছেলেদের মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেলেছেন। ছেলেরা তাঁকে 'আন্টি' ব'লে ডাকে। কেটের ইচ্ছে : কোনোরকমে ইভান্‌স্‌কে এই দলের মধ্যে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসা।

'আহা! ইভান্‌স্‌ বড়ো ভালোমানুষ!'

৭

ঘুড়ির ল্যাজ

এখন পর্যন্ত যদিও বোম্বেটেদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি, তবু তাদের ভয়ে ছেলেদের বাইরে যাওয়া প্রায় বন্ধই হ'য়ে গেছে। দ্বীপের সর্বত্র ছেলেদের বস-বাসের নানা চিহ্ন ছড়ানো। বিশেষ ক'রে সেই বেলুনটা। সেটা তো চোখে পড়বেই। দস্যুরা একবার সন্ধান পেলে কি আর রক্ষে আছে?

শেষে একদিন রাত্রিবেলায় কয়েকজন গিয়ে চুপি-চুপি বেলুনটা খুলে নিয়ে এলো। তার পর থেকে তারা প্রায়ই সাবধানে রাত্তিরে বেরুতো, সন্তর্পণে চারদিক পরীক্ষা ক'রে দেখতো কোথাও কোনো আগুন দেখা যায় কি না। কিন্তু এভাবে, এই অনিশ্চয়ের মধ্যে, আর ক-দিন চলে? প্রতি মুহূর্তে কেবল যদি ভয়ে-ভয়ে থাকতে হয়, কখনও যদি নিশ্চিত ক'রে জানা না-যায় দস্যুরা কোথায় আছে, তাহ'লে এখানে বসবাস করাই যে তাদের পক্ষে মুশকিল হ'য়ে উঠবে!

অবশেষে ব্রিয়ঁ। এক অদ্ভুত কাণ্ড ক'রে বসলো। অনেকদিন আগে সে একটা বইয়ে পড়েছিলো, কবে নাকি কোন ইংরেজ মহিলা এক অতিকায় ঘুড়ির সঙ্গে নিজেকে আঁটো ক'রে বেঁধে নিয়ে আকাশে অনেক উঁচুতে উঠেছিলেন। ব্রিয়ঁ। ঠিক করলে সেও ও-রকম করবে।

আগেকার ঘুড়ির চাইতে আরো বড়ো আরো বিরাট একটা ঘুড়ি তৈরি করা হ'লো। এই বিরাট ঘুড়ি ওড়াতে তেমনি মজবুত সুতোর দরকার। সে-কাজ হাসিল করা হ'লো জাহাজের লগ-রীল-এ জড়ানো ইস্পাতের সুতো অর্থাৎ লগ-লাইন দিয়ে। জাহাজের মাস্তুলের গায়ে যে-ধরনের বড়ো-বড়ো ঝুড়ি লাগানো থাকে,

banglabooks.in

এবং যার মধ্যে একজন লোক দাঁড়ালে একেবারে তার বুক পর্যন্ত ঝুড়ির ভিতর থাকে—অর্থাৎ যাকে নাবিকদের পরিভাষায় বলে 'কাকের বাসা'—তেমনি একটি ঝুড়ি ঘুড়ির সঙ্গে বাঁধা হবে।

প্রথমে পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্যে দেড়মণ ওজনের পাথর ভ'রে ঘুড়ি ছেড়ে দেয়া হ'লো। অবাক কাণ্ড! সেই বিপুল ভার নিয়ে ঘুড়িটা দিব্যি ফর-ফর ক'রে আকাশে উঠে গেলো। বেশ চমৎকারভাবেই উড়তে লাগলো ঘুড়িটা—দেড়মণ ভার বহন করেছে বলে কিছু যে বেশামাল হ'য়ে পড়েছে, তা মনে হ'লো না। তখন অনেক কষ্ট ক'রে লগ্-রীল-এ সুতো গুটিয়ে-গুটিয়ে সে-ঘুড়ি নিচে নামানো হ'লো।

এবারে ওই পরীক্ষার নিরিখেই ঝুড়ির মধ্যে লোক ওঠার পালা। কাজটা খুব সহজ নয়। রীতিমতো বুকের পাটা চাই সেইজন্যে—চাই প্রচুর সাহস, শক্ত স্নায়ু, বেপরোয়া ডাকাবুকো ভঙ্গি। কারণ মৃত্যুর ভয় প্রতি পদে।

ব্রিয়ঁা বললে, 'এবার ঝুড়িতে কে উঠবে বলো?'

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো জাক, সে বললে, 'আমি উঠবো।'

ডনাগান, উইলকক্স ও অন্যরাও 'আমি-আমি' রব তুলে গোল শুরু ক'রে দিলে।

তখন জাক তার দাদার হাতদুটি ধ'রে বললে, 'তুমি অনুমতি দাও, আমি উঠি! আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এবার করতে দাও।'

জ়াকের কথায় ডনাগান, উইলকক্স প্রভৃতি সকলেই খুব চমকে গেলো। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত? তার মানে? জ়াক এ কী বলছে?

জ়াক তেমনি রুদ্ধ স্বরে বললে, 'আজ আমাকে সব কথা খুলে বলতে দাও, ব্রিয়ঁা।' তারপর ডনাগানের দিকে ফিরে কম্পিত স্বরে বললে, 'হ্যাঁ ডনাগান, আমি একটা মারাত্মক অপরাধ করেছি—তার প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমারই সর্বাগ্রে এই বিপজ্জনক কাজে নামা দরকার। আজ যে তোমরা এই নির্জন দ্বীপের উপর নির্বাসিত হয়েছো, এত কষ্ট পাচ্ছো, এই দুই বছর এত নিগ্রহ ভোগ করছো, সে কার জন্যে, জানো? জানো, কেন হঠাৎ আমাদের জাহাজ রাতের অন্ধকারে অকল্যাণ্ড বন্দর ছেড়ে মহাসমুদ্রে ভেসে আসে? জানো, কে তোমাদের এত বিপদ-আপদের জন্যে দায়ী? আমি। হ্যাঁ, তোমরা সকলে যখন ঘুমোচ্ছিলে, তখন উজবুক আমি, বোকা আমি মজা করার জন্যে জাহাজের দড়ি খুলে দি। ভেবেছিলুম ভারি আমোদ হবে। আমি খেলার ছলে যা করেছিলুম, তার ফল যে শেষ পর্যন্ত এমন নিদারুণ হবে, তা বুঝতে পারিনি! যখন দেখলুম হাওয়ায় আমাদের ছোটো

banglabooks.in

জাহাজ বন্দর ছেড়ে ক্রমশ বারদরিয়ায় এসে পড়ছে, তখন ভয়ে আমি এতই অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলুম যে চেঁচিয়ে তোমাদের ডাকতে পর্যন্ত পারিনি। অনেক-ক্ষণ আমি ডেক-এ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সারেঙহীন নোঙরতোলা জাহাজের খামখেয়াল দেখেছিলুম আর প্রাণপণে ভগবানকে ডেকেছিলুম। শেষে যখন জাহাজ মধ্যসমুদ্রের উপর দিয়ে হাওয়ার তোড়ে হু-হু ক'রে ভেসে চলতে শুরু করে, তখন আমি ভয়ে-ভয়ে নিতান্ত গোবেচারার মতো, ভালোমানুষের মতো লুকিয়ে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ি, সারা রাত ঘুমুতে পারিনি আশঙ্কায়। বলো, তোমরাই বলো এই মারাত্মক অপরাধের জন্যে আমার কি কোনো ক্ষমা আছে ?'

বলতে-বলতে জ়াক কান্নায় একেবারে আকুল হয়ে গেলো, আর ব্রিয়ঁা অপরাধীর মতো কুণ্ঠিতভাবে মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। অন্যরা তো বিস্ময়ে হতবাক !

খানিকক্ষণ পরে ডনাগান বললে, 'এতদিনে তোমার যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হয়েছে, জ়াক। তোমার মতো অমন হাসিখুশি ফুর্তিবাজ ছেলে এ-দু-বছর যে-রকম মনমরা হ'য়ে দিন কাটিয়েছো, তাতেই তোমার সমস্ত দোষ কেটে গেছে। আর ব্রিয়ঁা, এইবার আমি বুঝতে পারছি, কেন তুমি সব বিপজ্জনক কাজে সকলকে রেখে জ়াককে পাঠাতে !'

সবাই তখন জ়াককে নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে শান্ত করলে। তাদের সান্ত্বনা ও সহানুভূতি পেয়ে জ়াক এক চোখে হাসি অন্য চোখে কান্না নিয়ে গিয়ে ঝুড়িতে উঠলো। এবার ঘুড়ির সুতো ছাড়া হবে—কিন্তু হঠাৎ ব্রিয়ঁা ঝুড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গম্ভীর গলায় বললে, 'জ়াক', নেমে আয় তুই। আমিই ওতে উড়বো, ঠিক করেছি।'

৮

ঝোড়ো কাকের আবির্ভাব

অনেক রাত্রে নির্বিঘ্নে সেই বিপজ্জনক আকাশ-অভিযান সঙ্গে ক'রে ব্রিয়ঁা ফিরে এলে ছেলেরা তাকে ঘিরে প্রশ্নে প্রশ্নে একেবারে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললো। কিন্তু তাদের সব প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত সংক্ষেপে ব্রিয়ঁা মোদ্দা কথাটি জানিয়ে দিলে, 'বোম্বেটেরা এখনও দিব্যি বহাল তবিয়তে চারম্যান আইল্যাণ্ডে ঘুরে বেড়াচ্ছে।'

banglabooks.in

সেদিন ২৪শে নভেম্বর। ব্রিয়ঁা আর গরডন নৌকোয় ক'রে জ্বীল্যাণ্ড-রিভারের ওপারে গিয়েছিলো। মতলব ছিলো, ওদিকে যে একটি সরু পথ আছে, সেটি কোনোরকমে একটা বেড়া দিয়ে ঘিরে দেবে।

নৌকো থেকে নেমে তীর থেকে প্রায় দেড়শো গজ দূরে গেছে, হঠাৎ ব্রিয়ঁা অনুভব করলে তার জুতোর তলায় কী-একটা শক্ত জিনিশ মচমচ শব্দ ক'রে ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে গেলো। তুলে দ্যাখে, সেটা একটা তামাকের পাইপ।

কী সর্বনাশ! এটা এখানে কোত্থেকে এলো?

'নিশ্চয়ই দস্যুরা এদিকে এসেছিলো', বিবর্ণ মুখে বললে গরডন, 'তাদেরই একজন বোধহয় ফেলে গেছে।'

'ফ্রাঁসোয়া বদোয়ঁার পাইপও তো হ'তে পারে।'

হ'তে যে পারতো না, তা নয়। কিন্তু সেটা যে বদোয়ঁার তামাক খাবার পাইপ নয়, তা তক্ষুনি স্পষ্ট ক'রে বোঝা গেলো। কারণ পাইপের মধ্যে কিছু পোড়া তামাক গোঁজা ছিলো, শুঁকে দেখা গেলো টাটকা তামাকের গন্ধ। নতুন তামাকের মধ্যে যেমন একটা সতেজ ঝাঁজ থাকে, পাইপের নলচেয় সেই ঝাঁজ পাওয়া গেলো। নিশ্চয়ই ওয়ালস্টোনের দলের কেউ এখানে ভুল ক'রে এটা ফেলে গেছে। ওয়ালস্টোন তবে তার সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে এদ্দুর পর্যন্ত এসেছিলো!

সেখানে আর বিন্দুমাত্র কালক্ষেপ না-ক'রে তারা দু'জনে তাড়াতাড়ি গুহায় ফিরে এলো।

এখন কোথায় আছে দস্যুরা? হয়তো খুব কাছেই কোথাও ঘাপটি মেরে ওৎ পেতে ব'সে আছে। হয়তো ছেলেদের তারা দেখতে পেয়েছে এর মধ্যে, হয়তো আজ রাত্তিরেই তারা ফরাশি গুহা আক্রমণ ক'রে বসবে।

কিন্তু এখন অহেতুক ভয় পেলে চলবে না। ওই নিষ্ঠুর বোম্বেটেগুলোর হাত থেকে কীভাবে আত্মরক্ষা করা যায়, সেই কথাই ভাবতে হবে সবাইকে। তারপর সেই প্রতিরোধের ব্যবস্থা কাজে খাটাতে হবে। তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য গোয়েন্দা-কাহিনীর অদ্ভুতকর্মা নায়কের মতো আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে সবাইকে।

দু'দিন গেলো ভীষণ গরম, তারপর ২৭শে নভেম্বর সন্ধে থেকেই আবার দেখা দিলো তুমুল ঝড়বাদল।

ছেলেরা গুহার ভিতরে দুয়ার বন্ধ ক'রে ব'সে আছে।

ফ্যানও এতক্ষণ কুণ্ডলী পাকিয়ে মেঝেয় ব'সে চুপচাপ ঝিমোচ্ছিলো, মাঝে-মাঝে লাঙ্গুল আস্ফালন ক'রে মশা তাড়াচ্ছিলো। হঠাৎ এক সময় সে দুয়ারের

banglabooks.in

কাছে ছুটে গিয়ে ভীষণভাবে গর্জন করতে শুরু ক'রে দিলে। তারপরেই অকস্মাৎ সেই শোঁ-শোঁ হাওয়া-বওয়া বর্ষণমুখর অন্ধকার রাত্রিকে স্তম্ভিত ক'রে দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ শব্দ হ'লো। স্পষ্ট বন্দুকের আওয়াজ—তাতে কোনোই ভুল নেই। ফরাশি গুহার একশো হাতের মধ্যে নিশ্চয়ই কেউ বন্দুক ছুঁড়েছে! আচমকা সেই বন্দুকের শব্দ শুনে ছেলেদের বুকের মধ্যে যেন অবিশ্রাম হাতুড়ির বাড়ি পড়তে লাগলো। এই দারুণ দুর্যোগ উপেক্ষা ক'রেও দস্যুরা তবে ফরাশি গুহা আক্রমণ করতে এসেছে।

ডনাগান, ব্রিয়ঁা, গরডন, উইলকক্স প্রভৃতি সকলেই যে-যার পিস্তল-বন্দুক নিয়ে স্পন্দিত বক্ষে অপেক্ষা করতে লাগলো, প্রবল ধাক্কায় কখন গুহার দরজা ভেঙে পড়ে। ঠিক এমন সময় তাদের কানে এলো এক করুণ, অসহায় ও হতাশ আর্তনাদ: 'বাঁচাও! বাঁচাও! কে আছো, বাঁচাও!'

সেই চীৎকার শুনে কেট দুয়ারের কাছে এগিয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে রইলেন—বোঝা গেলো কী যেন শোনবার চেষ্টা করছেন।

আবার সেই আকুল করুণ আর্তনাদ শোনা গেলো—আর শোনবামাত্র কেট ব'লে উঠলেন, 'শিগ্‌গির দরজা খুলে দাও, শিগ্‌গির!'

কোনো কথা না-ব'লে ছেলেরা তাঁর আদেশ মাথা পেতে মেনে নিলো। দরজা খুলে দিতেই একজন বলিষ্ঠ কিন্তু ক্লান্ত ও বয়স্ক নাবিক ঝোড়ো কাকের চেহারা নিয়ে হুড়মুড় ক'রে ঢুকে পড়লো। অবসাদে তখন তার শরীরের সব জোড়গুলো যেন আলগা হ'য়ে যাচ্ছে!

জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য

লোকটা আর কেউ নয়, সেভার্ন জাহাজের ফার্স্ট মেট ইভান্‌স্।

ঘরে ঢুকেই ইভান্‌স্ তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে কান পেতে অনেকক্ষণ কী যেন শোনবার চেষ্টা করলে। সে যে কী শুনতে চাচ্ছে, তার আর্ত মুখ দেখে বোঝা গেল না: সম্ভবত তার পিছু-নেয়া দস্যুদের পায়ের শব্দ। শেষটায় কিছুটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে মুখ ফেরাতেই একসঙ্গে এতজন কিশোরকে দেখে সে অবাক হ'য়ে গেলো। হঠাৎ তার নজর পড়লো কেটের দিকে। তার বিমূঢ় দশা আরো বৃদ্ধি

banglabooks.in

পেলো, অবাক হ'য়ে বললে, 'একি ! আপনি এখনও বেঁচে আছেন ?'

'হ্যাঁ ইভান্‌স্, এখনও আমি বেঁচে আছি—মরিনি !' হাসতে-হাসতে উত্তর দিলেন কেট, 'তুমিও যেমন ছেলেদের সাহায্যে প্রাণ রক্ষা করেছো, আমিও তেমনি মরতে ব'সেও শুধু এদেরই জন্যে বেঁচে গেছি।'

অবসন্ন ইভান্‌স্‌কে দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো অনেকক্ষণের মধ্যে কুটোগাছটিও সে দাঁতে কাটেনি। তাই ছেলেরা তাড়াতাড়ি তার জন্যে কিছু খাবারের ব্যবস্থা ক'রলো। আহারের পর কিঞ্চিৎ সুস্থ হ'লে সে ধীরে-ধীরে ছেলেদের সমস্ত কাহিনী শুনলো, তারপর নিজের কাহিনীও শোনালে।

জল থেকে উদ্ধার পাবার পর ওয়ালস্টোনেরা ইভান্‌স্‌কে নিয়ে যেখানে আশ্রয় নেয় সেটা ডিসেপশন বে-র তীরে বীয়ার-রক-হারবারের একটা গুহা বলে ওদের মনে হলো। মাথা গোঁজার একটা জায়গা জোগাড় ক'রে নেবার পর প্রথমেই তারা গিয়ে ওই ভাঙা নৌকোটা কোনোরকমে ভাসিয়ে দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে আসে ঐ গুহার সামনে।

নৌকোর একটা দিক একেবারে গুঁড়ো হ'য়ে গিয়েছিলো। যন্ত্রপাতি থাকলে সেটাকে মেরামত ক'রে হয়তো সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার উপযোগী করা যেতো, কিন্তু তার অভাবে কিছুই করা হয়নি।

ডনাগান বললে, 'আমাদের কাছে কিন্তু সমস্ত যন্ত্রপাতি আছে।'

'তোমাদের কাছে যে যন্ত্রপাতি আছে, ওয়ালস্টোন তা আগেই জানতে পেরেছে', বললে ইভান্‌স্। 'শুধু তা-ই নয়, দ্বীপে যে লোকের বাস আছে, আর সেই লোক-গুলিও যে কত বড়ো বড়ো, তাও সে অনেক আগেই জেনে ফেলেছে। সব শুলুক-সন্ধান সে জানে—'

গরডন একটু ভয় পেয়ে গেলো। 'কেমন ক'রে জানলো ?'

ইভান্‌স্ বললে, 'দিন-আষ্টেক আগে ওয়ালস্টোনের সঙ্গে আমরা তখন বনে-বনে ঘুরে বেড়াচ্ছি—হঠাৎ হ্রদের তীরে একটা অদ্ভুত জিনিশ দেখে আমরা সকলেই অবাক হ'য়ে গেলুম। দ্বীপে যে লোকের বাস আছে, সেটা আমরা তখুনি বুঝতে পেরেছিলুম। জিনিশটা আর কিছুই নয়, বেতের কাঠামোর উপর লাগানো—'

ইভান্‌সের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে ডনাগান বললে, 'ওঃ, সেটা তো আমাদের ঘুড়ি !'

'তাই নাকি ?' ব'লে ইভান্‌স্ এই অদ্ভুতকর্মা ছেলেদের দিকে তারিফ করার ভঙ্গিতে তাকালো। 'যা-ই হোক, সেই মুহূর্ত থেকে ওয়ালস্টোন জানবার জন্য ব্যস্ত

banglabooks.in

হয়ে পড়লো, এই লোকগুলো কারা ? আর আমিও সেই মুহূর্তে মনে-মনে সংকল্প ক'রে নিলুম এবার যেমন ক'রেই হোক এদের হাত থেকে পালাতে হবে। দ্বীপের বাসিন্দারা যদি নরখাদক জঙলিও হয়, তাহ'লেও পালিয়ে গিয়ে তাদের কাছে আশ্রয় ভিক্ষে করবো, কিন্তু তবু ওই খুনে বোম্বেটেদের সঙ্গে থাকবো না—জঙলিরাও তুলনায় এই দস্যুদের চেয়ে ভালো—অন্তত অবস্থার তাতে সবিশেষ তারতম্য হবে না। ওয়ালস্টোন বোধকরি আমার মনের কথা বুঝতে পেরেছিলো, কারণ সেদিন থেকে সে আমাকে সবসময় চোখে-চোখে রাখতো—কিছুতেই আমার সঙ্গ ছাড়তো না। ওয়ালস্টোন তখন চারদিকে অনুসন্ধান শুরু ক'রে দিলে। কিন্তু দ্বীপের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত অবধি তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে হদ্দ হ'য়ে গেলেও জীবিত বা মৃত কোনো লোকের কোনো পাত্তা পাওয়া গেলো না। দ্বীপের কোনোদিকেই এমন-কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না যাতে মনে হয় সেখানে লোকের বাস আছে।'

'তার কারণ', ব্রিয়ঁা ব্যাখ্যা ক'রে বোঝালে, 'আমরা ফরাশি গুহা থেকে মোটেই বেরোতুম না—আর কক্‌খনো বন্দুক ছুঁড়তুম না। বন্দুকের বিরুদ্ধে আমরা রীতি-মতো নোটিশ জারি ক'রে দিয়েছিলুম।'

ইভান্‌স্ বললে, 'কিন্তু তোমাদের অত সাবধানতা সত্ত্বেও আমরা কিছুদিনের মধ্যেই তোমাদের কথা জানতে পেরেছিলুম। তোমরা বোধহয় একদিন রাত্তিরে এক মুহূর্তের জন্য দুয়ার খুলেছিলে, তখন তোমাদের লণ্ঠনের আলো আমাদের চোখে পড়ে। পরদিন সকালেই ওয়ালস্টোন নিজে তোমাদের খোঁজ নিতে বেরোয়। একটা নদীর ধারে একটা ঝোপের মধ্যে সে সমস্ত দিন লুকিয়ে ছিলো…'

ইভান্‌সের কথায় বাধা দিয়ে ব্রিয়ঁা বললে, 'তা আমি জানি। গরডন আর আমি সেখানে একটা তামাকের পাইপ কুড়িয়ে পাই।'

'ঠিক, ঠিক!' ইভান্‌স্ ঘাড় নেড়ে বললে, 'তামাকের পাইপ হারিয়ে ওয়াল-স্টোনের সে কী রাগ! হাতের কাছে যাকে পেতো তাকেই সে তখন হয়তো ছিঁড়ে ফেলতো। যাই হোক, সেই ঝোপের মধ্যে শুয়ে থেকে সে তোমাদের দেখতে পায়। একদল বাচ্চা ছেলে নদীর ওপারে ছুটোছুটি করছে দেখে তার খুব আনন্দ হ'লো—পাইপ হারাবার রাগ প'ড়ে গেলো তক্ষুনি, দিব্যি শরীফ হ'য়ে গেলো মেজাজ। তারা কয়েকজনে অনায়াসেই এই কটা ছেলেকে শাবাড় করতে পারবে। ফিরে এসে সে তখনই ব্র্যান্‌ডের সঙ্গে ফন্দি আঁটতে বসলো—কেমন ক'রে ছেলেগুলোকে হত্যা ক'রে তাদের ঘর জবরদখল ক'রে নেয়া যায়, তারই মতলব করতে লাগলো।'

ডনাগান তখন রাগে ফুলছিলো। বললে, 'রাক্ষস!'

banglabooks.in

'রাক্ষস ? সে-বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে ?' বললে ইভান্‌স্, 'তা নইলে কি আর শুধু-শুধু জাহাজের নিরীহ নির্দোষ লোকগুলোকে অমনভাবে হত্যা করে ? আর দলের মধ্যে সবচেয়ে শয়তান হচ্ছে এই ওয়ালস্টোন ! সে মানুষ নয়—একটা পিশাচ ! এমন-কোনো অমানুষিক ও নিষ্ঠুর কাজ নেই যা সে হাসিমুখে করতে পারে না। তার উপর শরীরে তার অসম্ভব জোর—খ্যাপা হাতির বল নিয়ে সে যে কী করবে তাই ভেবে পায় না। যাক, যা বলছিলুম। আজ সকালে ওয়াল-স্টোন যখন দলবল নিয়ে কোথায় যেন বেরোলো, আমাকে বসিয়ে রেখে গেলো ফর্‌বস্ আর রকের পাহারায়। আমায় তারা এমন ভাবে চোখে-চোখে রেখেছিলো যে কিছুতেই পালাতে পারছিলুম না। তাদের হাত এড়িয়ে একটা মাছিও বোধহয় গ'লে যাবার সাধ্য নেই। তাদের দু'জনেরই হাতে বন্দুক, আমার কোমরে শুধু একটা বড়ো কিছু—ছুটে পালাবার চেষ্টা করলেই তারা আমাকে কুকুরের মতো গুলি ক'রে মারবে।'

একটু দম নিয়ে ইভান্‌স্ আবার বলতে থাকে, 'বেলা তখন দশটা, হঠাৎ দেখি কাছেই ঝোপের আড়ালে একপাল গুঅনাকো চ'রে বেড়াচ্ছে। গুঅনাকো দেখেই শিকারের আশায় যেই তারা দু'জনে ঝোপের দিকে এগোয়, অমনি আমিও মরিয়া হ'য়ে উল্‌টো দিকে জঙ্গলের মধ্যে ছুটতে শুরু ক'রে দিই। আমায় ছুটে পালাতে দেখে তক্ষুনি তারা শিকার শিকেয় তুলে আমার পেছন-পেছন তাড়া ক'রে আসে। আমি পালাচ্ছি প্রাণের ভয়ে, নিজেই জানতুম না যে এত জোরে আমি ছুটতে পারি। আমিও প্রাণপণে বনের ভেতর দিয়ে ছুটছি, তারাও পেছনে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে ছুটে আসছে। একবার ধরা পড়লে আর রক্ষে নেই। শেষটায় নাগালের বাইরে চ'লে যাচ্ছি দেখে তারা দু-চারবার গুলি ছুঁড়তে ও ছাড়ে না, কিন্তু ভগবানের দয়ায় একটা গুলিও আমার গায়ে লাগে না। উঃ, কী ছোটাই না ছুটেছি আজ সারাদিনে ! বেঁচে থাকার জন্যে লোকে কী না করে—এমনিতে সাধারণ অবস্থায় যেসব কর্ম তার কল্পনারও বাইরে, একবার মৃত্যুর মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালে সেইসব অসম্ভব কাণ্ডও সে সাধন ক'রে ফেলতে পারে !' এই দার্শনিক উক্তি ক'রে দম নেবার জন্যে একটু থামলো ইভান্‌স্। তাকিয়ে দেখলে, ছেলেরা জুল-জুল চোখে রুদ্ধশ্বাসে তার কথা শুনছে। কথাগুলো শুনতে তাদের ভয়ও লাগছে, আবার কেমন রোমাঞ্চও হচ্ছে।

ইভান্‌স্ আবার তার কাহিনীর খেই ধরল : 'ক্রমে সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। ভগবানও আমার উপর সদয় হলেন। হঠাৎ ভীষণ মেঘ ক'রে এলো, সঙ্গে-সঙ্গে

banglabooks.in

উঠলো দারুণ ঝড়। কিন্তু ওই ঝড়ের মধ্যেও রক আর ফরব্‌স্‌ তখনও আমার পিছু ছাড়েনি। বেগতিক দেখে আমি ঝপ্‌ ক'রে তখন নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ি, অন্ধকারে তারা অনেকে প্রথমটায় দেখতে পায়নি। সাঁতরে খানিকটা এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ একবার বিদ্যুতের আলোয় তারা আমাকে আবার দেখতে পায়। তক্ষুনি তারা আমাকে লক্ষ্য ক'রে গুলি ছোঁড়ে। একটা গুলি প্রায় আমার কাঁধ ঘেঁসে চ'লে যায়, আমিও চক্ষের পলকে জলের মধ্যে ডুব-সাঁতার কেটে অন্যখানে ভেসে উঠি। সেই অবস্থাতেই শুনতে পাই দু'জনে চীৎকার ক'রে বলাবলি করছে, "লোকটার গায়ে গুলি লেগেছে বোধহয়!" "খুব সম্ভব। দেখলে না গুলি খেয়ে হতচ্ছাড়া তক্ষুনি নদীর জলে ডুবে গেলো!" "যাক, আপদ গেছে!" এইসব বলা-বলি ক'রে তারা তীর থেকে ফিরে যায়। আমিও তারা চ'লে যেতেই জল থেকে উঠে তোমাদের গুহার অনুসন্ধান করতে থাকি। কিন্তু যে ভীষণ ঝড়-বাদল আর অন্ধকার! কিছুই দেখতে পাবার জো নেই। হঠাৎ এমন সময়ে তোমাদের কুকুরের ডাক শুনতে পেলুম—সেই শব্দকে লক্ষ্য ক'রেই এই গুহার সামনে এসে তোমাদের ডাকতে থাকি।'

কাহিনী শেষ ক'রে ইভান্‌স্‌ বললে, 'আজ থেকে আমিও যেমন তোমাদের উপর নির্ভর করবো, তোমরাও তেমনি আমার উপর বিশ্বাস রেখো। তোমাদের কোনো ভয় নেই।'

গরডন বললে, 'আচ্ছা, ওয়ালস্টোনের সঙ্গে একটা আপোস ক'রে নিলে হয় না? অন্তত চেষ্টা ক'রতে দোষ কী? ধরুন, আমরা যদি ওদের ভাঙা নৌকোটা সারিয়ে দি? তা'হলেও কি ওরা আমাদের ক্ষতি করবে?'

ইভান্‌স্‌ হো-হো ক'রে হেসে উঠলো। 'ওদের সঙ্গে আপোস? শয়তানের সঙ্গে রফা? তুমি ওদের চেনো না! বিশ্বাসঘাতকতায় ওদের জুড়ি নেই। ঠাণ্ডা মাথায় কারু সর্বনাশ করতে ওদের চোখের পাতাটিও পড়ে না। আজ সাধু সেজে ভিজে বেড়ালটির মতো তোমাদের সাহায্য নেবে—এমন ভাব করবে যেন ভাজা মাছটিও উলটে খেতে জানে না, কালই হয়তো তোমাদের যথাসর্বস্ব কেড়ে নিয়ে সবাইকে হত্যা ক'রে পালাবে। 'তাছাড়া'. ইভান্‌স্‌ আরো বললে, 'তাছাড়া ওইভাবে যদি ওদের নৌকো তোমরা সারিয়ে দাও, আর তা নিয়ে ওরা চ'লে যায়, তাহ'লে তোমাদের গতি কী হবে কিছু ভেবে দেখেছো?'

'আপনি কি—' গরডন বিমূঢ়ভাবে বললে, 'আপনি কি বলতে চান যে ওই নৌকো পেলে আমরা এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পেতে পারি?'

banglabooks.in

'নিশ্চয়ই !'

'কিন্তু ওইটুকুন একটা নৌকোয় ক'রে অত বড়ো প্রশান্ত মহাসাগর কি কেউ পাড়ি দিতে পারে ? ওই হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথ ?'

ইভান্‌স্‌ হেসে ফেললে। 'হাজার হাজার মাইল হ'তে যাবে কেন ? এখান থেকে মাত্তর মাইল-ত্রিশেক গেলেই এমন একটি দেশ পাওয়া যাবে, যেখান থেকে আমরা যে-কোনো বড়ো জাহাজের সাহায্য নিতে পারবো।'

অবাক হ'য়ে ডনাগান শুধোলে, 'মাত্র ত্রিশ মাইল ! তবে কি এই দ্বীপের চারদিকে কোনো সমুদ্র নেই ?'

'আছে বইকি। তবে চারদিকে নয়, কেবল পশ্চিম দিকে। উত্তর, দক্ষিণ আর পূর্বে আছে কেবল সমুদ্রের অল্পপরিসর সামান্য গভীর খাল। সে-সব প্রণালী অল্প-ক্ষণের মধ্যেই পেরুনো যায়। এখন বুঝেছো তোমরা এতদিন কোথায় বাস করছো ?'

গরডন তার অনুমান জানালে : 'বোধহয় দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপের ওপর।'

'হ্যাঁ, দ্বীপ তো বটেই', ঘাড় নেড়ে সায় দিলে ইভান্‌স, 'দক্ষিণ আমেরিকার কাছাকাছি শত-শত দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এও একটা দ্বীপ বইকি। এখান থেকে দক্ষিণ আমেরিকার দূরত্ব বোধহয় ত্রিশ মাইল, কি তার অল্পবিস্তর এদিক-ওদিক। তোমাদের ইশকুলের ম্যাপে এই দ্বীপের কী নাম দেয়া হয়েছে, জানো ?'

'কী ?' সমস্বরে জিগেস করলে সবাই।

'হ্যানোভার আইল্যাণ্ড।'

'এটা তাহ'লে অনাবিষ্কৃত, অপরিচিত নতুন কোনো দ্বীপ নয় ?

ছেলেদের কৌতূহল দেখে ইভান্‌স্‌ তখন তাদের সেই এলাকার ভৌগোলিক বিবরণ শোনাতে শুরু করলে।

১০

শেয়ানে-শেয়ানে

ওয়ালস্টোনের দলের সঙ্গে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী, ইভান্‌স্‌ তাই ছেলেদের নিয়ে ভারি তোড়জোড় শুরু করেছে। বোম্বেটেরা সবাই সমান—কেউ-কেউ আবার নিষ্ঠুরতায়

banglabooks.in

বেশি সরেশ। শুধু কেটের মতে ওরই মধ্যে ফর্‌ব্‌স্‌কে নাকি একটু ভালো বলা যেতে পারে, কারণ সে-ই নাকি ওয়ালস্টোনকে বারণ ক'রে বলেছিলো কেটকে যেন হত্যা করা না-হয়। কিন্তু ইভান্‌সের ধারণা আবার ঠিক তার উলটো—কারণ ইভান্‌স্‌কে তো ফর্‌ব্‌স্‌ই গুলি করেছিলো সেদিন।

তোড়জোড় তো তারা করছে, কিন্তু কোন দিক থেকে যে আক্রমণ আসবে তা-ই কেউ জানে না। তাদের মতলব বুঝতে পারলে ছেলেরা না-হয় ভালো ক'রে তৈরি হ'য়ে নিতে পারতো। কিন্তু দস্যুদের কোনোই সাড়াশব্দ নেই, ওয়ালস্টোন আজ দিনকতক ধ'রে বড্ড চুপচাপ। আর এত চুপচাপ ব'লেই তার রকমশকম তাই বড়ো সন্দেহজনক হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তার হয়তো ধারণা কেট আর ইভান্‌স্‌ আর বেঁচে নেই—কাজেই সে হয়তো ধ'রেই নিয়েছে যে ছেলের দলও তাদের কথা বিন্দুবিসর্গও জানে না। সুতরাং গোড়াতেই হয়তো সরাসরি লড়াই শুরু না-ক'রে সে জাহাজডোবা নাবিক সেজে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। যদি সে তা-ই করে, তাহ'লে ছেলেরা কী করবে, তাও মোটামুটি ঠিক করা হ'লো।

শেষ অবধি তাদের অনুমানই সত্য হ'লো। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার সময় গুহার দরজায় ধাক্কা আর করুণ মিনতি। দরজা খুলে ছেলেরা ছাখে রক আর ফর্‌ব্‌স্‌ করুণ মুখে দাঁড়িয়ে (লোকদুটি যে রক আর ফর্‌ব্‌স্‌ তা তারা পরে কেটের কাছ থেকে জেনেছিলো)। জাহাজ-ডোবা অসহায় নিরাশ্রয় নাবিক ব'লে পরিচয় দিয়ে ছেলেদের কাছে তারা আশ্রয় চাইলো। আগে থেকে সব না-জানলে কার সাধ্য ওদের ওই কাঁদুনি শুনে বোঝে যে তাদের পেটে-পেটে এত বিষ!

ছেলেরা আগেকার ব্যবস্থা অনুযায়ী হলঘরে এনে তাদের খাওয়ালে, তারপর শোয়ার জন্যে ফরাশি গুহাটা দেখিয়ে দিলে। কেট কিংবা ইভান্‌স্‌ কেউই তাদের সামনে বেরুলো না, তারা চোর-কুঠুরিটায় সাবধানে লুকিয়ে রইলো।

দস্যুদুটি ফরাশি গুহাটা ভালো ক'রে দেখে নিয়ে নেহাত ভালোমানুষের মতো কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লো। একটু পরেই ঘন গর্জনে তাদের নাক ডাকতে শুরু ক'রে দিলে। আর এত নাক ডাকার বহর দেখেই ছেলেরা চটপট বুঝে নিলে এ-সবই তাদের ঘুমের ভান মাত্র।

রাত নটার সময় মোকোও একটা কম্বল নিয়ে দিব্যি নিশ্চিন্তভাবে ফরাশি গুহায় শুতে এলো। চোখ মটকে মোকোকে দেখে নিয়ে দস্যুরা ভাবলে, মাঝরাতে উঠে হতভাগাটার ঘাড় মটকে ফেললেই হবে।

ওয়ালস্টোন ও তার অন্য স্যাঙাতরা তখন ফরাশি গুহারই আশপাশে ঘুরঘুর

banglabooks.in

করছিলো। কারণ রকের সঙ্গে বন্দোবস্ত ছিলো, মাঝরাতে সে ঘরের দুয়ার খুলে দেবে, আর তারা ভিতরে ঢুকে নির্বিচারে ঘুমন্ত ছেলেগুলোকে হত্যা করবে।

ছেলেরা মোকোকে ও-ঘরে শুতে পাঠিয়ে দিয়ে যাতায়াতের সরু গলিটার দরজা আঁটো ক'রে বন্ধ ক'রে দিলে। ওই দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেই হলঘর আর ফরাশি গুহা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। দ্বার বন্ধ ক'রে দিয়ে ছেলেরা চোর-কুঠুরিটার মধ্য থেকে ইভান্‌স্ আর কেটকে নিজেদের হলঘরে নিয়ে এলো।

এদিকে ফরাশি গুহায় গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেও মোকোও কিন্তু এক-ফোঁটাও ঘুমোয়নি, ঘুমের ভান ক'রেই পড়েছিলো কেবল। রাত বারোটার সময় হঠাৎ সে লক্ষ্য করলে রক আর ফর্‌ব্‌স্ বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। আড়চোখে তাদের উঠতে দেখেই মোকো চোখ বুজিয়ে ফেললে। অনুভব করলে তারা তার মুখের উপর ঝুঁকে দেখছে সে ঘুমোচ্ছে কি না। তাকে ঘুমন্ত মনে ক'রে তারা তখন পা টিপে-টিপে দরজার দিকে অগ্রসর হ'লো। ছেলেরা আগে থেকেই ফরাশি গুহার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ ক'রে দিয়ে তার সামনে বিস্তর পাথর সাজিয়ে রেখেছিলো, যাতে ওয়ালস্টোনেরা জোর ক'রে দরজা ভাঙতে না পারে। মোকো আড়চোখে দেখতে পেলে রক আর ফর্‌ব্‌স্ আস্তে-আস্তে পাথর-গুলো সরাতে শুরু করেছে।

পাথর সরিয়ে রক যেই দরজার খিল খুলবে ব'লে খিলেনের উপর হাত দিয়েছে, অমনি কে যেন পাথরের মতো ভারি হাতে শক্ত ক'রে তার কাঁধ চেপে ধরলো। সচমকে ফিরে তাকিয়ে সে দ্যাখে ইভান্‌স্ দৃঢ় হাতে তার কাঁধ চেপে ধ'রে তার দিকে কঠিন চোখে তাকিয়ে আছে। ভূত দেখলেও বোধহয় লোকে অতটা চমকায় না। ভীত অস্ফুট কণ্ঠে রক বললে, 'ইভান্‌স্, তুমি! তুমি এখানে?'

ইভান্‌স্ বললে, 'হ্যাঁ, আমি ইভান্‌স্; কিন্তু এখন তোমার যম!'

তক্ষুনি কেট আর একেবারে ছোটোরা বাদে হলঘরের সব ছেলেরা বন্দুক নিয়ে এই ঘরের মধ্যে ছুটে এলো। ক্রস, ওয়েব আর উইলকক্স তিনজনে চক্ষের পলকে ফর্‌ব্‌সের উপর লাফিয়ে প'ড়ে তাকে মেঝের উপর চেপে ধরলো। ওদিকে রক তখন ইভান্‌সের কবল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে ভয়ানক ছটোপুটি শুরু ক'রে দিয়েছে। ব্রিয়ঁা, ডনাগান আর বাক্সটার যেই রককে ধরতে যাবে, অমনি সে একটা ছোরা বার ক'রে ইভান্‌সের কাঁধে বসিয়ে দিয়ে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বাইরের অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। ইভান্‌স্ আহত অবস্থাতেই দরজার কাছে এসে রকের অপসৃয়মান ছায়ামূর্তি লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়লো, কিন্তু তা

banglabooks.in

রকের গায়ে লাগলো ব'লে মনে হ'লো না। সম্ভবত অক্ষত শরীরেই সে পালিয়েছে।

ইভান্‌স্ আর অন্ধকারে তার পিছু না গিয়ে ঘরের মধ্যে এসে বললে, 'পালিয়েছে হতচ্ছাড়াটা! যাই হোক, একটাকে তো পাকড়ানো গেছে! আয়, তোকেই আজ খতম করি!' এই ব'লে তক্ষুনি সে একটা ছোরা নিয়ে ফর্‌ব্‌সের দিকে এগিয়ে গেলো।

এদিকে ছেলেরাও ফর্‌ব্‌স্‌কে এমন জোরে চেপে ধরেছে যে তার প্রায় দম বন্ধ হ'য়ে আসে আর কি। করুণভাবে কাকুতি-মিনতি ক'রে সে প্রাণভিক্ষা চাইতে লাগলো। তার চীৎকার শুনে কেট অন্য ঘর থেকে ছুটে এলেন। ফর্‌ব্‌সের দশা দেখে কেট অনুনয় ক'রে বললেন, 'ফর্‌ব্‌স্‌কে মেরো না ইভান্‌স্, ও একদিন আমাকে বাঁচিয়েছিলো!'

ইভান্‌স্ বললে, 'লোকটা ভয়ানক শয়তান, একে শেষ ক'রে ফেললেই ভালো হ'তো। আমাকে গুলি করার সময় তো ও কোনো কথা ভাবেনি! যাই হোক, আপনার কথা আমি রাখছি। আজকের মতো অন্তত একে প্রাণে মারবো না।'

ছেলেরা তখন ফর্‌ব্‌স্‌কে দড়ি দিয়ে আগাপাশতলা শক্ত ক'রে বাঁধলো, তারপর তাকে তুলে নিয়ে হলঘরে যাবার গলির পাশের একটা চোর-কুঠুরির মধ্যে কয়লার বস্তার মতো ছুঁড়ে ফেলে দিলো।

১১

সংঘর্ষ

ইভান্‌সের কাঁধের আঘাত ছিলো সামান্য, তাই সেজন্যে সে মোটেই বিব্রত হয়নি। ক্ষতটা পরিষ্কার ক'রে একটা পট্টি বেঁধে দিতেই বেশ সুস্থ বোধ করলে সে।

সকাল হ'তেই ব্রিয়ঁ, সারভিস, ডনাগান আর গরডনকে নিয়ে সে সশস্ত্র হ'য়ে বেরিয়ে পড়লো। রককে পালাতে দিয়েই যত গোল হয়েছে, এখন আর ঘরে চুপচাপ ব'সে থাকলে চলবে না। বোম্বেটেরা কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে, খোঁজ নেয়া দরকার। প্রয়োজন হ'লে সম্মুখ-যুদ্ধের জন্যেও তৈরি থাকতে হবে। দস্যুদের চাইতে অস্ত্রশস্ত্র, গুলিবারুদ তো তাদেরই অনেক বেশি।

ইতিমধ্যে কেট ফর্‌ব্‌সের কাছে গিয়ে তাকে অনেক ক'রে বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তার

banglabooks.in

কাছ থেকে বোম্বেটেদের সম্বন্ধে ছোটোখাটো দু-চারটে খবর জোগাড় করেছেন। কিন্তু সে-সব খবর মোটামুটি সকলেই জানে—নতুন কোনো তথ্য তাতে নেই। ফর্‌ব্‌স্‌ যেন কেমনতর হ'য়ে পড়েছে। চুপচাপ প'ড়ে কী যেন ভাবছে সবসময়।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে ইভান্‌স্‌ বললে, 'সাবধান কিন্তু! সবসময় ঝোপ-ঝাড়ের আড়াল দিয়ে লুকিয়ে যেতে হবে। দস্যুদের দেখতে পেলেই গুলি কোরো, কোনো রকম দ্বিধা রেখো না।'

পা টিপে-টিপে অনেকটা রাস্তা গিয়ে এক গাছতলায় দেখা গেলো কিছু অঙ্গার প'ড়ে আছে—তখনও ভালো ক'রে নেভেনি, অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে। নিশ্চয়ই দস্যুরা এখানে কালকে রাত কাটিয়েছিলো—হয়তো একটু আগেও এখানে ছিলো তারা। সবাই আরো সাবধান হ'য়ে গেলো—এখন কী করবে চুপি-চুপি আলোচনা ক'রে তা-ই ঠিক করছে, এমন সময় হঠাৎ কানের পাশেই একটা বন্দুকের আওয়াজ হ'লো। তক্ষুনি একটা গুলি একেবারে ব্রিয়ঁার কান ঘেঁসে চ'লে গেলো। আচম্বিত আক্রমণটা সামলে ওঠার আগেই আরো তিনটে বন্দুকের শব্দ হ'লো একযোগে।

ডনাগানের রক্ত বোধহয় একটুতেই চন-চন ক'রে ওঠে। অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে তক্ষুনি সে খ্যাপার মতো ঝোপের দিকে ছুটে গেলো। ঝোপের ভিতরকার গর্জমান বন্দুকটির ঝিলিক লক্ষ্য ক'রে তার বন্দুক ততক্ষণে আগুন উগরে ফেলেছে।

অন্যরাও ডনাগানের পিছন-পিছন ছুটে গেলো। গিয়ে ছাখে সেখানে আর কেউ নয়, শুধু ডনাগান একটা মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে আছে। মৃতদেহটি পাইকের। একটু আগেই পাইক এদের লক্ষ্য ক'রে গুলি ছুঁড়তে কোনো দ্বিধা দেখায়নি, অথচ তবু ডনাগানের মুখ-চোখ লাল হ'য়ে উঠেছে, কেমন একটা জ্বরাতুর ভাব, সারা মুখ যেন পুড়ে যাচ্ছে। যত বদমায়েশই হোক না কেন, একজন জ্যান্ত মানুষকে মেরে তার সারা গা কেমন যেন করছে। এত সে শিকার ভালোবাসে, তবু আত্মরক্ষার জন্যও মানুষের রক্তে হাত রাঙিয়ে তার নাক-মুখ দিয়ে যেন হল্‌কা বেরুচ্ছে।

অথচ তখন সবাই কেমন যেন ঘোরের মধ্যে চলাফেরা করছে। ভাবনা-চিন্তার কোনো অবসর নেই। অন্য দস্যুরা কোথায় আছে কে জানে! কোন আড়াল থেকে তাদের বন্দুক মৃত্যুর পরোয়ানা পাঠাবে বজ্রগর্জনে, কে জানে! সংঘর্ষ যখন শুরু হয়েছে, তখন কোনো ফন্দি-ফিকির আঁটার পর্যন্ত ফুরসৎ পাওয়া যাবে না।

ইভান্‌স্‌ বললে, 'খুব সাবধান! সবাই হামাগুড়ি দিয়ে চলো। যে-কোনো মুহূর্তে ওরা আবার গুলি চালাতে পারে!'

এই কথাই যেন মন্ত্রের মতো কাজ করলে। ইভান্‌সের কথা শেষ হবার আগেই

banglabooks.in

আরেক দফা বন্দুকের আওয়াজ হ'লো, আর তৎক্ষণাৎ সারভিস কপাল চেপে ধ'রে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। গুলি তার কপালে লেগেছে। ঠিক লেগেছেও বলা যায় না, কপাল ছুঁয়ে গেছে, ভিতরে ঢোকেনি, কাজেই আঘাত তেমন মারাত্মক নয়—কিন্তু তা না হ'লে কী হবে—বেশ রক্ত ঝরছে।

আরো সাবধান হ'তে হবে তাদের।

সারভিসকে নিয়েই সবাই এত ব্যস্ত ছিলো যে আশেপাশে কী হচ্ছে তেমন খেয়াল করেনি। হঠাৎ দূরে একটা ঝাপটাঝাপটির শব্দ শুনে সবাই খেয়াল ক'রে ছাখে যে ব্রিয়ঁা তাদের সঙ্গে নেই। ব্রিয়ঁা কোথায়? তার সঙ্গেই কি হাতাহাতি হচ্ছে নাকি দস্যুদের! কী সর্বনাশ! ওইটুকু ছেলে অত বড়ো জোয়ান দস্যুদের সঙ্গে পারবে কেন?

কোনোদিকে না তাকিয়ে ডনাগান সেদিকে ছুটে গেলো—পিছন-পিছন অন্য সবাই। গরডনের পাশ দিয়ে শোঁ ক'রে একটা গুলি ছুটে গেলো—দেখা গেলো অদূরেই রক উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। চক্ষের পলকে ইভান্‌সের বন্দুক গর্জন ক'রে উঠলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুতভাবে রক যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলো। ইভান্‌স্ তক্ষুনি ছুটে গিয়ে ছাখে রক যেখানটায় ছিলো, সেখানে কোনো মৃতদেহই নেই। রক তাহ'লে আবার চম্পট দিয়েছে! কিন্তু হতভাগা পালালো কোনখান দিয়ে?

ঝোপের মধ্যে ওদিকে তখন ডনাগান চ্যাঁচাচ্ছে: 'ব্রিয়ঁা, ছেড়ো না শয়তানটাকে! ছেড়ো না!'

গলার স্বর লক্ষ্য ক'রে তারা সেখানে গিয়ে ছাখে ব্রিয়ঁা আর আরেকটা দস্যু—তার নাম কোপ—ভীষণ হুটোপুটি করছে। ও-রকম তাগড়াই গুণ্ডার সঙ্গে ব্রিয়ঁা পারবে কী ক'রে? কোপ তাকে মাটিতে চেপে ধ'রে একটা ছুরি নিয়ে তার বুকে বসিয়ে দেবার চেষ্টা করছে, আর ব্রিয়ঁা প্রাণপণে বাধা দিচ্ছে। ডনাগান ততক্ষণে তার সামনে লাফিয়ে প'ড়ে বন্দুক তুলে ধরেছে—কিন্তু বন্দুকের ঘোড়া টেপবার আগেই কোপ আচম্বিতে ব্রিয়ঁাকে ছেড়ে ডনাগানের বুকে ছোরাটা বাঁটসুদ্ধু বসিয়ে দিয়ে বনের মধ্যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো। টুঁ-শব্দটিও না ক'রে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো ডনাগান।

সারভিসের আঘাত তেমন গুরুতর হয়নি ব'লে সবাই তখনও দস্যুদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে থেকে গিয়েছিলো। কিন্তু ডনাগান যেভাবে জখম হয়েছে, তাতে বাঁচবে কি না কে জানে। যেভাবে ক্রমেই নিস্তেজ হ'য়ে পড়ছে, তাতে আশা একেবারেই বুঝি নেই। সবাই তৎক্ষণাৎ ডনাগানকে ধরাধরি ক'রে

banglabooks.in

ফরাশি গুহার দিকে নিয়ে চললো। এই অবস্থায় তাড়াতাড়ি যাওয়াও বিপজ্জনক—ঝাঁকুনি লেগে খারাপও হ'তে পারে, অথচ তাড়াতাড়ি শুশ্রূষার ব্যবস্থা না করলেও আবার নয়। যতটা সম্ভব দ্রুত পায়ে তারা তাকে ব'য়ে নিয়ে চললো। কিন্তু ফরাশি গুহার কাছে যাবার আগেই একটা ভীষণ কোলাহল তাদের কানে এসে পৌঁছোলো।

ব্যাপার আর কিছুই নয়, তাদের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ওয়ালস্টোন এসে ফরাশি গুহা আক্রমণ করেছে, তার সঙ্গে রয়েছে ব্র্যান্ড্, আর কুক। আরেকটু এগিয়ে তারা ছাখে, ওয়ালস্টোন একটা ছেলের টুঁটি টিপে ধ'রে বাইরে নিয়ে এসেছে। ছেলেটা আর কেউ নয়, জ়াক। তার পিছনে ব্র্যান্ড, সেও একটি ছেলেকে পাকড়েছে—সম্ভবত কোসটার। দস্যুরা হুড়মুড় ক'রে জ়ীল্যাণ্ড রিভারের দিকে ছুটে যাচ্ছে, আর জাক আর কোসটার ভীষণভাবে চেষ্টা করছে তাদের হাত ছাড়িয়ে পালাবার।

হঠাৎ বাক্সটার কোথেকে ছুটে এসে ব্র্যান্ডের উপর লাফিয়ে পড়লো। অমন অতর্কিত আক্রমণে ব্র্যান্ড, একটু হকচকিয়ে গেলেও বাক্সটারের সাধ্য কী তার সঙ্গে এঁটে ওঠে! ব্র্যান্ড্ এক ঘুসিতেই তাকে ধরাশায়ী ক'রে দিলে।

ওয়ালস্টোন আর ব্র্যান্ড্ আর অপেক্ষা করলে না—নদীর দিকে ছুটলো। নদীতে নৌকোর উপর কুক দাঁড়িয়ে।

একবার যদি তারা নদীর ধারে পৌঁছুতে পারে, তাহ'লে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে। জ়াক আর কোসটারকে নিয়ে তারা তবে বীয়ার-রক-হারবারে পালিয়ে যাবে, আর তারপর তারাই ছেলেদের জামিন হিশেবে ব্যবহার ক'রে যথেচ্ছাচার চালাবে।

ইভান্স্, ব্রিয়ঁা, গরডন, ক্রস আর উইলকক্স প্রাণপণে মরীয়া হ'য়ে তাদের পিছন-পিছন ছুটলো। গুলি করারও কোনো উপায় নেই, কারণ তাহ'লে আবার জাক আর কোসটারের গায়েও গুলি লাগতে পারে।

তাদের এই অসহায় অবস্থায় আচম্বিতে সাহায্য এলো ঈশ্বরপ্রেরিত। তারা কিছু করতে না-পারলেও আরেকজন এবার তাদের সাহায্য করলে, সে ফ্যান। তীরবেগে ছুটে গিয়ে সে ব্র্যান্ডের উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার ঘাড় কামড়ে ধরলো। ব্র্যান্ডের সাধ্য কী ফ্যানের সঙ্গে পেরে ওঠে! বাধ্য হ'য়েই সে তখন কোসটারকে ছেড়ে দিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে লাগলো, আর ওয়ালস্টোনকেও জাককে ফেলে রেখে তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসতে হ'লো।

এমন সময়ে দেখা গেলো ফরাশি গুহা থেকে আরেকটি লোক ছুটে বেরিয়ে

banglabooks.in

এসেছে। সে ফরব্‌স্‌। তাকে দেখেই ওয়ালস্টোন আশ্বস্ত হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো, 'ফর্‌ব্‌স্‌, শিগগির এসো! কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

ইভান্‌স্‌ আর সহ্য করতে পারলে না, থেমে দাঁড়িয়ে ফর্‌ব্‌সের দিকে বন্দুক তাগ ক'রে ধরলে। কিন্তু সবাইকে অবাক ক'রে দিয়ে ফর্‌ব্‌স্‌ ওয়ালস্টোনকে সাহায্য করা দূরে থাক, বাঘের মতো তার উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তার মুখে ঝড়ের বেগে প্রচণ্ড ঘুসি চালাতে লাগলো।

ওয়ালস্টোন প্রথমটায় ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সহজে ঘাবড়াবার পাত্র সে নয়। মুহূর্তের মধ্যে কোমরবন্ধ থেকে একটা মস্ত ছোরা বার ক'রে ফর্‌ব্‌সের বুকে আমূল বসিয়ে দিলে। ফর্‌ব্‌স্‌ মাটিতে লুটিয়ে পড়লো, রক্তে মাটি ভেসে গেলো।

ফর্‌ব্‌স্‌কে ছেড়ে দিয়ে ওয়ালস্টোন তখন আবার জ়াককে পাকড়াবার জন্যে তার দিকে এগিয়ে গেলো। কিন্তু ছেলেমানুষ হ'লেও জ়াক সেই বিপদের মধ্যেও মাথা ঠাণ্ডা রেখেছিলো। চকিতে জামার মধ্য থেকে পিস্তল বার ক'রে ওয়াল-স্টোনের বুকে সে পর-পর গুলি চালিয়ে দিলে।

ব্র্যান্‌ড্‌ ইতিমধ্যে নৌকোয় গিয়ে উঠেছিলো। গুলি খেয়েও টলতে-টলতে ওয়ালস্টোন গিয়ে নৌকোয় উঠলো। কুক তৈরিই ছিলো, তক্ষুনি সে নৌকো ছেড়ে দিলে।

আর সেই মুহূর্তেই আচম্বিতে যেন বিনা মেঘে বাজ ফেটে পড়লো। বাজ ফাটার মতোই ভীষণ শব্দে সমস্ত দ্বীপ কেঁপে উঠলো থর-থর, আর সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা কামানের গোলা এসে নৌকোয় পড়লো।

ফরাশি গুহা থেকে মোকো কামান ছুঁড়তে শুরু ক'রে দিয়েছে।

সভয়ে স'রে আসতে-আসতে ছেলেরা দেখতে পেলে, কামানের গোলায় নৌকো আর তার আরোহীরা একেবারে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেছে—আর নদীর মধ্যে স্তম্ভের মতো ঝাঁপ দিয়ে উঠেছে জল।

একটু আলোড়ন, তারপরেই নৌকোর কিছু ভাঙাচোরা কাঠ ভেসে রইলো জলে—লোকগুলো যে কোথায় তলিয়ে গেলো তার কোনো হদিশই রইলো না।

banglabooks.in

১২

মুক্তির উপায়

কেটের অক্লান্ত সেবায় ডনাগান ধীরে ধীরে সেরে উঠছে, কিন্তু এখনও ভারি দুর্বল। অথচ একটা সময় এসেছিলো যখন সমস্ত গুহায় শোকের ছায়া নেমে এসেছিলো। মানুষের রক্তে তার হাত রাঙা হ'য়ে গেছে—এই হাত সে কী ক'রে ধুয়ে পরিষ্কার করে? এইসব প্রশ্নই তখন সে করতো বিকারের ঘোরে।

কেট অল্পবয়েস থেকেই অবসর সময়ে চিকিৎসা-শাস্ত্রের চর্চা করতেন—ডনাগানের সংকটাপন্ন অবস্থায় তার অগ্নিপরীক্ষা হ'য়ে গেলো।

ছেলেরা ফর্‌বস্‌কেও গুহায় নিয়ে এসেছিলো। কিন্তু তার আঘাত হয়েছিলো মারাত্মক, তাকে কিছুতেই বাঁচানো গেলো না। মরবার আগে তার একটুক্ষণের জন্যে জ্ঞান ফিরেছিলো। তাকে দুষ্কর্মের পথ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্যে তখন সে কেটকে আকুলভাবে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলো। অনুশোচনায় তার গলা ভারি আর আতুর হ'য়ে এসেছিলো—ছেলেদের কাছে সে অনুতাপ প্রকাশ ক'রে মার্জনা ভিক্ষা চেয়েছিলো।

ফ্রাঁসোয়া বদোয়াঁর কবরের কাছেই তাকে সমাহিত করা হ'লো। দুটি ক্রুশ-চিহ্ন দ্বীপের উপর দুই শোচনীয় মৃত্যুর অভিজ্ঞান হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো!

কিন্তু দ্বীপ এখনও সম্পূর্ণ শত্রুশূন্য হয়নি। কোপ আর রক এখনও বেঁচে আছে। আর যতদিন তারা স্বাধীনভাবে দ্বীপের উপর চলাফেরা করবে, ততদিন দ্বীপবাসীরা মোটেই নিরাপদ নয়—যে-কোনো সময়ে বিপদ ঘনিয়ে আসতে পারে। এটা ঠিক যে ওয়ালস্টোনের মৃত্যুতে তারা হালভাঙা নৌকোর মতোই বানচাল অবস্থায় পড়েছে, কারণ সে-ই ছিলো তাদের মাথা। কিন্তু তবু তাদের আদৌ বিশ্বাস নেই —কখন যে কী ক'রে বসবে, কেউ জানে না!

তাই ডনাগান একটু সেরে উঠতেই ইভান্‌স্‌ একদিন গরডন, ব্রিয়াঁ, বাক্সটার আর উইলকক্সকে নিয়ে তাদের খোঁজে বেরুলো। কোপকে অবিশ্যি বেশি খুঁজতে হ'লো না। ট্র্যাপ-উডে টুকতেই একটা গাছের তলায় তার গুলিবিদ্ধ আধপচা মৃতদেহ চোখে পড়লো—তখনও যে তা বুনো জানোয়ারদের চোখে পড়েনি তা-ই আশ্চর্য। কোপ তাহ'লে ওই সংঘর্ষের সময়েই মারা গেছে। কিন্তু রক? অনেক খোঁজাখুঁজি ক'রেও তার কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না।

রকের আশা ছেড়ে ওরা সেদিনকার মতো গুহায় ফিরে আসছিলো, হঠাৎ

banglabooks.in

উইলকক্স বললে, 'এতসব ঝামেলায় আর তালেগোলে অনেকদিন ফাঁদের ভিতরটা দেখা হয়নি। একবার দেখা যাক ভিতরে কোনো শিকার-টিকার পড়লো কি না।)'

এই ব'লে উইলকক্স ফাঁদের ডালপালা সরিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখেই স্তম্ভিত! তার বিস্মিত চীৎকার শুনে ফাঁদের ভিতরে তাকিয়ে অন্যদেরও চক্ষুস্থির।

ফাঁদের মধ্যে কোনো জন্তু ধরা পড়েনি, পড়েছে স্বয়ং রক। তার দেহে অবিশ্যি প্রাণ নেই। তখন ইভান্‌স্ বুঝতে পারলো পলায়মান রকের পিছনে সে যখন গুলি ছুঁড়েছিলো, তখন রক কেন অমন অদ্ভুত ও রহস্যময়ভাবে হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছিলো।

যাক, শত্রুরা তাহ'লে নির্মূল হয়েছে দ্বীপ থেকে। এবারে ডনাগান আরেকটু সেরে উঠলেই যাত্রার ব্যবস্থা করতে হবে। ইতিমধ্যে দস্যুদের সেই 'শ্লুপ' নৌকোটা মেরামত করা দরকার।

একদিন ইভান্‌স্ কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বীয়ার-রক-হারবার থেকে নৌকোটা উদ্ধার ক'রে নিয়ে এলো।

জানুয়ারি মাসের শেষদিকে নৌকোটা তৈরি হ'য়ে গেলো। নৌকোটা তৈরি হ'য়ে গেলেই প্রথমে তাতে যতটা সম্ভব দরকারি জিনিশপত্র বোঝাই করা হ'লো। খাবারদাবার, অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি, এমনকি লাইব্রেরির বইগুলো পর্যন্ত বাদ গেলো না। নৌকোটা মস্ত—অনেক জিনিশ ধরবে—অতজন মানুষ গেলেও কোনো অসুবিধে হবে না। ইভান্‌স্ অবিশ্যি জিনিশপত্রের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্ব দিলে ছেলেদের নোটের তাড়াকে—ছেলেদের জাহাজের সিন্দুকে এই তাড়া-তাড়া নোট ছিলো। দেশে ফেরবার সময় ওই টাকা তাদের সবচেয়ে কাজে লাগবে।

১৮৬২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তারা চারম্যান (ওরোফে হ্যানোভার) আইল্যাণ্ড ছেড়ে যাবে ব'লে ঠিক করা হ'লো, ৪ তারিখ বিকেলবেলায় তারা পোষা জানোয়ার-গুলিকে ছেড়ে দিলে। ছাড়া পেয়ে সব গুআনাকো, ভিক্যুনা, অস্ট্রিচ হুড়মুড় ক'রে ছুটে পালালো বনের মধ্যে।

'হতচ্ছাড়াগুলো কী বেইমান দেখেছো!' গারনেট বললে, 'একটা ধন্যবাদ দেয়ার তরও তাদের সইলো না! আরে বাপু, ছেড়েই তো দিচ্ছিলুম—তো অত তাড়া কীসের?'

'এই হচ্ছে জগতের নিয়ম!' এমন গম্ভীর ভাবে সারভিস কথাটা বললে যে না হেসে আর থাকতে পারলে না কেউ। সারভিস প্রায়ই এইসব আপ্তবাক্য আউড়ে তাদের মধ্যে হাস্যরোল তুলে দিতো।

banglabooks.in

সে-রাত্তিরে আর কারু চোখে ঘুম এলো না।

এই দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে এতদিন তারা কত চেষ্টাই না করেছে—কিন্তু আজ যখন ছেড়ে যাবার সময় হ'লো, তখন তাদের বড্ড মন-কেমন করতে লাগলো।

সত্যি, দিব্যি ছিলো তারা এই দ্বীপে।

১৩

দেশের ডাক

সাল ১৮৬২, তারিখ ৫ই ফেব্রুয়ারি, সময় প্রাতঃকাল। জ্বীল্যাণ্ড রিভারের উপর দিয়ে তরতর ক'রে একটা মস্ত নৌকো স্কুনার উপসাগরের দিকে ভেসে যাচ্ছে, আর নৌকোর গলুইয়ে পাটাতনে কি হালে ব'সে আছে অকল্যাণ্ডের চারম্যান বোডিণ্ড স্কুলের ছেলেরা ও মোকো, ইভান্‌স্ এবং কেট। দেখতে-দেখতে অকল্যাণ্ড হিলের সবচেয়ে উঁচু চূড়োটিও তাদের দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলো।

সেদিন ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখ, সেদিন ভোরবেলায় হঠাৎ সারভিস নৌকোর গলুই থেকে চীৎকার ক'রে উঠলো, 'ধোঁয়া! ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে!'

এই ক-দিন সমানে ইভান্‌সের নির্দেশমতো প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে তাদের নৌকোটি ভেসে গিয়েছে। সমুদ্র বেশ শান্ত, আবহাওয়া ভালো—দেখে কে বলবে যে এই সমুদ্রেরই জল একদিন তাদের জাহাজটা তাড়িয়ে নিয়ে এসে দ্বীপে আছড়ে ফেলেছিলো—অথচ এখন সামান্য নৌকোটাকে যেন আলগোছে রক্ষা ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের কিছুই ঠিক নেই। এই খুশি, এই রাগে অস্থির।

সারভিসের চীৎকার শুনে গরডন চটপট জিগেস করলে, 'কারু বন্দুকের ধোঁয়া?'

ইভান্‌স্ ততক্ষণে চোখে দুরবিন লাগিয়েছে। বললে, 'না, একটা ষ্টিমারের ধোঁয়া।'

ব্রিয়ঁ। তখন একেবারে মাস্তুলের ডগায় উঠে গেছে। সে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, 'জাহাজ, একটা জাহাজ!'

একটু পরেই তারা খালি চোখেই দেখতে পেলে, একটা প্রকাণ্ড কালো সদাগরি জাহাজ জল কেটে দ্রুতবেগে এগিয়ে আসছে।

banglabooks.in

ছেলেরা হাতের কাছে যা পেলো, নিশান রুমাল কি গায়ের জামা—সব ওড়াতে লাগলো। জাহাজ থেকে তারই উত্তরে শোনা গেলো বাঁশির শব্দ। নৌকোটা তবে তাদের চোখে পড়েছে! দশ মিনিট পরেই নৌকোর সতেরোজন আরোহীকে তাদের মালপত্র-সমেত 'গ্র্যাফটন' জাহাজে তুলে নৌকোটা জলে ভাসিয়ে দেয়া হ'লো। নৌকোটা ভাসতে-ভাসতে কিছুক্ষণের মধ্যেই দিগন্তে মিলিয়ে গেলো।

গ্র্যাফটন জাহাজের কাপ্তেনের নাম লঙ। ক্যাপটেন লঙ অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে যাচ্ছেন। দু-বছর আগেকার সেই নিরুদ্দিষ্ট ছেলেদের কথা সবাই জানতো, পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছিলো। এতদিন পরে সেই হারানো জাহাজের বালক আরোহীদের উদ্ধারের গৌরব লাভ ক'রে ক্যাপটেন লঙ আর নাবিকদের আনন্দের সীমা রইলো না।

জাহাজে তখন দস্তুরমতো হইচই প'ড়ে গেছে। নাবিকদের কে আগে চারম্যান আইল্যাণ্ডের গল্প শোনাবে, তাই নিয়ে ছেলেদের মধ্যে ঝগড়া বাধে আর কি। গতিক দেখে ক্যাপটেন লঙ বললেন, 'একজন সব গুছিয়ে বলুক।'

অমনি বাক্সটার বললে, 'আমিই বলবো। আমি সব আমার রোজনামচায় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখে রেখেছি।'

ক্যাপটেন লঙ বললেন, 'তাই নাকি? তাহ'লে তুমি আমাদের তোমার দিন-পঞ্জীটাই না-হয় প'ড়ে শোনাও।'

বলামাত্র বাক্সটার তার দিনপঞ্জী বার ক'রে সবাইকে প'ড়ে শোনাতে লাগলো।

তার একটানা উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে ছেলেদের চোখ স্বপ্নাতুর হ'য়ে উঠলো। সে একেকটা ক'রে ঘটনা বিবৃত করে, আর তাদের চোখের সামনে জীবন্ত হ'য়ে ভেসে ওঠে চারম্যান আইল্যাণ্ড। ভূগোল যা-ই বলুক, তাদের কাছে দ্বীপটা চির-কালই চারম্যান আইল্যাণ্ড থেকে যাবে।

গ্র্যাফটন তখন পূর্ণবেগে এগিয়ে যাচ্ছে। আর বার-বার কী-এক রহস্যময় উচ্চারণে ফেনিল হ'য়ে উঠছে প্রশান্ত মহাসাগরের সুদূরবিসারী নীল কান্তি।

বোধহয় সমুদ্রও বাক্সটারের মতো তাদের কোনো গল্প শোনাতে চাচ্ছে।

—

banglabooks.in

পারচেজ অব্ দি নর্থ পোল

banglabooks.in

'আপনি তা'হলে ধ'রে নিচ্ছেন মিস্টার ম্যাস্টন, যে কোনো মহিলাই গণিতশাস্ত্র বা ফলিত বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে সাহায্য করতে পারেননি ?'

'অত্যন্ত খেদের সঙ্গে এটা আমাকে মানতে হয়েছে, মিসেস স্করবিট,' উত্তর করলেন জে. টি. ম্যাস্টন। 'গণিতশাস্ত্রে কয়েকজন স্মরণীয়ার আবির্ভাব হয়েছিলো, বিশেষত রাশিয়ায়, আপনার এই মতে আমার সম্পূর্ণ সায় আছে। কিন্তু মেয়েদের মস্তিষ্কের গড়নটাই এ-রকম যে, একজন আর্কিমিডিস হ'য়ে ওঠা তাদের পক্ষে অসম্ভব—নিউটন তো নয়ই।'

'ওঃ, মিস্টার ম্যাস্টন! স্ত্রীজাতির পক্ষ থেকে আমাকে এ-কথার প্রতিবাদ করতে দিন!'

'স্ত্রীজাতি এমনিতেই এত মনোহর যে উচ্চতর শিক্ষায় তাকে নষ্ট ক'রে ফেলার অর্থ হয় না, মিসেস স্করবিট।'

'তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে কোনো আপেলের পতন দেখে কোনো নারীই মাধ্যাকর্ষণের তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পারতো না, যা তাকে সপ্তদশ শতকের সবচেয়ে বড়ো বৈজ্ঞানিক প্রতিভায় পরিণত করতো ?'

'মিসেস স্করবিট,' ম্যাস্টন বললেন, 'আপেল পড়তে দেখে মেয়েদের মনে একটি-মাত্র ভাবনারই উদয় হবে—কী ক'রে সেটা ভক্ষণ করা যায়, আদি মাতা ঈভ যা করেছিলেন।'

'আপনি তাহ'লে আমাদের কল্পনার সমস্ত প্রবণতা থেকেই বঞ্চিত ক'রে দিচ্ছেন ?'

'সমস্ত প্রবণতা ? উঁহু, তা নয়। তবে এটা আমি প্রমাণ ক'রে দিতে পারি যে যেদিন থেকে জগতে মানুষের আবির্ভাব হয়েছে, এবং সেইসঙ্গে নারীজাতিরও, সেই থেকে এতাবৎকাল পর্যন্ত এমন কোনো স্ত্রী-মেধার সন্ধান এখনও পাওয়া যায়নি, আরিস্ততল, ইউক্লিড, কেপলের, লাপলেস প্রভৃতির সঙ্গে যার তুলনা চলে।'

'এটা কি কোনো যুক্তি হ'লো ? আর তাছাড়া অতীত কি সর্বদাই ভবিষ্যৎকে প্রমাণ করে ?'

'তা, যে-ব্যক্তি হাজার বছরেও কিছু করলে না, সে যে কোনোদিনই কিছু

banglabooks.in

করবে না তাতে কি কোনো সন্দেহ আছে !'

'এবার তাহ'লে, মিস্টার ম্যাস্টন, আমাকে স্ত্রীজাতির পক্ষই নিতে হ'লো। বুঝতে পারছি যে আপনার মতে আমাদের কোনোই মূল্য নেই।'

'মূল্যের কথা যদি বলেন···' ম্যাস্টন শুরু করলেন। যতটা বিনতি ও নম্রতা তাঁর পক্ষে আনা সম্ভব, তাঁর কণ্ঠস্বরে তার রেশ পাওয়া গেলো।

এতক্ষণ এই কথা শোনবার জন্যই উৎসুক ছিলেন মিসেস এভাঞ্জেলিনা স্করবিট। তুষ্ট হ'য়ে তক্ষুনি বললেন, 'প্রত্যেককেই জগতে নিজের ভাগ্য মেনে চলতে হয়। অসাধারণ বিশ্লেষণশক্তি আছে আপনার, তাই বরং থাকুক আপনার। আপনারা সব বন্ধুতে মিলে যে-বিপুল কাজে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন, তাতে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করুন। আর সব মামলাতেই যেমন একজন ক'রে স্ত্রীলোক থাকে, আমি বরং সেই হিশেবেই আপনাদের কাজে আমার অর্থ নিয়োগ করি।'

'তাহ'লে আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা চিরন্তন হবে,' ম্যাস্টন উত্তর দিলেন।

এভাঞ্জেলিনা স্করবিট কিঞ্চিৎ আরক্ত হলেন ; কারণ জনরব বলে যে ম্যাস্টনের জন্য তাঁর মনে কোনো বিশেষ বেদনা আছে। উপরন্তু স্ত্রী-হৃদয় কি অকূল পাথারের মতোই রহস্যময় নয় ?

এই বিত্তশালিনী মার্কিন বিধবাটি যে কাজের জন্য বিপুল অর্থ নিয়োগ করার সংকল্প নিলেন তা কিন্তু বাস্তবিকই একটি মস্ত কাজ। পরিকল্পনাটি—আর তার সম্ভাব্য ফলশ্রুতি—সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হ'লো ম্যাপ্টেক্রন, রেকলুজ সাঁ-মার্ত্যা ও অন্যান্য ভৌগোলিকদের মত অনুযায়ী স্পষ্টত এইসব অঞ্চলের দ্বারা সুমেরুবলয় গঠিত : বাফিন সাগর ও ল্যাকাস্টার সাউণ্ডের তুষার-ঢাকা দ্বীপপুঞ্জ-সমেত উত্তর ডেভন, স্যাবাইন, বিয়াম-মার্ত্যা, গ্রিফিথ, কর্নোয়ালিস, বাথুর্স্ট দ্বীপপুঞ্জ ও মস্ত উপকূলসমেত উত্তর জর্জিয়া,—এবং বাফিন-প্যারির দ্বীপপুঞ্জ—ক্যাম্বারল্যাণ্ড, সাদাম্পটন, জেমস-সমারসেট, বুটিয়া ফেলিক্স, মেলভিল এবং প্রায়-অজ্ঞাত মেরুবৃত্তের বিপুল অংশ তার অন্তর্ভূত। ৭৮ ডিগ্রি অক্ষাংশ-স্পৃষ্ট এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ১,৪০০,০০০ বর্গমাইল স্থল ও কিঞ্চিদধিক ৭০০,০০০ বর্গমাইল জল আছে। এই বিরাট ভূভাগের মধ্যে আধুনিক কালের দুঃসাহসী আবিষ্কারকেরা কেবল ৮৪ ডিগ্রি অক্ষরেখা পর্যন্ত গেছেন, উঁচু তুষার-পাহাড় যেখানে শৃঙ্খলের মতো সমুদ্র-তীরকে ঢেকে রেখেছে সেই সুমেরু পর্বত ছাড়িয়েও তাঁরা গেছেন ; নানা অন্তরীপ, পাহাড়, উপসাগরের নাম দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু এই ৮৪ ডিগ্রি অক্ষরেখার পরপারে কী আছে, তা এখনো কেউ জানে

banglabooks.in

না। মানচিত্রশিল্পীদের অজ্ঞাত এই দেশ ; কেউ জানে না তার ওপাশে কী ঢাকা আছে—ডাঙা, না জল। সুমেরু-বিন্দু পর্যন্ত ওই ছয় ডিগ্রি অগম্য তুষার-স্তূপ, তা যে বাস্তবিক কী, তা এখনো দুরধিগম্য রহস্যে আবৃত থেকে গেছে।

বছরটা ১৮৯—, এমন সময় যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রথম এই সুমেরু বলয়ের অনাবিষ্কৃত অঞ্চল নিলেমে বিক্রি করার পরিকল্পনা করলেন। তার কিছুদিন আগেই এই সুমেরু বলয় কিনে নেবার জন্য একটি মার্কিন সংস্থা গ'ড়ে উঠেছিলো—তারা সরকারের অনুমোদন প্রার্থনা করলে।

এটা ঠিক যে কয়েক বছর ধ'রে জগতের বড়ো-বড়ো শক্তিগুলো নিয়ে বের্লিন সম্মেলন একটি বিশেষ পরিকল্পনার চেষ্টা করছিলেন ; যাতে তারা উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠা বা ব্যবসা-বিস্তারের যথাযোগ্য সুবিধা ও নির্দেশ পায়, তাই ছিলো এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। এই সংহিতা অবশ্য সবাই মেনে নেয়নি। সেইজন্যই মেরুবলয় এতকাল জনপদে পরিণত হয়নি। এবং যার মালিক আসলে কেউ নয় তা যে আসলে সকলেরই সম্পত্তি, এটা এই নবগঠিত মার্কিন সংস্থা জানতো ব'লেই তা একেবারে সরাসরি কিনে নিয়ে মালিকানা-সংক্রান্ত পরবর্তী দাবি-দাওয়া এড়াতে চাচ্ছিলো। আর যুক্তরাষ্ট্রে যখনি কোনো বলিষ্ঠ ও সাহসী প্রকল্পের জন্ম হয়েছে তখনি দেখা গেছে যে বিপুল অর্থ দিয়ে তাকে সমর্থন করার লোকের অভাব হয়নি। সব প্রস্তাবই তাদের কাছে দিব্যি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন এবং ব্যবহারিক প্রকল্প ব'লে মনে হয়।

এই মনোভাবটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিলো কয়েক বছর আগে যখন বাল্টিমোরের গান-ক্লাব কামানের গোলায় পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদের সঙ্গে একটা সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলো।* উৎসাহী মার্কিনিরাই কি তখন এর টাকা জোগায়-নি ? এই কৌতূহলোদ্দীপক ও রোমাঞ্চকর পরীক্ষাটির জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন ছিলো—কিন্তু সে-টাকা উঠতেও একটুও দেরি হয়নি। আর যদি সে-চেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হ'তো তাহ'লে কি এই অতিমানবিক কর্মটির উদ্যোগী গান-ক্লাবের দুঃসাহসী সভ্যদের আমরা ধন্যবাদ দিতুম না ? যদি কোনো সংস্থা প্রস্তাব করতো যে তারা ইয়োরোপে একেবারে চীন সাগর পর্যন্ত খাল কাটতে চায়, কিংবা কোনো সম্প্রদায় বলতো যে পাথরের স্তূপ খুঁড়ে-খুঁড়ে একেবারে পৃথিবীর তলায় গলিত জ্বলন্ত ধাতু-স্তূপ থেকে আগুন এনে নাগরিকদের ঘরোয়া চুল্লিতে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে, কিংবা কোনো উৎসাহী বিদ্যুৎবিশারদ যদি ভূত্বকের যাবতীয় বিক্ষিপ্ত বিদ্যুৎশক্তিকে

---

* জুল ভের্ন রচিত 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

আলো ও তাপের একটি মাত্র অফুরন্ত উৎসে ঐক্যবদ্ধ করতে উৎসুক হ'তো, বা কোনো দুঃসাহসী প্রয়োগবিদ এই পরিকল্পনা করতেন যে তিনি গ্রীষ্মকালের উদ্‌বৃত্ত তাপকে এক বিশাল সিন্দুকে জমিয়ে রেখে শীতকালে তুষারপাতের সময় তা ছড়িয়ে দেবেন তাহ'লে এটা ঠিক যে চাঁদার খাতায় সব-আগে নাম লেখাবার জন্য মার্কিনিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি প'ড়ে যেতো এবং মিসিসিপি-মিস্থরি যেমন অবাধে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, সমিতির সিন্দুকে তেমনি একটানা ডলারের স্রোত এসে পড়তো।

সুমেরুবলয় নিলেমে উঠছে এবং সবচেয়ে বেশি দাম যে হাঁকবে তাকেই এটা বেচে দেয়া হবে—এইসব দেখে-শুনে তখন যে নানা মুনি নানা মত ছড়াতে থাকবে, এতে অস্বাভাবিক কিছু সেই। সুমেরুবলয় কাজে লাগানো হবে? আরে, ডাহা উজবুক না-হ'লে কি এমন কথা ভাবতে পারে! সাধারণ অভিমত ছিলো এটাই।

অথচ এই পরিকল্পনার চেয়ে গভীর কোনো সংকল্প তখন আর ছিলো না। শুধু যে আমেরিকা মহাদেশের কাগজেই অনুষ্ঠান-পত্র পাঠানো হ'লো তা নয়; আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইয়োরোপ ও আমেরিকার সবগুলি কাগজেও যুগপৎ তা প্রকাশিত হ'লো। মার্কিন সংবাদপত্রে যে-ঘোষণাটি ছাপা হয়েছিলো, তা এই-রকম :

বিশ্ববাসীদের প্রতি উদ্দিষ্ট :

৮৪ ডিগ্রি অক্ষরেখা থেকে মেরুবিন্দু পর্যন্ত সুমেরুদেশ যে এতকাল নিলেমে বিক্রি হয়নি তার চমৎকার কারণটি এই যে, সেটা এখনও অনাবিষ্কৃতই থেকে গেছে। বিভিন্ন দেশের অভিযানকারীগণ কে কত ভিতরে গেছেন তার তালিকা এইরকম :

১৮৪৭ সালের জুলাই মাসে ইংরেজ অভিযানকারী প্যারী ৮২ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট অক্ষরেখায় পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু ছিলো অষ্টাবিংশতিতম মধ্যরেখা, পশ্চিম, এবং স্পিৎসবের্গ-এর উত্তর।

১৮৬৭ সালের মে মাসে সার জন জর্জেস নেয়ার্সের ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে মার্কহ্যাম ৮৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট ২৮ সেকেণ্ড-এ পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু পঞ্চাশত্তম মধ্যরেখা, পশ্চিম, গ্রীনল্যাণ্ডের উত্তরে।

১৮৮২ সালের মে মাসে লেফটেনাণ্ট গ্রীলির মার্কিন বাহিনীর লকউড আর ব্রেনার্ড পৌঁছেছিলেন ৮৩ ডিগ্রি ৩৫ মিনিট অক্ষরেখায়, সর্বোচ্চ বিন্দু দ্বিচত্বারিংশত্তম মধ্যবিন্দু, পশ্চিম, নেয়ার্সল্যাণ্ডের উত্তরে।

১৮৯৯ সালের মে মাসে ডিউক অব আব্রুজি ৮৬ ডিগ্রি ৩৪ মিনিট অক্ষরেখায় পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু ছিলো ষষ্ঠত্রিংশত্তম মধ্যরেখা, পশ্চিম, এবং ফ্রানৎস যোসেফ ল্যাণ্ডের উত্তর।

১৯০১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নরওয়েজীয় অভিযানকারী সভারড্রুপ ৮৪ ডিগ্রি অক্ষরেখায় পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু ছিলো ষষ্ঠত্রিংশত্তম মধ্যরেখা, পশ্চিম, এবং ফ্রানৎস যোসেফ ল্যাণ্ডের উত্তর।

১৯০২ সালের মে মাসে ডিউক অব আব্রুজি ৮৬ ডিগ্রি ৩৪ মিনিট অক্ষরেখায় পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু ছিলো ষষ্ঠত্রিংশত্তম মধ্যরেখা, পশ্চিম, এবং ফ্রানৎস যোসেফ ল্যাণ্ডের উত্তর।

১৯০৫ সালের এপ্রিল মাসে পিয়ারি ৮৭ ডিগ্রি ৬ মিনিট অক্ষরেখায় পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু ছিলো ষষ্ঠত্রিংশত্তম মধ্যরেখা, পশ্চিম, এবং ফ্রানৎস যোসেফ ল্যাণ্ডের উত্তর।

১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে ডিউক অব আব্রুজি ৮৬ ডিগ্রি ৩৪ মিনিট অক্ষরেখায় পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু ছিলো ষষ্ঠত্রিংশত্তম মধ্যরেখা, পশ্চিম, এবং ফ্রানৎস যোসেফ ল্যাণ্ডের উত্তর।

১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ডিউক অব আব্রুজি ৮৬ ডিগ্রি ৩৪ মিনিট অক্ষরেখায় পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু ছিলো ষষ্ঠত্রিংশত্তম মধ্যরেখা, পশ্চিম, এবং ফ্রানৎস যোসেফ ল্যাণ্ডের উত্তর।

১৯০৮ সালের মে মাসে ডিউক অব আব্রুজি ৮৬ ডিগ্রি ৩৪ মিনিট অক্ষরেখায় পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু ছিলো ষষ্ঠত্রিংশত্তম মধ্যরেখা, পশ্চিম, এবং ফ্রানৎস যোসেফ ল্যাণ্ডের উত্তর।

১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে পিয়ারি ৮৭ ডিগ্রি ৬ মিনিট অক্ষরেখায় পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু ছিলো ষষ্ঠত্রিংশত্তম মধ্যরেখা, পশ্চিম, এবং ফ্রানৎস যোসেফ ল্যাণ্ডের উত্তর।

১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে শাকলটন ৮৮ ডিগ্রি ২৩ মিনিট অক্ষরেখায় পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু ছিলো ষষ্ঠত্রিংশত্তম মধ্যরেখা, পশ্চিম, এবং ফ্রানৎস যোসেফ ল্যাণ্ডের উত্তর।

১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে পিয়ারি ৮৭ ডিগ্রি ৬ মিনিট অক্ষরেখায় পৌঁছেছিলেন—সর্বোচ্চ বিন্দু ছিলো ষষ্ঠত্রিংশত্তম মধ্যরেখা, পশ্চিম, এবং ফ্রানৎস যোসেফ ল্যাণ্ডের উত্তর।

১৯০৯ সালের এপ্রিল মাসে ডিউক অব আব্রুজি ৮৬ ডিগ্রি ৩৪

banglabooks.in

৮৪ ডিগ্রি অক্ষরেখা মেরুবিন্দু পর্যন্ত যে-ছয় ডিগ্রি ভূভাগ, তাকে জগতের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে এক অবিভাজ্য অঞ্চল ব'লে গণ্য করতে হবে ; নিলেমে চড়িয়ে তাকে ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করার অধিকার কারো নেই। এখানে কাউকে থাকতেই হবে, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। এই অঞ্চলের মালিকানা কারো নেই ব'লে, যুক্তরাষ্ট্র এটাকে বাসযোগ্য ও ব্যবহার্য ক'রে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থা নামে বাল্টিমোরে একটি সমিতি স্থাপিত হয়েছে। এই সমিতি সাধারণ বিধান অনুযায়ী এই ভূভাগ কিনে নেবার সংকল্প করেছেন, যার ফলে এই দেশের দ্বীপ, জল, স্থল অর্থাৎ সুমেরুর সবকিছুর উপর তাঁদের সম্পূর্ণ অধিকার বর্তাবে। জাতিপুঞ্জের বিধান অনুযায়ী এটা ধ'রে নেয়া হয়েছে যে যাই হোক না কেন এই স্বত্বাধিকারকে কিছুতেই স্পর্শ করা যাবে না। এই শর্তগুলি জগতের সব শক্তির কাছে তুলে ধরা হ'লো। নিলেমে উঠিয়ে সুমেরুকে তার কাছেই বিক্রি করা হবে শেষ পর্যন্ত যে সবচেয়ে চড়া দর দেবে। বর্তমান বর্ষের তেসরা ডিসেম্বর নিলেমের দিন ধার্য হয়েছে ; আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যাণ্ডের বাল্টিমোরের নিলাম-ভবনে এ কাজ সম্পন্ন হবে।

যাবতীয় তথ্য সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার সাময়িক এজেন্ট ডবলিউ. এস. ফর্স্টারের কাছে বাল্টিমোরের ৯৩ নং হাই স্ট্রিটে জানা যাবে।

এই ঘোষণা জনসাধারণ কেমনভাবে গ্রহণ করলো, পাঠক তা সহজেই অনুমান করতে পারবেন। অধিকাংশই ব্যাপারটাকে আজগুবি ব'লে উড়িয়ে দিলে। কেউ-কেউ এর মধ্যে মার্কিনি ধাপ্পার নজির খুঁজে পেলে। আবার অনেকের মনে হ'লো এই প্রস্তাব যথেষ্ট পরিমাণে বিবেচনাযোগ্য ; এই নবগঠিত সংস্থা যে কারো কাছে চাঁদা না চেয়ে নিজেদের মূলধনের উপর নির্ভর করেছে, এই তথ্যটায় তাঁরা অঙ্গুলি-নির্দেশ করলেন। নিজেদের টাকাতেই তারা সুমেরু কিনে নিতে চাচ্ছে। সংস্থার কর্তৃপক্ষ তো সোনাদানা বা ব্যাঙ্কনোট ঠকিয়ে নিয়ে নিজেদের পকেট ভারি করতে চাচ্ছে না ! না, তারা কেবল নিজেদের টাকায় মেরুদেশ নেবার অনুমতিটুকু চাচ্ছে।

কোনো-কোনো বহুদর্শী বললেন যে ওই সংস্থা ইচ্ছে করলে কোনো হৈ-চৈ না ক'রে অনায়াসেই ওখানে গিয়ে মেরুদেশের স্বত্ব নিতে পারতো, কেননা অজানা অঞ্চলে প্রথম বাসিন্দাদের অধিকার সর্ব-স্বীকৃত। কিন্তু ঝামেলাটার সূচনাই এখানে, কারণ এতাবৎকাল মেরুদেশ যেন প্রায় সর্বজননিষিদ্ধ দেশ ছিলো। সেইজন্যই যুক্তরাষ্ট্র স্বত্ব-দান করলে পরে যদি কোনো গণ্ডগোল পাকিয়ে ওঠে, তাহ'লে সংস্থা

banglabooks.in

ঝামেলায় পড়বে। এই ঝামেলা এড়াতে চায় ব'লেই সংস্থা মেরুদেশের সম্পূর্ণ স্বত্ব চাচ্ছে। তাদের দোষারোপ করাটা অন্যায় হবে, কেননা এইসব কাজে যথাসম্ভব সতর্কতা অবলম্বন করা ভালো। উপরন্তু ঘোষণার একটি অংশে ভবিষ্যতের সমস্ত দিকেই দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। এই অংশটার ব্যাখ্যা এত রকম হ'তে পারে যে তন্নতন্ন ক'রে পড়েও তার সঠিক তাৎপর্য আবিষ্কার করা কারো পক্ষে সম্ভব হ'লো না। সেখানে এটাই বলা হয়েছে যে মেরুদেশের অবস্থিতি বা জলবায়ুর যে-কোনো রূপান্তরই হোক না কেন, মালিকানা-স্বত্বের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই স্বত্বাধিকারটি বস্তুত আবহাওয়া বা অবস্থান-নিরপেক্ষ। এখন, এই কথার আসল অর্থটা কী হ'তে পারে? অবস্থান বা জলবায়ু-ঘটিত এমন কী পরিবর্তন এ-দেশের পক্ষে সম্ভব? বিচক্ষণেরা মন্তব্য করলেন, 'নিশ্চয়ই এর মধ্যে কোনো গোপন মতলব আছে।' ভাষ্যকারদের স্বাধীনতা অবশ্যই অবাধ, এবং সোৎসাহে এই স্বাধীনতা তাঁরা ব্যবহার করলেন। ফিলাডেলফিয়ার একটি কাগজে এই মুখরোচক বিজ্ঞপ্তি দেখা গেলো : 'সুমেরু অঞ্চলের ভাবী ক্রেতারা নিশ্চয়ই গোপনে খবর পেয়েছেন যে ভবিষ্যতে এক প্রচণ্ড ধূমকেতু এই জগতের সঙ্গে প্রচণ্ড এক সংঘর্ষ বাধাবে যার ফলে ভৌগোলিক ও আবহাওয়া-ঘটিত নানা পরিবর্তন দেখা দেবে এবং ক্রেতারা মস্ত লাভ করবেন।'

চিন্তাশীল লোকেরা অবশ্য ধূমকেতুর সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনাটাকে কোনো পাত্তা দিলে না। বিশেষত, ধূমকেতু নিশ্চয়ই আগে থেকেই গোপনে ক্রেতাদের খবর পাঠায়নি!

ফলে নিউ-অর্লীন্সের একটি কাগজে লিখলো, 'সম্ভবত এই নতুন সমিতি মনে-মনে ভাবছেন যে কালক্রমে বিষুবরেখার স্থান পরিবর্তন ঘটবে, আর তার ফলে এই অঞ্চল ব্যবহারযোগ্য হ'য়ে উঠবে।'

'সে-সম্ভাবনা কি একেবারেই নেই? কেননা মেরুরেখার গতিকে তা-ই তো টেনে রাখে।' আরেকজন সংবাদদাতার মন্তব্য।

'বাস্তবিক,' লিখলো পারীর সায়েন্টিফিক রিভিউজ, 'আদেমার তো আগেই তাঁর সমুদ্রস্রোত-সম্পর্কিত বইতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে নিরক্ষরেখার স্থানচ্যুতি এবং মেরুদেশের গতি যুগ্মভাবে দীর্ঘকাল পরে জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপ-মাত্রায় এবং মেরুদেশের স্তূপীকৃত তুষারের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনবে।'

'কথাটা নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না,' এডিনবরার কাগজের উত্তর পাওয়া গেলো, 'তাছাড়া না-হয় মেনেই নেয়া গেলো যে এই ধারণাই ঠিক, কিন্তু এই গতির

'সে-সম্ভাবনা কি একেবারেই নেই? কেননা মেরুরেখার গতিকে তা-ই তো টেনে রাখে।' আরেকজন সংবাদদাতার মন্তব্য।

'বাস্তবিক,' লিখলো পারীর সায়েন্টিফিক রিভিউজ, 'আদেমার তো আগেই তাঁর সমুদ্রস্রোত-সম্পর্কিত বইতে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে নিরক্ষরেখার স্থানচ্যুতি এবং মেরুদেশের গতি যুগ্মভাবে দীর্ঘকাল পরে জগতের বিভিন্ন অঞ্চলের তাপ-মাত্রায় এবং মেরুদেশের স্তূপীকৃত তুষারের মধ্যে আমূল পরিবর্তন আনবে।'

'কথাটা নিশ্চিত ক'রে বলা যায় না,' এডিনবরার কাগজের উত্তর পাওয়া গেলো, 'তাছাড়া না-হয় মেনেই নেয়া গেলো যে এই ধারণাই ঠিক, কিন্তু এই গতির

banglabooks.in

ফলে অভিজিৎ যখন মেরুতারা হবে, আর সুমেরুর জলবায়ু যখন বদলে যাবে, ততদিনে ১২,০০০ বছর কি কেটে যাবে না ?'

ক্যোবনহাভ্‌নের 'ডাড্‌ব্লাট' বললো, 'তা, ১২,০০০ বছরে নিশ্চয়ই প্রস্তুতির যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে ; তার আগে ঝুঁকি নেয়ার দরকার কী ? তার আগে এমনকি একটি সেণ্ট দেয়াও অপব্যয়।'

আমাদের ধারণা সায়েন্টিফিক রিভিউজই নির্ভুল মত ব্যক্ত করেছে। কিন্তু এটাও হ'তে পারে যে নিরক্ষরেখার স্থানচ্যুতির উপর সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থা মোটেই নির্ভর করেনি। বস্তুত এই বিবৃতির শেষে যে-পরিবর্তনের উল্লেখ করা হয়েছিলো, তা দিয়ে কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে, তা কেউ স্পষ্ট বুঝতে পারলে না। হয়তো স্পষ্টভাবে জানতে গেলে নতুন সমিতির সম্পাদক বা সভাপতির কাছে চিঠি লিখলেই হয়। কিন্তু সভাপতি যে কে, তা-ই জানা গেলো না। সম্পাদক বা সংস্থার সদস্যদের নামও তেমনি অজ্ঞাত থেকে গেলো। এই বিজ্ঞপ্তিটি যে কোথেকে এসেছে, তা পর্যন্ত জানা গেলো না। নিউইয়র্কের খবর-কাগজগুলির আপিশে এই ঘোষণা পৌঁছে দিয়েছিলেন আরড্রিনেল কোম্পানির সদস্য বাল্টিমোরের এক কড মাছ বিক্রেতা—জনৈক উইলিয়ম এস. ফর্স্টার। পুরো ব্যাপারটাই এত গোপনে ও রহস্যময়ভাবে সাধিত হ'লো যে সেরা সাংবাদিকেরা পর্যন্ত এর কোনো হদিশই পেলেন না। সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থাটি এমন গোপন থেকে গেলো যে তার আসল নামটা পর্যন্ত জানা গেলো না। অবশ্য এই পরিকল্পনার উদ্যোক্তারা যদিও আত্ম-গোপন ক'রেই রইলেন, তবু সারা জগতে তাঁরা যে ঘোষণা ছাপালেন তাতে তাঁদের উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হ'লো।

মোদ্দা কথাটা তো আসলে এই : ৮৪ ডিগ্রি অক্ষরেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ সুমেরু-বৃত্তর ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু অঞ্চল সম্বন্ধে স্পষ্ট কিছুই তো জানা নেই। আধুনিক আবিষ্কর্তাদের মধ্যে অক্ষরেখার সবচেয়ে কাছাকাছি গিয়েছিলেন প্যারি, মার্কহ্যাম, লকউড ও ব্রেনার্ড। উত্তর সাগরের অন্যান্য নাবিকরা তারও অনেক আগেই থেমে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন : যেমন পাইয়েৎস্‌ ১৮৭৪ সালে নিউ জেম্বেলের ফ্রান্সিস জোসেফল্যাণ্ডের উত্তরে ৮২ ডিগ্রি ১৫ মিনিট পর্যন্ত গিয়েছিলেন ; ১৮৭০ সালে লে-উৎ গিয়েছিলেন সাইবেরিয়ার উত্তরে ৭২ ডিগ্রি ৭৪ মিনিট পর্যন্ত ; ১৮৭৯ সালের ইয়ানেৎ অভিযানের দ্য লঙ গিয়েছিলেন ৭৮ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট পর্যন্ত—ওখানকার দ্বীপপুঞ্জের নামকরণ হয়েছে তাঁরই নামে। অন্যরা নতুন সাইবেরিয়া ও গ্রীনল্যাণ্ড ঘুরে বিসমার্ক অন্তরীপের প্রান্ত পর্যন্ত গেছেন, কিন্তু ৭৬, ৭৭ বা ৭৮ ডিগ্রি

banglabooks.in

অক্ষরেখা কেউ পেরোতে পারেননি। সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থা তাহ'লে এমন ভূখণ্ড কিনতে চাচ্ছেন যেখানে এর আগে কোনো মানুষের পদস্পর্শ পড়েনি।

৮৪ ডিগ্রি অক্ষরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ এই ভূখণ্ড, অর্থাৎ ৮৪-তম থেকে ৯০ অক্ষরেখা পর্যন্ত এই ৬ ডিগ্রি জায়গায় আসলে ডিগ্রি-প্রতি ৬০ মাইল হিশেবে ৩৬০ মাইল ব্যাসার্ধের ও ৭২০ মাইল ব্যাসের জমি আছে। ফলে এর পরিধি হ'লো ২২৬০ মাইল, আর তল হ'লো ৪০৭ মাইল। অর্থাৎ সমগ্র ইয়োরোপের প্রায় এক-দশমাংশ। অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় ভূখণ্ড, সন্দেহ নেই। ঘোষণাপত্রেও বলা হয়েছে যে ভৌগোলিক দিক দিয়ে এ-অঞ্চল এখনো অজ্ঞাত থেকে গেছে, এবং কোনো বিশেষ মালিক নেই ব'লে সকলেই জায়গাটার মালিক। কিন্তু এটা অনুমেয় যে সংলগ্ন দেশগুলি অন্তত নিজেদের জমির উত্তর সীমার প্রসারণ মনে ক'রে কালক্রমে এর স্বত্ব দাবি ক'রে বসতে পারে। যে-সব আবিষ্কর্তা সমগ্র সুমেরুতে অভিযান চালিয়েছেন এবং স্বদেশের মহিমা বৃদ্ধি করেছেন, তাঁদের চেয়ে এই সমস্ত সংলগ্ন দেশের দাবি তখন হয়তো আরো সমর্থন পেয়ে বসবে। যুক্ত-রাষ্ট্রের সরকার সেইজন্যেই এই নব সমিতিকে ক্ষতির হাত থেকে বাঁচাবার জন্যও স্বত্বকে মূল্যবান করার জন্য আবেদন জানালেন। সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার সংশ্লিষ্ট কেউ অবশ্য এ-সব জানাননি। স্বত্বাধিকারের প্রশ্নটা অত্যন্ত স্পষ্ট হ'লো; এবং যেহেতু সুমেরুতে বসবাস করার জন্য ফতোয়া জারি করা হ'লো না সেইজন্য এই বিপুল অঞ্চলটি নিলামে তোলার বিরুদ্ধেও কোনো আপত্তি উত্থাপিত হ'তে পারলো না।

যে-সমস্ত দেশ সুমেরুর উপর দাবি জানাতে পারে এবং যাদের দাবি সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, তাদের সংখ্যা ছয়—আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন-নরোয়ে এবং হল্যাণ্ড। অন্যান্য দেশ এই ব'লে দাবি জানাতে পারে যে তাদের নাবিকরা নানা আবিষ্কারে অংশ নিয়েছে। মেরু-বিজয়ের অভিযানে যেহেতু অনেক ফরাশি অংশ নিয়েছিলো, সেইজন্য ফরাশি দেশ এসে নাক গলাতে পারে। অনেক আবিষ্কর্তাদের মধ্যে একজন হলেন দুঃসাহসী বেলো; তাঁর মৃত্যু হয়েছিলো ১৮৫৩ সালে, বীশে দ্বীপপুঞ্জে—স্যার জন ফ্র্যাঙ্কলিনের সন্ধানে যে ফীনিক্স অভিযান প্রেরিত হয়েছিলো, বেলো ছিলেন তাঁদেরই একজন। ডক্টর অকতেভ পাভির কথাও ভুলে গেলে চলবে না; গ্রীলি অভিযাত্রীরা যখন ফোর্ট কনগেরে, তখন ১৮৮৪ সালে স্যাবাইন অন্তরীপের কাছে তাঁর মৃত্যু হয়। আর ১৮৩৮-৩৯ সালে যে-অভিযান শার্ল মার্মি, ব্রাভায়া ও তাঁর নির্ভীক সহযাত্রীদের নিয়ে স্পিৎসবের্গ সমুদ্রে পাড়ি

banglabooks.in

দিয়েছিলো তাঁদের কথা ভুলে গেলেও অন্যায় হবে। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও ফ্রান্স এই ব্যাপারে মাথা গলালো না, কেননা তার কাছে ব্যাপারটা বৈজ্ঞানিক প্রয়াস মনে না-হ'য়ে বরং সদাগরি প্রচেষ্টা ব'লে মনে হ'লো। সে এই মেরুদেশের সর্বস্বত্ব ত্যাগ করলে। জার্মানিও তা-ই। ১৬৭১-এর পরে জার্মানি ফ্রেডেরিক মার্টেনস-এর নেতৃত্বে স্পিটস্‌বের্গেন-এ হামবুর্গ অভিযান পাঠিয়েছিলো; ১৮৬৯-৭০-এ 'জার্মানিয়া' আর 'হান্‌সা' নামে আরো দুটি অভিযান হয়েছিলো কোল্ডেরফি ও হেগেমান-এর নেতৃত্বে এবং তাঁরা গ্রীনল্যাণ্ডের উপকূল দিয়ে মাত্র বিসমার্ক অন্তরীপ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। কিন্তু জার্মানি যদি আরো অনেক উজ্জ্বল আবিষ্কারে অংশ নিতো, তবু মেরুদেশ জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করার কোনো তাগিদ তাদের থাকতো না। অস্ট্রিয়ার বেলাতেও এই কথা প্রযোজ্য, যদিও সাইবেরিয়ার উত্তরে ফ্রান্সিস জোসেফ এলাকার মালিক ছিলো তারাই। আর ইতালির আপত্তি জানাবার কোনো অধিকার ছিলো না ব'লে সে কোনো উচ্চবাচ্যই করলে না; ব্যাপারটা আশ্চর্য হ'লেও সত্যি। তারপরে, ওই অঞ্চলে যাদের বাস সেইসব আদিবাসীদের এই ব্যাপারে কিছুই বলার ছিলো না। তাছাড়া বেচারিদের বলারই বা কী থাকতে পারে—সেই সামান্য টাকাও তাদের ছিলো না যা দিয়ে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার কাছ থেকে ওই অঞ্চলটা কিনে নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হ'তো; শুধু হয়তো নানা পশুচর্ম, পশুদন্ত বা তেল বেচে তারা কিছু টাকা ওঠাতে পারতো। অথচ অন্যদের চেয়ে এই দেশে তাদেরই দাবি ছিলো বেশি প্রবল—কেননা নিলেমে যে জায়গাটা বিক্রি হ'তে যাচ্ছে তার প্রথম বাসিন্দা তো তারাই। কিন্তু এস্কিমো, চুক্‌চি বা সামোয়েডিজদের কোনো কথা জিগেসই করা হ'লো না। চরাচরের রীতিই এই।

২

একটা বিষয় তৎক্ষণাৎ সমস্ত জগতের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো। নতুন সংস্থাটি যদি সুমেরুবৃত্ত কিনে নিতে পারে, তাহ'লে ওই অঞ্চল সম্পূর্ণভাবে আমেরিকা অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে চ'লে যাবে; আর যুক্তরাষ্ট্র তো প্রতিক্ষণেই একটা-কিছু হস্তগত করার তাল খুঁজছে। প্রতিদ্বন্দ্বী সরকারদের কাছে এটা মোটেই মধুর ব'লে বোধ হ'লো না। তবু ইয়োরোপ আর এশিয়ার যে-সব দেশ মেরুবলয়ের নিকটবর্তী

banglabooks.in

নয়, তারা এই প্রস্তাবিত নিলেমে অংশ নিতে চাইলো না, কেননা এর প্রতিক্রিয়া তাদের কাছে জটিল ও রহস্যময় ঠেকলো। শুধু যে-সব দেশের ভূখণ্ড চুরাশি ডিগ্রি অক্ষরেখাকে ছুঁয়ে গেছে, তারাই সরকারিভাবে প্রতিনিধি পাঠিয়ে নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তুলতে চাইলো। শুধু এটুকু প্রতিক্রিয়াই তাদের মধ্যে দেখা গেলো। এমনকি যৎসামান্য মূল্যেও তারা সেই ভূখণ্ড কেনার কথা ভাবতে পারলে না, যাকে কাজে খাটাবার চেষ্টাটা নিছকই একটি সম্ভাবনা মাত্র। সব ব্যাপারেই যেমন দেখা যায়, এ-ব্যাপারেও তেমনি অতৃপ্ত ইংল্যাণ্ড তার অর্থসচিবদের জাঁকজমক দেখাতে নির্দেশ দিলে। মেরুবৃত্তের স্বত্বত্যাগ ইয়োরোপে কোনো বিপত্তিরও কারণ হবে না, কিংবা কোনো আন্তর্জাতিক জটিলতার সৃষ্টি করবে না। মহামহিম আয়রন চ্যান্সেলর হের ফন বিসমার্ক তখনও বেঁচে, কিন্তু তাঁর ভুরুযুগল একবারও কুঞ্চিত হ'লো না। বাকি রইলো কেবল ইংল্যাণ্ড, দিনেমারদেশ, সুইডেন, নরোয়ে, ওলন্দাজ দেশ আর রাশিয়া—তারা নিলেমে হাজির থাকবে ব'লে ঠিক করলো, শুধু তাই নয়, বাল্টিমোরের কমিশনারের কাছে যুক্তরাষ্ট্র যত দর হাঁকবে তার চেয়ে বেশি দর হাঁকবে ব'লেও তারা স্থির করলে।

মেরুবৃত্তের মূল্য নির্ধারণ করাও বড়ো কঠিন কাজ, কেননা ব্যবসার দিক থেকে তার গুরুত্ব কতখানি, তা কেউই জানে না। হঠাৎ যদি কোনো সুবিধে পেয়ে যায় —এই বোধটাই নিলেমে প্রতিনিধি পাঠাবার প্রধান কারণ।

সুমেরুবিন্দু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই বিরাট ভূখণ্ডের উপর তাদের স্বত্বাধিকার আছে, ৭২ ডিগ্রি অক্ষরেখার পরপারে অবস্থিত উত্তর অন্তরীপের মালিক যে তারাই, নরোয়ে-স্যুইডেন এই তথ্য চেপে রাখার কোনো চেষ্টাই করলে না। ডেভিস প্রণালীর ডিস্কো দ্বীপ দিনেমার উপনিবেশ ব'লে ডেনমার্ক বললে যে মেরুবৃত্তের দ্বীপমালা আরা গিরিখাতে ইতিমধ্যেই তাদের অধিকার বর্তেছে। তারা উপনিবেশ বসিয়েছে বাফিন সাগরের হোলস্টাইন, প্রভেন, গডহাভেন, উপেরাফিক-এ; গ্রীন-ল্যাণ্ডের পশ্চিম উপকূলেও তাদের শিবির আছে। তাছাড়া বিখ্যাত নাবিক বেরিং (বেরিং আসলে দিনেমার, কিন্তু তখন চাকরি করতেন রাশিয়ায়) ১৭২৮ সালে এই প্রণালী পেরিয়ে যান; পরে তাঁর নামেই ওই প্রণালীর নাম হয়। তেরো বছর পরে আবারও তিনি আরেকটি অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যে ত্রিশজন সহযাত্রীসহ ছোট্ট একটা দ্বীপে তাঁকে মরতে হয়—আর ওই দ্বীপও তো তাঁর মহান নাম এখনো বহন করছে। ১৬১৯ সালে জাঁ মুস্ক কি গ্রীনল্যাণ্ডের পূর্ব উপকূলে অভিযান চালিয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কতগুলি অন্তরীপ

banglabooks.in

আবিস্কার করেননি ? সেইজন্য—ডেনমার্কের বক্তব্যের নির্যাস—এতদঞ্চলে তার বিতর্করহিত স্বত্ব র'য়ে গেছে।

ওলন্দাজদের দাবিও নেহাত ফ্যালনা নয়। ষোলো শতকের শেষ ভাগে বারেনৎজ্ আর হেম্স্কের্ক স্পিটসবের্গেনও নিউজীল্যাণ্ডে গিয়েছিলেন। জঁা মাইয়ে নামে যে নির্ভীক অভিযাত্রী উদীচী-বিজয়ে বেরিয়েছিলেন, এবং পরবর্তীকালে একটি দ্বীপের নামও যাঁর নামে হয়েছিলো, তিনিও তো ওলন্দাজ। দ্বীপটি ৭২ ডিগ্রি অক্ষরেখার নিচেই অবস্থিত। সেইজন্য হল্যাণ্ড ভাবলে যে তার অতীত তাকে এই অঞ্চলের স্বত্বাধিকার দিয়েছে। রাশিয়ারও তেমনি আলেক্সি চিরিকফ আছেন, বেরিং যাঁর অধীনে কর্ম নিয়েছিলেন ; আছেন পাউলুটস্কি, ১৭৫১ সালে যাঁর অভিযান হিমমুকুট স্পর্শ করেছিলো ; আর আছেন ক্যাপ্টেন মার্টিন স্পাঙবের্গ ও লেফটেনাণ্ট উইলিঅম ওআলটন, যাঁরা ১৭৩৯ সালে এই অজ্ঞাত অঞ্চলে যাবার দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন এবং যাঁদের সাহায্যে এশিয়া ও আমেরিকার বিভাজক সেই উপসাগরটি আবিষ্কার করার কাজে রাশিয়া উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলো। অধিকন্তু সাইবেরিয়ার অবস্থানও যেহেতু ১২০ ডিগ্রি থেকে শুরু ক'রে কামচাটকা অর্থাৎ এশীয় উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত, সেইজন্য এটা কি বলা বাহুল্য নয় যে উদীচীর মহাসমুদ্রের অর্ধেকেরই শাসক তারা ? এই অঞ্চলের চুক্চি, ইয়াকুট প্রমুখ নানা বিজিত উপজাতির উপর তাদের অধিকার নেই কি ? তাছাড়া মেরুবিন্দু থেকে নশো মাইলের মধ্যে ৭৫ ডিগ্রি অক্ষরেখায় যে-নতুন-সাইবেরিয়া ও লিয়াটকঙ দ্বীপপুঞ্জ আছে (অষ্টাদশ শতকে যে-দ্বীপগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিলো), তার স্বত্বও কি তার নয় ? এবং শেষত, ১৭৬৪ সাল থেকে ইংরেজ, মার্কিন বা স্ক্যাইডদের অনেক আগেই নাবিক চিট্ট্সচাসফ উদীচীতে দুই মহাদেশে যোগাযোগের জন্য একটি ছোটো রাস্তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করেননি কি ? অথচ এ-সব তথ্যকে পাত্তা না-দিয়ে মার্কিনিরাই কিনা এই অগম্য হিমমুকুটকে অধিকারে আনার জন্য জগতের মধ্যে সবচেয়ে উদ্গ্রীব ও ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে ! তারা অবশ্য বারবার এটাকে দখল কববার চেষ্টা করেছে। সেইজন্যই গ্রিনেল, কেন, হেইস, গ্রীলি, দ্য লঙ এবং অন্যান্য নির্ভীক নাবিকেরা সার জন ফ্র্যাঙ্কলিনের সন্ধানে বেরিয়েছিলেন। তাছাড়া তারা আমেরিকার ভৌগোলিক অবস্থানের কথা তুলেও দাবি জানাতে পারে। মেরুবৃত্তের বেরিং সাগর থেকে হাডসন উপসাগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এই মহাদেশ। তাছাড়া ওলাস্টোন, প্রিন্স অ্যালবার্ট, ভিক্টোরিয়া, কিং উইলিঅম, মেলভিল, ককবার্ন, ব্যাঙ্কস, বাফিন দ্বীপপুঞ্জের অন্য সব ছোটো-দ্বীপের কথা না-হয় বাদই

banglabooks.in

থাক—কি পাতার মতো নব্বুই ডিগ্রির দিকে ছড়িয়ে প'ড়ে নেই? তারপর যদি এটা স্বীকার ক'রে নেয়া হয় যে জগতের যে-কোনো একটি মহাদেশের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে সুমেরু সংলগ্ন থাকবে তাহ'লে এশিয়া ও ইয়োরোপের চেয়ে আমেরিকার দাবিই কি আরো প্রবল হ'য়ে ওঠে না? সেইজন্যই কোনো মার্কিনি সংস্থার সুবিধের জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকার যদি এই ভূখণ্ড কিনে নেবার কথা তোলে তাহ'লে তার চেয়ে স্বাভাবিক আর-কিছুই হ'তে পারে না।

যদি মেরুবৃত্ত দখলকরার জন্য কারো তর্কাতীত আধুনিক দাবি থেকে থাকে তো তা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের। অবশ্য গ্রেট ব্রিটেনের দাবিও মোটেই উড়িয়ে দেয়া চলবে না। ক্যানাডা ও ব্রিটিশ কলম্বিয়া তাদের অধিকারে আছে। তাছাড়া অসংখ্য ব্রিটিশ নাবিক সুমেরুতে অভিযান করেছিলেন ব'লে তাদের বিশাল সাম্রাজের সঙ্গে এই উদীচীকে জুড়ে দেবার যথেষ্ট সংগত কারণ তাদের আছে। নানা ইংরেজি কাগজে এ-বিষয়ে বহুদিন ধ'রে অনেক বাগ্-বিতণ্ডা হ'লো, বিস্তৃত আলোচনা হ'লো। লণ্ডনের এক কাগজে একটি নিবন্ধে বিখ্যাত ইংরেজ ভৌগোলিক ক্লিপট্রিনগান যখন বললেন, 'নিঃসন্দেহে দিনেমার, ওলন্দাজ, রুশ ও মার্কিনিরা তাদের জন্য সুকীর্তির গর্ব করতে পারে,' তখন মস্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হ'লো। ইংল্যাণ্ড কিছুতেই এই মেরুদেশকে হারাতে পারে না। মহাদেশের এই উত্তরাঞ্চল কি এখনো তাদের হ'য়ে ওঠেনি? যে-সব এলাকা আর দ্বীপপুঞ্জ দিয়ে উদীচী গঠিত, সেইসব কি ইংরেজ নাবিকদের দ্বারাই আবিষ্কৃত হয়নি? উইলোবি কি ১৭৩৯ সালে স্পিট্‌স্‌বের্গেন ও নিউজীল্যাণ্ড যাননি? ১৮৫৩ সালে ম্যাক-ক্লিণ্টরের জলপোত কি উত্তর-পশ্চিমে যাবার রাস্তা বের করেনি? তাছাড়া ফ্রবিশার, ডেভিস, হল, উয়েমাউথ, হাডসন, বাফিন, কুক, রস, প্যারী, বেচে, বেলচার, ফ্র্যাঙ্কলিন, মালগ্রেভ, স্কোর্সবি, ম্যাকক্লিটন, কেনেডি, নেয়ার্স, কলিন্সন, আর্চার কি মূলত অ্যাংলো-স্যাক্সন নন? এঁরা যে-সব অংশ আবিষ্কার করেছেন সুমেরু-বৃত্তের সেইসব অংশে অন্য-কোনো দেশের দাবি কি ন্যায্য হ'তে পারে? শুনে কালিফোর্নিয়ার এক কাগজ বললে, 'বেশ, তাহ'লে বাস্তব অবস্থাটা বিচার ক'রে দেখা যাক—ইংল্যাণ্ড আর যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কার দাবি বেশি ন্যায্য। নেয়ার্স অভিযানের ইংরেজ মার্কহ্যাম যদি ৮৩ ডিগ্রি ২০ মিনিট পর্যন্ত গিয়ে থাকেন, তাহলে গ্রীলি অভিযানের লকউড ও ব্রেনার্ড যে ৮৩ ডিগ্রি ৩৫ মিনিট পর্যন্ত গিয়েছিলেন, সেই তথ্যও মনে রাখা উচিত। এখন জিজ্ঞাস্য এই, সুমেরুবিন্দুর সবচেয়ে কাছাকাছি আসার সম্মান কার প্রাপ্য?'

banglabooks.in

নানা দেশের দাবি ও যুক্তি ছিলো এইরকম পরস্পরবিরোধী। কিন্তু এর মধ্যে থেকে একটা জিনিশ স্পষ্ট বোঝা গেলো যে, লড়াইটা শেষ পর্যন্ত হবে মার্কিনি ডলার আর ইংরেজি পাউণ্ড-স্টার্লিংএ। তবু সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার প্রস্তাব অনুযায়ী সব দেশেরই মত নেয়া ভালো—নিলেমে সকলকে সুযোগ দেয়াও সংগত। নিলেম হবে বাল্টিমোরে, ডিসেম্বর মাসের তিন তারিখে। নিলেম ক'রে যে-টাকা পাওয়া যাবে তা ব্যর্থ ক্রেতাদের মধ্যে ভাগ ক'রে দেয়া হবে। ভবিষ্যতে সুমেরুতে তাদের কোনো দাবি থাকবে না, এই টাকা তারই ক্ষতিপূরণ আর-কি। প্রতিনিধিরা সকলে নানা কাগজপত্র নিয়ে লণ্ডন, দি হেগ, স্টকহোল্‌ম, ক্যোবনহাভন, সেণ্ট-পিটার্সবুর্গ ত্যাগ করলেন এবং নিলেমের তিন সপ্তাহ আগেই বাল্টিমোরে এসে উপস্থিত হলেন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমেরিকার প্রতিনিধি বলতে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার ডবলিউ. এস ফর্স্টারই কেবল ছিলেন। ইয়োরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধি হিশেবে যাঁরা এলেন তাদের তালিকা এই :

হল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে এলেন জাক জানসেন, আগে তিনি ছিলেন ওলন্দাজ ইণ্ডিজের উপদেষ্টা, বয়স তিপান্ন বছর, বলিষ্ঠ, খর্বকায়, সুগঠিত, ছোটো-ছোটো বাঁকা পা, উজ্জ্বল সুগোল মুখ, পক্ককেশ মানুষটি বেশ যোগ্যতা ধরেন, কিন্তু এমন-একটি কাজের ভার নিয়ে এসেছেন যার বাস্তব ফলাফল কী হবে তা তিনি কিছুতেই ভেবে পাচ্ছিলেন না।

দিনেমার প্রতিনিধি হলেন এরিক বালডেনাক, আগে ছিলেন গ্রীনল্যাণ্ডের উপ-রাজ্যপাল। উচ্চতা মাঝারি, ঈষৎ নুব্জ, মস্তকটি মস্ত ও গোল, চোখে এত কম দ্যাখেন যে বইপত্র একেবারে নাকের ডগায় তুলে নেন, স্বদেশকেই তিনি উদীচীর বিধিসংগত স্বত্বাধিকারী মনে করেন ব'লে অন্য-কেউ তাঁর দেশের বিরুদ্ধে কথা বলতে গেলে কিছুতেই শুনতে চান না।

নরোয়ে স্যুইডেনের পক্ষ সমর্থন করতে এলেন ইয়ান হারাল্‌ড। ক্রিষ্টিয়ানায় বিশ্বগঠনতত্ত্ব পড়ান, মানুষটি খাঁটি উদীচীর। লালমুখো, গুম্ফশ্মশ্রুমণ্ডিত ও স্বর্ণকেশ, মেরুসাগরে-গড়া মেরুবলয়ের যে কোনোই দাম নেই এটা তাঁর কাছে বেদবাক্য ব'লে মনে হয়। ফলে পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধেই তাঁর কোনো কৌতূহল বা আকর্ষণ নেই, কেবল দায়সারাভাবে কর্তব্যপালনের জন্য এসেছেন।

রাশিয়ার প্রতিনিধি কর্নেল বরিস কার্কফ আধা-মিলিটারি আধা-কূটনৈতিক মানুষ ; ছোটো-খাটো মোটা-শোটা, শক্ত, খোঁচা-খোঁচা গোঁফ, নাগরিক পোশাকে একটু অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন ব'লে মনে করেন। কোমরে তলোয়ার ঝুলতো ব'লে

banglabooks.in

অন্যমনস্কভাবে কোষে হাত দিয়ে ফ্যালেন। সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার প্রস্তাবের পিছনে আসল উদ্দেশ্য কী এই নিয়ে অতিশয় উদ্বিগ্ন ও ভাবিত : পরে হয়তো এ থেকে কোনো আন্তর্জাতিক বিপৎপাত সূচিত হবে, এই আশঙ্কায় কিঞ্চিৎ বিচলিত।

আর ইংল্যাণ্ড থেকে সেক্রেটারি ডীন ট্রুড্রিঙ্ককে নিয়ে এলেন মেজর ডনেলান। গ্রেট ব্রিটেনের রুচি ও আশা—সবকিছুরই প্রতিভূ এঁরা, বণিকবৃত্তি ও সদাগর বিদ্যায় উৎসুক ও আগ্রহী, তাছাড়া যে-দেশ মূলত কারো নয় তা যে আসলে প্রকৃতিদত্ত কারণেই গ্রেট ব্রিটেনের, এই কথা যে-কোনো ইংরেজের মতোই তাঁরা বিশ্বাস করেন। সত্যিকার ইংরেজ যদি কাউকে বলতে হয় তো সে এই মেজর ডনেলানকে : ঢ্যাঙা, কৃশকায়, অস্থিসার, নার্ভাস, ষাট বছর বয়সের পরেও পা-দুটি সুগঠিত ; ভারত-সীমান্তে কাজ করার সময়েই বোঝা গিয়েছিলো যে আসলে তিনি অক্লান্তকর্মী ; তখন তিনি একটুও হাসতেন না, বোধহয় কখনোই হাসেননি। তা হাসবেনই বা কেন ? কোন বাষ্পীয় পোত, রেল-ইঞ্জিন বা এলিভেটরকে কেউ কোনো-দিন হাসতে দেখেছে ? এইদিক থেকে তাঁর সেক্রেটারি ট্রুড্রিঙ্কের তিনি সম্পূর্ণ বিপরীত। কথা বলতে ভালোবাসেন ডীন ট্রুড্রিঙ্ক, স্বভাবটি মধুর. মস্তকটি মস্ত, চোখ ঢেকে কপালের ওপর চুলের গোছা এসে পড়েছে। রূপকথায় অনুরক্ত ও উৎফুল্ল এই মানুষটি বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু উৎফুল্ল হ'লে কী হবে, গ্রেট ব্রিটেনের কথা উত্থাপিত হ'লে তাঁর অহমিকাও অত্যন্ত উগ্র হ'য়ে দেখা যায়। মার্কিন সংস্থার প্রবলতম প্রতি-দ্বন্দ্বী আসলে এঁরাই। সুমেরু তো তাঁদেরই সম্পত্তি—চিরকালই তো তাঁদেরই ছিলো। পৃথিবী যে তার মেরুরেখার চারপাশে ঘুরে চলে, তার তত্ত্বাবধানের ভার যেন ঈশ্বর তাঁদেরই উপর ন্যস্ত করেছেন—এবং মেরুরেখা কোনো অজ্ঞাত হাতে তুলে দেবার ব্যাপারটায় যথাসাধ্য বাধা দেয়া তাঁদের কর্তব্য। এখানে এই কথাটা বলা ভালো যে ফ্রান্স কোনো প্রতিনিধি পাঠাবার প্রয়োজনীয়তাই অনুভব করেনি, তবে, একজন ফরাশি প্রয়োগবিদ মজা দেখবার জন্য নিলেমে হাজির হলেন। উত্তর ইয়োরোপীয় দেশগুলির প্রতিনিধিরা নানা স্টিমারে ক'রে বাল্‌টিমোরে এসে পৌঁছলেন—ভঙ্গিটা তাঁদের এই, যেন পরস্পরের সঙ্গে তাঁদের কোনো সম্বন্ধ নেই, আসলে তাঁরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। মার্কির সংস্থার সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হবার অস্ত্র প্রত্যেকের পকেটেই ছিলো, কিন্তু শক্তি সকলের সমান ছিলো না। কেউ হয়তো দশলাখ টাকা খরচ করতে পারে, কেউ বা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ বেশি। আর তাছাড়া বিশ্বের একটি অগম্য অঞ্চল কিনতে গিয়ে এত অর্থব্যয় একটু পীড়াদায়ক, সন্দেহ নেই। বস্তুত ইংরেজ প্রতিনিধিই ছিলেন সবচেয়ে সচ্ছল, কেননা সরকার তাদের

banglabooks.in

নামে বিস্তর টাকা জমা রেখেছিলেন। এতই মোটা টাকা যে স্ব্যইড, দিনেমার, ওল্‌দাজ, বা রুশ প্রতিদ্বন্দ্বীদের হঠিয়ে দিতে মেজর ডনেলানকে বোধহয় বেশি বেগ পেতে হবে না। তবে, আমেরিকার কথা অবশ্য আলাদা। এই ডলারের প্রস্রবণকে জয় করা বেশ কষ্টকর হবে ; অন্তত এটা নিশ্চয় যে এই রহস্যময় সংস্থা অজস্র অর্থ হাতে নিয়েই কাজে নেমেছে। ফলে সবচেয়ে বেশি দর নিশ্চয়ই কোটি টাকার অঙ্কে গিয়ে পৌঁছুবে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতাটা হবে ইংল্যাণ্ড আর আমেরিকার মধ্যে।

ইয়োরোপীয় প্রতিনিধিরা পৌঁছুবার সঙ্গে-সঙ্গেই জনমত আরো উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। কাগজে নানা অদ্ভুত ও পল্লবিত কাহিনী প্রকাশিত হ'তে লাগলো, নিলেমকে কেন্দ্র ক'রে প্রতিষ্ঠিত হ'লো নানা ভ্রান্ত মত। সুমেরুকে দিয়ে সংস্থাটি করবে কী ? কী করতে পারে তারা ? কিছু না ; কিংবা পুরো ব্যাপারটাই হয়তো হিমশৈলকে হস্তগত করার ফন্দি মাত্র। পারির 'ফিগারো' কাগজটি এই মত প্রচার করলে। কিন্তু তার জন্য তো প্রথমত চুরাশি ডিগ্রি অক্ষরেখার দক্ষিণে যেতে হয়।

কিন্তু জনরব যাই হোক না কেন, প্রতিনিধিরা অ্যাটলান্টিক পেরোবার সময় পরস্পরকে এড়িয়ে চললেও বাল্‌টিমোরে পা দিয়েই ক্রমশ পরস্পরের সান্নিধ্যে এসে পৌঁছুলেন। কারণ পৌঁছেই প্রতিনিধিরা আলাদা আলাদা ভাবে পরস্পরের অজ্ঞাতসারে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। ব্যাপারটার মধ্যে আসলে কী লুকিয়ে আছে, এবং নিলেমে সুমেরু কিনে নিয়ে সংস্থাই বা কী লাভ করতে চাচ্ছে—তাঁদের একমাত্র জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল ছিলো এই। কিন্তু বাল্‌টিমোরে সংস্থার কোনো কার্যালয় আছে কি নেই সেটাই কিছুতেই জানা গেলো না। কোনো কার্যালয় নেই, নেই এমনকি কোনো কর্মচারী ; শুধু জানা গেলো যে যাবতীয় তথ্যের জন্য বাল্‌টিমোরের হাই স্ট্রিটের উইলিয়ম এস. ফর্স্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে এবং এই কড মাছের ব্যাবসাদার যে রাস্তার কোনো কুলির চেয়ে এ-বিষয়ে বেশি কিছু জানে তা মনে হ'লো না। ফলে প্রতিনিধিরা তাঁর কাছ থেকে কিছুই জানতে পারলেন না। কাজেই অবিশ্বাস্য জনরবে অল্পবিস্তর আস্থা স্থাপন করতে তাঁরা বাধ্য হলেন। তাহ'লে কি দুর্ভেদ্য রহস্যের আড়ালেই এই সংস্থা আত্মগোপন ক'রে রইবে ? যতদিন না নিজে থেকে ধরা দিচ্ছে, ততদিন কি সত্যি তাকে জানবার উপায় নেই ? এই প্রশ্নটাই অতিকায় হ'য়ে উঠলো আস্তে-আস্তে। এটা স্পষ্ট, যে কিনে ফেলার আগেই এই সংস্থা কোনো তথ্যই জানাতে রাজি নয়। ফলে পরস্পরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ ক'রেই প্রতিনিধিরা আপাতত তুষ্ট রইলেন। পরস্পরের সঙ্গে দেখা হ'লো, হ'লো আলাপ, পরিচয় ও

banglabooks.in

ঘনিষ্ঠতা ; শেষকালে সম্ভবত তাঁরা একজোট হ'য়েই সাধারণ শত্রু অর্থাৎ মার্কিন সংস্থার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাইলেন। শেষে একদিন সন্ধেবেলায় তাঁরা উল্‌স্‌লি হোটেলের একটি ঘরে সমবেত হলেন ; কামরাটি মেজর ডনেলান ও তাঁর সেক্রেটারি ডীন ট্রুড্রিঙ্কের। সেখানে তাঁদের অধিবেশন বসলো। আসলে সকলের ঐক্যবদ্ধ হবার পরিকল্পনাটা জেগেছিলো কর্নেল বরিস কার্কফের মগজে ; প্রধানত তাঁরই পরামর্শে এই অধিবেশনের প্রস্তাবনা হ'লো। কূটনৈতিকদের মধ্যে তিনি যে এক-জন দীপ্ত ব্যক্তি এই অধিবেশনটি তারই সামান্য নজির। সুমেরুবৃত্ত কিনে নিয়ে সংস্থাটি বাণিজ্য ও প্রয়োগবিদ্যা সংক্রান্ত যে-লাভের প্রত্যাশা করছে, প্রথমটায় সেই বিষয়েই কথাবার্তা হ'লো। 'এ-সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট তথ্য কেউ পেয়েছেন কি ?' অধ্যাপক ইয়ান হারাল্ড প্রশ্ন তুললেন। সবাই শেষকালে জানালেন যে তাঁরা উইলিয়ম এস্. ফর্স্টারের কাছ থেকে খবর বের করার চেষ্টা করেছিলেন, যোগা-যোগের জন্য তাঁরই ঠিকানা দেওয়া হয়েছিলো ব'লে।

'আমি কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি,' এরিক বালডেনাক বললেন।

'এবং আমিও মোটেই সাফল্য লাভ করিনি,' জাক জানসেন যোগ করে দিলেন।

'আমার নিজের কথা আমি বলতে পারি,' ডীন ট্রুড্রিঙ্ক উত্তর দিলেন, 'মেজর ডনেলানের হ'য়ে আমি যখন হাই স্ট্রিটের ওই গুদোমঘরে গিয়ে হাজির হলাম তখন কালো-পোশাক-পরা মস্ত একটা লোক আমাকে অভ্যর্থনা করেছিলো ; মাথায় একটা উঁচু টুপি, গায়ে শাদা একটা অ্যাপ্রন—সেটা আবার এমনি খাটো যে তার মস্ত বুটজুতো কিছুতেই ঢাকা পড়ে না। তার কাছে খবর জানতে চাইতেই সে জানালে যে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে মালভর্তি জাহাজ "সাউথ স্টার" এসে পৌঁছেছে। আরো জানালে যে মেসার্স আরড্রোনেল অ্যাণ্ড কোম্পানির কাছে কড মাছের নতুন চালান কত এসে পৌঁছেছে, সে-সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্য সে আমাকে দিতে পারে।'

এবং ওলন্দাজ ইণ্ডিজের ঈষৎ সন্দেহগ্রস্ত প্রাক্তন উপদেষ্টা বললেন, 'সত্যি বলতে কী, উদীচীর হিমজলে টাকা ঢালার চেয়ে এক জাহাজ কড মাছ কেনাও ঢের ভালো।'

'প্রশ্ন তা নয়,' উঁচু গলায় মেজর ডনেলান জানালেন, 'আমাদের প্রশ্ন কড মাছ সম্পর্কে নয়, মেরুবৃত্ত সম্বন্ধে।'

'মুণ্ডুতে ভর দিয়ে চলা উচিত মার্কিনিদের', নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে

banglabooks.in

উঠলেন ডীন ট্রুড্রিঙ্ক। 'নাহ'লে তাদের সর্দি লেগে যাবে,' শেষটায় কর্নেল কার্কফ মন্তব্য করলেন। 'সমস্যা সেটা নয়,' বললেন মেজর ডনেলান। 'শুধু একটা তথ্যই এ-পর্যন্ত জানা গেছে যে কোনো অজ্ঞাত কারণে আমেরিকার পক্ষ থেকে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থা ("উদ্যোগ" কথাটা লক্ষণীয়) উত্তর মেরুর ৪০৭ বর্গমাইল জমি কিনতে চায়—যে-জমিটির উপর দিয়ে বস্তুত (কথাটায় লক্ষ্য রাখবেন) চুরাশি ডিগ্রি অক্ষরেখা গেছে।'

'এ-সব তথ্য আমরা জানি, মেজর ডনেলান, হয়তো আরো দু'-একটা বাড়তি তথ্যও জানি,' বললেন ইয়ান হারাল্ড। 'কিন্তু যেটা আমরা এখনো জানি না তা হ'লো, এই অদ্ভুত সংস্থাটি কী ক'রে ওই অঞ্চলের জল বা ডাঙাকে ব্যাবসায় খাটাবে?'

'সমস্যা এটা নয়,' মেজর ডনেলান আবারও বললেন। 'একটা দেশ টাকা দিয়ে বিশ্বের একটা বিপুল অংশ কিনে নিতে চাচ্ছে—অথচ ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী জায়গাটা আসলে ইংল্যাণ্ডের হওয়া উচিত।' 'জায়গাটা রাশিয়ার,' বললেন কর্নেল কার্কফ, 'ওলন্দাজদের,' বললেন জাক জানসেন, 'নরোয়ে স্ব্যেই-ডেনের,' বললেন ইয়ান হারাল্ড, 'দিনেমারদের,' বললেন এরিক বালডেনাক।

পঞ্চ প্রতিনিধি লাফিয়ে উঠলেন একসঙ্গে, মনে হ'লো অধিবেশনটা বুঝি-বা কটু বাক্যে পর্যবসিত হয়। এমন সময় ডীন ট্রুড্রিঙ্ক বাধা দিলেন। 'মহোদয়গণ,' আপশের গলায় তিনি বললেন, 'আমার কর্তার কথা অনুযায়ী বলতে হয় যে সমস্যাটা এখানে নয়। যখনি এটা ঠিক হয়েছে নিলেমে উত্তর মেরু বিক্রি করা হবে, তখনই এটা মেনে নেওয়া হয়েছে যে সবচেয়ে চড়া দর যিনি দেবেন, জায়গাটা তাঁরই হ'য়ে যাবে। এবং স্ব্যেইডেন, নরোয়ে, রাশিয়া, ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড এবং ইংল্যাণ্ড যখন তাদের প্রতিনিধিদের হাতে বিপুল অর্থ ন্যস্ত করেছে, তখন একটা সিণ্ডিকেট গ'ড়ে এমন একটা দর হাঁকা উচিত নয় কি, আমেরিকার পক্ষে যার চেয়ে বেশি দর হাঁকা অসম্ভব হ'য়ে পড়ে?' প্রতিনিধিরা পরস্পরের মুখ-চাওয়া-চায়ি করলেন। হারানো সূত্রটি সম্ভবত ডীন ট্রুড্রিঙ্কই খুঁজে পেয়েছেন। সিণ্ডিকেট—বারোয়ারি সভা—হ্যাঁ, আজকাল এ-কথাটা হরদম ও হামেশাই শোনা যায় বটে। আজকাল সবই তো বারোয়ারি; খাদ্য, পানীয়, পুঁথিপত্র, শয্যা—সবই তো বারোয়ারিভাবে তৈরি করা হয়। কি রাজনীতিতে, কি বা ব্যাবসায়—একজোট হওয়ার চেয়ে আধুনিক আর-কিছু নেই। কিন্তু একটা আপত্তিও আছে; বরং বলা ভালো, ব্যাপারটা বিশদ ক'রে বোঝা দরকার। সহযোগীদের মনোভাব জানবার চেষ্টা

banglabooks.in

করলেন জাক জ্যানসেন, 'কিন্তু তারপরে ? না-হয় বারোয়ারিভাবে উত্তরমেরুটা কেনাই গেলো, কিন্তু ততঃকিম্ ?' 'আমার কিন্তু মনে হয় যে ইংল্যাণ্ড,' মেজর চড়া গলায় ব'লে উঠলেন। 'এবং রাশিয়া,' কথাটা বলার সময় কর্নেলের নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত হ'লো, 'আর হল্যাণ্ড,' বললেন উপদেষ্টা মহোদয়। এরিক বালডেনাক মন্তব্য করলেন, 'ঈশ্বর যখন দিনেমারদের হাতেই ডেনমার্ককে ন্যস্ত করেছেন···।' তখন ডীন ট্রুড্রিঙ্ক বললেন, 'খামকা ঝগড়া করবেন না আপনারা। বাদ-বিসংবাদে আমাদের লাভটা কী হবে ? বরং আসুন একটি সিণ্ডিকেট রচনা করা যাক।'

'ততঃকিম্ ?' ইয়ান হারাল্ড জিগেস করলেন।

'তারপরে ?' ডীন ট্রুড্রিঙ্ক উত্তর দিলেন। 'তারপরেরটুকু তো জলবত্তরল। আপনারা মেরুদেশ কিনে নেবার পর তাকে নিজেদের মধ্যে অবিভাজ্য রেখে দিতে পারেন, নয়তো পরে ক্রেতাদের মধ্যে তাকে ভাগ ক'রে দেয়া যাবে—প্রয়োজন হ'লে ক্ষতিপূরণও দেয়া যাবে। কিন্তু তার আগে আমাদের উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হবে। আমরা সুমেরুকে মার্কিনিদের হাত থেকে বাঁচাতে চাচ্ছি। তাই না ?'

এই প্রস্তাব আবহাওয়াকে কিঞ্চিৎ হালকা ক'রে দিলো, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য তো বটেই। প্রতিনিধিরা অবশ্য পরমুহূর্তেই পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হ'তে ছাড়বেন না ; চুলোচুলির সুযোগ ঘটলেই পরস্পরের কেশাকর্ষণ করবেন তাতেও সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই স্থাবর সম্পত্তির ক্রেতা কে হবেন, তা নির্বাচন করার মুহূর্তে এত তর্কের অর্থ হয় না।

তাহ'লে অন্তত,' চতুর ডীন ট্রুড্রিঙ্ক মন্তব্য করলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের প্রশ্ন আর উত্থাপিত হবে না।'

'অত্যন্ত সমীচীন প্রস্তাব,' বললেন এরিক বালডেনাক।

'খুব কার্যকর,' কর্নেল কার্কফ রায় দিলেন।

'উপযুক্ত,' ইয়ান হারাল্ডের মন্তব্য।

'এটাই ঠিক,' জাক জানসেন জানালেন।

'ইংরেজোচিত প্রস্তাব,' মেজর ডনেলান বললেন। প্রত্যেকেই সহযোগীদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য সুচিন্তিত মতামত জানালেন।

'তাহ'লে এটা ধরা রইলো যে সিণ্ডিকেট গঠন করা হ'লে প্রত্যেকটি দেশের অধিকার ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ মান্য করা হবে।'

তা রইলো। এখন শুধু এটা জানা দরকার, কোন দেশের প্রতিনিধি কত টাকা নিয়ে হাজির হয়েছেন। এটা একবাক্য ধ'রে নেয়া হ'লো যে সকলের টাকা একত্র

banglabooks.in

ক'রে এমন-এক বিপুল অঙ্ক উঠবে, সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার মূলধন সেই অঙ্কের ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারবে না, তার চেয়ে বেশি টাকা হাঁকা তো দূরের কথা। এই টাকার প্রশ্নটা ডীন ট্রুড্রিঙ্কই উত্থাপন করলেন।

অটুট স্তব্ধতা নেমে এলো ঘরে। উত্তর দেবার ইচ্ছে কারো নেই। পকেট বই দেখানো? সিণ্ডিকেটের সিন্দুকে টাকা জমা দেয়া? এক-এক দেশের হাতে নিলেম ডাকার জন্য কত টাকা আছে, তা আগে থাকতেই জানিয়ে দেয়া? এইসব কথা ঘুরতে লাগলো মাথার মধ্যে। তাড়াহুড়োর চিহ্নমাত্র দেখালেন না কেউ। যদি ভবিষ্যতে এই নবগঠিত সিণ্ডিকেটে মতভেদ জেগে ওঠে? যদি পরিস্থিতির চাপে প'ড়ে প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা ভাবে দাম হাঁকতে হয়? জাক জানসেনের কৌশলে বরিস কার্কফের মতো কূটনীতিক হার মানবেন? ইয়ান হারাল্ডের গোপন চক্রান্তে জাক জানসেন অপমানিত হবেন? ইয়ান হারাল্ডই বা কী ক'রে মেজর ডনেলানের এই দম্ভ মেনে নেবেন? আর মেজর ডনেলান কি প্রত্যেকের সঙ্গেই ঝামেলায় জড়িয়ে প'ড়ে বিব্রত হ'য়ে উঠবেন না! কত টাকা আছে তা খুলে বলতে হবে? বা রে, তাহ'লে তো তুরুপের তাস সবই হাতছাড়া হ'য়ে গেলো, অথচ এখন তা জমিয়ে রাখা দরকার। ডীন ট্রুড্রিঙ্কের এই সংগত কিন্তু অস্বস্তিকর প্রশ্নের জবাব দেবার দুটো মাত্র পথ খোলা আছে। এবং টাকার অঙ্কটা ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে বলা যায়, কিন্তু পরে তাহ'লে টাকা দেবার সময়ে বিষম লজ্জায় পড়তে হবে। আরেক হয়, টাকার অঙ্কটা কমিয়ে এমন হাস্যকর ক'রে ফেলা যাতে প্রস্তাবটা ধামাচাপা প'ড়ে যায়। দ্বিতীয় ভাবনাটা প্রথমে এসেছিলো প্রাক্তন উপদেষ্টা মহোদয়ের মাথায়, কিন্তু তিনি সে-ভাবনাকে কিছুমাত্রই আমল দেননি, কথাটা এ প্রসঙ্গে বলা উচিত। তাঁর সহযোগীরা অবশ্য একযোগে তা-ই করলেন। হল্যাণ্ড তার মুখপাত্রকে দিয়ে বলালো, 'অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে সুমেরুর জন্য আমি কেবলমাত্র পঞ্চাশ রিখস্টালের খরচ করতে পারি।' 'আমি পারি পঁয়ত্রিশ রুব্‌ল্,' বললে রাশিয়া। 'আমি মাত্র বিশ ক্রোনের,' বললে নরোয়ে স্ব্যইডেন। 'আমি শুধু পনেরো ক্রোনেটন,' ডেনমার্ক জানালে। 'তাহ'লে,' যে-তিক্ত কণ্ঠ কেবল কোনো ইংরেজকেই মানায় তেমনি স্বরে মেজর ডনেলান বললেন, 'তাহ'লে আপনারাই বরং সুমেরুটা কিনে নিন—কেননা ইংল্যাণ্ড এক্ষেত্রে দেড় শিলিং-এর বেশি কিছু দিতে পারবে না।' এবং এই ব্যঙ্গোক্তি দিয়েই প্রাচীন ইয়োরোপের প্রতিনিধিদের অধিবেশন শেষ হ'লো।

banglabooks.in

সেখানে সাধারণত আশবাবপত্র, বাসন-কোশন, যন্ত্রপাতি প্রভৃতি বা শিল্পকীর্তি, নানা চিত্র, মেডেল বা প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিশ বিক্রি করা হয়, ডিসেম্বরের তিন তারিখে সেই নিলেম-ভবনেই কেন উত্তর মেরু নিলেমের ব্যবস্থা হয়েছে? কেন, তাতে বাধা কীসের? সুমেরু যেহেতু একটি বাস্তব জিনিশ, সেইহেতু আইনসংগতভাবে ধর্মাধিকরণের সামনেই কি তা নিলেম করা ঠিক নয়? যখন বিশ্বের একটা অংশ বিক্রি হ'তে যাচ্ছে, তখন সরকারি নিলেমদারের সাহায্যের দরকার হ'লো কেন? এটা যখন জগতের সবচেয়ে অস্থাবর সম্পত্তি, তখন তাকে কেমন ক'রে কোনো স্থাবর সম্পত্তির সঙ্গে তুলনা করা যাবে? সত্যি, ভাবতে গেলে পুরো ব্যাপারটাই অযৌক্তিক মনে হ'তে পারে। আসলে কিন্তু তা নয়। পুরো সুমেরুবৃত্ত এমনভাবে বিক্রি হওয়া চাই দলিলটা যাতে বিধিসংগত ও মূল্যবান হয়। তা থেকে এটাও কি বোঝা যাচ্ছে না যে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার মতে এই স্থাবর সম্পত্তির মধ্যে এমন একটা কিছু আছে যাকে জঙ্গম বলা যেতে পারে? যুক্তরাষ্ট্রের বহু বিজ্ঞরা পর্যন্ত এই রহস্যে হিমশিম খেয়ে গেলেন। পক্ষান্তরে, এমনিতর নিলেম যে আগে আদৌ হয়নি তা নয়। আমাদের এই গ্রহটির একটি অংশ আগেও একবার সরাসরি নিলেমভবনে সর্বোচ্চ মূল্যদাতার কাছে বিক্রি করা হয়েছিলো এবং এই ব্যাপারটাও ঘটেছিলো আমেরিকায়।

কয়েক বছর আগে কালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিসকোতে প্রশান্ত মহাসাগরের স্পেনসার দ্বীপটি প্রভূত বিত্তশালী উইলিঅম ডবলিউ. কোল্ডরুপের কাছে বিক্রি করা হয়েছিলো; প্রতিদ্বন্দ্বী স্টকটনের জে. আর. টাসকিনারের চেয়েও বেশি দাম হেঁকেছিলেন তিনি, শেষটায় ৫০০,০০০ ডলারে কিনে নেন। দ্বীপটার পিছনে খরচ হয়েছে ৪,০০০,০০০ ডলার। এটা সত্যি এই দ্বীপে মানুষ ছিলো উপকূল থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে, ছিলো অরণ্য, জল—ছিলো উর্বর, কঠিন ছিলো না প্রান্তর ও তৃণভূমি, ছিলো কর্ষণযোগ্য ও সম্ভাবনাময়। চিরন্তন তুষার দিয়ে ঢাকা অজ্ঞাত বন্য জলরাশির সঙ্গে তার কিছু মেলে না। দুর্ভেদ্য হিমশৈলের পাহাড় পেরিয়ে কেউ কোনোদিন সেখানে গিয়ে থাকবেও না। কাজেই এটা সবাই ধ'রে নিয়েছিলো যে নিলেমে খুব একটা চড়া দরে বিক্রি হবে না সুমেরু। তবু নিলেমের দিনে অজস্র

banglabooks.in

ভারিক্কি, বিচক্ষণ ও কৌতূহলী লোক এসে জমা হ'লো ; ব্যাপারটার শেষ দেখতে চায় তারা। তাছাড়া নিলেমটা চিত্তাকর্ষক না হ'য়ে যায় না।

বাল্টিমোরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ইয়োরোপীয় প্রতিনিধিরা আবিষ্কার করেছিলেন যে সব সময়েই তাঁদের চারপাশে কৌতূহলী মানুষেরা ভিড় ক'রে আছে। বলাই বাহুল্য, অনেকেই তাঁদের সঙ্গে দেখা ক'রে নানা কথা জিগেস ক'রে গেছে। এ-সব কথা মনে রাখলে আমেরিকার মানুষদের এই প্রবল উত্তেজনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব'লে ঠেকবে। আমেরিকার লোকদের কৌতূহল ও উত্তেজনা প্রকাশ করার একটা উপায় বাজি ধরা, যে-দৃষ্টান্ত ইয়োরোপ খুব চটপট শিখে নিয়েছে। মার্কিন নাগরিকেরা যদিও নিউ ইংল্যাণ্ড ও পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্য দেশের নানা ছোটো-ছোটো রাষ্ট্রে বিভক্ত, তবু একটি কামনার সূত্রে তারা সবসময় এক হ'য়ে যায় ; স্বদেশের কীসে ভালো হয়, এটাই তাদের একমাত্র চিন্তা। কিন্তু তবু অনিশ্চয়তার পরিমাণও নেহাৎ কম ছিলো না। রাশিয়া, সুইডেন, নরোয়ে বা হল্যাণ্ডকে তারা মোটেই ভয় পায় না। সাম্রাজ্যলিপ্সু ইংল্যাণ্ডই তাদের একমাত্র আতঙ্ক। সবকিছু গ্রাস ক'রে ফেলার একটা মারাত্মক স্বভাব রয়েছে ইংল্যাণ্ডের, উপরন্তু আছে ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডের তাড়া-তাড়া নোট ; সেইজন্যই মস্ত মোটা-মোটা বাজি ধরা হ'তে লাগলো। ঘোড়দৌড়ের মাঠে যেমন লোকে ঘোড়ার নামে টাকা ধরে, তেমনি আমেরিকা আর গ্রেট ব্রিটেনের নামে টাকা ধরা হ'তে লাগলো। অন্য দেশগুলোকেও একেবারে বাদ দেয় হ'লো না, তাদের নিয়েও বাজি রাখা হ'লো। কেউ-কেউ আবার ডেনমার্ক, সুইডেন, হল্যাণ্ড ও রাশিয়ার নামে ১২ : ১ বা ১৩½ : ১ বাজি ধরতে চাইলো, কিন্তু এইসব প্রস্তাবে কেউ রাজি হ'তে চাইলো না।

নিলেম শুরু হ'লো বেলা বারোটায়।

ভীড়ের জন্য সকাল থেকেই রাস্তার সব দোকানপাট বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো, তারবার্তায় কাগজগুলোকে জানানো হ'লো যে মার্কিনদের সঙ্গে বাজি ধরেছে ইংরেজরা—এবং ডীন টুড্রিঙ্ক সেই মর্মে নিলেম-ভবনে একটা বিজ্ঞপ্তি টাঙিয়ে দিলেন। সময় যত এগিয়ে এলো, উত্তেজনাও ততই বেড়ে চললো ; জানা গেলো যে ইংরেজ সরকার নাকি মেজর ডনেলানের হাতে অজস্র টাকা দিয়ে রেখেছেন। 'নাবধিকরণে নৌবহরের সেনাপতিরা নিলেমটিকে যথাসাধ্য সমর্থন করেছে,' নিউ-ইয়র্কের একটি কাগজ লিখলো, 'কারণ পরবর্তী অভিযাত্রায় তাঁরা যোগদান ক'রে কীর্তি ও যশ চান।' এইসব কিংবদন্তির পিছনে কতখানি সত্য ছিলো কেউ জানে না। কিন্তু বাল্টিমোরের চরম রক্ষণশীল মানুষটিও ভাবলে যে ইংল্যাণ্ডের চড়া

banglabooks.in

দরের যোগ্য জবাব দেবার মতো টাকা সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার আছে এটা আশা করা অন্যায় ; ফলে সংস্থার স্বার্থরক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে উদ্যোগী করার জন্য ওয়াশিংটনে চাপ দেয়া হ'তে লাগলো। এত সব হৈ-চৈ-এর মধ্যে কিন্তু নতুন সমিতির পক্ষ থেকে একজনই প্রতিনিধিকে দেখা গেলো ; তিনি আর-কেউ নন, সংস্থার এজেন্ট উইলিয়ম ফর্স্টার ; তাঁকে কিন্তু এত গুজবে ও জনরবে একটুও বিচলিত হ'তে দেখা গেলো না, বরং তাঁকে দেখে এটাই মনে হ'লো যে সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর মনে বুঝি এতটুকু সংশয় নেই।

নিলেমের সময় যত কাছে এলো, ভিড়ও ততই বেড়ে চললো। নিলেম শুরু হবার তিন ঘণ্টা আগেই নিলেম-ভবনে তিলমাত্র জায়গা রইলো না। দর্শকদের জন্য যে জায়গাটুকু ছিলো, তা এমনভাবে ভর্তি হ'য়ে গেলো যে আস্ত বাড়িটাই বুঝি ভেঙে পড়ে। ইয়োরোপীয় প্রতিনিধিদের জন্য রেলিং-দিয়ে-ঘেরা সংরক্ষিত জায়গাটুকু শুধু তখনও ফাঁকা প'ড়ে ছিলো। অবশ্য তাঁদের জন্যও আরাম ক'রে বসার ব্যবস্থা করা যায়নি ; কেবল কোনোরকমে ঠাশাঠাশি ক'রে যাতে নিলেমটা দেখতে পারেন, শুধু তেমন একটু জায়গাই তাঁদের জন্য রাখা হয়েছিলো।

প্রতিনিধিগণ হলেন এরিক বালডেনাক, বরিস কার্কফ, জাক জানসেন, ইয়ান হারাল্ড, মেজর ডনেলান ও তাঁর সেক্রেটারি ডীন টুড্রিঙ্ক। আঁটোশাঁটো একটা গোষ্ঠী রচনা করেছিলেন তাঁরা, এমনভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলেন যে দেখে মনে হয় যেন যুদ্ধক্ষেত্রের সৈন্যবাহিনী। তা, উত্তর মেরুর স্বত্বের জন্য তাঁরা তো যুদ্ধই করতে চাচ্ছেন। মার্কিনদের পক্ষ থেকে আপাতদৃষ্টিতে কোনো প্রতিনিধিই ছিলো না। শুধু সেই কড মাছ বিক্রেতা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁর মুখেও ঔদাসীন্যের ভাব ছাড়া আর-কিছুই নেই। বরং তাঁকে একটু চিন্তামগ্ন মনে হ'লো : পরের স্টিমারে যে-মাল আসবে, তার কথাই বোধ করি তন্ময় হ'য়ে ভাবছেন। এই ব্যক্তির হাতে যাঁরা সব ভার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে আছেন তাঁরা কোথায় ? এই মানুষটির হাত দিয়ে লক্ষ-লক্ষ ডলার বেরিয়ে যাবে—অথচ হাতে যাঁদের টাকা তাঁরা কোনখানে ব'সে আছেন ? ব্যাপারটা এমন রহস্যময়ভাবে চাপা রাখা হয়েছে যে লোকের কৌতূহল একেবারে অসীমে পৌঁছুলো।

জে. টি. ম্যাস্টন কি এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের সঙ্গে যে এর কোনো সম্পর্ক আছে, তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারলে না। তা আন্দাজ করার সূত্রই বা কী ছিলো ! দু'জনেই অবশ্য সে-ঘরে উপস্থিত ছিলেন। ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে-যাওয়া এই দু'জনের জন্য কোনো বিশেষ আসনের ব্যবস্থা করা হয়নি। সঙ্গে রয়েছেন

banglabooks.in

ম্যাস্টনের কয়েকজন বন্ধু, বাল্টিমোরের গান-ক্লাবের কয়েকজন সদস্য। ব্যাপারটায় তাঁদের যে কোনো কৌতূহল বা আকর্ষণ আছে, তা-ই বোঝা যায় না। উইলিয়াম এস. ফর্স্টার যে তাঁদের চিনতে পেরেছেন, তা পর্যন্ত বোধ হ'লো না।

নিলেমদার তার কাজ শুরু ক'রে দিলো। যে-জিনিশটা বিক্রি করা হয় সেটাকে প্রথমে দেখতে দেয়া সাধারণ নিয়ম ; কিন্তু এক্ষেত্রে যে তা অসম্ভব, এই কথা ব'লেই সে তার বক্তব্য শুরু করলে ; হাতে-হাতে চালান ক'রে দিয়ে উত্তর মেরুকে দেখাবার ক্ষমতা তার নেই : ক্রেতারা আতশ কাচ দিয়ে তাকে পরীক্ষা ক'রে দেখতে পারবেন না, কিংবা উপরের পাতটা শক্ত কিনা তাও টিপে-টুপে দেখা অসম্ভব ; জিনিশটা কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু কি না, তাও সম্ভবত প্রশ্নসাপেক্ষ। অবশ্য তার নিজের মতে এটা একটা দুর্লভ সাবেকি জিনিশই। সে বললে যে অতীতের একটা পাথরের খণ্ড এটা, পৃথিবীর সমান বয়সী ; কেননা বিশ্বসৃষ্টির সময়েই উত্তর মেরুর জন্ম হয়েছিলো। তবে সরকারি নিলেমদারের টেবিলের উপরে যদিও সকলের দেখবার জন্য উত্তর মেরুকে রাখা যায়নি, তার একটা মস্ত মানচিত্র রাখা গেছে ; কৌতূহলী ব্যক্তিদের সহজেই তা চোখে পড়বে, কেননা নিলেমে কোন অঞ্চল বিক্রি হচ্ছে, তা মোটা ও স্পষ্ট দাগ দিয়ে তাতে বোঝানো আছে। মেরুবলয়ের সতেরো ডিগ্রি নিচে একটা লাল রেখা গেছে চুরাশি ডিগ্রি অক্ষরেখায়, তা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে—ওই রেখা দিয়েই বোঝানো হচ্ছে ভূমণ্ডলের কোন অংশটা নিলেমে ওঠানো হয়েছে। ঘন তুষারের তলায় সেখানে কেবল জল আছে ব'লেই মনে হ'লো। কিন্তু ক্রেতাকে তো ঝুঁকি নিতেই হবে। শুধু এই সম্ভাবনাটা আগে থেকেই এইজন্য জানানো হ'লো, যাতে পরে কেউ এই কথা না বলে যে তাকে ঠকিয়ে এই মালটা গছিয়ে দেয়া হয়েছে। ভুল-বোঝাবুঝির কোনো অবকাশই দেয়া উচিত নয়।

কাঁটায়-কাঁটায় বারোটার সময় সরকারি নিলেমদার একটা ছোটো পথ দিয়ে ঢুকে তার টেবিলে গিয়ে বসলো। ফ্লিণ্ট হচ্ছে তার সহকারী ; সে-ই নিলেমের হাঁক দেবে ; আগেই সে পৌঁছেছিলো ; এতক্ষণ সে এমনভাবে পায়চারি করছিলো, যেন কোনো খাঁচায়-পোরা ভাল্লুক। প্রত্যাশায় দু'জনেই উৎসুক ও চঞ্চল, কেননা তাদের ধারণা ছিলো যে এককাঁড়ি টাকায় মেরুদেশ বিক্রি হবে, এবং তার ফলে দস্তুরি হিশেবে তাদেরও মোটা টাকা মিলবে। বলাই বাহুল্য ধারে বিক্রি নেই ; খাঁটি মার্কিনি দস্তুর অনুযায়ী করকরে নগদ টাকায় এই নিলেম হবে। টাকার অঙ্ক যত মোটাই হোক না কেন প্রতিনিধিদেরই তা দিয়ে যেতে হবে। এমন সময় একটা মস্ত ঘণ্টা সোৎসাহে বেজে উঠলো। বোঝা গেলো ডাক শুরু হবে। একটা

banglabooks.in

গম্ভীর উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত নেমে এলো। আশেপাশের অনেকের বুক দুরু-দুরু ক'রে উঠলো। বাইরে ভিড়ের মধ্যে একটা ছোটোখাটো দাঙ্গা হ'য়ে গেলো যার রেশ এমনকি হলঘরেও এসে পৌঁছুলো। যতক্ষণ না সবাই চুপ করলো নিলেমদার গিলমুর বাধ্য হ'য়ে স্তব্ধ রইলো। উঠে দাঁড়িয়ে সহকারীদের দিকে তাকালো সে, তারপর চোখ থেকে তার চশমাটা খুলে বুকে ঝুলিয়ে যথাসাধ্য শান্ত গলায় বললে, 'মহাশয়গণ, যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী ইয়োরোপীয় রাষ্ট্র-গুলির সৌজন্যে আমরা একটি বিরাট অংশ বিক্রি করবো এবার। চুরাশি ডিগ্রি অক্ষরেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ ভূমণ্ডলের মেরুবিন্দুর নিকটবর্তী পুরো জায়গাটাই— তা সে দেশ, মহাদেশ, সমুদ্র, দ্বীপ, হিমশৈল, কঠিন বা তরল যাই হোক না কেন— বিক্রি হবে।' তারপর দেয়ালের দিকে ফিরে সে যোগ করলে, 'এই মান-চিত্রটির দিকে তাকিয়ে দেখুন। সর্বশেষ অভিযানের ফলে যা-যা আবিষ্কৃত হয়েছে সব এখানে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত আছে। লক্ষ করলে দেখতে পাবেন যে এই অংশটুকুতে আসলে ৪০৭,০০০ বর্গমাইল জায়গা আছে। সেইজন্যই নিলেমের কাজে সুবিধের জন্য এটাই স্থির করা হয়েছে, প্রতি বর্গ-মাইল হিশেবে দর হাঁকতে হবে, অর্থাৎ এক সেণ্ট দাম হাঁকার মানেই হ'লো ৪০৭০০০ সেণ্ট; বা এক ডলার দাম মানেই ৪০৭০০০ ডলার। দয়া ক'রে আপনারা একটু চুপ করলে এবার আমাদের কাজ শুরু করতে পারি।'

অনুরোধটা মোটেই অহেতুক হয়নি, কেননা লোকের অস্থিরতা তখন এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে ক্রেতার গলা শোনা অসম্ভব ছিলো। খানিকটা নীরবতা নেমে এলে—তার জন্য অবশ্য ফ্লিণ্টের পরিশ্রম ধন্যবাদ পাবে, কেননা সে এতক্ষণ জাহাজের সাইরেনের মতো চ্যাঁচাচ্ছিলো—গিলমুর তার বক্তব্য শেষ করলে: 'আরম্ভ করার আগে আমি কেবল নিলেমের একটি শর্ত উল্লেখ করতে চাই। ভৌগোলিক বা আবহাওয়া-সংক্রান্ত যে-পরিবর্তনই ঘটুক না কেন, একবার সর্বোচ্চ মূল্যে কারো কাছে এই জায়গাটা বিক্রি ক'রে দেবার পর জায়গাটা তর্কাতীতভাবে তারই থেকে যাবে—চুরাশি ডিগ্রি অক্ষরেখার উত্তরে অন্য-কোনো দেশেরই তখন কোনো দাবি বা অধিকার থাকবে না—।' আবারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে এই অদ্ভুত মন্তব্যটা করা হ'লো। কথাটা শুনে অনেক হো-হো ক'রে হেসে উঠলো, আবার কেউ-বা অতি বিজ্ঞের মতো ব্যাপারটাতে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করলে। 'নিলেম শুরু হ'লো', সরকারি নিলেমদার অত্যন্ত উচ্চস্বরে জানালে। হাতির দাঁতের হাতুড়িটাকে ঘোরাতে-ঘোরাতে ঈষৎ নত স্বরে সে যোগ

banglabooks.in

করলে, 'প্রতি বর্গ-মাইলের জন্য দাম পেয়েছি আসরা দশ সেণ্ট অর্থাৎ এক ডলারের এক-দশমাংশ। তার মানে, এই পুরো স্থাবর সম্পত্তির দাম ৪০৭০০০ ডলার স্থির হয়েছে।'

নিলেমদার সত্যি এ-রকম কোনো প্রস্তাব পেয়েছিলো কি না কে জানে, তবে তাতে কিছু এসে-যায় না, কেননা দিনেমার সরকারের পক্ষ থেকে এরিক বাল-ডেনাক তক্ষুণি তার চেয়েও চড়া দাম হাঁকলেন। 'কুড়ি সেণ্ট,' বললেন তিনি।

'ত্রিশ সেণ্ট,' নরোয়ে-স্থইডেনের পক্ষ থেকে ইয়ান হারাল্ড হাঁকলেন।

রাশিয়ার হ'য়ে কর্নেল কার্কফ হাঁকলেন, 'চল্লিশ সেণ্ট।'

তার মানে, এর মধ্যেই ১৬২৮০০ ডলার দাম উঠে গেলো। ইংল্যাণ্ডের প্রতি-নিধি তো এখনো মুখই খোলেননি। ঠোঁটদুটি পর্যন্ত একটুও কাঁপেনি তাঁর, ঠোঁট চেপে তিনি ব'সে আছেন তাঁর সহকারীর সঙ্গে। ওদিকে উইলিয়ম এস. ফর্স্টারও দুর্ভেদ্য মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে উপবিষ্ট। এমনকি এখনো তাঁকে খবরের কাগজের জাহাজ আসা-যাওয়ার-খবর-দেয়া পাতাটি পড়তে দেখা গেলো; দৈনন্দিন বাজারদর ও জাহাজের খবরেই তিনি তন্ময় ও মগ্ন।

'প্রতি বর্গ-মাইল চল্লিশ সেণ্ট ক'রে,' ফ্লিণ্ট প্রায় হাজারের ভোঁ-এর মতো বাজখাঁই গলায় পুনরাবৃত্তি করলো, 'চল্লিশ সেণ্ট।'

মেজর ডনেলানের চারজন সহযোগী পরস্পরের মুখ চাওয়া-চায়ি করলেন। এর মধ্যেই কি তাঁদের সব টাকা ফুরিয়ে গেলো? নিলেম শুরু হ'তে-না-হতেই চুপ ক'রে যেতে হবে কি তাঁদের?

'আর কেউ ডাকবেন?' গিলমুর বললে, 'চল্লিশ সেণ্ট—শস্তায় যাচ্ছে তার বেশি কেউ ডাকবেন না? চল্লিশ সেণ্ট? মাত্র? উত্তর মেরুর দাম নিশ্চয়ই তার চেয়ে ঢের বেশি, অন্তত বরফ যে অঢেল পাওয়া যাবে তাতে তো সন্দেহ নেই!'

দিনেমার প্রতিনিধি ৫০ সেণ্ট দাম দিতে-না-দিতেই ওলন্দাজ প্রতিনিধি দামটা আরো দশ সেণ্ট চড়িয়ে দিলেন।

টুঁ শব্দটি করলো না কেউ। ষাট সেণ্ট! অর্থাৎ ২৪৪২০০ ডলার: যথেষ্ট মোটা অঙ্ক। ওলন্দাজ প্রতিনিধির দর জানার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরে একটা মৃদু গুঞ্জন হ'লো। দেখা গেলো যে-সব লোকের পকেটে কানাকড়িও নেই এবং যাদের সবই ফোঁপরা, তারাই এই ডলার-যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী।

জাক জানসেন তাঁর দাম জানাতেই মেজর ডনেলান তাঁর সেক্রেটারি ডীন টুড্রিঙ্কের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত অস্ফুট নেতিবাচক ইঙ্গিতে তাঁকে চুপ করিয়ে

banglabooks.in

রাখলেন। উইলিয়ম এস. ফর্স্টার খবর-কাগজ থেকে কতগুলি জরুরি খবর তাঁর নোটবইয়ে টুকে নিলেন। এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের মৃদু হাসির উত্তরে জে. টি. ম্যাস্টন কেবল মাথা হেলালেন একবার।

'আসুন, একটু প্রাণ আনুন ডাকের মধ্যে! এত সময় নেবেন না। ধুকপুক ক'রে ডাকছেন আপনারা, বড্ড আস্তে,' নিলেমওলার বাণী শোনা গেলো। 'তাহ'লে এর চেয়ে বেশি দর কেউ দেবেন না! তবে কি এই সামান্য দামেই উত্তর মেরু বিক্রি হ'য়ে যাবে?' কথা বলার সময় তার হাতের গজদন্তের হাতুড়িটি এমনভাবে ওঠা-নামা করতে লাগলো যেন কোনো পাদ্রি তাঁর ক্রুশ নেড়ে লোককে আশীর্বাদ করতে চাচ্ছেন।

'সত্তর সেণ্ট,' একটু কেঁপে গেলো ইয়ান হারাল্ডের গলা।

'আশি,' তৎক্ষণাৎ কর্নেল বরিস কার্কফের সাড়া পাওয়া গেলো।

'আশি সেণ্ট,' উত্তেজনায় ফ্লিণ্টের চোখ চকচক ক'রে উঠলো, 'চ'লে যাচ্ছে আশি সেণ্টে—মাত্র আশি সেণ্টে!'

ডীন টুড্রিঙ্কের ইঙ্গিতে মেজর ডনেলান প্রায় ভূতের মতো লাফিয়ে উঠলেন। গ্রেট ব্রিটেনের স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ ও সংক্ষিপ্ত গলা শোনা গেলো: 'একশো সেণ্ট।' এই একটি কথাই ইংল্যাণ্ডকে ৪০৭০০০ ডলারের জন্য দায়ী ক'রে দিলো।

যুক্তরাজ্যের পক্ষে যারা বাজি ধরেছিলো, তারা ও তাদের বন্ধুবান্ধব উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো; বাইরের জনতার মধ্যেও তার পুনরাবৃত্তি হ'লো ঠিক একটি প্রতিধ্বনির মতো। আমেরিকার পক্ষে যারা বাজি ধরেছিলো তারা হতাশা-ভাবে পরস্পরের দিকে তাকালে। সুমেরুর জন্য ৪০৭০০০ ডলার? এর মধ্যেই এত মোটা টাকা উঠে গেলো? তুষার, হিমশৈল ও তুহিনক্ষেত্রের জন্য কিনা ৪০৭০০০ ডলার? এদের কি মাথা খারাপ?

আর তবু কিনা সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার লোকটি টুঁ শব্দটিও করলেন না—এমনকি মুখ তুলে দেখলেন না পর্যন্ত! তাহ'লে কি শেষকালে ওস্তাদের মারের মতো বিরাট কোনো দর হাঁকবেন তিনি? যদি তিনি এতক্ষণ দিনেমার, সুইডেন, হল্যাণ্ড আর রাশিয়ার প্রতিনিধিদের শেষ দর জানার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকেন, যদি তিনি ভেবে থাকেন যে তাঁদের টাকা ফুরিয়ে গেলে পরে ডাক দেবেন, তাহ'লে এতক্ষণে নিশ্চয়ই সেই সময় এলো। তাঁদের মুখ দেখেই এটা বোঝা যায় যে মেজর ডনেলানের '১০০ সেণ্টের' নির্ঘোষ শুনে তাঁরা রণে ভঙ্গ দিয়ে

banglabooks.in

স'রে দাঁড়াবেন ব'লে ঠিক করেছেন। 'একশো সেণ্টে এক বর্গমাইল,' নিলেম-দার দ্বিতীয়বার ঘোষণা করলে। 'একশো, এ-ক-শো,' হাতের চেটো গোল ক'রে শিঙার মতো ফুঁ দিয়ে চ্যাঁচালো ফ্লিণ্ট। 'তার বেশি কেউ ডাকবেন না?' গিলমুর জিগেস করলো। 'শুনেছেন? একশো সেণ্ট? বুঝেছেন? পরে মন-স্তাপ হবে না তো? তাহ'লে এই দামেই বেচে দিচ্ছি আমরা।' কেরানির দিকে তাকিয়ে সে ঘোষণা করলো: একশো সেণ্ট—এক একশো সেণ্ট—দুই—'

'একশো দশ,' অতিমাত্রায় শান্ত স্বরে উইলিয়ম এস. ফর্স্টার বললেন, কী প্রতিক্রিয়া হ'লো তা এমনকি চোখ তুলে দেখলেন না পর্যন্ত; খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতেই নিরাসক্তভাবে ব'লে গেলেন।

'হিপ, হিপ, হিপ' আমেরিকার পক্ষে যারা বাজি ধরেছিলো, তারা চেঁচিয়ে উঠলো। মেজর ডনেলান তো প্রায় স্তম্ভিত! লম্বা গলা বাড়িয়ে তিনি চার দিকে তাকালেন, অসহায়ের মতো কাঁধ ঝাকালেন একবার, আর উত্তেজনায় ঠোঁট-দুটি শুধু কেঁপে-কেঁপে উঠলো। পারতেন তো দৃষ্টি দিয়েই মার্কিন প্রতিনিধিকে ভস্ম ক'রে ফেলতেন তিনি, কিন্তু হায় রে, পারলেন না: অত্যন্ত ঠাণ্ডা উইলিঅম ফর্স্টার এতটুকু বিচলিত হলেন না।

'একশো চল্লিশ,' মেজর ডনেলান ঘোষণা করলেন।

'একশো ষাট,' ফর্স্টারের শান্ত গলা শোনা গেলো।

অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে মেজর বললেন, 'একশো আশি।'

ফর্স্টার বললেন, 'একশো নব্বুই।'

'একশো নিরেনব্বুই', গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধি গর্জন ক'রে উঠলেন। আড়া-আড়িভাবে বাহু দুটি বক্ষে স্থাপন ক'রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন তিনি।

কোনো ইঁদুর যদি সেখানে দৌড়ুতো, কিংবা মাছি উড়ে যেতো, বা কোনো পোকা যদি এঁকেবেঁকে বুকে হেঁটে যেতো, তাহ'লে বোধ করি তাও শোনা যেতো। দুরুদুরু করছে সকলের বুক; মনে হচ্ছে মেজর ডনেলানের প্রাণটা ঠোঁটের কাছে এসে আটকে আছে। এমনিতে তাঁর মাথা অস্থিরভাবে নড়েচ'ড়ে ওঠে, কিন্তু এখন তা নিশ্চল। ডীন ট্রুড্রিঙ্ক ব'সে প'ড়ে এক-এক ক'রে চুল ছিঁড়ছেন। নিলেমওলা গিলমুর কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলো। কিন্তু তা-ই মনে হ'লো এক-একটা শতাব্দী ব'লে। কডমাছ-বিক্রেতা তাঁর কাগজ নিয়েই তন্ময় তখনো, কেবল মাঝে-

banglabooks.in

মাঝে পেন্সিল দিয়ে কী সব লিখছেন—স্পষ্ট বোঝা যায় তার সঙ্গে বর্তমান ব্যাপারের কোনো সম্পর্ক নেই। তাঁরও কি তবে টাকা ফুরিয়ে গেলো নাকি? না কি শেষ আরেকটা দর হাঁকার ইচ্ছে তাঁর আছে? নাকি, ১৯৯ সেণ্ট প্রতি বর্গ-মাইল বা সর্বসাকুল্যে ৭৯৩০০০ ডলার তাঁর কাছে অসম্ভাবনার চূড়ান্ত ব'লে মনে হচ্ছে?

'একশো নিরেনব্বুই সেণ্ট,' নিলেমদার পুনরাবৃত্তি করলে। 'এই দামেই বেচা হ'লো তবে,' তার হাতুড়ির বাড়ি পড়লো টেবিলে। 'একশো নিরেনব্বুই—এক! একশো নিরেনব্বুই—দুই!' তার সহকারী চ্যাঁচালো। সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার প্রতিনিধিটির দিকে তাকিয়ে রইলো সবাই।

অদ্ভুত মানুষটি তখন মস্ত একটা ডোরা-কাটা রুমালে মুখ ঢেকে নাক ঝাড়তে ব্যস্ত। জে. টি. ম্যাস্টন একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন, এভাঞ্জেলিনা স্করবিটও তা-ই। তাঁদের উদ্বিগ্ন মুখচোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো যে তীব্র আবেগ চেপে রাখার জন্য চেষ্টা করছেন। মেজর ডনেলানের চেয়ে বেশি ডাকতে ফর্স্টার এত ইতস্তত করছেন কেন? শান্তশিষ্ট ফর্স্টার দ্বিতীয়বার নাক ঝাড়লেন, তারপর আবার আরেকবার নাক ঝাড়লেন অনুত্তেজিত ভাবে—আর জাহাজে ভোঁ-এর মতো শব্দ হ'লো প্রতিবার, কিন্তু দ্বিতীয়বার আর তৃতীয়বার নাক ঝাড়বার মধ্যখানে অত্যন্ত শান্ত, বিনীত ও মধুর গলায় তিনি বললেন, 'দুশো সেণ্ট!'

ঘরের ভিতরে দীর্ঘ একটি শিহরণের স্রোত খেলে গেলো। তারপরেই মার্কিনি সমর্থকেরা এমন চ্যাঁচামেচি তুললো যে জানলাগুলি শুদ্ধ কেঁপে উঠলো। মেজর ডনেলান বিধ্বস্ত, হতাশ, পরাস্ত ও অভিভূত ভাবে ধপ ক'রে ডীন ট্রুড্রিঙ্কের পাশের আসনে ব'সে পড়লেন, কিন্তু ট্রুড্রিঙ্কের অবস্থাও তখন বিশেষ ভালো নয়। এই দামে দু'হাজার মাইল জমি কিনতে ৮১৪০০০ ডলারের বিপুল অঙ্ক লাগে; স্পষ্ট বোঝা গেলো ইংল্যাণ্ডের তার বেশি টাকা দেবার সামর্থ্য নেই।

'দুশো সেণ্ট,' নিলেমওলা পুনরাবৃত্তি করলো। 'দু'শো সেণ্ট,' বললো ফ্লিণ্ট। 'দুশো সেণ্ট—এক; দুশো সেণ্ট—দুই,' বললো নিলেমওলা। 'এর চেয়ে বেশি দাম কেউ দেবেন?' মেজর ডনেলান অতি কষ্টে নিজেকে টেনে তুলে অন্য প্রতি-নিধিদের দিকে কাতরভাবে তাকালেন। প্রত্যাশায় উঠে বসলেন তাঁরা; তা'হলে মার্কিনি হাত ছাড়িয়ে ইয়োরোপেরই একটি দেশের হাতে চ'লে এলো সুমেরু! কিন্তু না, উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে তাঁর সব শক্তি হারিয়ে গিয়েছিলো। মুখ খুলে কী যেন বলতে চাইলেন মেজর—কিন্তু কথা ফুটলো না; বরং ইংল্যাণ্ড আবার ধপ

banglabooks.in

ক'রে ব'সে পড়লো। বিজয়ী আমেরিকার সমর্থকেরা সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, আমেরিকার নামে জয়ধ্বনি দিলো। আর নিমেষের মধ্যে এই নিলেমের ফলাফল বাল্টিমোরে ছড়িয়ে পড়লো—তারপর তারবার্তায় সারা যুক্তরাষ্ট্রে এবং তারও পরে জগতের সর্বত্র। তাহ'লে শেষকালে উইলিঅম এস. ফর্স্টারের দালালির সাহায্যে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থা মেরুবৃত্তের মালিক হ'য়ে গেলো—চুরাশি ডিগ্রি অক্ষরেখার উপরে যা-কিছু আছে সব এখন তাদেরই দখলে!

পরের দিন ফর্স্টার যখন টাকা জমা দিতে গেলেন, তখন লোকে কোম্পানির মালিক ও অধ্যক্ষের নাম জানতে পারলে। টাকা জমা দেয়া হ'লো বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির অধ্যক্ষ ইম্পে বার্বিকেনের নামে।

৪

বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানি! একটি গোলন্দাজ সংঘের সভাপতি! কিন্তু গোলন্দাজরা এ-ব্যাপারে কী করবে? দেখা যাক। বাল্টিমোরের গান-ক্লাবের সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল, জে. টি. ম্যাস্টন, কাঠের পা-ওলা টম হাণ্টার, ঝলমলে বিল্‌স্‌বি, কর্নেল ব্লুমসবেরি বা অন্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার সত্যি কোনো প্রয়োজন আছে? তা মনে হয় না। প্রথম যখন জগৎ তাঁদের দিকে তাকিয়েছিলো, তার পরে কুড়ি বছর কেটে গেছে বটে, কিন্তু বয়স বাড়া ছাড়া আর-কোনো পরিবর্তন তাঁদের হয়নি। ঠিক সেই রকমই আছেন তাঁরা! দৈহিক দিক দিয়ে তেমনি অসম্পূর্ণ, কিন্তু কোনো অদ্ভুত রগরগে অভিযানের সময় হ'লে তেমনি নির্ভীক, নিনাদপ্রবণ ও বিশৃঙ্খল হ'য়ে উঠতে তাঁদের দেরি হয় না। সময়ের কোনো ছাপই এই গোলন্দাজদের উপর পড়েনি; বোধহয় যে-সব কামান এখন আর ব্যবহৃত হয় না, সময় তাদের যেমন জাদুঘরে সাজিয়ে রেখে শ্রদ্ধা জানায়, এঁদেরও বোধহয় তেমনি শ্রদ্ধাই করে সময়। গান-ক্লাব যখন প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার সদস্য-সংখ্যা ছিলো ১৮৩৩—আস্ত মানুষ অবশ্য ১৮৩৩ জন নন—বরং বলা যায় ১৮৩৩-টি নাম—কারণ সদস্যদের প্রত্যেকেরই হাত-পা কি অন্য কোনো অঙ্গ ছিলো না। আর ছিলো ৩০৫৭৫ পত্রসভ্য, যারা গান-ক্লাবের সদস্য ব'লে গর্ব অনুভব করতো। সেই সংখ্যা তো মোটেই কমেনি, বরং তাঁরা যখন চাঁদের সঙ্গে পৃথিবীর সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করার অবিশ্বাস্য চেষ্টা করলেন, তখন

banglabooks.in

তার খ্যাতি ও প্রতিপত্তি আরো বিপুল অনুপাতে বেড়ে যায়। এ-বিষয়ে গান-ক্লাবের যে প্রতিবেদন বেরিয়েছিলো, তা নিশ্চয়ই কেউ কখনো ভুলে যাবেন না; তবু এখানে সে-সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলা উচিত।

গৃহযুদ্ধের কয়েক বছর পরে গান-ক্লাবের কয়েকজন সভ্য আলস্যে কালক্ষেপ করতে-করতে বিরক্ত হ'য়ে অবশেষে বিরাট একটি কামানের ফাঁপা গোলা চাঁদে পাঠাবার প্রস্তাব করেন। ৯০০ ফুট লম্বা ও ৯ ফুট চওড়া একটা বিশেষ কামান এই উদ্দেশ্যে মুনসিটি বা চন্দ্রনগরে বানানো হ'লো; নাইট্রোগ্লিসারিনে ৪০০০০০ পাউণ্ড তুলো ভিজিয়ে বারুদ তৈরি ক'রে তার গোলা ছোঁড়া হবে ব'লে ঠিক হয়। এই কামান থেকে ছোটো-একটি কৌণিক নলের মতো গোলা নক্ষত্রের উদ্দেশে ছোঁড়া হবে; প্রতি বর্গ-ইঞ্চিতে চাপ পড়বে ছশো কোটি পাউণ্ড। বাঁকাভাবে গোলাটা আকাশে উঠে যায় মহাশূন্যে, তারপরে আবার পৃথিবীতেই ফিরে আসে: প্রশান্ত মহাসাগরে সেই গোলা ডুবে যায়—২৭ ডিগ্রি ০৭ মিনিট অক্ষরেখা ও ৪১ ডিগ্রি ৩৭ মিনিট পশ্চিম দ্রাঘিমায়। মার্কিন নাবধিকরণের জাহাজ 'সাসকুয়েহানা' ভিতরকার অধিবাসীদের পরম স্বাচ্ছন্দ্য বিধান ক'রে সমুদ্রের তলা থেকে এখানেই তাকে টেনে তোলে। অধিবাসী? হ্যাঁ, অধিবাসী। কারণ গান-ক্লাবের দুই সভ্য—সভাপতি ইম্পে বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকল একজন দুঃসাহসী ফরাশির সঙ্গে এই উড়ো-কলে মহাশূন্যে গিয়েছিলেন। তিনজনেই এই বিপজ্জনক অভিযান থেকে সুস্থ ও সবল ফিরে আসেন। কিন্তু মার্কিনি দু'জন যদি এখন আবার তেমনি কোনো রগ-রগে সংকল্প ক'রে থাকেন, ফরাশি মিশেল আর্দাঁ যে তাতে নেই, এটা নিঃসন্দেহ। অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে ইয়োরোপে ফিরেছিলেন তিনি—তাঁর ঐশ্বর্যের পরিমাণ অনেক-কেই স্তম্ভিত করেছিলো তখন। এখন তিনি ভলতেয়ারের পরামর্শ অনুযায়ী নিজের বাগানে বাঁধাকপির চাষ করেন, তারপর তাদের ভক্ষণ এবং এমনকি তাদের হজম করতেও কোনো বেগ পান না—অন্তত সবজান্তা সাংবাদিকদের কথা কেউ যদি বিশ্বাস করেন, তাহ'লে এ-কথা মান্য না-ক'রে উপায় নেই।*

এই কামান বিস্ফোরণের পর ইম্পে বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকল এতকাল অপেক্ষাকৃত শান্তভাবে প্রভূত সম্মানের সঙ্গে দিন কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই রকম আরেকটি কাজে হাতে দেবার জন্য ভিতরে-ভিতরে তাঁরা অধীর হ'য়ে ছিলেন এতকাল: নানা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছেন, চেষ্টা করেছেন আরেকটি রুদ্ধশ্বাস অভিযানে

---

* জুল ভের্ন রচিত বৈজ্ঞানিক কাহিনী 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন'-এ এই কাহিনী বিবৃত হয়েছে; সেই বইটিতে গান-ক্লাবের পুরো পরিচয় পাওয়া যাবে।

banglabooks.in

রত হবার। অর্থ তাঁদের ছিলো যথেষ্ট। প্রায় আশি লক্ষ ডলার চাঁদা তুলেছিলেন তাঁরা, তার মধ্যে প্রায় কুড়ি লাখ ডলার এখনো অটুট আছে। এই টাকা তোলা হয়েছিলো সমগ্র বিশ্ব থেকে। তাছাড়া ইচ্ছে করলেই তাঁরা অজস্র অর্থ উপার্জন করতে পারেন—একবার যদি ওই গোলায় ব'সে লোককে দর্শন দিতে রাজি হন, তাহ'লেই যে কোনো সময়ে বিপুল অর্থ তুলে আনতে পারেন। কোনো উচ্চাভিলাষী মর্তধামবাসী যতটুকু মহিমা ও যশ পেতে পারে, সব তাঁরা পেয়েছেন। অলস্য যদি তাঁদের নিয়ত দংশন না করতো, তাহ'লে ইম্পে বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকল অনায়াসে সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে পারতেন। কিন্তু সুখ তাঁদের যেন কামড়ায় কেবল। কেবল যে ব'সে-থাকার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই তাঁরা এই সুমেরুবৃত্ত কিনে নিয়েছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু এটা ভুললে চলবে না যে ৮,০০০০০ ডলারের বেশি যত টাকা এতে লেগেছে এবং লাগবে, সব শ্রীমতী এভাঞ্জেলিনা স্করবিটই দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। এই দানশীলা মহিলার সৌজন্যেই আমেরিকা ইয়োরোপকে হারাতে পারলো। মর্ত-ধামে ফিরে আসার পর থেকেই সভাপতি বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকল চূড়ান্ত বিখ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু আরেকজন ওই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, যাঁর দানকেও স্বীকৃতি দিতে হবে। সহজেই অনুমেয় যে আমরা গোলন্দাজ সংঘের অস্থায়ী সম্পাদক জে. টি. ম্যাস্টনের কথা বলছি। গণিতবিদ্যায় পারদর্শী এই মানুষটিরই মেধা ও প্রতিভা ছাড়া চন্দ্রলোকে যাত্রা কিছুতেই সম্ভব হ'তো না, কেননা সমস্ত বৈজ্ঞানিক হিশেব তিনিই করেছিলেন। তিনি যে সেই ভয়ংকর অভিযানে বার্বিকেনদের সহযাত্রী হননি, তার কারণ এটা নয় যে ভয় তাঁকে পিছু টেনেছিলো; তার আসল কারণ ছিলো এই যে যুদ্ধে তাঁর দেহে আঘাত লেগে-ছিলো। মানব জাতির প্রতিনিধি হিশেবে চাঁদে এ-রকম একজন পঙ্গু মানুষ গেলে চাঁদের প্রাণীদের ধারণা খুব খারাপ হ'য়ে যেতো না কি—আর চাঁদ কি না পৃথিবীরই একটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপগ্রহ! অত্যন্ত পরিতাপ ও খেদের সঙ্গে ম্যাস্টন তখন বাড়ি ব'সে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। তাই ব'লে তিনি কুঁড়ে হ'য়ে থাকেননি। এক বিপুল দুরবিন তৈরি ক'রে রকি মাউন্টেনের সবচেয়ে উঁচু চুড়ো লঙপীকে বসিয়ে তিনি স্বয়ং সেখানে গিয়েছিলেন; কামান ছোঁড়ার পর থেকে এক মুহূর্তের জন্যও ওই জায়গা থেকে তিনি নড়েননি। সেই 'মানমন্দির' থেকে তিনি মহাশূন্যে তাঁর বন্ধুদের যাত্রার প্রতিবেদন রচনার ভার নিয়েছিলেন। লোকে হয়তো বিশ্বাস ক'রে বসবে যে তাঁর বন্ধুরা পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেলেন; চাঁদের আকর্ষণে আটকে গিয়ে

banglabooks.in

তারই আরেকটি উপগ্রহ হ'য়ে-পড়া তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব ছিলো না। কিন্তু যাকে বলা যায় দৈবানুগ্রহ, তা-ই ঘটেছিলো যেন ; ফলে সেই গোলা একবার চাঁদের চারপাশে ঘুরে আসার পর তাকে না-ছুঁয়েই কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো ভয়ংকর বেগে পৃথিবীর দিকে প'ড়ে গেলো ; মিনিটে ৫,৭৬,০০০ মাইল বেগে সে প্রশান্ত মহা-সাগরে এসে পড়লো—তারপর সমুদ্র তাকে গিলে ফেললে। ভাগ্যিশ সেই অতল তরলে এসে পড়েছিলো গোলাটা, যার ফলে তার গতি ম'রে গেলো ; আর ভাগ্যিশ মার্কিন জাহাজ 'সাসকুয়েহানা' তাকে জলে পড়তে দেখেছিলো। যেই গান-ক্লাবের সম্পাদক ম্যাস্টনের কাছে এই বার্তা গেলো, অমনি তিনি লঙপীকে সেই 'মানমন্দির' ছেড়ে বন্ধুদের বাঁচাবার জন্য ছুটে এলেন। গোলাটা যেখানে পড়েছিলো সেখানে ডুবুরি নামানো হ'লো। ম্যাস্টনও তখন ডুবুরির পোশাক প'রে বন্ধুদের খুঁজে বের করতে একটুও দ্বিধা করেননি। কিন্তু এত ঝামেলার কোনো দরকার ছিলো না। সেই সুন্দর পতনের পর গোলাটি প্রশান্ত মহাসাগরের ফেনিল জলে ভেসে বেড়াচ্ছিলো। আর দেখা গেলো ক্যাপ্টেন নিকল ও মিশেল আর্দাঁর সঙ্গে সভাপতি বাবিকেন সেই ভাসমান বন্দীশালায় অক্ষক্রীড়ায় তন্ময়।

জে. টি. ম্যাস্টনের কথায় আবার ফিরে আসা যাক। চন্দ্রালোকে যাত্রার ব্যাপারে তিনি যে-দায়িত্ব বহন করেছিলেন. তা নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রশংসাযোগ্য। এটা সত্যি যে ওই ধাতুনির্মিত হাতের জন্য তাঁকে খুব রূপবান বলা চলে না। তরুণ তিনি মোটেই নন, বয়স আটান্ন বছর। কিন্তু তাঁর চরিত্রের মধ্যে এমন একটা 'নিজত্ব' ছিলো, তাঁর মেধা ও মনীষার মধ্যে এমন একটি প্রাণময়তা ছিলো, আর এতই সতেজ শক্তি ও নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি কাজে লাগতেন যে এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের কাছে তিনি আদর্শ পুরুষ ব'লে বিবেচিত হয়েছিলেন। অস্পৃষ্ট ছিলো তাঁর প্রজ্ঞা ও প্রতিভা ; এ-যুগের একজন স্মরণীর অনুগণক ব'লে তাঁকে বর্ণনা করলে দোষের হবে না। অঙ্কের নাম শুনলেই যদিও এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের জ্বর আসতো, এবং গণিতশাস্ত্রে তাঁর যদিও একটুও রুচি ছিলো না, তবু এই গণিতজ্ঞটির প্রতি তাঁর অনুরাগের সীমা ছিলো না। শ্রীমতী স্করবিট গণিতজ্ঞদের জগতের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর মানুষ-ব'লে মনে করতেন। পিপের মধ্যে যেমন বাদাম ভর্তি থাকে, তেমনি যে-সব মাথায় এক্স, ওয়াই, জেড্ ভিড় ক'রে আছে, যে-সব মস্তিষ্কে বীজগণিতের নানা চিহ্ন খেলা ক'রে বেড়ায়, যে-সব হাত পূর্ণসংখ্যার ত্রিগুণ নিয়ে জাদুকরের খেলা দেখায়—তাঁদেরই তিনি ভালোবাসেন। হ্যাঁ, এই মহাজ্ঞানীদেরই সমর্থন ও প্রশস্তি-যোগ্য ব'লে তাঁর মনে হ'তো। চুম্বকের

banglabooks.in

মতো তাঁদের দিকে যেন আকৃষ্ট হতেন তিনি। আর জে. টি. ম্যাস্টন হলেন সেই রকমই একজন, তিনি যাঁদের স্তব করেন; যদি তাঁদের জীবন (অর্থাৎ তাঁর ও ম্যাস্টনের) কোনোরকমে এক হ'তে পারে তাহ'লেই তাঁর সুখ পূর্ণ ও অসীম হবে। তাঁর অঙ্কের একমাত্র উত্তর ছিলো এটাই। গোলন্দাজ সংঘের সম্পাদকটি অবশ্য তাতে একটুও বিচলিত হতেন না, কেননা এবম্প্রকার মিলনের মধ্যে সুখ যে কোথায়, তা তিনি কখনো জানেননি।

মিসেস এভাঞ্জেলিনা স্করবিট এখন আর যুবতী নন। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হ'লো তাঁর; কেশগুচ্ছ কপালে লেপ্টে থাকে; দাঁতগুলি বড়ো-বড়ো—একটা দাঁতও পড়েনি; কটিদেশের কোনো আকার নেই, চলার মধ্যে নেই শ্রী বা ছন্দ; এক কথায় তাঁকে দেখলে মনে হয় একজন বর্ষীয়সী কুমারী, যদিও বিয়ে তিনি করেছিলেন এবং কয়েক বছর আগে তাঁর পতিবিয়োগ হয়েছে। মানুষ হিশেবে সব সত্ত্বেও তিনি চমৎকার আর বাল্টিমোরের সমাজে জে. টি. ম্যাস্টন ব'লে পরিচিত হ'তে পারলেই তাঁর সুখের পেয়ালা উপচে পড়বে। অর্থবিত্ত তাঁর যথেষ্ট আছে যদিও রথসচাইল্ডকে যাঁরা ভিক্ষে দিতে পারেন, সেই গৌল্ড, ম্যাকাই বা ভাণ্ডেরবিল্টের মতো ক্রোড়পতি তিনি নন। মিসেস স্টুয়ার্টের মতো তিনশো ক্রোড় টাকা তাঁর নেই, মিসেস ব্রুকারের মতো আশি ক্রোড় বা মিসেস কার্পারের মতো দুশো ক্রোড় টাকা তাঁর আছে, এ-কথাও তিনি বলেন না। মিসেস হ্যামার্সলে, মিসেস হেটি গ্রীন, মিসেস মাফিট, মিসেস মার্শাল, মিসেস প্যারান স্টিভেন্স, মিসেস মিনটার্ন বা আরো অনেকের মতো ধনীও তিনি নন। তবে অন্তত পাঁচ ক্রোড় টাকা না-থাকলে নিউ ইয়র্কের ফিফ্‌থ্ অ্যাভিন্যুর হোটেলের যে-ভোজসভায় ঢুকতে দেয় না, সেখানে গিয়ে বসার অধিকার তাঁর আছে। সংক্ষেপে এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের নগদ কড়কড়ে আশি লক্ষ ডলার আছে—বা কুড়ি ক্রোড় ফ্রাংক; জন পি. স্করবিটের কাছ থেকে এই টাকা তিনি পেয়েছেন; তাঁর ছিলো শুকনো ও লবণমাখা শুয়োরের মাংসের ব্যাবসা। এই দানশীলা মহিলাটি তাঁর সমস্ত অর্থ জে. টি. ম্যাস্টনের হাতে তুলে দিতে পারলে যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হতেন; অবশ্য অনুরাগ ও ভালোবাসার যে-অফুরান রত্নখনি তাঁর ছিলো, তাও তিনি ম্যাস্টনের জন্যই তুলে রেখেছিলেন।

কাজেই এভাঞ্জেলিনা স্করবিট যখন ম্যাস্টনের প্রয়োজন জানতে পেলেন, তখন সানন্দে কোনো কিছু জিগেস না-ক'রেই সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার হাতে কয়েক লক্ষ ডলার তুলে দিতে রাজি হলেন। মেরুদেশ কিনে তারা কী

banglabooks.in

করবে, তা তিনি জানতেন না, জানতে চানও নি। তিনি শুধু এটুকু জানতেন যে স্বয়ং জে. টি. ম্যাস্টন যখন এ-ব্যাপারে লিপ্ত আছেন, তখন ব্যাপারটি সম্ভ্রমসূচক, বৃহৎ ও অতিকায় না-হ'য়ে যায় না। গোলন্দাজ সংঘের সম্পাদকের কথা চিন্তা করাই তাঁর পক্ষে যথেষ্ট। অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন যে নিলেম হ'য়ে যাবার পর যখন বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির নাম এই নবতম প্রতিষ্ঠান ব'লে ঘোষিত হ'লো এবং এটা যখন জানা গেলো যে বার্বিকেনই কোম্পানির প্রধান অধ্যক্ষ, তখন হয়তো ম্যাস্টনের আস্থা পেয়েছেন তিনি। তাঁরই টাকা কি সকলের চেয়ে বেশি নয়? তিনিই তো নিজেকে চুরাশি ডিগ্রি অক্ষরেখার পরবর্তী সমস্ত মেরুদেশের স্বত্বাধিকারিণী! কিন্তু মেরুদেশ দিয়ে তিনি কী করবেন? সংস্থাই বা কোন লাভের ব্যাবসা ফাঁদতে চাচ্ছে? এ-সব প্রশ্নের উত্তর স্করবিট জানেন না, এবং অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে এভাঞ্জেলিনা স্করবিট যদি এ-ব্যাপারে কিছু কৌতূহল বোধ করে থাকেন, তাহ'লে বলতে হয় সমগ্র জগৎই ততোধিক কৌতূহল পোষণ করে। তাঁর কৌতূহল কিন্তু সমগ্র রহস্যটি সম্বন্ধেই বেশি ছিলো। এমনিতে এই চমৎকার মহিলাটি বেশ বিচক্ষণ, টাকা দেবার আগে তবু তিনি ম্যাস্টনের কাছ থেকে দু-একটা তথ্য জানবার চেষ্টা করেছিলেন। ব্যাপারটি যে অতিবৃহৎ তাতে তো সন্দেহ নেই, জাঁ জাক তো ব'লেই ছিলেন এ-রকম আর এর আগে হয়নি, ভবিষ্যতেও হবে না—তাছাড়া এটা এমন একটা উদ্যম, যার কাছে গান-ক্লাবের চন্দ্র-লোক যাত্রাও মলিন হ'য়ে যাবে। কিন্তু যখনই এভাঞ্জেলিনা স্করবিট কিছু জিগেস করেছেন, ম্যাস্টন তাঁকে একটি কথাই শুনিয়েছেন, 'মহোদয়া, দয়া ক'রে ধৈর্য ধরুন।' সম্মিলিত ইয়োরোপীয় রাষ্ট্রপুঞ্জকে হারিয়ে দিয়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই বিজয়ে এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের যে-আনন্দ হয়েছে, তা আরো বেড়ে যেতো যদি তিনি বার্বিকেনদের আস্থা পেতেন। হেসে তিনি বিখ্যাত অনুগণকটিকে জিগেস করলেন, 'কিন্তু তাহ'লে কি আমি মূল ব্যাপারটা জানতে পারবো না।'

'শিগ্‌গিরই জানতে পাবেন,' মহিলাটির পাণিপীড়ন ক'রে দরাজ গলায় ম্যাস্টন বললেন।

এ-কথা শুনে এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের অস্থিরতা আপাতত কিঞ্চিৎ শান্ত হ'লো। কিন্তু তার কয়েকদিন পরেই যখন কোম্পানির গোপন অভিপ্রায় ঘোষণা ক'রে লোকের কাছ থেকে চাঁদা দেওয়া হ'লো, সারা জগৎ একেবারে কেঁপে উঠলো। সুমেরুর কয়লাখনিগুলি কাজে লাগাবার জন্যই নাকি কোম্পানি মেরুবলয় কিনে নিয়েছে।

banglabooks.in

উত্তর মেরুতে কি সত্যি কয়লার খনি আছে? বুদ্ধিমানেদের মনে এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে প্রথমে জেগে উঠলো। কেউ বললে কয়লার খনি থাকবে কেন উত্তর মেরুতে? অন্য অনেকেও আবার ঠিক একই রকম জোর দিয়ে বললে, 'নেই, তা-ই বা বলা যায় কী ক'রে?' কয়লাখনিগুলি যে সারা জগতে ছড়িয়ে আছে এটা তো সকলেই জানে। ইয়োরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে অজস্র কয়লার খনি আছে। আমেরিকাতেও তেমন-কিছু কম নেই; আর তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের খনিগুলিই সম্ভবত সবচেয়ে ঐশ্বর্যময়। এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়াতেও অজস্র কয়লাখনি পাওয়া গেছে। জগৎকে আমরা যত বেশি জানছি, ততই নতুন-নতুন খনি আবিষ্কৃত হচ্ছে। অন্তত একশো বছরের মতো আমাদের কয়লার অভাব হবে না। একা ইংল্যাণ্ডই বছরে ১৬০০০০০০০ টন কয়লা উৎপাদন করে। স্বভাবতই নিত্যবর্ধমান কলকারখানার সঙ্গে-সঙ্গে একই অনুপাতে কয়লাও বেশি পাওয়া চাই। যদি এমনকি বিদ্যুৎ এসে একদিন বাষ্পের স্থান অধিকার ক'রে বসে, তাহ'লেও এটা ঠিক যে কয়লা কাজে লাগবেই। এটা আমাদের কাছে এত বেশি জরুরি যে জগৎকে 'কয়লার জীব' বললেও ভুল হয় না; আর সেই কারণেই তার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ ও প্রযত্ন দরকার। কেবল যে জ্বালানি হিশেবেই কয়লাকে ব্যবহার করা হয়, তা নয়; অশোধিত কয়লাকেও বিজ্ঞান নানা কাজে লাগিয়ে থাকে। বীক্ষণাগারে যে-সব রূপান্তর তাকে মেনে নিতে হয়, তার ফলে তাকে দিয়ে কোনো কিছু রঙ করা যায়, সুগন্ধি ক'রে তোলা যায়, করা যায় শোধিত, তপ্ত ও আলোকিত—এমনকি হিরের টুকরোকে সুন্দর করার জন্য পর্যন্ত কয়লা লাগে। লোহার মতোই, কিংবা হয়তো তারও চেয়ে বেশি দরকারি এই খনিজ দ্রব্যটি। আমাদের সৌভাগ্য যে লৌহ নামক ধাতুটি কোনোকালেই নিঃশেষ হবে না, কেননা বস্তুত জগৎটাই ওই ধাতু দিয়ে তৈরি। সমস্ত জগৎকে আসলে বিরাট ও নিরেট একটি লৌহপিণ্ড ব'লে বর্ণনা করা যায়: অন্যান্য ধাতু, পাথর ও জল অর্থাৎ অন্যান্য আদিম দেবতারা ভূত্বকের গঠনে অনেক পিছিয়ে আছে। কিন্তু লোহার যদিও কোনো অভাবই কোনোকালে আমাদের হবে না, কয়লার ব্যাপারে কিন্তু তা নয়। কয়লার জোগান লোহার মতো অমন অফুরন্ত তো নয়ই, বরং ঢের কম। যাঁদের এ-সম্বন্ধে কথা বলার যোগ্যতা

banglabooks.in

ও অধিকার আছে, এবং যাঁরা কয়েকশো বছরের পৃথিবীকে অলোকদৃষ্টির সামনে উন্মোচিত হ'তে দ্যাখেন, তাঁরা সর্বদাই কয়লার এই দুর্ভিক্ষের কথা ব'লে থাকেন। 'কিন্তু,' বিরোধী দলও তক্ষুনি ব'লে ওঠেন (এবং যুক্তরাষ্ট্রে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা কেবল তর্কের খাতিরেই রিরোধিতা ক'রে থাকেন এবং বিরোধিতা ক'রে মজা পান), কিন্তু সুমেরুবৃত্তে কয়লা পাওয়া যাবে কেমন ক'রে ?' 'কেন ?' প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের সমর্থকেরা ব'লে ওঠেন 'জগৎ যখন প্রথম সূর্য থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে শক্ত হ'তে শুরু করে, তখন সূর্য এমন ছিলো যে বিষুবরেখা বা মেরুদেশে তাপের খুব একটা তারতম্য হ'তো না। তারপরে, মানবজাতির আবির্ভাবের আগে বিশাল অরণ্য মেরুবৃত্তকে ঢেকে দিলে, আর পৃথিবী নামক গ্রহটিও তাপ ও আর্দ্রতার একটানা আক্রমণের কাছে আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিলে।' নানা কাগজ ও সমসাময়িক পত্র এই মতবাদটি সহস্র বিভিন্ন রচনায় প্রচার করলো—কখনও ঠাট্টা করার জন্য, কখনও-বা সত্যি তা বিশ্বাস ক'রে : 'আর যে-অতিকায় পরিবর্তনের ফলে পৃথিবী বর্তমান আকার নিয়েছে, তা ঘটার আগেই তার সমস্ত অরণ্য ধীরে-ধীরে অদৃশ্য হ'য়ে গিয়েছে ; তারপর রূপান্তর ও পরিবর্তনের অন্তহীন চাপে প'ড়ে কালপ্রভাবে তা আভ্যন্তরীণ জল ও তাপের ক্রিয়ায় কয়লাখনিতে পরিণত হয়েছে। কাজেই এই মতবাদের মতো সম্ভাব্য ও সম্ভাবনাময় আর-কিছু নেই ; এবং যারা খনি কেটে তুলতে পারবে তাদের কাছে সুমেরু এক বিশাল আকর উন্মুক্ত ক'রে দেবে।' তথ্য হিশেবে এ-কথার বিরোধিতা করা যায় না। এমনকি যারা সকল সম্ভাবনার সূত্র মেনে সমস্ত হিশেব ক'রে থাকে তারা পর্যন্ত এই তথ্যগুলিকে উড়িয়ে দিতে পারলো না। আর এই তথ্যগুলিই লোকেদের মধ্যে তাদের উপর বিপুলভাবে আস্থা বাড়িয়ে দিলো।

'ট্রু ফ্রেণ্ডস' নামক একটি সরাইখানার এক কোণে সকলের অগোচরে ব'সে এই বিষয়েই তাঁর সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করছিলেন মেজর ডনেলান। 'তা ঠিক,' ডীন টুড্রিঙ্ক বললেন, 'এই বার্বিকেন লোকটা (লোকটাকে একদিন ফাঁসিতে লট-কালে খুশি হই) ঠিক কথাই বলছে ব'লে মনে হয়।'

'তার মত যে অতি সম্ভাব্য, তাতে সন্দেহ নেই,' মেজর ডনেলান বললেন। 'আমার তো মনে হয় তা এত নিশ্চিত যে তর্কাতীত। মেরুদেশে, সন্ধান করলে, কুবেরের ঐশ্বর্য পাওয়া যাবে। উত্তর আমেরিকাতে যদি এতগুলি কয়লাখনি থেকে থাকে—আর যদি কাগজের খবর সত্যি হয়—আরো অনেকগুলি খনি

banglabooks.in

যদি সম্প্রতি সত্যি আবিষ্কৃত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এটা নিশ্চয়ই অসম্ভব নয় যে আরো অনেকগুলি এখনো অনাবিষ্কৃত থেকে গেছে। আরেকটা কথা তোমাকে জানাতে পারি। অধ্যাপক নোর্ডেনস্কিয়োল সুমেরুবৃত্তে অনুসন্ধান চালিয়ে এমন সমস্ত শিলা পেয়েছেন যার জীবাশ্মবৈচিত্র্য বিপুল।'

'কোথায় পেয়েছেন শিলাগুলি ? মেরুর কাছে ?

'মেরুর কাছে।' মেজর উত্তর দিলেন, 'কয়লা যে সেখানে আছে, এটা প্রায় সংশয়াতীত। শুধু ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে তুলে নেবার অপেক্ষা। এখন, কয়লা যদি ও-সব জায়গার ভূপৃষ্ঠেই এত বিপুল, তাহ'লে তার আকর নিশ্চয়ই ভূত্বকের নানা স্তর ভেদ ক'রে গেছে।' তাঁর ভুল হয়নি। সুমেরুর ভূতাত্ত্বিক গঠন অত্যন্ত ভালোই জানা ছিলো মেজর ডনেলানের : তাছাড়া এ-বিষয়ে তাঁর মতের বিরোধিতা করাও তেমন নিরাপদ নয়। সরাইখানার অন্য লোকেরা যদি এত উৎসুকভাবে না-শুনতো, তাহ'লে এ-সম্বন্ধে তিনি আরো অনেকক্ষণ ব'লে যেতেন। কিন্তু এখন তিনি একটা কথা জিগেস ক'রেই থেমে যাওয়া সমীচীন বোধ করলেন ; 'একটা বিষয়ে কি তোমার অবাক লাগেনি ? এ-ব্যাপারে নাবিক বা প্রয়োগবিদদের দেখা পাওয়া স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত ; অথচ, আশ্চর্য, গোলন্দাজেরাই কেবল এই ব্যাপারটায় লিপ্ত !'

সভ্য জগতের কাগজগুলি যে অচিরেই তারপর সুমেরুতে কয়লাখনি আছে কি না সে-সম্বন্ধে আলোচনা শুরু ক'রে দেবে, এটা মোটেই বিস্ময়কর নয়।

প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনের পক্ষ সমর্থন ক'রে একটি মার্কিন কাগজের সম্পাদক লিখলেন, 'কয়লা সেখানে পাওয়া যাবে না-ই বা কেন ? এটা তো আমাদের মনে আছে যে ১৮৭৫ ও ১৮৭৬ সালে বিরাশি ডিগ্রি অক্ষরেখায় ক্যাপ্টেন নেয়ার্স হ্যাজেল, পপলার, বীচ গাছ ও অজস্র কুসুমশয্যা আবিষ্কার করেছিলেন।'

'এবং ১৮৮১ ও ১৮৮৪ সালে,' নিউ-ইয়র্কের একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকা যোগ করলে, 'লেডি ফ্র্যাঙ্কলিন উপসাগরে অভিযান চালাবার সময় ক্যাপ্টেন গ্রীলি কি ওয়াটার-হাউসের কাছে, ফোর্ট কনুগের-এর অদূরে কয়লার আকর আবিষ্কার করেননি ? আর ডক্টর পেভি কি এ-কথা বলেননি যে এই অঞ্চল কয়লায় একেবারে টই-টুম্বুর, যেন এই ভয়ংকর তুষার-স্তূপের সঙ্গে একদিন যুদ্ধ করতে হবে ব'লেই সেখানে তাদের জন্ম !'

মার্কিন অভিযাত্রীদের আবিষ্কৃত এইসব দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত তথ্যের বিরুদ্ধে প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনের শত্রুরা যে কী ব'লে জবাব দেবে, তা-ই ভেবে পেলো না। যারা আগে

banglabooks.in

বলেছিলো যে ওখানে আবার কয়লা থাকবে কী ক'রে, তারা, এখন যারা 'কয়লা থাকবে নাই-বা কেন' বলেছে তাদের মাথা নোয়াতে বাধ্য হ'লো। 'নিশ্চয়ই কয়লা আছে সেখানে, বেশ বিপুল পরিমাণেই আছে—' এই কথাই তারা ভাবলে এবার। একদা যেখানে উদ্ভিদ জগতের চরম বিকাশ ঘটেছিলো, মেরুবৃত্তের সেই হিম মুকুটের নিচে কয়লার মূল্যবান স্তূপ লুকিয়ে আছে। কিন্তু কয়লা সম্বন্ধে দ্বিরুক্তির অবকাশ না-পেলেও, শত্রুপক্ষ অন্যভাবে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করলে। গান-ক্লাবের সভা-ঘরে তুমুল তর্কাতর্কির পর শেষটায় মেজর ডনেলান বললেন, 'বেশ,'—এবারই প্রথম বার্বিকেনের সঙ্গে তাঁর মুখোমুখি দেখা হ'লো—'বেশ, স্বীকার করছি যে সেখানে কয়লার খনি আছে; না-হয় আমি জোর দিয়েই বলবো যে আপনারা এমন একটা জায়গা কিনেছেন যেখানে কয়লার একেবারে ছড়াছড়ি। কিন্তু যান দেখি, গিয়ে সেগুলি সন্ধান করুন—হা! হা! হা!'

'ঠিক তা-ই আমরা করতে যাচ্ছি,' বললেন বার্বিকেন।

'চুরাশি ডিগ্রি অক্ষরেখার ওপারে যাবেন? যেখানে কোনো অভিযাত্রীই এ-যাবৎ পদার্পণ করতে পারেননি?'

'আমরা তাও পেরিয়ে যাবো—মেরুবিন্দুতে গিয়ে পৌঁছুবো আমরা,' বললেন বার্বিকেন। 'পৌঁছুবোই আমরা সেখানে।' এত ঠাণ্ডা, দৃঢ়, স্পষ্ট ও দ্বিধাহীন গলায় গান-ক্লাবের সভাপতি কথাটি বললেন যে তাঁর সবচেয়ে প্রবল বিরোধীটিও একটু মুষড়ে গেলেন। এমন-একটি মানুষের কাছে তাঁরা এসেছেন, যিনি এখনও তাঁর আগেকার শান্ত, ধীর, স্থির, চিন্তাশীল মনটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, যে মনটি ঘড়ির কাঁটার মতো নির্ভুল, নির্ভীক ও দুঃসাহসী, যে-মনটি সমস্ত স্বাভাবিক ও বাস্তব পরি-কল্পনার সঙ্গে চূড়ান্ত ঔদ্ধত্য ও জেদ মিশিয়ে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে ভালোবাসে।

প্রতিদ্বন্দ্বীটিকে গলা টিপে মারার একটা উদগ্র ইচ্ছে অনুভব করলেন মেজর ডনেলান। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনও সবল ও সুস্থ—ঝড়-জলের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো বুকের পাটা তাঁর আছে; কাজেই মেজরের ভয়ে তিনি মোটেই কম্পিত হলেন না। তাঁর শত্রু, মিত্র, বা তাঁর প্রতি যারা ঈর্ষাতুর, তারা প্রত্যেকেই তাঁর চরিত্রের এই দিকটা ভালো ক'রে জানতো। কিন্তু ঈর্ষাতুরের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিলো না, ফলে গান-ক্লাবের সভ্যদের নিয়ে নানা পরিহাসময় মজার গল্প শোনা যেতো। নানা ব্যঙ্গচিত্র আর ক্যারিকেচার রচনা করা হ'লো তাঁদের নিয়ে—ইয়োরোপের সর্বত্রই হ'লো, তবে ইংল্যাণ্ডে সবচেয়ে বেশি, কেননা ইংরেজরা পাউণ্ড-স্টার্লিং-এর দিক থেকে যে মার খেয়েছিলো তা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। 'আহা,' তারা ঢক্কা-

banglabooks.in

নাদ করলে, 'এই ইয়াঙ্কিটার মাথায় কিনা সুমেরুতে পৌঁছুবার ইচ্ছে জন্মেছে! এ-যাবৎ কোনো জ্যান্ত প্রাণী যেখানে যেতে পারেনি, সেখানে সে পদার্পণ করতে চায়! সেখানে কত কী করবে সে—দালান-কোঠা বানাবে, বানাবে যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট-হাউস। কোনখানে বানাবে? না, যেখানে কিনা এখনো পৌঁছুনো যায়-নি! আর বাকি জগতের সব কিছুই তো আমাদের চেনা-জানা, কিন্তু সেখানে তার করণীয় কিছুই নেই!' তারপরে নানা কাগজে অদ্ভুত সব ব্যঙ্গচিত্রের প্লাবন ব'য়ে গেলো! কি ইয়োরোপের ছোটো শহর, বা কি আমেকিার বৃহৎ নগর—সর্বত্র, দোকানের জানলায়, বা সংবাদপত্রের আপিশে, প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের ব্যঙ্গচিত্র লটকে দেয়া হ'লো—নানা হাস্যকর ভঙ্গিতে তিনি সুমেরুতে পৌঁছোবার মরীয়া ও প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন, সেই সমস্ত রঙ্গব্যঙ্গের মূল বিষয় এই। এক উদ্ধত মার্কিন কার্টুনে দেখানো হ'লো গান-ক্লাবের সভ্যরা ওই অনড় ও ভয়ানক হিমশৈলের তলায় সুড়ঙ্গ কাটার চেষ্টা করছেন; চুরাশি ডিগ্রি অক্ষরেখায় তাঁরা সমাগত; প্রত্যেকের হাতে কোদাল ও শাবল। আরেকটা ছবির বিষয় ছিলো: জে. টি. ম্যাস্টন আর ক্যাপ্টেন নিকলের সঙ্গে ইম্পে বার্বিকেন অবশেষে বেলুনে ক'রে ওই মেরুবিন্দুতে গিয়ে নেমেছেন, এবং বহু ব্যর্থ ও প্রাণঘাতী চেষ্টার পর অবশেষে প্রায় আধ-পাউণ্ড ওজনের এক টুকরো কয়লা পেয়েছেন। সেই কাল্পনিক কয়লাক্ষেত্রে এই এক টুকরো কয়লাই তাঁরা আবিষ্কার করেছেন। জে. টি. ম্যাস্টনেরও অসংখ্য ব্যঙ্গচিত্র বানানো হ'লো: হাস্যোদ্রেক করার ব্যাপারে বার্বিকেনের মতো তাঁকেও অজস্রবার ব্যবহার করা হ'লো। সুমেরুর বৈদ্যুতিক আকর্ষণ বের করার প্রাণান্তকর চেষ্টার পর গান-ক্লাবের সম্পাদকই কিনা শেষ পর্যন্ত তাঁর ধাতুনির্মিত হাতের জন্য মাটিতে আটকে গেছেন!

বিখ্যাত অনুগণকটি কিন্তু একটু রগচটা মানুষ; তাঁর দৈহিক ত্রুটি নিয়ে এ-রকম ঠাট্টায় তিনি কোনোই মজা পেলেন না, বরং অত্যন্ত উক্ত্যক্তই বোধ করলেন। আর শ্রীমতী এভাঞ্জেলিনা স্করবিটেও যে তৎক্ষণাৎ তা অত্যন্ত জঘন্য ঠেকলো, তাও অতি সহজেই অনুমেয়। ব্রাসেল্‌সের 'লণ্ঠন' ব'লে একটা কাগজে দেখানো হ'লো যে গান-ক্লাবের সভ্যরা ফুঁ দিয়ে-দিয়ে মস্ত এক আগুনের কুণ্ড জ্বালাবার চেষ্টা করছেন; উদ্দেশ্য: অ্যাল্‌কোহলের সমুদ্র নিক্ষেপ ক'রে এই বিপুল তুষার-স্তূপ গলিয়ে ফেলা, যার ফলে এই মেরু পর্যঙ্ক সুরা ও শরবতে পরিণত হবে। এইসব ঠাট্টা-ভরা ছবির মধ্যে সবচেয়ে যেটা সফল ও লক্ষ্যভেদী হয়েছিলো, সেটা বেরিয়েছিলো ফরাশি 'শারাভারা' কাগজে, আর তার শিল্পীর নাম 'স্টপ'। তিমি মাছের পেটের মধ্যে ব'সে

banglabooks.in

বার্বিকেন আর ম্যাস্টন দাবা খেলতে-খেলতে কোনো-একটা অন্তরীপে পৌঁছুবার প্রতীক্ষা করছেন ; এই নতুন আয়োনা আর তাঁর সেক্রেটারিকে এই মস্ত তিমিঙ্গিলটি গিলে ফেলেছে ; আর তিমির পেটের মধ্যে ব'সেই তাঁরা হিমশৈলের তলা দিয়ে সুমেরুতে পৌঁছুতে চাচ্ছেন। নতুন সংস্থাটির অধ্যক্ষ অবশ্য এ-সব ব্যঙ্গচিত্রের পরোয়াই করলেন না ; যা-খুশি তারা লিখুক, ছড়া কাটুক, আঁকুক, কী এসে-যায়—এই ছিলো তাঁর অভিমত।

অনুমোদন পেয়ে সংস্থাটি যেই উদীচীর একচ্ছত্র অধিপতি হ'লো, অমনি ১৫০০০০০ ডলার চাঁদা তোলার জন্য লোকের কাছে আবেদন করা হ'লো। ১০০ ডলার দামের শেয়ার ছাড়া হ'লো বাজারে (পুরো টাকাটাই কেনার সময়ে প্রদেয়), এবং বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির সুনাম এত ছিলো যে বন্যার মতো টাকার স্রোত ব'য়ে গেলো তৎক্ষণাৎ। বেশির ভাগই এলো আমেরিকার বিভিন্ন রাজ্য থেকে। 'তা-ই সব চেয়ে ভালো,' কোম্পানির লোকেরা জানালেন, সম্পূর্ণ মার্কিন উদ্যোগ হয় তাহ'লে।'

বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির ভিত্তি এত দৃঢ় ছিলো যে অতি অল্প সময়ে পুরো টাকা তো উঠে এলোই, বরং প্রায় তার তিনগুণ পাওয়া গেলো। ব্যাপারটা সম্বন্ধে সকলেরই আগ্রহ ও ঔৎসুক্য দেখা গেলো : এমনকি বড়ো-বড়ো বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত তার সাফল্য সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ প্রকাশ করলেন না।

শেয়ারের সংখ্যা এক-তৃতীয়াংশ কমানো হ'লো ; ডিসেম্বরের ষোলো তারিখে দেখা গেলো কোম্পানির আদায়ীকৃত মূলধন নগদ ১৫,০০০০০ ডলার। গান-ক্লাব চাঁদের উদ্দেশে কামানের গোলা পাঠাবার সময় যত চাঁদা তুলেছিলো, এই টাকা তার ঠিক তিনগুণ।

সব টাকা যখন উঠে এলো, তখন আরেকটি বাধাও দূর হ'য়ে গেলো ; আর তাঁদের উদ্দেশ্য যে সফল হবেই, এ-বিষয়ে প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের মনে কোনো সংশয় রইলো না। সাফল্য সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকলে কিছুতেই তিনি লোকের কাছ থেকে চাঁদা তুলতে রাজি হতেন না। অবশেষে তবে সুমেরু জয় করার সময় এলো! অন্য অনেকেই যেখানে পরাস্ত হয়েছেন, প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন ও তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ যে

banglabooks.in

সেখানে জয়যুক্ত হবেন, এটা যেন নিশ্চিত ক'রে বোধ করা গেলো। ফ্র্যাঙ্কলিন, কেন, দ্য লঙ, নেয়ার্স বা গ্রীলি যা করতে পারেননি, তাই তাঁরা অনায়াসে সাধন করবেন। ৮৪ ডিগ্রি অক্ষরেখা পেরিয়ে যাবেন তাঁরা; নিলেমে যে-বিপুল ভূখণ্ড কিনেছেন, সত্যি গিয়ে তার দখল নেবেন। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকায় নতুন আরেকটি তারা যোগ হবে। 'সব ধাপ্পা,' ইয়োরোপ আর তার প্রতিনিধিরা শুধু এই কথাটিই বললো। অথচ সুমেরুকে জয় করার জন্য এত সৎ, যুক্তিময় ও ব্যবহারিক চেষ্টা এর আগে করা হয়নি; এত সরল তাদের প্রকল্প, যে মনে হয় যেন শিশুতোষ—কিন্তু ম্যাস্টন তাঁদের এই কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন পরিকল্পনাটাই জানালেন। চিন্তাটির উদ্ভব সেই মস্তিষ্কে, যেখানে প্রতিক্ষণেই নানা ভাবনা দানা বাঁধছে, আকার নিচ্ছে, জেগে উঠছে—যেখানে এই ভৌগোলিক উদ্যোগটি এমনভাবে দানা বেঁধে উঠেছে যে সাফল্য অনিবার্য।

গান-ক্লাবের এই সম্পাদকটি যে অনুগণকদের মধ্যে স্মরণীয়—বা অন্য ভাবে বলা যায়, একজন স্নাতকোত্তর অনুগণক—এই কথাটি বারে-বারে মনে করিয়ে দেয়া যাবে না। শুধু এটা বললেই হবে যে গণিতশাস্ত্রের জটিলতম সব সমস্যার নিরসনের জন্য মাত্র একটি দিনই তাঁর যথেষ্ট বোধ হ'তো। সমস্যাটা বীজগণিত বা গণিত—যারই হোক না কেন, তাঁর কাছে সব হাস্যকর ব'লে ঠেকতো। কেমন ক'রে তিনি সংখ্যা বা চিহ্নগুলিকে কায়দা ক'রে নেন তা পাঠকদের দেখা উচিত। বীজগণিতের চিহ্ন, অজ্ঞাত রাশিবাচক বর্ণমালার হরফ, রাশিগুলি কেমন ক'রে আয়ত্তে আসবে তা বোঝাবার জন্য যে-সব বর্গক্ষেত্র বা ঢ্যাড়া-চিহ্ন—সব যেন জাদুবলে তাঁর বশীভূত হ'য়ে গেছে। এই জটিল ভাষার চিহ্ন, রেখা ও মূল তাঁর নখদর্পণে; আর কী অনায়াসেই যে বন্যার মতো তা তাঁর কলমের ডগা দিয়ে বেরিয়ে আসে! কলম না-ব'লে চক-খড়ির কথা বলাই ভালো। কারণ তাঁর লোহার হাতে চক লাগিয়ে দিয়ে ব্ল্যাক-বোর্ডে অঙ্ক করতেই ভালবাসতেন তিনি। আর ছয় বর্গ-ফুট এই ব্ল্যাকবোর্ডই শুধু চাইতেন তিনি, এই ব্ল্যাকবোর্ডে কাজ করতেই তাঁর সবচেয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ হ'তো। অদ্ভুত সব চিত্র আঁকতেন তিনি—অতিকায় ও সৃষ্টিছাড়া। তাঁর '২' আর '৩' গুলি হ'তো যথাসম্ভব সুশ্রী ও গোলগাল। তাঁর ৭-কে দেখে মনে হ'তো যেন ক্রাচ, যেন তার উপর ভর দেবার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছে লোককে। তাঁর ৪ ছিলো চশমার মতো সুগঠিত; আর যে-সব বর্ণ ব্যবহার ক'রে তিনি তাঁর সূত্র রচনা করতেন, তিনি তা এমনভাবে লিখতেন যে স্বয়ং আর্কিমিডিসও তার জন্য গর্ব করতে পারতেন। জ্ঞাত রাশির বদলে ব্যবহৃত হ'তো বর্ণমালার আদি বর্ণ তিনটি—a, b, c, আর অন্বিষ্ট

banglabooks.in

অজ্ঞাত রাশির বদলে ব্যবহৃত হ'তো শেষ তিনটি বর্ণ x, y, z—বিশেষ ক'রে 'z', এবং ডেল্‌টা, ওমেগা, আল্‌ফা এই তিনটি গ্রীক বর্ণের প্রতি তাঁর মমতা ও আকর্ষণ ছিলো অসীম। স্পষ্ট, পরিচ্ছন্ন ও নিখুঁত অন্য যে-সব চিহ্ন তিনি যেমনভাবে ব্যবহার করতেন, তা একেবারে অবাক ক'রে দেয়। তার + চিহ্ন অত্যন্ত মুখরভাবে বুঝিয়ে দিত যে এই চিহ্ন এক বস্তুর সঙ্গে আরেক বস্তুকে যোগ ক'রে দিতে চাচ্ছে ; তাঁর — চিহ্ন ঈষৎ ছোটো মাপের হ'লেও আকারে সুন্দর ; তাঁর = বোঝাতো যে ম্যাস্টন এমন এক জগতে বাস করেন সাম্যবাদ সেখানে ব্যর্থ ও অলীক বুলিমাত্র নয়। আর সমানুপাতের বোধ প্রকাশিত হ'তো তার > চিহ্ন আর < চিহ্ন আর :: চিহ্ন দিয়ে। আর, কোনো সংখ্যা বা রাশির মূল বোঝাবার জন্য যে √ তিনি ব্যবহার করতেন, তাঁর কাছে তা ছিলো জয়-তিলকের মতো ; আর যখন তিনি কোনো অনুভূমিক রেখা দিয়ে এই √কে সম্পূর্ণ করতেন, তখন মনে হ'তো যেন ব্ল্যাকবোর্ডের এই চিহ্নটি ভ্রান্ত জগৎটিকেই তাঁর গণিতের কাছে সমর্পণ ক'রে দেবে।

কিন্তু এটা যেন কেউ ভুলেও না ভাবে ম্যাস্টনের গাণিতিক মেধা কেবল প্রাথমিক বীজগণিতের চর্চাতেই সীমাবদ্ধ ছিলো। তা নয়, মোটেই তা নয় ; যে-কোনো জ্যামিতিক বা কনিক সমস্যাও ছিলো তাঁর নখদর্পণে ; অভ্যস্ত হাতেই সব চিহ্ন ও চিত্র তিনি রচনা করতেন। দেখতে আপাত-সরল 'f'-এও তাঁর কোনো সংশয় বা দ্বিধা ছিলো না : আর তার তলায় সব সময়েই এক বিপুল অনুগণনার স্বাক্ষর থেকে যেতো। পূর্ণরচিত সংখ্যার সূচক 'e' চিহ্নের বেলাতেও তাই, আর অসম্পূর্ণতা বোঝাবার জন্য গণিতজ্ঞরা যে-চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাও ছিলো তাঁর অতি চেনা। অঙ্কের যে-রহস্যময় ও জটিল ভাষা সাধারণের অগম্য, তার সবগুলি প্রতীকই তাঁর আয়ত্তে ছিলো। গণিতের সর্বোচ্চ স্তরের সমস্যাও এই আশ্চর্য মানুষটির কাছে কুর্নিশ ক'রে যেতো। জে. টি. ম্যাস্টন মানুষটি এইরকম ছিলেন ব'লে তাঁর উপর তাঁর সহযোগীদের আস্থা ছিলো অসীম ; সেইজন্যেই তাঁর প্রচণ্ড মস্তিষ্কের কাছে অত্যন্ত জটিল সমস্ত সমস্যা নিয়ে তাঁরা উপস্থিত হতেন। চাঁদের উদ্দেশে গোলা পাঠাবার দুরূহ সমস্যাটির ভারও সেইজন্য গান-ক্লাব তাঁকেই দিয়েছিলো। সেই-জন্যেই তার যশ ও কীর্তির প্রতি এত ঔৎসুক্য ও আগ্রহ বোধ করছিলেন এভাঞ্জেলিনা স্করবিট -- পরে যা অনুরাগে পরিণত হয়েছিলো। বর্তমান ব্যাপারেও, অর্থাৎ সুমেরুবিজয়ের চেষ্টাতেও, কেবল তাঁর হাত দেবার ওয়াস্তা—তাঁর চিন্তায় ও স্বপ্নে মেরুদেশ এসে গেলেই তো সাফল্য হাতের মুঠোয় এসে গেলো। সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হ'লে কতগুলি গাণিতিক সমস্যা নিয়ে বসতে হয় তাঁকে—

banglabooks.in

হয়তো অত্যন্ত প্রহেলিকার মতো গাণিতিক জটিল সমস্যাকে নাড়াচাড়া করতে হবে—কিন্তু শেষকালে তিনি যে জয়ী হ'য়ে বেরিয়ে আসবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ একটা ভুলের জন্য কোটি-কোটি টাকার লোকশান মেনে নিতে হ'তে পারে, কিন্তু তবু তাঁর উপর আস্থা রাখাই নিরাপদ। তাঁর অঙ্কে এ-পর্যন্ত সামান্যতম ভুল কখনো হয়নি—যখন তিনি কোনো জিনিশের দৈর্ঘ্য মেপেছেন, এক ইঞ্চির সহস্রাংশও গরমিল হয়নি। একচুল এদিক-ওদিক হ'লে তিনি মাথার চুল ছিঁড়ে ফেলতেন। অনুগণনায় যখন তিনি ব্যস্ত থাকতেন, তখন তাঁকে কেমন দেখাতো তা জানার জন্য কয়েক সপ্তাহ পিছিয়ে যাওয়া ভালো।

উত্তর মেরু নিলেম হবে—এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি বেরোবার একমাস আগেই ম্যাস্টন একটা পরিকল্পনার গণনাকার্যে হাত দিয়েছিলেন ; সাফল্য সম্বন্ধে তাঁর নিজের মনে কোনো সন্দেহ ছিলো না, সহযোগীদেরও তিনি সেই প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন। বহু বছর ধ'রেই ম্যাস্টন বাল্টিমোরের সবচেয়ে শান্ত ও নিরিবিলি রাস্তা ফ্র্যাঙ্কলিন স্ট্রীটের ১৭৯ নম্বর বাড়িতে বাস করছেন ; শহরের শোরগোল নেই এখানে, কেননা বানিজ্যকেন্দ্র থেকে এই রাস্তা বহু দূরবর্তী ; আর বাণিজ্য সম্বন্ধে তাঁর যেমন কোনো আগ্রহ নেই তেমনি ভিড় সম্বন্ধেও নেই, যা তাঁকে অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্যক্ত করতো। ছোট্ট সুন্দর একটা বাড়িতে তিনি থাকেন, নাম—'বালিস্টিক কটেজ' বা কার্তুজ কুটির। গোলন্দাজ বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী হিশেবে সামান্য পেনসন পান, তা ছাড়া গান-ক্লাবের সেক্রেটারি হিশেবেও মাইনে দেয়া হয় তাঁকে—আর তাতেই তাঁর চ'লে যায়। নিগ্রো চাকর 'ফায়ার-ফায়ার' ছাড়া আর-কেউ থাকে না তাঁর সঙ্গে। 'ফায়ার-ফায়ার' সাধারণ ভৃত্য নয় ; বরং তাকে গুণমুগ্ধ বন্ধু বলা যায়, প্রভুকে সে আপন ভাইয়ের মতো দেখতো। ম্যাস্টন অকৃতদার : বর্তমান জগতে চিরকৌমার্যই বেঁচে থাকার একমাত্র বিচক্ষণ উপায়, এই ছিলো তাঁর অভিমত। 'চারটে ষাঁড়ের যে-শক্তি নেই, স্ত্রীলোকের একটি কেশ তার চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী,' এই প্রবচন তাঁর জানা ছিলো, কিন্তু তিনি তা মানতেন না। তিনি যে একা থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, তা স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে। আমরা তো জানি যে একবার এই একাকিত্বের বদলে যমল জীবনের সিদ্ধান্ত নিলেই তাঁর এই সামান্য আয় লাখ-লাখ টাকায় পৌঁছে যেতো। তাঁর নিজেরও তাতে সন্দেহ ছিলো না। স্করবিট তো অত্যন্ত সুখী ও আনন্দিত হবেন যদি···! কিন্তু আপাতত যেহেতু ম্যাস্টন নিজে সেই প্রস্তাবে সুখী বোধ করছেন না, সেই হেতু···! এটা প্রায়

banglabooks.in

নিশ্চিত মনে হয় যে এই দুটি মানুষ—পরস্পরের জন্যই যেন তাঁদের জন্ম হয়েছিলো, অন্তত এই কোমলা মহিলাটির ধারণা তো তাই—যেন কিছুতেই সন্ধিতে পৌঁছোবেন না। অত্যন্ত শাদাসিধে কুটির ম্যাস্টনের। দোতলা বাড়ি, দ্বিতলে একটি বারান্দা আছে। ছোটো একটি বৈঠকখানা, আর একটি ছোটো খাবারঘর ; তা ছাড়া আছে রান্নাঘর, আর বাগানের পিছনে বহির্বাটিতে আরেকটি ছোটো ঘর —এই হ'লো একতলা। দ্বিতলে তার শোবার ঘর ; এবং বাগানের দিকে একটি কর্মগৃহ, যেখানে বহির্জগতের হট্টগোল কখনো পৌঁছোয় না। এই চার দেয়ালের মধ্যেই এমন সব অনুগণনার জন্ম হয়েছে, এমনকি নিউটন ইউক্লিড বা লাপলাসকেও যা ঈর্ষাতুর ক'রে তুলতো। মিসেস এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের হর্ম্যটি ছিলো ঠিক তার বিপরীত ; নিউ-পার্কের নিউ পল্লীতে অলিন্দ মিনার আর গম্বুজে সাজানো তার বাড়ি—আদ্ধেক গথিক, আদ্ধেক রোমানেস্ক ; দামি আশবাবপত্রে ঠাশা একেকটা ঘর আর বড়ো হলঘর ; মস্ত একটি ছবিঘরে ফরাশি শিল্পীদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি ; রাজবাড়ির মতো সিঁড়ি চ'লে গেছে—আছে আস্তাবল, গাড়িঘর, আর ভৃত্যমহল ; আর আছে মস্ত একটি বাগান, যেখানে রম্য মূর্তিতে ফুলে ফোয়ারায় স্বপ্নলোকের সৃষ্টি হয়েছে ; আরো আছে মস্ত একটি মিনার যার চুড়োয় জলজলে ফলকের উপরে নীলে-সোনায় স্করবিট বংশের প্রতীক আঁকা। নিউ-পার্কের এই 'রাজবাড়ি', আর ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রিটের এই ছোট্ট কুটির—এদের মধ্যে দীর্ঘ তিন মাইলের ব্যবধান। তাই ব্যক্তিগত টেলিফোন বসিয়ে এই দুই বাড়ির মধ্যে যোগাযোগ করা হয়েছে, যাতে 'হ্যালো! হ্যালো!' এই ডাকের উত্তরে কুটিরে আর রাজবাড়িতে কথোপকথন আরম্ভ করা যায়। চোখে না-দেখলেও শুনতে পাবেন তো পরস্পরকে। ম্যাস্টন যখন ব্যস্ত ও উদ্ব্যস্ত হ'য়ে তাঁর গাণিতিক সমস্যায় আপ্লুত, শ্রীমতী স্করবিট যে অসংখ্যবার তখন ক্রিং-ক্রিং ক'রে ঘণ্টা বাজিয়ে তার সঙ্গে গল্প করেছেন, এ-কথা শুনলে কেউ নিশ্চয় অবাক হবেন না। বাধ্য হ'য়েই, অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফোন বেজে উঠলে কর্মে ইস্তফা দিতে হয় ম্যাস্টনকে। 'কেমন আছেন ? ভালো ?' মিসেস স্করবিটের এই মধুর সম্ভাষণের উত্তরে তিনি ঘোঁৎ ক'রে যে-নিনাদ করেন তা টেলিফোনে—দূরত্বের জন্য—সহৃদয় ও মধুর শোনায়। একটু গল্প ক'রেই আবার কাজে ফিরে যেতে পারলে বাঁচেন ম্যাস্টন। অক্টোবর মাসের তিন তারিখ সেটা—, দীর্ঘস্থায়ী শেষ অধিবেশনটির পর ম্যাস্টন নিজের কাজে হাত দেবার জন্য গানক্লাবের সভ্য ও বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। সবচেয়ে জরুরি কাজের ভার পড়েছিলো তাঁর উপর : কেলনা সুমেরুবিন্দুতে পৌঁছোবার জন্য বলবিদ্যা প্রয়োগের

banglabooks.in

সূত্রটিই তাকে বের ক'রে দিতে হবে ; কেননা অভেদ্য তুষার-মোড়া এই বিশাল ক্ষেত্রকে কাজে লাগাতে গেলে প্রথমে সেখানে না গেলে চলবে কী ক'রে ! অঙ্ক ক'ষে এই জটিল ও রহস্যময় হিশেবটি সাঙ্গ করতে তাঁর এক সপ্তাহ লাগবে। অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও প্যাঁচালো এই অঙ্ক, যুগপৎ বহু গভীর ও জরুরি সমস্যার সমাধান না-করলে কিছুতেই হিশেবটি শেষ করা যাবে না। তাই লোকে যাতে বিরক্ত করতে না-পারে, গান-ক্লাবের এই সম্পাদকটি তাই তাঁর কুটিরে অজ্ঞাতবাস করবেন ব'লে স্থির করলেন। এভাঞ্জেলিনা স্করবিটকে এই সিদ্ধান্ত অত্যন্ত দমিয়ে দিলে, কিন্তু তাকে মেনে নেয়া ছাড়া আর উপায় কী। প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল, হাস্যময় বিল্‌স্‌বি, কর্নেল ব্লুম্‌স্‌বেরি, আর কাঠের পা-ওলা টম হাণ্টার যখন তাঁকে শুভেচ্ছা ও বিদায় জানাতে ব্যস্ত, এভাঞ্জেলিনা স্করবিট তখন শেষবারের মতো ম্যাস্টনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

'সাফল্য আপনার অবধারিত,' বিচ্ছেদের মুহূর্তে এভাঞ্জেলিনা স্করবিট বললেন।

'কোনো ভুল যেন না হয় !' প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন যোগ ক'রে দিলেন।

'ভুল ? ওঁর ভুল হবে ?' বিস্ময় প্রকাশ করলেন মিসেস স্করবিট।

'এই বিশ্ব সৃষ্টি ক'রে ঈশ্বর যে-ভুল করেছেন তার চেয়ে বড়ো ভুল নিশ্চয়ই হবে না,' অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ম্যাস্টন উত্তর দিলেন। তারপরে দীর্ঘশ্বাস, শুভেচ্ছা ও অতিরিক্ত খাটুনির প্রয়োজন নেই এই পরামর্শের পরে—অনুগণকটি একা হলেন। কার্তুজ-কুটিরের দরজা বন্ধ ক'রে দেয়া হ'লো, ফায়ার-ফায়ারকে নির্দেশ দেয়া হ'লো কাউকে যেন সে ঢুকতে না-দেয়—এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টও এসে যদি দেখা করতে চান, তবে তাঁকেও না।

নির্জন বাসের প্রথম দু'দিন জে. টি. ম্যাস্টন কেবল ভাবলেন আর ভাবলেন : যে-দায়িত্ব তিনি নিজের কাঁধে নিয়েছেন সেই সম্বন্ধে কেবলই ভাবলেন তিনি, কিন্তু একবারও চকখড়ি স্পর্শ করলেন না। পৃথিবী, তার স্থূলতা, ঘন-মাপ, গঠন, মেরু-রেখায় ভর দিয়ে সে কীভাবে ঘোরে—এই সমস্ত তথ্য তাঁর অনুগণনার মূল ব'লে উপাদান সংগ্রহের জন্য নানা পুস্তক পড়তে হ'লো তাঁকে। যে-সূত্র ব্যবহার ক'রে তিনি হিশেব করেছিলেন, তা এইরকম :

পৃথিবীর গঠন : আবর্তমান এক উপবৃত্ত, যার দীর্ঘতম ব্যাসার্ধ ৬৩৭৭৩৯৮ মিটার আর ক্ষুদ্রতম ৬৩৫৬০৮০ মিটার। বিষুবরেখায় পৃথিবীর পরিধি ৪০৪০০ কিলো-মিটার। পৃথিবীর তল স্থূল হিশেবে ৫১০০০০০০ বর্গ-কিলোমিটার। পৃথিবীর আয়তন ত্রিঘাত কিলোমিটারের প্রায় ১০০০ মিলার্ড অর্থাৎ, এমন একটি ঘনফল

banglabooks.in

যার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর ব্যাসার্ধ এক মিটার। পৃথিবীর ঘনাঙ্ক ওজনের পাঁচগুণ। সূর্যের চতুস্পার্শ্বস্থ কক্ষে ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিট ১০ সেকেণ্ড ৩৭ সেণ্টাইম। তার ফলে মেরুরেখায় পৃথিবীকে ৩০৪০০ মাইল ঘুরতে হয়। বিষুবরেখার নিকটবর্তী ভূ-পৃষ্ঠের কোনো বিন্দুর গতি সেকেণ্ডে ৪৬৩ মিটার। অনুগণনায় মূলত এই পরিমাপগুলিই তিনি ব্যবহার করেছিলেন।

যে অক্টোবর মাসের পাঁচ তারিখে বিকেল পাঁচটায় এই আশ্চর্য কাজটিতে হাত দিলেন, সেটা উল্লেখ করা জরুরি। গণনা আরম্ভ করলেন বিষুবরেখার মহাবৃত্তটির পরিধির একটি নক্‌শা এঁকে। ঘষা ওক কাঠের ফ্রেমে আঁটা ব্ল্যাকবোর্ড ছিলো ঘরের এক কোণে, কাছের একটি জানলা দিয়ে তাতে আলো এসে পড়েছে। পাখার গায়ে লাগানো একটা বোর্ডে অজস্র চক প'ড়ে আছে। হাতের কাছেই রয়েছে স্পঞ্জ। তাঁর ডান হাত, বা বলা ভালো তার ডান বাহুর বাঁকা আঁকশিটি, বোর্ডে ব্যবহার্য সংখ্যাগুলো বসাবার জন্য উৎসুক। দাঁড়িয়ে উঠে ম্যাস্টন মস্ত গোল একটা বৃত্ত, অর্থাৎ ভূমণ্ডল আঁকলেন, একটি সরলরেখা এঁকে বিষুবরেখা বোঝানো হ'লো, তারপরে ব্ল্যাকবোর্ডের ডান কোনায় পৃথিবীর পরিধিসূচক রাশিটি বসালেন : ৪০,০০০,০০০ বসাবার পর এবার মূল সমস্তটির চিত্ররচনায় হাত দিলেন তিনি। এই অঙ্কে তিনি এতটাই মগ্ন ও তন্ময় হ'য়ে ছিলেন যে বাইরের আবহাওয়ার দিকে তাকিয়ে ছাখেননি। বাইরে তখন ভয়ংকর ঝড় ঘণ্টাখানেক ধ'রে সমস্ত প্রাণীকে ধাক্কা দিচ্ছে। ভীষণ সেই ঝড়, মৃত তাণ্ডবের মতো প্রলয়ংকর মুষলধারে বর্ষণ হচ্ছে, যেন প্লাবন ব'য়ে যাবে : প্রকৃতির মধ্যে সব কিছু যেন ওলোটপালোট হ'য়ে ডিগ-বাজি খাচ্ছে। চারপাশ ঝলশে ও আলো ক'রে দু-তিনবার বিদ্যুৎ চমকালো। গণিতজ্ঞটি কিন্তু ক্রমশই নিজের কাজে ডুবে গেলেন ; কিছুই তাঁর চোখে পড়লো না, কিছুই তাঁর কানে এলো না। হঠাৎ বাইরের বিদ্যুৎপাতে আকৃষ্ট হ'য়ে ঘরের একটি বৈদ্যুতিক অর্গল ঝলশে উঠে অনুগণকটিকে উত্ত্যক্ত করলে। 'আঃ,' বিরক্তি প্রকাশ করলেন ম্যাস্টন, 'লোকের সঙ্গে দেখা করতে না-চাইলেও পার পাবার জো নেই! দরজা দিয়ে না-এসে টেলিফোনে আসতে শুরু করেছে শেষকালে! যারা একা থাকতে চায়, তাদের জ্বালিয়ে মারার এক চমৎকার উপায় বেরিয়েছে! গিয়ে তার কেটে দিয়ে এসে কাজে লাগতে হবে—যতদিন অঙ্ক করবো, ততদিন এ-সব উৎপাতের হাত থেকে রক্ষে চাই!' এই কথা ভাবতে ভাবতে রিসিভার তুলে বললেন, 'কে? দয়া ক'রে সংক্ষেপে ব'লে ফেলুন।' উত্তর এলো : 'আপনি আমার গলা চিনতে পারেননি? আমি—আমি মিসেস স্করবিট।' 'মিসেস স্করবিট! না,

banglabooks.in

মহিলাটি আমাকে মুহূর্তের জন্যও শান্তি দেবেন না দেখছি, নিশ্বেসের ফাঁকে নিচু গলায় তিনি বিড়বিড় করলেন, যাতে তাঁর কানে না পৌঁছোয়। তারপরেই মনে হ'লো ভদ্রভাবে অন্তত একটা উত্তর দেয়া দরকার; বললেন, 'ও! আপনি! মিসেস স্করবিট!'

'হ্যাঁ, আমি—'

'তা আপনার জন্য কী করতে পারি বলুন?' ম্যাস্টন জিগেস করলেন। 'জানেন, কী ভয়ংকর ঝড় বিদ্যুৎ হচ্ছে, আস্ত শহরটাই বুঝি ধ্বংস হ'য়ে যায়।' 'তা,' ম্যাস্টন বললেন, 'আমি তো এ-সম্বন্ধে কিছুই করতে পারি না।' 'আমি শুধু জিগেস করছিলাম যে ঘরের জানলা বন্ধ করার কথা ভুলে যাননি তো?' মিসেস স্করবিটের কথা শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড একটা বজ্রপাত হ'লো শহরে। ব্যালিস্টিক কটেজটার পাশেই পড়লো বাজটা, আর টেলিফোনের তার দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহ এসে ভীষণ জোরে অনুগণকটিকে ধাক্কা দিয়ে মেঝেয় ফেলে দিলে। জীবনের মোক্ষম ডিগবাজিটি খেলেন জে. টি. ম্যাস্টন। তাঁর ধাতুনির্মিত বাঁকা আঁকশির মতো হাতটি দিয়ে জ্যান্ত তারটি ছোঁবার সঙ্গে সঙ্গে শাটলককের মতো তিনি ছিটকে পড়লেন। পড়বার সময় ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে ধাক্কা লাগলো; আর সেটাও ঘরের অন্য পাশে ছিটকে প'ড়লো। তারপর তড়িৎপ্রবাহ অন্য নানা জিনিসের মধ্য দিয়ে মেঝেয় অদৃশ্য হয়ে গেলো। হতভম্ব ম্যাস্টন উঠে দাঁড়িয়ে টিপে টিপে দেখলেন নিজেকে—না, কোথাও আঘাত লাগেনি। তারপরে ঠাণ্ডা মাথায় ঘরের লণ্ডভণ্ড জিনিসগুলি এক-এক ক'রে আবার আগের জায়গায় গুছিয়ে রাখলেন, ব্ল্যাকবোর্ড'টা তুলে ফ্রেমে বসালেন, চকের টুকরোগুলি তুলে নিয়ে আবার হিশেবে মন দিলেন। লক্ষ করে দেখলেন, প'ড়ে যাবার দরুন ব্ল্যাকবোর্ডের ডান কোণার খানিকটা লেখা মুছে গেছে। আবার ঠিক করে লিখতে যাবেন, এমন সময় ঝনঝন করে টেলিফোনটি আবার বেজে উঠলো।

'আবারও!' রিসীভার তুলে তিনি একটু চটা গলায় বললেন; 'কে?' 'মিসেস স্করবিট!' 'তা মিসেস স্করবিট কী চান?' 'এই সর্বনেশে বাজটা ব্যালিস্টিক কটেজে পড়েনি? আমার তো তা-ই মনে হ'লো! হা, ভগবান, কী একখানা বাজই না প'ড়লো!'

'ভয় পাবার কিছু নেই, মিসেস স্করবিট।'

'আপনার আঘাত লাগেনি তো, মিস্টার ম্যাস্টন?'

'না, মোটেই না', তিনি জানালেন।

'কোথাও লাগেনি তো? ঠিক?' মহিলাটির প্রশ্ন।

banglabooks.in

'আমার প্রতি আপনার সহৃদয়তা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি ।'

এই উত্তরটাই তাঁর ম্যাস্টনের কাছ থেকে সবচেয়ে ভালো ব'লে মনে হ'লো। শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে মিসেস স্করবিট টেলিফোন রেখে দিলেন। ম্যাস্টনও তাঁকে শুভ সন্ধ্যা জানালেন বটে, কিন্তু কাজে মন দিতে দিতে বিরক্ত স্বরে মন্তব্য করলেন, 'গোল্লায় যান তিনি! অমন সময় ফোন না করলেই হতো; তা'হলে তো আর তড়িতাহত হবার অবকাশ থাকতো না!' আবারও কোনো বাধা পড়ুক, এটা অভিপ্রেত নয় বলে ম্যাস্টন টেলিফোনের তার কেটে দিলেন। তারপর যে সংখ্যাটা লিখেছেন, তাকে নির্ভর করে তার নানান সূত্র প্রয়োগ করলেন তিনি, তারপর তার বাঁ পাশে যে সূত্রটি লিখেছিলেন, তাও প্রয়োগ করলেন। তারপরে বীজগণিতের ভাষায় হিশেব করতে লাগলেন। এক সপ্তাহ পরে, অর্থাৎ এগারোই অক্টোবর, এই মস্ত অঙ্কটি শেষ হ'লো, আর গান-ক্লাবের সম্পাদক মশাই অত্যন্ত গর্ব ও পরিতোষ ভরে সংঘের অধীর প্রতীক্ষারত সদস্যদের কাছে তাঁর সমাধানটি উপস্থাপিত করলেন। উত্তর মেরুতে যাবার ব্যবহারিক পথটি গাণিতিকভাবে আবিষ্কৃত হ'লো। স্থাপিত হ'লো নতুন একটি সংস্থা, তার নাম হ'লো সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থা, আর ওয়াশিংটনের সরকার তাকে সম্পূর্ণ অধিকার দিলেন যাতে সে নিলেমে সুমেরু বৃত্ত কিনে নিতে পারে। কিন্তু আমরা তো আগেই বলেছি মার্কিনীরা কেমন করে সুমেরু কিনে নিয়ে ১৫,০০০,০০০ ডলার চাঁদা তোলার জন্য আবেদন করেছিলো।

৭

বাবিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানিকে যারা চাঁদা দিয়েছিলো, বাইশে ডিসেম্বর তাদের উদ্দেশে এক সাধারণ সভা আহূত হ'লো। গান-ক্লাবেরই মূল কেন্দ্র যে সভাস্থল হিশেবে নির্বাচিত হ'লো, সে-কথা নিশ্চয়ই বলার দরকার নেই। বস্তুত সে-দিন চাঁদা-দাতাদের যে বিপুল সমাবেশ হয়েছিলো, পুরো বাড়িটায় তাতে কুলোতো না। কিন্তু বাল্টিমোরের কোনো পার্কে খোলা হাওয়ায় সভা করলে এই ঠাণ্ডায় তা খুব একটা ভালো কাজ হ'তো না। গান-ক্লাবের মস্ত হলটা সচরাচর সভ্যদের তৈরি নানা মডেলে সাজানো থাকে। গোলন্দাজতত্ত্বের একটা জাদুঘরই তাকে বলা যায়। এমনকি ঘরের আশবাবপত্র, টেবিল চেয়ার, ডিভান সোফা পর্যন্ত এমন অদ্ভুতভাবে

banglabooks.in

সাজানো যে তৎক্ষণাৎ সেইসব খুনে যন্ত্রগুলি চোখে ভেসে ওঠে, যেগুলি বহু নির্ভীক মানুষকে অপরিণত বয়সেই অন্য জগতে প্রেরণ করেছে।

সভার দিনে এই সবই বাইরে সরিয়ে ফেলা হ'লো। সভার উদ্দেশ্য তো আর যুদ্ধ নয়, বরং একটা শান্তিপ্রিয় বাণিজ্যিক সভাতেই ইম্পে বার্বিকেন আজ পৌরহিত্য করবেন। যুক্তরাষ্ট্রের সবখান থেকেই চাঁদাদাতারা এসেছে; তাদের যাতে জায়গা দেয়া যায়, তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হ'লো। হলে যেমন, তার আশপাশের ঘরগুলিতেও তেমনি—ভিড় আর ভিড়; ধাক্কাধাক্কি করছে, ঠ্যালা দিচ্ছে, কেউ কারো দিকে দৃকপাত করছে না, আশপাশে রাস্তায় যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের কথা তো ভাবছেই না কেউ। প্রথম চাঁদাদাতা হিশেবে ডেস্কের সামনেই গান-ক্লাবের সদস্যদের জন্য আসন সংরক্ষিত আছে। তাঁদের দিকে তাকালে কর্নেল ব্লুম্‌স্‌বেরিকে দেখা যাবে, আগের চেয়েও অনেক হাসিখুশি হ'য়ে আছেন; টম হাণ্টার ও তাঁর কাঠের পা, এবং হাস্যময় বিল্‌স্‌বি। মধ্যমণির মতো একটা আরাম চেয়ারে বসে আছেন শ্রীমতী এভাঞ্জেলিনা স্করবিট—আসলে তাঁর স্থান হওয়া উচিত সভাপতির দক্ষিণ পাশে, কেননা বস্তুত সুমেরুর মালিক তো তিনিই। আরো কয়েকজন মহিলাও ছিলেন ভিড়ের মধ্যে। নানা রঙের চিত্র-বিচিত্র মস্ত টুপিগুলির জন্য তাঁদের খুঁজে বের করতে মোটেই অসুবিধে হয় না। বাইরের মস্ত ভিড় ঠেলে ঘরে ঢোকবার চেষ্টা করছে, আর তাদের রকমশকম দেখে মনে হয় সমাগত লোকেরা বুঝি গান-ক্লাবের সভ্যদের সাহায্যকারীই মাত্র নয়, বরং যেন তাদের ব্যক্তিগত বন্ধু। য়ুরোপীয় প্রতিনিধিরা (অর্থাৎ সুইডেন, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও রাশিয়ার প্রতিনিধিরা) ব'সে ছিলেন সংরক্ষিত আসনে—তাঁরা যদি শেয়ার কিনে থাকেন তো সে কেবল ব্যক্তিগতভাবে, যাতে একটি ক'রে ভোট দেবার অধিকার পান সেইজন্যে। এই জায়গাটা কিনতে গিয়ে তাঁরা একবার একজোট হয়েছিলেন; এবারে তাঁরা একজোট হয়েছেন শুধু ক্রেতাদের উত্যক্ত করার জন্য। সভাপতি যে-জরুরি বার্তা শোনাবার জন্য সভা ডেকেছেন, তা যে তাঁরা কী তীব্র ঔৎসুক্য ও কৌতূহল-ভরে শুনতে এসেছেন, তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। সংস্থা কেমন করে মেরুবিন্দুতে পৌঁছুতে চাচ্ছে, এই বার্তায় নিশ্চয়ই সে-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হবে। কয়লাখনি খোঁড়ার চেয়েও সেটা বেশি কঠিন নয় কি? আপত্তি করার কিছু থাকলে সহকারী ডীন টুড্রিঙ্কের সাহায্যে মেজর ডনেলানই যে মহা শোরগোল তুলবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এবং অন্য প্রতিনিধিরাও যে সেই ঐকতানে যোগ দিতে দেরি করবেন না, তাও নিশ্চিত।

banglabooks.in

যতটুকু পারা যায় প্রতিদ্বন্দ্বী ইম্পে বার্বিকেনকে জব্দ আর কোণঠাশা করার মতলব মেজরের।

সন্ধে আটটা বাজে। এডিসনের বৈদ্যুতিক বাতির দৌলতে গান-ক্লাবের হলঘর বৈঠকখানা ও সর্বত্র আলোয় ঝলমল ক'রে উঠেছে। সাধারণের জন্য দ্বার খুলে দিতেই হুড়মুড় ক'রে এক ভয়ংকর জনতা হলঘরে ঢুকে পড়লো। কিন্তু পরিচারক যেই ঘোষণা করলো যে পরিচালক সভায় আসছেন, অমনি সবাই চুপ ক'রে গেলো। পর্দা উঠে গেলো; মঞ্চ থেকে দেখা গেলো কালো কাপড়ে ঢাকা একটি টেবিলের সামনে প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন, সেক্রেটারি ম্যাস্টন আর তাঁর সহযোগীরা। উল্লাসের ধ্বনি উঠলো, শোনা গেলো উৎফুল্ল 'ব্যাঘ্রগর্জন,' আর হল থেকে সেই ধ্বনি মুহূর্তে আশপাশের রাস্তায় ছড়িয়ে পড়লো। অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ম্যাস্টন আর ক্যাপ্টেন নিকল ব'সে পড়লেন। সভাপতি এবারও বসেননি; এবার তিনি সভার কাজ শুরু করলেন। ট্রাউজারের পকেটে ডান হাত ঢোকালেন বার্বিকেন, বাঁ হাত বুকের বসনে। তাঁর ভাষণ শুরু হ'লো:

'সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণ, আপনারা যাঁরা চাঁদা দিয়েছেন, তাঁদের কাছে একটি জরুরি বার্তা পৌঁছে দেবার জন্যই গান-ক্লাবের মূলকেন্দ্রে পরিচালন-পরিষদ এই সভার আয়োজন করেছেন। খবরের আলোচনা প'ড়ে ও নানা বিজ্ঞপ্তি থেকে এটা আপনারা নিশ্চয়ই জেনেছেন যে সুমেরু বৃত্তের বিশাল কয়লাক্ষেত্রগুলির সন্ধান করাই আমাদের সংস্থার উদ্দেশ্য—আমরা যে মেরুদেশ কিনে নিয়েছি এবং সরকার যে ওই অঞ্চলের সর্বময় কর্তৃত্ব আমাদের উপর ন্যস্ত করেছেন, এই তথ্য—বলাই বাহুল্য—আপনাদের নিশ্চয়ই অগোচর নেই। লোকের কাছ থেকে চাঁদা তুলে যে-টাকা পাওয়া গেছে, তা এই উদ্দেশ্যেই ব্যয়িত হবে। এই কাজে আমরা যে-সাফল্য লাভ করবো তা অবিশ্বাস্য ব'লে বোধ হ'তে পারে; আপনাদের টাকা থেকে যে-অনুপাতে লাভের বখরা পাওয়া যাবে, তাও এ-দেশ বা অন্য দেশের বাণিজ্যিক বা অর্থনীতিক ইতিহাসে অভূতপূর্ব।' এখানে এমন হাততালি শুরু হ'লো যে সাময়িকভাবে ভাষণ বন্ধ রইলো। 'আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি,' বার্বিকেন বলতে থাকলেন, 'আমরা কেমন ক'রে প্রমাণ করেছি এই অঞ্চলে বিপুল কয়লাক্ষেত্র থাকতে বাধ্য—হয়তো সেইসঙ্গে হাতির দাঁতের জীবাশ্মও পাওয়া যাবে। এই বিষয়ে যে-সব প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে তাতে কয়লাক্ষেত্র যে সেখানে আছে, এ সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে ভঞ্জন হয়। আর আপনারা তো জানেন, কয়লাই আমাদের সমস্ত বাণিজ্যিক শিল্পের মূল। চুল্লি জ্বালাতে বা উত্তাপ ছড়াতে আমরা প্রতি বছর যে-

banglabooks.in

কয়লা ব্যবহার করি, তার কথা বাদ দিয়েও কয়লা যে আরো কত কাজে লাগানো হয়, এই মুহূর্তে আমি তার একশো নাম করতে পারি। কয়লা যে অত্যন্ত মূল্যবান সামগ্রী, তাতে সন্দেহ নেই ; এবং প্রত্যহ তা এত কাজে লাগে যে একদিন তার জোগান যে ক'মে যাবে, তাও তর্কাতীত। ৫০০ বছরের মধ্যেই এখনকার কয়লা-খনিগুলি থেকে আর কয়লা পাওয়া যাবে না।'

'পাঁচশো নয়, তিনশো বছরেই এই দুর্দিন আসবে।' একজন চেঁচিয়ে উঠলো। 'তিনশো নয়, দুশো বছর, ব্যস —' আরেকজন উত্তর দিলে।

'বেশ, না-হয় এটাই ধ'রে নেয়া গেলো যে, আগে বা পরে, একদিন কয়লার খনিগুলি আর কয়লা দেবে না,' শান্তভাবে প্রেসিডেণ্ট ব'লে চললেন, 'এবং না-হয় ধ'রেই নিই যে আরো অনেক নতুন কয়লাখনি আবিষ্কৃত হবে, হয়তো ঊনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই তার কয়লা ফুরিয়েও যাবে।' শ্রোতারা যাতে খানিকটা ধরতে পারে কথাটা, এইজন্য তিনি একটু থামলেন, তারপর আবার শুরু করলেন, 'কাজেই আমরা, চাঁদাদাতারা, আজ এখানে সমবেত হয়েছি। এবং আমি আপনাদের অনুরোধ করছি যে চলুন, আমরা সবাই মিলে এক্ষুনি উত্তরমেরু চ'লে যাই।' সবাই তক্ষুনি উঠে পড়লো, যেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন তাঁদের উত্তর মেরু নিয়ে যাবার জন্য একটা জাহাজ ঠিক ক'রে রেখেছেন, এক্ষুনি তাই গিয়ে তল্পিতল্পা গুছিয়ে বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে আসতে হবে। কিন্তু মেজর ডনেলান স্পষ্টভাবে উচ্চস্বরে এমন একটা মন্তব্য করলেন, যা তাদের মুহূর্তে বাস্তব সম্বন্ধে সচেতন ক'রে থামিয়ে দিলো। 'রওনা হবার আগে জানতে চাই,' তিনি জিগেস করলেন, 'আমরা কেমন ক'রে গিয়ে সুমেরু পৌঁছুবো ?'

'হয় জলপথে, নয়তো ডাঙা দিয়ে, না-হয় আকাশপথে।' শান্তভাবে জবাব দিলেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন।

সমবেত লোকেরা ব'সে পড়লো : কৌতূহল যে তাদের ছিঁড়ে খাচ্ছে, এটা নিশ্চয় না-বললেও চলে।

'অতীতের অভিযাত্রীদের নিষ্ঠা, সংকল্প ও সাহস সত্ত্বেও চুরাশি ডিগ্রি অক্ষ-রেখাই ছিলো আমাদের উদীচীর সীমা। ফলে এটা ধ'রে নিলে নিশ্চয়ই ভুল হবে না যে বর্তমান অবস্থায় যাবার যত উপায় আমাদের হাতে আছে, তাতে এর চেয়ে বেশি উত্তরে যাওয়া যাবে না। হিমশৈল পর্যন্ত পৌঁছুবার জন্য অদ্যাবধি আমরা ব্যবহার করেছি শুধু নানা জাতের নৌকো আর জলপোত, আর তুষারক্ষেত্র পেরোবার জন্য নানা ভেলা। এত নিচু তাপমাত্রায় এমন তুচ্ছ ও সামান্য শক্তি ও

banglabooks.in

সম্বল দিয়ে বিপদের মুখে দাঁড়ানো মোটেই উচিত নয়। ফলে উত্তর মেরুতে পৌঁছু-বার জন্য আমাদের অন্য উপায় খুঁজে বের করতে হবে।'

শ্রোতাদের মধ্যে যে কী বিপুল উত্তেজনার শিহরণ খেলে গেলো তা স্পষ্ট দেখা গেলো। এতদিন ধ'রে নানাভাবে যে-তথ্যটা জানবার চেষ্টা করছে, সেই গোপন কথাটা এবার বেরিয়ে পড়বে।

'তা আপনি উত্তর মেরু পৌঁছুবেন কী ক'রে?' ইংল্যাণ্ডের প্রতিনিধি জানতে চাইলেন।

'দশ মিনিটের মধ্যে আপনি তা জানতে পারবেন, মেজর ডনেলান,' প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন বললেন, 'সেইসঙ্গে সমস্ত অংশীদারদেরও একটি কথা জানিয়ে দিতে চাই যে এই চেষ্টার উদ্যোক্তা হিশেবে আমাদের উপরে তাঁরা যেন আস্থা রাখেন; এটা যেন তাঁদের মনে থাকে যে আমরাই একদা চাঁদের উদ্দেশে একটি নাতিবৃহৎ গোলা পাঠিয়েছিলুম।'

'হ্যাঁ', ডীন টুড্রিঙ্কের গলার ঠাট্টার রেশ পাওয়া গেলো, 'তা তো বটেই—তাঁরা তো চাঁদেই যাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তবু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানেই তাঁরা থেকে গেছেন।'

এই বাধাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করলেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে উঁচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ, আমরা কী করতে যাচ্ছি, তা আপনারা আর দশ মিনিটের মধ্যেই জানতে পারবেন।'

মৃদু গুঞ্জন ব'য়ে গেলো ঘরে, নানা বিস্ময়সূচক ধ্বনি উত্থিত হ'লো, প্রত্যাশা-সূচক ধ্বনিও—যেন এই বাগ্মীটি তাঁদের জানিয়েছেন যে আর দশ মিনিটের মধ্যেই তাঁরা সুমেরুবিন্দুতে পৌঁছে যাবেন। বার্বিকেন তারপর পুনরায় শুরু করলেন, 'প্রথমে বিবেচ্য, সুমেরুবৃত্ত কি একটি মহাদেশ, না মহাসমুদ্র? কম্যাণ্ডার নেয়ার্স একে প্রাচীন তুষারের মহাসাগর বলেছিলেন, কিন্তু তিনি কি ঠিক বলেছিলেন? এই প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতেই হবে যে তাঁর ভুল হয়েছিলো।'

'মুখের কথাই তো যথেষ্ট নয়,' এরিক বাল্ডেনাক ব'লে উঠলেন। 'আপনার কী অনুমান, তা আমরা জানতে চাচ্ছি না, আমরা নিশ্চিত হ'তে চাই।'

এই উত্তেজিত জিজ্ঞাসার উত্তর হ'লো: 'তা, আমরা যথেষ্ট নিশ্চিত বৈকি! একটা কঠিন মহাদেশই কিনেছে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থা—তুষার-সমুদ্র নয়। এই অঞ্চল এখন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে, কোনো য়ুরোপীয় শক্তির তাকে স্পর্শ করার অধিকার নেই।'

banglabooks.in

য়ুরোপের প্রতিনিধিদের মধ্যে ঈষৎ গুঞ্জন শুরু হ'লো। 'বাহবা!' তাঁরা বললেন, 'জলে ভরা আস্ত একটা গামলা কিনেছে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থা —কিছুতেই তার সব জল নিষ্কাশন করা যাবে না, কোনো দিনও না।' অধিকাংশ শ্লেষোক্তি যথারীতি ডীন ট্রুড্রিঙ্কের কাছ থেকেই উদ্ভূত হ'লো, আর সহযো র করতালি দিয়ে তা সমর্থন করলেন। 'মোটেই তা নয়,' তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন, 'মধ্য-এশিয়ার গোবি মরুভূমির মতো মালভূমি এটা —যথাযোগ্য একটি মহাদেশ আর কি। প্রতিবেশী দেশগুলির নানা তথ্য লক্ষ্য ক'রে এটা সহজেই বোঝা যায়, মরুদেশ শুধু তাদেরই বিস্তৃতি মাত্র। অভিযানের পরে নোর্ডেনস্কিয়োল্ড, পেরী, আর মাইগার্ড কি বলেননি গ্রীনল্যাণ্ড ক্রমশ উঁচু হ'তে হ'তেই সুমেরুর দিকে এগিয়ে গেছে? তাছাড়া পাখি দেখেছেন তাঁরা সেখানে, সেই উদীচীর তুষারে তাঁরা আবিষ্কার করেছেন নানা উদ্ভিদ ও নানা ধ্বংসাবশেষ, এমনকি হাতির দাঁত-সুদ্ধ পেয়েছেন, যা থেকে বোঝা যায় সেখানে প্রাণীর বসবাস ছিলো—হয়তো মানুষজনও ছিলো। একদা বিশাল অরণ্য ছিলো সেখানে, যা এখন কয়লায় পরিণত হ'য়ে গেছে—আর তা-ই আমরা খুঁজে বের করতে যাচ্ছি। হ্যাঁ, সুমেরুর চারপাশটা যে একটা মহাদেশ তাতে কোনো সন্দেহই নেই—মনুষ্যহীন একটি মহাদেশ সুমেরু, যেখানে আমরা যুক্তরাষ্ট্রের নিশেন ওড়াবো।'

এই মন্তব্যে শ্রোতারা অত্যন্ত হর্ষপ্রকাশ করলে। শোরগোল একটু কমলে মেজর ডনেলানকে এ-কথা বলতে শোনা গেলো, 'তা, আপনি বলেছিলেন উদীচীতে যেতে মাত্র দশ মিনিট লাগবে—তার মধ্যে সাত মিনিট তো চ'লেই গেলো।'

'তিন মিনিটের মধ্যেই আমরা সেখানে পৌঁছুবো,' প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনের কণ্ঠে কোনো উত্তাপ নেই।

'না-হয় ধ'রেই নেয়া গেলো আপনারা একটা মহাদেশই কিনেছেন, এবং তা মালভূমির উপর অবস্থিত; কিন্তু তাহ'লেও এটা তো ঠিক চিরন্তন তুষার তাকে ঢেকে আছে; আর আবহাওয়াও এমন যে অভিযান চালানো সেখানে দুষ্কর,' মেজর বললেন। 'দুষ্কর নয়, অসম্ভব,' হাত নেড়ে জোর দিয়ে বললেন ইয়ান হারাল্ড। 'ঠিক আছে, না-হয় মেনে নিলাম,' ইম্পে বার্বিকেন বললেন, 'কিন্তু অসম্ভবকে জয় করার জন্যই এই অঞ্চল আমরা কিনে নিয়েছি। জল-পোতও লাগবে না আমাদের, ভেলাও লাগবে না; বরং আমাদের চেষ্টায় তুষার ও হিমশৈল গ'লেও মেরু পৌঁছুবার পথ ক'রে দেবে: আর তাতে না লাগবে এক ডলার মূলধন, না লাগবে এক মিনিট সময়।'

banglabooks.in

এই কথায় একটি নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতা নেমে এলো হলঘরে : অবশেষে চূড়ান্ত মুহূর্তটি সমাগত। গান-ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট বললেন, 'মহোদয়গণ, ভূমণ্ডলকে তুলে ধরার জন্য একটি লিভার চেয়েছিলেন আর্কিমিডিস। আপনাদের অবগতির জন্য জানাই, সেই লিভার আমরা পেয়ে গেছি। উত্তর মেরুকে সরিয়ে ফেলতে এখন আমাদের সামনে কোনো অসুবিধেই নেই।'

'কী ?' এরিক বালডেনাক চেঁচিয়ে উঠলেন, 'উত্তর মেরুকে সরিয়ে ফেলবেন ?'

'তাকে কি আমেরিকায় নিয়ে আসবেন নাকি ?' ইয়ান হারাল্ড জিগেস করলেন। প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন অবশ্য তখুনি সব কথা ব্যাখ্যা করতে বলতে চাচ্ছিলেন না, তাই তিনি বললেন, 'এই লিভার বা ভার-তোলার দণ্ডটির সম্বন্ধে···'

'ফাঁস ক'রে দেবেন না, ফাঁস ক'রে দেবেন না !' অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে তাঁর একজন সহযোগী চেঁচিয়ে উঠলেন।

'এই ভার-তোলা দণ্ডটি সম্বন্ধে···'

'চেপে যান, চেপে যান !' দর্শকদের অধিকাংশই ওই চিৎকারে অংশ নিলে।

'বেশ, চেপেই যাবো তা'হলে,' বললেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন।

স্বভাবতই য়ুরোপীয় প্রতিনিধিরা এতে বেশ খানিকটা বিমূঢ় ও হতাশ হ'য়ে পড়লেন। তার কারণ অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। এত বাগ্মিতা সত্ত্বেও পরিকল্পনাটি বার্বিকেনের ফাঁশ ক'রে দেবার ইচ্ছে মোটেই ছিলো না। তিনি বলতে লাগলেন, 'এই লিভারটি আমরা নানা যান্ত্রিক উপায়ে বের করেছি—প্রয়োগ-বিদ্যার ইতিহাসে তার সমান্তর কোনো আবিষ্কার নেই। এটা বানাবার কাজে আমরা হাত দেব—এবং আমাদের মূলধনের সাহায্যে এ-কাজে আমরা সাফল্যও লাভ করবো ; এবং কেমন ক'রে যে তা হবে, তা আপনাদের জানাচ্ছি।'

'হিয়ার ! হিয়ার !' অন্যেরা সোৎসাহে ব'লে উঠলো।

'আমাদের এই পরিকল্পনাটি প্রথমে মাথায় আসে আমাদের একজন সহযোগীর, যিনি নিজে একজন অত্যন্ত দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও মেধাবী গণিতজ্ঞ,' বললেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন। 'আমরা যে এত ভালোভাবে কাজ করতে পারি, তার সমস্ত গণনাই তিনি করেন ব'লে তাঁর কাছে আমরা চিরঋণী। সুমেরু অভিযান তো আর কোনো ছেলেখেলা নয়—মেরুদেশ স্থানান্তর করার সমস্যাটি এত বৃহৎ ও জটিল যে অত্যন্ত উচ্চস্তরের অনুগণনা ছাড়া তার সমাধান অসম্ভব। সেইজন্যই আমরা আমাদের পরম শ্রদ্ধার্হ সেক্রেটারি মিস্টার জে. টি. ম্যাস্টনের সাহায্য চেয়েছিলুম।'

banglabooks.in

এই অসাধারণ গণিতজ্ঞটিকে উপস্থিত দেখে শ্রোতারা আরো প্রেরণা পেয়ে তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিলে। আর এই বিখ্যাত অনুগণকটির স্বীকৃতি ও খ্যাতি শ্রীমতী এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের হৃদয়ে গভীর দাগ কেটে গেলো—অবশ্য ম্যাস্টন তো আগেই তাঁর হৃদয় জয় করেছেন। আর ম্যাস্টন ডাইনে-বাঁয়ে মাথা নেড়ে, হেলিয়ে, ঝুঁকে শ্রোতাদের অভিবাদন ক'রে ধন্যবাদ জানালেন।

'ফরাশি অভিযাত্রী মিশেল আর্দাঁর আমেরিকা আগমন উপলক্ষে তাঁর সম্মানে চাঁদে পাড়ি দেবার কয়েক মাস আগে যে বিরাট সভা হয়েছিলো,'—চাঁদে পাড়ি দেবার কথাটা বার্বিকেন এমন এক ভঙ্গিতে বললেন, যেন সেটা নিউইয়র্ক পাড়ি দেবার মতোই একটি সাধারণ ঘটনা, 'তার আগে থেকেই ম্যাস্টন নিজেকে বলে-ছিলেন, "উত্তর মেরুকে স্থানান্তর করার কল বের করতেই হবে। কাজ শুরু করার জন্য একটা জায়গা বেছে নিয়ে মেরুরেখাটিকে ঠিকভাবে বসাতে হবে।" তা আপনারা তো সবাই আমার কথা শুনলেন এবার যন্ত্রটা বের করুন দেখি। আমি কেবল এটুকু বলতে পারি যে যন্ত্রটা আবিষ্কার করা গেছে, কোনখানে লিভার বসানো হবে তাও ঠিক হ'য়ে গেছে, এবার কেবল মন দিয়ে কাজে লেগে মেরু-রেখাটাকে ঠিকভাবে বসাতে হবে।' এই ব'লে বার্বিকেন থামলেন, কিন্তু শ্রোতাদের চোখ-মুখে যে-বিস্ময় ফুটে উঠলো, তা বর্ণনা করা অসাধ্য।

'কী!' মেজর ডনেলান চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আপনারা পৃথিবীর মেরুরেখাটাকে অন্যভাবে বসাতে চাচ্ছেন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ,' তৎক্ষণাৎ প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন জানালেন, 'আমরা একটা নতুন মেরুরেখা বানাচ্ছি; এর পর থেকে সেটাই দিন-রাত্রিকে নিয়ন্ত্রণ করবে।'

'পৃথিবীর আহ্নিক অয়নকে আপনারা সংশোধন করতে চান!' কর্নেল কার্কফের চোখ জ্বলজ্বল ক'রে উঠলো।

'নিশ্চয়ই, তবে কালগত কোনো পরিবর্তন হবে না,' উত্তর দিলেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন। 'এই কাজের ফলে মেরুদেশ সাতষট্টি অক্ষরেখার কাছে এসে পড়বে—বৃহস্পতি গ্রহের মতো হ'য়ে যাবে তখন পৃথিবী; কারণ বৃহস্পতির মেরুরেখা তার কক্ষতল থেকে প্রায় লম্বের মতো উঠে গেছে। এই ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট অদল-বদল হওয়ার ফলে আমাদের মেরুদেশ এমন তাপ পাবে যে তার সহস্র বছরের জমাটবদ্ধ হিমশৈল ও তুষার-ক্ষেত্র তৎক্ষণাৎ গ'লে যাবে।'

শ্রোতাদের যেন শ্বাসরোধ হ'য়ে গেলো। কোনো আপত্তি তোলার কথা যেমন কেউ ভাবলে না, তেমনি কোনো হাততালিও শুরু হ'লো না। যার উপর ভর দিয়ে

banglabooks.in

পৃথিবী ঘুরছে, সেই মেরুরেখাকে বদলে ফেলার অতি অদ্ভুত ও অতি সরল ভাবনাটি সবাইকে যেন গ্রাস করে ফেললো। আর য়ুরোপীয় প্রতিনিধিরা? তাঁরা তো একেবারে স্তম্ভিত, হতচকিত, নিঃসাড় ও বিধ্বস্ত - বিস্ময় তাঁদের এতই গগন-চুম্বী যে কথা বলার ক্ষমতা পর্যন্ত অপসৃত। কিন্তু প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন যখন আরো বললেন, 'সূর্যই সুমেরুর হিমশৈল ও তুষার-ক্ষেত্র গলাবার ভার নেবে, আর তখন মেরুদেশে যাবার কোনো অসুবিধেই হবে না; কাজেই মানুষ যদি মেরুদেশে যেতে না-পারে, তাহ'লে মেরুদেশ মানুষের কাছে চ'লে আসবে—' তখন জয় ও উল্লাসের ধ্বনিতে হলঘর যেন টুকরো-টুকরো হ'য়ে গেলো।

৮

মিশেল আর্দার সম্মানে সেই যে সভা* হয়েছিলো, তার পর থেকেই জে. টি. ম্যাস্টন 'পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষ বা মেরুরেখা বদলানোর কথা' ছাড়া আর কিছুই ভাবেননি বা বলেননি। বিষয়টা তিনি আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেছেন, যাবতীয় তথ্য ও চিত্র সংগ্রহ করেছেন। অবশেষে এই বিখ্যাত অনুগণকটি এমনভাবে সমস্যাটির সমাধান করলেন, যার ফলে এখন যে মেরুরেখায় পৃথিবী ঘূর্ণ্যমান, তার জায়গা নেবে নতুন একটা মেরুরেখা—এছাড়া জগৎ আগে যেমন ছিলো তেমনি থেকে যাবে। বসন্তকালে নরোয়ের ট্রোণ্ডায়েম-এ যে-আবহাওয়া থাকে, মেরুদেশের আবহাওয়াও ঠিক সেইরকম হ'য়ে যাবে তখন। স্বভাবতই সূর্যের উগ্র তাপে তখন এই বিশাল তুষার-ক্ষেত্র গ'লে যাবে। আর ভূমণ্ডলের সর্বত্র সেই জলবায়ু পাওয়া যাবে, বৃহস্পতি গ্রহে এখন যে-জলবায়ু রয়েছে। ভাষান্তরে, বার্বিকেনের নতুন সংস্থাটি বর্তমান পৃথিবীর সব কিছুই বদলে দিতে চাচ্ছে। আর নতুন মেরুরেখারও সৃষ্টি এখন সম্ভব, কোনো আর্কিমিডিস যে মালভূমির স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর জে. টি. ম্যাস্টন যে ভারোত্তোলকের কল্পনা করেছেন, দুটোই এখন এই সাহসী প্রয়োগ-শিল্পীদের হাতে এসে গেছে। আর যেহেতু তাঁরা তাঁদের আবিষ্কার সম্বন্ধে আপাতত স্তব্ধ থাকতে চান, সেইজন্যেই কেবল নানা বিষয় কল্পনা করা ছাড়া লোকের কিছু করণীয় থাকলো না। কাগজগুলি অন্তত তা-ই করলো। বড়ো-বড়ো জ্ঞানী গুণী ও নামজাদা বিজ্ঞানীদের সঙ্গে-সঙ্গে অজ্ঞাতকুলশীল নানা

* জুল ভের্নের 'ফ্রম দি আর্থ টু দি মুন' দ্রষ্টব্য।

banglabooks.in

লোকের নিবন্ধ ছাপাতে লাগলো তারা। সত্যি যদি বৃহস্পতি নামক গ্রহটিতে মানুষ থেকে থাকে, তাহ'লে পৃথিবীর মানুষের চেয়ে তাদের সুযোগ-সুবিধে যে নানাদিক দিয়ে অনেক বেশি, চাঁদে পাড়ি দেবার সময়ে আহূত সভাটিতে সেইসব কথা বিশদভাবে বর্ণিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। জগৎবাসী সেই সুবিধেগুলিই এবার লাভ করবে, যদি বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ করে। তখন তাহ'লে দুটি মধ্যদিনের সঙ্গে ব্যবধান সব সময়েই হবে চব্বিশ ঘণ্টা। উষা আর সন্ধ্যালোক চিরকালই থাকবে এখনকার মতো। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপারটা হবে এই যে, পৃথিবীতে বিভিন্ন ঋতু আর-কিছু থাকবে না। এখন তো আছে গ্রীষ্ম, শীত, হেমন্ত আর বসন্ত (এবং কোনো-কোনো জায়গায় আরো দুটি : বর্ষা ও শরৎ)। বৃহস্পতির মানুষ এই ঋতুগুলির কথাই শোনেনি। এই পরীক্ষা সফল হ'লে পৃথিবীর মানুষও আর এদের পাবে না। যে-মুহূর্তে নতুন ধ্রুবাক্ষ বা মেরুরেখা তার কাজ শুরু ক'রে দেবে, তৎক্ষণাৎ তুহিনক্ষেত্র বলেও কিছু থাকবে না, গ্রীষ্মমণ্ডলও অপসৃত হবে—আর সারা জগৎ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যাবে।

গ্রীষ্মমণ্ডলটা, বস্তুত, কী ? গ্রীষ্মমণ্ডল পৃথিবীর এমন একটা অংশ, সেখানকার মানুষ সূর্যকে বছরে দুবার খ-মধ্য বা সু-বিন্দুতে দ্যাখে ; আর নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল হ'লো তাই সূর্য যেখানে কখনো সু-বিন্দুকে ছোঁয় না ; আর হিমমণ্ডল হ'লো জগতের সেই অংশটুকু সূর্য যাকে দীর্ঘদিন ভুলে থাকে, আর সুমেরুর কাছে এই বিস্মৃতির পরিমাণ দু-মাস। আসলে সূর্যের অবস্থিতির জন্যই কোনো দেশ হয় তুহিন, আর কোনো দেশ অত্যুষ্ণ। কিন্তু মেরুরেখা বদলে দিতে পারলে পৃথিবীতে এই অসুবিধেগুলো আর থাকবে না। সূর্য তখন সব সময়েই নিরক্ষরেখার উপর থাকবে : প্রতি বারো ঘণ্টা অন্তর একবার ক'রে সে নিয়মিত অস্ত যাবে তখন। 'আর এই নতুন পদ্ধতির সুবিধেগুলো হ'লো এই,' প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনের বন্ধুদের বক্তব্য, 'যে, প্রত্যেকেই তখন এমন এক জলহাওয়া পাবে যা রুচি আর স্বাস্থ্যের অনুকূল ; বাতব্যাধি আর থাকবে না, থাকবে না সর্দিকাশি, বা ইনফ্লুয়েঞ্জা ; তাপের আতিশয্য বা অভাব কোনোটাই তখন আর পীড়া দেবে না।' সংক্ষেপে : পৃথিবীর জন্ম থেকে যে-আবহবিদ্যা তাকে মান্য করতে হচ্ছে, বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানি তাকেই বদলে দিতে যাচ্ছেন। এটা ঠিক, এখন যে-সব জিনিশ দেখতে ভালো লাগে, তার কিছু-কিছু তখন আর দেখা যাবে না ; কয়েকটা তারা হয়তো হারিয়ে যাবে, আর কোনো স্বপ্নাতুর রাত্রি পাবেন না কবিরা ; কিন্তু এ-সবের তুলনায় সুবিধের

banglabooks.in

পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। 'এবং,' কয়েকটি কাগজ লিখলো, 'মাটি থেকে উদ্ভূত দ্রব্যগুলি এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে যে কৃষিজীবীরা সমস্ত উদ্ভিদেরই যথাযোগ্য তত্ত্বাবধান করতে পারবেন।' অন্য কতগুলি কাগজ জিগেস করলে: 'আর কি তাহ'লে ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত হবে না—চাষবাস যার উপর নির্ভর করে?' 'হবে নিশ্চয়ই,' বার্বিকেনের বন্ধুরা বললেন, 'তবে, এই সমস্ত নৈমিত্তিক ব্যাপার আগের চেয়েও অনেক দুর্লভ হ'য়ে উঠবে, কেননা তাপমাত্রায় তো আর এমন তারতম্য থাকবে না! সত্যি, সব দিক বিবেচনা ক'রে দেখলে মানতেই হবে যে মানবজাতির তাতে মহদুপকারই সাধিত হবে। সত্যিকার রাম-রাজত্ব নেমে আসবে তখন জগতে। আর বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানি মানবজাতির এমন একটি কল্যাণ সাধন করবেন, তাঁরা না-থাকলে যা চিরকাল কল্পনাতীত ও অসম্ভব থেকে যেতো।' 'সত্যি,' বললেন মিশেল আর্দা, 'আমাদের এই ভূমণ্ডল (যার পৃষ্ঠদেশ হয় অতি ঠাণ্ডা আর না-হয় অতি তপ্ত থাকে) থেকে চিরকালের মতো সর্দিকাশি ও বাতব্যাধি ইত্যাদি দূরীভূত হ'য়ে যাবে।' সাতাশে ডিসেম্বর তারিখে নিউইয়র্কের একটি কাগজ ছাপলো: 'প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনের যশ অক্ষয় হোক! তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা যে কেবল আমাদের এই আমেরিকা মহাদেশে নতুন একটি প্রদেশ যোগ ক'রে বিশাল যুক্তরাষ্ট্রের বিপুলতাকেই বাড়িয়ে দিচ্ছেন, তা নয়; তাঁরা সমগ্র জগৎকেও অধিকতর উর্বর, সৃষ্টিশীল ও বাসযোগ্য ক'রে তুলেছেন। ফসল কেটে নেবার পরেই আবার তখন বীজ ছিটিয়ে দেয়া যাবে; শীতের সময় এখন যে সময়টা নষ্ট হয়, তখন আর তা হবে না। আর কয়লাক্ষেত্রগুলিও দেশকে এখনকার চেয়েও ঢের বেশি সম্পদশালী ও ঐশ্বর্যময় ক'রে তুলবে। বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানি সমস্ত জগৎকে আমূল পরিবর্তিত ক'রে উন্নততর করতে চাচ্ছেন। মানবজাতির এই মহদুপকার যাঁরা সাধন করলেন, তাঁদের তাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই।'

৯

মেরুরেখার স্থান পরিবর্তন ক'রে তাহ'লে এই সুবিধে করতে চাচ্ছেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন। পৃথিবীর অয়ন চলন অবশ্য তেমনি থাকবে, এবং বর্ষচক্র বেশি বদলাবে না। আর এই পরিবর্তন যখন সমগ্র জগৎকে স্পর্শ করবে, তখন এটা যে বিশ্ববাসীর কৌতূহল ও আগ্রহের বিষয় হ'য়ে দাঁড়াবে তাতেও অস্বাভাবিক কিছু নেই। তবে,

banglabooks.in

নতুন কোন মেরুরেখা এজন্য ব্যবহৃত হবে, এই গোপন তথ্যটিই প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল বা জে. টি ম্যাস্টন কাউকে খুলে বলতে চাচ্ছিলেন না। পরিবর্তনটা ঘটার আগে কি তাঁরা জানতে দিতে চান না, না কি আগেই কোনো সময়ে তা উদ্‌ঘাটিত করবেন? আমেরিকার মনে কিঞ্চিৎ সংশয় ও দ্বিধা দেখা দিলো। সমালোচনা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ও প্রত্যাশিত; এবং কাগজগুলি তাই আরম্ভ করলে। কোন যান্ত্রিক কৌশলে সফল হবে সেই পরিকল্পনা যা এই পরিবর্তন আনবে? সেজন্য তো ভয়ানক ক্ষমতা চাই। তৎকালীন একটি নামজাদা কাগজ মন্তব্য করলে: 'পৃথিবী যদি মেরুরেখায় ভর ক'রে না ঘুরতো, তাহ'লে হয়তো অত্যন্ত দুর্বল একটি আঘাতেই এই বাঞ্ছিত আন্দোলন পাওয়া যেতো; কিন্তু ঘূর্ণমান কক্ষ থেকে তাকে সরানো যদি অসম্ভব নাও হয়, তবু তাকে অতন্ত দুরূহ কর্ম ব'লে মানতে হয়।' এর চেয়ে খাঁটি কথা আর-কিছু হ'তে পারে না—সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার প্রয়োগ-তাত্ত্বিকেরা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুরূহ কাজে হাত দিয়াছেন। পরিবর্তন কেমন ক'রে আসবে—দৈবাৎ, আচমকা, না অগোচরে; আলোচনাটা এবার এই দিকে মোড় নিলে। যদি আচমকা আসবে ব'লে মনে হয়, তাহ'লে পরিবর্তনের মুহূর্তে কি ভীষণ সব দুর্ঘটনার সূচনা হবে না? এই প্রশ্নটাই বিজ্ঞানী-অজ্ঞানীদের সমভাবে বিচলিত করলো। একটা ধাক্কা লাগবে, এটা জানি; কিন্তু ধাক্কার ফলাফল কী হবে, তা কিছুই জানি না—এই অবস্থাটা মোটেই মনোরম নয়।

মনে হ'লো এই প্রচেষ্টার প্রবর্তকেরা সম্ভবত ফলাফলের কথা খুব-একটা চিন্তা করেননি।

তা যে পৃথিবীর পক্ষে ভয়ংকর হ'তে পারে, এবং প্রথম যতটা ভাবা গিয়েছিলো ততটা হিতকরও না হ'তে পারে—এটা কি তাঁরা ভেবে দেখেছেন? লোকশানের কথাটা ভাবতেই য়ুরোপীয় প্রতিনিধিরা রোষে ও ক্রোধে তপ্ত হ'য়ে উঠেছিলেন; তাঁরা এই প্রশ্নটাকে নিয়ে তুলকালাম ক'রে তোলার সিদ্ধান্ত নিলেন, যাতে সাধারণকে গান-ক্লাবের সদস্যদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তোলা যায়।

স্মর্তব্য যে, ফ্রান্সের সঙ্গে এই প্রতিনিধিদের কোনো সম্পর্ক ছিলো না, কেননা মেরুদেশ কিনে নেয়ার কোনো অভিপ্রায়ই তার ছিলো না। তবু বাল্টিমোরে একজন ফরাশী ভদ্রলোক এসেছিলেন; উদ্দেশ্য: স্বীয় উন্নতি সাধন; অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে গান-ক্লাবের ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করছিলেন তিনি। নিজে তিনি একজন যন্ত্রশিল্পী ও বাস্তুকার; বয়স পঁয়ত্রিশ বছরের বেশী নয়। পলিটেকনিক বিদ্যালয়ে

banglabooks.in

প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন তিনি—সর্বোচ্চ সম্মান নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। তাঁর গণনক্ষমতা যে ম্যাস্টনের মতোই দক্ষ ও নিপুণ, তাতে কোনো সন্দেহই নেই। অত্যন্ত মেধাবী তরুণ তিনি ; তীক্ষ্ণধী, সৃষ্টিশীল ও উদ্ভাবনক্ষম ; প্রফুল্ল, বিনয়ী ও হাস্যময়। কথায় কোনো মারপ্যাঁচ নেই, অত্যন্ত দরাজ ও সহৃদয়, কথা বলেন সরল ভাষায়, কৌতুকে ও নিষ্ঠায় সমান দ্ব্যর্থহীন তাঁর বচন। দরকার হ'লে এমনকি সতেজ স্ল্যাং বুলি ব্যবহার করতেও তাঁর দ্বিধা ছিলো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা টেবিলে ব'সে নকশা চিত্র ও সংখ্যা নিয়ে হিশেব করতে পারেন তিনি ; আর তাঁর লেখনীও চলে অত্যন্ত দ্রুত, যেমন দ্রুত চলে তাঁর গণনা চিত্রাঙ্কন। জটিল গাণিতিক সমস্যা ছাড়া আর যাতে তাঁর অভিরুচি আর আনন্দ ছিলো, তা হ'লো হুয়িস্ট নামক তাসের বাজি এমনিতে মনে হয় যেন খেলায় কোনো মন নেই এমনি নিবিক্ত ও উদাসীন, অথচ নিজের সুযোগ সম্বন্ধে ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত সচেতন। নাম তাঁর আলস্যাদ পিয়েৰ্দ্যো, কিন্তু সাধারণত তিনি আ. পি. ব'লেই স্বাক্ষর করতেন। এত ঢ্যাঙা যে বন্ধুরা বলেন তিনি নাকি মধ্যরেখার সিকিভাগের দশলক্ষ-ভাগের পাঁচ ভাগ এবং তাঁদের ধারণাটা মোটেই ভুল নয়। মাথাটি ছোট্ট, অন্তত চওড়া কাঁধের তুলনায় ছোটোই দেখায়, কিন্তু মুখে তাঁর প্রাণবন্ত ও সতেজ ভাব, চশমার আড়ালে নীল চোখের তারাদুটি সব সময়েই কৌতুকে ঝলমল করছে। এটাই তাঁর বৈশিষ্ট্য ; অন্তত যখন গভীর ও আগ্রহী, তখন কারো-কারো মুখে কৌতুকের একটা ছাপ থাকে ; তাঁর মুখটি ঠিক ওইরকম। ক্লাসে তাঁর যে কেবল সেরা ছাত্র বলেই পরিচয় ছিলো তা নয়, তাঁর মেজাজও সকলের চেয়ে ভালো ছিলো, কিন্তু ওই চওড়া কাঁধে বসানো ব'লে তাঁর মাথাটিকে ছোটো ব'লে বোধ হ'লেও এটা মনে রাখা উচিত সে-মাথার ক্ষমতা ছিলো সর্বোচ্চ স্তরের, তাঁর বংশের সবাই ছিলো গণিতজ্ঞ, তিনিও তাই ; কিন্তু প্রয়োগবিদ্যায় বা জীবিকার কাজে লাগবে ব'লে তিনি অঙ্ক শেখেননি, কেননা যে-কোনো রকম পেশাই তিনি খুব অপছন্দ করেন। না, গণিত তিনি অধ্যয়ন করেছিলেন গণিতশাস্ত্রের জন্যই : কত কি এখনো অজ্ঞাত আছে মানুষের, তাকে কি জানা যাবে না কোনো দিনও ? এখানে একথাও বলা ভালো আলস্যাদ পিয়োর্দ্যো এখনো বিয়ে করেননি। এখনো তিনি এক ও অদ্বিতীয়, কিংবা তাঁর নিজের ভাষায় বলা যায় একের সমান (= ১), যদিও বিয়ে করার জন্য তাঁর ইচ্ছে ছিলো অত্যন্ত প্রবল। একটি সুন্দরী হাসিখুশী ও ঝলমলে মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে ব'লে তাঁর বন্ধুরা ভেবেছিলো ; কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, বড্ড চটপটে ও অপ্রতিভ তিনি, অর্থাৎ অতিচালাক, এবং তিনি

banglabooks.in

হয়তো এমন ভাষায় তাঁর কন্যার সঙ্গে কথা বলবেন, যা মোটেই তার মাথায় ঢুকবে না। কন্যার পিতৃদেবটি অত্যন্ত বিনয়ী ও শাদাশিধে। আর এইজন্যই এই তরুণ বিজ্ঞানীটি স্বদেশ আর নিজের সঙ্গে একটি মস্ত সাগরের ব্যবধান রচনা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এক বছরের জন্য বিদেশ যাত্রার অনুমতি চাইলেন তিনি, অনুমতি পেলেনও। তখন ভাবলেন বাল্টিমোরে গিয়ে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করলেই তাঁর সময়ের সদ্ব্যবহার হবে। এই সময়ে তাঁর যুক্তরাষ্ট্রে আসার মূল কাহিনী এটাই। অবশ্য বাল্টিমোরে পৌঁছোনোর পরে বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির এই মস্ত কাজটি সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহল খুব ব'লেই প্রতীয়মান হ'লো। পৃথিবীর মেরুরেখা বদলাবে কি একই থাকবে, এতে তাঁর কী এসে যায়। কেমন ক'রে তারা পৃথিবীকে সরাবে, এটাই শুধু তিনি জানতে চাচ্ছিলেন। এই বিষয়েই তাঁর কৌতূহল অসীমে পৌঁছুলো। কেমন ক'রে তারা মেরুরেখা বদলাবে—বারে বারে তিনি এ-কথা ভাবলেন, নানা চিন্তারও উদয় হ'লো মাথায়, কিন্তু প্রতিবারেই তা বাতিল ক'রে দিয়ে আবার তিনি নতুন ক'রে ভাবতে বসেন। শেষটায় তিনি এই বিশ্বাসে পৌঁছুলেন যে, তাঁরা নিশ্চয়ই আরেকটি নতুন ধ্রুবাক্ষ স্থাপন করতে চাচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা তাকে বসাবেন কোথায়? তারপরে আবার তাঁর মনে হ'লো, আহ্নিক অয়নও তো আছে; তাকে তো আর চাপা দেয়া যাবে না বা রোধ করা যাবে না। 'না, সত্যি, তাঁরা যে ব্যাপারটা কেমন ক'রে করবেন. তা আমার কাছে একটা আস্ত প্রহেলিকা ব'লে বোধ হচ্ছে।' বার্বিকেন আর ম্যাস্টনের মূল অভিপ্রায় কী, সে সম্বন্ধে তাঁর কোনো ধারণা ছিলো না। তাঁদের অভিপ্রায় যে তাঁর জানা ছিলো না, এ-ব্যাপারটা অত্যন্ত দুঃখের; কেননা তাহ'লে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সূত্র বা ফর্মুলাটা বের ক'রে ফেলতে পারতেন। ফলে উনত্রিশে ডিসেম্বর তারিখে আলস্যাদ পিয়েদ্যোকে কপালে হাত দিয়ে চিন্তামগ্ন অবস্থায় বাল্টিমোরের রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে দেখা গেলো।

১০

গান-ক্লাব ও নবগঠিত সংস্থার অংশীদারদের সেই বিরাট সভাটির পর একমাস কেটে গেছে; জনমত কিছু এর মধ্যেই বেশ বদলে যাচ্ছে। পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষ পাল্টে যে-সুযোগ সুবিধে পাওয়ার কথা ব'লে ভাবা গিয়েছিল, তার কথা লোকে এখন ভুলেই গেছে, বরং এখন অসুবিধেগুলির কথাই আলোচনা করছে সবাই। 'যেহেতু

banglabooks.in

মেরুরেখা পাল্টাতে গেলে ভয়ংকর একটা ধাক্কা দিতে হবে, সেই জন্যেই মারাত্মক একটা দুর্বিপাকের যে-সম্ভাবনা অত্যধিক পরিমাণে থেকে গেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' জনমত বললো। এই মারাত্মক দুর্বিপাক সত্যি কী হ'তে পারে? আর, এই যে কোনো ঋতু থাকবে না, তা কি শেষ পর্যন্ত মানুষের বাঞ্ছিত? হয়তো হারাবার কিছু নেই ব'লে এস্কিমো, ল্যাপল্যাণ্ডের লোক, সামোয়েডেন আর চুক-চিদের তাতে লাভ হবে। প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন ও তাঁর কাজের বিরুদ্ধে য়ুরোপীয় প্রতিনিধিদের কথাবার্তা অত্যন্ত তৎপর হ'য়ে উঠলো। প্রথমেই তাঁরা নিজের-নিজের দেশের সরকারের কাছে প্রতিবেদন পাঠালেন। প্রায়ই তারবার্তায় সংকেতে সংবাদ পাঠাতেন তাঁরা। নানা প্রশ্ন আছে তাঁদের এ-বিষয়ে; যথোচিত নির্দেশও চাই; এবং তা পেতেও থাকলেন। তা অত্যন্ত গোপন, সাবধানী ও সাংকেতিক। এইসব নির্দেশের তাৎপর্য কী? 'জোর দেখাও, কিন্তু আমাদের সরকারকে জড়িয়ো না, একটি বার্তা নির্দেশ এলো। আরেকটিতে: 'অত্যন্ত বিবেচনা ক'রে কাজ কোরো, কিন্তু কিছুতেই স্থিতাবস্থাকে স্পর্শ কোরো না।' মেজর ডনেলান ও তাঁর সহযোগীরা এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করতে ছাড়লেন না। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে যুক্তরাষ্ট্রের গায়ে যাতে একটু আঁচড়ও না লাগে, বা লাগলেও অত্যন্ত কম লাগে, সেজন্য মার্কিনি যন্ত্রশিল্পীরা যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন,' কর্নেল বরিস কার্কফ ভাবলেন। 'কিন্তু তা কী ক'রে সম্ভব?' ইয়ান হারাল্ড জিগেস করলেন, 'একটা গাছ ধ রে নাড়া দিলে তার সব ডালপালাতেই কি ঝাঁকুনি লাগে না?' 'আর কেউ যদি পিছন থেকে এসে আপনাকে বেমক্কা মেরে বসে, আপনার আস্ত শরীরটাই কি তার জন্য যন্ত্রণায় কাৎরে ওঠে না?' বললেন জাক জানসেন। 'তাহ'লে তাঁদের ঘোষণা-পত্রের অদ্ভুত স্তবকটি এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করা গেলো,' বললেন ডীন টুড্রিঙ্ক। 'এইজন্যই তাঁরা ভৌগোলিক পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন?'

'হ্যাঁ,' বললেন এরিক বালডেনাক, 'আর সেটাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভয়ের। এই পরিবর্তনের ফলে পর্যঙ্ক ছেড়ে ছিটকে বেরোবে সমুদ্র; আর মহা-সমুদ্রগুলি যদি হঠাৎ একদিন তাদের বর্তমান আশ্রয় ছেড়ে হুড়মুড় ক'রে বেরিয়ে পড়ে, তাহ'লে জগতের কিছু লোক কি তৎক্ষণাৎ সমগ্র বিশ্ববাসীদের থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে না? তারা নিজেদের এমন কোণঠাশা অবস্থায় আবিষ্কার করবে, যেখানে অন্য কারো সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব সহজ হবে না।'

'হয়তো সেখানকার আবহাওয়া এমন কোনো ঘনাঙ্ক স্পর্শ করবে,' ইয়ান হারাল্ডের গলার স্বর গম্ভীর, 'যে, তাদের পক্ষে নিশ্বাস নেয়াই কঠিন হ'য়ে পড়বে।'

banglabooks.in

'হয়তো দেখবো যে লণ্ডন নগরী মণ্ট ব্লাঙ্কের চুড়োয় উঠে ব'সে আছে,' মেজর ডনেলান ব'লে উঠলেন। পায়ের উপর পা চাপিয়ে দিয়ে, মাথা হেলিয়ে, ভদ্রলোকটি এমনভাবে শূন্যের দিকে তাকালেন যে মনে হ'লো তাঁর স্বদেশের রাজধানী বুঝি এখনি মেঘের মাঝখানে হারিয়ে গেছে। সংক্ষেপে, ব্যাপারটা আস্তে আস্তে আসন্ন বিপদ ব'লে গণ্য হ'লো, অত্যন্ত যে আশঙ্কাজনক তাতে আর কোনো সন্দেহই রইলো না। এটা অবশ্য সত্যি যে মাত্র ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট অদলবদল হবে; কিন্তু তার ফলে মেরুদেশে যখন নতুন ডাঙা জেগে উঠবে, তখন হয়তো মহাসমুদ্র-গুলি স্থানচ্যুত হ'য়ে পড়বে। সবখান থেকেই প্রতিবাদ উত্থিত হ'লো: তড়িঘড়ি বাধা দিতে অনুরোধ করা হ'লো যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে: ব্যাপারটায় হাত না দেয়াই সবচেয়ে ভালো।' 'তার ফলে হয়তো আস্ত জগৎটাই ধ্বংস হ'য়ে যাবে।' 'ভগবান যা করেছেন সবই মঙ্গলের জন্য; তাঁর সৃষ্টিকর্মকে আর সংশোধন ক'রে কাজ নেই,' এই সমস্ত মন্তব্য শোনা গেলো সর্বত্র। কিন্তু হাল্কা-মেজাজের মানুষও ছিলো অনেক, যারা ব্যাপারটা নিয়ে মজা করতে ছাড়লে না। 'ইয়াঙ্কিগুলোর দিকে তাকিয়ে ছাখো একবার,' বললে তারা, 'তারা কিনা পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষ পাল্টে ফেলতে চাচ্ছে। আরে, পৃথিবী যদি অয়ন চলনে গণ্ডগোল করতো তবে না-হয় তোদের এই সংশোধন চেষ্টার কারণ বুঝতুম। কিন্তু লক্ষ-লক্ষ বছর ধ'রে তো ঘড়ির কাঁটা-মাফিক কাজ ক'রে গেছে—তাহ'লে আর কী দরকার?'

এ-সব প্রশ্নের উত্তর দেবার চেষ্টা না ক'রে যন্ত্রশিল্পী আলস্যাদ পিয়েরের্দ্যো কেবল এটাই বের করার চেষ্টা করলেন, গণিতজ্ঞ ম্যাস্টন এই পরীক্ষার জন্য কোন দেশ ও কোন দিক বেছে নিয়েছেন। পৃথিবীর ঠিক কোনখানটায় তাঁদের কাজ শুরু হবে, এটাই ছিলো তাঁর জিজ্ঞাস্য। এই তথ্যটা জানার সঙ্গে-সঙ্গেই পুরো ব্যাপারটা তাঁর হাতে চ'লে আসবে—কোন জায়গায় বিপদের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি, তা তিনি তখন সহজেই বুঝতে পারবেন। এই কথাটা তো আগেই বলা হয়েছে যে য়ুরোপের কতগুলি দেশের সঙ্গে সুমেরুর সম্ভবত কোনো যোগসূত্র থেকে থাকবে। য়ুরোপে এই প্রশ্নটাই সবচেয়ে বেশি শোনা গেলো: 'এই ধাক্কা থেকে যদি কিছু বিপদের উৎপত্তি হয়, তার হাত থেকে নিজেদের দেশকে বাঁচাবার কথাটাই কি প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল আর জে. টি. ম্যাস্টন বেশি ভাববেন না? লোকটা তো ইয়াঙ্কি—তিনজনেই যে তা-ই, তা অবশ্য বলা হ'লো—আর বার্বিকেন লোকটা তো বিশেষ ক'রে; চাঁদে যাবার কল্পনা ওর মাথাতেই গজিয়েছিলো প্রথম।' সে যাই হোক—এমন মন্তব্য শোনা গেলো—মেরু-বলয় থেকে শুরু ক'রে মেক্সিকো

banglabooks.in

উপসাগর পর্যন্ত সমগ্র আমেরিকার এই ধাক্কা থেকে কোনো ভয় নেই। পক্ষান্তরে এটাই বরং সম্ভব যে এর ফলে আমেরিকা আরো নতুন-কিছু ভূখণ্ড পাবে ও বিপুল ঐশ্বর্য লাভ ক'রে বসবে। 'আমেরিকার উপকূলে যে-দুটি মহাসমুদ্র চঞ্চল ও তরঙ্গ-ময়, তাদের তলায় কী আছে কে জানে? এমনও তো হ'তে পারে যে সমুদ্রের তলায় এক মূল্যবান ভূখণ্ড ছিলো একদা আর তারা তা-ই ফিরে পেতে চাচ্ছে!' কোনো কিছুর কালো দিকটা ছাড়া আর কিছুই যাদের চোখে পড়ে না, তারা জিগেস করলে। 'কোনো বিপদ যে নেই, এটা কি দিব্যি দিয়ে বলা যায়? যদি জে. টি. ম্যাস্টনের হিসেবে কোনো ভুল হ'য়ে থাকে? আর যন্ত্রটন্ত্রগুলি বানিয়ে কাজে লাগাবার সময় প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনও কি কোনো ভুল ক'রে বসতে পারেন না? সবচেয়ে সপ্রতিভ ও বুদ্ধিমান লোকের ক্ষেত্রেও এটা হ'তে পারে। গুলি যে সব সময়েই চাঁদমারিতে লাগবে, তা তো নয়। বলা তো যায় না, হয়তো কামানে গোলা ভরতেই ভুলে গেলেন.' নার্ভাস মানুষের মধ্যে এমনি নানা কথা শোনা গেলো। এই স্নায়ুপীড়া ও অস্বাচ্ছন্দ্যের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে তুললেন য়ুরোপীয় প্রতিনিধিরা। এ-বিষয়ে কতগুলি প্রবন্ধ ছাপালেন সেক্রেটারি ডীন টুড্রিঙ্ক: সবচেয়ে জোরালো লেখাগুলি ছাপলেন 'স্ট্যাণ্ডার্ড' কাগজে। স্যুইডেনের বিখ্যাত পত্রিকা 'আফটেনব্লাড্‌ট্‌'-এ কতগুলি প্রবন্ধ লিখলেন ইয়ান হারাল্ড। আর কর্নেল বরিস কার্কফ এমন একটি রুশ কাগজকে নিজের প্রচার-যন্ত্রে পরিণত করলেন, যার বিক্রি ছিলো সবচেয়ে বেশি। এমনকি আমেরিকাতেও নানা মুনির নানা মত দেখা গেলো। রিপাবলিকানরা তো প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনের বন্ধু, কিন্তু ডেমোক্র্যাটরা তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলে। আমেরিকার খবর-কাগজগুলির কেউ-কেউ য়ুরোপীয় সংবাদ-পত্রের সঙ্গে একমত হ'লো। আর যুক্তরাষ্ট্রে যেহেতু সংবাদ-পত্র-গুলির ক্ষমতা ও পরাক্রম অত্যন্ত বেশি—বছরে প্রায় তিন কোটি ডলার খরচ ক'রে তারা সংবাদের জন্য—লোকের উপর তাই তাদের প্রভাবও যথেষ্ট। কাজেই এমনি নানা প্রচারবহুল জার্নাল সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থাকে সমর্থন ক'রে ফল পেলো না। এই আবিষ্কারের পক্ষ সমর্থন ক'রে যিনি প্রবন্ধ লিখবেন, প্রতি লাইনের জন্য তাঁকে ১০ ডলার ক'রে দেয়া হবে—এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের এই ঘোষণা পর্যন্ত ব্যর্থ হ'লো। এই একাগ্র মহিলাটি খামকাই এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করলেন যে কোথাও কোনো গোল নেই, সমস্তই ঠিক রয়েছে, আর অঙ্কে জে. টি. ম্যাস্টনের কোনোই ভুল হ'তে পারে না। শেষটায় আমেরিকাও আতঙ্ক বোধ ক'রে য়ুরোপের দ্বারা চালিত হয় আর-কি। কিন্তু গোলন্দাজ সংঘের প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন বা সেক্রেটারি

banglabooks.in

ম্যাস্টন লোকের কথাবার্তায় মোটেই তোয়াক্কা করলেন না। নানা প্রবন্ধের মধ্যে যে-সব তথ্যগত ভুল ছিলো, তা পর্যন্ত সংশোধন করার ঝামেলা তাঁরা পোয়ালেন না। গুজবে বা জনরবে বাধা দেয়া কিংবা জনমত পরিবর্তনের জন্য আদৌ কোনো চেষ্টাই তাঁরা করলেন না। যে-বিরাট কাজের দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছেন, তাঁতেই তাঁরা মগ্ন ও তন্ময় হ'য়ে রইলেন। কিন্তু জনমতটাও খুব আশ্চর্য : এই তারা ছিলো সাফল্যের ব্যাপারে নিঃসন্দেহ ও উৎসাহী—আর হঠাৎ কিনা বেমক্কা পরিকল্পনাটার বিরুদ্ধে চ'লে গেলো!

শিগরিরি য়ুরোপ ও আমেরিকার লোকেরা শ্রীমতী এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের প্রভূত অর্থব্যয় সত্ত্বেও এটা ধ'রে নিলো যে গান-ক্লাবের প্রেসিডেণ্ট আর সেক্রে-টারির চেয়ে ভয়ংকর লোক আর হয় না। য়ুরোপও সরকারিভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে এ-ব্যাপারে হস্তক্ষেপ ক'রে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করতে বললো। কী ভাবে তাঁরা এই আরব্ধ কাজটি সম্পূর্ণ করবেন এবং কী তাঁদের পরিকল্পনা, প্রবর্তকদের তা খুলে বলতে বাধ্য করা হোক। জগতের কোন অংশ তাঁদের কাজের ফলে সবচেয়ে বিপদে পড়বে, এটা যেন তাঁরা সরকারকে স্পষ্টভাবে জানান। অর্থাৎ সংক্ষেপে দাবি উঠলো, এ-সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য তাঁদের উদ্ঘাটন করতে হবে। শেষকালে চাপে প'ড়ে ওয়াশিংটনের সরকার ফতোয়া জারি করতে বাধ্য হলেন। যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে, দক্ষিণে, মধ্যপ্রদেশে এমন বিক্ষোভ দেখা দিলো যে তা ছাড়া তাঁদের আর কোনো উপায় রইলো না। যন্ত্রবিশারদ, বাস্তুকার, প্রয়োগ-তাত্ত্বিক, গণিতজ্ঞ ও ভৌগোলিকদের নিয়ে একটি কমিশন বসলো—কমিশনের সদস্য-সংখ্যা পঞ্চাশ, সভাপতি জন প্রেসটিস এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখের বিধি অনুযায়ী তার হাতে পূর্ণ কর্তৃত্ব তুলে দেয়া হ'লো। এ-সম্বন্ধে কমিশন যা ভালো ব'লে বিবেচনা করবে, তাই সে করতে পারে। প্রথমে কমিশনের কাছে দেখা করার জন্য প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেনের কাছে অনুজ্ঞা গেলো। প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন কোনো উচ্চবাচ্য করলেন না। এবার বাল্টিমোরে তাঁর বাড়িতে লোক গেলো, কিন্তু প্রেসিডেণ্টকে সেখানে পাওয়া গেলো না—তিনি সেখানে নেই। তাহ'লে তিনি গেছেন কোথায়? কেউ জানে না। কবে গেছেন? দু-সপ্তাহ আগে, জানুয়ারি মাসের এগারো তারিখে ক্যাপ্টেন নিকলকে নিয়ে বাল্টিমোর তথা ম্যারিল্যাণ্ড থেকে চ'লে গেছেন তিনি। কোথায় গেছেন দু'জনে? কেউ বলতে পারলে না। স্পষ্ট বোঝা গেলো, তখন যে রহস্যময় জায়গাটিতে এই বিরাট কাজের প্রস্তুতি চলেছে, গোলন্দাজ সংঘের এই দু'জন সদস্য সেখানেই গেছেন। কিন্তু সে জায়গাটা

banglabooks.in

কোথায় ? জায়গাটা কোনখানে, সেটা জানাই তো সবচেয়ে জরুরি। এদের পরিকল্পনা ও উদ্যোগ যদি নষ্ট ক'রে ফেলতে হয়, তাহ'লে, দেরি হ'য়ে যাবার আগে, এক্ষুনি এই জায়গাটার হদিশ জেনে নেয়া দরকার।

প্রেসিডেণ্ট ও তাঁর সহযোগীর এই আকস্মিক নিরুদ্দেশের ফলে যে-ত্রাসের সঞ্চার হ'লো, তার কোনো তুলনা হয় না। এতকাল সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার বিরুদ্ধে কেবল জনমত জেগেছিলো, এবার তা ঘৃণায় পর্যবসিত হ'লো। প্রেসিডেণ্ট আর তাঁর সহযোগী কোথায় গেছেন তা কিন্তু একজনের জানার কথা। শুধু একজনই আছেন যিনি এই মুহূর্তে জগৎকে যে অতিকায় প্রশ্নটি ছিঁড়ে খাচ্ছে তার উত্তর জানেন, এবং তিনি আর কেউ নন—জে. টি. ম্যাস্টন। জন প্রেক্টসনের সভাপতিত্বে যে তদন্ত-সমিতি বসেছিলো তাতে উপস্থিত হবার জন্য কর্মান গেলো তার কাছে।

তিনি এলেন না। তাহ'লে কি তিনিও বাল্টিমোর ছেড়ে গেছেন নাকি ? তিনিও কি তবে তাঁর সহযোগীদের কাজে সাহায্য করার জন্য চ'লে গেছেন, যে কাজের কথা ভেবে সমস্ত জগৎ এখন আতঙ্কে ব্যাকুল হ'য়ে আছে ? না। এখনো ১৭৯ ফ্রাঙ্কলিন স্ট্রিটের বালিস্টিক কটেজেই তিনি আছেন। এখনি তিনি নতুন একটি গণনায় হাত দিয়েছেন ব'লে সর্বদাই নিজের কাজে মগ্ন ও তন্ময়, শুধু মাঝে মাঝে সন্ধেবেলায় এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের নিউ-পার্কের রাজবাড়িতে যান, তাছাড়া আর সব সময়েই অঙ্ক করেন। তদন্ত-সমিতির সভাপতি তাঁকে নিয়ে আসার জন্য লোক পাঠালেন। লোকটি বালিস্টিক কটেজে এসে কড়া নেড়ে নিজের পরিচয় দিলে। ফায়ার-ফায়ার তো তাঁর সঙ্গে রীতিমতো বিশ্রী ব্যবহার করলো, আর গৃহস্বামী ততোধিক। শেষকালে ম্যাস্টন ভাবলেন যে সভায় না-যাওয়াটা তাঁর পক্ষে ঠিক হবে না, তাই তিনি লোকটির সঙ্গেই বেরিয়ে পড়লেন। ম্যাস্টন সভায় পৌঁছানো-মাত্র জেরা শুরু হ'য়ে গেলো।

প্রথমেই প্রশ্ন হ'লো : 'প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকল এই মুহূর্তে কোথায় আছেন ?' আরও দৃঢ় স্বরে ম্যাস্টন জবাব দিলেন, 'তাঁরা কোথায় আছেন, তা আমি জানি, কিন্তু এই তথ্য জানিয়ে দেবার স্বাধীনতা আমার নেই।' দ্বিতীয় প্রশ্ন : 'তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা কি কাজের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত ?' 'এটা,' ম্যাস্টন বললেন, 'এমনি একটি গোপনীয় তথ্য যা আমার পক্ষে খুলে বলা অসম্ভব।' 'অভিপ্রায় অনুযায়ী কাজ করতে পারবেন কি না, তা বিচার করার জন্য তিনি কি অনুগ্রহ ক'রে এই তদন্ত সমিতিতে তাঁর আরব্ধ কাজটি পরীক্ষা ক'রে দেখতে দেবেন ?'

banglabooks.in

'না, কিছুতেই না, ককৃখনো না। বরং সব ধ্বংস ক'রে ফেলবো, তবু না। স্বাধীন আমেরিকার নাগরিক হিশেবে এই অধিকার আমার আছে। আমার কাজের ফলা-ফল আমি কাউকে জানাতে বাধ্য নই।'

'কিন্তু,' অত্যন্ত গম্ভীর গলায় প্রেসিডেণ্ট জানালেন, 'চুপ ক'রে থাকাটা যদি আপনার অধিকার হয় তাহ'লে এ-সব গুজব ও জনরব বন্ধ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করার দাবিও আছে যুক্তরাষ্ট্রের। কী উপায়ে আপনার কোম্পানি কাজ করতে চাচ্ছে সে সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ চাইবার অধিকারও আছে তার।' এ অধিকার তার আছে কিনা সে বিষয়ে ম্যাস্টন একমত হলেন না; আরো প্রশ্নের উত্তর দিতেও তিনি বাধ্য নন এটাও তিনি বললেন। তাঁরা তাঁকে অনুরোধ করলেন, ভয় দেখালেন, অনুনয়-বিনয় করলেন নানাভাবে, 'কিন্তু লোহার-বাঁকা-আঁকশিওলা মানুষটির কাছ থেকে কোনো খবর বার করতে পারলেন না। কিছুতেই না, ককৃখনো না, একটি কথাও তিনি বললেন না—আর গাটাপার্চার মাথার তলায় যে এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি লুকিয়ে ছিলো তাই যেন কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকলো। যেমন এসেছিলেন তেমনি চ'লে গেলেন মিস্টার ম্যাস্টন, আর এভাঞ্জেলিনা স্করবিট তাঁর এই নির্ভীক আচরণে মুগ্ধ হ'য়ে তাঁকে বার বার অভিনন্দন জানালেন। তদন্ত সমিতির এই শেষ সভার প্রতিবেদন যখন লোকের কাছে পৌঁছুলো জনতার ঘৃণা স্রেফ এমনি আকার নিলে যার ফলে অনুগণকটির নিরাপত্তা ব'লে আর কিছু রইলো না। জনমতের চাপ এত প্রবল হ'য়ে উঠলো যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ক্যাবিনেট শেষটায় তদন্ত সমিতির এ-সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার পূর্ণ অধিকার দিতে বাধ্য হ'লেন। একদিন, সেদিন ১৩ই মার্চ, সন্ধেবেলায় জে. টি. ম্যাস্টন বালিস্টিক কটেজে তাঁর পড়বার ঘরে নানা চিহ্ন ও নকশায় অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে আছেন, এমন সময় ঝনঝন ক'রে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো। 'হ্যালো!' হঠাৎ বাধা পড়ল। তিনি একটু বিরক্ত হলেন, 'কে?' 'মাদাম স্করবিট।' 'তা হঠাৎ তিনি কী চান?' 'আপনাকে সাবধান করতে চাচ্ছেন তিনি। আমি এইমাত্র খবর পেয়েছি যে'—তাঁর কথাটা শেষ হবার আগেই ম্যাস্টন তাঁর বাড়ির দরজায় একটা প্রচণ্ড চ্যাঁচামেচি শুনতে পেলেন। তাঁর পড়ার ঘরে আবার সিঁড়িতে দস্তুরমতো দাঙ্গা চলেছে যেন। তার ভৃত্য ফায়ার-ফায়ার এই অবাঞ্ছিত অতিথিদের বাধা দেবার চেষ্টা করছে, যাতে তারা জোর করে তার প্রভুর ঘরে ঢুকে না পড়ে। মুহূর্ত পরেই জোর করে ধাক্কা দিয়ে দরজা খোলা হ'লো, এবং ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো জনকয়েক পুলিশ। গেস্তাপো পুলিশ দেখালো পুলিশ—জে. টি.

banglabooks.in

ম্যাস্টনকেই শুধু গ্রেফতার করতে আসেনি, সেইসঙ্গে যাবতীয় কাগজ-পত্রও বাজেয়াপ্ত ক'রে নিয়ে যাবার অধিকার তাদের দেয়া হয়েছে। গান-ক্লাবের রুষ্ট সেক্রেটারিটি তাঁর পিস্তল বার করলেন। হঠাৎ কেড়ে না নিলে পিস্তলটা তিনি তা নির্ঘাৎ ব্যবহার করতেন আত্মরক্ষার জন্য। অফিসারেরা তাঁকে ধরে থাকলো। বাণ্ডিল করা হ'লো সব কাগজ। হঠাৎ তিনি জোর হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে তাঁর নোটবইটা আঁকড়ে ধরলেন। তারপরেই নোট বইটার শেষ পাতাটা এক টানে ছিঁড়ে ফেলে স্রেফ মুখে পুরে দিয়ে চিবোতে লাগলেন। 'এবার তোমরা এটা নিতে পারো', বললেন তিনি, 'কারণ এখন আর এটা তোমাদের কোনো কাজে লাগবে না।' এক ঘণ্টা পরে বাল্টিমোরের জেলখানার কয়েদীরূপে তাঁকে দেখা গেলো। এটাই কিন্তু শাপে বর হ'লো আসলে, কেননা জনচিত্ত যখন এমন ক্ষিপ্ত ও রুষ্ট, তখন স্বাধীন জীবন তাঁর পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক ও সাংঘাতিক হ'য়ে উঠতো।

১১

পুলিশ যে নোট-বইটি বাজেয়াপ্ত করেছিলো তার তিরিশ পাতা জুড়ে কেবল নানা সূত্র আর চিত্র আঁকা। জে. টি. ম্যাস্টনের পুরো অনুগণনাটাও তাতে থেকে গেছে। উচ্চ গণিতের একটি সমস্যা, উচ্চশ্রেণীর গণিতজ্ঞ ছাড়া আর সকলেরই কাছে সেটা প্রহেলিকা ব'লে ঠেকবে

$$V^2 - V_0^2 = 2gr_0^2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_0}\right)$$

পৃথিবী থেকে চাঁদে পাড়ি দেবার গবেষণাতে এই যে সূত্রটি অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ ছিলো, এখানেও সেটা সবচেয়ে প্রধান স্থান নিয়ে আছে। অধিকাংশ লোকেই এই নোট-বইয়ের কোনো লেখারই কোনো মানে করতে পারলো না, কিন্তু যার জন্য লোকে এমন উদ্‌গ্রীব ও ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলো যে সেই ফলাফল জানতে পারলে তৃপ্তিকর হ'তো। কাজেই প্রত্যেকটি সংবাদপত্র ও তদন্ত কমিটি এই বিখ্যাত গণিতজ্ঞর সূত্রটি তন্নতন্ন করে প'ড়ে দেখার চেষ্টা করলো। ম্যাস্টনের নোট-বইতে কতগুলি সমস্যার সমাধান দেয়া ছিলো, কতগুলি আবার ছিলো অসম্পূর্ণ। অত্যন্ত নির্ভর ও নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্কগুলি করা : তদন্ত সমিতি এটা ধ'রেই নিলো যে এগুলি সম্পূর্ণ নির্ভুল। পরিকল্পনাটি যদি কাজে খাটানো যায়, তাহ'লে পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষ যে অনেকটা স'রে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই : আর যে-ভয়ংকর দুর্বি-

banglabooks.in

পাকের আশঙ্কা করা হচ্ছে তাও প্রচণ্ডভাবে ফ'লে যাবে তখন। বিভিন্ন সংবাদপত্রে এই তদন্ত সমিতি যে প্রতিবেদন পাঠালো তা এইরকম :

'সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার পরিচালনা সভার সংকল্প হচ্ছে পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষ পাল্টে নতুন আরেকটি সৃষ্টি করা এবং এইজন্য পৃথিবীর কোনো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে তাঁরা বৃহৎ একটি কামান ছাড়ার ব্যবস্থা করেছেন, যার ফলে একটি প্রবল আন্দোলন ও সংকোচনের সৃষ্টি হবে। কামানের চোঙা বা নলটা যদি অনড় ও অবিচলভাবে মাটিতে আটকানো থাকে, তাহ'লে এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে আমাদের এই গ্রহটির সর্বত্র তার ধাক্কা এসে লাগবে। তাহ'লে সংস্থার যন্ত্রবিদ্‌গণ যে-যন্ত্রটি ব্যবহার করতে চাচ্ছেন—একটি অতিকায় ও দানবিক কামান ব্যতীত তা আর কিছু নয়—এবং যদি উল্লম্ব বা খাড়াভাবে তা ছোঁড়া হ'তো, তা'হলে তার প্রতিক্রিয়াও কিছুই হ'তো না। প্রতিক্রিয়াকে তীব্রতম করার জন্য তাকে উত্তরে বা দক্ষিণে অনুভূমিকভাবে স্থাপন করা উচিত, এবং বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানি তাকে দক্ষিণমুখীই স্থাপন করেছেন। এর ফলে যে-সংকোচনের সৃষ্টি হবে, তাতে পৃথিবী উত্তরের দিকে খানিকটা ঘুরে যাবে—একটা বিলিয়ার্ড বল অন্য আরেকটা বলের গায়ে লাগলে যেমন হয়।

বুদ্ধিমান আলস্যাদ পিয়েদ্যোও ঠিক তা-ই ভেবেছিলেন। যেই কামানটা ছোঁড়া হবে, অমনি পৃথিবীর মধ্যরেখা সেই সংকোচনের সমান্তরভাবে স্থানচ্যুত হ'য়ে যাবে। তাতে কক্ষপথ ঈষৎ পরিবর্তিত হ'য়ে যাবে, তার ফলে বর্ষকালের স্থিতি যৎকিঞ্চিৎ, কিন্তু সেই পরিবর্তন এমনি সামান্য হবে যে তাতে কোনো মন্দের অবকাশ থাকবে না। সেই মুহূর্তে পৃথিবীও নিরক্ষীয় তলে একটি নতুন মেরুরেখা সৃষ্টি ক'রে ঘোরা শুরু ক'রে দেবে এবং এই নতুন মেরুরেখায় প্রাত্যহিক ঘূর্ণনটি অনির্দিষ্ট হ'য়ে যাবে, যেন এই ধাক্কার আগে কোনো প্রাত্যহিক অয়ন চলনই ছিলো না। বর্তমানে এই ঘূর্ণন চলে মেরুরেখার চারপাশে; আর ওই ধাক্কার ফলে যে সহায়ক বলের সৃষ্টি হবে তা ওই ঘূর্ণনের সঙ্গে মিলে গিয়ে নতুন মেরুরেখার সৃষ্টি করবে, যার ধ্রুবাক্ষ বর্তমান অবস্থার থেকে সরে 'এক্স' নামক অজ্ঞাত জায়গায় এসে পড়বে। অন্য কথায় : যদি কামানটি সেই সময়ে ছোঁড়া হয় যখন মহা বিপ্লব—নিরক্ষরেখা যেখানে ক্রান্তিবৃত্তকে ছেদ ক'রে কামান থেকে কুবিন্দুতে রয়েছে, আর যদি তার ধাক্কা এত জোরালো হয় যে পুরোনো মেরুরেখাকে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট সরিয়ে দিয়েছে, তাহ'লে নতুন মেরুরেখা পৃথিবীর কক্ষের ঠিক লম্ব হ'য়ে যাবে, বৃহস্পতি গ্রহের যেমন রয়েছে।

banglabooks.in

কী ফল প্রত্যাশা করা যেতে পারে, তা আমরা আগেই জেনেছি বাইশে ডিসেম্বরের সভায় বার্বিকেন যখন বলেছিলেন। পৃথিবীর ভর আর ভরবেগের পরিমাণ দেয়া আছে ; কিন্তু তবু এত শক্তিমালী কোনো কামান তৈরি করা সম্ভব হবে কি যার ফলে অ'সল ধ্রুবাক্ষের কোনো পরিবর্তন হ'তে পারে—বিশেষ ক'রে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট পরিবর্তন ? হ্যাঁ, যদি এক বা একাধিক কামান বলবিদ্যার প্রয়োজনানুগ মাত্রায় নির্মাণ করা যায়—কিংবা মাত্রার বদলে আবিষ্কর্তারা যদি এমন কোনো বিস্ফোরক পান যা কোনো প্রাসকে এই স্থানচ্যুতির জন্য প্রয়োজনীয় বেগে নিক্ষেপ করতে পারেন; তাহ'লেই তা সম্ভব হবে।

১৮০ কিলোগ্রামের একটি প্রাসকে সেকেণ্ডে ৫০০ মিটার প্রারম্ভিক বেগে নিক্ষেপ করে—ফরাশী নৌবহর কর্তৃক নির্মিত ২৭ সেন্টিমিটারের এমন একটি কামানকে যদি আদর্শ হিশেবে ধ'রে নিই, এবং ওই কামানটিকে যদি শতমাত্রায় বাড়িয়ে তুলে —অর্থাৎ আয়তনে যদি তাকে দশলক্ষ গুণ বাড়িয়ে তুলে তাকে দিয়ে ১৮০,০০০ টনের একটি প্রাস নিক্ষেপ করি,—বা অন্য কথায় বলা যায়, সাধারণ কামানের জন্য যে কালো বারুদ ব্যবহার করা হয় তার বদলে এমন-কোনো বারুদ যদি ব্যবহার করি যা প্রাসটিকে ৫,৬০০ গুণ বেশি প্রারম্ভিক বেগে নিক্ষেপ করবে, তাহ'লে এই বাঞ্ছিত ফল পাওয়া যাবে। বস্তুত, সেকেণ্ডে ২৮০০ কিলোমিটার বেগে (যে-বেগে এক সেকেণ্ডেই প্যারী থেকে সেণ্টপিটার্সবুর্গ চ'লে যাওয়া যায়) হ'লে পৃথিবীর উল্টোদিকে প্রাসের ধাক্কা লেগে সব আবার স্তব্ধতায় ফিরে আসবে। তা অসাধারণ ব'লে মনে হ'লেও এটা সত্যি যে জে. টি. ম্যাস্টন ও তাঁর সহযোগীদের কাছে ঠিক এই ধরনের বিস্ফোরক আছে—এমন এক বিস্ফোরক, যার শক্তি প্রায় অসীম, চাঁদের দিকে কামান ছোঁড়ার সময় যে-বারুদ ব্যবহৃত হয়েছিলো, তা কেবল যার ক্ষীণ ইঙ্গিত মাত্র করে। এই বিস্ফোরক আবিষ্কার করেছেন ক্যাপ্টেন নিকল। যে-সব বস্তু দিয়ে এই বিস্ফোরক গঠিত, ম্যাস্টনের নোট-বইতে তার সামান্য ইঙ্গিত আছে, এবং তিনি তাকে স্রেফ 'মেলিমেলোনাইট' ব'লে উল্লেখ ক'রেই ছেড়ে দিয়েছেন। তার সম্বন্ধে শুধু এটুকুই জানা গেছে যে অ্যাজোটিক অ্যাসিড আর জৈব পদার্থের মেলিথেলোর প্রতিক্রিয়ায় তা গ'ড়ে ওঠে। তা বিস্ফোরকটি যা-ই হোক না কেন, যে-শক্তি তার আছে তাতে পৃথিবীর আকর্ষণের বাইরে ১৮০,০০০ টন প্রাস নিক্ষেপ করা তার পক্ষে কিছুই না, আর কামানকে তা যে-জোরে ধাক্কা দেবে তাতে মেরুরেখা পাল্টে সুমেরুকে ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট সরিয়ে দিয়ে নতুন মেরু-রেখাকে ক্রান্তিবৃত্তের দিকে নিয়ে আসতে তার মোটেই অসুবিধে হবে না। আর

banglabooks.in

তার ফলে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে, পৃথিবীবাসীরা যা ন্যায্যভাবেই ভয় পাচ্ছে।

এই যে-পরীক্ষাটি থেকে পৃথিবীর ভৌগোলিক ও আবহতথ্যের এমন ওলোট-পালোট হবে, তার হাত থেকে রেহাই পাবার একটা সুযোগ অবশ্য মানবজাতির আছে। ২৭ সেন্টিমিটারের চেয়ে আয়তনে দশলক্ষ গুণ বড়ো কোনো কামান বানানো কি সম্ভব ? সন্দেহ আছে। বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির চেষ্টা যে সাফল্য-মণ্ডিত হবে না, সে কথা ভাববার এই একটা যুক্তিই আছে। কিন্তু অপর সম্ভাবনাটিও অনস্বীকার্য, কারণ মনে হয় যে কোম্পানিটি এর মধ্যেই এই অতিকায় প্রচেষ্টায় হাত দিয়ে ফেলেছে। এখন প্রশ্ন হ'লো, তাঁদের কাজের জায়গাটা ঠিক কোথায় ? কেউ তা জানে না, আর সেইজন্যেই এই উদ্ধত কাজে বাধা দেবার কোনো উপায় নেই। বার্বিকেন আর নিকল যে বাল্টিমোর ও আমেরিকা ত্যাগ করেছেন, তা তো সকলেই জানে। দু-মাস আগেই তাঁরা চ'লে গেছেন দেশ ছেড়ে। কিন্তু গেছেন কোথায় ? নিশ্চয়ই যে অজ্ঞাত স্থানে এই কাজের প্রস্তুতি চলছে। জে. টি. ম্যাস্টনের নোট-বইয়ের শেষ পাতাটায় যে জায়গাটির নাম লেখা ছিলো. তা তো স্পষ্ট। কিন্তু এই শেষ পাতাটি তো বার্বিকেনের অনুচরটি ছিঁড়ে খেয়ে ফেলেছেন, এবং বাল্টিমোরের জেলখানায় ব'সে এই মহোদয়টি সম্পূর্ণ মৌনব্রত অবলম্বন ক'রে ব'সে আছেন এখন। পরিস্থিতি তো এইরকম। সভা-পতিটি যদি এখন এই অতিকায় কামান ও তার প্রাসটি বানিয়ে ফেলতে পারেন —অর্থাৎ পুরো কাজটাই যদি পূর্বোক্ত শর্ত অনুযায়ী শেষ হ'য়ে যায় তাহ'লে পৃথিবীর মেরুরেখা তাঁরা পাল্টে ফেলবেন, এবং বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির এই উদ্ধত চেষ্টার প্রতিক্রিয়া ছ-মাসের মধ্যেই ভূমণ্ডলকে গ্রাস ক'রে বসবে। ব্যাপারটা ঘটবে ২২শে সেপ্টেম্বর, সূর্য সেই 'এক্স' নামক অজ্ঞাত স্থানটির মধ্য-রেখার উপরে আসার বারো ঘণ্টা পর।

যে তথ্যগুলি জানা গেছে তা এইরকম : প্রথমত ২৭ সেন্টিমিটার মাপের কোনো কামানের দশলক্ষ গুণ বড়ো মাপের কামান থেকে গোলা ছোঁড়া হবে। দ্বিতীয়ত, কামানে ১৮০,০০০ টনের প্রাস ভরা হবে। তৃতীয়ত, প্রাসটি ২৮০০ কিলোমিটার বেগ দ্বারা প্রাণবন্ত হবে। চতুর্থত, সূর্য 'এক্স' নামক অজ্ঞাত স্থানটির মধ্যরেখায় আসার ১২ ঘণ্টা পরে ২২শে সেপ্টেম্বর কামান দাগা হবে। এ-সব তথ্য থেকে 'এক্স'-টি যে কোন জায়গা তা কি ধরা যাবে ? 'কিছুতেই না', বললে তদন্ত সমিতি। 'এক্স'-টি যে কোন জায়গা তা বের করার কোনো উপায়ই নেই, কেননা ম্যাস্টনের

banglabooks.in

হিশেব থেকে এটা কিছুতেই বের করা গেলো না কোনখান দিয়ে নতুন ধ্রুবাক্ষটি যাবে বা নতুন মেরুদেশগুলি কোথায় অবস্থিত হবে। সেইজন্যই কোন দেশ পাহাড়ের চুড়োয় উঠে যাবে আর কোন দেশ চলে যাবে জলের তলায় তা বোঝার কোনো উপায় নেই, অথচ এটা ঠিক যে সমুদ্রগুলি স্থানচ্যুত হবেই আর তার ফলে কোনো দেশ জলে ঢেকে যাবে আবার কোথাও নতুন ডাঙা জেগে উঠবে। সমুদ্রতলে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হবে ৮.৪১৫ মিটার। সেইজন্যেই পৃথিবীর কোনো কোনো জায়গা নিচু হয়ে যাবে, কোনো-কোনো জায়গা উর্ধ্বে উন্নীত হবে। সমস্ত অবশ্য নির্ভর করছে 'এক্স' জায়গাটি কোথায় অবস্থিত তার উপর। ভাষান্তরে, এই অনিশ্চিত ব্যাপারটির প্রবর্তকদের গোপন কথাই হ'লো 'এক্স'। 'আমরা', তদন্ত সমিতি বললে, 'আমরা কেবল এই কথাটিই আবার জানতে চাই যে দেশ-নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্ব-বাসীই স্থানটি জানবার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করছেন ; কেননা বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির ক্রিয়াকলাপে সকলেরই বিপদের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশি। সেইজন্যই য়ুরোপ, আফ্রিকা, এশিয়া, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রত্যেক মানুষকেই সমস্ত কামান ও গোলা-বারুদের কারখানার উপর নজর রাখতে বলা হচ্ছে। আগন্তুকের উপরেই যেন তাঁরা লক্ষ রাখেন এবং এর মধ্যে যদি কারও ভাবভঙ্গি সন্দেহজনক ঠেকে, তাহলে এক্ষুনি যেন তারবার্তায় বাল্টিমোরের তদন্ত সমিতিকে জানিয়ে দেন। ঈশ্বর করুন যাতে এই বছরের বাইশে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এই তারবার্তা আসে, কেননা আবহমান কালের পৃথিবীর সমস্ত নিয়ম ও শৃঙ্খলা সেইদিন মারাত্মক বিপদে পড়বে।'

১২

পৃথিবী থেকে চাঁদে কোনো প্রাস নিক্ষেপ করার জন্য কামান দাগতে হবে, আগের একটি কাহিনীতে তা-ই ছিল ; এবার আবার পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষকে পাল্টাবার জন্যও কামান দাগার ব্যবস্থা হচ্ছে। কামান আর কামান, কেবল কামান, গান-ক্লাবের এই গোলন্দাজদের মাথায় যেন কামান ছাড়া আর কিছু নেই। কামানের নামে তাঁরা যেন পাগল হ'য়ে যান। এই পাশবিক যন্ত্রই কি বিশ্ব-ব্যাপারের আতঙ্ক হ'য়ে

banglabooks.in

ডেন্ট বার্বিকেন ও তাঁর সহযোগীদের মাথায় একটা কামানের কথাই সর্বাগ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছিলো, ফ্লোরিডার সেই কামানটির পর এবার তাঁরা 'এক্স' নামক অজ্ঞাত স্থানে গিয়ে আরেকটি অতিকায় কামান বানাবার উদ্যোগ করেছেন। কান পাতলেই যেন উঁচু গলাটি শোনা যাবে : 'চাঁদের দিকে লক্ষ স্থির করো!' প্রথম অঙ্ক : 'কামান দাগো।' 'পৃথিবীর মেরুরেখা পাল্টে দাও।' দ্বিতীয় অঙ্ক : দাগো কামান।' আর সমগ্র জগৎ এখন তাঁদের যেখানে পাঠাতে চাচ্ছে, তা হ'লো, 'চলো, নরকে!' তৃতীয় অঙ্ক: 'কামান দাগো'। আর, সত্যি, তাঁদের পরিকল্পনাগুলি এমনি, যে জনমতকে কোনো দোষ দেয়া যায় না।

তদন্ত-সমিতির শেষ প্রতিবেদনটি খবরের কাগজে বেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে এমন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হ'লো যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। এটা স্পষ্ট সে প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকল যে-উদ্যোগের হোতা, পৃথিবীর দৈনন্দিন কার্যক্রমে তা ভয়ংকর বাধার সৃষ্টি করবে। তার ফলে যে কী হবে, তা সকলেই বুঝতে পারছে। সেইজন্যই বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির এই পরীক্ষাকে অভিসম্পাত দিতে লাগলো। পৃথিবীর সর্বত্রই এই বোধ জেগে উঠলো যে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার সদস্যরা সবাই মানুষের শত্রু। এই খেয়ালি মার্কিনিদের অনুরক্ত ও বন্ধু ব'লে যাদের মনে হ'তে পারে, সংখ্যায় তারা অত্যন্ত বিরল।

কেবল নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই বিচক্ষণের মতো প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকল বাল্টিমোর ও আমেরিকা ত্যাগ করেছিলেন। আহা, যদি তাঁরা কোনো দুর্ঘটনায় পড়েন! পৃথিবীব বিধিশৃঙ্খলা ভঙ্গ ক'রে কোটি কোটি মানুষের জীবনে মৃত্যু আনার জন্য স্বর্গের অভিসম্পাত নেমে আসবে না কি তাঁদের উপর? সেই ঐশ্বরিক রোষ তাঁরা এড়াবেন কী করে?

কিন্তু গান-ক্লাবের এই যে দু'জন নেতা কোনো চিহ্ন-মাত্র না রেখে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে গেলেন, তা-ই বা সম্ভব হ'লো কী ক'রে? কেউ জানলো না, কেউ শুনলো না—অথচ তাঁরা রসদপত্র-সমেত সহযোগীদের পাঠিয়ে দিলেন, এটা কেমন ক'রে ঘটলো? ডাঙা দিয়ে গেলে একশোটা মালগাড়ি লাগতো, জল-পথে গেলে অন্তত একশোটা জাহাজ—তাতেও এত কয়লা ও মেলিথেলোজোইট চালান দেয়া যেতো কিনা সন্দেহ। নাম-ধাম বেমালুম চেপে গিয়ে সনাক্ত করার কোনো উপায় না দিয়ে, এ-ভাবে চ'লে যাওয়া কেমন দুর্বোধ ব'লে ঠেকে। কিন্তু তা-ই তো হ'লো। ব্যাপারটা আরো গুরুতর হ'য়ে উঠলো, যখন জানা গেল য়ুরোপ কিংবা আমেরিকার কোনো গোলন্দাজ কারখানাতেই ওই শক্তিশালী বারুদের জন্য কোনো হুকুম

banglabooks.in

আসেনি। হিং-টিং-ছট ব'লে মনে হয় সব, প্রহেলিকার মতো। একদিন যে সব খবর বেরিয়ে পড়বে, তাতে অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই।

প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকল তো অমনি রহস্যময়ভাবে পলায়ন করে অব্যবহিত বিপদের হাত এড়ালেন, কিন্তু তাঁদের সহযোগী জে. টি. ম্যাস্টন—তাঁকে তো জেলখানায় চাবিবন্ধ কুঠরিতে ব'সে জনমতের ঘৃণা সহ্য করতে হচ্ছে। তিনি অবশ্য কিছুতেই আত্মসমর্পণ করলেন না। সেই বাল্টিমোরের জেলখানার একটা ছোট্ট কুঠরির এক কোণায় ব'সে গান-ক্লাবের সেক্রেটারিটি বরং যাঁদের ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ করার সুযোগ তাঁর ছিলো না তাঁর সেই দূরবর্তী সহযোগীদের কথাই ভাবছিলেন। তিনি যেন অলোকদৃষ্টির বলে স্পষ্ট দেখতে পেলেন প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকল পৃথিবীর একটি অজ্ঞাত কোণে তাঁদের অতিকায় উদ্যোগে শশব্যস্ত; তিনি যেন দেখতে পেলেন নির্বাধভাবে তাঁদের কাজ এগিয়ে যাচ্ছে, বানিয়েছেন তাঁরা সেই মহাকায় কামান, মেলিমেলোনাইট মিশিয়ে বানাচ্ছেন সেই অতিকায় প্রাসটি যা কিছুদিন পরেই সূর্যের আরেকটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ হিশেবে সৌর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যাবে। এই নতুন তারার জন্য মনোরম একটি নামও তিনি ভেবে রাখলেন, 'স্কর্‌বেটা'—নিউ-পার্কের সেই ধনী মহিলাটির প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রীতির নিদর্শনে। আর কতদিন পরে এই অতিকায় কামানটি গর্জে উঠবে, জে. টি. ম্যাস্টন তা মনে-মনে হিশেব করে দেখলেন।

এপ্রিল প'ড়ে গেলো। আর আড়াই মাস পরেই মধ্যরেখার তারা কর্কটক্রান্তি বৃত্তে এসে থেমে আবার মকরক্রান্তি বৃত্তের দিকে ফিরে যাবে। তিন মাস পরেই বিষুব জলপ্রপাতের কাছে এসে তা নিরক্ষীয় রেখার আড়াআড়ি হবে। আর তার পরেই এই যে ঋতুগুলি কোটি কোটি বছর ধ'রে প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়ে দেখা দিয়েছে, তারা ম'রে যাবে। শেষ বারের মতো ১৮৯—সালে এই ঋতুচক্রের অনু-বর্তী হ'লো ভূমণ্ডল। সত্যি বিরাট কাজ হ'লো একটা, অতিমানবিক, প্রায় ঐশ্বরিক। সুমেরু বৃত্তের কথা ভুলে গেলেন জে. টি. ম্যাস্টন, ভুলে গেলেন কয়লার সন্ধান: তাঁর মানস চক্ষুতে শুধু বিশ্বগঠনের রূপান্তরটিই ফুটে উঠতে থাকলো। সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য এখন এই ওলোট পালট ও ভাঙ-চুরকেই সম্ভব করে তোলা, যার ফলে পৃথিবীর মুখ সম্পূর্ণ বদলে যাবে।

কিন্তু এটাই তো মূল প্রশ্ন। পৃথিবী কি আদৌ তার মুখশ্রী পাল্‌টাতে চাচ্ছে? এখনো কি পূর্ণ যুবতী নয় সে? লাবণ্যের কি অভাব হয়েছে তার? সৃষ্টির মুহূর্তে ঈশ্বর তাকে যেমনভাবে রচনা করেছিলেন সেই শ্রী ও কান্তি কি এখন আর নেই?

banglabooks.in

একা বসে আছেন তিনি জেলখানার ছোটো ঘরে, নিঃসঙ্গ ও অসহায়। তবু হাজার চেষ্টা ক'রেও ম্যাস্টনের মুখ থেকে এ-সম্বন্ধে টুঁ-শব্দটিও বের করা গেলো না। তদন্ত সমিতির সভ্যরা রোজ তাঁর কাছে আসেন, রোজ তাঁরা অনুনয় বিনয় করেন, রোষ প্রকাশ করেন, মিনতি করেন—কিন্তু কোনো ফলই হয় না। এই অবস্থাতেই একদিন জন প্রেসটিস এক নতুন ফন্দি আঁটলেন। অন্য কারো প্রভাবে যদি কিছু হয়। আর সেইজন্যই এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের সাহায্য দরকার হ'লো। ম্যাস্টনকে এই সহৃদয়া কী চোখে দেখেন তা সবাই জানতো, তিনি যে তাঁর অত্যন্ত অনুগত এবং তাঁর প্রতি তাঁর আগ্রহও যে অসীম, এ তথ্য কারোই অগোচর ছিলো না। সেইজন্যই সমিতির প্রযত্নে এভাঞ্জেলিনা স্করবিটকে যদৃচ্ছা জেলখানায় গিয়ে ম্যাস্টনকে দেখে আসবার অনুমতি দেয়া হ'লো। দৈত্যপ্রতিম এই কামানটার ধাক্কায় পৃথিবীর অন্য সকলের মতো শ্রীমতী স্করবিটের জীবনও কি বিপন্ন নয়? কোনো রেড ইণ্ডিয়ানের ছোটো কুটিরের চেয়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কি তাঁর নিউ-পার্কের রাজপ্রাসাদটিকে বেশি সমীহ করবে, না কি তাঁকে ছেড়ে কথা কইবে? প্রশান্ত মহাসাগরের অজ্ঞাত দ্বীপে যে সব জংলি বাস করে তাঁর জীবনও কি ঠিক তাঁদেরই মতো বিপদগ্রস্ত হ'য়ে নেই? তদন্ত সমিতির সভাপতি এই কথাগুলিই তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, গণিতজ্ঞটির উপর জোর খাটাবার জন্য এইজন্যই মিনতি করা হ'লো তাঁর কাছে। যদি সব কথা বলতে রাজি হন; প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকল কোথায় এটা যদি তিনি খুলে বলেন, তাঁদের সঙ্গে কতজন লোক আছে এটা যদি তিনি জানান, তাহ'লে এখনো সেখানে গিয়ে তাঁদের উদ্যোগ বন্ধ করার সময় পাওয়া যাবে, তাহ'লে এখনও এই আসন্ন দুর্যোগ ও বিপৎপাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করা যাবে।

কাজেই যখনই চাইতেন, এভাঞ্জেলিনা স্করবিট জেলখানায় ঢোকবার অনুমতি পেতেন। এই দুর্ধর্ষ পুলিশগুলো বালিস্টিক কটেজের আরাম থেকে জে.টি. ম্যাস্টনকে নিয়ে আসবার পর থেকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য মিসেস স্করবিট উৎসুক হ'য়ে ছিলেন। এপ্রিল মাসের নয় তারিখে প্রথম যেদিন তিনি ম্যাস্টনের ছোটো কুঠরিতে ঢুকলেন, সেদিন যদি কোনো অভদ্র ব্যক্তি সেখানে আড়ি পাততো তাহ'লে নিম্নোক্ত কথাবার্তা শুনতে পেতো;

'অবশেষে আবার আপনার সঙ্গে দেখা হ'লো, মিঃ ম্যাস্টন!'

'মিসেস স্করবিট, আপনি! আপনি!'

'ব্যাঁ, চার সপ্তাহ—চার সপ্তাহ অদর্শনের পর অবশেষে—'

banglabooks.in

ঘড়ি দেখে জে. টি. ম্যাস্টন বললেন, 'ঠিক চার সপ্তাহ নয়। আসলে আটাশ দিন পাঁচ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর দেখা হ'লো।'

'শেষকালে আবার আমরা পুনর্মিলিত হলাম।'

'কিন্তু ওরা যে বড় আপনাকে আসতে দিলে—একেবারে এই কুটির পর্যন্ত, এটা কেমন ক'রে হ'লো ?

'আমার প্রীতির কথা জানে ব'লে এই শর্তে তারা আমাকে আসতে দিয়েছে যে, প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের শুলুক সন্ধান বের করার জন্য আমি যেন আপনার উপর জোর খাটাই।'

'কী ?' চিৎকার করে উঠলেন ম্যাস্টন, 'আর আপনি আমাকে সেই পরামর্শ দিতে এসেছেন ? সহযোগীদের ফাঁশিয়ে দিতে পারি, এই চিন্তাকে আপনি মনে স্থান দিয়েছেন ?'

'আমি স্থান দিয়েছি ! আমাকে এতটাই মন্দ ভাবেন আপনি ? আমি আপনার নিরাপত্তার জন্য আপনার সম্মান বিসর্জন দেবো আমি ! বিশুদ্ধ গণিতের সেবায় অঙ্কশাস্ত্রের জটিল চিন্তায় যে জীবন কেটে গেলো, তাকে কলঙ্কিত করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করবো—আমি !'

'বাহবা, মিসেস স্করবিট ! আপনার মধ্যে আবার আমাদের সংস্থার দানশীলা পৃষ্ঠপোষিকাকে দেখতে পেলাম। আপনার সহৃদয়তায় মোটেই আমি সন্দেহ করিনি।'

'ধন্যবাদ মিস্টার ম্যাস্টন।'

'পৃথিবীর আর আমার কথা যদি তোলেন, তো বলি,' ম্যাস্টন ব'লে চললেন, 'পৃথিবীর কোন্‌খানে আমাদের এই বিরাট কামান দাগা হবে তা বলার আগে—বা ঠিকভাবে বলতে গেলে, এতদিন যে-গোপন তথ্যটি আমি চেপে রেখেছি, যার ফলে এই বর্বরগুলি আমার বন্ধুদের পিছনে ধাওয়া ক'রে তাঁদের কাজে বাধা দিতে পারছে না এবং যা থেকে আমাদের মহিমা ও লাভের পরিমাণ বেড়ে যাবে, সেই তথ্যটি বেচে দেবার আগে—আমি বরং মৃত্যুবরণ করবো !'

'চমৎকার, মিস্টার ম্যাস্টন !' চেঁচিয়ে উঠলেন এভাঞ্জেলিনা স্করবিট।

একই উৎসাহ ও প্রেরণায় ঐক্যবদ্ধ—বা যদি বলেন, একই পাগলামিতে ক্ষিপ্ত —এই দুইটি মানুষ অনুভূতি ও বোধশক্তির দিক থেকে আশ্চর্য মানিয়েছেন কিন্তু।

'না, যে-দেশটিকে আমি গুণে বের করেছি, যার খ্যাতি অচিরেই অমরতাকে স্পর্শ করবে, তার নাম কিছুতেই জানতে পারবে না এরা,' বললেন জে. টি.

banglabooks.in

ম্যাস্টন। 'ইচ্ছে করলে তারা আমাকে চিরকালের মতো চুপ করিয়ে দিতে পারে, তবু আমার কাছ থেকে গোপন কথাটি কিছুতেই জানতে পারবে না।'

'আমাকেও যেন তারা আপনার সঙ্গে বধ করে?' বললেন এভাঞ্জেলিনা স্করবিট, 'আমিও মৌন ভঙ্গ করবো না।'

'এটা মস্ত সৌভাগ্য বলতে হবে সে তারা এখনো জানে না যে আপনি জায়গাটার নাম জানেন।'

'আপনি কি ভেবেছেন নারী বলে জায়গাটার নাম ফাঁস করে ফেলা আমার পক্ষে সম্ভব? আমার সহযোগীদের ও আপনাকে বিপদে ফেলবো আমি—না, বন্ধু, না। যদি তারা সারা দেশ ও নগরকে আপনার বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলে, যদি সমগ্র বিশ্ব এই কোঠা থেকে আপনাকে ছিনিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তা'হলে আমিও আপনার পাশে থাকবো; তাহ'লে অন্তত একটা সান্ত্বনা থাকবে আমাদের যে আমরা দু'জনে একসঙ্গেই মরেছি।'

যেন এর চেয়ে বৃহত্তর কোনো সান্ত্বনা আছে! যেন মিস্টার ম্যাস্টন কখনো এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের আলিঙ্গনে মৃত্যুবরণ করাটাকে মধুর ব'লে ভেবেছেন! এই আশ্চর্য মহিলাটি যতবারই জেলখানায় বন্দী মানুষটির সঙ্গে দেখা করেছেন, প্রতিবারই এইভাবে তাঁদের কথাবার্তা শেষ হয়েছে। আর তদন্ত সমিতি যতবারই তাঁর কাছে জানতে চেয়েছেন কোনো ফল পাওয়া গেলো কি না ততবারই তিনি জানিয়েছেন এখনো কিছু জানতে পারিনি। তবে, আর কিছু দিন গেলে মূল কথাটা বের করে নিতে পারবো।'

হায়, নারী! তা নারী আর কী-ইবা! 'দিন গেলে,' তিনি ভরসা দিলেন। কিন্তু দিন তো ছুটে চ'লে যাচ্ছে। সপ্তাহ কাটছে যেন একটি দিন, দিন যেন মাত্র একটি ঘণ্টা, আর ঘণ্টাগুলি যেন মিনিট শুধুই।

এর মধ্যেই সে এসে পড়লো। অথচ এখনো এভাঞ্জেলিনা স্করবিট ম্যাস্টনের কাছ থেকে কোনো তথ্যই আদায় করতে পারলেন না; আর তিনি-সুদ্ধ যেখানে ব্যর্থ আর কেউ কি সফল হবেন? তাহ'লে কি কোনো বাধা না দিয়েই ভাগ্য ব'লে এই ভীষণ ধাক্কাকে মেনে নিতে হবে? না, না। এ কিছুতেই হয় না। এমন অবস্থায় হাল ছেড়ে দেবার কথাই ওঠে না। য়ুরোপীয় প্রতিবেশীরা ক্ষিপ্ত ও হতাশ হ'য়ে উঠতে লাগলেন। রোজই তাঁদের মধ্যে টানা-হেঁচড়া চলে। এমনকি জ্যাক জানসেন সুদ্ধ তাঁর ওলন্দাজ-সুলভ তৃপ্ত ভঙ্গি থেকে জেগে উঠে রোজ তাঁর সহযোগীদের অভিযোগে নাজেহাল ক'রে তুললেন। কর্নেল বরিস কার্কফ তো একদিন তদন্ত

banglabooks.in

সমিতির সভাপতির সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লেগে গেলেন : জন প্রেসটিস শুধু সামান্য আহত হলেন তাতে। আর মেজর ডনেলান ? তিনি ? তিনি ইংরেজ-জনোচিত অভ্যেস ভুলে গিয়ে না-ব্যবহার করলেন পিস্তল না-ব্যবহার করলেন বজ্রমুষ্টি, শুধু ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলেন তিনি ; আর ডীন টুড্রিঙ্ক সেই অবসরে মুষ্টিযুদ্ধ প্রতি-যোগিতায় যোগ দেবার ভঙ্গিতে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার সেই দালালটি অর্থাৎ উইলিঅম এস. ফর্স্টারের সঙ্গে যৎকিঞ্চিৎ ঘুসি-বিনিময় করলেন, যে বেচারি আস্ত ব্যাপারটার কিছুই কি না জানে না।

যুক্তরাষ্ট্রকে শায়েস্তা করার জন্য সমস্ত জগৎ ঐক্যবদ্ধ হ'য়ে গেলো : অতি বিখ্যাত ইম্পে বার্বিকেনের কাজের জন্য তারা আস্ত আমেরিকাকে দায়ী করতে চাইলে, সারা দেশটাই যেন একজনের জন্য দোষী। ওয়াশিংটনের এই উচ্ছৃঙ্খল সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার জন্য দূতাবাস বন্ধ করে দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজদূতদের ফিরিয়ে আনার কথা চলতে লাগলো। বেচারা যুক্তরাষ্ট্র ! বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানিকে একবার হাতে পেলে হয় ! খামাকাই এই রিপাবলিক চতুর্মহা-দেশের দেশগুলিকে জানালে যে এই রোমাঞ্চপ্রিয় মার্কিনিদের হাতে পেলেই গ্রেফ-তার করার পূর্ণ অধিকার তাদের দেওয়া হ'লো। কিন্তু এ-সব কথা ধৈর্য ধ'রে শোনার মতো মনোভাব কারো থাকলে তো ! আর, কাজেই অনেক—অনেক দূরে, কোন গোপন ও রহস্যময় স্থানে প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন সদলে তাঁর এই বিশাল উদ্যোগের প্রস্তুতিতে নিরত রইলেন। তাঁদের কোনো হদিশই পাওয়া যাচ্ছিল না বলে বিদেশী রাষ্ট্রগুলো বলতে আরম্ভ করলে : 'এঁদের শাকরেদটি তো তোমাদের হাতে আছে ; এটা তো ঠিক যে বার্বিকেন ও তাঁর দলবল কোনখানে কাজে ব্যস্ত তা মিস্টার ম্যাস্টন জানেন। ম্যাস্টনকে চাপ দিয়ে পেট থেকে কথা বের করছো না কেন ? বাধ্য করো তাঁকে। গরম তেল ফেলতে পারো না তাঁর গায়ে—গলানো মোম ? আগে তো এর চেয়ে অনেক তুচ্ছ কাজে এ-সব ব্যবহার করা হ'তো—এখন সমস্ত মানুষের মুখ চেয়ে এ-সব উপায় কাজে খাটাচ্ছো না কেন ?' এর উত্তরে এটাই জানানো হ'লো যে প্রাচীনকালে এ-সব উপায় নানা সময়ে অবলম্বন করা হলেও, সুসভ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে তো আর করা যায় না। সেইজন্য এদিক থেকে ম্যাস্টনের আতঙ্কিত হবার কিছু ছিলো না। লোকে শুধু এই আশা করলে যে কালক্রমে তাঁর এই দুষ্ক্রিয়ার বিপুলতা তাঁর বিবেক জাগ্রত করবে, আর তখন তিনি এই গোপন তথ্য উদ্ঘটিত করবেন—আর নয় তো কেবল দৈবের জন্য অপেক্ষা করা —যদি দৈব হঠাৎ দয়াপরবশ হ'য়ে সব উদ্ঘাটন ক'রে বসে।

banglabooks.in

সময়, অবশ্য, যথারীতি কেটে চললো, এবং সম্ভবত বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকলের কাজও : কেউ জানে না কোনখানে কোন আশ্চর্য অবস্থায় তাঁদের এই মস্ত প্রস্তুতি চলেছে।

প্রশ্ন উঠলো, এত বড়ো একটা কাজ এতো গোপনে চলে কী ক'রে ? লোহার কারখানা চাই, চাই ধাতু গলাবার জন্য বিপুল চুল্লি—২৭ সেন্টিমিটার মাপের কোনো কামানের দশলক্ষ গুণ বড়ো একটি কামান বানাতে হবে তো, আর প্রাসটিও তো ১৮০,০০০ টনের, তার জন্য ধাতুপিণ্ড গলাতে হবে না ? কয়েক হাজার মজুর খাটাতে হবে সেই জন্য, উপরন্তু তাদের জন্য চাই যানবাহন ও নির্বাহ সভা। সত্যি সারা জগৎ হদিশ পায় না, অথচ এমন একটা ঘটে যায়—এমন হয় কী করে ? পৃথিবীর কোন প্রান্তে বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানি এমন একটি গোপন আস্তানা খাড়া করলেন, যার আশপাশে কোনো লোকই কিছু টের পায় না ? প্রশান্ত বা ভারত মহাসাগরের কোনো জনহীন দ্বীপ কি আর আছে ? সমস্তই তো ইংল্যাণ্ড উদরসাৎ করে ফেলেছে। হয়তো নতুন সংস্থা বহু কষ্টে এই জন্যেই একটি খুঁজে বের করেছেন। হয়তো সুমেরুবৃত্তের কোনোখানে তাঁদের কারখানা বসানো হয়েছে, কেউ কেউ বললে। না তা হ'তে পারে না—সুমেরুবৃত্তে যাওয়া যায় ব'লেই তো সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থা স্থানান্তর করতে চাচ্ছে। কাজেই এ-সব দ্বীপে বা কোনো দুরধিগম্য স্থানে বার্বিকেন ও নিকলের সন্ধান করা আসলে সময়েরই অপব্যয়। জে. টি. ম্যাস্টনের কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত-করা নোটবইতে কি কামান দাগার স্থান ব'লে নিরক্ষীয় অঞ্চলকে নির্দেশ করা হয়নি ? কিন্তু বিষুবরেখার আশপাশে সবখানেই তো মনুষ্য-বসতি। মনুষ্য-সৃষ্ট স্থান থেকেও এত গোপনে কাজ চালানো কি অসম্ভব নয়, কেন না তাহ'লে এত দিনে ব্যাল্টিমোরের তদন্ত সমিতিকে কেউ কি খবর দিতো না ?

তা আলস্যাদ পিয়েদ্যো এ-সম্বন্ধে কী ভাবেন ? এই কাজ সফল করতে গেলে কী কী লাগবে, তারই স্বপ্ন দেখেছেন তিনি কেবল। ক্যাপ্টেন নিকল নাকি প্রচণ্ড-শক্তি-সম্পন্ন বিস্ফোরক আবিষ্কার করেছেন। ভীষণতম বিস্ফোরক ব'লে যা বর্ণিত তার চেয়ে তিন চার হাজারগুণ বেশি প্রসারণ-শক্তি সম্পন্ন মিলিথেলোনাইট নাকি তাঁর হস্তগত। আমাদের পূর্বপুরুষ যে কালো বারুদ ব্যবহার করতেন, এর জোর

banglabooks.in

নাকি তার ৫৬০০০ গুণ বেশি। অত্যন্ত বিস্ময়কর তথ্য এটা, অত্যন্ত বিস্ময়কর। কিন্তু তা ব'লে অসম্ভব অবশ্য নয়। কে জানে ভাবী প্রগতির দিনে দূরবর্তী সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করার জন্য কত সব উপায় বের করা হবে! কামান দেগে যে-প্রবল ধাক্কার সৃষ্টি হবে তা দিয়ে পৃথিবীর মেরুরেখা পাল্টে ফেলার চিন্তাটা অবশ্য এই ফরাশি যন্ত্রবিদকে তেমন আশ্চর্য করেনি। এমন-কিছু নতুনত্ব নেই এই চিন্তায়। তারপর প্রেসিডেন্ট বার্বিকেনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে চিন্তা করলেন পিয়ের্দ্যো, প্রতিদিন ভূমণ্ডলে যত ঘাত-প্রতিঘাত লাগে তার সব তো পৃথিবী শোষণ ক'রে নিচ্ছে। লক্ষ-লক্ষ লোক রোজ নিছকই আমাদের জন্য কয়েক গ্রাম বা কয়েক কিলোগ্রাম ওজনের প্রাসক্ষেপণ ক'রে যাচ্ছে, এমনকি আমি যখন হাঁটি, লম্ফ-ঝম্ফ দিই, হাত বাড়াই তখন সবকিছুই পৃথিবীর পিঠে ঘটছে ব'লে পৃথিবীর বেগকে বাধা দিচ্ছে কিংবা সাহায্য করছে। তা'হলে আপনার এই বিপুল কামনটি কী এমন জাতের যে বাঞ্ছিত ধাক্কার সৃষ্টি করতে পারবে? পৃথিবীকে সরাবার পক্ষে এই ধাক্কা যথেষ্ট হবে কেমন করে যদি জে. টি. ম্যাস্টন নামক ব্যক্তিটি তা অঙ্ক ক'রে প্রমাণ করতে পারেন, তাহ'লে তা দেখানোও খুব কঠিন নয়।' গান-ক্লাবের এই সম্পাদকটির আশ্চর্য গাণিতিক প্রতিভার প্রশংসা না-ক'রে পারলেন না পিয়ের্দ্যো। তদন্ত-সমিতি তাঁর কাছে ম্যাস্টনের অঙ্কটির নকল পাঠিয়েছিলেন ; এই অঙ্কের মূল মর্মটি কী, তা জানার জন্য সব গণিত-বিদকেই তাঁরা তা পাঠিয়েছিলেন। আর বীজগণিত তো পিয়োর্দ্যোর কাছে সংবাদ-পত্রের মতোই মনোজ্ঞ ঠেকে : এই পাঠ্যবস্তুর মধ্য থেকে অসীম আনন্দ লাভ করেন তিনি। যদি সত্যি এ-সব পরিবর্তন ঘটে, তাহ'লে কী মারাত্মক দুর্যোগই না নেমে আসবে পৃথিবীর উপর! ওলোট পালোট হ'য়ে যাবে নগর-গ্রাম, সমুদ্র পর্যন্ত তীর ছেড়ে তিন লাফে এগিয়ে আসবে, কোটি-কোটি লোক মরে যাবে মুহূর্তে। একটা ভয়ংকর ভূমিকম্পের মতো হবে ব্যাপারটা, এমন ভয়ংকর, যে তার আর তুলনাই মিলবে না কখনও। 'সব সত্ত্বেও,' পিয়ের্দ্যো বললেন, 'ক্যাপ্টেন নিকলের এই নারকীয় বারুদ যদি একটু কম শক্তিসম্পন্ন হ'তো তাহ'লে কামান দাগার পর ক্ষেপ-ণাস্ত্র বা প্রাসটি আবার পৃথিবীতে এসে পড়বে ব'লেই আশা করা যেতো। তাহ'লে একবার শূন্যে ঘুরে এলেও এই ক্ষেপণাস্ত্রটি থেকে বিশ্বগ্রাসী সর্বনাশের উৎপত্তি হ'তো না—বেশি কিছু ধ্বংস হ'তো না তাহ'লে। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহ'লে আবার পূর্ববৎ শান্ত হ'য়ে যেতো। কিন্তু এই চিন্তাকে ভুলেও মনে প্রশ্রয় দেবেন না। ওদের ওই মেলিথেলোনাইটের ক্ষেপণাস্ত্রটি সেইজন্য যথারীতি পৃথিবী ছেড়ে চ'লে যাবে, ভূমণ্ডলের সব ওলোট পালোট ক'রে দিয়েছে ব'লে ফিরে এসে সব ঠিকঠাক ক'রে

banglabooks.in

কখনো ক্ষমা চাইবে না। 'কোনখানে কামান দাগবেন ওঁরা', পিয়েদ্যো অবশেষে বললেন, 'তা যদি জানতে পেতুম তাহ'লে এটা অন্তত বলতে পারতুম যে কোন-কোন জায়গায় এর ফলে সবচেয়ে ভয়ংকর প্রতিক্রিয়া হবে, আর কোথায় বা অতি অল্পই হবে। তাহ'লে তাসের বাড়ির মতো ঘরদোর ভেঙে পড়ার আগে লোকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'তে পারতো। কিন্তু জায়গাটার নাম জানবোই বা কী ক'রে?' 'আমার মনে হয়,' পিয়েদ্যো বললেন, 'এই ধাক্কার ফল হয়তো যতটুকু আমরা কল্পনা করছি তার চেয়েও জটিল ও ভয়ানক পরিণত হবে। এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সুযোগ পাবে আগ্নেয়গিরিগুলি; সিন্ধুপীড়াগ্রস্তদের মতো অবিরাম তারা বমি করতে থাকবে। তাদের কোনো জ্বালামুখ দিয়ে সমুদ্রজল ভিতরে চ'লে যেতে পারে। তবে বিশেষ উনিশ-বিশ তাতে এমন হবে না অবশ্য। এমনকি, এমন বিস্ফোরণও হ'তে পারে, যার ফলে পৃথিবী নামক এই গ্রহটি লম্ফন শুরু করে দেবে। ম্যাস্টন লোকটি নির্ঘাৎ শয়তান; পৃথিবীটা নিয়ে সে যেন ভেলকি দেখাচ্ছে, যেন কোনো বিলিয়ার্ড-বল নিয়ে খেলা করছে সে!'

আলস্যাদ পিয়েদ্যোর যুক্তি ও বক্তব্যের নির্যাস এই। তাঁর এই ভয়ংকর অনুমানগুলি কাগজওলারা লুফে নিয়ে আলোচনা করতে থাকলো (বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির এই পরিকল্পনার ফলে যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে, তার শেষ হবে কেবল অবিরাম দুর্ঘটনায়)। ফলে ব্যাপারটা এমন হ'য়ে দাঁড়ালো যে দেশের সেই ভয়ংকর দিন যতই এগিয়ে আসতে লাগলো, ততই আতঙ্কের পরিমাণ বেড়ে চললো: এমনকি নির্ভীকেরাও পর্যন্ত ভীত ও সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠলেন। ঠিক ১০০০ সালে যেমন হয়েছিলো, তেমনি অবস্থা হ'লো পৃথিবীর; আচমকা মৃত্যু এসে গ্রাস করবে ব'লেই মানুষ তখন ভেবেছিলো। সেই সময় কী হয়েছিলো, তা একবার স্মরণ ক'রে দেখা যেতে পারে। আপোক্যালিপ্‌স্ বা দিব্য-প্রকাশ অনুযায়ী লোককে বিশ্বাস করানো হয়েছিলো যে শেষ বিচারের দিন সমাগত। দশম শতাব্দীর শেষ বছরে—এচ. মার্ত্যঁ বলেছেন—সব বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো—আমোদ প্রমোদ ব্যবসা বাণিজ্য, আগ্রহ কৌতূহল, সমস্ত বন্ধ—এমনকি জনহিতকর কর্মের অনুষ্ঠান পর্যন্ত। কালকেই যে-চিরন্তনের সূচনা হবে, তার কথা ভেবে কেবল দু-একদিনের জন্য জরুরি জিনিসপত্র জমিয়ে রেখেছিলো লোকে। যাবতীয় সম্পত্তি, স্থাবর কি অস্থাবর, কেল্লা বা জমিদারি—গির্জাকে দান করা হয়েছিলো যাতে এই পুণ্য-কর্মের ফলে স্বর্গরাজ্যে সবাই রক্ষা পায়। 'জগতের শেষ যখন আসন্ন, এবং প্রলয় অনিবার্য, তখন ভজনালয়কেই নিবেদন করা ভালো,' এই ব'লে গির্জের

banglabooks.in

উদ্দেশে বহু দানকর্মের অনুষ্ঠান হয়েছিলো তখন। তারপর অবশেষে নিয়তিনির্দিষ্ট সেই মুহূর্ত যখন এলো, সবাই দৌড়ে গেলো গির্জেয় ও ধর্মসভায়, মঠে ও ভজনালয়ে : উৎকর্ণ হ'য়ে প্রতীক্ষা করতে লাগলো কখন সপ্তদূতের তূর্যনিনাদ ধ্বনিত হয় আর স্বর্গের আহ্বান আসে ; ১০০০ সালের প্রথম দিন এলো, আস্তে আস্তে চ'লেও গেলো কিন্তু কিছুই বদলালো না—কোনো আঁচড়ই পড়লো না পৃথিবীতে। কিন্তু এবার তো আর বাইবেলের কোনো শ্লোক থেকে এই উৎপত্তির সূচনা হয়নি—এবার কথা উঠেছে পৃথিবীর ধ্রুবাক্ষ পাণ্টানোর প্রস্তাব থেকে : আর নানা নির্ভরযোগ্য গাণিতিক পরীক্ষার পর দেখা গেছে যে এই সম্ভাবনা মোটেই কল্পনাবিলাস নয়।

এই পরিস্থিতিতে জে. টি. ম্যাস্টনের দশা দিনে-দিনে অত্যন্ত মারাত্মক হ'য়ে উঠতে লাগলো। পাছে সমগ্র বিশ্ব প্রতিহিংসার স্পৃহায় ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে, এই ভয়ে মিসেস এভাঞ্জেলিনা স্করবিট কম্পিত হ'তে লাগলেন। অত্যন্ত নির্ভীকভাবে বীরের মতো যে-তথ্য তিনি গোপন ক'রে রেখেছেন, শেষকালে শ্রীমতী স্করবিট হয়তো তাঁকে তা উদ্ঘাটন করবার জন্য অনুরোধ ক'রে বসতেন। কিন্তু তাঁর কাছে এ-কথা উচ্চারণ করার সাহস তিনি কিছুতেই সঞ্চয় করে উঠতে পারলেন না ; আর সেটাই তাঁর পক্ষে ভালো হ'লো। একবার নিজের এই দুর্বলতা প্রকাশ ক'রে ম্যাস্টনের তিরস্কারের কাছে নিজেকে সমর্পণ করা তাঁর পক্ষে বোকামি হ'তো। বাল্টিমোর নগরে এমন-এক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছিলো যে বাসিন্দারা প্রায় অদমনীয় হ'য়ে উঠে-ছিলো। সেই উত্তেজনায় উস্কানি দিচ্ছিলো খবরের কাগজের প্রবন্ধগুলি। যদি জে. টি. ম্যাস্টন তখন একবার এই ক্ষিপ্ত লোকগুলির হাতে পড়তেন, তা'হলে তক্ষুনি তাঁর ভাগ্য নির্ধারিত হ'য়ে যেতো। হয়তো বন্য জন্তুর মুখেই ছুঁড়ে ফেলা হ'তো তাঁকে। তিনি অবশ্য তাতেই তুষ্ট : 'আমি তার জন্য তৈরি আছি,' তিনি বললেন। যাই ঘটুক না কেন, 'এক্স' বলতে কোন জায়গা বোঝায়, তা কিছুতেই বলবেন না ব'লে তিনি সংকল্প নিয়েছিলেন ; কেননা এটা তিনি ভালোই জানতেন যে একবার যদি লোকে বার্বিকেন আর নিকলের হদিশ পায়, তাহ'লে কাজটা আর কিছুতেই শেষ হবে না। অদ্ভুত একটা যুদ্ধ : সারা জগতের বিরুদ্ধে একা দাঁড়িয়েছে একটি মাত্র লোক আর তার ফলে এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের চোখে ম্যাস্টন মহত্তর ও বৃহত্তর হ'য়ে উঠতে লাগলেন—এবং ক্লাবের সভ্যরাও এই মানুষটির প্রতি অধিকতর শ্রদ্ধা-শীল হ'য়ে উঠলো। গান-ক্লাবের সম্পাদকটি এতই নামজাদা হ'য়ে উঠলেন যে, সব দুষ্ক্রিয়দের মতো তাঁর নামেও রোজ অজস্র চিঠি আসতে লাগলো ; আস্ত জগৎটাকে

banglabooks.in

যিনি পাল্টে দিচ্ছেন, তাঁর হাতের লেখা পাবার জন্য লোকে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। এটা যতোই মধুর লাগুক না কেন, অবস্থা কিন্তু তাঁর দিনে দিনে মন্দ থেকে মন্দতর হ'তে লাগলো। জেলখানার বাইরে দিন রাত লোকের ভিড় : হৈ-চৈ, আন্দোলন আর উত্তেজনার একটি রোষায়িত সমুদ্র যেন। কোনো বিচার না ক'রেই রোষোন্মত্ত জনতা তাঁকে বধ করতে চাচ্ছিলো। পুলিশ এটা ভালো ক'রেই বুঝতে পারলে যে অচিরেই এমন এক সময় আসবে যখন কয়েদী ম্যাস্টন ও তাঁর জেল-খানাকে তারা আর এই ক্ষিপ্ত মানুষের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না। আমেরি-কার মানুষ—সেইসঙ্গে বিশ্ববাসীও অবশ্যই—যাতে তৃপ্ত হয় সেইজন্য ওয়াশিংটনের সরকার জে. টি. ম্যাস্টনকে দায়রায় সোপর্দ করলেন। 'অন্যেরা যে-চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হ'লো বিচারকেরাও তাতে কোনো সাফল্য লাভ করবেন না', বললেন আলস্যাদ পিয়েরের্দ্যো। এই অসুখী প্রতিভাটির জন্য এখন তিনি সংবেদনা বোধ করলেন।

সেপ্টেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে প্রাতঃকালে তদন্ত সমিতির সভাপতি নিজে বন্দীর সঙ্গে জেলখানায় দেখা করতে গেলেন। এভাঞ্জেলিনা স্করবিটও তাঁর সঙ্গে যাবার অনুমতি পেয়েছিলেন—অবশ্য নিজেই তিনি এ-জন্য অনুরোধ করেছিলেন। শেষ চেষ্টা এটা ; এবার হয়তো এই চমৎকার মহিলাটি তাঁর যাবতীয় প্রভাব বিস্তার ক'রে প্রত্যাশিত ফল লাভ করতে পারবেন। কোনো দিক থেকেই যাতে কিছু বাদ না যায়, এই শেষ চেষ্টা যাতে সফল হয়, তার জন্য সমস্ত উপায়ই প্রয়োগ করে দেখা যাক। আর যদি সফল না হয়, তবে ? 'বেশ, তবে দেখবো কী হয়। দেখা-দেখি আর কী, সোজা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবো আর-কি জানোয়ারটাকে',—বললো লোকে। আর সুযোগ পেলে লোকে তৎক্ষণাৎ তা-ই করতো। ফলে সকাল এগারোটার সময় তদন্ত সমিতির সভাপতি জন প্রেসটিস ও শ্রীমতী এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের কাছে জে. টি. ম্যাস্টনকে হাজির করা হ'লো।

কোনো ঘোর-প্যাঁচ বা ভণিতা না ক'রে সোজা মূল ব্যাপারটায় পৌঁছে গেলেন প্রেসটিস। কতিপয় প্রশ্নোত্তরই হ'লো শুধু—এক পক্ষ অত্যন্ত উত্তেজিত, আর অপর পক্ষ শান্ত ও সমাহিত। আর, বলাই বাহুল্য, এই অবস্থাতেও শান্ত, সমাহিত ভাবে যিনি কথা বললেন, তিনি জে. টি. ম্যাস্টন।

'শেষবার জিগেস করছি : আপনি ঠিক উত্তর দেবেন তো ?' জিগেস করলেন জন প্রেসটিস।

'কী উত্তর দেবো ?' গান-ক্লাবের সম্পাদকমশাই ঠাট্টার স্বরে মন্তব্য করলেন।

'উত্তর দেবেন এই প্রশ্নের : আপনার সহযোগী বার্বিকেন এখন কোনখানে

banglabooks.in

'একশোবার তো বলেছি আপনাদের।'

'বেশ, একশো-এক বারই না হয় বলুন।'

'যেখানে কামান দাগা হবে।'

'কোনখানে কামান দাগা হবে?'

'যেখানে আমার সহযোগী বার্বিকেন রয়েছেন।'

'একটু সাবধান হবেন জে. টি. ম্যাস্টন।'

'কেন?'

'কারণ উত্তর দিতে অস্বীকার করার জন্য'—

'আপনি সেই খবর জানতে পাবেন না যা জানা আপনার ঠিক হবে না।'

'তা জানার আমাদের অধিকার আছে।'

'আমার অবশ্য মত তা নয়।'

'এ-জন্য আপনাকে কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।'

'বেশ তো।'

'এবং জুরি আপনাকে অভিসম্পাত দেবে।'

'তাতে আমার কী এসে গেলো।'

'আর রায় শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তা পালন করা হবে।'

'তা তো ভালোই।'

'ম্যাস্টন, আপনি—' এইসব ভীতি প্রদর্শনে এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের বুক ফেটে যাচ্ছিলো।

'কী, আপনিও এঁদের দলে?' ব'লে উঠলেন জে. টি. ম্যাস্টন।

নত মুখে রইলেন এভাঞ্জেলিনা।

'শুনবেন বিচারে কী রায় হবে?'

'যদি দয়া ক'রে বলেন,' বললেন ম্যাস্টন।

'প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে আপনাকে—আর তারই যোগ্য আপনি।'

'সত্যি?'

'দুই আর দুয়ে যেমন চার হয় এটাও তেমনি নিশ্চিত যে আপনি ফাঁসিতে ঝুলবেন।'

'তা'হলে বোধহয় এখনো আমার বেঁচে যাবার সুযোগ আছে,' একটু ভেবে ম্যাস্টন বললেন। 'আপনি যদি একটু ভালো অঙ্ক জানতেন তা'হলে কখনোই এটা বলতেন না যে দুই আর দুয়ে চার হয়। দুটি সংখ্যার যোগফল তাদের একটি

banglabooks.in

অংশের সমান অর্থাৎ দুই আর দুয়ে যদি চার হয়, এটা যে এতকাল জগতের সব গাণিতিকরা মূর্খের মতো ব'লে এসেছেন আপনি শুধু এই কথাটাই প্রমাণ করলেন।'

জন প্রেসটিস অত্যন্ত ভ্যাবচ্যাকা খেয়ে গেলেন।

'আপনি যদি বলতেন যে, "একে আর একে যেমন দুই হয়, ঠিক তেমনি নিশ্চিত," তা'হলে কোনো ভুল হ'তো না।' ম্যাস্টন তাঁকে বোঝালেন, 'এটা এই-জন্যই স্বতঃপ্রকাশ যে এটা এখন আর উপপাদ্য নয়—পুরোপরি একটি সংজ্ঞার্থ।'

সরল পাটীগণিতের এই পাঠ নিয়েই তদন্ত সমিতির সভাপতি বেরিয়ে এলেন। এভাঞ্জেলিনা স্করবিটও নীরবে ও নতমুখে তাঁকে অনুসরণ করলেন; অনুগণকটির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা এতই বেড়ে গেলো যে তাঁর দিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত তাঁর হ'লো না।

জে. টি. ম্যাস্টনের পরম সৌভাগ্য যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার হঠাৎ জাঞ্জিবারের মার্কিনি দূতাবাস থেকে এই তারবার্তা পেলেন :

'জন. এস. রাইট, স্বরাষ্ট্র সচিব, ওয়াশিংটন, যুক্তরাষ্ট্র, সমীপেষু : জাঞ্জিবার, ১৩ সেপ্টেম্বর, ভোর ৫টা (স্থানীয় সময়)—কিলিমানজরো গিরিমালার দক্ষিণে ওয়ামাজাইতে বৃহৎ তৎপরতা চলেছে। সুলতান বালি-বালির সাহায্যে আট মাস হ'লো প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন ও ক্যাপ্টেন নিকল সেখানে কালো আদমিদের নিয়ে মস্ত এক প্রতিষ্ঠান বানিয়েছেন। রিচার্ট ডবলিউ. ট্রাস্ট, রাষ্ট্রদূত কর্তৃক এই তথ্য সরকারের গোচরীভূত করা হ'লো।'

অবশেষে এইভাবেই জে. টি. ম্যাস্টনের গোপন তথ্য উদ্ঘাটিত হ'য়ে গেলো। আর সেইজন্যই গান-ক্লাবের সম্পাদক ফাঁসিকাঠে না-ঝুলে জেলখানাতেই বন্দী হ'য়ে থেকে গেলেন।

কিন্তু বেঁচে থেকে ব্যর্থতা ও অসাফল্যের দাস হবার চেয়ে হয়তো মৃত্যুবরণই অধিকতর কাম্য ছিলো তাঁর কাছে। কে জানে!

banglabooks.in

১৫

কোথায় গিয়ে যে বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানি তাঁদের মূল ঘাঁটি করেছেন, অবশেষে ওয়াশিংটন সরকার তা জানতে পেলেন। কিন্তু তারবার্তা কি সঠিক? নির্ভুল? না কি তাঁরা সন্দিগ্ধ হবেন? না, তা ঠিক যুক্তিসংগত হবে না। জাঞ্জিবারের রাষ্ট্রদূত মানুষ হিশেবে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য; এই বার্তাটি যে নির্জলা সত্য, তা সন্দেহাতীত। পরে আরো যে-সব তার এলো, তাতেও এই তথ্য সমর্থিত হ'লো। আফ্রিকার ওয়া-মাজাই-এ, কিলিমানজরোয়, বিষুবরেখার কিঞ্চিৎ নিম্নদেশেই যে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থা তাঁদের এই অতিকায় কর্মটি সমাধা করতে চাচ্ছেন, তা নিঃসন্দেহ।

কেমন ক'রে এত গোপনে এত চুপেচাপে তাঁরা এই হারানো দেশে গিয়ে পৌঁছলেন? মাত্র ১৮৪৯ সালে ডক্টর রেবভিয়ানি আর ডক্টর কাপ্‌ফ্‌ কিলিমান-জরো আবিষ্কার করেছেন—তার চুড়োটায় এ যাবৎ উঠেছেন কেবল অটো এলের আর অ্যাবট: আর ওয়ামাজাই তো সেই পাহাড়েরই পাদদেশে অবস্থিত। সকলের অজ্ঞাতসারে, নিঃশব্দে তাঁরা কেমন ক'রে সেখানে গেলেন—কেমন ক'রেই বা কলকারখানা বসালেন সেখানে? কী ক'রে বসালেন লোহা ঢালাইয়ের যন্ত্রপাতি? কোত্থেকে পেলেন এত মজুর? কেমন ক'রে সে দেশের রাজা আর ধূর্ত ও নিষ্ঠুর জংলিদের সঙ্গে বন্ধুতা পাতালেন? কিছুই জানি না আমরা—হয়তো কোনোদিন জানতেও পারবো না, কারণ বাইশে সেপ্টেম্বরের তো আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকি। কিলিমানজরোর রহস্য যে জাঞ্জিবারের এক তারবার্তায় উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেছে, ম্যাস্টন তা জানতে পেলেন এভাঞ্জেলিনার কাছ থেকে। 'হা ঈশ্বর', বাতাস ফেঁড়ে তাঁর লোহার হাত শূন্যে উঠে গেলো, 'তবু ভাগ্যিশ এখনো টেলিফোনে বা টেলিগ্রামে কোথাও যেতে পারি না আমরা—আর দিন-ছয়েকের মধ্যেই ওদিকের ব্যাপারটা শেষ হ'য়ে যাবে।' তখন এই স্মরণীয় মানুষটিকে দেখলে বা শুনলে এই বৃদ্ধ গোলন্দাজের শক্তি ও উৎসাহে আশ্চর্য হ'তে হ'তো।

ভুল বলেননি ম্যাস্টন। বার্বিকেনকে গ্রেফতার করার পরোয়ানা নিয়ে ওয়ামাজাই-এ লোক পাঠাবার অবসর তখন ছিলো না। আলজেরিয়া বা মিশর—এমনকি এডেন, মাদাগাস্কার বা জাঞ্জিবার থেকে লোক পাঠালেও বড্ড দেরি হ'য়ে যাবে, কারণ ওই পাহাড়ি অঞ্চলে একদিকে যেমন হাজার ঝামেলায় পড়তে হবে তাদের, তেমনি হয়তো সুলতানের মস্ত বাহিনীর কাছ থেকেও ভীষণ বাধা পাবে—কারণ সুলতানও

banglabooks.in

তো এই ব্যাপারে ঈষৎ উৎসুক। ফলে এই প্রচেষ্টায় বাধা দেবার কোনো আশাই আর রইলো না। বাধা যখন দেয়াই যাচ্ছে না, তখন না-হয় তার প্রতিক্রিয়াটাই বিচার ক'রে দেখা যাক, কারণ এখন তো 'এক্স' বলতে ঠিক কোন জায়গা বোঝায় তা আর অজ্ঞাত নেই! সমস্যাটা অবশ্যই জটিল, কিন্তু এতসব নামজাদা গাণিতিক রয়েছেন, তাঁরা এটার সমাধান করতে পারবেন না? জাঞ্জিবারের রাজদূত তাঁর বার্তাটি সরাসরি ওয়াশিংটনের স্বরাষ্ট্রদপ্তরকে পাঠিয়েছিলেন ব'লে যুক্তরাষ্ট্র সরকার খবরটা প্রথমে চেপে যাবার কথা ভেবেছিলেন। অথচ খবরটা সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ুক, এটাও আবার তাঁরা সেইসঙ্গেই চাইলেন : লোকে তাতে বস্তুত এটা বুঝতে পারবে যে মেরুরেখা পাল্টাবার সময় কোথায় স্তম্ভের মতো ঘুরে-ঘুরে উঠবে উৎক্ষিপ্ত সমুদ্র, আর বিশ্ববাসী তা থেকে এটা অন্তত ধরতে পারবে যে কাছে-পিঠে কোথায় গিয়ে আশ্রয় নেয়া উচিত তাদের। নিয়তি কী বলে এটা জানার জন্য লোকেরা যে কী বিষম অধীর ও ব্যাকুল হ'য়ে যাচ্ছে, তাও তো স্মর্তব্য।

১৪ই সেপ্টেম্বর তারবার্তাটি ওয়াশিংটন মানমন্দিরে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো : সেই-সঙ্গে নির্দেশ গেলো যাতে তৎক্ষণাৎ ধ্রুবাক্ষ পাল্টাবার ভৌগোলিক পরিণাম বিচার ক'রে বের করা হয়। তাদের বিচার শেষ হ'লো দু-দিন পরে। বিশ্বের সর্বত্র তা তারবার্তায় জানিয়ে দেয়া হ'লো। আর হাজার হাজার খবরের কাগজে যখন তা প্রকাশিত হ'লো, তখন বড়ো-বড়ো নগরে ও সর্বত্র শুধু এ-বিষয়েই বলাবলি করলে লোকে। 'কী হবে তাহ'লে? কী হবে?' সমস্ত বিশ্বে কেবল এই আতঙ্কিত প্রশ্নটিই সমস্বরে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হ'লো।

ওয়াশিংটন মানমন্দির যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিলো তা এই :

জরুরি ঘোষণা

প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকলের প্রচেষ্টাটি সংক্ষেপে এই যে তাঁরা স্থির করেছেন ২৭ সেন্টিমিটার মাপের সাধারণ কামানের দশ লক্ষগুণ বড়ো একটি অতিকায় কামান দেগে ২২শে সেপ্টেম্বর মধ্যরাতে ২৮০০ কিলোমিটার বেগে ১৮০,০০০ টন ওজনের একটি প্রাস নিক্ষেপ ক'রে প্রবল একটি আন্দোলন ও ধাক্কার সৃষ্টি করবেন।

এখন, যদি নিরক্ষীয় রেখার নিম্নদেশে, পারীর মধ্যরেখার ৩৪ ডিগ্রি

banglabooks.in

পশ্চিম অক্ষাংশে, কিলিমানজরোর নিচে এই কামান গর্জন ক'রে ওঠে আর তার মুখ যদি দক্ষিণদিকে ফেরানো থাকে, তাহ'লে এই ভূমণ্ডলে নিম্নোক্ত যান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে : তৎক্ষণাৎ এই ধাক্কার ফলে নতুন একটি মেরুরেখার আহ্নিক অয়নের সৃষ্টি হবে—এবং জে. টি. ম্যাস্টনের হিশেব অনুযায়ী পুরোনো মেরু-রেখাটি যেহেতু ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট স'রে যাবে, নতুন মেরু-রেখাটি সেইজন্য ক্রান্তিবৃত্তের উপর লম্ববান হবে। এই নতুন মেরুরেখা সূচিত হবে কোন বিন্দু থেকে ? কোনখান থেকে কামান দাগা হবে, তা জানা গেছে ব'লে সহজেই তা বের করা গেছে।

বাফিন সাগর যেখানে সুমেরুবৃত্তকে ছেদ করেছে, উদীচীতে সেখানে, গ্রীনল্যাণ্ড আর গ্রীনেলল্যাণ্ডের মধ্য দিয়ে, এই নতুন ধ্রুবাক্ষের প্রান্ত যাবে। আর অবাচীতে তার অবস্থান হবে আভেলিয়াল্যাণ্ডের কয়েক ডিগ্রি পূর্বে, কুমেরুবৃত্তরেখায়। এই অবস্থায় নতুন উত্তরমেরুটি থেকে আরম্ভ হ'য়ে একটি নতুন শূন্য মধ্যরেখা আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিন, ফ্রান্সের পারী, সিসিলির পালের্মো, ত্রিপোলি উপকূলে গ্র্যাণ্ড সিজে উপসাগর, ডারফুরের ওবেদ, কিলিমানজরোর গিরিমালা, মাদাগাস্কার ভেদ ক'রে চ'লে যাবে : মধ্য-প্রশান্ত মহাসাগরের কেরগুয়েলেন দ্বীপ, নতুন কুমেরুবিন্দু, পারীর প্রতিপদ, কুক আইল্যাণ্ড, আইল্যাণ্ড অব্ কুয়াদ্রা, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার ভ্যাঙ্কুভারও তার দ্বারা স্পৃষ্ট হবে ; এবং আমেরিকার উত্তরাঞ্চল থেকে মেলভিল দ্বীপ পর্যন্ত এবং উত্তরমেরুর চতুস্পার্শ্বও সেই নবজাত মধ্যরেখাকে ছুঁয়ে থাকবে।

উদীচীতে বাফিন উপসাগর আর অবাচীতে আভেলিয়াল্যাণ্ডকে ছুঁয়ে এই যে নতুন মেরুরেখা ঘুরতে থাকবে, তা নতুন আরেকটি বিষুবরেখার জন্ম দেবে, যার উপর দিয়ে রোজ ঠিক একই ভাবে চ'লে যাবে সূর্য। খ-বিষুববৃত্তের রেখা কিলিমানজরোর ওয়ামাজাই ভেদ ক'রে, ভারত মহাসাগর, গোয়া ও চিকাকোলা, কলকাতা, মান্দালয়, টংকিং-এর কেনগো, হংকং, রিজা আইল্যাণ্ড, মার্শাল আইল্যাণ্ড, গ্যাস পার রিকো, প্রশান্ত মহাসাগরের ওয়াকার আইল্যাণ্ড, আর্জেন্টাইন প্রজাতন্ত্রের কোর্দিলেরাস, ব্রাজিলের রিয়ো ডি জানেরো, আট-লান্টিক মহাসাগরের ট্রিনিটি ও সেণ্ট হেলেনা দ্বীপ, কঙ্গোর সেণ্ট পল দ্য লোয়ান্দো হ'য়ে আবার কিলিমানজরোর পিছনে ওয়ামাজাইয়ে এসে মিলবে। নতুন মেরুরেখার উদ্ভবের ফলে এই-যে নতুন বিষুবরেখার জন্ম হবে, তা থেকে সমুদ্রের জোয়ার-ভাঁটায় পরিবর্তন নির্ণয় করা যাবে, আর বিশ্ববাসীদের নিরা-

banglabooks.in

পত্তার জন্য সেটা নির্ণয় করাই সবচেয়ে জরুরি। সেইসঙ্গে এটাও উল্লেখ করা উচিত যে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার পরিচালনসভা এই ধাক্কাটিকে যতদূর সম্ভব দুর্বল করার ব্যবস্থা করেছেন : কামানের মুখ যদি উত্তর দিকে ফেরানো থাকতো তাহ'লে সভ্য জগতে ধ্বংসের পরিমাণ আরো বৃহৎ হ'তো। অপর পক্ষে, কামানের মুখ দক্ষিণ দিকে ঘোরানো ব'লে আঘাত ও বিপর্যয়ের সব চিহ্ন জগতের এমন অংশে ফুটে উঠবে, যেখানে জনবসতি বিরল। অত্যন্ত যত্ন-সহকারে হিশেব ক'রে দেখা গেছে, যখন নতুন মেরুর কাছে ভূ-ত্বক চ্যাপ্টা ও সমতল হ'য়ে যাবে, তখন কেমন ক'রে কোন দিকে বিপুল জল উৎক্ষিপ্ত হবে। দুটি মহাবৃত্তে দ্বি-খণ্ডিত হবে তখন পৃথিবী, আর সেই বৃত্তদুটির চাপ কিলিমান-জরোয় খ-বিষুববৃত্তের মহাসমুদ্রের প্রতিপাদে সমকোণে পরস্পরকে ছেদ ক'রে যাবে। এবং তার ফলে চারটি ভাগে বিভক্ত হবে পৃথিবী—দুটি ভাগ উদীচিতে আর দুটি ভাগ অবাচীতে : যেখানে সামুদ্রিক উৎক্ষেপ আর জলস্তম্ভ মোটেই হবে না, সেইসব রেখা দ্বারাই বিচ্ছিন্ন হবে এরা।

উত্তর গোলার্ধে : কিলিমানজরোর পশ্চিম থেকে প্রথম ভাগটির সূচনা হবে ; তার মধ্যে থাকবে আফ্রিকার কঙ্গো থেকে মিশর, য়ুরোপের তুরস্ক থেকে গ্রীনল্যাণ্ড, আমেরিকার ব্রিটিশ কলম্বিয়া থেকে পেরু, ব্রেজিল থেকে একেবারে সান-সালভাদোর পর্যন্ত, আর থাকবে আটলান্টিক মহাসাগরের সমগ্র উত্তর ভাগ ও নাতিশীতোষ্ণ আটলান্টিক অঞ্চলের বৃহত্তম অংশ। দ্বিতীয় ভাগটি আরম্ভ হবে কিলিমানজরোর পূর্ব দিক থেকে, আর তার মধ্যে থাকবে য়ুরোপের অধি-কাংশ, কৃষ্ণসাগর থেকে এদিকে স্ক্যাইডেন অবধি, সমগ্র রুশদেশ, আরব, প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষ, পারস্য, বেলুচিস্তান, আফগানিস্তান, তুর্কিস্তান, মঙ্গোলিয়া, জাপান, কোরিয়া, কৃষ্ণসাগর, কাস্পিয়ান সাগর, প্রশান্ত মহাসাগরের অধি-কাংশ, উত্তর আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশ, এবং সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার অধীনস্থ সমস্ত সুমেরুবৃত্ত।

দক্ষিণ গোলার্ধে : তৃতীয় ভাগটি আরম্ভ হবে কিলিমানজরোর পূর্ব থেকে ; মাদাগাস্কার, ম্যারিঅন দ্বীপপুঞ্জ, কেরগুয়েলেন দ্বীপ, মরিস দ্বীপ, রি-ইউনিয়ন দ্বীপ, ভারত মহাসাগরের সমস্ত দ্বীপমালা, কুমেরু সাগর (একেবারে নতুন মেরু পর্যন্ত), মালাক্কা, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, বোর্নিয়ো, সোন্দে দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, নিউগিনি, নিউ ক্যালেডোনিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরের উত্তর অংশ ও সেখানকার অসংখ্য দ্বীপপুঞ্জ নিয়ে প্রায় ১৬০-তম মধ্যরেখা পর্যন্ত

banglabooks.in

ভূভাগ হবে তার অংশ। চতুর্থ ভাগটি সূচিত হবে কিলিমানজরোর পশ্চিম থেকে ; সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা, কঙ্গো থেকে মোজাম্বিক প্রণালী ও উত্তমাশা অন্তরীপ, দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের পেরনামবুকো থেকে শুরু হ'য়ে লিমা, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টাইন প্রজাতন্ত্র, পাতাগনিয়া, ফায়ার আইল্যাণ্ড, মালুইন দ্বীপপুঞ্জ, স্যাণ্ডউইচ ও শেটল্যাণ্ড দ্বীপ হ'য়ে একেবারে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত, এমনকি বর্তমান ১৬০ ডিগ্রি অক্ষরেখাও তার অন্তর্ভূক্ত হবে।

সমুদ্রতলের পরিবর্তনের ফলে শূন্য রেখা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এই চারটে ভাগেই বিভক্ত হবে পৃথিবী। এখন, সমুদ্রের স্থানচ্যুতির ফলে এই চার অংশেই কী প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে তা-ই সর্বোপরি বিবেচ্য। প্রত্যেকটি ভাগের একেবারে মাঝখানে—অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দুতে—প্রতিক্রিয়া হবে সবচেয়ে তীব্র ও প্রবল—হয় সমুদ্রের উৎক্ষেপ ও অবস্তল হবে তার মূল কারণ, আর নয়তো সব জল সেখান থেকে সরে যাবে। জে. টি. ম্যাস্টনের হিশেব অনুযায়ী তর্কাতীতভাবে জানা গেছে যে প্রত্যেকটি চূড়ান্ত বিন্দুতেই উৎক্ষেপের উচ্চতা হবে ৮,৪১৫ মিটার। কাজেই এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির এই প্রকল্পের ফলে এ-সব জায়গার নিরাপত্তাই সবচেয়ে বিঘ্নিত হবে। প্রতিক্রিয়াদুটি আলাদাভাবেও অনুভব করা যেতে পারে। উত্তর গোলার্ধে এবং দক্ষিণ গোলার্ধেও অবশ্যই, পরস্পরের মুখোমুখি যে-দুটি অংশ থাকবে সেখান থেকে সমুদ্র স'রে গিয়ে অপর দুটি অংশকে আক্রমণ ক'রে বসবে : দুই গোলার্ধই তারা পরস্পরের বিরোধী হ'য়ে উঠবে।

প্রথম অংশে : আটলান্টিক মহাসাগর প্রায় পুরোপুরিই নিরাশ্রয় হ'য়ে যাবে—যেখান থেকে জল সবচেয়ে স'রে যাবে, জলের গভীরতা সেখানে ৮,৪১৫ মিটারের কম হ'লে এমনকি ডাঙাসুদ্ধ বেরিয়ে আসবে—এবং সেই জায়গাটি বারমুডার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। তার ফলে য়ুরোপ ও আমেরিকায় জেগে উঠবে বিশাল ভূভাগ, ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন আর পর্তুগাল তা দাবি করতে পারবে—এবং সম্ভবত তারা দাবি জানাতে নিরুৎসুক হবে না। এখানে এই তথ্যটা উল্লেখ করা ভালো যে সমুদ্রের স্থানচ্যুতির ফলে বাতাসেরও স্থানচ্যুতি ঘটবে, তার ফলে য়ুরোপ ও আমেরিকার তাপমান যন্ত্রে বায়ুচাপের পরিমাণ এমন বদলে যাবে যে এক লীগ উঁচু জায়গায় যতখানি বায়ুচাপ, চূড়ান্ত কিছু থেকে বিশ-ত্রিশ ডিগ্রি দূরের

banglabooks.in

নগরগুলিতেও বায়ুচাপ সে রকম হ'য়ে যাবে। কতগুলি প্রধান নগরে অবশ্য বায়ুচাপের দিক থেকে বর্তমান স্বাভাবিক অবস্থাই বজায় থাকবে ; নগরগুলি একদিকে হ'লো : নিউ-ইয়র্ক, ফিলাডেলফিয়া, চার্লটন, পানামা, লিসবন, মাদ্রিদ্র, পারী, লণ্ডন, এডিনবরা, ডাবলিন, কায়রো, কনস্তান্তিনোপল, ডান্-ট্‌ৎজিগ, স্টকহোল্‌ম্‌ ; অপর দিকেও এই অক্ষরেখায় অবস্থিত নগরগুলির বায়ু-চাপগত কোনো পরিবর্তন হবে না। বারমুডায় বাতাসের চাপ এতটাই ক'মে যাবে যে মনে হবে যেন একদল বৈমানিক যেন ৮,০০০ মিটার উপরে উঠে এসেছেন, কাজেই সেখানে বাস করা অসাধ্য হ'য়ে উঠবে। ঠিক একই প্রতি-ক্রিয়া প্রাপ্তব্য বিপরীত অংশেও ; ভারত মহাসাগর, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহা-সাগর দ্বারা গঠিত এই অংশে, প্রশান্ত মহাসাগর অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ উপকূলে অংশত নিক্ষিপ্ত হবে। নিক্ষিপ্ত স্থানে বায়ু যে অত্যন্ত স্বচ্ছ হবে, তাতে কোনো সংশয় নেই, কিন্তু কিছুতেই ততখানি ঘন হবে না, যতটুকু মানুষের পক্ষে জরুরি। সমুদ্রের অল্পবিস্তর স্থানচ্যুতির ফলে দুই অংশেই যে পরিবর্তনের সূচনা হবে, তা অধিকাংশত এইরকম। জল যেহেতু সম্পূর্ণ অদৃশ্য হবে না, সেইজন্য এ-সব জায়গায় যে অসংখ্য নতুন দ্বীপ আর পাহাড় দেখা দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু বায়ুস্তরের হ্রাসপ্রাপ্তি যদি আবহ-মণ্ডলের উচ্চ স্তরে উন্নীত নব-জাগ্রত ভূভাগে যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি না করে, তাহ'লে যে-সমস্ত জায়গায় জলোৎক্ষেপ হবে, তাদের বেলায় কী হবে? আবহমাণ্ডলিক চাপের তলায় আমরা হয়তো সেই হ্রাসপ্রাপ্ত বায়ুচাপেই নিশ্বাস নিতে পারবো, পক্ষান্তরে কয়েক ইঞ্চি জলের তলায় আমরা কিছুতেই নিশ্বাস নিতে পারবো না। আর অন্য দুই ভাগও তখন এই অবস্থাতেই পড়বে। কিলিমানজরোর উত্তর-পশ্চিম দিক পরিবর্তনের কেন্দ্র হবে সাইবেরিয়ার ইয়াকুট্‌স্ক্‌। এখন যতখানি উন্নতি তা হ্রাস পাবে তার, কেননা ৮,৪১৫ মিটার জলের নিচে সে চ'লে যাবে ; আর তার তরল ভর ক্রমশ ক'মে নিরক্ষরেখার দিকে ছড়িয়ে পড়বে, যার ফলে ভারতবর্ষ, চীন, জাপান ও রাশিয়ার বৃহত্তর অংশ ও মার্কিন আলাস্কা বেরিং সাগরের তলায় চ'লে যাবে। মহাদুর্যোগের আগে যদি সবাই পালাতে না পারে তা'হলে একদিকে সেণ্টপিটার্সবুর্গ আর মস্কো এবং অন্যদিকে কলকাতা, ব্যাঙ্কক, সাইগন, পিকিং, হংকং আর ইয়োডো জলের এত তলায় চ'লে যাবে সবরুণা, হিন্দু, কোচিন চীনা, চৈনিক, নিগ্রনি আর শ্যামদেশীয়রা সবাই

banglabooks.in

ডুবে মরবে।

কিলিমানজরোর দক্ষিণ-পূর্ব দিকের ভূখণ্ডে প্রলয়ের পথ সমভাবে উন্মুক্ত হবে। এইদিককার বৃহত্তর অংশই আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর দ্বারা আবৃত ; আজোর দ্বীপপুঞ্জের কাছে জল ৮,৪১৫ মিটার উত্থিত হবে, এই কৃত্রিম মহাপ্লাবনে বিশাল ভূভাগটি সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যাবে—দক্ষিণ আফ্রিকার গিনি আর কিলিমানজরো থেকে উত্তমাশা অন্তরীপ, এবং দক্ষিণ আমেরিকার কাছে ত্রিভুজাকারে পেরু মধ্য-ব্রেজিল চিলি আর্জেণ্টাইন প্রজাতন্ত্র তেরা দেল ফুয়েগো আর কেপ হর্ন—পুরো অঞ্চলটাই জলে ঢেকে যাবে। এমনকি উঁচুতে থেকেও পাতাগনীয়রা এই সলিল-সমাধি থেকে নিষ্কৃতি পাবে না ; তারা যে অ্যাণ্ডিস গিরিমালায় আশ্রয় নেবে তারও কোনো জো নেই, কারণ সেখান থেকে তার উঁচু শিখর চোখেই পড়বে না।

গান-ক্লাবের এই উদ্যোগের পরিণাম তবে এই : ভূত্বকের সংকোচ-প্রসারে তৈরি হবে নতুন সমুদ্রশয্যা, আর যা ছিলো উঁচুতে তা চ'লে যাবে নিচে আর যা ছি ।। নিচে তা উন্নীত হবে শিখরে ; বার্বিকেন কোম্পানির এই পাপকার্যে বাধা না দিলে এই পরিণামটাই হবে পৃথিবীর, কিছুতেই যার হাত থেকে বিপন্ন বিশ্ববাসীর নিস্তার নেই।

১৬

এই বিজ্ঞপ্তির পরে আসন্ন বিপৎপাতের জন্য প্রতীক্ষা করা কিংবা নিরপেক্ষ রেখায় পালিয়ে বিপর্যয়কে এড়াবার চেষ্টা করা ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর রইলো না। ভীত ও বিপন্ন মানুষের মধ্যে মূলত দুটি দলের সৃষ্টি হ'লো : 'কেউ মরবে জলে ডুবে, কেউ বা শ্বাস-কষ্টে।' বহু পরস্পর-বিরোধী ধ্বনি উঠলো প্রথমে, যা শেষে উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে প্রবল ঘৃণা ও প্রতিবাদে রূপান্তরিত হ'লো। শ্বাস-কষ্টে যারা মরবে, তার মধ্যে পড়ে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, য়ুরোপের ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড আর স্পেন। সমুদ্রতল থেকে নতুন ভূখণ্ড জেগে উঠে তাদের রাজ্য বৃদ্ধি পাবে, এই লোভেও তারা শ্বাসকষ্টের ব্যাপারটা মেনে নিতে পারলে না। এখন পুরোনো মেরু থেকে যতটা দূরে আছে, পারী তখন নতুন মেরুর ঠিক ততটাই কাছে চলে যাবে—কিন্তু তাতে তার লাভ কিছুই হবে না। চির-বসন্তের দেশে পরিণত হবে সে, তা

banglabooks.in

ঠিক ; কিন্তু বাতাসের চাপও যথেষ্ট হ্রাস পাবে। আর এই ব্যাপারটা পারীর বাসিন্দাদের ঠিক মনঃপূত হ'লো না : হাওয়া তারা চায়, যথেষ্ট চায় ; আর এই ধ্বনিই উত্থিত হ'লো সব কাফিখানায় ও বুলভারে। আর সলিল-সমাধি যাদের অদৃষ্ট, তাদের মধ্যে রয়েছে দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ক্যানাডা, ভারতবর্ষ আর জীল্যাণ্ড। সবচেয়ে ঐশ্বর্যময় উপনিবেশগুলি হারিয়ে বসবে গ্রেট ব্রিটেন—বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির এই চেষ্টা সব যেন তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেবে। মেক্সিকো উপসাগর তখন বিপুল অ্যাণ্টিলেস রাজ্যে পরিণত হবে, মনরো-মতবাদ অনুযায়ী ইয়াঙ্কিরা আর মেক্সিকানরা উভয়েই যা দাবি করতে পারে। ফিলিপাইন আর সেলেবেস-এর চারপাশে জল স'রে গিয়ে যে বিপুল ভূখণ্ডের জন্ম দেবে, ইংরেজ ও স্পেনীয়রা তা দখল ক'রে বসবে। কিন্তু ক্ষতিপূরণ হিশেবে তা মোটেই যথেষ্ট ও তৃপ্তিকর নয়। মহাপ্লাবনের ফলে যে বিপুল ক্ষতি হবে, তার পরিমাণ এই সামান্য লাভের চেয়ে অনেক বেশি। যদি এই নতুন সিন্ধু-শয্যার জন্ম হ'লে শুধু আর্জেণ্টাইন ক্ষতিগ্রস্ত হ'তো ও ধ্বংস হ'তো তা'হলে হয়তো 'সভ্য জগৎ' এই বিপর্যয়কে হাসিমুখে মেনে নিতো। কিন্তু এই বিপর্যয় এতগুলি দেশকে এমনি ওলোট-পালোট ক'রে যাবে যে প্রতিবাদের ঝড় উঠলো।

আর য়ুরোপকে যেটা সবচেয়ে চিন্তিত করলো, সে হ'লো তার পূর্ব ও পশ্চিম ভূভাগ—মধ্যভাগ অটুট ও অক্ষুণ্ণ থাকলেও তার পশ্চিম দিক আকাশ ছোঁবে আর পূর্বদিক অতল তল ; একদিক মরবে শ্বাসকষ্টে, আর অন্যদিক জলে ডুবে। এটা খুব মনোহর প্রস্তাব নয়। ভূমধ্যসাগর একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে, আর ফরাশি, ইতালীয়, স্পেনীয়, গ্রীক, তুর্কী ও মিশরীয়দের কাছে তা মোটেই লোভনীয় ঠেকবে না, কারণ ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত ব'লে সমুদ্রভ্রমণে তর্কাতীত অধিকার রয়েছে তাদের। আর তা'ছাড়া সুয়েজ খালেরই কী প্রয়োজন থাকবে তখন—অথচ নিরপেক্ষ রেখায় অবস্থিত ব'লে তার কোনো পরিবর্তনই হবে না। লোহিত সাগর আর ভূমধ্যসাগর কোনোটাই তখন আর নেই, অন্তত স্বাভাবিক দূরত্বে নেই, লেসেপ্‌স্‌-এর মহৎ কর্মটিই বা তখন কোন কাজে লাগবে ? মেঘের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া গিরিশিখরে পরিণত হ'তে দেবে না। যদি হয়, তা'হলে তার মানোয়ারি জাহাজ কেমন ক'রে তার কাছে যাবে ? না, আটলাণ্টিক মহাসাগরের অতল থেকে উত্থিত সামান্য কিছু ভূভাগ নিয়েই সে সন্তুষ্ট হবে না। মেজর ডনেলান অবশ্য এর মধ্যেই য়ুরোপ ফিরে যাবার উদ্যোগ করলেন ; বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির চেষ্টা সফল হ'লে এই নতুন ভূখণ্ডের স্বত্বাধিকার যাতে পাওয়া যায়, সেইজন্য সচেষ্ট

banglabooks.in

হওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য। প্রতিবাদ উঠলো জগতের সর্বত্র—এমনকি ন্যূনতম পরিবর্তন যে-দেশে হবে, তারাও তাতে গলা মেলাতে ছাড়লো না।

কোনখান থেকে কামান দাগা হবে জাঞ্জিবার থেকে তার বার্তা আসবার পর তা যখন জানা গেলো, এবং যখন ওয়াশিংটন মানমন্দির তাদের জরুরি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে, তখন এই প্রতিবাদ প্রায় হিংস্র হ'য়ে উঠলো। প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল ও জে. টি. ম্যাস্টনকে মানব জাতির শত্রু ও নরাধম বলে ঘোষণা করা হ'লো। কিন্তু খবর-কাগজের ব্যবসা তাতে যে কী ফেঁপে উঠলো, তা আর বলার নয়। কী যে বিক্রি হ'লো কাগজগুলো, আর কত যে প্রচার বেড়ে গেলো তাদের ; কতবার যে তাদের অতিরিক্ত সংস্করণ ছাপতে হ'লো, তার আর ইয়ত্তা নেই। বোধহয় সমগ্র সংবাদপত্রের ইতিহাসে এই প্রথম সবগুলি কাগজ পারস্পরিক বিসংবাদ ভুলে ঐক্যবদ্ধ হ'লো। কেবলমাত্র য়ুরোপ বা আমেরিকার ব্যাপার নয় এটা : সমগ্র বিশ্বের স্বার্থ ও নিরাপত্তা এর সঙ্গে জড়িত। যেন কোনো বারুদের স্তূপে বোমা ফাটলো।

আর ম্যাস্টন ? মনে হ'লো তাঁর অন্তিম মুহূর্ত যেন সমাগত। ১৭ই সেপ্টেম্বর সন্ধেবেলায় এক বিরাট জনতা খ্যাপা কুকুরের মতো জেলখানার দিকে ধেয়ে এলো : বিচার না ক'রেই তাঁকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবে তারা : আর কারাধ্যক্ষও তাদের কোনো বাধা দেবার চেষ্টা করলেন না। করিডর দিয়ে ছুটে এলো তারা ভিতরে ; এসে দ্যাখে জে. টি. ম্যাস্টনের ঘরটি ফাঁকা প'ড়ে আছে। অজস্র স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এসেছিলেন এভাঞ্জেলিনা, আর তার ফলেই ম্যাস্টন পালাতে পারলেন। কারাধ্যক্ষ যে-পরিমাণ উৎকোচ গ্রহণ করলেন, তাতে কোনো কাজ না-ক'রেও তাঁর সারা জীবন হেসে-খেলে কেটে যাবে। এটা তাঁর মনে ছিলো যে বাল্টিমোর, ওয়াশিংটন নিউ-ইয়র্ক ও আমেরিকার আরো কতগুলি প্রধান নগরী ঊর্ধ্বোত্থিত হবে বটে, কিন্তু সেখানে শ্বাস-প্রশ্বাসের কোনো কষ্ট হবে না।

ক্ষিপ্ত জনতার কাছ থেকে নিরাপদ একটি নির্জন জায়গায় অবসর গ্রহণ করলেন ম্যাস্টন : অনুরক্ত নারীর সাহায্যে অবশেষে তাঁর মহান জীবন রক্ষা পেলো। আর মাত্র চার দিন বাকি। আর চার দিন পরেই বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির অতিকায় প্রচেষ্টা শেষ হ'য়ে যাবে। জরুরি ঘোষণাটি সমগ্র বিশ্বে এমন হুলুস্থুল তুলেছে যা এমনি-কোনো অতিকায় উদ্যোগ ছাড়া কিছুতেই হ'তো না। গোড়ার দিকে কোনো-কোনো ব্যক্তি ঈষৎ সন্দিগ্ধ হ'লেও এখন আর কোথাও সংশয়ের লেশমাত্র নেই। বিভিন্ন সরকার এর মধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন কোন-কোন জায়গা উন্নীত হবে—

banglabooks.in

আর কোন-কোন প্রদেশ—বলাই বাহুল্য সংখ্যায় তারা বিপুলতর—সলিল-সমাধি পাবে। পাঁচ মহাদেশেই গৃহত্যাগের এমন হিড়িক প'ড়ে গেলো, এতকাল যা এমন-কি স্বপ্নেও ভাবা যায়নি। এই বহুবর্ণ শোভাযাত্রায় সব রঙের মানুষ ছিলো: শাদা, কালো, পীত বা পীত-ধূসর। কিন্তু তবু সময় এত কম যে সকলের নিরাপত্তার সুযোগ নেই। বিপর্যয়ের ক-ঘণ্টা বাকি, তা সূক্ষ্ম হিশেব হ'য়ে গেলো। চৈনিকদের চীন, অস্টেলীয়দের অস্টেলিয়া ও সাইবেরীয়দের সাইবেরিয়া ত্যাগ করতে অন্তত কয়েকমাস লাগবে। কতগুলি ক্ষেত্রে কামান দাগার জায়গাটি জানার পর আতঙ্ক কিঞ্চিৎ হ্রাস পেলো, কারণ বিপদ তাদের তেমন স্পর্শ করবে না। কোনো-কোনো প্রদেশ—এমনকি কোনো-কোনো রাষ্ট্র—খানিকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। যে-সব অঞ্চলে প্রত্যক্ষত কোনো বিপর্যয় ঘটবে না, তারা কেবল এই প্রবল আন্দোলনের খানিকটা আন্দাজ করলে মাত্র। আর সর্বক্ষণ আলস্যাদ পিয়েদ্যো কেবল এই কথাই ভাব-ছিলেন: '২৭ সেণ্টিমিটার মাপের কামানের দশলক্ষ গুণ বড়ো মাপের কামান কেমন ক'রে বানাবেন বার্বিকেন? এই ম্যাস্টন লোকটার সঙ্গে দেখা হ'লে বেশ হ'তো—এ-ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। ব্যাপারটা এতই বৃহৎ ও এতই অসম্ভব, যে কিছুতেই ঠিক কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন ব'লে বোধ হচ্ছে না।'

কিন্তু সে যা-হয় হোক গে। চেষ্টাটা ব্যর্থ না-হ'লে যে পৃথিবীর কতগুলি অংশ মহাবিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পাবে না, তা সুনিশ্চিত। আহা! বার্বিকেনের পক্ষে যদি কোনোরকমে বিফল হওয়া সম্ভব হতো!

ওয়ামাজাই মধ্য-আফ্রিকার পূর্ব দিকে অবস্থিত—মস্ত হ্রদ অঞ্চলে, যেখানে ভিক্টো-রিয়া নিয়াঞ্জা আর টাঙ্গানাইকা প্রায় সমুদ্রের আকার নিয়েছে সেখানে জাঞ্জিবারের উপকূলভাগে তার অবস্থান। ইংরেজ জনস্টন, কাউণ্ট টেকেলি, আর জর্মান ডক্টর মেয়ার তার যে-অংশে গিয়েছিলেন, সেই অংশটাই সর্বাধিক পরিচিত। ত্রিশ-চল্লিশ হাজার কাফ্রি প্রজাকে নিয়ে সুলতান বালি-বালি এই পার্বত্য অঞ্চলে শাসনকার্য নির্বাহ করেন।

বিষুবরেখার তিন ডিগ্রি নিচে কিলিমানজরো গিরিমালার সর্বোচ্চ শিখর। একটি চূড়োর নাম কিবো শিখর, উচ্চতা ৫,৭০৪ মিটার। তার উত্তরে, দক্ষিণে ও

banglabooks.in

পশ্চিমে ওয়ামাজাইয়ের উর্বর, বিশাল প্রান্তর ভিক্টোরিয়া নিয়াঞ্জা হ্রদ থেকে শুরু ক'রে মোজাম্বিক প্রদেশ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, ফলে শাসনকার্যের দিক থেকে কিবো শিখরের রীতিমতো গুরুত্ব রয়েছে।

কিলিমানজরোর কয়েক লীগ নীচে কিসোঙ্গো ব'লে একটি ছোটো গ্রাম সুলতানের রাজধানী। রাজধানী অবশ্য কেবল নামেই, আসলে তা মস্ত একটি পল্লী মাত্র। গ্রামবাসীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও কর্মঠ : বালি-বালির লোহার শাসনে ক্রীতদাসেরা যেমন অত্যন্ত খাটে, তেমনি নিজের জন্যও মোটেই কম খাটে না।

মধ্য-আফ্রিকার যে-সব শাসক ইংল্যাণ্ডের আধিপত্য ও প্রভাব এড়াতে পেরেছিলেন, এই সুলতান তাঁদেরই মধ্যে অত্যন্ত স্মরণীয় ব'লে গণ্য হ'য়ে থাকেন। তাঁর এই রাজধানী কিসোঙ্গোতেই জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ছ-জন বিশ্বস্ত ও অনুগত সঙ্গী নিয়ে বার্বিকেন আর নিকল এসে উপস্থিত হন। তাঁরা যখন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়েন, তখন তাঁদের কথা জানতো মাত্র দু'জনে : এভাঞ্জেলিনা স্করবিট, আর জে. টি. ম্যাস্টন ; নিউ-ইয়র্ক থেকে উত্তমাশা অন্তরীপে যাবার জন্য একটি জাহাজে উঠেছিলেন তাঁরা, আর উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে আরেকটা জাহাজ তাঁদের নিয়ে এলো জাঞ্জিবার দ্বীপে। সেখানে সুলতান বালি-বালি তাঁদের জন্য গোপনে একটি বজরা ভাড়া ক'রে রেখেছিলেন, সেই বজরা তাঁদের খালের অন্য দিকে, আফ্রিকার সীমান্তে, মোম্বাসা বন্দরে নিয়ে এলো। তাঁদের নিয়ে যাবার জন্য সুলতান লোক পাঠিয়েছিলেন বন্দরে ; অবশেষে নানা উৎপাত ও পরিশ্রম সহ্য করে বনাকীর্ণ বিপজ্জনক রাস্তা ধ'রে একশো লীগ পথ অতিক্রম ক'রে তাঁরা সুলতানের কাছে পৌঁছুলেন। জে. টি. ম্যাস্টনের অঙ্কের ফল জানার সঙ্গে-সঙ্গেই একজন স্যুইড পর্যটকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন বার্বিকেন ; এই পর্যটকটি আফ্রিকার এই অঞ্চলে কয়েক বছর কাটিয়েছেন ব'লে বালি-বালির সঙ্গে যোগাযোগ করা তাঁর পক্ষে সহজ হবে। বার্বিকেনদের চাঁদে যাবার চেষ্টার কথা আফ্রিকার এই অঞ্চলেও পৌঁছেছিলো, আর সুলতানও বার্বিকেনদের অত্যন্ত অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছিলেন ; ফলে এই দুঃসাহসী ইয়াঙ্কিদের জন্য তাঁর মনে বন্ধুতার মনোভাবই ছিলো। কী জন্য চাচ্ছেন, সে কথা তাঁকে না-ব'লেই ইম্পে বার্বিকেন অতি সহজেই কিলিমানজরোর দক্ষিণ পাদদেশে তাঁদের জরুরি নিরীক্ষা চালাবার অনুমতি পেয়ে গেলেন। আর বালি-বালি পেলেন প্রায় ৩০০,০০০ ডলার ; শর্ত : প্রয়োজন-মতো মজুর জোগাতে হবে। এক কথায়, বার্বিকেন ও তাঁর সহযোগীগণ কিলিমানজরোয় যা খুশি তা-ই করার অধিকার পেয়ে গেলেন। ইচ্ছে করলে এমনকি তোপ দেগে এই

banglabooks.in

মস্ত পাহাড়কেও উড়িয়ে দিতে পারেন ; পছন্দ হ'লে তাকে টুকরো টুকরো ক'রে ছিঁড়ে ফেলতে পারেন, বা দরকার মনে হ'লে যদি পারেন তো তাকে স্কন্ধে বহন ক'রে নিয়ে যেতেও আপত্তি নেই। সুলতানের অভিপ্রায় অনুযায়ীই স্থির হয়েছিলো টাকার অঙ্ক ; কিন্তু তার ফলে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থা যেন মেরুদেশের মতো এই সংস্থা দেশেরও মালিক হ'য়ে গেলো। কিসোঙ্গোতে অত্যন্ত সাদর আপ্যায়ন পেলেন বার্বিকেনরা ; বালি-বালি তাঁদের প্রশংসায় এমনি পঞ্চমুখ হলেন যে তাকে প্রশংসা না ব'লে স্তব বলাই ভালো : কী দুঃসাহসী এঁরা, শেষকালে কিনা সুমেরুতে পৌঁছুবার জন্য এই মারাত্মক অভিযানে লিপ্ত হয়েছেন ; মেরুবিন্দুতে যাবার জন্য কিনা এসেছেন নিরক্ষরেখার এই ভীষণ অঞ্চলে !

তাঁর রাজ্যে এই যে রহস্যময় কাজ চলেছে, তার উদ্যোক্তাদের প্রতি তাঁর অসীম সহানুভূতি ছিলো। শুধু সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিই দিয়েছিলেন তা নয়, তিনি তাঁর প্রজারা যাতে একটি কথাও বাইরে ফাঁস না করে সেজন্যেও অঙ্গীকার করেছিলেন তিনি। তাঁদের কারখানায় যে সব কাফ্রি কাজ নিয়েছিলো তাদের কাউকেই একদিনের জন্যও বাইরে যেতে দেওয়া হ'তো না : কেউ যাবার চেষ্টা করলে তাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হ'তো। এইজন্যই পুরো কাজটা এমন গোপনে রহস্যময়ভাবে শেষ হয়েছে : য়ুরোপ-আমেরিকার ঝানু গোয়েন্দারা পর্যন্ত এই দুর্ভেদ্য যবনিকা ভেদ করতে পারেননি। খবরটা শেষকালে জানা গেছে, তার কারণ সমস্ত কাজ শেষ হ'য়ে যাবার পর সুলতান তাঁর আইনের কঠোরতা কথঞ্চিৎ হ্রাস করে-ছিলেন : আর বাচাল ও বিশ্বাসঘাতক তো এমনকি কাফ্রিদের মধ্যে পর্যন্ত আছে। সেইজন্যই জাঞ্জিবারের রাজদূত রিচার্ড ডবলিউ. ট্রাস্ট কিলিমানজরোয় কী হচ্ছে না হচ্ছে তার খানিকটা আঁচ পেয়েছিলেন। কিন্তু তখন, ঐ ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে বার্বিকেনকে তাঁর অভিপ্রায় থেকে বিচ্যুত করার আর সময় নেই।

কিন্তু এত জায়গা থাকতে হঠাৎ ওয়ামাজাইকেই বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানি মূল ঘাঁটি হিশেবে বেছে নিলেন কেন ? প্রথমত, ভৌগোলিক দিক থেকে এই জায়গাটা তাঁদের উদ্দেশ্যের সঙ্গে বেশ মানিয়ে গিয়েছিলো : আফ্রিকার সবচেয়ে দুর্গম অঞ্চল এটা, পর্যটকেরা পর্যন্ত সচরাচর এখানে আসেন না, তাছাড়া তাঁর কথাও বিশেষ জানা নেই কারো। তারপর কিলিমানজরোর বিপুল ভর তাঁদের শুধু দৃঢ়তাই দেয়নি, নানা উপাদানও সরবরাহ করেছিলো। আর সর্বোপরি এখানে তাঁর অত্যন্ত সহজেই যথেষ্ট কাঁচা মাল পেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করার কয়েক মাস আগেই সুইডেনের সেই পর্যটকের কাছ থেকে বার্বিকেন এটা জেনেছিলেন যে কিলিমান-

banglabooks.in

জরোয় যথেষ্ট কয়লা আর লোহা আছে—আর তার জন্য বেশি খোঁড়া-খুঁড়িরও দরকার হয় না। খুঁড়ে খনি বানাতে হবে না, ভূত্বকের হাজার ফুট নিচে খোঁজাখুঁজি করতে হবে না, এই বিপুল কাজের পক্ষেও লোহা আর কয়লা এত প্রচুর প'ড়ে আছে যে কেবল নিচু হ'য়ে কুড়িয়ে নেয়ার অপেক্ষা। অর্থাৎ এই পাহাড়ের চারপাশে সোরা আর লোহামাক্ষিকের বিপুল প্রান্তর ছড়িয়ে আছে, আর মেলিমেলোনাইট তৈরি করতে গেলে এই দুই বস্তুই সবচেয়ে জরুরি। অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও অনুগত ব'লে নিশ্চিত করে জানেন এমনি মাত্র দশজন সঙ্গী নিয়ে গিয়েছিলেন বার্বিকেন আর নিকল। বালি-বালি যে দশ হাজার কাফ্রি শ্রমিক দেবেন, এই দশজনকে তাদের তত্ত্বাবধান করতে হবে : আর এরাই নির্মাণ করবে এই দৈত্যের মতো কামান আর দৈত্যের মতো গোলক। বার্বিকেন ও তাঁর সহযোগীরাও মাজাই-এ পৌঁছবার দু' সপ্তাহ পরেই কিলিমানজরোর দক্ষিণ পাদদেশে তিনটি মস্ত কারখানা তৈরি হ'লো ; একটিতে বানানো হবে অতিকায় কামানটি, দ্বিতীয়টিতে তার বিপুলাকার প্রাস, আর তৃতীয়টিতে মেলিমেলোনাইট নামক বিস্ফোরক।

এই বৃহৎ মাত্রার কামান নির্মাণ করার সমস্যাটির সমাধান কেমন ক'রে করেছিলেন ? আমরা দেখতে পাবো—সেইসঙ্গে এটাও বুঝবো—যে, এ-রকম কোনো যন্ত্র নির্মাণ করার অসুবিধে বিশ্ববাসীর ঠিক বোধগম্য হয় না। ২৭ সেন্টিমিটার মাপের দশলক্ষ গুণ বড়ো কোনো কামান কেবল অতিমানুষেরাই বানাতে পারে। ২৭৪ কিলোগ্রাম বারুদ দিয়ে ৭৮০ কিলোর প্রাস নিক্ষেপ করা যায়, ৪২ সেন্টিমিটার মাপের এ-রকম একটি কামান বানাতে হিম-শিম খেয়ে যেতে হয়।

বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানি কিন্তু এই সমস্ত অসুবিধেকে কোন আমলই দিলেন না। কামান বানাবারই চেষ্টা করলেন না তাঁরা আদৌ, বরং কিলোমানজরোর নিরেট পাথরে শুধু মস্ত একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করলেন—বলা যায়, তৈরি করলেন তীরের মতো একটা খনি।

এই দীর্ঘায়ত সুড়ঙ্গটি যে ধাতুনির্মিত কামানের স্থান নিতে পারে তা তো স্পষ্ট। অথচ কামানের মতো এটা দুর্মূল্য ও জটিল নয়, তাছাড়া বিস্ফোরণ এড়াবার জন্য তার বেধ বিপুল বা অনড় করারও দায় নেই। চিরকালই এমনি একটি কামান বানাবার পরিকল্পনা ছিলো গান-ক্লাবের, যদিও আদৌ এটাকে কামান বলা যাবে না ; জে. টি. ম্যাস্টনের নোটবইতে কামানের উল্লেখ ছিলো এইজন্যেই যে, ২৭ সেন্টিমিটার মাপের একটি কামানকে তিনি হিশেবের ভিত্তি বলে ধরেছিলেন। সেইজন্যই পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ঢাল-এ একটা জায়গা বাছা হ'লো, কিলি-

banglabooks.in

মানজরোর নিরেট পাথর থেকে প্রাসটি যখন সবেগে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হবে, তখন কোনো বাধাই পড়বে না তার পথে। কিন্তু এই সুড়ঙ্গ বানাতে গেলে যেমন অত্যন্ত নির্ভুল হ'তে হবে, তেমনি আবার কঠিন পরিশ্রমকেও মেনে নিতে হবে। পাহাড়ের প্রবল জলপ্রপাতগুলি কাজে খাটিয়ে বার্বিকেনেরা সংনমিত বাতাসের সৃষ্টি করে-ছিলেন, আর তারই সাহায্যে সরল ও সাধারণ যন্ত্রের দ্বারাই সহজে কিছু করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হ'লো। আর চোখা যন্ত্র দিয়ে যে গর্তগুলি করা হ'লো সেগুলি হ'লো মেলিমেলোনাইটের আধার। আর এই কঠিন পাথরকে বিকম্পিত করার জন্য এই ভীষণ বিস্ফোরকের চেয়ে জরুরি আর-কিছুই ছিলো না। বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির পরিচালনায় দশজন তত্ত্বাবধায়কের সাহায্যে হাজার-হাজার মজুর অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে কাজটি শেষ করার জন্য উঠে পড়ে লাগলো। ছয়মাস পরে সেই খনির বা সুড়ঙ্গের ব্যাস হ'লো ২৭ মিটার, আর আস্তরের বেধ হ'লো ৬ মিটার। অত্যন্ত মসৃণ না-হলে প্রাসটি এই গহ্বর থেকে যথোচিতভাবে বেরোতে পারবে না ব'লে ভিতরটা মসৃণ করা দরকার, সেইজন্যই ঠিক সেই মাপের একটি ছাঁচ তৈরি করা হ'লো। চন্দ্রনগরে সেই বিখ্যাত কামানটি যেমন ক'রে বানানো হয়েছিলো যা থেকে চাঁদের উদ্দেশে প্রাস উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলো, এই ছাঁচটিও তেমনি ক'রে ঢালাই করা হ'লো। কিন্তু বর্তমান বিশ্বে যে-সব যন্ত্রবিদ রয়েছেন, তাঁদের কাছে আস্ত ব্যাপারটাই অসম্ভব ব'লে বোধ হবে। সুড়ঙ্গ নির্মাণ যেই শেষ হ'য়ে গেলো অমনি মজুরেরা দ্বিতীয় কারখানায় কাজ শুরু করে দিলে।

ধাতুর ছাঁচটি যখন তৈরি হচ্ছে, প্রাসটির কাজটিও তখনি শুরু হ'লো। তার জন্য ৮০,০০০,০০০ কিলোগ্রাম বা ১৮০,০০০ টনের একটি নলাকার ভর। কখনোই এই প্রাসটিকে গলিয়ে একটিমাত্র ধাতুপিণ্ডে পরিণত করার পরিকল্পনা তাঁদের ছিলো না, এটা মনে রাখতে হবে। হাজার টন ওজনের একশো আটাশটা ধাতু-পিণ্ড নির্মাণ করতে হবে, তারপর একটার পর একটা নলাকার ধাতুপিণ্ড নামানো হবে সেই সুড়ঙ্গে, মেলিমেলোনাইট যার তলায় সঞ্চয় ক'রে রাখা। একটার সঙ্গে আরেকটা জুড়ে দিয়ে আস্ত একখানি পুরো মাপের জিনিশে পরিণত হবে পিণ্ড-গুলি, যা সেই নলাকার ছাঁচে খাপে-খাপে মিলে যাবে। কিন্তু ধাতু গলাবার জন্য অতিকায় চুল্লি নির্মাণ করতে গিয়েই সবচেয়ে বেগ পেতে হ'লো। শেষকালে, একমাস পরে, দশ মিটার উঁচু দশটা চুল্লি একেকটা রোজ ১৮০ টন করে গলমান ধাতু উৎপাদন করতে লাগলো—অর্থাৎ দিনে একটানা কাজের পর ১০০,০০০ টন পাওয়া যেতে লাগলো।

banglabooks.in

মেলিমেলোনাইট বানাবার জন্য যে তৃতীয় কারখানাটি বসানো হ'লো, অত্যন্ত সহজেই তার কাজ চলতে লাগলো, কিন্তু তার জন্য এমন গোপনীয়তা আর সতর্কতা অবলম্বন করা হ'লো যার ফলে এই বিস্ফোরকের সংযুক্তি ঠিকমতো বলা গেলো না। সব কাজ অত্যন্ত চমৎকারভাবে চলতে লাগলো। এর চেয়ে বেশি সাফল্য কোনো কারখানাতেই পাওয়া যায় না। তিনশো হাজার ফ্রাংকের কোনো কোনো কাজে দুর্ঘটনাকে এড়াবার প্রত্যাশা কেউ করতে পারে না। সুলতান যে অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়েছিলেন তা সহজেই বোঝা যায়। অক্লান্ত আগ্রহে তিনি তাঁদের অগ্রগতি লক্ষ করতে লাগলেন। আর স্বয়ং সুলতান হাজির থাকেন ব'লে কাফ্রিরাও প্রাণপণে খাটতে লাগলো। একদিন বালি-বালি তাঁদের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। বার্বিকেন তক্ষুনি তাঁকে জানিয়ে দিলেন : এই কাজের ফলে আস্ত পৃথিবীটা এমন বদলে যাবে যে প্রাচ্যদেশের সবচেয়ে বড়ো সুলতান তা থেকে বিপুল মহিমা লাভ করবেন।

২৯ শে অগস্টের মধ্যেই সব কাজ শেষ হ'য়ে গেলো। যত বড়ো সুড়ঙ্গ দরকার, তা নির্মিত হয়েছে ; ছয় মিটার ব্যাসের মসৃণ ছাঁচ বসানো হয়েছে তাতে ; তারপর তার তলায় রাখা হয়েছে ২০০০ টন মেলিমেলোনাইট ; তারপর বসানো হয়েছে ১০৫ মিটার লম্বা প্রাস। বিস্ফোরক আর প্রাস মিলে যতখানি জায়গা জুড়ে থাকবে তার পরেও কামানের মুখ পর্যন্ত ৪৯২ মিটার ফাঁক থেকে যাবে ; গ্যাস-বৃদ্ধির ফলে যে-ধাক্কার সৃষ্টি হবে, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই এই ফাঁকা জায়গাটুকু দরকার।

এখন, প্রথম প্রশ্ন হ'লো, জে. টি. ম্যাস্টন নানা হিশেব ক'রে প্রাসটির জন্য যে কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, প্রাসটি কি সেই পথ থেকে স'রে যাবে ? কোনো-মতেই নয়, কেননা তাঁর হিশেব সম্পূর্ণ নির্ভুল। পৃথিবীর আহ্নিক অয়নের ফলে কিলিমানজরোর মধ্যরেখার কতটুকু পূর্বদিকে প্রাসটি স'রে যাবে এটাও ম্যাস্টন হিশেব করে জেনেছিলেন। আর প্রাথমিক বেগের প্রচণ্ডতার জন্য সেই বাঁকার আকৃতিও কেমন হবে, তাও তাঁর অঙ্কের ফলে জানা গিয়েছিলো। দ্বিতীয়ত সেটা যখন ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হবে, তখন সেই ধাবমান প্রাসটিকে কি দেখা যাবে ? না, কারণ সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে গিয়েই প্রাসটি পৃথিবীর ছায়ায় হারিয়ে যাবে, তাকে আর দেখাই যাবে না, কারণ তার নিচু কক্ষপথের জন্য পৃথিবীর কক্ষের সঙ্গে সূক্ষ্ম কোণ রচনা ক'রে তা বেগে বেরিয়ে যাবে। বস্তুত বার্বিকেন আর নিকল তাঁদের কাজের জন্য গর্ব করতে পারেন, কারণ প্রত্যেকটি অনুপঙ্ক্ষেই তাঁরা সফল হয়েছেন।

banglabooks.in

জে. টি. ম্যাস্টনেরই হিশেব অনুযায়ী সমস্ত কাজ হ'লো অথচ এই বৃহৎ কাজটি দেখবার জন্য তিনিই এখানে এলেন না, এটা কেন হ'লো ? যখন এই ভীষণ কামান-গর্জন এমনকি আফ্রিকার সুদূরতম দিগন্তেও ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হবে, তখন এমন কী আছে যা তাঁকে অনেক দূরে আটকে রেখে দেবে ?

তাঁর কথা ভাবতে গিয়ে তাঁর দুই বন্ধু এই কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারলেন না যে জেলখানা থেকে নিস্তার পাবার পর ক্ষিপ্ত মানুষের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য ম্যাস্টন বালিস্টিক কটেজ ছেড়ে অন্য একটি নিরাপদ স্থানে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছেন। এটা তাঁরা ভাবতেই পারলেন না যে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার যন্ত্রবিদদের প্রতি কী বিপুল ঘৃণা জন্মেছে মানুষের মনে। এটাও তাঁরা জানতে পারলেন না যে তখন তাঁদের হাতে পেলে লোকে তাঁদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারতো, নয়তো নির্যাতন করেই মেরে ফেলতো। কামান যখন গর্জন ক'রে উঠবে তখন তাঁদের অভিনন্দন জানাবার জন্য পূর্ব-আফ্রিকার কাফ্রিরাই যে কেবল থাকবে, এইজন্য সত্যি তাঁদের আনন্দিত হওয়া উচিত। বাইশে সেপ্টেম্বর তাঁরা সেই অদ্ভুত কামানের সামনে এসে যখন দাঁড়ালেন, নিকল বললেন, 'তাহ'লে এতদিনে !' 'হ্যাঁ, এতদিনে।' বললেন ইম্পে বার্বিকেন। 'আশ্চর্য, মেলিমেলোনাইট যে শেষ পর্যন্ত এই সুযোগ পেলো, এ-কথা ভাবতেও ভালো লাগছে !' বললেন ক্যাপ্টেন নিকল। 'তার জন্য, নিকল, পৃথিবীর সবচেয়ে নামজাদা লোক ব'লে তুমি গণ্য হবে।' 'তাতে কোনো সন্দেহ নেই, বার্বিকেন,' বিনীতভাবে বললেন ক্যাপ্টেন নিকল। 'জানো, চাঁদে গোলা পাঠাবার সময় তুলোর যে বারুদ আমরা ব্যবহার করেছিলুম, তার জন্য কিলিমানজরোর মধ্যে বড়ো সুড়ঙ্গ বানাতে হ'তো ?'

'কত বড়ো, নিকল ?'

'এ-রকম একশো আশিটা সুড়ঙ্গ লাগতো, বার্বিকেন।'

'তা আমরা তা খুঁড়ে ফেলতুম, ক্যাপ্টেন।

'১৮০,০০০ টন ওজনের ১৮০টা প্রাস লাগতো তখন।'

'তাও আমরা গালিয়ে নিতুম, নিকল।'

তাঁদের কথাবার্তার মধ্যে কাণ্ডজ্ঞানের ছাপ থাকবে, এটা আশা করাই ভুল। কিন্তু চাঁদের চারপাশ থেকে ঘুরে আসার পর অসম্ভব বলে তাঁদের অভিধানে আর কি কিছু আছে ? সেইদিন সন্ধেবেলায় কামান দাগার কয়েক ঘণ্টা আগে যখন বার্বিকেন আর নিকল নিজেদের সাফল্যে ডগমগ হ'য়ে পরস্পরকে অভিনন্দন জানাতে ব্যস্ত, আলস্যাদ পিয়েদের্ণা তখন বাল্টিমোরে তাঁর বন্ধ স্টুডিয়োর মধ্যে হঠাৎ

banglabooks.in

পাগলের মতো উল্লাসধ্বনি করে উঠলেন। তাঁর সামনে টেবিলের উপর রাশীকৃত কাগজে নানা চিত্র, নক্‌শা আর অঙ্ক ছড়ানো রয়েছে। হঠাৎ টেবিল ছেড়ে উঠে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন : 'ঈশ! ম্যাস্টনটা কী উজবুক! ডাহা মূর্খ লোকটা! তার পুরো পরিকল্পনাই বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাবে! হায় ক্রিস্টোফার কলম্বাস। আগে কেন আমার চোখে পড়েনি ব্যাপারটা? যদি জানতুম সে কোথায় আছে, তাহ'লে নৈশভোজে তাকে নিমন্ত্রণ করতুম; আর যখন তারা কামান দাগতো, শ্যাম্পেনের গেলাশে চুমুক দিতুম তখন!'

আরো নানা খেদ ও বিস্ময়সূচক মন্তব্য করতে করতে তিনি বললেন,—এমন মন্তব্য তিনি হুয়িস্ট খেলার সময় প্রায়ই ক'রে থাকেন—'আহা, উজবুক, উজবুক একটা! এই কিলিমানজরোর ব্যাপারটায় অঙ্ক করার সময় তার মগজে নির্ঘাৎ পোকা ঢুকেছিলো—কিংবা হয়তো হঠাৎ বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছিলো তার। একটু পরেই সে টের পাবে সব—বুঝবে যে আবার তাকে হিশেব নিয়ে বসতে হবে। ওঃ, কামানটা নিয়ে কী বোকামিই না করলে লোকটা!'

১৮

১০০০ সালের ১লা জানুয়ারিকে একদা লোকে যেমন অলুক্ষুণে ও অমঙ্গুলে ব'লে মনে করেছিলো, তেমনি আরেকটি অবিস্মরণীয় অশুভ সায়াহ্নকাল : হ্যাঁ, আজই সেই বাইশে সেপ্টেম্বর, সন্ধেবেলা। সূর্য কিলিমানজরোর মধ্যরেখা অতিক্রম করার ঠিক বারো ঘণ্টা পর, অর্থাৎ ঠিক মধ্যরাতে, ক্যাপ্টেন নিকল সেই ভয়ংকর কামান দাগবেন।

কিলিমানজরো যেহেতু পারীর মধ্যরেখার ৩৫ ডিগ্রি পূর্বে আর বাল্টিমোর ৭৯ ডিগ্রি, সেইজন্য এই দুই জায়গার ব্যবধান আসলে ১১৪ ডিগ্রি, কিংবা সময়ের দিক থেকে ৪৫৬ মিনিট বা ৭ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট। অর্থাৎ ঠিক যখন কামান গর্জন ক'রে উঠবে, তখন মেরিল্যাণ্ডের এই নগরীতে ৫টা বেজে ২৪ মিনিট। আবহাওয়া চমৎকার। এইমাত্র স্বচ্ছ দিগন্তরে ওয়ামাজাইয়ের সমভূমিতে সূর্য ডুবে গেলো। এর চেয়ে সুন্দর রাত্রি আর হ'তে পারে না; অসংখ্য তারা ফুটেছে আকাশে, সব শান্ত ও স্নিগ্ধ : শূন্যে প্রাস উৎক্ষেপ করার পক্ষে এই রাত্রিই সর্বোত্তম। মেলিমেলোনাইটের বিদারণের ফলে যে কৃত্রিম বাষ্পের সৃষ্টি হবে, তার সঙ্গে মেঘ

banglabooks.in

মিশে যাবে না, আকাশ এমনি পরিষ্কার।

এই প্রাসের ভিতরে আশ্রয় নিতে পারলেন না ব'লে বার্বিকেন আর নিকলের মনে কোনো পরিতাপ হচ্ছিলো কি না কে জানে। প্রথম মুহূর্তেই তাঁরা ২,৮০০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম ক'রে যেতেন। সুলতান বালি-বালি ও তাঁর রাজসভার প্রধানেরা—অর্থাৎ অর্থসচিব ও প্রধান বাস্তুকার—সেই কালো বাহিনী-সমেত (এই বিপুল কাজে সবচেয়ে সাহায্য তো এরাই করেছে) কামান দাগা দেখবার জন্য এসে হাজির হয়েছেন। কিন্তু, সাবধানের মার নেই ব'লে, কিলিমানজরোর সেই সুড়ঙ্গ থেকে তিন মাইল দূরে এসে দাঁড়িয়েছে সবাই, যাতে বাতাসের আলোড়নের ফলে তাদের কোনো চোট না-লাগে। এই আশ্চর্য দৃশ্য দেখার জন্য কিসোঙ্গো ও তার দক্ষিণের প্রতিবেশী প্রদেশগুলি থেকে কয়েক হাজার আদিবাসী এসে দাঁড়িয়েছে সুলতানের আদেশে। খনি থেকে একটা তার বের ক'রে একটা বৈদ্যুতিক ব্যাটারির সঙ্গে জুড়ে দেয়া হয়েছে, যাতে মুহূর্তমধ্যে তড়িৎ সঞ্চালন ক'রে মেলিমেলোনাইট চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলা যায়। আর এই উপলক্ষের সঙ্গে মানিয়ে সুলতান তাঁর মার্কিনি অতিথিদের আপ্যায়ন করার জন্য তাঁর টেবিলে একটা ছোট্ট ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানিয়েছেন: অত্যন্ত তৃপ্তিকর ভূরিভোজের ব্যবস্থা করেছেন তিনি, এবং এই ভোজসভার সমস্ত ব্যয়ভারও তিনিই বহন করেছেন, আর যতকাল বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির সভ্যগণ তাঁর রাজকোষে অর্থ জুগিয়ে যাচ্ছেন, ততক্ষণ তাঁর আড়ম্বর পরিমাণ কমানোর কোনোই মানে হয় না!

ভোজসভা শুরু হয়েছিলো সাড়ে-সাতটায়; যখন শেষ হ'লো তখন এগারোটা বাজে। অবশেষে সুলতান স্বয়ং সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার যন্ত্রবিদ ও বিরাট প্রচেষ্টার সাফল্য কামনা ক'রে স্বাস্থ্য-পানের প্রস্তাব করলেন। আর তো একটি মাত্র ঘণ্টা কেবল, তারপরেই পৃথিবীর ভূগোলবিদ্যা ও আবহমণ্ডল আদ্যোপান্ত পরিবর্তিত হ'য়ে যাবে।

প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল ও তাঁদের সহযোগী দশজন কামানের পাশে—যেখান দিয়ে বৈদ্যুতিক তারটি গেছে—গিয়ে দাঁড়ালেন। বার্বিকেনের হাতে ক্রনোমিটার, মিনিট গুনছেন তিনি, আর তাঁর মনে হ'লো জীবনে কোনোদিনই মিনিটগুলি যে আসলে এত দীর্ঘস্থায়ী তা তিনি বোধ করেননি। একেকটা মিনিট তো একেকটা বছর নয়, যেন একেকটা শতাব্দী! মধ্যরাত্রির দশ মিনিট আগে নিকল আর বার্বিকেন চাবিটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন, এই চাবি দিয়েই খনির সঙ্গে বৈদ্যুতিক তারের সংযোগ করা হবে। সপারিষদ সুলতান এবং স্থানীয় অধি-

banglabooks.in

বাসীরা কামানের চারদিক ঘিরে মস্ত একটা বৃত্তের মতো দাঁড়িয়ে পড়লো। জে. টি. ম্যাস্টন নানা অঙ্ক ক'ষে যে সময়টা নির্দেশ করেছেন, কামানটাকে ঠিক তখনই দাগতে হবে ; অত্যন্ত জরুরি এটা ; অর্থাৎ, সূর্য যে-মুহূর্তে খ-বিষুবরেখাকে ছেদ করবে, তখনই কামানটা যেন গর্জন ক'রে ওঠে ; তাহ'লে আর পুরোনো কক্ষ-পথে সে ফিরে আসতে পারবে না। বারোটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি—আর মাত্র চার মিনিট—তিন মিনিট—দু-মিনিট—আর মাত্র এক মিনিট বাকি বারোটার—

একজন সহযোগী একটি জ্বলন্ত লণ্ঠন ধ'রে আছে, আর প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন অসীম আগ্রহে ক্রনোমিটারের কাঁটা লক্ষ করছেন, আর ক্যাপ্টন নিকলের হাত বোতাম ছুঁয়ে আছে, চাপ দেবার সঙ্গে-সঙ্গে, মুহূর্তে, তড়িৎ-প্রবাহ খেলে যাবে তারে।

কুড়ি সেকেণ্ড বাকি—দশ সেকেণ্ড—পাঁচ সেকেণ্ড—এক সেকেণ্ড। উদাসীন নিকলের হাত একটুও কাঁপছে না। চাঁদে যাবার জন্ত কামানের গোলায় উঠে ব'সে যখন উৎক্ষেপের প্রতীক্ষা করছিলেন, তখন যেমন তাঁর ও বার্বিকেনের মধ্যে কোনো উত্তেজনা ছিলো না, এখনো তেমনি।

'দাগো কামান', প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন আদেশ দিলেন।

সেই মুহূর্তেই বোতামে চাপ দিলেন ক্যাপ্টেন নিকল। কানফাটা গর্জন শোনা গেলো পরক্ষণে, ভয়ংকর একটি গর্জন, যার প্রতিধ্বনি ওয়ামাজাইয়ের দূরতম প্রদেশ-কেও কাঁপিয়ে দিলে। তীব্র একটা হিশ্‌হিশ্‌ শব্দ ছিটকে চ'লে গেলো মুহূর্তে, প্রবল আলোড়ন উত্থিত হ'লো উনপঞ্চাশ পবনে : মুহূর্তমধ্যে ২,০০০ টন মেলিমেলোনাইট বিদীর্ণ হ'য়ে যাওয়ায় মিলিয়ার্ড-মিলিয়ার্ড গ্যাস সৃষ্টি হ'য়ে গেলো। যেন এমন-একটি উল্কা পৃথিবী থেকে ছিটকে ছুটে গেলো, প্রকৃতির সমস্ত শক্তি যাতে সংহত হ'য়ে আছে। আকাশের সমস্ত বজ্র আর পৃথিবীর সব কামান যদি একসঙ্গে গর্জন ক'রে উঠতো, তাহ'লে তার প্রতিক্রিয়াও এর চেয়ে ভয়াবহ হ'তে পারতো না। আতঙ্কে ও ভয়ে মুহ্যমান হ'য়ে প্রতীক্ষা করছিলো সারা জগৎ—যেমন রাজধানী, তেমনি ছোটো-বড়ো নগরী—সর্বত্রই এক শ্বাসরোধী প্রতীক্ষা। সংবাদপত্রগুলির সৌজন্তে প্রত্যেকেই এটা জানতো ঠিক কোন সময়ে কিলিমানজরোয় কামান দাগা হবে ; কিলিমানজরোর অবস্থিতি ৩৫ ডিগ্রি পূর্ব-দ্রাঘিমায়—দেশান্তরের ব্যবধানে সময়ের যে-তফাৎ ঘটে, তাও হিশেব ক'রে স্থানীয় সময় জানিয়ে দেয়া হয়েছিলো কাগজ-গুলিতে। সূর্য চার মিনিটে এক ডিগ্রি যায় ব'লে, কিলিমানজরোতে যখন রাত

banglabooks.in

বারোটা, তখন কতগুলি প্রধান নগরীর সময় দাঁড়ায় এইরকম :

পারীতে তখন রাত নটা বেজে চল্লিশ ;

সেণ্টপিটার্সবুর্গে রাত এগারোটা একত্রিশ ;

লণ্ডনে রাত সাড়ে ন-টা ;

রোমে রাত দশটা কুড়ি ;

মাদ্রিদে রাত ন'টা পনেরো ;

বের্লিনে রাত্রি এগারোটা কুড়ি ;

কনস্তান্তিনোপলে রাত্রি এগারোটা ছাব্বিশ ;

কলকাতায় ভোর তিনটে বেজে চার মিনিট ;

নানকিঙ-এ সকাল পাঁচটা পাঁচ ; আর

সূর্য কিলিমানজরোর মধ্যরেখা পেরিয়ে যাওয়ার বারো ঘণ্টা পরে বাল্টিমোরে বাজে বিকেল পাঁচটা চব্বিশ। কি প্রবল যন্ত্রণায় এই মুহূর্তে লোকেরা ছটফট করছে, তা বর্ণনা করা অসম্ভব। আধুনিক লেখকদের মধ্যে যাঁদের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি, তাঁরা পর্যন্ত এ-ক্ষেত্রে অসহায় বোধ করছেন। আতঙ্কে থরথর ক'রে কাঁপছে বাল্টিমোরের লোকেরা : তাদের ভয়, যে-বিপুল জলস্তম্ভ উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে এই নগরীর উপর পড়বে, তাতে তারা পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে একেবারে মুছে যাবে। তারা ভাবছিলো, চেসাপীকে উপসাগর বুঝি মুহূর্তে নিজেকে তাদের উপর নিঃশেষ ক'রে দেবে। আর যদি জলস্তম্ভ নগরীকে আক্রমণ না-ও করে, কামান দাগার ফলে যে প্রচণ্ড ধাক্কার সৃষ্টি হবে, তাতে আস্ত বাল্টিমোরই তো তাসের বাড়ির মতো কেঁপে উঠবে। ভেঙে পড়বে স্মৃতিস্তম্ভ ও মিনার, মাটি হাঁ ক'রে গিলে ফেলবে নগরীর বাড়ি-ঘর, আর সব মুহূর্তে টুকরো-টুকরো হ'য়ে ধ্বংসে প'ড়ে যাবে। এই ভয় যে শুধু বাল্টিমোরের তা নয়, সমুদ্রের উৎক্ষেপ থেকে জগতের যে-সব দেশের ভয় ছিলো না, এই ভয়েই তারা আধমরা হ'য়ে গেলো। প্রত্যেকটি মানুষ এই ভীষণ মুহূর্তে অনুভব করলে, হঠাৎ যেন অস্থিমজ্জা কাঁটা দিয়ে উঠলো, আর শিহরণ খেলে গেলো সর্বাঙ্গে।

হ্যাঁ, কেঁপে উঠলো প্রত্যেকেই ; প্রত্যেকেই, কেবল একজন বাদে ; আর সেই ব্যক্তিটি হলেন আলস্যাদ পিয়েরের্দ্যো—যন্ত্রবিদ। যেহেতু তাঁর আবিষ্কারের ফল তখন আর পৃথিবীকে জানাবার সময় ছিলো না—কারণ একেবারে শেষ মুহূর্তেই তিনি আবিষ্কারটি করেছেন। তিনি শহরের একটা বিখ্যাত কাফেতে ব'সে বোতলের পর বোতল শ্যাম্পেন পান করলেন, আর বিশ্বের স্বাস্থ্য কামনাও করলেন সেইসঙ্গে।

banglabooks.in

যেই পাঁচটা বেজে চব্বিশ মিনিট হ'লো, অর্থাৎ কিলিমানজরোয় যেই মধ্যরাত নেমে এলো—

বাল্টিমোরে কিন্তু কিছুই হ'লো না, কিছুই না।

লণ্ডন, পারী, কনস্তান্তিনোপল, বের্লিন—কোথাও এমনকি সামান্যতম কম্পনও অনুভব করা গেলো না।

শ্যামোকিনে তাঁর কয়লাখনিতে জন মিল্‌নে ব'লে একজন একটি ভূমিকম্প-নির্দেশক যন্ত্রের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন; তিনিই বসিয়েছিলেন যন্ত্রটা। দেখলেন পৃথিবীর খোলে কোথাও কোনো অস্বাভাবিক কম্পন নেই। বাল্টিমোরে আকাশ ছিলো মেঘলা; ফলে তারাই দেখা গেল না, পৃথিবীর মেরুরেখা পাল্টে গেছে কি না তা হয়তো তারার সংস্থান থেকে বোঝা যেতে পারতো।

জে টি. ম্যাস্টনের নিরাপদ আশ্রয়টি কোথায়, তা কেবল এভাঞ্জেলিনা স্করবিটই জানতেন। কিন্তু কী একটা রাত যে কাটলো ম্যাস্টনের! নিজেকে যেন হারিয়ে বসেছিলেন তিনি। যেন তিনি আর এই আলোকদৃষ্টিসম্পন্ন যন্ত্রবিদ্ নন। কিছুতেই শান্ত থাকতে পারছিলেন না তিনি, কেবলই ছটফট করছিলেন। একদিনেই যেন অনেক বুড়োটে হ'য়ে গেছেন তিনি; চটপট এসে তাকালেন সূর্যের প্রাত্যহিক পরিক্রমণ-পথে কোনোরকম অদল-বদল হ'লো কি না দেখবার জন্য। তাঁর সাফল্যের অন্তত একটা প্রমাণ তবে পাওয়া যেতো। কিন্তু ২৩শে সেপ্টেম্বর সকালেও সূর্যের পথ বদলে গেছে কি না বোঝার কোনো উপায় নেই, কারণ সূর্য তো সেদিন একেবারে পুবদিকে ওঠে। পরের দিন সূর্য এমনভাবে দিগন্তের ওপাশে চ'লে গেলো, যা দেখে বোঝা গেলো যে তার পথ একতিলও বদলায়নি।

য়ুরোপীয় প্রতিনিধিরা তাঁদের হোটেলের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালেন; সঙ্গে তাঁদের অত্যন্ত সূক্ষ্ম সব যন্ত্রপাতি। সূর্য বিষুবরেখার দিকে যাচ্ছে কি না, এই যন্ত্রগুলি দিয়েই তা বোঝা যাবে।

তাই তো, কিছুই তো বদলায়নি। সূর্য ওঠার কিছুক্ষণ পরেই এই জ্বলন্ত গোল বিরাট আগুনের চাকাটি দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে ঝুঁকে পড়লো; তার পরিক্রমণ-পথের কোনোই পরিবর্তন দেখা গেল না।

মেজর ডনেলান ও তাঁর সহযোগীরা সোল্লাসে জয়ধ্বনি দিয়ে স্বর্গের এই মশালকে অভিনন্দন জানালেন: নাট্যমঞ্চের প্রিয় তারকাকে যেমন অভিনন্দন জানানো হয়, সূর্যকেও তা-ই জানালেন তাঁরা। আকাশ স্বচ্ছ ও নির্মল; দিগন্তে রাতের কোনো বাষ্পের লেশমাত্র নেই; স্তম্ভিত মানুষের কাছে মহান সবিতা এত সুন্দর ও বিরাট

banglabooks.in

রূপে আর যেন দেখা দেননি। 'আর কোনখানে তাঁর উদয় হ'লো?' এরিক বাল্ডেনাক নিজেই উত্তর দিলেন, 'না, জ্যোতির্বিদ্যা তাঁর জন্য যে উদয়-শিখর স্থির ক'রে রেখেছে, ঠিক সেইখানে।'

'হ্যাঁ, আমাদের প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্যার বিধি অনুযায়ীই তিনি উদিত হলেন,' বললেন বরিস কার্কফ। 'অথচ ওই গর্দভগুলি এমন ভঙ্গি করলে যেন তাঁকে ধ্বংস ক'রে ফেলেছে!'

'তা; সেজন্য তাঁদের কপালে যথেষ্ট উপহাস আছে। এর মজাটা তাঁরা ঠিকই টের পাবেন,' জাক জানসেন এমনভাবে কথা বললেন যে মনে হ'লো সমগ্র হল্যাণ্ড যেন তাঁর কণ্ঠে আত্মপ্রকাশ করল।

'এবং সুমেরু বিন্দুও তেমনি তুহিন ও তুষারময় থেকে গেলো, আবিষ্কারের মুহূর্তে যেমন দেখা গিয়েছিলো,' বললেন অধ্যাপক ইয়ান হারাল্ড।

'সূর্যেরই জয় হ'লো শেষে,' বললেন মেজর ডনেলান। 'তিনি যেমন আছেন তেমনি থাকুন—আমাদের এই ছোট্ট গ্রহের পক্ষে তা-ই যথেষ্ট।'

'জয়, সূর্যের জয়।' সমস্বরে য়ুরোপ ব'লে উঠলো। ডীন ট্রুড্রিঙ্ক এতক্ষণ কোনো উচ্চবাচ্য করেননি; এবার তিনি অত্যন্ত সতর্কভাবে বললেন, 'হয়তো এখনো তারা কামান দাগেনি!'

'কামান দাগেনি!' ব'লে উঠলেন মেজর। 'ঈশ্বর করুন তারা যেন একবারের জায়গাতে দু-বার কামান দেগে থাকে।'

আর ঠিক এই কথাই তখন বলছিলেন ম্যাস্টন আর এভাঞ্জেলিনা।

পরিস্থিতির অন্তর্লীন যুক্তির চাপে পরম জ্ঞানী আর চরম অবোধ মিলিত হয়েছেন এখন। এমনকি আলস্যাদ পিয়েদ্যো পর্যন্ত এই সম্ভাবনাটার পুনরাবৃত্তি ক'রে বললেন, 'অবশ্য যদি কামান দেগেও থাকে, তাতেই বা কী এসে যায়? কোনো উনিশ-বিশই তো তাতে হবে না। পুরোনো মেরুরেখায় পৃথিবী এতকাল যেভাবে নৃত্য ক'রে ঘুরেছে, তা তো আর বদলাবে না!'

কিলিমানজরোতে যে কী হয়েছে. তা কেউই সত্যি ক'রে জানেন না কিন্তু যে-প্রশ্নটা মানবজাতিকে এমন ব্যাকুল ক'রে তুলেছিলো, সন্ধেবেলায় তার সঠিক উত্তর পাওয়া গেলো। একটা তারবার্তা এসে পৌঁছুলো যুক্তরাষ্ট্রে; প্রেরক রিচার্ড ডবলিউ. ট্রাস্ট, জাঞ্জিবারের রাজদূত।

'জাঞ্জিবার, ২৩শে সেপ্টেম্বর, সকাল ৭-২৫ মিনিট'

'স্বরাষ্ট্র সচিব জন এস. রাইট সমীপেষু:

banglabooks.in

'কিলিমানজরোর দক্ষিণ দিকে পাহাড়ে সুড়ঙ্গ কেটে যে-কামান বসানো হয়েছিলো, কাল রাত ঠিক বারোটায় সে-কামান দাগা হয়েছে। উৎক্ষেপের সময় প্রাসটি ভয়ংকর ঘূর্ণিবায়ু ও প্রচণ্ড নিনাদ সৃষ্টি করেছিলো। বাতাসের আন্দোলনে ও আঘাতে কতগুলি প্রদেশ নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। মোজাম্বিক প্রণালী পর্যন্ত সমুদ্রে জলস্তম্ভ উঠেছিলো। অনেক জাহাজ সবেগে তীরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তার ফলে। বহু গ্রামে গৃহাদি পতনের শব্দ শোনা গেছে দূরে-কাছে। এছাড়া আর সব খবরই ভালো।—রিচার্ড ডবলিউ. ট্রাস্ট।'

এটা ঠিক, তাছাড়া আর সব খবরই ভালো—আর সবই ঠিকমতো চলেছে। ওয়ামাজাইয়ের প্রবল তাণ্ডব ছাড়া আর কোনো জাগতিক পরিবর্তনই লক্ষ করা গেলো না। কৃত্রিম জলস্তম্ভ ঘুরে-ঘুরে উঠেছিলো আকাশে, তার ফলে ওয়ামা-জাইয়ের একটা অংশ একেবারে প্লাবিত হ'য়ে গেছে, আর বাতাসের মধ্যে যে উনপঞ্চাশ স্রোত সৃষ্টি হয়েছিলো, তার ফলে অনেক জাহাজ ডুবে গেছে সমুদ্রে। চন্দ্রনগরীর বৃহৎ কামানটি যখন গর্জন ক'রে উঠেছিলো, তখনও এমনি দুর্যোগ এসেছিলো। ফ্লোরিডার মাটি যেভাবে থর-থর ক'রে কেঁপে উঠেছিলো ধাক্কায়, একশো মাইল দূর থেকেও কি তা টের পাওয়া যায়নি? তা গিয়েছিলো, কিন্তু এবার তো তার প্রতিক্রিয়া শতগুণ ভয়ংকর হওয়া উচিত ছিলো।

যাই কেন ঘটুক না এই থেকে বিশ্ববাসী অন্তত দুটি তথ্য জানতে পেলো। এক : সেই অতিকায় কামানটি বসানো হয়েছিলো কিলিমানজরোর গায়ে সুড়ঙ্গ কেটে। দুই : নির্দিষ্ট সময়েই কামানটি দাগা হয়েছে। আর, তৎক্ষণাৎ, অত্যন্ত তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলেই অট্টরোলে হেসে উঠলো সমগ্র জগৎ। বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির উদ্যম সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। ম্যাস্টন যে জটিল অঙ্কটি করেছিলেন, তার যোগ্য জায়গা হ'লো বাজে কাগজের ঝুড়ি। নিজের ব্যর্থতা ঘোষণা করা ছাড়া সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার আর-কিছুই নেই। কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে যে গান-ক্লাবের সম্পাদকটি তাঁর অনুগণনায় কোনো ভুল ক'রে বসেছেন? 'যদি কেউ বলে যে তাঁর প্রতি আমার মনোভাব সঠিক কী তা আমি বুঝতে পারিনি, তাহ'লে তা বরং বিশ্বাস করবো', বললেন এভাঞ্জেলিনা স্করবিট, 'কিন্তু ম্যাস্টন করবেন অঙ্কে ভুল? অসম্ভব।'

কিন্তু সবচেয়ে অসুখী মানুষ যদি কেউ থেকে থাকেন তো তিনি জে. টি. ম্যাস্টন। পৃথিবীর আহ্নিক অয়ন একটুও বদলায় না, সৃষ্টির মুহূর্তে জগৎ যেমন ছিলো তেমনি থেকে গেলো, এটা দেখে প্রথমটায় তিনি আশা করেছিলেন বুঝি কোনো দুর্ঘটনায়

banglabooks.in

বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানি সাফল্য থেকে বঞ্চিত হ'লো, তাঁর সহযোগীরা মারাই গেছেন দৈবচক্রে। কিন্তু কামান যে সত্যিই দাগা হয়েছে এই মর্মে কিনা তারবার্তা এলো জাঞ্জিবার থেকে!

ব্যর্থ হয়েছেন? ব্যর্থ ও পরাস্ত!!! এই-যে তিনি এত সময় নানা সূত্র আর অনুগণনা নিয়ে কাটালেন, তার কী হবে? এটা কি সম্ভব যে ৬০০ মিটার লম্বা ও ২৭ মিটার চওড়া ১৮০,০০০ টনের একটি নলাকার প্রাস ২০০ টন মেলিমেলোনাইট বিদীর্ণ ক'রে ২,৮০০ কিলোমিটার প্রাথমিক বেগে ছুটে বেরিয়ে এসেও পৃথিবীর মেরুরেখা পাল্টে ফেলতে পারলো না? না, তা কিছুতেই সম্ভব হ'তে পারে না!

অথচ, তাহ'লে?

কাজেই অত্যন্ত উত্তেজিত ম্যাস্টন জানালেন যে তিনি এক্ষুনি তাঁর গোপন আবাস ছেড়ে বেরিয়ে পড়বেন। বাধা দেবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন এভাঞ্জেলিনা স্করবিট। এমন নয় যে তাঁর জীবন এখনো বিপন্ন—সেই জাতীয় বিপদের সম্ভাবনা আর নেই। কিন্তু কী বিপুল বিদ্রূপ সহ্য করতে হবে তাঁকে—কতভাবে যে সবাই তাঁকে উপহাস করবে, তাঁর কাজ সম্বন্ধে যে-জাতীয় হুলফোটা পরিহাস করা হবে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এই ঠাট্টা-পরিহাসের হাত থেকে ম্যাস্টনকে তিনি বাঁচাতে চাচ্ছিলেন। আর তা'ছাড়া গান-ক্লাবের সভ্যরাই বা তাঁকে কী বলবেন? ব্যর্থতার জন্য ম্যাস্টনকেই কি তাঁরা দায়ী করবেন না? তাঁরা যে উপহাসের পাত্র হ'য়ে উঠলেন এমনিভাবে, ম্যাস্টনই কি তার মূল কারণ নন? তিনিই কি পরিকল্পনাটার জনক নন? তাঁর কাঁধেই কি সমস্ত দায়িত্ব নেই?

কিন্তু জে. টি. ম্যাস্টন কোনো কথাতেই কর্ণপাত করলেন না। এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের মিনতি ও চোখের জল তিনি প্রতিরোধ করলেন। এতদিন যেখানে লুকিয়েছিলেন, সেই গুপ্তগৃহ ছেড়ে তিনি বেরিয়ে এলেন। তাঁকে চিনে ফেলতে মোটেই দেরি হ'লো না। এতদিন তাঁর পরিকল্পনার ভয়ে যারা থরথর ক'রে কেঁপেছে, তারা এবার তাঁকে উপহাস ক'রে প্রতিশোধ নিলে: নানাভাবে তারা তাঁকে নিয়ে আমোদ করলে, জোর ক'রে তাঁকে সমস্ত হুল-বেঁধা মন্তব্য শোনানো হ'লো, এমনকি রাস্তার লোকেরা পর্যন্ত তাঁকে ছেড়ে কথা কইলো না। 'ছাখ-ছাখ', তারা চেঁচিয়ে বললে, 'এই-যে যাচ্ছেন শ্রীমান—ইনিই পৃথিবীর মেরুরেখা পাল্টাতে চেয়েছিলেন, শখ ছিলো উত্তর মেরুতে কয়লার খনি আবিষ্কার করেন, এমনকি উত্তর মেরুকে কিনা সরিয়ে ফেলতে চাচ্ছিলেন ইনি।' তাঁকে নিয়ে এমনি পরিহাস শুরু হ'লো যে তাঁকে একটু পরেই এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের বাড়িতে ফিরে আসতে

banglabooks.in

হ'লো, আর এভাঞ্জেলিনা তাঁর সমস্ত লাবণ্য ও স্নেহ দিয়ে তাঁকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। অবশ্য তাতে কোনো ফল হ'লো না। জে. টি. ম্যাস্টনের সান্ত্বনা কোথায় ? একটা গাদা বন্দুকের চেয়েও বেশি প্রতিক্রিয়া তুলতে পারলো না তাঁর কামান, পৃথিবী র'য়ে গেলো যেমন-কে তেমনি ! এইভাবে পনেরো দিন কেটে গেলো। বিশ্ববাসী আবার প্রাত্যহিকতায় মগ্ন হ'য়ে গেলো : সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার পরিকল্পনা সম্বন্ধে আর কোনো মাথা-ব্যথা নেই কারো : তা নিয়ে কেউ আর ভাবে না।

পনেরো দিন কেটে গেলো, অথচ এর মধ্যে বার্বিকেন আর নিকলের কোনো বার্তাই পাওয়া গেলো না। ওয়ামাজাইতে কামান দাগার সময়েই কি তাঁদের মৃত্যু হ'লো নাকি তবে ? একালের সবচেয়ে রহস্যময় পরিকল্পনা সফল করতে গিয়েই কি তবে তাঁরাও প্রাণ দিলেন ?

না।

কামান গর্জনের সঙ্গে-সঙ্গে সপারিষদ সুলতানও সহস্র কাফ্রিদের সঙ্গে হুড়মুড় ক'রে ছিটকে পড়েছিলেন, কিন্তু একটু পরেই তাঁরা যখন উঠে দাঁড়ালেন, তখন দেখা গেলো কারো গায়েই কোনো আঁচড় পড়েনি।

নিজের কাঁধ ডলতে-ডলতে বালি-বালি জিগেস করলেন : 'কী ? কৃতকার্য হলেন তো ?'

'আপনার কি তাতে সন্দেহ আছে নাকি ?'

'সন্দেহ করবো ? আমি ?' সুলতান বিস্ময় প্রকাশ করলেন। 'কিন্তু সঠিক কবে জানা যাবে ?'

'কয়েকদিনের মধ্যেই', জানালেন বার্বিকেন।

তাঁরা যে ব্যর্থ হয়েছেন, বার্বিকেন কি তা তক্ষুনি টের পেয়েছিলেন ? হয়তো। কিছু ওয়ামাজাইয়ের সুলতানের কাছে তা তিনি কিছুতেই স্বীকার করতেন না।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে বার্বিকেন আর নিকল ওয়ামাজাই থেকে বিদায় নিলেন। দেশের নিদারুণ ধ্বংস ঘটানোর জন্য তার আগে অবশ্য বিপুল ক্ষতিপূরণ দিতে হ'লো তাঁদের। পুরো টাকাটা যেহেতু সুলতানের কোষাগারেই থেকে গেলো এবং প্রজারা তার একটি সেণ্টও পেলো না, সেইজন্য এ নিয়ে তাঁর কোনো অভিযোগ ছিলো না।

সঙ্গী দশজন নিয়ে দুই বন্ধু তারপর জাঞ্জিবার পৌঁছলেন : সেখান থেকে একটি জাহাজ তাঁদের সুয়েজ পৌঁছে দিলো। সেখান থেকে তাঁরা মার্সাই গেলেন

banglabooks.in

ছদ্মনামে, 'মরিস' নামক একটি জাহাজে ; মার্সাই থেকে ট্রেনে পারী, সেখান থেকে বিনা বিপদেই আবার রেলপথে হাভ্‌র্ : আর এসেই সেখানে ট্রান্স-আটলান্টিক কোম্পানির 'বুর্জোই' জাহাজে ক রে আমেরিকা। ওয়ামাজাই থেকে নিউ-ইয়র্ক এলেন ঠিক বাইশ দিনে। পনেরোই অক্টোবর নিউপার্কের সেই বৃহৎ বাড়িটির কড়া নাড়তে দেখা গেলো তাঁদের—তখন দুপুর বারোটা বেজে তিন। পরমুহূর্তেই এভাঞ্জেলিনা স্করবিট আর জে. টি. ম্যাস্টনের সম্মুখীন হলেন তাঁরা।

'বার্বিকেন ! নিকল !'

'ম্যাস্টন !'

'আপনারা ?'

'হ্যাঁ আমরা।'

আর এই বহুবচনাত্মক সর্বনামটি দুই বন্ধুই এমন সমস্বরে ব'লে উঠলেন, যে তার মধ্যে তিরস্কার ও বিদ্রূপের রেশ লক্ষ করা গেলো।

জে. টি. ম্যাস্টন তাঁর লোহার হাতে কপাল চেপে ধরলেন। তাঁর গলা দিয়ে যেন কোনো স্বরই বেরোতে চাচ্ছে না। কোনোমতে জিগেস করলেন, কিলিমান-জরোতে আপনারা যে সুড়ঙ্গ বানিয়েছিলেন, তার ব্যাস কি সত্যি ২৭ মিটার ছিলো ?'

'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

'প্রাসের ওজন কত ছিলো ? সত্যি ১৮০,০০০,০০০ কিলোগ্রাম তো ?'

'হ্যাঁ।'

'সত্যি ২০০০ টন মেলিমেলোনাইট দিয়ে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

এই তিনটে 'হ্যাঁ' তিনটে মস্ত পাথরের চাঁইয়ের মতো এসে ম্যাস্টনের মাথায় পড়লো। 'তাহ'লে আমি কেবল এটাই বলতে পারি যে—' ?'

'—যে ?' জিগেস করলেন বার্বিকেন।

'বলছি।' ম্যাস্টন জানালেন : 'আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়াতে এটা বোঝা গেলো যে ওই বিস্ফোরক আমাদের প্রাসকে ২৮,০০০ কিলোমিটার প্রারম্ভিক বেগ

banglabooks.in

দিতে পারেনি।'

'তাই নাকি?' ক্যাপ্টেন নিকলের গলায় ঠাট্টার সুর ফুটে উঠলো।

'হ্যাঁ, তাই। আপনার মেলিমেলোনাইটে কেবল এয়ার গানই ছোঁড়া যায়!'

এই কথা শুনে ক্যাপ্টেন নিকল অপমানে রোষে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'ম্যাস্টন!'

'নিকল!'

'আপনাকে মেলিমেলোনাইট দিয়ে উড়িয়ে দেয়া উচিত ছিলো!'

'না, তুলোর বারুদে—তাতে অন্তত নিশ্চিত হওয়া যেতো।'

এই দুই রুষ্ট গোলন্দাজকে শান্ত করার জন্য এভাঞ্জেলিনা স্করবিটকে মাঝখানে দাঁড়াতে হ'লো। 'কী করছেন আপনারা—ছেলেমানুষের মতো!'

'আর তা ছাড়া,' অত্যন্ত শান্ত গলায় প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন বললেন, 'পরস্পরকে দোষারোপ ক'রেও বা কী লাভ হবে এখন? এটা যেমন ঠিক যে আমাদের বন্ধু জে. টি. ম্যাস্টনের অঙ্কে যেমন কোনো ভুল হয়নি, তেমনি বন্ধুবর নিকলের বিস্ফোরকের শক্তিও যথেষ্ট। আসলে আমরা কেবল বিজ্ঞানের ততটুকুই প্রয়োগ করেছি যতটুকু আমাদের জানা ছিলো। অভিজ্ঞতা ব'লে তো কিছুই ছিলো না আমাদের। কেন ব্যর্থ হলাম? হয়তো তা কোনোদিনই আমরা জানতে পারবো না।'

'আবার নতুন ক'রে শুরু করবো আমরা', গান-ক্লাবের সম্পাদক জানালেন।

'তাহ'লে এবারকার সব টাকাটাই জলে গেলো!' ক্যাপ্টেন নিকল বললেন।

'লোকে কিন্তু,' এভাঞ্জেলিনা স্করবিট বললেন, 'দ্বিতীয়বার এ কাজে হাত দিতে দেবে না।'

'তা'হলে আমাদের সুমেরুর কী হবে?' বললেন ক্যাপ্টেন নিকল: 'সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থায় শেয়ারের দাম কোথায় পড়বে তাহ'লে? জিজ্ঞেস করলেন বার্বিকেন।

'পড়বে আর কোথায়? এর মধ্যেই তো পুরোনো কাগজের দরে বিক্রি হচ্ছে শেয়ার।'

তাহ'লে এই অভিনব পরিকল্পনার ফল হ'লো এই: পর্বতের মূষিক প্রসব হ'লো মাত্র! বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানির অতিমানবিক পরিকল্পনার ফল হ'লো কিনা এই অতিকায় প্রহসন!

সর্বসমক্ষেই হাসাহাসি শুরু হ'লো এই দুর্ভাগা যন্ত্রবিদদের নিয়ে; একের পর এক ব্যঙ্গচিত্র বেরোলো কাগজে কাগজে; ছড়া কাটা হ'লো, গান বাঁধা হ'লো,

banglabooks.in

পরিহাস-প্রবণ মন্তব্য বেরোলো অগুন্তি : এমন একটা প্রহসনের অবতারণা হ'লো, যার তুলনা কোথাও নেই। প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন, নতুন সংস্থার পরিচালক ও গান-ক্লাবের সদস্য সার্বিকভাবে উপহাস্য হলেন। পৃথিবীর প্রত্যেকটা ভাষায় ব্যঙ্গ করা হ'লো তাঁদের, আর এইসব নিন্দুক প্রবন্ধগুলি যাতে সহজেই বিশ্ববাসী পড়তে পারে, সেইজন্য সে-সব ছাপানো হ'লো 'ভলাপুক'-এ। বিশেষত য়ুরোপে সুমেরু উদ্যোগ-সংস্থার কর্তৃপক্ষকে নিয়ে যত ছড়া আর গান বাঁধা হয়েছিলো সব বেতারে প্রচারিত হ'লো। সবচেয়ে লাগসই গান লিখেছিলেন একজন ফরাশি ; আস্ত একটি গাথা রচনা করেছিলেন তিনি, আর ফ্রান্স ও আমেরিকার সমস্ত জলসাঘরে তা গাওয়া হ'তে লাগলো। কিন্তু তাঁদের পরিকল্পনা এমনভাবে কেন ব্যর্থ হ'লো, তা কি আমরা কোনোদিনই জানতে পারবো না ? এই ব্যর্থতা থেকে এটাই কি ধ'রে নিতে হবে যে এই চেষ্টা কোনোদিনই সফল হবে না ? মানবজাতির অধিকারের শক্তি আছে, তাতে কি কোনোদিনই পৃথিবীর আহ্নিক অয়নের পরিবর্তন ঘটানো যাবে না ? তাহ'লে কি এটাই প্রমাণিত হ'লো যে সুমেরুকে কোনোদিনই সেখানে সরিয়ে নেয়া যাবে না, সেখানে মানুষের সাহায্য ছাড়াই কি সূর্য তার তাপে ওই তুহিনক্ষেত্র বিগলিত করতে পারবে ? প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকল য়ুরোপে ফিরে আসার কয়েকদিন পরেই এ-বিষয়ে আলোকপাত হ'লো। ১৭ই সেপ্টেম্বরের 'টাইমস্'-কাগজে এ-সম্বন্ধে অত্যন্ত সরল একটি নিবন্ধ বেরোলো। আমরা সেটাই নিচে তুলে দিলাম

'নতুন মেরুরেখা তৈরি করার চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে, তা আমরা সকলেই জানি। কিন্তু যে-সব প্রতিষ্ঠিত তথ্যের উপর নির্ভর ক'রে জে. টি. ম্যাস্টন গণনা করেছিলেন, তা থেকে ওই বাঞ্ছিত ফল সত্যি পাওয়া যেতো, যদি-না দৈবাৎ প্রথম থেকেই একটা ভুল ক'রে বসতেন তাঁরা। এই ভুলটা যে কেন হ'লো, তার কোনো হদিশ নেই, এতই সেটা অস্বাভাবিক। গান-ক্লাবের নামজাদা সম্পাদক মশাই যখন গণনার জন্য ভূমণ্ডলের পরিধি হিসেব করেন, তখন ৪০,০০০,০০০ মিটারের বদলে তিনি ৪০,০০০ মিটার বসিয়েছিলেন—যার ফলে তাঁদের সব চেষ্টাই বিফল হ'য়ে গেলো।

'এমন একটা ভুল কেমন ক'রে হ'লো? এতগুলো "শূন্য" বাদ প'ড়ে যায় কেমন ক'রে ? এত বড়ো একজন গাণিতিক এ-রকম একটা ভুল ক'রে বসলেন কীভাবে ?

'এটা ঠিক যে এই ভুলটা না-হ'লে পৃথিবীর মেরুরেখা পাল্টাবার সমস্যাটা তিনি ঠিকই সমাধান করতেন। কিন্তু এই তিনটি শূন্যের কথা ভুলে গিয়ে গণনার ফলে শেষ পর্যন্ত একেবারে বারোটা শূন্যের গরমিল হ'য়ে গেছে।

banglabooks.in

'২৭ সেন্টিমিটার মাপের কামানের দশ লক্ষ গুণ বড়ো কামান নয়, তারও শত-পরার্ধ গুণ বড়ো কামান চাই, আর চাই ৮০,০০০ টনের শত-পরার্ধ প্রাস—তাহ'লে অবশেষে সুমেরুকে সরানো যাবে ; অবশ্য এটা ধ'রেই নিচ্ছি যে ক্যাপ্টেন নিকল মেলিমেলোনাইটের প্রসারণ-শক্তির নির্ভুল হিসেব করেছেন।

'সেইজন্যই তাঁদের এই বিপুল চেষ্টার ফলে এক মিলিমিটারের তিনহাজার ভাগের একভাগ মাত্র সরেছে সুমেরু, আর তার ফলে সমুদ্রতলের পরিবর্তন হয়েছে এক মিলিমিটারের তিনহাজার ভাগের একাংশের ন'হাজার ভাগের একাংশ। যে-প্রাসটি নিক্ষিপ্ত হ'লো সেটা একটা ছোট্ট গ্রহে পরিণত হ'য়ে সূর্যের আকর্ষণে সৌর পরিবারের অন্তর্ভূত হ'য়ে যাবে।

'তাহ'লে অনুগণনায় জে. টি. ম্যাস্টন সেই-যে সামান্য একটু অমনোযোগ দেখিয়েছিলেন, তার ফলেই বার্বিকেন অ্যাণ্ড কোম্পানিকে এমনভাবে অপদস্থ হ'তে হ'লো।

'সহযোগীরা তাঁর উপর অত্যন্ত রুষ্ট হ'লেও, আর সবাই তাঁকে নিয়ে উপহাস করলেও এটা বলা ভালো যে তাঁর এই গণনার ভুলেই এক বিষম সর্বনাসের হাত থেকে পৃথিবী বেঁচে গেলো।'

আলস্যাদ পিয়েদ্যো

তিনটি শূন্যের এই বিস্মরণকে অভিনন্দন জানিয়ে ম্যাস্টনের নামে চিঠি আর তারবার্তার প্লাবন ব'য়ে গেলো। কিন্তু জগৎ তাঁর নামে জয়ধ্বনি দিলেও ম্যাস্টন যেন এবার একেবারে ভেঙে পড়লেন। প্রেসিডেন্ট বার্বিকেন, ক্যাপ্টেন নিকল, কাঠের-পা-ওলা টম হাণ্টার, কর্নেল ব্লুমসবেরি, উৎফুল্ল বিল্‌স্‌বি ও অন্যান্য সহ-যোগীরা কি কোনোদিন তাঁকে ক্ষমা করতে পারবেন ? এভাঞ্জেলিনা স্করবিট কিন্তু তাঁর উপর মোটেই রুষ্ট হলেন না—চমৎকার মহিলাটি, এমন আর হয় না।

জে. টি. ম্যাস্টন কিছুতেই তাঁর ভুল স্বীকার করতে চাইলেন না : আবার নতুন ক'রে গণনা শুরু করলেন।

ভুল অবশ্য তাঁর হয়েছিলো। আলস্যাদ পিয়েদ্যোর হিশেবটাই বরং নির্ভুল। তাঁর এই ভ্রান্তিবিলাস একেবারে শেষ মুহূর্তে ধরা পড়েছিলো পিয়েদ্যোর কাছে : তখন আর তা কাউকে জানাবার সময় নেই। তবে, চারপাশের এই ত্রাস ও আতঙ্কের মধ্যে তখনও তিনি বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হননি, শুধু কামান দাগার মুহূর্তে স্যাম্পেনে এই ভূমণ্ডলের স্বাস্থ্যপান করেন।

banglabooks.in

হ্যাঁ, সত্যিই পৃথিবীর পরিধির তিনটে শূন্যের কথা তিনি ভুলে গিয়েছিলেন। আচমকা আস্ত ঘটনাটাই ম্যাস্টনের মনে পড়ে গেলো।

গণনা শুরু করার একেবারে গোড়ার দিকে ঘটেছিলো ব্যাপারটা। তখন তিনি সদ্য নিজেকে ব্যালিস্টিক কটেজে বন্ধ ক'রে তাঁর ব্ল্যাকবোর্ডে ৪০,০০০,০০০ এই সংখ্যাটি লিখেছেন। সেই মুহূর্তেই হঠাৎ ঝনঝন ক'রে টেলিফোন বেজে ওঠে। ফোনের কাছে গিয়ে রিসিভার তুলে ধরলেন, সামান্য কিছু কথাবার্তা হ'লো এভাঞ্জেলিনা স্করবিটের সঙ্গে। হঠাৎ বাইরের ঝোড়ো আকাশে প্রবলভাবে বিদ্যুৎ চমকে উঠলো, তাঁর টেলিফোনের তারে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চালিত হ'য়ে তিনি ভীষণ এক ধাক্কায় ব্ল্যাকবোর্ডের গায়ে ছিটকে পড়লেন, ব্ল্যাকবোর্ডটিও হুড়মুড় করে প'ড়ে গেলো। তার ফলে ব্ল্যাকবোর্ডের অঙ্কগুলি খানিকটা মুছে যায়; উঠে দাঁড়িয়ে মুছে-যাওয়া সংখ্যাগুলি আবার লিখতে শুরু করলেন তিনি। মাত্র ৪০,০০০ লিখেছেন, এমন সময় আবার দ্বিতীয়বার টেলিফোন বেজে উঠলো। আবার গিয়ে মাদাম স্করবিটের সঙ্গে কিছু কথা ব'লে এলেন তিনি এবং যখন আবার তাঁর কাজ শুরু করলেন, তখন পৃথিবীর পরিধিতে শেষের তিনটে শূন্য বসাতে ভুলে গেলেন।

পুরোটাই মাদাম স্করবিটের দোষ। তিনি টেলিফোন না করলে ম্যাস্টন তড়িৎ-প্রবাহের ধাক্কায় ব্ল্যাকবোর্ড-সমেত মাটিতে ছিটকে পড়তেন না। বাইরে বিদ্যুৎ চমকালো কি বজ্রপাত হ'লো, কিছুই তবে তিনি লক্ষ করতেন না—আর এই বিপুল জটিল অঙ্কটি এমন শোচনীয়ভাবে ভুল হ'তো না।

ভুলটা হ'লো কেমন ক'রে এটা যখন ম্যাস্টন মিসেস স্করবিটকে জানালেন তখন বেচারি অত্যন্ত আঘাত পেলেন। সত্যি, তিনিই এই ব্যর্থতার মূল; তাঁর জন্যই চিরকালের মতো লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হলেন ম্যাস্টন; গান-ক্লাবের প্রায় প্রত্যেক সদস্যই শতাধিক বছর বাঁচেন, অথচ এই দীর্ঘকাল ম্যাস্টনকে আজীবন লোকের অবমাননা ও অবহেলা সহ্য করতে হবে।

নিউ-পার্কে এই কথাবার্তার পর ম্যাস্টন তাঁর ব্যালিস্টিক কটেজে ফিরে এলেন। পড়ার ঘরে ঢুকতে-ঢুকতে আস্তে-আস্তে বিড়-বিড় ক'রে বললেন, 'জগতে যদি কেউ সম্পূর্ণ অপদার্থ থেকে থাকে তো সে আমি।'

তাঁর পিছন থেকে কে যেন ভাঙা গলায় ব'লে উঠলেন, 'এমনকি, বিয়ে করারও যোগ্য নয়?' ইনি আর কেউ নন, শ্রীমতী এভাঞ্জেলিনা স্করবিট। সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ ও বিধ্বস্ত হ'য়ে গেছেন তিনি, আস্তে আস্তে ম্যাস্টনকে অনুসরণ ক'রে চ'লে এসেছেন।

'একটা শর্তেই বিয়ে করতে পারি', আপন মনেই বললেন ম্যাস্টন, 'আর কোনো

banglabooks.in

দিনও কোনো অঙ্কে হাত দেবো না।'

'আবার অঙ্ক!' চমৎকার মহিলাটি ব'লে উঠলেন, 'অঙ্কের কথা ভাবলেই আমার বিভীষিকা হয়!'

এইভাবেই গান-ক্লাবের সম্পাদকটির দ্বারা শ্রীমতী এভাঞ্জেলিনা স্করবিট একদিন মিসেস জে. টি. ম্যাস্টনে পরিণত হলেন।

এদিকে আলস্যাদ পিয়েরদ্যোর প্রবন্ধটি তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি ও সম্মান এনে দিলো। পৃথিবীর সব ভাষাতেই তর্জমা হ'লো তার, সমস্ত কাগজেই তা ছাপানো হ'লো, আর এইভাবেই সমগ্র বিশ্বে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়লো। তাঁর প্রেমিকার পিতৃদেবটি একদিন তাঁর সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাননি, বলেছিলেন অতি চালাক কারো হাতে তিনি তাঁর মেয়েকে তুলে দিতে পারেন না। কিন্তু এই প্রবন্ধটি প'ড়ে—বলাই বাহুল্য প্রবন্ধটির মর্মার্থ ভেদ করতে তাঁকে অন্যের সাহায্য নিতে হয়েছিলো—তিনি মনে মনে এই যুবকটির জন্য দুঃখ অনুভব করলেন। পিয়েরদ্যোকে তিনি তাঁর এবং তাঁর কন্যার সঙ্গে দেখা করার জন্য নৈশভোজে আমন্ত্রণ করে পাঠালেন।

২০

এবার বিশ্ববাসী আবার সহজ হ'তে পারেন। প্রেসিডেণ্ট বার্বিকেন আর ক্যাপ্টেন নিকল আর কখনো এই ব্যর্থ পরিকল্পনাটিতে হাত দেবেন না। যতই নির্ভুল হোক-না কেন, ম্যাস্টন আর কোনোদিনই কোনো গণনায় লিপ্ত হবেন না। আলস্যাদ পিয়েরদ্যোর প্রবন্ধটিই ঠিক বলেছে। যদি কেউ মেরুরেখাকে মাত্র ২৩ ডিগ্রি ২৮ মিনিট সরাতে চায় তা'হলে মিলিমেলোনাইট সত্ত্বেও কিলিমানজরোর পাহাড়ে সুড়ঙ্গ ক'রে যে কামানটি বানানো হয়েছে তার শতপরার্ধ গুণ বড়ো একটি কামান বানাতে হবে। অন্তত বলবিদ্যার তত্ত্ব থেকে তো এটাই বোঝা যায়। কিন্তু আস্ত ভূমণ্ডলটিকে খুঁড়ে ফেলেও সে কামান তার মধ্যে আঁটানো যাবে না। কাজেই নির্ভয়ে ঘুমোতে পারেন বিশ্ববাসী। এই আবর্তমান গ্রহটিকে পরিবর্তিত করা মানবজাতির সাধ্যে কুলোবে না। নীহারিকা-মণ্ডল সৃষ্টির সময় সৃষ্টিকর্তা যে বিধান আরোপ করেছেন তাকে একতিল ওলোট-পালোট করার ক্ষমতা এই ক্ষুদ্র মানবজাতির হাতে নেই।

banglabooks.in

জার্নি টু দি সেণ্টার অব্ দি আর্থ

banglabooks.in

রুনিক হরফের ভোজবাজি

জার্মেনির হ্যামবুর্গে কনিগ স্ট্রাস স্ট্রিট নামে যে রাস্তাটা আছে, সেইখানে পুরোনো একটা ছোটো বাড়িতে থাকতেন অধ্যাপক লিডেনব্রক। লিডেনব্রক আমার কাকা।

কাকামণির কথা বলতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে চাইনে। রসায়ন, ভূতত্ত্ব আর ধাতুবিজ্ঞানে নিত্য-নতুন গবেষণা ক'রে অধ্যাপক লিডেনব্রেক যে কী পরিমাণ বিখ্যাতি অর্জন করেছিলেন, আজকে তার আর কোনো বিশদ বিবরণ দেয়ার প্রয়োজন নেই। যখনকার কথা বলতে বসেছি, তখন কাকামণির বয়েস পঞ্চাশের মতো। কিন্তু এতো বয়েস হ'লে কী হবে, উৎসাহ-উদ্দীপনা তাঁর বিন্দুমাত্র কম ছিলো না যুবকদের চেয়ে।

ভূতত্ত্ব পড়তে আমার ভালো লাগতো ব'লে কাকামণি নিজে আমাকে পড়ানোর ভার নিয়েছিলেন। তার ফলে অল্পদিনের মধ্যেই অধ্যাপক লিডেনব্রকের সহকারী ব'লে পণ্ডিত-মহলে আমার নাম ছড়িয়ে পড়েছিলো।

আমি আর কাকামণি ছাড়া সেই পুরোনো বাড়িটায় থাকতো অনেক দিনের পুরোনো ঝি বুড়ি মার্থা, আর কাকামণির ধর্মকন্যা গ্রোবেন। গ্রোবেন অবশ্য হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করতো, কিন্তু সপ্তাহ-শেষে একবার ক'রে তার বাড়ি আসাটা যেন নিয়ম হ'য়ে গিয়েছিলো।

সেদিন ছিলো সোমবার, পনেরোই মে। কড়া ক'রে এক কাপ কফি তৈরি ক'রে বসেছি, এমন সময় দেখতে পেলাম, কাকামণি হন্তদন্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরলেন। হাতে একটা মোটা বই। কোনো দিকে দৃকপাত না ক'রে কাকামণি সোজা পড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। হাতের ছড়িটা এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, টুপিটা আছড়ে ফেলে দিলেন টেবিলের উপর। তারপর আমায় ডাকতে শুরু ক'রে দিলেন : 'অ্যাকজেল ! অ্যাকজেল !'

কাকামণির হৈ-চৈ করার স্বভাব জানতুম ব'লে কফির কাপটা হাতে নিয়েই তাড়াতাড়ি পড়ার ঘরে এসে ঢুকলুম। পড়ার ঘর না ব'লে ওটাকে জাদুঘর বলাই

banglabooks.in

উচিত। পৃথিবীর সমস্ত খনিজ পদার্থের নমুনা সে-ঘরে থাকে-থাকে সাজানো। কাকামণির সংগ্রহের বাতিক সারা জার্মেনিতে প্রসিদ্ধ ছিলো।

ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলাম, ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে কাকামণি সেই মোটা বইটা নাড়াচাড়া করতে-করতে তৃপ্তির স্বরে বলছেন : 'আহা, কী চমৎকার বই !'

কাকামণির মাথায় যে খানিকটা ছিট ছিলো, এ-কথা অন্য কেউ না জানলেও আমি জানতুম। পণ্ডিতদের অমন হ'য়েই থাকে। কিন্তু তবু আমি অবাক হলুম একটু। কেউ যা পড়তেও পারেনি, তেমনি দুষ্প্রাপ্য প্রাচীন পুঁথি ছাড়া কাকামণির কাছে অন্য কোনো বইয়ের কদর ছিলো না। কাকামণির হাতের বইটাও নিশ্চয়ই তেমনি কিছু হবে।

আমাকে দেখেই কাকামণি বলে উঠলেন : 'কথায় বলে, যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখো তাই, পাইলে পাইতে পারো অমূল্য রতন।' সাংঘাতিক খাঁটি কথা ! সেই ইহুদি বুড়োর দোকানটা তন্ন-তন্ন করে খুঁজে আজ এই রত্নটা উদ্ধার করেছি। আহা কী চমৎকার বই ! আর ছাখ্, বাঁধাইটাও কী চমৎকার ! কত পুরোনো হ'য়ে গেছে, কিন্তু তবু কী মজবুত আছে এখনও ! জানিস, কত পুরোনো বইটা ? সাতশো বছরের। অথচ বইটার চেহারা ছাখ্ ! একদম নতুনের মতো লাগছে না ? এমন বাঁধানো বই দেখলে বড়ো-বড়ো দপ্তরিরা পর্যন্ত থ হ'য়ে যাবে।'

জিজ্ঞেস করলাম : 'নাম কী বইটার ?'

'নাম ?' তেমনি উত্তেজিত গলায় বললেন কাকামণি : 'বারো শতকে টার্লেশন নামে যে পণ্ডিত ছিলেন, বইটা তাঁরই লেখা। নাম "হিমস্ ক্রিলো" !'

'জার্মান তর্জমা কে করেছে ?'

'তর্জমা ! তুই কি বলছিস অ্যাকজেল ! এটা সেই আসল বই—খাঁটি আইসল্যাণ্ডের ভাষায় লেখা। আহা কী সুন্দর ভাষা, আর কী সাবলীল ! ঠিক যেন জার্মান বই !'

'ছাপা কেমন ? হরফগুলো দেখতে খুব সুন্দর বোধহয় ?'

'ছাপা !' কাকামণি যেন ভূত দেখলেন : 'ছাপা ? বলিস কী রে তুই ? এ হচ্ছে পাণ্ডুলিপিটা, হাতে লেখা পুঁথি—খাঁটি রুনিক হরফে লেখা।'

'রুনিক ?' অবাক হ'য়ে শুধোলাম : 'সে আবার কী ?'

ততোক্ষণে ভাষা সম্পর্কে কাকামণির বক্তৃতাটা শুরু হ'য়ে গেছে। অসহায়-

banglabooks.in

ভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতাটা সম্পূর্ণ শুনতে হ'লো। শেষটায় বললেন: 'সেকালে এই রুনিক হরফই আইসল্যাণ্ডে চলতি ছিলো। সেখানকার লোকদের মতে, দেবতা অডিন নাকি স্বয়ং এই বর্ণমালা তৈরি করেছিলেন।' বইটা নাড়াচাড়া করতে-করতে কথাগুলো বললেন কাকামণি। হঠাৎ বইটার মধ্য থেকে ছোটো একটা বিবর্ণ, হলদে রঙের কাগজ মেঝেয় ছিটকে পড়লো। তক্ষুনি কাকামণি উদ্‌গ্রীব আগ্রহে সেটা তুলে নিলেন। খুব সাবধানে কাগজটার ভাঁজ খুলে মেলে রাখলেন টেবিলের উপর। কাগজটা লম্বায় পাঁচ ইঞ্চি, চওড়ায় ইঞ্চি-তিনেক হবে। কী-সব হিজিবিজি হরফে কি যেন লেখা কাগজটায়। কিন্তু কী যে লেখা, তার কোনো মাথামুণ্ডুই বুঝতে পারলাম না।

কাকামণি ততোক্ষণে মহা উৎসাহে কাগজটার পাঠোদ্ধারে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। আমি নির্বিকার চোখে দেয়ালের ছবিগুলো দেখতে লাগলাম। কিন্তু একটু বাদেই শুনতে পেলাম কাকামণির গলা: 'রুনিক হরফেই তো চিরকুটটা লেখা। কিন্তু কী যে লেখা, তা তো বুঝতে পারছি নে!'

দুনিয়ার সব ভাষা যাঁর সমান দখলে, তাঁর মুখে এমন কথা শুনে অবাক হ'য়ে গেলাম। কিন্তু অবাক হওয়ার তখনও ঢের বাকি ছিলো। ক্রমশ তাঁর চোখে-মুখে উত্তেজনার এমন সব চিহ্ন জেগে উঠলো যা দেখে বোঝা গেলো চিরকুটটার কোনো মানেই উনি বার করতে পারছেন না। আর, মানে বার করতে না পারার দরুন, কাকামণি সেদিনই প্রথম খাবার ব্যাপারে অবহেলা দেখালেন। মার্থা যখন এসে খেতে যাওয়ার কথা বললে, তখন কাকামণি খাবারের নিকুচি ক'রেছে বলে তাকে তাড়া লাগালেন। গতিক সুবিধের নয় দেখে আমি অবিশ্যি খাবারের ব্যাপারে অবহেলা করলাম না। গোগ্রাসে গিলে এলাম গিয়ে। বলা নিষ্প্রয়োজন, কাকামণির প্লেটটাও আমি একাই সাবাড় করলাম।

খাওয়া-দাওয়া সেরে পড়ার ঘরে গিয়ে দেখি, কাকামণি ভুরু কুঁচকে আপন মনেই বিড়বিড় ক'রে বকছেন: 'হরফগুলো যে রুনিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কোনো মানে বুঝতে পারা যাচ্ছে না কেন? নিশ্চয়ই গোপন কোনো সঙ্কেতে চিরকুটটা লেখা। সেই সঙ্কেতটা কী বুঝতে পারলেই সব মানে স্পষ্ট হ'য়ে যাবে।'

হঠাৎ চোখ তুলে আমাকে দেখতে পেলেন কাকামণি। তক্ষুনি একটা চেয়ার আমায় আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। বললেন, 'বোস। যা বলি, সব একটা কাগজে টুকে নে তো! রুনিক বর্ণলিপির যে হরফ আমাদের যে হরফের মানে

banglabooks.in

বোঝায়, কাগজটা দেখে-দেখে তা আমি বলে যাচ্ছি। সাবধানে লিখিস। দেখিস যেন ভুল না হয়।'

কাকামণি বলতে লাগলেন আর আমি লিখতে লাগলাম। লেখা শেষ হ'লে দেখি, অক্ষরগুলি এমনভাবে বসেছে, কোনো বাক্যই তৈরি হয় না, মানে বার করা তো দূরের কথা। লেখাগুলো এরকম :

m. rnlls	esrevel	seeclde	sgtssmf
vnteief	niedrke	kt. samn	atrate
saodrrn	emtuoel	uvaect	rrilSa
Atsaar	.nvcrc	ieaabs	ccdrmi
eevtVI	frAurV	dt,iac	Oseibo
Kediil			

লেখা শেষ হ'লে কাকামণি কাগজটা নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে পড়বার চেষ্টা করলেন। নিজের মনেই বিড়বিড় ক'রে বলতে লাগলেন : 'কী মানে এর? মনে হচ্ছে এ কোনো সাঙ্কেতিক চিরকুট,—ক্রিপ্‌টোগ্রাফ। অক্ষরগুলো যদি কোনোমতে ঠিক ক'রে সাজানো যায়, তাহলেই কিস্তিমাত! কিন্তু…'

কাকামণি বইটা আর কাগজটা মিলিয়ে দেখতে লাগলেন। অনেকক্ষণ ধ'রে কী যেন লক্ষ্য করলেন উনি। তারপর বললেন : 'হুঁ, যা ভেবেছি তাই। চিরকুট আর পুঁথি যে দুই হাতের লেখা, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। চিরকুটটা বইটার ঢের—ঢের পরের লেখা। চিরকুটটার প্রথম হরফ হ'লো ইংরিজি জোড়া নাম'—টার্লেশমের বইয়ে এমন কোনো হরফই নেই। এই হরফটা প্রথম ব্যবহার করা হয় চোদ্দ শতকে—তার মানে চিরকুটটা ঐ পুঁথিটার অন্তত দু'শো বছর পরে লেখা হয়েছে।' একটু থেমে আবার বললেন কাকামণি : 'আমার মনে হয়, যাঁর কাছে এই পুঁথিটা ছিলো, এই রহস্যময় চিরকুটটা তাঁরই লেখা। কিন্তু কে সেই ব্যক্তি? কার কাছে ছিলো পুঁথিটা? পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে কাকামণি জানালেন : 'না, তাঁর নাম তো পাওয়া যাচ্ছে না!'

বইটার প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত তন্ন-তন্ন ক'রে দেখলেন কাকামণি, যদি কারও নাম পাওয়া যায়। কিন্তু কারও নাম পাওয়া গেলো না। এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার লোক ছিলেন না কাকামণি! আতস কাচ দিয়ে বইটার পাতাগুলো পরীক্ষা করতে লাগলেন। প্রথম পাতায় এক কোণে অস্পষ্ট একটু কালির দাগ দেখা গেলো। অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর বোঝা গেলো কালির দাগটা

banglabooks.in

কতকগুলো আবছা-হ'য়ে-যাওয়া অক্ষরের সমষ্টি। ভালো ক'রে সেই অক্ষরগুলো দেখতে-দেখতে সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন কাকামণি: 'আরে, এ যে আর্ন্ সাক্নুস্যউজমের নাম! উনি তো আইসল্যাণ্ডের মস্ত বড়ো বৈজ্ঞানিক! রসায়নে আজও তাঁর জুড়ি পাওয়া যায়নি। শোনা যায়, উনি অ্যালকেমির গবেষণায় সাফল্য লাভ করেছিলেন। বোধ হয়, সাক্নুস্যউজম কোনো নতুন জিনিশ আবিষ্কার ক'রে সঙ্কেতের সাহায্যে চিরকুটটায় লিখে গেছেন। কিন্তু কী তিনি লিখে গেছেন? কী?'

'কিন্তু কাকামণি, সাক্নুস্যউজম যদি নতুন কিছু আবিষ্কার ক'রেই থাকেন, তবে এমন রহস্যময় সঙ্কেত ব্যবহার করেছেন কেন?'

'নিশ্চয়ই কোনো কারণ ছিল।' কাকামণি জানালেন: 'গ্যালিলিয়ো যখন নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন, তখন এমনি-ভাবেই সঙ্কেতলিপিতে সমস্ত তথ্য লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই সঙ্কেতের মানে আমাকে বের করতেই হবে। যতোক্ষণ না এর অর্থ বার করতে পারছি, ততোক্ষণ সব কাজ বন্ধ। বুঝলি অ্যাকজেল, এখন আমাদের একমাত্র কাজ হ'লো এই বিদ্‌ঘুটে হরফগুলোর মধ্য থেকে মানে বের করা।'

ভালো ছেলের মতো ঘাড় নেড়ে সায় দিতে-দিতে ভাবলাম, কাকামণি যখন পুরোদস্তুর খেপে গেছেন, তখন আর রেহাই নেই, আহার নিদ্রা সব একেবারে বাতিল।

কাকামণি কিন্তু একটানা ব'লেই চলেছেন: 'কাজটা অবশ্যি মোটেই কঠিন নয়, একেবারে জলের মতো সোজা। চিরকুটটার মধ্যে একশো বত্রিশটা অক্ষর আছে, তার মধ্যে সাতাত্তরটা হ'লো ব্যঞ্জনবর্ণ, আর বাকিগুলি স্বরবর্ণ। সাক্নুস্যউজম অনেক ভাষা জানতেন—মস্ত বড়ো পণ্ডিত ছিলেন তো! সুতরাং চিরকুটটা তিনি মাতৃভাষায় না লিখে লাতিনেই লিখেছেন ব'লে মনে হচ্ছে, কেননা সেকালে লাতিনই ছিলো পণ্ডিতদের ভাষা। কিন্তু গোলমেলে ব্যাপার হ'লো, হরফগুলো ওলট-পালট ক'রে সাজানো হয়েছে। কী ভাবে সাজানো হয়েছে, তার ধরনটা বুঝতে না পারলেই সব মাটি। ঠিক কী করে যে সাজানো হয়েছে···' ভুরু কুঁচতে গেলো কাকামণির। 'আচ্ছা, এমনও তো হ'তে পারে, সাক্নুস্যউজম লাইনগুলো সোজা না লিখে উপর থেকে নিচের দিকে লিখে গেছেন। এই ধরনেও তো অনেকে সঙ্কেতলিপি লিখে থাকে।

সায় দিয়ে বললাম: 'তা লিখে থাকে বৈকি।'

banglabooks.in

'তাহ'লে এবার চটপট দেখা যাক সাকুন্যুউজম কী লিখেছেন।' এই ব'লে গভীর মনোযোগের সঙ্গে চিরকুটটা পড়তে লাগলেন কাকামণি। অনেকক্ষণ ভাবনা-চিন্তার পর হরফগুলো এইভাবে সাজালেন : **messvnka senrA ice fdok. seg nitt amvrtn,**

'না, কিছুই হলো না!' উত্তেজিত স্বরে বললেন কাকামণি : 'এই ধরনে লিখলেও তো কোনো মানে হয় না!' এই ব'লে চেঁচিয়ে উঠে একলাফে ঘর থেকে বেরিয়ে হুড়মুড় ক'রে নিচে নেচে সোজা রাস্তায় গিয়ে হাজির হলেন কাকামণি, যেন বিদ্যুৎবেগে পাহাড়ের চুড়ো থেকে একটা বড়ো পাথর নিচে গড়িয়ে পড়লো। আর, তাই দেখে আমি তো একেবারে হতভম্ব।

কাকামণিকে হঠাৎ এমনি উত্তেজিতভাবে বেরিয়ে যেতে দেখে মার্থাও অবাক হ'য়ে আমায় এসে জিগেস করলে : 'উনি যে বেরিয়ে গেলেন খাওয়া-দাওয়া না ক'রে?'

'খাওয়া-দাওয়া বোধহয় আজ আর কাকামণির বরাতে নেই।'

মার্থাও আশ্চর্য হ'লো : 'তার মানে? রাত্তিরেও কি খাবেন না নাকি?'

'খাবেন ব'লে তো মনে হচ্ছে না।' এই ব'লে আমি চেয়ারে হেলান দিয়ে ব'সে আকাশ-পাতাল কতো কি ভাবতে লাগলাম।

কাকামণির স্বভাব তো ভালো ক'রেই জানা ছিলো। ঐ হেঁয়ালির কোনো সমাধান না হওয়া অবধি অন্য কোনো দিকেই দৃকপাত করবেন না আর। তার মানে, ওঁর সঙ্গে-সঙ্গে আমাদেরও আহার-নিদ্রা সব সমাপ্ত।

হঠাৎ মনে হ'লো, চিরকুটটা একবার নেড়ে-চেড়ে দেখলে কেমন হয়! দৈবাৎ কোনো হদিশও তো মিলে যেতে পারে! কাগজটা টেবিল থেকে তুলে নিলাম। না, কোনো মানেই হয় না এর! মনে-মনে নানানভাবে সাজালাম অক্ষরগুলো। কিন্তু, বৃথা—ও হেঁয়ালির সমাধান করা মানুষের সাধ্য নয়। কাকামণি যেভাবে অক্ষরগুলো সাজিয়েছিলেন, তার এক জায়গায় পাওয়া গেল ইংরেজি **icc**, আরেক জায়গায় পাওয়া গেলো ইংরেজি **Sir**। এ ছাড়া কতকগুলো লাতিন শব্দও দেখা গেলো—**rota, mutalsile, ira, nec, atra, luco**। একটা হিব্রু শব্দও পাওয়া গেলো—**talsiled**। আরে,—তিন-চারটে ফরাসি কথাও তো রয়েছে দেখছি,—**mer, are, mire**!

মাথাটা আরো ঘুলিয়ে গেলো। ইংরেজি, লাতিন, হিব্রু, ফরাশি—চার-চারটে ভাষা! বাব্বা! এর মানে বের করা আমার কর্ম না। বরফ, মশায়, রাগ,

banglabooks.in

নিষ্ঠুর, পবিত্র, অরণ্য, পরিবর্তনশীল, মা, ধনুক, সমুদ্র—এসব শব্দের মানে হয় কোনো? বরফ আর সমুদ্র কথাদুটি অবশ্য আইসল্যাণ্ডের কোনো লোকের লেখায় বেশ মানানসই। কিন্তু বাকি কথাগুলোর মানে কী?

ভাবতে ভাবতে craterem, terrestre—এমনি আরো কয়েকটা লাতিন কথা চোখে পড়লো।··· আরে, এখন তো বেশ মানে বোঝা যাচ্ছে! শেষ লাইনের শেষ হরফে শুরু ক'রে ডান থেকে বাঁয়ে পড়তেই সব মানে স্পষ্ট বোঝা গেলো। আর, যেই বুঝতে পারলাম, অমনি উত্তেজনায় ভ'রে গেলো মন। কী সর্বনাশ! এ কী লেখা চিরকুটে! একথা জানলে কাকামণিকে আর কোনোমতেই ঘরে আটকে রাখা যাবে না! তক্ষুনি ছুটে বেরুবেন উনি! অসম্ভব! কিছুতেই একথা ওঁকে জানালে চলবে না!

তক্ষুনি মনে হ'লো, এই চিরকুটটা আমার নষ্ট ক'রে ফেলা উচিত, নইলে একবার যদি কাকামণি বুঝতে পারেন কী লেখা আছে এতে, তাহ'লে আর রেহাই নেই।

চিরকুটটা তুলে নিয়ে চুল্লিতে ফেলতে যাচ্ছি, এমন সময়ে কাকামণি ঝড়ের মতো ঘরে এসে ঢুকলেন। তাঁকে দেখেই সাত-তাড়াতাড়ি কাগজটা টেবিলের উপর রেখে দিলাম। কাকামণির চেহারা দেখে বোঝা গেলো, বাইরে গিয়েও তিনি মুহূর্তের জন্য স্বস্তি পাননি—চিরকুটটা তাঁকে ভূতের মতো তাড়া ক'রে ফিরেছে।

চেয়ারে ব'সে কাকামণি কাগজ-কলম নিয়ে কি সব লিখতে লাগলেন। একবার লেখেন, তার পরেই তা ঘ্যাঁচ ক'রে কেটে ফেলেন। ওঁর রকম-সকম দেখে আমার বুক দুরুদুরু করতে লাগলো। এই বুঝি পাঠোদ্ধার ক'রে ফেলেন লেখাটার!

কিন্তু না, সে আশা করাটা রীতিমতো বাতুলতা। চিরকুটের একশো বত্রিশটা অক্ষর অসংখ্যভাবে সাজানো যায়। কতোভাবে আর সাজাবেন কাকামণি! আসল সঙ্কেতটা না বার করতে পারলে চিরকাল এই গোলোকধাঁধায় পথ হাতড়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু তবু আমার ভয় করতে লাগলো। যদি চিরকুটটার অর্থ করতে পারেন উনি!

অনেকক্ষণ কেটে গেলো। সন্ধে হ'লো, রাত হ'লো, রাত গভীর হ'লো, পথ-ঘাটের সোরগোল থেমে গেলো, কিন্তু তবু হুঁশ ফিরলো না কাকামণির। একমনে উনি অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে চলেছেন।

banglabooks.in

মার্থা একবার দরজা দিয়ে উঁকি দিয়ে বলেছিল, 'খাবার তৈরি।' কিন্তু কোনো সাড়া-শব্দ না পেয়ে সে আস্তে-আস্তে চ'লে গেল। আমি নিরুপায়ভাবে ব'সে রইলাম। তারপর কখন যে চেয়ারের উপরেই ঘুমিয়ে পড়লাম, তা জানি না।

ভোরবেলা যখন চোখে-মুখে এসে রোদ পড়লো, তখন ঘুম ভাঙলো আমার। ধড়মড় ক'রে উঠে বসলাম আমি। তাকিয়ে দেখি, তখন কাকামণি ঘাড় গুঁজে হরফের পর হরফ সাজিয়ে চলেছেন। চোখদুটো রাঙা টকটকে, মুখ শুকিয়ে গেছে, আলুথালু চুল এসে পড়েছে চোখে-মুখে, সারা শরীরে রাত-জাগার ক্লান্তি। রাতটা যে ওঁর এইভাবে কাটবে, তা আমি জানতাম। কিন্তু কী করতে পারি আমি? যদি ওঁকে সব খুলে বলি, তাহলে উনি তো সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হবেন মৃত্যুর পথে! অথচ এমন ভীষণ মানসিক শ্রমেও একটা কিছু বিপদ-আপদ ঘ'টে যাওয়া বিচিত্র নয়। কী করবো ঠিক করতে না পেরে চুপচাপ ব'সে রইলাম।

শেষ পর্যন্ত কাকামণির রকম-সকম দেখে সব কিছু খুলে বলা উচিত ব'লেই ঠিক করলাম। আস্তে-আস্তে জিগেস করলাম, 'সাকনুস্যউজমের চিরকুটটার কোনো মানে বের করতে পেরেছো কাকামণি?'

সচমকে আমার দিকে ফিরে তাকালেন উনি, আকুল হ'য়ে আমার হাত ধরলেন। দেখতে পেলাম ওঁর হাতদুটি থরথর ক'রে কাঁপছে। এবার আর চুপ ক'রে থাকতে পারলাম না। 'বললাম, 'আমি কিন্তু এর মানে খুঁজে পেয়েছি কাকামণি!'

কাকামণি চেঁচিয়ে উঠলেন একবারে: 'পেরেছিস! মানে করতে পেরেছিস তুই!'

সঙ্কেতটা জানিয়ে দিলাম: 'যদি শেষ হরফ থেকে পড়তে থাকো, তাহ'লে তুমিও এর মানে বুঝতে পারবে কাকামণি।'

আমার কথা শেষ হবার আগেই উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন কাকামণি। মুহূর্তের মধ্যে বদলে গেল ওঁর চেহারা। চিরকুটটা হাতে তুলে নিয়ে এক নিশ্বাসে উনি প'ড়ে গেলেন:

"In Sneffels joculis craterem quem delibat.
Umbra Scartaris julii intra calendas descende,
Audax viator, et terrestre centrum attinges
Quod feci, Arne Saknussemm."

কথাগুলো লাতিন। তার মানে এই দাঁড়ায়:

banglabooks.in

'হে নির্ভীক লামণিক! জুলাই মাসের গোড়ার দিকে যখন স্কার্টারিস পর্বতচূড়োর ছায়া পড়বে স্নেফেল অগ্নিগিরির মুখের উপর, তখন সে-পথে অবতরণ করলে তুমি পৌঁছতে পারবে পৃথিবীর অন্তঃপুরে। আমি সে-পথে গিয়েছিলাম।— আরন্ সাকন্যুউজম।'

ছোটো ছেলের মতো উল্লাসে কাকামণি রীতিমতো নৃত্যকলায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লেন। তারপর হঠাৎ কী যেন মনে পড়তেই ধপ্ ক'রে চেয়ারে ব'সে প'ড়ে নিস্তেজ গলায় শুধোলেন, 'কটা বাজলো?'

'দু'টো।'

'তাই তো বলি, খিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি হজম হ'য়ে যেতে চাইছে কেন? ঈশ্! কতো বেলা হ'য়ে গেছে দেখেছিস! চল্, চল্ শিগগির খেতে চল্। তারপর অনেক কাজ। মাল-পত্তর গুছোতে হবে তো!'

'সে কী? তার মানে?'

'শুধু আমার বাক্সই না, সেইসঙ্গে তোর বাক্সও গুছিয়ে নিতে হবে।' এই ব'লে খাবার-ঘরের দিকে পা বাড়ালেন কাকামণি।

২

বৈজ্ঞানিকের খেয়াল

বুকটা কেঁপে উঠলো। যে ভয় করছিলাম, শেষ পর্যন্ত তা-ই হ'লো।

তখন অবশ্য মিছিমিছি বেশি মাথা ঘামালাম না। কাকামণি তো একেবারে পাগল নন! ভাল-মন্দ বুঝবার শক্তি নিশ্চয়ই তাঁর আছে। পৃথিবীর অন্তঃপুরে ঘুরে বেড়ানো কি আর সম্ভব? তাই তখনকার মতো সব ভাবনা-চিন্তা ঝেড়ে ফেলে খাবার ঘরে ঢুকলাম।

ঢুকে দেখি, কাকামণি পর্বতপ্রমাণ খাবার নিয়ে বসেছেন। কালকে সারাদিনে খাওয়া-দাওয়া হয়নি, তাই আজ তার শোধ তুলছেন।

খাওয়া-দাওয়া চুকে গেলে কাকামণি আমাকে আবার পড়ার-ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। চেয়ারে আয়েস ক'রে গা এলিয়ে দিয়ে কাকামণি বললেন, 'অ্যাকজেল, তুই যে আমার কী উপকার করেছিস তা ব'লে বোঝাতে পারবো না! কিন্তু

banglabooks.in

সাবধান, এ-কথা যেন কাক-পক্ষীও টের না পায়! একবার যদি কেউ এ-কথা জানতে পারে, অমনি স্নেফেলে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো লেগে যাবে।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা কাকামণি, তুমি কি মনে করো লোকে এ-কথা বিশ্বাস করবে?'

'সকলের কথা বলতে পারিনে। কিন্তু কোনো বিজ্ঞানী এ-কথা জানতে পারলে তখুনি যে আইসল্যাণ্ডে ছুটবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই!'

'আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না। চিরকুটের কথাগুলো যে সত্যি, তার তো কোনো প্রমাণ নেই?'

কাকামণি আমার কথা শুনে তো রেগেই অস্থির। 'তুই বলতে চাস সাকুন্যুউজম মিথ্যে কথা লিখে গেছেন? তা, তোমার মতো গবেট এ-কথা বলবে না তো কে বলবে? সেদিন পিটার্মানের কাছ থেকে যে ম্যাপখানা পেয়েছি, নিয়ে আয় সেটা। তোকে সবকিছু দেখিয়ে দিচ্ছি।'

ম্যাপটা টেবিলের উপর বিছিয়ে কাকামণি ব'লে চললেন, 'এটা হ'লো আইসল্যাণ্ডের সবচেয়ে ভালো ম্যাপ, সমস্ত খুঁটিনাটি দেয়া আছে। এই দ্যাখ্ কতোগুলো আগ্নেয়গিরি এখানে। এদের অনেকগুলোই এখন ম'রে গেছে। এবার এদিকে দ্যাখ্—আইসল্যাণ্ডের এটা পশ্চিম উপকূলে। এটা হ'লো আইসল্যাণ্ডের রাজধানী রিজ্‌কিয়াভিক্। এই উপকূলে অগুন্তি পর্বতময় ঘাঁটি আছে। এইটে হ'লো পয়ষট্টি ডিগ্রি অক্ষাংশ। আর এটা হ'লো একটা ছোটো উপদ্বীপ। এবার এর বরাবর উপরে তাকিয়ে দ্যাখ্। বল দিকিন এটা কী?'

'সমুদ্রের কোল থেকে একটা পাহাড় উঠেছে।'

'এই পাহাড়টাই হ'লো স্নেফেল। এই পাহাড়ের চুড়ো পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। এই চুড়োর উপরে যখন স্কার্টারিস পর্বতচুড়োর ছায়া পড়বে, তখন পাওয়া যাবে পৃথিবীর অভ্যন্তরে যাবার পথ।'

'অসম্ভব! সে কী ক'রে হবে? এই আগ্নেয়গিরির মধ্যে হয়তো এখনো জ্বলন্ত আগুন, অঙ্গার, ছাই, ধাতু, লাভা—সবকিছুই আছে—'

মুখের কথা কেড়ে নিয়ে কাকামণি বললেন, 'পৃথিবীর বেশির ভাগ আগ্নেয়গিরিই তো এখন নিভে গেছে। এইটে যে যায়নি তা তুই কী ক'রে জানলি? বারোশো উনিশ সালে স্নেফেল শেষবার অগ্ন্যুদ্গার করেছিল। এরপর থেকে তো একদম চুপ ক'রে আছে।'

ব'লেই চললেন কাকামণি: 'সাকুন্যুউজম যে কতো হুঁশিয়ার হ'য়ে এ-কথা

banglabooks.in

লিখে গেছেন, তা তুই বুঝতে পারিসনি এখনো। আমাদের যাতে কোনো ভুল না হয়, সেজন্যে তাঁর কতো সতর্কতা, সেটা তুই খেয়াল করেছিস? স্নেফেলের অনেকগুলো জ্বালামুখ। যে-জ্বালামুখটা দিয়ে ঢুকলে একবারে পাতালে পৌঁছনো যায়, সেটা বোঝানোর জন্যেই জুলাই মাসের কথা উল্লেখ করেছেন উনি। জুলাই মাসের গোড়ার দিকে স্কার্টারিস পর্বতচুড়োর ছায়া ঠিক সেই নির্দিষ্ট মুখের উপর পড়ে। এটা উনি খুব ভালো ক'রে লক্ষ্য করেছিলেন ব'লেই লিখে গেছেন। এর পরও কি ওঁকে অবিশ্বাস করা চলে?'

'কিন্তু এমনও তো হ'তে পারে যে সাকনুসেমজম তাঁর দেশের চলতি প্রবাদ শুনেই এ-কথা লিখে গেছেন? আইসল্যাণ্ডের লোকেদের হয়তো ধারণা ছিলো যে এই পাহাড়ের মুখ দিয়ে একেবারে পৃথিবীর মধ্যখানে গিয়ে পৌঁছনো যায়। এমন প্রবাদ তো কতো দেশেই শুনতে পাওয়া যায়। এইটেও হয়তো তেমনি একটা কিছু।'

কাকামণি চ'টে উঠে বললেন, 'আর-কিছু বলবার আছে তোর?'

'আছে।' বললাম আমি। 'পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে যাওয়া অসম্ভব, বিজ্ঞান সে-কথা জোর গলায় বলে। বিজ্ঞান বলে যে, পৃথিবীর ভিতর অসহ্য উত্তাপ, যে-উত্তাপে কোনো প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। পৃথিবীর নিচে প্রতি সত্তর ফুট অন্তর এক ডিগ্রি ক'রে উত্তাপ বাড়ে। সেই হিশেবে পৃথিবীর ঠিক মধ্যখানের উত্তাপ দাঁড়ায় তিন লক্ষ ষাট হাজার বত্রিশ ডিগ্রির কাছাকাছি। সেখানটা গ্যাসে ভরা।'

'তাহ'লে তোর প্রধান আপত্তি হ'লো সাঙ্ঘাতিক উত্তাপ, তাই না?'

জোর গলায় বললাম, 'নিশ্চয়ই! বিজ্ঞান এ-কথাও বলে যে, পৃথিবীর ত্রিশ মাইল নিচু পর্যন্ত মাটি, বালি বা কাদা। তারপরেই জ্বলন্ত তরল পদার্থ।'

কাকামণি রাগ ক'রে ব'লে উঠলেন, 'খামোকা কি আর কথায় বলে—অল্পবিদ্যে ভয়ঙ্করী! পৃথিবীর নিচে কী হচ্ছে-না-হচ্ছে সে-কথা কেউই নিশ্চয় ক'রে বলতে পারে না, সবই আন্দাজের ব্যাপার। বিজ্ঞান তো এখনো রীতিমতো শিশু। সে আজ যে-কথা বলে, কালকেই তার উল্টো কথা বলে। তুই নিশ্চয়ই মস্ত বড়ো বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক পোঅঁসের নাম শুনেছিস। উনি কি বলেন নি যে, যদি পৃথিবীর নিচে তিন লক্ষ ষাট হাজার বত্রিশ ডিগ্রি উত্তাপ থাকতো, তবে ঐ ভয়ঙ্কর উত্তাপ ভিতরে বন্ধ ক'রে রাখবার ক্ষমতা উপরের এই ত্রিশ মাইল মাটির মোটেই থাকতো না—কবে ভেঙে-চুরে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যেত। আর শুধু

banglabooks.in

পোঅঁস নন, আরো অনেকেই সে-কথায় সায় দিয়েছেন। পৃথিবীর ভিতরে যে গ্যাস বা আগুন নেই, এ তো সবাই জানে। হাজার-হাজার বছর আগে যে-সব আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুদ্গার করতো, এখন তার বেশির ভাগই ম'রে গেছে। তার মানে কি এই নয় যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর ক্রমশ ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে! যাক—এ নিয়ে তোর সঙ্গে তর্ক ক'রে কোনো লাভ নেই। চাক্ষুষ প্রমাণ নিলেই সত্তি-মিথ্যে বোঝা যাবে। আঠারো শো পঁচিশ সালে স্যর হান্‌ফ্রি ডেভির সঙ্গে আমার তর্ক বেধেছিলো যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর এখনো তরল আছে কি না। শেষে মীমাংসা হ'লো যে তরল থাকতেই পারে না।'

'কোন্ যুক্তির উপর নির্ভর ক'রে তোমরা সিদ্ধান্ত করেছিলে?'

কাকামণি হেসে বললেন, 'এ তো খুব সহজ ব্যাপার। যা-কিছু তরল, তা-ই সমুদ্রজলের মতো চন্দ্রের আকর্ষণের পাল্লায় পড়ে। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ যদি তরল হ'তো তা'হলে নিশ্চয়ই দিনে দু-বার করে তা জোয়ারের মতো ফুলে-ফেঁপে উঠতো। তাতে নিয়মিত সময়ে দু-বার ক'রে ভূমিকম্প হ'তো দিনে।'

আমি আর কোনো যুক্তি খুঁজে না পেয়ে বললাম, 'কিন্তু পাতালে যাবে কী ক'রে? যা অন্ধকার—'

'কেন? টর্চ নেই?

শুকনো গলায় বললাম, 'তা'হলে পৃথিবীর অভ্যন্তরে গেলেও যাওয়া যেতে পারে?'

উত্তেজিত হ'য়ে কাকামণি বললেন, 'তার মানে? নিশ্চয়ই যাওয়া যাবে। নইলে এতক্ষণ ধ'রে তোকে কী আর বোঝালাম?'

আমি আর কোনো কথা না ব'লে নীরবে পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কাকামণির কথা শুনে মাথাটা ঝিম-ঝিম করলো। একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেড়িয়ে এলে ভালো লাগবে ব'লে মনে হ'লো। পথে বেরিয়ে লক্ষ্যহীনের মতো অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু মনে হ'লো যেন হ্যামবুর্গ শহরে একটুও হাওয়া নেই।

কাকামণির কথা শুনে বোঝা গেছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে না গিয়ে ছাড়বেন না কোনোমতেই। অথচ পাতালে যাওয়া যায় ব'লে আমার বিশ্বাস হ'তে চাইছিলো না। যতোই যুক্তি দেখান কাকামণি, পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিশ্চয়ই দিনরাত আগুন জ্বলছে। মানুষের পক্ষে কি আর সেখানে যাওয়া সম্ভব?

অনেকক্ষণ পর বাসায় ফিরে এসে দেখলাম, গ্রোবেন হোস্টেল থেকে ফিরে এসেছে কী উপলক্ষে দিন-দুয়েকের ছুটি পেয়েছে ব'লে। ওকে দেখতে পেয়ে

banglabooks.in

সবকিছু খুলে বললাম। ও খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'এ তো খুব গৌরবের কথা, অ্যাকজেল। ভয় কিসের? সম্ভব হ'লে আমিও তোমাদের সঙ্গে যেতাম। ইতিহাসে তোমাদের নাম সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। ভাবতেও তো আমার রীতিমতো হিংসে হচ্ছে!'

এ-কথার জবাবে আর কী বলতে পারি আমি? চুপচাপ নিজের ঘরে চ'লে এলাম। সারা রাতটা কাটলো পাগলের মতো নানান এলোমেলো চিন্তায়। ভোরের দিকে কখন ঘুম এসেছিলো জানি নে, ভাঙলো লোকজনের শোরগোলে। কাকামণি একলাই চেঁচামেচি ক'রে বাড়ি মাথায় ক'রে তুলেছেন।

হঠাৎ ঝড়ের মতো আমার ঘরে ঢুকলেন কাকামণি। তখনো শুয়ে আছি দেখে রেগে উঠলেন একেবার। 'শিগগির, শিগগির ওঠ্! চটপট জিনিশপত্র গুছিয়ে নে! আমার কাগজপত্রও সব নিস কিন্তু।'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে চিঁ-চিঁ ক'রে বললাম, 'সত্যিই তবে যাবো আমরা?'

'সত্যি না তো কি মিথ্যে? কালই তো আমরা রওনা হবো। তাড়াতাড়ি ওঠ তুই'—এই ব'লে আমাকে আরো হতভম্ব ক'রে দিয়ে কাকামণি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

খানিকক্ষণ বাদে সম্বিত ফিরলে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সেখানে তখন ভীষণ ব্যাপার। বাক্স, পোর্টম্যাণ্টো, দড়ির মই, গিঁঠদেয়া দড়ি, মশাল, বড়ো-বড়ো শিশি-বোতল, কুঠার, গাঁইতি—কতো কী ছড়ানো!

এমন সময় পিছন থেকে গ্রোবেন আমায় ডাক দিলে। বললে, 'অতো ভয় পাচ্ছো কেন তুমি? বাবার সঙ্গে এইমাত্র আমার আলোচনা হ'লো। যা বললেন তাতে বুঝলাম, যে-কাজে তোমরা নামছ, তা মোটেই অসম্ভব নয়। আমার মন বলছে, তোমরা সফল হবেই।'

গ্রোবেনের দৃঢ় গলা শুনে একটু জোর পেলাম মনে। ওকে সঙ্গে নিয়ে কাকামণির ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। 'আচ্ছা কাকামণি, যেতেই যদি হয়, তবে এতো তাড়াহুড়ো করবার দরকার কী? এখনও তো ঢের সময় হাতে আছে! এখনও তো মে মাসই শেষ হয়নি—'

'আইসল্যাণ্ড তো আর দু'দিনের পথ নয়'—বললেন কাকামণি—'জুনের শেষের দিকে আমাদের স্নেফেলের উপর উঠতে হবে। তারপর জুলাই মাসের গোড়ার দিকে—সে পয়লা জুলাইও হ'তে পারে, দোসরাও হ'তে পারে—আমাদের ক্রেটারের মধ্য দিয়ে নিচে নামতে হবে। এ ছাড়া এক্ষুনি কোপেন-

banglabooks.in

হেগেনের জাহাজের আপিস থেকে আইসল্যাণ্ডের টিকিট কাটতে হবে। কারণ, মাসে শুধু একবার কোপেনহেগেন থেকে জাহাজ ছাড়ে আইসল্যাণ্ডের দিকে। এ মাসে সে তারিখটা হ'লো বাইশে মে। কাজেই দেখ—হাতে মোটেই সময় নেই আমাদের।'

বললাম, 'কিন্তু বাইশে জুন জাহাজে চড়লেও তো চলে!'

'না, চলে না।' কাকামণি যেন একটু রেগে উঠলেন: 'তাতে প্রচুর দেরি হ'য়ে যাবে। কারণ, কখন যে স্কার্টারিস পর্বতচূড়োর ছায়া স্নেফেলের উপর পড়বে, তার কোনো ঠিক নেই। সেইজন্যে আমাদের সেখানে গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। তাই কোপেনহেগেনে যতো শিগগির পৌঁছুনো যায় ততোই ভালো।'

সুতরাং সারাদিন জিনিশপত্র গোছগাছ করতেই কাটল। সন্ধেবেলা কাকামণি জানালেন যে, পরদিন ভোর ছ'টায় আমরা রওনা হবো।

রাত দশটার সময়ে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু ঘুম কি আর সহজে আসে? রাত যতো গভীর হ'লো, ততোই ভয় করতে লাগলো। তন্দ্রার ঘোরে একটা দুঃস্বপ্নও দেখলাম। মনে হ'লো, যেন পৃথিবীর অভ্যন্তরে নেমেছি। নিরেট অন্ধকার। চলতে-চলতে এক সময় এক গোলাকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ আছাড় খেয়ে পড়েছি একটা বড়ো পাথরে, আর সঙ্গে-সঙ্গে সারা পৃথিবী ভেঙে পড়েছে আমার গায়ের উপর। সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম ভেঙে গেলো। ঘড়িতে তখন পাঁচটা বাজে।

হাত-মুখ ধুয়ে জামা-কাপড় প'রে নিচে নেমে দেখি কাকামণি প্রাতরাশে বসেছেন। আমাকেও তাড়াতাড়ি প্রাতরাশ ক'রে নিতে বললেন। এখুনি রওনা হ'তে হবে।

সাড়ে পাঁচটার সময় একটা গাড়ির শব্দ শোনা গেলো ফটকের সামনে। মাল-পত্র তোলা হ'লো গাড়িতে। গ্রোবেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি আর কাকামণি গাড়ির ভিতরে গিয়ে বসলাম। গাড়ি ছেড়ে দিলো। চলতে লাগলো স্টেশনের দিকে।

banglabooks.in

৩

আইসল্যাণ্ডে

কোপেনহেগেন শহরটা দেখতে ভারি সুন্দর। রাজপ্রাসাদটা কী বড়ো! চারধারে তার পরিখা। পরিখার উপরে একটা সেতু। ষোলো শতকে তৈরি হয়েছিলো।

আমরা কোপেনহেগেনে এসে পৌঁছেছিলাম বেলা দশটার সময়। স্টেশন থেকে সমস্ত মালপত্র ফিনিক্স হোটেলে পাঠিয়ে দিলেন কাকামণি। তারপর আমায় নিয়ে তখুনি চললেন মিউজিয়ামের দিকে।

সুন্দর শহরটা দেখতে-দেখতে চলেছি। এক্সচেঞ্জ আপিসের দালানের গম্বুজটা চমৎকার লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো যেন চারটে সোনালি ড্র্যাগনের ল্যাজ জড়িয়ে-জড়িয়ে তৈরি। কাকামণির চোখ কিন্তু সেদিকে পড়লো না। কিছু দূরে যে আকাশ-ছোঁয়া গির্জের চুড়ো দেখা গেলো, সেদিকে নিয়ে চললেন আমাকে।

গির্জের চুড়োটা এতো উঁচু যে, মনে হয় আকাশের মেঘ এসে ছুঁয়েছে ওর গা। গির্জের গা বেয়ে একটা ঘোরানো সিঁড়ি সেই উঁচু চুড়োকে লক্ষ্য ক'রে আকাশে উঠে গেছে।

কাকামণি যখন বললেন যে এই সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠা যাক, তখন সত্যি-সত্যিই আমি আঁৎকে উঠলাম। কিন্তু কাকামণি আমার কোনো কথায় কান দিলেন না। বললেন, 'উঁচু সিঁড়ি দিয়ে উঠতে হবে আমাদের। উঁচুতে ওঠা অভ্যেস করতে হবে তো!'

কোনো বারণ না শুনে কাকামণি আমায় নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন। যতোক্ষণ পর্যন্ত সিঁড়িটা ভিতর দিয়ে ঘুরে-ঘুরে উপরে উঠেছিলো ততক্ষণ বেশ সহজেই ওঠা গেলো। কিন্তু প্রায় দেড়শোটা সিঁড়ি ভেঙে ওঠবার পর খোলা জায়গায় এসে হাজির হলাম। এখান থেকে গির্জের গা বেয়ে সিঁড়ি গম্বুজের চুড়ো অবধি উঠে গেছে।

কোনোরকমে রেলিং ধরে-ধরে আস্তে-আস্তে উঠতে লাগলাম। এলোমেলো হাওয়া এসে ছুঁলো শরীর। তাতে আরো ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হ'তে লাগলো যেন হাওয়ায় গির্জেটা কাঁপছে, থর-থর ক'রে দুলছে গির্জের চুড়ো।

banglabooks.in

খানিকক্ষণ উঠেই মাথা ঘুরতে লাগলো। আর দাঁড়াতে পারলাম না, ধপ ক'রে সিঁড়ির উপরে ব'সে পড়লাম।

তারপরে কী ক'রে যে কাকামণির ধমক শুনতে-শুনতে চুড়োর মাথায় এলাম, তা আমি নিজেই জানি নে। কিন্তু চুড়োয় উঠেও নিস্তার নেই। কাকামণির নির্দেশ শোনা গেলো, 'এবারে বেশ সাহস ক'রে নিচের দিকে তাকা দিকিন! না, না, ভয় পেলে চলবে কী ক'রে? পাহাড়ের চুড়ো থেকে এমনি ক'রেই পাতাল-ছোঁয়া গহ্বরের দিকে তাকাতে হবে। এখন থেকে তা অভ্যেস ক'রে না নিলে চলবে কেন?'

ভয়ে-ভয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলাম, ঘর-বাড়ি সমস্তই যেন ধোঁয়ার চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে। পুতুলের দেশের মতো ছোটো-ছোটো ঘর-বাড়ি, পিঁপড়ের মতো সারি-সারি চলমান জনস্রোত। এতো উঁচুতে উঠেছি ব'লে মনে হ'তে লাগলো আকাশের মেঘের ভেলাগুলি স্থির নিষ্কম্প, গির্জের চুড়ো-সমেত আমিই বরং বোঁ-বোঁ ক'রে ঘুরছি। দূরে দিগন্তে তমালতালী-বনরাজিনীলা, অন্য দিকে ধারানিবদ্ধকলবণাম্বুরাশির কলঙ্করেখা। সবই যেন বন্-বন্ ক'রে লাট্টুর মতো ঘুরছে।

সারা শরীর শিরশির ক'রে উঠলো। ঝিমঝিম ক'রে উঠলো মাথা। কাঁপতে লাগলো পা-দুটি। কিন্তু তবু কাকামণির নির্দেশ-মতো পুরো একটি ঘণ্টা কাটাতে হ'লো ওখানে। যখন গির্জের চুড়ো থেকে নেমে এলাম, তখন দেখি পা-দুটি ব্যথায় টনটন করছে।

জাহাজ-আপিসে গিয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, আমাদের জাহাজ ছাড়তে আরো পাঁচদিন বাকি। ভেবেছিলাম এই পাঁচ দিন বেশ জিরোনো যাবে। কিন্তু কাকামণি নাছোড়বান্দা। এই পাঁচ দিনই আমাকে দিয়ে 'স্টেজ রিহার্স্যাল' দেওয়ালেন। পাঁচ দিনই আমাকে উঠতে হ'লো গির্জের চুড়োয়। সত্যি বলতে কি, এতে কাজও হয়েছিল—প্রথম দিনের চেয়ে পঞ্চম দিনে যে অনেক বেশি সাহস ও জোর পেয়েছিলাম, তা নিঃসন্দেহ।

পাঁচদিন পর ভলকিরিয়া জাহাজে উঠে কাকামণি রীতিমতো একটা কাণ্ড ক'রে ফেললেন; উল্লাসে অধীর হ'য়ে তিনি এতো জোরে জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে শেকহ্যাণ্ড করলেন যে ক্যাপ্টেনকে বেশ কয়েকদিন ধ'রে কব্জির ব্যথা অনুভব করতে হয়েছিলো। কাকামণির রকম-শকম দেখে ক্যাপ্টেন বেশ একটু আশ্চর্যও হয়েছিলেন। অবশ্য আমি এতে অবাক হইনি। আইসল্যাণ্ড যাওয়ার

banglabooks.in

আনন্দে কাকামণি যে এমনি একটা-কিছু করবেন, তা আমি আগেই আন্দাজ করতে পেরেছিলাম।

দশ-এগারো দিনের মধ্যেই আইসল্যাণ্ডের রাজধানী রিজকিয়াভিকে পৌঁছুনো গেলো। জেটি থেকেই আঙুল দিয়ে কাকামণি আমাকে স্নেফেল দেখালেন। বরফে মোড়া পাহাড়টির চুড়ো যেন আকাশের মেঘ ভেদ ক'রে কোন্ মহাশূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো।

আগেকার ব্যবস্থা-মতো রিজকিয়াভিকের বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক ফ্রিদিকসনের অতিথি হলাম আমরা। ফ্রিদিকসনের বাড়িতে কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর কাকামণি বেরোলেন লাইব্রেরির সন্ধানে, যদি দৈবাৎ সাকৃন্যুউজমের লেখা কোনো পুঁথি-টুথি পাওয়া যায়, তাই দেখতে। আর আমি বেরোলাম শহরটা ঘুরে বেড়াতে।

শহরটা ছোটো, মাত্র দু'টি রাজপথ। ভালো লাগলো না শহরটা। যতোদূর চোখ গেলো শুধু আগ্নেয়গিরির মেলা দেখা গেলো। হয়তো সেই কারণেই শহরটা আমার ভালো লাগলো না। কারণ, এখান থেকেই তো আমাদের রওনা হ'তে হবে পাতালের পথে।

অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে ক্লান্ত হ'য়ে বাড়ি ফিরলাম। বাসায় এসে দেখি দুই বৈজ্ঞানিকের মধ্যে জোর কথা চলছে। বলা বাহুল্য, কাকামণি যথেষ্ট সতর্ক হয়ে আমাদের আইসল্যাণ্ডে আসার উদ্দেশ্য গোপন রাখতে চেষ্টা করছেন।

কথায়-কথায় কাকামণি প্রশ্ন করলেন : 'আরন্ সাকৃন্যুউজমের কোনো বই কি আপনাদের লাইব্রেরিতে আছে ?'

গর্বের স্বরে ফ্রিদিকসন বললেন : 'যিনি যে-কোনো ধাতুকেই সোনা করতে পারতেন, ষোলো শতকের সেই অসাধারণ বিজ্ঞানীর কথা বলছেন তো ? আইসল্যাণ্ডের গৌরব উনি। এদেশের বিজ্ঞান আর সাহিত্যের সম্রাট। পৃথিবীর সর্বত্রই পুজো ওঁর।'

কাকামণি বললেন : 'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি তারই বই দেখতে চাইছি।'

ফ্রিদিকসন আফশোস করে বললেন : 'কিন্তু এখানে তো ওঁর কোনো বই পাবেন না। শুধু এখানে কেন, দুনিয়ার কোথাও পাবেন না। এটা কি কম দুঃখের কথা ? ম্লেচ্ছ, ধর্মবিদ্বেষী ব'লে পনেরো শো তিয়াত্তর সালে ওঁর যে লাঞ্ছনা হয়েছিল, সে-কথা ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আইসল্যাণ্ডের, তথা পৃথিবীর দুর্ভাগ্য যে সেই সময়েই ওঁর সব বই কোপেনহেগেনে পুড়িয়ে ফেলা

banglabooks.in

হয়েছিলো।'

আপন মনেই কাকামণি বললেন : 'হুঁ'! এখন বুঝতে পারছি কেন উনি হেঁয়ালির মধ্য দিয়ে অতো বড়ো আবিষ্কারটার কথা লিখে গেছেন।'

আর বুঝি কিছু গোপন থাকে না! এ-কথা শুনেই ফ্রিদিকসন অবাক গলায় শুধোলেন : 'হেঁয়ালি! আবিষ্কার!—তার মানে? আপনি কি ওঁর কোনো গুপ্তলিপি পেয়েছেন?'

কাকামণি কথা ঘুরোবার চেষ্টায় আমতা আমতা ক'রে বললেন : 'না, না। আমি পাবো কোথেকে? ও একটা অনুমান মাত্র!'

'ও, অনুমান! তাই বলুন!'

হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন যেন কাকামণি। বললেন, 'আইসল্যাণ্ডে আসতে আমার বোধকরি দেরি হ'য়ে গেলো। অনেকেই বোধহয় আগে এখানে এসে সব-কিছু দেখে-শুনে গেছেন।'

'তাতে কী হ'লো?' বললেন ফ্রিদিকসন : 'আইসল্যাণ্ড তো ভূতত্ত্বের দেশ। এখনো যে কতো কী দ্রষ্টব্য আছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এখানে যে কতো পাহাড়-পর্বত, আগ্নেয়গিরি, হিমশৈল আছে কে তার খোঁজ রাখে? বেশি দূরে যাওয়ারই বা কী দরকার? ঐ যে স্নেফেল পর্বত, ও-রকম আশ্চর্য আগ্নেয়গিরি দ্বিতীয় আর নেই দুনিয়ায়। তবু তো পাঁচশো বছর হ'লো নিভে গেছে।'

'তাই নাকি?' বিপুল আনন্দ চেপে কোনোরকমে কাকামণি বললেন : 'আমি তা'হলে ঐ স্নেফেলেই যাবো। কিন্তু কী ক'রে যাওয়া যায় বলুন তো?'

'স্থলপথে যেতে হবে আপনাকে।' বললেন ফ্রিদিকসন, 'পথ অবশ্য খুব সোজা, —সমুদ্রতীর ধরে নাক-বরাবর চ'লে গেলেই হ'লো।'

'কিন্তু এখানকার পথ-ঘাট তো জানিনে। একজন গাইড না হ'লে চলবে কী করে?'

'গাইডের জন্যে আর ভাববার কী আছে? একটি লোকের সঙ্গে আমার জানাশোনা আছে। ওকে বললে ও ঠিক নিয়ে যাবে। লোকটি খুব চালাক আর বিশ্বাসী।'

ফ্রিদিকসনকে ধন্যবাদ জানালেন কাকামণি। 'তা, লোকটির সঙ্গে এক্ষুনি আলাপ ক'রে নেয়া যাবে তো?'

'না, আজ আর ওকে পাওয়া যাবে না। কোথায় যেন কী-একটা কাজে গেছে। কাল ভোরে ফিরে আসবে। তখনই আলাপ ক'রে নেবেন'খন।'

banglabooks.in

বললেন ফ্রিদিকসন।

কাকামণি এইভাবে যে নিজের উদ্দেশ্যের কথা একটুও ফাঁস না ক'রে সমস্ত ব্যবস্থা ক'রে নিতে পারবেন, তা আমি আগে কল্পনাও করতে পারিনি।

৪

যাত্রা হ'লো শুরু

ঘুম ভাঙলো কাকামণির গলার শব্দে। তখন বেশ বেলা হ'য়ে গেছে। চোখে-মুখে এসে পড়েছে সূর্যের সোনালি আলো। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই শুনতে পেলাম কাকামণি কার সঙ্গে যেন ঝড়ের মতো কথা ব'লে চলেছেন।

কথা চলছিলো দিনেমার ভাষায়। যে-লোকটির সঙ্গে কথা হচ্ছিলো, তার চেহারা দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো,—যেমন লম্বা-চওড়া, তেমনি স্বাস্থ্যবান। একটুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, সে গম্ভীর এবং স্বল্পবাক—কাজের কথা ছাড়া একটিও বাজে কথা বলে না।

লোকটি আইসল্যাণ্ডের। চওড়া বুকের উপর আড়াআড়িভাবে দু'হাত রেখে চুপচাপ সে কাকামণির কথা শুনছিলো। নাম তার হান্‌স্ বিল্‌কে। আইসল্যাণ্ডের এমন জায়গা নেই যা সে ঘুরতে বাকি রেখেছে। সে-ই আমাদের পথ দেখিয়ে স্নেফেলে নিয়ে যাবে ব'লে ঠিক হ'লো। পারিশ্রমিকটাও প্রথমে ঠিক ক'রে নেয়া হ'লো। স্নেফেলের সানুদেশে স্ট্যাপি নামে যে ছোট্ট গ্রামটা আছে,—এখান থেকে একশো চুরাশি মাইল দূরে,—সেই পর্যন্তই সে আমাদের সঙ্গে যাবে বলে কথা হ'লো।

ফ্রিদিকসন আমাদের জন্য চারটে ঘোড়ার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলেন। একটি কাকামণির জন্যে, একটি আমার আর বাকি দুটি মালপত্র ব'য়ে নিয়ে যাবে। হান্‌স্ বরাবর হেঁটেই যাবে।

পথ-ঘাট হান্‌সের নখদর্পণে। এই পথে সে যে কতোবার যাওয়া আসা করেছে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। এ-কথা শুনে কাকামণি তার সঙ্গে নতুন একটা বন্দোবস্ত ক'রে নিলেন। আগেকার ব্যবস্থামতো সে যে শুধু স্ট্যাপি পর্যন্তই যাবে তা নয়, কাকামণি তাঁর বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে যতোদূর যাবেন,

banglabooks.in

হান্‌স্‌কেও সঙ্গে-সঙ্গে ততোদূর যেতে হবে। পারিশ্রমিক ঠিক হ'লো সপ্তাহে বারো শিলিং ক'রে। হান্‌স্ শুধু এইটুকুই বললে যে, আমাদের যা-ই ঘটুক না কেন, প্রতি শনিবার যদি তার সাতদিনের মাইনে চুকিয়ে দেয়া না হয়, তবে সে তক্ষুনি চাকরি ছেড়ে দেবে।

আমাদের রওনা হওয়ার সময় হ'য়ে এলো। জিনিশপত্র সব গুছিয়ে নেয়া হ'লো—গাঁইতি, কুঠার, রেশমের দড়ি, দড়ির সিঁড়ি, হাতুড়ি, পেরেক, যন্ত্রপাতি, এমন কি ফার্স্ট এডের সরঞ্জাম পর্যন্ত। গুলি-বারুদ থেকে শুরু ক'রে কাকামণির দেশলাই, চুরুট কিছুই বাদ গেলো না। টাকাকড়ি কতো আছে কাকামণি তা একবার হিশেব ক'রে নিলেন। কয়েক জোড়া খুব ভালো রবারের জুতো, আর ছ'মাসের উপযোগী রসদও সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করা হ'লো।

ষোলোই জুন আজ। আকাশ মেঘলা থাকলেও বৃষ্টির নাম-গন্ধ নেই। কী-রকম বিষণ্ণ একটা দিন যেন। ঘোড়ার পিঠে মালপত্র চাপিয়ে দিয়ে আমরা রওনা হ'য়ে পড়লাম।

আস্তে-আস্তে রিজকিয়াভিক ছাড়িয়ে এলাম আমরা। সমুদ্রতীর ধ'রে সামনের দিকে চলতে লাগলাম।

সমুদ্রের ধারে মাঝে-মাঝে পাহাড় ছিলো ব'লে কখনো-কখনো আমাদের একটু ঘুরে যেতে হচ্ছিলো।

যেতে যেতে কাকামণি আইসল্যাণ্ডের ঘোড়া সম্পর্কে একটা লম্বাচওড়া বক্তৃতাও দিয়ে ফেললেন। এখানকার ঘোড়ার মতো এমন সুন্দর ঘোড়া নাকি পৃথিবীতে আর কোথাও নেই। যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি পরিশ্রমী। পথ চলতে গিয়ে কোনো বাধাই এরা মানে না। বরফ পড়ুক, তুফান উঠুক, পাহাড়-পর্বত নদী-নালা যা-কিছু সামনে পড়ুক, কিছুতেই এরা দমবার পাত্র নয়, সব কিছু অবলীলাক্রমে অতিক্রম ক'রে চ'লে যেতে পারে, ইত্যাদি-ইত্যাদি।

বেচারি হান্‌স্ প্রত্যেক দিন অতো মাইল ক'রে হাঁটবে কী ক'রে, সে-কথা আমি কাকামণিকে একবার মনে করিয়ে দিতেই কাকামণি বললেন, 'ওর কথা ভাবিসনে। ও আমাদের চেয়ে আরো ভালো চ'লে যাবে হেঁটে। সহজে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ার লোক ও নয়। আর যদি কখনো ক্লান্তই হ'য়ে পড়ে, তখন না-হয় আমার ঘোড়ায় এসে উঠবে। একটানা ঘোড়ায় চ'ড়ে যেতে আমারও তো আর খুব ভালো লাগবে না!'

একটা নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছিলাম আমরা।

banglabooks.in

জায়গাটা মরুভূমির মতো পরিত্যক্ত। ক্বচিৎ কোথাও এক-আধটা ভাঙাচোরা ঘর-বাড়ি দেখা যাচ্ছিল।

ঘণ্টা-দুয়েক বাদে প্রাতরাশ সেরে আবার আমরা চলতে লাগলাম। এবার পথ গেছে পাহাড়ের উপর দিয়ে। ভারি বিচ্ছিরি পথ। কবে কোন্ অতীতে আগ্নেয়গিরির লাভা এখানে এসে পড়েছিল,—এখন তা' ক্রমে কঠিন হ'য়ে গেছে। অসমতল, ঢেউখেলানো রাস্তা দেখে সহজেই তা' বোঝা যায়।

ক্রমশ বেলা বাড়তে লাগলো। একটানা চ'লে চারটের সময় হিশেব ক'রে দেখা গেলো সবশুদ্ধ চব্বিশ মাইল পথ পেরোনো গেছে। এবার পথে একটা পার্বত্য নদী পড়লো। চওড়ায় নেহাৎ কম ছিলো না নদীটা। তার দুই তীরে খাড়া পাথর মাথা তুলেছে শূন্যে। নদীর মাঝখানেও বড়ো-বড়ো পাথরের টুকরো ছড়িয়ে পড়ে ছিলো। সেইজন্যে সেইসব পাথরের মধ্য দিয়ে যেতে হয় ব'লে ভীষণ স্রোত দেখা গেলো।

স্রোতের উদ্দামতা দেখে জলে নামতে সাহস হ'লো না আমার। কাকামণির মনে কিন্তু একটুও ভয়-ডর দেখা গেলো না। বরং বললেন: 'এইসব পার্বত্য নদীতে স্রোত ভীষণ হ'লেও জল সাধারণত কমই থাকে। সুতরাং ভয় কিসের?' এই ব'লে ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষালেন কাকামণি। আইসল্যাণ্ডের অশ্বতরের যে প্রাণের মায়া আছে, এবার তা ভালো ক'রেই বোঝা গেলো। দু-পা এগিয়েই মাথা নিচু ক'রে সে জল শুঁকতে লাগলো, আর একটুও নড়ানো গেলো না ওকে। ঘোড়ার এই বেয়াড়ারকম বেয়াদবি সহ্য হ'লো না কাকামণির। একধার থেকে চাবুক মারতে শুরু করলেন। কিন্তু তবু ঘোড়া একটুও নড়লো না। মাথা ঝাঁকাতে লাগলো শুধু।

ব্যাপার-স্যাপার দেখে কাকামণি দস্তুরমতো রেগে উঠলেন। ধমক দিতে শুরু করলেন ঘোড়াকে। তখন শ্রীমান অশ্বতর নিরুপায় হ'য়ে পেছনের পা দুটি মুড়ে নিচু হ'য়ে কাকামণির পায়ের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এলো। কাকামণি তো হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমি হাসবো কি কাঁদবো বুঝতে পারলাম না।

তখন হান্‌স্ আমাদের বুঝিয়ে বললো: এখন জোয়ারের সময়। হাজার চেষ্টা করলেও এখন ও-নদী কোনোমতেই পেরোনো যাবে না। ভাঁটার সময় জল কমলে ভেলায় ক'রে নদী পেরোতে হবে।

আর কোনো উপায় নেই দেখে অপেক্ষা করাই সাব্যস্ত করলেন কাকামণি। হান্‌স্ ইতিমধ্যে পাশের একটি গ্রাম থেকে দু'টি লোক এবং প্রচুর কাঠ ও বাঁশ

banglabooks.in

নিয়ে এসে ঐ লোকদুটির সাহায্যে মজবুত একটা ভেলা তৈরি করলো।

বিকেল ছ'টার সময়ে সেই ভেলায় ক'রে আমরা নদী পেরোলাম। বলা নিষ্প্রয়োজন, ঘোড়াগুলিকেও এইভাবেই পার ক'রে নেয়া হ'লো। তারপর আবার সামনের দিকে এগোনো শুরু হ'লো।

রাত তখন আটটা কি সাড়ে-আটটা। রাত অবশ্য ঘড়ির কথায়, আসলে রাতের কোনো চিহ্নই নেই, দিনের আলো চারিদিকে ছড়িয়ে আছে। আইসল্যাণ্ডের মতো দেশে জুন ও জুলাই মাসে সূর্যাস্ত বলতে গেলে হয়ই না,—রাত বারোটার সময়েও দিনের মতোই দেখায়।

শীতটা কিন্তু এর মধ্যেই একটু বেশিরকমই প'ড়ে গিয়েছিলো। খিদেও পেয়েছিল সাংঘাতিক রকম। এমন সময় কাছেই একটা চাষীর বাড়ি দেখতে পেয়ে মন উল্লাসে নেচে উঠলো। তা-ই তখন আমার কাছে রীতিমতো রাজ-প্রাসাদ। গৃহস্বামী তো আদরে আপ্যায়নে আমাদের একেবারে উদ্ব্যস্ত করে তুললো প্রায়। রাতটা সেখানে খুব ভালোই কাটলো।

পরদিন ভোর পাঁচটার সময়ে সেই চাষী-পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা আবার বেরিয়ে পড়লাম। এখন থেকে পথ আরো খারাপ। দক্ষিণ দিকে অন্তহীন পাহাড়ের সারি ঠিক মেঘের মতো দেখাচ্ছিলো। পথ তো একেবারে নির্জন। কোনো জন-প্রাণীরই সাক্ষাৎ পাওয়া গেলো না পথে। সন্ধের সময় আরেকটা ছোটো নদী পেরিয়ে নির্জন প্রান্তরের একটি জনহীন পোড়ো বাড়িতে রাতটা কাটানো গেলো।

পরদিনও নির্জন প্রান্তরের মধ্য দিয়ে এগোনো চলল। মরুভূমির মতো পরিত্যক্ত যেন পথ-ঘাট। আমার কিন্তু মোটেই ভালো লাগছিলো না। রাত্রি-বেলা ক্রস্‌লব্‌ নামে একটা গ্রামে এসে পৌঁছলাম আমরা। কাকামণি হিশেব ক'রে জানালেন যে প্রায় অর্ধেক পথ আমরা অতিক্রম করেছি।

উনিশে জুন আমরা কঠিন লাভার এবড়ো-খেবড়ো পথ দিয়ে চললাম। মধ্যে-মধ্যে দেখতে পেলাম উষ্ণ প্রস্রবণের বাষ্পধারা। কোথাও নুড়ি-পাথরে বোঝাই, কোথাও-বা পঙ্কিল জলাভূমি, আবার কোনোখানে ঝিলের জলে সূর্যের সোনা রোদ্দুর। দূরে স্নেফেলের চুড়োগুলি শাদা মেঘের মতো দেখাচ্ছিলো।

পর-পর কয়েকদিন একটানা ঘোড়ায় চড়ে যেতে-যেতে আমি ভীষণ ক্লান্ত হ'য়ে পড়লাম। কাকামণির কিন্তু এখনো উৎসাহের কমতি নেই। হান্‌সের মুখ দেখে অবশ্য তার মনের অবস্থা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

banglabooks.in

বিশে জুন সন্ধ্যাবেলায় বুদির নামে একটা গ্রামে এসে হাজির হলাম। গ্রামটি একেবারে সমুদ্রের কোল ঘেঁসে। এখানেই হান্‌সের বাড়ি। রাত্তিরে তার বাড়িতেই ওঠা গেলো। হান্‌সের বুড়ো বাবা আমাদের সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। আজ হান্‌সের সাত দিনের মাইনে চুকিয়ে দিলেন কাকামণি।

একুশে জুন ভোরবেলাতেই আবার তাড়াহুড়ো ক'রে যাত্রা শুরু করা হ'লো। স্নেফেল আর বেশিদূর নয়। পৌঁছে গেছি বললেও চলে। স্নেফেলের পূর্বাভাস হিসেবে পথ এবার তাই গ্র্যানাইট পাথরে ছাওয়া। কয়েক ঘণ্টা পরই স্নেফেলের আকাশ-ছোঁয়া বিরাট শরীর চোখে পড়লো। পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে চলা আরম্ভ হ'লো এবার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলেছি—কিন্তু স্নেফেলের সঙ্গে ব্যবধান যেন আর কমতেই চায় না। কাকামণি তো একদৃষ্টে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে আছেন, আর মাঝে-মাঝে ডন কুইকজোটের মতো মুঠো উঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছেন : 'যে ক'রেই হোক ঐ দৈত্যটাকে আমাদের জয় করতেই হবে !'

পুরো চার ঘণ্টা চলবার পর স্নেফেলের সানুদেশের গণ্ডগ্রাম স্ট্যাপিতে পৌঁছনো গেলো। ছোট্টো গ্রাম। মোটে ত্রিশটি ঘর। ঘরগুলো আবার লাভা দিয়ে তৈরি। গ্রামের সর্বত্রই হলুদ রঙের ব্যাসাল্ট পাথর স্তূপাকারে ছড়ানো।

স্ট্যাপিতে পৌঁছে আমার কেমন যেন ভয় করতে লাগলো। এবার সত্যি-সত্যিই স্নেফেলের মধ্য দিয়ে নামতে হবে পাতালের দিকে ? একবার পাতালে নামলে যে আর ফিরে আসা সম্ভব হবে না, সে-সম্বন্ধে আমি একরকম নিশ্চিতই ছিলাম। সেইজন্যেই মন কেমন করতে লাগলো শুধু।

হান্‌স্‌কে আমাদের আসল উদ্দেশ্যটা খুলে বললাম। আশ্চর্য ! ওর কি একটুও ভয়-ডর নেই ? তবে কি হান্‌স্‌ও কাকামণির মতো পাগল হ'য়ে গেছে ? একটুও ভীত বা অবাক না হ'য়ে সে শেষ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজি হ'লো। বুঝতে পারলাম, রেহাই নেই এবারে। হ্যামবুর্গে জোর ক'রে বোঝালে কাকামণি হয়তো না-ও আসতে পারতেন, কিন্তু স্নেফেলের নিচে দাঁড়িয়ে ওঁকে এ-কাজ থেকে নিবৃত্ত করা অসম্ভব। পাহাড়ে তো অনেকেই ওঠে। অগ্নিগিরির ক্রেটারও পরীক্ষা করে দেখে অনেকে। কিন্তু ঐ ক্রেটারের মধ্য দিয়ে একেবারে পৃথিবীর অভ্যন্তরে নেমে পড়া ?—ভাবলেও শিউরে ওঠে শরীর।

একটা প্রশ্ন বার-বার আমার মনের মধ্যে উঁকি মারছিলো। সাকৃন্যুউজমের কথা কি সত্যি ? সত্যিই কি ক্রেটারের মধ্য দিয়ে একদম পৃথিবীর মধ্যখানে

banglabooks.in

গিয়ে পৌঁছনো যাবে ? ধরা গেলো যাওয়া যায়। কিন্তু সেই অন্ধকার পাতালের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলাটা তো বিচিত্র নয়। তারপর, হয়তো ভিতরে নেমেছি, এমন সময়ে সাতশো বছরের ঘুম ভেঙে জাগলো আগ্নেয়গিরি, তখন ? তখন কী হবে ?

তেইশে জুন তারিখে হান্‌স্ দুজন লোক ঠিক ক'রলো। লোকদু'টি আমাদের মালপত্র নিয়ে পাহাড়ের উপর পর্যন্ত যাবে। কাঁধে বন্দুক নিয়ে, সঙ্গে পাহাড়ে ওঠার লোহা-বাঁধানো লাঠি নিয়ে আমরা তৈরি হ'য়ে নিলাম। হান্‌স্ বুদ্ধিমানের মতো এক বোতল জল নিলো সঙ্গে। এই জলে আট দিন চ'লে যাবে আমাদের। সকাল ন'টার সময় স্ট্যাপির লোকজনদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমরা স্নেফেলে উঠতে শুরু করলাম।

স্নেফেলের উচ্চতা পাঁচ হাজার ফুট। প্রকাণ্ড দু'টি চুড়ো তার। রিজকিয়াভিক থেকেও এই চুড়োদু'টি মেঘের মতো দেখা গিয়েছিলো। এখন কাছ থেকে দেখে মনে হ'লো, বরফ-মোড়া চুড়োদু'টি আকাশের নীল রঙ ছুঁয়েছে।

নীরবে আমাদের আরোহণের পালা চললো। পথ এত সরু যে একসঙ্গে একজনের বেশি ওঠা যায় না। হান্‌স্ যাচ্ছিলো আগে-আগে পথ দেখিয়ে। পেছনে আমরা। চারপাশে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে খনির আকর। জিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের মতে বরফের মধ্যে পাথর ও খনিজ আকর নেই। ভূতাত্ত্বিকদের মতে, আইসল্যাণ্ড আগে ছিলো সমুদ্রের তলায়, ভূমিকম্পের দরুন জলের অতল থেকে মাথা তুলেছে শূন্যে। তাই বলে অন্যান্য দেশের মতো পলিমাটির চাদর এখানে নেই, ভূ-ত্বক লাভায় ঢাকা। এখনো যে আইসল্যাণ্ডের মাটির নিচে ভীষণ রকম আগ্নেয় আলোড়ন চলেছে, আশপাশের পর্বতের ফাটল দিয়ে উষ্ণ বাষ্প বেরোতে দেখে তা সহজেই বোঝা যায়।

আমাদের পথ বড়ো-বড়ো পাথরে সাজানো। থাকগুলো লাভায় মোড়া। পথ ক্রমশই বিপদসঙ্কুল হ'য়ে উঠলো। একেবারে খাড়াই। খুব সাবধানে লাঠি ঠুকে-ঠুকে পা টিপে-টিপে উপরে উঠতে লাগলাম। খুব কষ্ট হচ্ছিলো উঠতে। হান্‌স্ কিন্তু দ্রুতপায়ে বেশ সাবলীল গতিতেই চলেছে। আমরা সবাই পিছিয়ে পড়ি ব'লে একটু দূর গিয়েই ওকে আমাদের জন্যে থামতে হচ্ছিলো। তখনো সত্যিকার পাহাড়ে চড়ার পালা শুরু হয়নি। সেটা শুরু হ'লো আরও ঘণ্টা-তিনেক পরে। ভাগ্যিস হান্‌সের কথামতো মধ্যে একটু জিরিয়ে প্রাতরাশ

banglabooks.in

ক'রে নিয়েছিলাম, নইলে আর এক পা-ও এগোতে পারতাম না।

খাড়াই বেয়ে-বেয়ে যতোই আমরা উঠতে লাগলাম, পথও যেন ততোই বেড়ে চললো। ফুরোতেই চায় না কোনোমতে। মাটির চিহ্নমাত্র নেই কোনো-খানে। শুধু পাথর আর পাথর। পায়ের ধাক্কায় কতো ছোটোখাটো পাথর যে নিচে গড়িয়ে পড়লো তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এক-এক জায়গায় পথ এতো খাড়াই যে হান্‌স্‌ কোনোরকমে আমাদের লাঠির সাহায্যে টেনে তুললো। কাকামণিও আমাকে অনেকবার হাত ধরে টেনে তুললেন।

ভাগ্যিস অনেকক্ষণ ওঠার পরে আবার লাভার তৈরি পাথরের সিঁড়ির মতো সারি সারি থাকের নাগাল পাওয়া গিয়েছিল, নইলে আমার দ্বারা আর ওঠা হ'তো না।

সন্ধে সাতটার সময়ে হাজার-দুই সিঁড়ি পেরিয়ে একটি প্রশস্ত চত্বরের মতো জায়গায় এসে পৌঁছলাম। তাকিয়ে দেখি, দূরে—বহু দূরে, চার হাজার ফুট নিচে সমুদ্রের ঘন নীল রঙ। এইখানে অল্প একটু জিরিয়ে নিয়ে আবার আমরা উঠতে লাগলাম।

রাত বারোটার সময়ে চূড়োয় এসে পৌঁছলাম আমরা। মধ্যরাত্রির সূর্যালোকে চারিদিক তখন আলোয় আলোকিত।

খিদেয় ঠাণ্ডায় তখন প্রাণ যেন প্রায় গলার কাছে এসে পৌঁছেছিলো। তবুও মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলাম মধ্যরাত্রির অপরূপ আলো। চারদিকে বরফের শাদা, মাথার উপরে পরিচ্ছন্ন আকাশের নীল রঙ, দূরে মধ্যরাত্রির সূর্যের উজ্জ্বল সোনালি।

আর সারা পৃথিবী তখন ঘুমের অথই তলায় অচেতন হ'য়ে প'ড়ে।

৫

আইসল্যাণ্ডের সেই বৈজ্ঞানিক

তাড়াতাড়ি সামান্য কিছু গলাধঃকরণ ক'রে সমুদ্র থেকে পাঁচ হাজার ফুট উপরে স্নেফেলের চূড়োয় পাথরের উপরে গা এলিয়ে দিলাম আমরা। সঙ্গে-সঙ্গেই চোখের পাতায় নেমে এলো একঝাঁক ঘুম। এমন গাঢ় ঘুম আমার অনেকদিন

banglabooks.in

হয়নি। জেগে উঠে দেখি বেলা প্রায় দুপুর।

দিগন্তের অন্যান্য পাহাড়ের চুড়োগুলিকে ছোটো-ছোটো প্রাচীরের মতো দেখালো। নদীগুলো যেন সরু সুতো। দক্ষিণ দিকের বরফ-ছাওয়া ভূমির উপরে রোদের রঙ ঝলমল করছে। পশ্চিম দিকে সমুদ্রের গাঢ় নীল রঙ। সবকিছুই দেখতে অপূর্ব লাগছিলো।

এমন সময়ে কাকামণি আর হান্‌স্‌ আমার সামনে এসে দাঁড়ালো। ওরা দুজনে সেই লোকদুটিকে বিদায় দিতে গিয়েছিলো। কাকামণি এসে পশ্চিম দিকে কুয়াশার মতো কী যেন একটা আঙুল দিয়ে দেখালেন। বললেন: 'ঐ দ্যাখ্‌ গ্রীনল্যাণ্ড!'

অবাক হয়ে বললাম: 'গ্রীনল্যাণ্ড!'

'গ্রীনল্যাণ্ড তো এখান থেকে খুব বেশি দূর নয়। শ'খানেক মাইল দূরে মাত্র। যাক সেকথা।···আমরা এখন স্নেফেলের উপরে। দুটি চুড়োও দেখতে পাচ্ছি। একটা তো এইটে—যেটার উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, অন্যটা ঐ যে। কোনটার কী নাম, সেটা এখন জানা দরকার।' হান্‌সের দিকে তাকালেন কাকামণি: 'আচ্ছা হান্‌স্‌, আমরা যে চুড়োটার উপর' দাঁড়িয়ে আছি, এটার নাম কী?'

হান্‌স্‌ উত্তর করলে: 'স্কার্টারিস।'

আনন্দে কাকামণি অধীর হয়ে উঠলেন। 'তবে আর দেরি কিসের! এক্ষুনিই তো নামা যেতে পারে!'

আমার বুক একবার ভয়ে কেঁপে উঠলো। কিন্তু এখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। হান্‌স্‌কে কিন্তু একটুও বিচলিত দেখালো না। সে সহজভাবেই আমাদের ক্রেটারের দিকে নিয়ে চললো। আমি মুখ অন্ধকার ক'রে চুপচাপ ওদের পিছন-পিছন চললাম।

স্নেফেলের প্রধান ক্রেটারের মুখটা মাইলখানেক চওড়া। গভীরতা কম ক'রেও দু'হাজার ফুটের বেশি। পাগল না হ'লে মানুষ কখনো এমন সাংঘাতিক চিমনির মধ্যে নামবার কল্পনা করতে পারে? মুখের কাছ থেকে একটা রাস্তা অনেকদূর পর্যন্ত নিচে নেমে গেছে। হান্‌স্‌কে অনুসরণ ক'রে সেই রাস্তা ধ'রে আমাদের অবতরণ শুরু হ'লো। ঠিক দুপুরবেলায় আমরা একটা চাতালের মতো প্রশস্ত জায়গায় এসে হাজির হলাম। সেখান থেকে দেখা গেলো, আগ্নেয়গিরির তিনটি জ্বালামুখ সর্বনাশের আভাস নিয়ে অন্ধকার মুখকে বিস্ফারিত ক'রে আছে। এক-

banglabooks.in

একটি মুখের পরিধি প্রায় একশো ফুট ক'রে। স্নেফেল যেন আমাদের গ্রাস করবার জন্যেই এই গহ্বর তিনটে তৈরি করেছে। আমার এতো ভয় করলো, যে গহ্বরগুলোর কাছে গিয়ে নিচের দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস হ'লো না।

কাকামণি তখন পাগলের মতো ছুটে-ছুটে মুখগুলো দেখছেন, আর আপন-মনে কত-কী ব'কে চলেছেন। তাঁর রকম-সকম দেখে এই প্রথম হান্‌স্‌কে পর্যন্ত একটু অবাক দেখালো, সে আশ্চর্য হ'য়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো তাঁর কাণ্ড।

হঠাৎ কাকামণি তীব্র গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন। সেই তীব্র কণ্ঠস্বরে চারপাশ গমগম ক'রে উঠলো। আমি তো হঠাৎ এমন চ্যাঁচানো শুনে মনে করলাম, কাকামণি বুঝি-বা সেই তলহীন গহ্বরের মধ্যেই প'ড়ে গেছেন! তাকিয়ে দেখি, বড়ো একটা পাথরের সামনে গোল-গোল চোখে দাঁড়িয়ে আছেন উনি।

কাকামণির চোখে-মুখে এমন বিস্ময় দেখে আমি নিজেই অবাক হ'য়ে গেলুম। তাড়াতাড়ি পাশে এসে দাঁড়াতেই কাকামণি আঙুল দিয়ে দেখালেন, সেই পাথরটার উপর কতকগুলি রুনিক হরফ খোদাই করা। কোনো-কোনো জায়গায় ক্ষয়ে গেলেও কোনোমতে পড়া গেলো। পাথরটার গায়ে লেখা: আর্‌ন্‌ সাক্‌নুস্যুউজম্‌।

৬

আর্‌ন্‌ সাক্‌নুস্যুউজম্‌

আর্‌ন্‌ সাক্‌নুস্যুউজম্‌! বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

এবারে আর কাকামণির সিদ্ধান্তকে অহেতুক ব'লে উড়িয়ে দেয়া চলবে না। তাঁর এতো কাণ্ড, এতো আয়োজন, এতো সমারোহকে নিছক পাগলামি ব'লে আর উড়িয়ে দেবার জো নেই। অসমসাহসী আর্‌ন্‌ সাক্‌নুস্যুউজম—আইসল্যাণ্ডের সেই বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক—এখানকারই কোনো একটি গহ্বর দিয়েই যে পাতালে নেমেছিলেন, এই লেখা তারই প্রমাণ বহন করছে।

কাকামণি হেসে বললেন: 'কী রে? আরো প্রমাণ চাই নাকি তোর?'

banglabooks.in

'না, এমন অব্যর্থ ও অকাট্য প্রমাণের পরে আর কোনো কথাই বলা চলে না।' অসহায়ভাবে আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আস্তে-আস্তে সন্ধে হয়ে এল। এই গহ্বর তিনটের পাশে, এই চত্বরের মধ্যেই রাত্রিবাস করতে হবে আমাদের। সারাদিনের পরিশ্রমে সারা শরীর ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো। পা-দুটি ব্যথায় টন্‌টন্ করছিলো। এইটুকু পথ নামতে তো আর কম কষ্ট করতে হয়নি!

হান্‌স্ খুঁজে-পেতে একটু সমতল জায়গা বের ক'রে বিছানা পাতার বন্দোবস্ত করলে। জায়গাটা কঠিন লাভার প্রলেপ-মোড়া। লাভার সেই পুরু প্রলেপের উপর গরম চাদর পেতে আমি আর হান্‌স্ শুয়ে পড়লাম। কাকামণি কিন্তু আলো জ্বেলে চারদিক পরীক্ষা করতে লাগলেন, কখনো বা ইতস্তত ছুটোছুটি করতে লাগলেন আশে-পাশে। তারপর এক সময়ে আমাদের ঘুমিয়ে নিতে ব'লে আলো নিয়ে চারদিক টহল দিয়ে আসতে গেলেন।

একটু পরে হান্‌সের দিকে তাকিয়ে দেখি, নির্বিকারভাবে সে ঘুমিয়ে রয়েছে। আমার কিন্তু ঘুম আসছিলো না। শ্রান্তিতে শরীর এলিয়ে প'ড়ে রইলাম শুধু। আর দুর্ভাবনায় ভরে উঠলো মন।

কাকামণি কোথায় যে অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন, কে জানে? এখনো আলো নিয়ে ফিরে আসছেন না কেন? হান্‌স্ তো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমি চোখ মেলে প'ড়ে আছি! হঠাৎ কেমন যেন ভয়-ভয় করতে লাগলো। মনে হ'লো, অন্ধকারের মধ্যে যেন অসংখ্য অশরীরী আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেইসব আত্মার উৎপত্তি যেন পাতালের অন্ধকারে।

এমনি গাঢ় ভয়ের মধ্যে কখন যে ঘুমে দু'চোখ জড়িয়ে এসেছিলো জানিনে! ঘুম ভাঙলো একেবারে সকাল বেলায়। ঘুম ভাঙতেই দেখি কাকামণি মুখখানা অন্ধকার ক'রে ব'সে আছেন। প্রথমটা তাঁর রাগের কারণ বুঝতে পারলাম না, পরে অবশ্য বোঝা গেলো।

আকাশ মেঘলা হয়ে আছে ব'লেই কাকামণির এই অসহায় ভাব। সঙ্কেত-লিপিতে ছিল, জুলাই মাসের গোড়ার দিকে স্কার্টারিসের ছায়া যে-জ্বালামুখের ওপরে পড়বে, সেই পথ দিয়েই নামতে হবে পাতালে। কিন্তু আকাশ মেঘলা ব'লে স্কার্টারিসের কোনো ছায়াই পড়লো না। আর কাকামণির রাগের কারণ হ'ল তাই। যদি জুলাই মাসের গোড়ার দিকে সূর্যের সাক্ষাৎ না মেলে তবে আরো এক বছরের জন্য যাত্রা বন্ধ থাকবে।

banglabooks.in

সে কী রাগ কাকামণির ! সূর্যকে কতোবার যে ধমক দিলেন, অভিশাপ দিলেন, তার কোনো ইয়ত্তাই নেই। সারা দিনে একবারও সূর্যের দেখা পাওয়া গেল না। এক হিসেবে অবশ্য ভালোই হ'লো। একটানা পরিশ্রমের পর এই ছুটিটা বেশ উপভোগ করা গেলো আয়েশ ক'রে শুয়ে-শুয়ে।

পর-পর তিন দিন আকাশ এতো মেঘলা হ'য়ে রইলো যে, রোদের নাম-গন্ধও দেখা গেলো না। কাকামণির রাগের পরিমাণও ক্রমে বেড়েই চললো। কিন্তু চৌঠা জুলাই সানন্দে কাকামণি সুপ্রভাতকে স্বাগত জানালেন। সূর্যের সোনালি রোদে সকালবেলাতেই চারিদিক ঝলমল ক'রে উঠলো। আস্তে-আস্তে দুপুর হ'লো। সঙ্গে-সঙ্গে রোদের রঙও উজ্জ্বল হ'তে লাগলো আরো। তারপর এক সময়ে স্কার্টারিসের ছায়া ক্রমশ স'রে এসে পড়লো একটি জ্বালামুখের উপর।

সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে কাকামণি সেই বুড়ো বয়সেই দস্তুরমতো নৃত্য শুরু ক'রে দিলেন। চ্যাঁচামেচি ক'রে আমাদের প্রস্তুত হ'তে বললেন। পৃথিবীর অন্দর-মহলে রওনা হ'তে হবে এবার। সে কি খুব সহজ কথা ?

হান্‌স্‌ যেন প্রস্তুত হ'য়েই ছিলো। উঠে দাঁড়িয়ে পা বাড়ালো সে। বলল : 'চলুন।'

তখন বেলা একটা বেজেছে। পাথরের খাঁজ-কাটা সিঁড়ি দিয়ে পাতালের দিকে আমাদের অবতরণ শুরু হ'লো।

৭

পথের পাঁচালী

পাথরের খাঁজ-কাটা সিঁড়ি দিয়ে পাতালের দিকে নামতে লাগলাম আমরা। ক্রেটারের পরিধি ক্রমশ বেড়ে গিয়েছে। শ'তিনেক ফুট হবে হয়তো খানিক নিচে। আর সেই নিচে আছে পাতাল-ছোঁয়া অন্ধকার। গহ্বরের যতটুকু দেখা গেল তাতেই মনে হ'লো, এর পাঁচিল সোজাসুজি নিচে নেমে গেছে। হয়তো অতি মসৃণ রেখায়। অবশ্য পাঁচিলের গায়ে মাঝে-মাঝে এমনভাবে খাঁজের মতো পাথর বেরিয়ে ছিলো যে তাতে আমাদের সিঁড়ির কাজ হ'য়ে গেলো। উপরে যদি কোথাও বড়ো একটা দড়ি বাঁধা যেত, তবে সহজেই সেই দড়ির সিঁড়ি বেয়ে

banglabooks.in

নিচে নামা যেত। কিন্তু তার জন্যে বড়ে বড়ো দড়ির দরকার, ততো বড়ো দড়ি কি আছে আমাদের ?

কাকামণি বললেন : 'এর জন্যে এতো ভাবনা তোর ?'

চারশো ফুট লম্বা একটা দড়ি নিয়ে তার ঠিক মাঝখানটা পাঁচিলের গায়ের একটা পাথরের সঙ্গে দু-তিন পাক জড়িয়ে দিলেন উনি। বুঝতে পারলাম যে, দু'হাতে দড়ির দুই প্রান্ত ধ'রে সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে। দু'শো ফুট নেমে দড়ির এক প্রান্ত ধ'রে টানলেই দড়ি উপর থেকে খুলে আসবে। তখন ঐভাবেই দড়ির সাহায্যে সহজেই আরো নিচে নামা যাবে।

'এই বন্দোবস্তই ভালো হ'লো, কী বলিস ?' বললেন কাকামণি। 'কিন্তু, সমস্যা হ'লো, মালপত্রের ব্যবস্থা কী করা যায়। যতটুকু সম্ভব আমাদের সঙ্গে ক'রে নিতে হবে—বিশেষ ক'রে যেসব জিনিশ একটুতেই ভেঙে যেতে পারে। হান্‌স্, তুমি নাও কিছু যন্ত্রপাতি আর খাবার-দাবার। অ্যাক্‌জেল, তোর কাছে গুলি-বারুদ আর কিছু খাবার থাক। বাকি খাবার আর যন্ত্রপাতিগুলো আমিই নিচ্ছি।'

বললাম : 'তা না-হয় নেয়া গেলো, কিন্তু বিছানাপত্র, কাপড়-চোপড় আর অন্য সব জিনিশের কী হবে ?'

কাকামণি জানালেন : 'সেজন্যে ঘাবড়াতে হবে না তোকে। তারা আপনি আমাদের সঙ্গে যাবে।' এই বলে বাকি জিনিশপত্র একসঙ্গে খুব ভালো ক'রে বেঁধে কাকামণি গহ্বরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেললেন। শোঁ ক'রে বাণ্ডিলটা নেমে গেলো। যতোক্ষণ দেখা গেলো, কাকামণি সেটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর নির্বিকার গলায় বললেন : 'চল, এবার নামা যাক।'

আর দ্বিরুক্তি না ক'রে মরিয়া হ'য়ে পাতালের দিকে নেমে চললাম। সবচেয়ে আগে হান্‌স্. তারপর কাকামণি এবং সবশেষে আমি। একের পর এক তিনজনে দড়ি ধ'রে-ধ'রে নামতে লাগলাম। আলগা পাথরগুলি পায়ের আঘাতে ঝুর-ঝুর করে নিচে পড়তে লাগলো।

আধ ঘণ্টা নামবার পর দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটু প্রশস্ত চত্বরের মতো দেখা গেলো। সেখানেই থামলাম আমরা। টান দিয়ে উপর থেকে দড়িটা খুলে নিলেন কাকামণি। আবার দড়ি বাঁধা হ'লো তিন-চার পাক দিয়ে। আবার নিচের দিকে নেমে চললাম।

আমি তখন নিজেকে সামলাতে এতোই ব্যস্ত ছিলাম যে শিলাস্তরের

banglabooks.in

বিন্যাসের দিকে নজর দেবার মতো অবসর ছিলো না। এমন পাগল ভূতত্ত্ববিদ কে আছে যে এই অবস্থায়ও চারদিককার শিলাস্তরের নানান লক্ষণ খেয়াল করতে-করতে নামতে পারে? কাকামণি কিন্তু শিলাস্তরের বিন্যাস করতে-করতেই নামতে লাগলেন। তাঁর রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন কোনো মিউজিয়ামে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

হঠাৎ একবার কাকামণি আমায় বললেন: 'যতোই নামছি নিচের দিকে, ততোই নিঃসন্দেহ হচ্ছি। এই অগ্নিগিরির শিলাস্তরের বিন্যাস দেখে মনে হচ্ছে যে পৃথিবীর অভ্যন্তরে খুব বেশি উত্তাপ নেই। দেখছিস নে, এখন আমরা যে শিলাস্তরের মধ্য দিয়ে চলেছি, তা-ই হ'লো পাথরের আদিম অবস্থা। ধাতব পদার্থের গায়ে জল হাওয়া লেগে তখন যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটেছিলো, এখনো তার চিহ্ন পাথরের গায়ে বর্তমান। তুই ভালো ক'রে নজর রাখলেই বুঝতে পারবি সব।'

আমি কোনো কথা বললাম না। দড়ি ধ'রে কোনোমতে টাল সামলিয়ে নামতে লাগলাম শুধু। ইতিমধ্যে গহ্বর ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হ'য়ে আসছিলো, গাঢ় হচ্ছিল অন্ধকার। আলগা পাথরের টুকরোগুলি ক্রমশ আরো জোরে নিচে পড়তে লাগলো, আর তাদের নিচে পড়ার শব্দ ক্রমেই গভীর থেকে গভীরতর হ'য়ে উঠতে লাগলো।

প্রায় দু'হাজার আটশো ফুট নামবার পর কাকামণি যখন জানালেন যে আমাদের পথ আপাতত এখানেই শেষ হ'য়ে গেছে, তখন রাত দুপুর হয়ে গেছে। নিচে যাওয়ার নতুন পথ আবিষ্কার করা এই রাত্তিরে মোটেই সহজ ব্যাপার নয় ব'লে আমরা রাত কাটাবার উদ্যোগে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। সহজেই একটি প্রশস্ত সমতল ভূমি পাওয়া গেলো। আমাদের শোওয়া-বসার কোনো অসুবিধে হ'লো না। কিছু খেয়ে নিয়ে কোনো রকমে শুয়ে পড়লাম আমরা।

চারদিক নিস্তব্ধ। সূচীভেদ্য অন্ধকার। সেই অন্ধকারের মধ্যে আকাশ-পাতাল কতো-কি যে ভাবতে লাগলাম, তার ইয়ত্তা নেই। ঘুম যখন ভাঙলো, তখন বেলা আটটা। মৃদু সূর্যরশ্মির সরু একটি রেখা এসে পড়ছিলো আমাদের পাশে।

আমার ঘুম ভেঙেছে দেখে কাকামণি হেসে বললেন: 'কী রে, কেমন লাগছে তোর? কাল রাত্তিরের মতো এমন শান্তিতে ঘুমিয়েছিস আর কখনো? গাড়ি-ঘোড়ার গোলমাল নেই, লোকজনের সোরগোল নেই—কী রকম নিস্তব্ধ চারদিক দেখছিস?'

banglabooks.in

'এতো নিস্তব্ধ বলেই তো ভয় করছে বেশি।'

কাকামণি হেসে উঠলেন : 'এখনই ভয় করছে তোর? এরই মধ্যে? এখনো তো প্রচুর পথ বাকি! সত্যি কথা বলতে গেলে আমরা তো এখনো পৃথিবীর অন্তঃপুরে প্রবেশই করিনি—ঠিক সমুদ্রের সমতলে আছি।'

অবাক হ'য়ে বললাম : 'সে কী করে হয়?'

আবার কাকামণির হাসির শব্দ শোনা গেলো : 'এই ব্যারোমিটার ছাখ,—ভূপৃষ্ঠের মতো এখানেও চাপ সমান। যখন ব্যারোমিটারে বাতাসের চাপ মাপা যাবে না, ম্যানোমিটারে মাপতে হবে, তখনই বোঝা যাবে যে আমরা সত্যি-সত্যি পৃথিবীর অন্দরমহলে প্রবেশ করেছি।

হঠাৎ একটা গুরুতর প্রশ্ন জেগে উঠলো মনে : 'কিন্তু কাকামণি, পৃথিবীতে যে-পরিমাণ বাতাসের চাপ সহ্য করা আমাদের অভ্যেস, এখানে তার চেয়ে বেশি চাপ হ'লে সহ্য করা যাবে না তো!'

নিশ্চিন্ত গলায় কাকামণি বললেন : 'আমরা তো খুব আস্তে-আস্তে নামছি। ঘন হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে-নিতে ক্রমশ আমাদের অভ্যেস হ'য়ে যাবে। আমরা তো জানি, বেলুনে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের উপরে বাতাসের চাপ কতো কম। কিন্তু তা তো তারা সহ্য করে থাকে!'

'তার মানে, তুমি বলতে চাইছো আস্তে-আস্তে অভ্যেস হ'য়ে যাবে?'

'হ্যাঁ।' বললেন কাকামণি। 'আর অভ্যেস হ'লেই সহ্য হ'য়ে যাবে। কাল যে-বাণ্ডিলটা ফেলে দিয়েছিলুম, এবারে তার খোঁজ নেয়া যাক।'

খানিকক্ষণের মধ্যেই হান্‌স্ বাণ্ডিলটা খুঁজে বার করলে। আহার সেরে নিয়ে হান্‌স্ আর কাকামণি তাঁদের টর্চ জ্বালিয়ে নিলেন। তারপর সেই আলোয় পথ দেখে পাতালের অন্ধকারের দিকে এগিয়ে চললাম সবাই।

বারোশো উনত্রিশ খ্রীস্টাব্দে স্নেফেলের শেষ অগ্ন্যুদ্গীরণ ঘটেছিল। এখনো তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলো। সেই আগ্নেয় উদ্গার জমাট বেঁধে কঠিন হ'য়ে গিয়েছিলো। টর্চের আলোয় তা জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগলো। পথ এতো গড়ানো যে, আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। মাথার উপরে অসংখ্য কার্তজোপলের স্বচ্ছ ফানুশ ঝড়ের মতো ঝুলছিলো, তাদের গায়ে যেন পরিচ্ছন্ন কাচ বসানো। টর্চের আলোয় ফানুশগুলো ঝলমল করতে লাগলো। ভারি সুন্দর লাগলো দেখতে। লাল, নীল, সবুজ—নানান রঙের সব ফানুশ। তাদের উপর আলো পড়ে তৈরি হয়েছে পাতালের রামধনু।

বারোশো উনত্রিশ খ্রীস্টাব্দে স্নেফেলের শেষ অগ্ন্যুদ্গীরণ ঘটেছিল। এখনো তার চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেলো। সেই আগ্নেয় উদ্গার জমাট বেঁধে কঠিন হ'য়ে গিয়েছিলো। টর্চের আলোয় তা জ্বল্‌জ্বল্ করতে লাগলো। পথ এতো গড়ানো যে, আমাদের খুব সাবধানে এগোতে হচ্ছিল। মাথার উপরে অসংখ্য কার্তজোপলের স্বচ্ছ ফানুশ ঝড়ের মতো ঝুলছিলো, তাদের গায়ে যেন পরিচ্ছন্ন কাচ বসানো। টর্চের আলোয় ফানুশগুলো ঝলমল করতে লাগলো। ভারি সুন্দর লাগলো দেখতে। লাল, নীল, সবুজ—নানান রঙের সব ফানুশ। তাদের উপর আলো পড়ে তৈরি হয়েছে পাতালের রামধনু।

banglabooks.in

অনেক দূর পর্যন্ত এগোলাম সেদিন। উত্তাপ কিন্তু সেই অনুপাতে বেড়েছে ব'লে মনে হ'লো না।'

রাত্রে খেতে ব'সে আবিষ্কার করলাম, জল ক'মে এসেছে। আগেও জলের কথা কাকামণিকে অনেকবার জানিয়েছি। কিন্তু ওঁর মুখে সেই এক কথা: 'ঝরনার জল পাওয়া যাবে পথে। কাজেই ভয় কিসের?' কিন্তু এখন যখন দেখতে পেলাম অর্ধেকেরও বেশি জল ফুরিয়ে গেছে, তখন আবার জানালাম ওঁকে। শুনে কাকামণি বললেন: 'এতো ব্যস্ত হচ্ছিস কেন? ঝরনার জল পাওয়া যাবে পথে। যখনই এই অগ্ন্যুদ্গারের দেয়াল ভেদ করবো, ঠিক তখুনি জলের দেখা মিলবে।'

'এ দেয়াল কতদূর গেছে, তা কী ক'রে বুঝতে পারবে? আমরা যে নিচের দিকে খুব বেশি নামতে পেরেছি, তা কিন্তু মনে হচ্ছে না আমার। সমতল ক্ষেত্র দিয়েই বোধহয় চলেছি আমরা। কারণ যতো নিচে নামবো ততোই তো উত্তাপ বাড়বার কথা। কিন্তু তাপ একটুও বাড়েনি। খুব বেশি হ'লে আমরা এগারো-বারোশো ফুট নামতে পেরেছি।'

হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন কাকামণি। 'তোর ধারণা ভুল। এখন আমরা সমুদ্র-তলের চেয়েও দশ হাজার ফুট নিচে।'

দু'চোখ বিস্ফারিত করে বললাম: 'অ্যাঁ? বলো কী কাকামণি?'

কাকামণি অঙ্ক ক'ষে তাঁর সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিলেন।

পরদিন ভোরবেলাতেই আবার আমাদের চলা শুরু হ'লো। দুপুর বেলায় আমরা দুটি সুড়ঙ্গ-পথের মোহানার সামনে এসে থমকে দাঁড়ালাম। দুটি পথই সঙ্কীর্ণ, অন্ধকার এবং অপ্রশস্ত। সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে যদি অনন্তকাল ভাবতাম—কোন পথ দিয়ে যাবো, তাহলেও পথের সন্ধান পাওয়া যেতো না। কাকামণি কিন্তু চট করে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। বললেন: 'পূর্বদিকের সুড়ঙ্গ দিয়েই যাওয়া যাক, কী বলিস?'

এগোতে-এগোতে দেখতে পেলাম ঐ সুড়ঙ্গের অবসর্প বেশ কম, আর সামনের দিকে তোরণের পর তোরণ যেন আমাদেরই জন্য উন্মুক্ত হ'য়ে আছে। মাইলখানেক যেতে-না-যেতেই তোরণগুলি ক্রমশ ছোটো হ'য়ে আসতে লাগলো। সেই কারণে কোথাও আমাদের মাথা নুইয়ে চলতে হ'লো, কোথাও বা এগোতে হ'লো বুকে হেঁটে অতি সন্তর্পণে।

উত্তাপ এখনো সহনীয়। তবে, এক-একবার যখন মনে হচ্ছিল যে এই পথ দিয়ে একদা প্রচণ্ড আবেগে তরল আগুনের স্রোত বয়ে গিয়েছিলো, তখুনি ভয়ে

banglabooks.in

শিউরে উঠছিলো শরীর। এমনও তো হ'তে পারে যে এখন কোথাও আবার শুরু হয়েছে দ্রবীভূত আগুনের অসহ্য তাণ্ডব! আর তার মানেই হ'লো নিশ্চিত মৃত্যু।

কাকামণি কিন্তু নির্বিকারভাবে এতো কষ্ট সহ্য ক'রেও এগিয়ে চললেন। হান্‌সেরও ঠিক তেমনি বিরামহীন গতি। শুধু আমারই ভারি কষ্ট হচ্ছিল এগোতে।

সন্ধের সময় যখন আমরা জিরোবার জন্যে থামলাম, তখন হিশেব ক'রে দেখা গেলো যে আমরা মোটে ছ'মাইল পথ অতিক্রম করেছি সারাদিনে, আর নিচের দিকে নেমেছি মাত্র আধমাইল।

পরদিন ভোরবেলায় আবার যাত্রা শুরু হ'লো। কিছুদূর যাওয়ার পর দেখা গেলো সুড়ঙ্গ-পথ নিচের দিকে না গিয়ে সমতল ক্ষেত্রেই চলেছে। আমার তো মনে হ'লো আমরা ক্রমশ উপরের দিকে উঠছি। চলতে তখন ভারি ক্লান্তি লাগছিলো। আস্তে-আস্তে চলছি দেখে কাকামণি অধৈর্য গলায় আমাকে তাড়াতাড়ি হাঁটতে বললেন।

অবসন্ন গলায় বললাম: 'আর যে পারছি নে কাকামণি!'

'পারছিস নে!' অবাক হলেন যেন কাকামণি। 'এমন সুন্দর রাস্তা দিয়ে হাঁটতে তোর কষ্ট হচ্ছে? মোটে তো তিন ঘণ্টা হ'লো রওনা হয়েছি।'

'আমার পা যে ভেঙে আসছে, কাকামণি! উপরে ওঠা তো সহজ ব্যাপার নয়!'

'কী সর্বনাশ! তুই পাগল হ'য়ে গেলি নাকি? কোনটা উঁচু, কোনটা নিচু—তাও জানিস নে? চল, চল!' কাকামণি তর্জনীসঙ্কেতে সামনের পথ দেখিয়ে দিলেন। আর কোনো দ্বিরুক্তি না ক'রে মরিয়া হ'য়ে এগোতে লাগলাম।

দুপুরবেলায় দেখি শহরের প্রাচীর অন্যরকম রূপ নিয়েছে। আমাদের হাতের আলোয় আর তেমন উজ্জ্বল দেখাচ্ছে না। লক্ষ্য ক'রে দেখি, এবার আর অগ্ন্যুদ্গারে গঠিত নয়, পাষাণময়। খানিকক্ষণ বাদেই দেখি, চারিদিক চূর্ণোপলে আর স্লেট-পাথরে ছাওয়া। গ্রন্থি-প্রস্তরের প্রাচীর পেছনে পড়ে রয়েছে।

আমাকে বিস্ময়ে অর্ধস্ফুট চিৎকার করতে দেখে কাকামণি শুধোলেন: 'ব্যাপার কী?'

বললাম: 'ছাখো কাকামণি, আমরা কোথায় এসে পৌঁছেছি। যে-যুগে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিলো, প্রথম উদ্ভিদ দেখা দিয়েছিলো, আমরা এখন সৃষ্টির সেই পরিবেশে এসে উপস্থিত হয়েছি।' প্রাচীরের গায়ে

banglabooks.in

আলো ফেলে দেখালাম ওঁকে। কাকামণি কিন্তু একটুও অবাক হলেন না। নীরবে এগিয়ে চললেন।

তবে কি আমারই ভুল হ'লো? হয়তো। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত যদি ঠিক হ'য়ে থাকে, তবে প্রাচীন যুগের উদ্ভিদ-জগতের কিছু-না-কিছু চিহ্ন নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আমি তারই অপেক্ষায় রইলাম।

অল্পক্ষণের মধ্যেই লক্ষ্য করলাম, আমরা বালির উপর দিয়ে চলেছি। এখানে নদী নেই, সমুদ্রও নেই,—তবে বালি এলো কোত্থেকে? এ তাহ'লে উদ্ভিদের ধ্বংসাবশেষ ছাড়া অন্য কিছু না। আর-একটু পরেই প্রাচীরের গায়েও উদ্ভিদ জগতের অভ্রান্ত চিহ্ন দেখা গেলো।

কাকামণি কিন্তু তবুও এগিয়ে চললেন। দেখে আর সহ্য হ'লো না। একটা ঝিনুক কুড়িয়ে কাকামণির হাতে দিয়ে বললাম: 'এই ছাখো কাকামণি, ট্রিলোবাইট জাতের ঝিনুক। এ দেখেও কি মনে হয় না—'

—'যে আমরা পথ হারিয়েছি?' অকম্পিত স্বরে আমার কথাটা শেষ করলেন কাকামণি, তারপর বললেন: 'পথ তো অনেকক্ষণ হ'লো হারিয়েছি। গ্রন্থিপ্রস্তর আর অগ্ন্যুদ্গারের প্রাচীর ছাড়িয়ে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই বুঝতে পেরেছি, আমরা ঠিক পথে আসছি নে। কিন্তু এই পথটাও যে পাতালে যায়নি, তারই বা প্রমাণ কী? এর শেষ না দেখে কি ফিরতে পারি?'

অবাক গলায় বললাম: 'তুমি তবে পথের শেষ না দেখে ফিরবে না? ওদিকে যে আমাদের জল ফুরিয়ে এলো!'

'তাতে কী হয়েছে?' নির্বিকার স্বরে কাকামণি বললেন: 'অল্প-অল্প করে খেতে হবে আর-কি!'

৮

পথের শেষ কোথায়, পথের শেষ?

কাকামণির কথায় প্রতিবাদ করবার মতো অবস্থা তখন আমার না,—না দেহের, না মনের। শুধু একবার কতোটুকু জল এখনো হাতে আছে দেখে নিলাম। তখনো তিনদিনের উপযোগী জল ছিলো। কিন্তু ক'দিন যে লাগবে এই পথের

banglabooks.in

শেষ দেখতে, তা কে জানে ? সে-কথা আর ভাববার চেষ্টাও করলাম না। ভেবে কোনোই লাভ নেই। কাকামণি তো আর আমার কথা শুনবেন না ! কাজেই শ্রান্ত পায়ে এগিয়ে চলতে লাগলাম শুধু।

এবার দেখতে পেলাম, মারবেল পাথরের রাজ্যে এসে পৌঁছেছি। শাদা, লাল, নীল, হলুদ নানান বর্ণের পাথর। কোনো-কোনো জায়গায় আবার দেখলাম, নানান জাতের মাছ ও সরীসৃপের কঙ্কাল ইতস্তত ছড়ানো। বুঝতে পারলাম, আমরা ক্রমশ সৃষ্টির আদি যুগের দিকে চলেছি। তবে কি আমরা একেবারে পৃথিবীর অন্দরমহলের কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম ?

ক্রমশ আবার সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গে এসে নামলো আর-একটি রাত্রি। লণ্ঠনের অল্প আলোয় কোনোরকমে আমরা আহার সেরে নিলাম। জল ফুরিয়ে যাবে এই ভয়ে বেশি জল খাওয়ার সাহস পর্যন্ত হ'লো না। তারপর অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়েই আশ্রয় নিলাম প্রস্তর-শয্যায়।

পরদিন একটানা দশ ঘণ্টা চলবার পর দেখলাম, প্রাচীরের গায়ে টর্চের আলো আর তেমন যেন ফুটতে চাইছে না। পরীক্ষা ক'রে দেখতে পেলাম, মারবেল পাথর, চুন পাথর, শ্বেত পাথর নেই, স্লেট পাথরের স্তরও অন্তর্হিত। সামনে আছে শুধু ঘন কালো রঙের আস্তরণ-ঢাকা সুড়ঙ্গ-প্রাচীর। প্রাচীরের গা থেকে হাত সরিয়ে নিতেই চোখে পড়লো, হাত কালো হ'য়ে গেছে।

বিস্ময়ে অস্ফুট কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলাম : 'কয়লার খনি ! কয়লার খনি !

কাকামণি হেসে বললেন : 'এই কয়লার খনিতে এর আগে মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি। আমরাই এই দেশের প্রথম আগন্তুক।' তারপর হান্‌সের দিকে ফিরে তাকালেন উনি। বললেন : 'আজ এখানেই থামা যাক, হান্‌স্। অনেকক্ষণ এগোনো গেছে। একদিনের পক্ষে এই যথেষ্ট।'

রাত্রির আহার সেরে নিতে বসলাম সবাই মিলে। খেতে আমার কোনোই আগ্রহ ছিলো না। আমার ভাগে যে অল্প-একটু জল পড়লো প্রাণভরে তাই শুধু পান করলাম।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'তেই সবাই শুয়ে পড়লাম। কাকামণি আর হান্‌স্ সহজেই ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু আমার চোখে ঘুম নামলো না। জলের চিন্তায় আমার ঘুম আসতে চাইলো না। অনেকক্ষণ জেগে থাকবার পর কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, টের পাইনি। সকালবেলায় যখন কাকামণি আর হান্‌স্ যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন, তখন আমার ঘুম ভাঙলো। প্রাতরাশ সেরে নিয়ে আবার

banglabooks.in

নিয়মিতভাবে চলা শুরু হ'লো।

কিছুদূর এগোনোর পর সামনে একটা বিপুল আকারের গহ্বর পড়লো। অন্ধকার হাঁ মেলে দাঁড়িয়ে আছে। আর সেই অন্ধকারে রয়েছে সর্বনাশের সম্ভাবনা। প্রকৃতি ছাড়া এমনতরো দ্বিতীয় একটি গহ্বর সৃষ্টি করবার ক্ষমতা আর কারো নেই। গহ্বরটার পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম।

সেদিনও সারা দিন হেঁটে পথের শেষ দেখা গেলো না। আমাদের যেমন চলার বিরতি নেই, তেমনি সুড়ঙ্গটারও কোনো শেষ হবার লক্ষণ নেই। যতই এগোই না কেন, সুড়ঙ্গ যেন আর ফুরোবে না। কাকামণি পর্যন্ত আস্তে-আস্তে অধৈর্য হ'য়ে উঠতে লাগলেন।

রাত না দিন বোঝবার জো নেই এমনিতে। শুধু আকারহীন ঘন অন্ধকার। আমাদের হাতের আলো যেন সেই অন্ধকারকে আরো বাড়িয়ে তুলছিলো। ঘড়ি দেখেই নিয়ম-মতো সময়ে আমরা জিরোই, আহার করি, ঘুমোই, তারপর আবার চলতে থাকি।

অবশেষে ঘড়িতে একসময়ে সন্ধে ছ'টা বাজলো। আর ঠিক সেই সময়েই দেখতে পেলাম, আমাদের সামনে একটা নিরেট প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এই পথের তাহ'লে এখানেই শেষ!

কাকামণি কিন্তু নির্বিকার। শুধু বললেন: 'ভালো। এতক্ষণে তবু একটা পথের শেষ দেখা গেলো। সাকুল্যউজম্ তবে এই পথে আসেননি। এবার তাহ'লে ফেরার উদ্যোগ করা যাক। আফশোষ ক'রে আর লাভ কী খামোকা? আমরা পথ ভুল করেছিলুম—এবার ফিরে গিয়ে আসল পথ ধরে এগোবো।'

এই হতাশার মধ্যেও কেন জানি না হাসি পেলো আমার। ম্লান স্বরে বললাম: 'ফিরবো তো নিশ্চয়ই, কিন্তু শক্তি কই?'

'নেই মানে? এতোটা পথ আসতে পারলাম, আর ফেরবার বেলায় পারবো না?'

আশঙ্কাটা প্রকাশ ক'রে বললাম: 'কিন্তু কাকামণি, কালকেই যে সব জল ফুরিয়ে যাবে!'

'নিকুচি করেছে তোর জলের!' অধৈর্য হ'য়ে উঠলেন কাকামণি। 'জল ফুরিয়ে যাবে ব'লে কি আমাদের ধৈর্য, সাহস, সঙ্কল্প সবকিছুই ফুরিয়ে যাবে নাকি?'

এই কথার জবাব দেবার সাধ্য আমার ছিলো না। আমি শুধু ভাবতে লাগলাম, এতোটা পথ আসতে লেগেছে পাঁচ দিন, ফিরে যেতেও তো আবার

banglabooks.in

সেই পাঁচ দিনের ধাক্কা। ততোদিন কি জল না খেয়ে বাঁচবো ?

কিন্তু এখানে হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে থাকলেও তো বাঁচবার সম্ভাবনা নেই। গেলেও মৃত্যু, থাকলেও তথৈবচ। সুতরাং বৃথা দেরি না ক'রে তখুনি প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করলাম আমরা।

৯

অন্য পথ

সে যে কী কষ্ট, কী অসহ্য যন্ত্রণা, তা লিখে বোঝাতে পারি এমন ভাষা নেই আমার। কাকামণির কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতার কোনো তুলনা নেই। দাঁতে দাঁত চেপে এগোতে লাগলেন তিনি। আর হান্‌স্ ? হান্‌সের যে কোনো কষ্ট হচ্ছে এমন কোনো লক্ষণই চোখে পড়লো না। নীরবে চলতে লাগলো সে। শুধু পারলাম না আমি।

প্রথম দিনেই জল গেলো ফুরিয়ে। তখন জলের বদলে জিন পান করলাম আমরা। সেই তরল আগুনে পুড়ে যেতে চাইলো কণ্ঠনালী। বুক জুড়ে আকণ্ঠ পিপাসা, কিন্তু তবু ঐ জিনের বোতলের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করলো না আমার। বরং ক্রমেই আমার মনে হ'তে লাগলো চারদিকে যেন অসহ্য উত্তাপ, যেন আগুনের চুল্লির ভিতর দিয়ে চলেছি আমরা, মরুভূমিও বোধহয় এর চেয়ে ভীষণ নয়।

সত্যিসত্যিই শেষটায় আর পারলাম না। এক পাও চলবার মতো ক্ষমতা রইলো না আমার। কতোবার যে চেতনা হারালাম তার কোনো হিশেব নেই। কাকামণি আর হান্‌স্ অনেক ক'রে আমার চেতনা সঞ্চার করতে লাগলেন। ওদের মুখ দেখে বুঝতে পারছিলাম, অসহ্য পিপাসা ও নিদারুণ শ্রমে ওঁরাও ক্রমশ অবসন্ন হ'য়ে পড়ছেন।

কী ক'রে যে পাঁচ দিন কাটলো, জানি নে। বহু কষ্টে শ্রান্ত তৃষ্ণাদীর্ণ দেহ টেনে-টেনে কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বুকে হেঁটে—আমরা সেই সুড়ঙ্গের মোহানার কাছে এসে পৌঁছলাম। বেলা তখন দশটা। সেখানে পৌঁছে আর নিজেকে সামলে রাখতে পারলাম না। জ্ঞান হারিয়ে পাথরের উপর প'ড়ে গেলাম।

banglabooks.in

যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন দেখি কাকামণি আমাকে বুকে নিয়ে রুদ্ধ স্বরে বলছেন : 'হায়রে বাছা আমার ! কেন তোকে সঙ্গে টেনে আনলাম !'

কাকামণির এমন গাঢ় কথা শুনে আমার গলার কাছটা বেদনায় টন-টন ক'রে উঠলো। আমার দু-হাতে ওঁর হাত তুলে নিয়ে একটু চাপ দিলাম। কাকামণির চোখ দিয়ে অঝোর ধারে অশ্রু ঝরতে লাগলো। নিজের বোতলটা আমার মুখের কাছে ধ'রে কাকামণি বললেন : 'এইখানে অল্প একটু জল আছে—'

হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলাম। স্বপ্ন, না সত্যি ? পাগল না তো কাকামণি ? বোতলে কি আর এক ফোঁটাও জল আছে ?

কাকামণি বোতলটা আমার মুখে উপুড় ক'রে ধরলেন। জল ! সত্যিকার জল !

আমার আতপ্ত জিহ্বার উপরে যেন অমৃত ঝ'রে পড়লো। তৃপ্তিতে দু'চোখ গাঢ় হ'য়ে এলো।

কাকামণি বললেন : 'অ্যাকজেল, এইটুকুই আমার শেষ সম্বল ছিলো, শেষ মুহূর্তের জন্য তুলে রেখেছিলাম। আর এক বিন্দুও জল নেই। আগেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এই পর্যন্ত আসতেই একেবারে মৃতপ্রায় হয়ে পড়বি। তাই জলটুকু তোর জন্যে রেখে দিয়েছিলাম। কতোবার তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে ঐ বোতলের দিকে তাকিয়েছি, হাতও বাড়িয়েছি, মনে করেছি একফোঁটা জল খাই। কিন্তু খাইনি—তোর জন্যেই রেখে দিয়েছি। অ্যাকজেল, অ্যাকজেল, আর আমাদের এক ফোঁটাও জল নেই !'

কাকামণি খালি বোতলটা উপুড় ক'রে ধরলেন। এবারে আমি কেঁদে ফেললাম। কাকামণি কি মানুষ, না অন্য কিছু ?

ঐ একফোঁটা জলে আমার তৃষ্ণার জ্বালা সামান্যই কমলো বটে, কিন্তু তাতেই শরীর বেশ সুস্থ হ'লো। গলা একেবারে শুকিয়ে গিয়েছিলো, এখন আবার খানিকটা ভিজলো, কথা বলবার ক্ষমতা ফিরে পেলাম। কাতর কণ্ঠে বললাম : 'কাকামণি, আর না। জল যখন ফুরিয়ে গেছে, তখন পৃথিবীতে ফিরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গতি নেই। চলো, এখুনি আমরা ফিরে যাই।'

কাকামণি নত মুখে চুপ ক'রে আমার কথা শুনলেন। কোনো জবাব দিলেন না।

আমি আবার বললাম : 'ফিরতে আমাদের হবেই কাকামণি, ফিরতে আমাদের হবেই। তবে শেষ পর্যন্ত স্নেফেলের চুড়ো অবধি ওঠবার শক্তি থাকবে

banglabooks.in

কি না কে জানে !'

অস্ফুট কণ্ঠে কাকামণি বললেন : 'এতোদূরে এসে শেষটায় ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে যাবো ?'

'ফিরতে আমাদের হবেই।' আরো জোর দিয়ে বললাম এবার। 'ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোনো পথ নেই। আর এক মুহূর্তও দেরি করা ঠিক হবে না।'

অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন কাকামণি। বিবর্ণ মুখে হতাশার রঙ লাগলো। মুখ দেখে বোঝা গেলো, কী করবেন তা ঠিক ক'রে উঠতে পারছেন না। কিন্তু অবশেষে আবার প্রতিজ্ঞার দীপ্তিতে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো ওঁর চোখ-মুখ। অনতিস্ফুট কণ্ঠে বললেন : 'তুই যে আশা হারিয়ে ফেলেছিস, তা আমি জানি, অ্যাকজেল। কিন্তু আমার শেষ সম্বলটুকু দিয়ে গলা ভিজিয়েও কি তোর হারানো সাহস ফিরে এলো না ? এখনও তুই হতাশ হ'য়ে ফিরে যেতে বলছিস ? তোর মনে কি আর কখনো আশার আলো জেগে উঠবে না, অ্যাকজেল ?'

এমন কথা আমি মোটেই আশা করিনি। এইরকম সঙ্কটময় মুহূর্তে কোনো মানুষ যে এরকম কথা বলতে পারে, আমার তা ধারণারও বাইরে ছিলো। অস্ফুট স্বরে বললাম : 'তবে কি তুমি ফিরতে চাও না কাকামণি ?'

কাকামণি বললেন : 'যখন পরিবেশ আমার অনুকূলে তখন কি আর ফিরতে পারি ? তা কখনও হতে পারে না।'

বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেলাম। 'পরিবেশ তোমার অনুকূলে ? তুমি কী বলছো কাকামণি ?'

কাকামণি বললেন : 'ঠিকই বলছি। জলের অভাবই তো এখন আমাদের সবচেয়ে বড়ো বাধা ? তুই তো সেই কারণেই ফিরে যেতে চাস ? কিন্তু ভেবে ছাখ, এবার আমরা ঠিক পথ ধ'রেই এগোবো। আরন্ সাকন্যুউজম্‌ও এই পথ ধ'রে গিয়েছিলেন। এই পথে যদি জল না থাকতো, তবে তিনি যেতে পেরেছিলেন কী ক'রে ? এই পথে গেলে আমরা জল পাবো।'

শুধোলাম : 'কী ক'রে তুমি অতোটা নিঃসন্দেহ হ'লে ?'

'এই সুড়ঙ্গের ভিতরে খানিক দূর আমি গিয়েছিলাম। প্রস্তরের স্তরবিন্যাস দেখেই বুঝতে পেরেছি, এই পথে জল আছে।'

'কিন্তু যদি জল না পাওয়া যায় ?'

বাধা দিয়ে কাকামণি বললেন : 'কলম্বাসের আবিষ্কারের কাহিনী জানিস তো ? যখন কলম্বাস ঠাণ্ডায় খিদেয় আর উপর্যুপরি বিপদের আঘাতে ভেঙে

banglabooks.in

পড়েছিলেন, যখন তাঁর নাবিকেরা ঠিক করেছিলো আর অগ্রসর হবে না, তিনি তখন তাদের কাছ থেকে মাত্র তিনদিন সময় চেয়েছিলেন ; বলেছিলেন—তিন দিনের মধ্যে যদি কোনো নতুন দেশের মাটি চোখে পড়ে, ভালো—নইলে নিশ্চয়ই দেশে ফিরে যাবেন। নাবিকেরা সহজেই তাঁকে সেই সময়টুকু দিয়েছিলো, আর তাই তিনি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন আমেরিকা। আমি কিন্তু তোর কাছে তিন দিনও সময় চাইনে, অ্যাকজেল—শুধু আজকের দিনটা ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা কর। যদি জল না পাওয়া যায়, তবে, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, তোর সঙ্গে কালকেই ফিরে যাবো।'

এই কথায় রাজি না হ'য়ে উপায় ছিলো না ব'লে সম্মতি জানালাম। কাকামণি বললেন, 'বেশ। তবে এক সেকেণ্ডও দেরি না আর। 'শিগগির চল পশ্চিমের সুড়ঙ্গে।'

অন্য পথে আমাদের যাত্রা শুরু হ'লো। পা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে কেন যেন মনে হ'লো এই গহ্বর থেকে জীবনে আর ফিরতে পারবো না। কে জানে, এই সুড়ঙ্গ ঘুরে-ফিরে কোথায় কোন অন্ধকারে গিয়ে শেষ হয়েছে! এবারে কখনো গাঢ়, কখনো ফিকে-নীল রঙের স্লেট-পাথরের প্রাচীর ; প্রাচীরের গায়ে কোথাও সোনা, কোনোখানে বা প্ল্যাটিনামের আর সোনার সুতো বিনুনির মতো প্রাচীরের গায়ে।

স্লেট-পাথরের পর স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো ধাতব পদার্থের গ্রন্থিপ্রস্তর। রাশি-রাশি অভ্র আমাদের টর্চের আলোয় হিরের মতো জ্বলতে লাগলো। সন্ধের কিছুক্ষণ আগে এই হিরের আলোর ঝলমলানি অন্ধকারের অতলে মিলিয়ে গেলো। আবার আমরা আভাহীন গ্রন্থি-প্রস্তরের প্রাচীরের পাশ দিয়ে চলতে লাগলাম।

আরো দু-ঘণ্টা কাটলো, কিন্তু জলের কোনো চিহ্ন দেখা গেলো না কোথাও। ক্রমশ আবার যন্ত্রণা বেড়ে চললো আমার। বুঝতে পারছিলাম কাকামণিদের আমাদের চেয়েও বেশি কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তবু থামলেন না কাকামণি। একটানা এগিয়ে চললেন।

ক্রমশ আমার আর হাঁটবার শক্তি রইলো না। পা যেন আর চলতে চাইছে না। তবু কোনোমতে ধুঁকতে-ধুঁকতে এগিয়ে চললাম। তারপর একসময় অস্ফুট আর্ত কণ্ঠে চিৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে পাথরের উপর প'ড়ে গেলাম।

জ্ঞান ফিরতেই তাকিয়ে দেখি কাকামণি আর হান্‌স্‌ আমার পাশেই পাথরের

banglabooks.in

উপরে শুয়ে ঘুমোচ্ছেন। মৃত্যুর চেয়েও ভয়ঙ্কর তখন আমার অবস্থা। অতন্দ্র চোখে তাকিয়ে রইলাম অন্ধকারের দিকে। অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ দেখতে পেলাম, হান্‌স্ ঘুম থেকে উঠে একটা টর্চ হাতে নিয়ে আস্তে-আস্তে কোথায় যেন চলেছে। তবে কি আমাদের মৃত মনে ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে ও? প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু শুকনো গলা থেকে কোনো শব্দই বেরুলো না। ইচ্ছে হ'লো ছুটে গিয়ে ধরি ওকে। কোনোমতেই শরীরটাকে টেনে তুলতে পারলাম না। ওদিকে হান্‌সের টর্চের আলো অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো, পায়ের শব্দ ঢাকা প'ড়ে গেলো অসহ্য নীরবতায়। আর যন্ত্রণায়, দুর্ভাবনায় আমি কিছুক্ষণ বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিলাম। তারপর হঠাৎ মনে হ'লো, হান্‌স্ তো ক্রমশ নিচে নেমে গেলো, উপরে তো উঠল না। নিচে তো পাতালের অন্ধকার! হান্‌স্ তবে গেলো কোথায়? পালিয়ে যাবার উদ্দেশ্য থাকলে তো উপরে উঠতো, নিচে নামলো কেন তবে?

কোনো কিছু বুঝবার ক্ষমতা আমার তখন ছিলো না। তাই আমি সেই অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে প'ড়ে রইলাম শুধু। ঘণ্টাখানেক বাদে হান্‌সের পায়ের শব্দ শুনতে পাওয়া গেলো।

হান্‌স্ ফিরে এসে কাকামণির ঘুম ভাঙালো ধাক্কা দিয়ে। বিড়বিড় ক'রে কী যেন বললে তাঁকে।

জ্যা-মুক্ত তীরের মতো উঠে দাঁড়ালেন কাকামণি: 'জল! কোথায় জল? কোনখানে?'

প্রথমটা বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে গেলাম, তারপর কোনোরকমে টেনে-হিঁচড়ে খাড়া করলাম শরীর। শুনতে পেলাম হান্‌স্ বলছে: 'ঐ যে দূরে—নিচের দিকে জল আছে।' উল্লাসে অধীর হ'য়ে সজোরে ওর হাত ধরে ঝাঁকুনি দিলাম আমি। হান্‌সের মুখ কিন্তু চীনেদের মতো নির্বিকার।

জলের আশা শরীরে নতুন শক্তি আনলো। তখনি জলের খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম আমরা। কোনোরকমে শ্রান্ত শরীর টেনে-টেনে হাজার-দুই ফুট নিচে নামলাম। এমন সময়ে কাকামণি হঠাৎ আমায় বললেন: 'কান পেতে শোন দিকিন, কিছু শুনতে পাচ্ছিস কি না?'

রুদ্ধশ্বাসে কান পেতে শুনতে পেলাম, গ্রন্থি-পাথরের কঠিন দেয়াল ভেদ ক'রে দূরাগত বজ্র-নির্ঘোষের মতো কি যেন এক উদাত্ত আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ঐ শব্দ নিঃসন্দেহে জলের কল্লোলের।

banglabooks.in

যতো নিচে নামতে লাগলাম, ততোই স্পষ্ট হ'তে লাগলো জলের কলরোল। মনে হ'লো, দেয়ালের ওপাশ দিয়ে একটি সঞ্জীবনী ঝরনা-ধারা ব'য়ে চলেছে। কিন্তু জল কই—জল তো চোখে পড়ছে না! হয়তো এরই নাম মৃগতৃষ্ণিকা।

আরো আধ ঘণ্টা কাটলো। আরো প্রায় মাইলখানেক নিচে নামলাম। এবার ক্রমশ জলের রাগিণী মিলিয়ে যেতে লাগলো। তখন আমরা ফিরে দাঁড়ালাম। দেয়ালের গায়ে যেখানে শব্দ সবচেয়ে স্পষ্ট ছিলো, হান্‌স্ সেখানে দাঁড়ালো। আমার আর দাঁড়াবার শক্তি ছিলো না। পাথরের উপরে ব'সে পড়লাম।

এই দেয়াল ভাঙবার পরে জল পাওয়া যাবে? সে তো অসম্ভব! এ দেয়াল ভাঙবার ক্ষমতা কার আছে? তাহ'লে মৃত্যু।—আমি মরবার জন্ত প্রস্তুত হ'তে লাগলাম।

হান্‌স্ আমার দিকে তাকিয়ে বিবর্ণভাবে হাসলো। তারপর আবার কান পাতলো দেয়ালের গায়ে। শুনবার চেষ্টা করলো অ-দেখা ঝরনার কলরোল। তারপর ও ওর বিরাট গাঁইতিটা হাতে তুলে নিলে। কোনোদিকে না তাকিয়ে একমনে আস্তে-আস্তে পাথরে আঘাত করতে লাগলো। প্রায় এক ঘণ্টা কাটলো। হান্‌স্ তখনও পাথরে আঘাত ক'রে চলেছে। শেষটায় কাকামণিও গিয়ে গাঁইতি ধরলেন।

আরো খানিকক্ষণ কাটলো। তারপর হঠাৎ একটা তীব্র শোঁ-শোঁ শব্দ শোনা গেলো। বিদ্যুৎবেগে একটা জলধারা বেরিয়ে এসে আছড়ে পড়লো অন্ত পাশের দেয়ালে। জলের আঘাতে হান্‌স্ আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

জল ছুঁয়ে দেখি আগুনের মতো গরম, যেন টগবগ ক'রে ফুটছে। উষ্ণ বাষ্পে সারা সুড়ঙ্গ ভ'রে গেলো। বন্ধনহীন উত্তপ্ত জলতরঙ্গ পাতালের দিকে তীব্রবেগে ছুটে চললো।

সেই জল অনেকক্ষণ ধ'রে ঠাণ্ডা ক'রে আমরা পান করলাম। অমৃতের মতো লাগলো সেই সঞ্জীবনী ধারা। তারপর যখন আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাস ক'মলো, কাকামণি বললেন: 'এর নাম আজ থেকে হ'লো হান্‌স্ নদী।'

সানন্দে কাকামণির কথায় সায় দিয়ে উঠলাম আমি। হান্‌স্ কিন্তু তখনো এমন নির্বিকার, যেন কিছুই ঘটেনি। একপাশে ব'সে সে তখন জলের দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে ছিলো।

কাকামণিকে বললাম: 'এমন ক'রে জল নষ্ট করা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না

banglabooks.in

আমাদের। জলের বোতলগুলি ভ'রে নিয়ে দেয়ালের রন্ধ্রটা বন্ধ ক'রে দিই।'

হেসে কাকামণি বললেন : 'ভয় নেই। এই উৎসধারা অফুরন্ত। দরকার নেই ঐ রন্ধ্র বন্ধ ক'রে। জল যেমন যাচ্ছে, যাক,—নিচের দিকেই তো যাচ্ছে। আমরাও নিচেই যাচ্ছি। জলস্রোতের অনুসরণ ক'রে চললে পথ হারানোরও ভয় থাকবে না, জলেরও অভাব ঘটবে না কখনো।'

'যদি উৎস ফুরিয়ে যায় ?'

ঘাড় নেড়ে কাকামণি বললেন : 'না, তা যাবে না। জলের এতো স্রোত দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে এর উৎস অনেক উপরে—এ উৎস ফুরোবে না।'

উৎফুল্ল মনে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। অনেক দিনের পর আজ খেয়ে-দেয়ে ভালো ক'রে ঘুমোনো যাবে !

অন্তহীন অন্ধকার ভেদ ক'রে পাতালের দিকে জলধারা এগিয়ে চললো। ঠিক যেন আমাদের বিনি-মাইনের পথ-প্রদর্শক।

১০

অজানার উজানে

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই আবার আমরা নিচে নামতে লাগলাম। এবার পথ সাপের মতো এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। পায়ের তলায় কুলকুল শব্দ ক'রে ব'য়ে চলেছে জলের স্রোত।

হঠাৎ সামনে পড়লো প্রকাণ্ড বড়ো একটা গহ্বর। যেন পাতালের অন্ধকারে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। গহ্বরের মধ্য দিয়ে রাস্তা একরকম সোজা নিচে নেমে গেছে দেখে কাকামণি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলেন।

হান্‌স্ দড়ি বের ক'রে আমাদের কোমরে বাঁধলো, যাতে কেউ যদি প'ড়েও যায়, তবে অন্য দু'জনের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে পারবে। উনিশে জুলাই থেকে সাতাশে জুলাই পর্যন্ত একটানা নিচে চললাম আমরা। কিন্তু সেই প্রকাণ্ড গহ্বরের যেন আর শেষ নেই ; অতল, নিতল যেন সে।

কাকামণি বললেন, 'এখন আমরা কোথায় আছি জানিস ? অতলান্তিক মহাসাগরের নিচে।'

banglabooks.in

অবাক হ'য়ে বললাম, 'কী বলছো কাকামণি ? এখন আমাদের মাথার উপরে প্রথর ভয়ঙ্কর অতলান্তিক ? অসম্ভব !'

'কে বললে অসম্ভব ? সত্যিই আমরা এখন অতলান্তিকের নিচে। অবশ্য এতো নিচে, যে আমাদের কাছে এখন সবই সমান।'

উনত্রিশে জুলাই সন্ধের সময় আমরা একটা বিশাল গুহার মধ্যে প্রবেশ করলাম। সেখানেই সে-রাতটা কাটানো গেলো। পরদিন ভোরে আবার যাত্রার প্রস্তুতি চললো। গ্রানাইট পাথরের মেঝের উপর দিয়ে তখনো সেই জলস্রোত ব'য়ে চলেছে।

কাকামণি হিশেব করতে-করতে বললেন : 'আজ পর্যন্ত আমরা মোটে একশো পঞ্চান্ন মাইল পথ চলেছি। মাথার উপরে এখন অতলান্তিক গর্জাচ্ছে। হয়তো এখন সমুদ্রের উপরে চলছে ঝড়, ঝঞ্ঝা বজ্রপাত—উন্মাদ হ'য়ে নাচছে ঢেউ—হয়তো কোনো জাহাজ ডুবতে ডুবতে চলেছে—হয়তো—'

কাকামণির 'হয়তো' আর ফুরোবে না দেখে বাধা দিয়ে শুধোলাম, 'আচ্ছা কাকামণি, সবশুদ্ধ আমরা কতো নিচে এখন ?'

হিশেব ক'রে কাকামণি বললেন, 'আটচল্লিশ মাইল। এতো নিচে নেমেছি, অথচ ছাখ, কোনো রকম কষ্ট হচ্ছে না আমাদের, শুধু কানের মধ্যে সামান্য যা। তাও ক্রমশ সহ্য হ'য়ে যাবে।'

ক্রমশই আমরা নিচে নেমে চলেছি। পথ কোথাও ঢালু, কোথাও একেবারে সোজা নেমে গেছে পাতালের দিকে—অন্য পৃথিবীর সন্ধানে। একত্রিশে জুলাই অবধি ক্রমাগত নেমেই চললাম, কিন্তু পথের আর শেষ নেই যেন ! শুধু অজ্ঞাত পথে এগিয়ে চলা।

এ ক'দিন আমাদের কোনো বিপদ ঘটেনি। শুধু সাতই আগস্ট আমি ভয়ানক এক বিপদে পড়লাম। আমি চলছিলাম সকলের আগে। পিছনে কাকামণি আর হান্‌স্‌। কাকামণির হাতে একটা আলো, আমার হাতেও একটা। পথের দু'পাশের দৃশ্য দেখতে-দেখতে চলেছি, হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি, আমি একলা। কাকামণি আর হান্‌স্‌কে চারপাশে কত খুঁজলাম, কিন্তু কোনো সাড়াশব্দও পাওয়া গেল না। অগত্যা যে-পথ ধ'রে এসেছিলাম সে-পথে ফিরে চললাম। অনেকক্ষণ ঘুরেও কাকামণি বা হান্‌সের সাক্ষাৎ পেলাম না। ওদের সাক্ষাৎ না পাওয়ার মানে সহজেই বুঝতে পারলাম। ভয়ে ছম-ছম ক'রে উঠলো শরীর। বিমূঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। তারপর সম্বিত ফিরতেই খুব

banglabooks.in

জোরে চেঁচিয়ে কাকামণিকে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু কর্কশ প্রতিধ্বনির অট্টহাসি ছাড়া আর কিছু শুনতে পেলাম না।

এই পাতালে তো একটিই পথ—তবে আমি পথ হারালাম কী ক'রে? হঠাৎ মনে পড়লো সেই জলধারার কথা। সেই জলরেখা ধ'রে হাঁটলেই তো আবার সেই গুহার কাছে পৌঁছনো যাবে।

হেঁট হ'য়ে জলে হাত-মুখ ধুতে যাচ্ছি, তখনই সমস্ত আশাভরসার শোচনীয় বিনাশ ঘটলো। কী সাংঘাতিক! পথের উপর জলের চিহ্নমাত্র নেই—শুকনো গ্রানাইট পাথর শুকনো দাঁত বের ক'রে আমাকে যেন ব্যঙ্গ করতে লাগলো।

মাথায় যেন সারা পৃথিবী ভেঙে পড়লো। ভাববার শক্তি পর্যন্ত রইলো না। একেই হয়তো পুঁথি-পত্রে জীবন্ত সমাধি বলে! রন্ধ্রহীন নীরবতা যেন শব্দহীন অট্টহাসিতে আমাকে টিটকিরি করতে লাগলো! ঝিমঝিম করতে লাগলো সমস্ত চৈতন্য।

কখন যে অন্যমনস্কভাবে চলতে-চলতে ভুল পথে এসে পড়েছি, তা বুঝতেও পারিনি। এখন কী ক'রে কাকামণির সন্ধান পাওয়া যায়? তবে কি পাতালের এই অন্ধকার পথে জীবন্ত সমাধি হবে আমার? মনে পড়লো পৃথিবীর আলো হাওয়ার কথা, শ্যামল স্নিগ্ধতার কথা, গ্রোবেনের কথা। বেদনায় গলার কাছটা টন-টন ক'রে উঠলো।

সমস্ত ব্যাপারটাকে তলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। আমার সঙ্গে দিন-তিনেক কাটানোর উপযোগী খাবার আছে, আর আছে এক বোতল জল! সেই ভরসায় ভূমিশয্যা ছেড়ে উঠলাম—যদি আবার জলস্রোতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—অন্ততপক্ষে যদি কোনো রকমে স্নেফেলের উপরেও উঠতে পারি।

আধ ঘণ্টা ধ'রে এগিয়ে চললাম। পথের চেহারা, দেয়ালের রঙ, পাথরের কুচি দেখে পথ চেনবার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। তবু দ্রুতপায়েই এগোলাম। চলতে-চলতে হঠাৎ এক জায়গায় কিসের সঙ্গে যেন ধাক্কা লাগলো, হাত বাড়িয়ে দেখতে পেলাম আমার সামনে নিরেট পাথরের দেয়াল। বোধহয় আমাকে এই অবস্থাতে ব্যঙ্গ করার জন্যই তার সৃষ্টি!

সর্বনাশ! এগোবো কী ক'রে তবে? এবার আর কোনো আশা নেই, ভরসা নেই, শুধু অসহায়ভাবে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ও নেই। দুঃসহ নিরাশায় পাগলের মতো মেঝেয় মুখ ঘষতে লাগলাম। চেঁচিয়ে শেষবারের মতো কাকামণিকে ডাকবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ

banglabooks.in

বেরোলো না।

এদিকে আস্তে-আস্তে নিস্তেজ হ'য়ে আসতে লাগলো আলো। আর সামান্য কিছুক্ষণ তার আয়ু। শূন্য চোখে ক্রমক্ষীয়মান আলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম, আলো ক্রমেই নিভে আসছে। চারপাশে কারা যেন ছায়ার মতো নাচছে। অন্ধকারের চাপ ঘন হচ্ছে ক্রমশ। যেন পিষে মারবে আমাকে। তারপর এক সময়ে দপ ক'রে নিভে গেলো। এবার অন্ধকার।

অন্ধকার, অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। চারদিকে গভীর, সুতীক্ষ্ণ, অন্তহীন অন্ধকার —সে অন্ধকার যেন স্পর্শ করা যায়, জড়ানো যায় হাতে। ভয়ে শিরশির ক'রে উঠলো গা। মরি যদি, আলোয় মরি যেন! আলো, আলো, একটু আলো—

তারপর আমার জ্ঞান হারিয়ে গেলো।

কতক্ষণ অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে ছিলাম, সঠিক বলতে পারি না। জ্ঞান ফিরতেই উঠে দাঁড়ালাম—তারপর পাগলের মতো সেই অন্ধকারেই ছুটতে লাগলাম। কতোবার আছাড় খেয়ে পড়লাম, কতোবার যে মাথা ঠুকে গেলো দেয়ালে, তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। রক্তে ভরে গেলো চোখ-মুখ। তবু ছুটতে লাগলাম উন্মাদের মতো। তারপর হঠাৎ সজোরে দেয়ালে মাথা ঠুকে গেলো। আবার আমার জ্ঞান হারিয়ে গেলো।

জ্ঞান ফিরতেই শুনতে পেলাম, দূরে—বহুদূরে, বজ্রগর্জনের মতো একটা শব্দ। কিসের শব্দ বুঝতে পারলাম না। উৎকর্ণ হ'য়ে সেই শব্দ শুনবার চেষ্টা করলাম। মিনিট-কয়েক পরে সেই আশ্চর্য শব্দ থেমে গেলো। বুঝতে পারলাম, আমি পাগল হ'য়ে যাচ্ছি, তাই ঐ শব্দের সৃষ্টি হয়েছিলো আমার মগজের স্নায়ু-উপশিরায়।

না ঐ তো আবার—আবারো শব্দ শোনা যাচ্ছে। এবারে অন্যরকম শব্দ। কারা যেন কথা বলছে। কারা? কারা কথা বলছে দেয়ালের ওপাশে? মরিয়া হয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে উঠলাম: 'বাঁচাও, বাঁচাও।'

প্রথমটা কোনো উত্তর পেলাম না। অনেকক্ষণ পরে আবার যেন কাদের কথা কানে ভেসে এলো। তার পরমুহূর্তেই একটা ভীষণ শব্দে চারদিক ছেয়ে গেলো। যতোবারই কথা শুনছি, তার পরক্ষণেই বজ্রের মতো শব্দ উঠছে আমার চার-পাশে।

কে যেন আমার নাম ধ'রে ডাকলো, 'অ্যাকজেল! অ্যাকজেল!'

এবারে বুঝতে পারলাম। তারের মধ্য দিয়ে যেমন ক'রে বিদ্যুতের প্রবাহ

banglabooks.in

বয়, তেমনই এই দেয়ালের ভিতর দিয়ে শব্দ আসছে। আমার কথা ওদের শোনাতে হ'লে এই দেয়ালে মুখ লাগিয়ে বলতে হবে। দেয়ালে মুখ রেখে ডাকলাম, 'কাকামণি।'

উৎকর্ণ হ'য়ে রইলাম উত্তরের জন্য। এক-এক পলক যেন এক-একটি যুগ। অবশেষে আমার কানে এলো কাকামণির গলা : 'অ্যাকজেল, এ কি তোর গলার শব্দ? তুই এখন কোথায়?'

'হ্যাঁ কাকামণি, আমি অ্যাকজেল। পথ হারিয়ে ফেলেছি। আলোটাও নিভে গেছে।'

'সেই জলের রেখাটাই বা কী হ'লো?'

'জলস্রোতটাও হারিয়ে ফেলেছি।'

'হুঁ!' কাকামণির কণ্ঠস্বর শোনা গেলো। 'যাক, কোনো ভয় নেই। গ্যালারির রাস্তা ধরে তোকে কতো খুঁজেছি, তোর নাম ধ'রে কতো ডেকেছি, বন্দুকের শব্দ পর্যন্ত করেছি।—অ্যাকজেল, আরেকটু সাহস করে থাক। পরস্পরের গলা শোনা যাচ্ছে, অথচ কেউ কারো কাছে যেতে পারছি নে; কী করা যায়, ভেবে নি,—একটু অপেক্ষা ক'রে থাক।'

'কাকামণি, আমাদের মধ্যে দূরত্ব কতোটা বলতে পারো?'

'তোর কাছে ফসফরাস-দেয়া ক্রনোমিটারটা আছে তো?' কাকামণি বললেন; 'এক কাজ কর। তুই ঘড়ি ধ'রে আমার নাম উচ্চারণ কর, আমিও ঘড়ি ধ'রে শুনছি, তারপর খেয়াল রাখ ঠিক কতো সময়ে আমার কথা শুনতে পাস। হ্যাঁ এবার ডাকতে পারিস।'

আমি দেয়ালে মুখ রেখে কাকামণিকে ডাকলাম। একটু পরেই শুনতে পেলাম আমার নাম।

কাকামণি শুধোলেন, 'কতো সময় লাগলো?'

'চল্লিশ সেকেণ্ড।'

'তাহ'লে শব্দ আসতে ঠিক বিশ সেকেণ্ড লেগেছে।' বললেন কাকামণি। শব্দ সেকেণ্ডে এগারোশো বিশ ফুট চলে। 'তার মানে, বিশ সেকেণ্ডে বাইশ হাজার চারশো ফুট। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে ব্যবধান হ'লো প্রায় শোয়া চার মাইল।'

অবাক হ'য়ে বললাম, 'শোয়া চার মাইল!'

'হ্যাঁ। তুই এক কাজ কর। নিচের দিকে নেমে আয়, তাহ'লে শিগগিরই দেখতে পাবি আমাদের। তাড়াতাড়ি কর।'

banglabooks.in

সঙ্গে-সঙ্গে রওনা হ'য়ে পড়লাম। পা চলতে চাইছিলো না, শ্রান্তিতে নুয়ে পড়তে চাইছিলো শরীর, তবু সেই ঢালু পথ ধ'রে এগিয়ে চললাম। পথ এমনভাবে গড়ানো যে কোনো-কোনো জায়গায় আমাকে হাঁটতে হ'লো না—কে যেন আমাকে ঠেলে নামাতে লাগলো। মনে হ'লো যেন একটা কুয়োর মধ্যে দিয়ে নামছি। গতি ক্রমশ তীব্র হ'তে লাগলো। চেষ্টা ক'রেও তাকে একটু ধীর করতে পারলাম না। তারপর অনেক নিচে একটা পাথরের উপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। চোখের সামনে নেমে এলো একঝাঁক ঘন অন্ধকার, তারপরে কী হ'লো, তা আমার মনে নেই।

জ্ঞান ফিরতেই দেখলাম একটা কম্বলের উপরে শুয়ে আছি—কাকামণি আমার উপরে ঝুঁকে পড়ে হাতের নাড়ি দেখছেন। আমাকে চোখ মেলে তাকাতে দেখে শিশুর মতো উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন উনি। ক্ষীণভাবে হাসবার চেষ্টা ক'রে শুধোলাম, 'আমরা এখন কোথায় আছি?'

'এখন আর একটাও কথা না, কথা কাল হবে। এখন ঘুমো।'

সত্যি বলতে কি, আমি তখন ভীষণ দুর্বল। তাই পাশ ফিরে শুয়ে চোখ বুজোলাম দ্বিরুক্তি না-ক'রে।

ভোরবেলায় আমার ঘুম ভাঙলো। চারদিক স্বচ্ছ আলোয় উজ্জ্বল। দূরে, অনেক দূরে, কিসের যেন শব্দ হচ্ছিল—ক্ষীণ অথচ স্পষ্ট, মৃদু অথচ উদাত্ত সেই শব্দ—যেন দূরে বেলাভূমির উপরে সমুদ্রতরঙ্গ এসে আছড়ে পড়ছে। প্রথমটা হতভম্ব হ'য়ে গেলাম। স্বপ্ন, না সত্যি?—

না, স্বপ্ন তো নয়—স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তরঙ্গের শব্দ। তবে কি—

কাকামণি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছিস এখন?'

'ভালো। কিন্তু ও কীসের শব্দ? আর এতো উজ্জ্বল আলোই বা কিসের?'

'আস্তে-আস্তে সব বুঝতে পারবি, শুধু আজকের দিনটা ধৈর্য ধ'রে থাক। এখন খোলা হাওয়া লাগলে তোর অসুখ করতে পারে।'

চমকে উঠলাম। 'খোলা হাওয়া? কী বলছ তুমি?'

'ঠিকই বলছি। হাওয়া এখন প্রবল, এমন অবস্থায় তোর চলাফেরা করা ঠিক হবে না। আজকের দিনটা জিরিয়ে নে। নইলে কাল সমুদ্র-যাত্রায় আবার তোর অসুখ করবে।'

আমি আরো হতভম্ব হ'য়ে পড়লাম। সম্বিত ফিরতেই উঠে দাঁড়ালাম। গায়ে র‍্যাগ্‌টা জড়িয়ে এগোলাম কাকামণির সঙ্গে।

banglabooks.in

অল্পক্ষণ পরেই চোখ-ধাঁধানো দিগন্ত-বিসারী উজ্জ্বল আলো পিছলে পড়লো আমার উপরে। সহ্য হ'লো না সেই আলো, অনভ্যস্ত চোখ সহজেই বু'জে এলো। একটু পরে চোখ খুলে যা দেখলাম তাতে বিস্ময়ে অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠতে হ'লো, 'সমুদ্র।'

'হ্যাঁ, সমুদ্র।' বললেন কাকামণি। 'এই সমুদ্রের নাম আমার নামেই দিয়েছি, লিডেনব্রক সাগর।'

নীলাঞ্জিত সমুদ্রের ঢেউ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে আছড়ে পড়ছে বেলাভূমির সোনালি বালিতে, আর সেই সোনালি বালিতে চিকচিক করছে ঢেউ-এর রুপোলি ফেনা। দেখতে একেবারে সমুদ্রের মতো। কিন্তু এ অন্য পৃথিবীর সমুদ্র, পাতালের। তাই যেন একটু নিষ্প্রাণ। চারদিকে যে উজ্জ্বল আলো, তা সূর্যালোক বা চন্দ্রালোক কিছুই নয়, অরোরা বোরিয়ালিসের মতো এও এক ধরনের বৈদ্যুতিক আলো।

নিঃসীম শূন্যে তখন অসম্ভব মেঘ করেছে। যে-কোনো মুহূর্তে মুষলধারে বৃষ্টি পড়তে পারে। বিস্ফারিত চোখে এই অলৌকিক দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি। মনে হ'লো পৃথিবী ছেড়ে যেন অন্য কোনো গ্রহে এসে পড়েছি। পাথরের অন্ধকার গহ্বরে সাতচল্লিশ দিন কাটানোর পর এমন উন্মুক্ত বাতাস আর নীলাঞ্জিত সমুদ্র আমাকে আশ্বাস দিলো, শক্তি দিলো, স্বাস্থ্য দিলো।

উপকূল ধ'রে হাঁটতে লাগলাম কাকামণির সঙ্গে। উপকূল অসম্ভব আঁকাবাঁকা। শুধু পাথর, আর পাথর। কোনোখানে-বা পাহাড়ের ফাটলের মধ্য দিয়ে ব'য়ে চলেছে ঝর্নাধারা, কোথাও বা উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে উঠছে গরম তাপ।

একটু দূরে গভীর জঙ্গল দেখা গেলো। সেই জঙ্গলের ভিতর ঢুকতেই কেমন যেন শীত করতে লাগলো, পায়ের তলার মাটি ভিজে। আধ ঘণ্টা পর সেই জঙ্গল পেরিয়ে আবার সমুদ্র-কূলে এসে পৌঁছলাম। সামনে দেখতে পেলাম আর-একটি জঙ্গল। এই জঙ্গলের গাছপালা খুব বড়ো-বড়ো, প্রত্যেকটি একশো থেকে দেড়শো ফুট উঁচু। মাটিতে নানা জন্তুর শ্বেতবর্ণ কঙ্কাল। অনেকক্ষণ পর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলাম। কাকামণি আমাকে তাঁবুর দিকে নিয়ে চললেন। এইটুকু হাঁটতেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, তাই তাঁবুতে পৌঁছেই শুয়ে পড়লাম আমি।

পরদিন সকালবেলায় ঠিক করলাম, অনেক দিন স্নান করিনি, আজ এমন সুন্দর সমুদ্রে স্নান করতেই হবে। স্ফটিক-স্বচ্ছ উজ্জ্বল জলে স্নান করে উঠবার পর সারা শরীরে স্বাস্থ্যের আবির্ভাব অনুভব করলাম। খিদেও লাগলো বেশ। তাড়াতাড়ি আহার সেরে নিলাম।

banglabooks.in

অল্পক্ষণ পরে কাকামণি জানালেন, 'এবারে সমুদ্রে জোয়ার আসবে।'

'পাতালের সমুদ্রেও জোয়ার-ভাঁটা হয়? আশ্চর্য!'

'আশ্চর্য কিছুই না, স্বাভাবিক। পৃথিবীর সব কিছুই তো অভিকর্ষের অধীন।'

'আচ্ছা কাকামণি, এখন আমরা কোন্ জায়গায় আছি?'

'আইসল্যাণ্ড থেকে প্রায় সাড়ে চারশো মাইল দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। আর পৃথিবীর উপর থেকে কতোটা নিচে নেমেছি জানিস? প্রায় একশো দশ মাইল। এখন আমাদের মাথার উপরে হয় স্কটল্যাণ্ড, নয়তো ইংল্যাণ্ড।—হ্যাঁ, এবারে এই সমুদ্র পেরোবার ব্যবস্থা করতে হবে।'

'সমুদ্র পার হবে?' অবাক হলাম আমি। 'কী ক'রে? জাহাজ কই?'

'জাহাজ বা নৌকা ক'রে পেরোবার কথা তো বলিনি। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে ভেলা বানিয়ে নেবো।'

'আবার এখন গাছ কাটতে হবে?'

'কাটা অনেকক্ষণ হ'য়ে গেছে। চল, দেখে আসবি।'

কাকামণির সঙ্গে মাইলখানেক দূরে গিয়ে দেখি, হান্‌স্ কাঠের টুকরো ও শুঁড়ি দিয়ে বেশ মজবুত ক'রে একটা ভেলা তৈরি করছে।

পরদিন সন্ধের সময় ভেলা তৈরি হ'লো। লম্বায় দশ ফুট, চওড়ায় পাঁচ। তিনজনে ঠেলে ভেলাটিকে জলে নামালাম। জলের উপর বেশ সুন্দর দেখালো আমাদের জল-পোতকে। তখন অন্ধকার গাঢ় হয়েছে ব'লে ভেলাটিকে দড়ি দিয়ে একটা পাথরের সঙ্গে বেঁধে রাখা হ'লো। কাল ভোরে এই ভেলায় চ'ড়েই আমরা পাড়ি দেবো অথই সমুদ্রে।

১১

অন্য পৃথিবীর সমুদ্র-পাড়ি

তেইশে অগস্ট সকালবেলায় আমাদের ভেলা অজানা সমুদ্রে রওনা হ'লো। হান্‌স্ পাল তুলে দিয়ে হালের কাছে গিয়ে বসলো। অনুকূল হাওয়া আর স্রোতের টানে তরতর ক'রে ভেলা এগিয়ে চললো।

কাকামণি বললেন, 'যেখান থেকে আমাদের ভেলা ছাড়লো, সেই বন্দরটার

banglabooks.in

একটা নাম দেয়া উচিত। কী নাম দেওয়া যায় বল তো ?'

'কেন ? বন্দরটার নাম পোর্ট গ্রোবেন দিলেই তো হয়।'

স্মিতমুখে আমার দিকে তাকিয়ে কাকামণি বললেন, 'পোর্ট গ্রোবেন ? বেশ, তাই হোক।'

এই লক্ষ্যহীন নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরোবার পর থেকে সত্যিই গ্রোবেনকে খুব বেশি ক'রে মনে পড়ছিলো।

চব্বিশে অগস্ট শুক্রবার বাতাসকে বেশ শান্ত আর সুস্থির মনে হ'লো। ভেলা তেমনি তরতর ক'রে এগিয়ে চলেছে। সামনে, দু-পাশে, পিছনে—চারদিকে শুধু জল আর জল !

দুপুরবেলার দিকে হান্‌স্ একটি ছিপ নিয়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে বসলো। বঁড়শিতে মাংসের টোপ গেঁথে ছিপ ফেলে ব'সে রইলো সে। ঘণ্টা-দু'য়েক পরে একসময়ে কিন্তু সত্যি-সত্যি ছিপে টান পড়লো। হান্‌স্ তক্ষুনি ছিপ টানলে। দেখতে পেলাম জলে একটা মাছ ছটফট ক'রে নড়ছে।

মাছটা একটু অদ্ভুত ধরনের। মাথাটা আশ্চর্য রকম চ্যাপ্টা, মুখটা গোল, গায়ে বনরুইয়ের মতো শক্ত আঁশ। মুখে দাঁত নেই, পিছনে লেজও নেই। কাকামণি বললেন, 'এটা এ-যুগের মাছ নয়। এ হচ্ছে কোটি-কোটি বছর আগেকার যুগের মাছ। পৃথিবী থেকে এ-মাছ লোপ পেয়ে গেছে। ঐ দ্যাখ, মাছটার কোনো চোখ নেই। পণ্ডিতেরা এ-মাছের তিনটে নাম দিয়েছেন—গ্যানোঅ্যাড, শ্রেফালাসপিডে আর প্টেরিকথ্যিস।'

আমি অবাক চোখে এই দাঁতভাঙা ত্রিনামধারী অদ্ভুত মাছটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। হান্‌স্ আবার ছিপ ফেললে। দেখতে-দেখতে হান্‌স্ সেই জাতের ও অন্যান্য ধরনের প্রায় কুড়িটা মাছ ধরলে। কাকামণি সযত্নে সেগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

সমুদ্রে এতো মাছ, কিন্তু আশ্চর্য, শূন্যে কোনো পাখি নেই।

ছাব্বিশে অগস্ট, রবিবার। কাল সারাদিনে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি, শুধু আকাশটা একটু মেঘলা ছিলো। আজ আকাশ আবার পরিচ্ছন্ন।

সমুদ্রের কোনো কিনারা চোখে পড়লো না। কাকামণিকে খুব উত্তেজিত দেখালো। সমুদ্রের শেষ নেই ব'লে তাঁর রাগের সীমা ছিলো না। আরেকটা প্রশ্নও আমাদের সামনে ছিলো। সাকুন্যুউজম্ কী সত্যিই সমুদ্রপথে এসেছিলেন ?

আটাশে অগস্ট, মঙ্গলবার। কাল বিকেল থেকে সমুদ্রের জলে ভীষণ

banglabooks.in

আলোড়ন চলছে। তবু হান্‌স্‌ সতর্ক হাতে ভেলাটিকে সামলে রেখেছে। আজো সারাদিনে কোথাও সমুদ্রের শেষ দেখা গেলো না। সন্ধেবেলার দিকে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ এক ভীষণ ধাক্কায় আমার দুঃস্বপ্নভরা ঘুম ভেঙে গেলো। ভেলার যে কোণে আমি শুয়েছিলাম, সেই প্রচণ্ড ধাক্কায় সে-কোণ থেকে ছিটকে এসে ভেলার অন্য কোণে পড়লাম আমি। ঘুমের ঘোর কাটবার আগেই একটা জিনিস স্পষ্ট বোঝা গেল যে, কোনো মারাত্মক কারণেই সমুদ্র এমন আলুথালু হ'য়ে উঠেছে।

তারপরেই সন্ধেবেলার অস্পষ্ট আলোয় দেখতে পেলাম ছ-শো গজ দূরে প্রকাণ্ড একটা রাত্রির মতো কালো জিনিশ। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে-সঙ্গে সেও লাফালাফি করছে। অবাক হয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এ যে একটা অতিকায় শুশুক!'

কাকামণি পর্যন্ত অস্ফুট বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ঐ যে একটা ভয়ঙ্কর কুমির! কী বিরাট দেহ! মুখের হাঁ আর চোয়ালের বহরটা দেখেছিস!'

'ঐ দ্যাখো কাকামণি, একটা সামুদ্রিক গিরগিটি—অনায়াসে আমাদের মতো জনাপঞ্চাশকে গিলে ফেলতে পারে!'

'ঐদিকে দ্যাখ তিমিমাছটা কীভাবে জলের মধ্যে আলোড়ন তুলেছে!'

এতগুলো মারাত্মক রকমের অতিকায় জলজন্তু একসঙ্গে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলাম। দেখতে-দেখতে চারদিকে আরো অনেকগুলো জলজন্তু ভেসে উঠলো। তাদের সে কী বিরাট চেহারা! শরীরে কী অসম্ভব জোর! তাদের মধ্যে যেটি সবচেয়ে ছোটো, সেও বোধহয় তার লেজের এক ঝাপটায় আমাদের এই ভেলাটি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে দিতে পারে।

এইসব ভয়ানক জলজন্তুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য হান্‌স্‌ তাড়াতাড়ি ভেলার মুখ খুলে দিলে, যাতে কোনোমতে কোনো নিরাপদ এলাকায় গিয়ে পৌঁছনো যায়। কিন্তু যেদিকেই সে ভেলা চালায়, সেদিকেই পথ বন্ধ। কোথাও পঞ্চাশ ফুট লম্বা একটি কচ্ছপ পথ বন্ধ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে, কোথাও বা তারও বড়ো একটি সাপ ফণা তুলে লেজের ঝাপটা মেরে বিক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে জল। কোনোদিকে যাওয়ার উপায় নেই।

ভয়ে কাঠ হ'য়ে ব'সে রইলাম। এ-কথা বুঝতে আমাদের বাকি ছিলো না যে এদের গুলি ক'রেও কোনো লাভ নেই। এমন সময়ে দুটি জন্তু একেবারে ভেলার দু'পাশে এসে পড়লো—একদিকে সেই মারাত্মক কুমির, আর অন্যদিকে একটি

banglabooks.in

সাংঘাতিক সাপ। ভয়ে আমি চোখ বুজোলাম—এবারে আর রেহাই নেই! জলজন্তু-দুটি কিন্তু ভেলা আক্রমণ না ক'রে পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভেলা থেকে প্রায় তিনশো গজ দূরে তাদের লড়াই চলতে লাগলো। সেই ভয়ংকর ও অলৌকিক লড়াই-এর বর্ণনা দেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তাদের লেজের ঝাপটা আর দেহের পেষণে সমুদ্র ফুলে, ফেঁপে, ফুঁশে উঠলো রাগে। সাপের চোখদুটি টকটকে লাল—মাথাটা আকারে মানুষের মাথার মতো। লম্বায় একশো ফুট সাপটা। কুমিরের শরীরে লোহার মতো কঠিন কালো রঙের আঁশ। তাদের প্রচণ্ড সংগ্রামে মথিত-উন্মথিত হ'তে লাগলো সমুদ্র। আর সেই উথাল-পাথাল সমুদ্রে কতোবার যে ওল্টাতে-ওল্টাতে বেঁচে গেলো আমাদের ভেলা, তার কোনো লেখা-জোখা নেই।

কতোক্ষণ যে ওদের লড়াই চললো, সে-কথা আমার পক্ষে বলা অসম্ভব। শুধু এই কথাই বলতে পারি, অনেকক্ষণ পর অকস্মাৎ দুটিতেই জলের ভিতরে ডুব দিয়ে সমুদ্রের নিচে লড়াই শুরু ক'রে দিলে, আর আরো অনেকক্ষণ পর হঠাৎ জলের উপরে জেগে উঠল একটি ভয়ংকর মাথা। সেটি সাপের। কুমিরের মরণ-কামড়ে মুমূর্ষু সাপটা যন্ত্রণায় উন্মাদ হ'য়ে উঠেছে, আর তার মৃত্যু-যন্ত্রণার আলোড়নে সমুদ্র আলু-থালু হ'তে থাকলো। কিছুক্ষণ পরে আর সেই সাপটার চিহ্নমাত্র দেখা গেলো না। কুমিরটা কোথায় অদৃশ্য হয়েছে কে জানে। সমুদ্রজলের উপর নেমে এলো একরাশ শব্দহীন সমারোহ।

বরাত? হ্যাঁ, বরাত ভালো না থাকলে এমনি অবস্থা থেকে রেহাই পাওয়া একেবারেই অসম্ভব। আর একটুও দেরি না ক'রে প্রাণপণে ভেলাটিকে অন্যদিকে নিয়ে চললাম আমরা।

উনত্রিশে অগস্ট, বুধবার। আকাশে ঘন মেঘ। বিদ্যুতের চাবুক বারে বারে সেই মেঘকে ছিন্ন-ভিন্ন করছে। বিকেল চারটের সময় হান্‌স্ মাস্তুলের উপরে উঠে চারদিক লক্ষ করতে লাগলো—কোথাও তীরের সন্ধান পাওয়া যায় কি না। সমুদ্রের একদিকে সে অনেকক্ষণ ধ'রে স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো। তারপর হঠাৎ দূরে কিসের দিকে আঙুল দিয়ে দেখালো, অবাক গলায় বললো, 'ঐ যে! ঐ দেখুন!'

তক্ষুনি দূরবীন নিয়ে নির্দেশিত দিকে তাকালেন কাকামণি। তারপর উনিও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হুঁ! তাই তো দেখছি!'

বিস্মিত হ'য়ে শুধোলাম, 'কী কাকামণি? আবার নতুন কোনো জানোয়ার

banglabooks.in

নাকি ? তবে আর দেরি করা ঠিক হবে না। শিগগিরই অন্যদিকে ভেলা নিয়ে যেতে হবে।'

'হ্যাঁ,' বললেন কাকামণি, 'আর দেরি করা ঠিক হবে না !'

ভেলা থেকে সেই অপার্থিব অতিকায় বস্তুটি মাইল-কয়েক দূরে হবে। তিমি-মাছের মতন শূন্যে জলের ফোয়ারা ছুঁড়ছিলো সে।

হান্‌স্ যখন সেই অতিকায় জলজন্তুটির দিকেই ভেলা চালাতে লাগলো, তখন রীতিমতো স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। সহস্রবার বারণ করা সত্ত্বেও সে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করলো না আমার কথায়। আস্তে-আস্তে সেই প্রচণ্ড ফোয়ারা স্পষ্ট হ'য়ে উঠতে লাগলো, আর স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো সেই অতিকায় জন্তুটির কুচকুচে কালো শরীর। আর ঠিক সেই সময়ে হান্‌স্ আইসল্যাণ্ডের ভাষায় কী যেন ব'লে উঠলো ঐ জন্তুটিকে নির্দেশ ক'রে।

হান্‌সের কথা শুনে কাকামণি অবাক হ'য়ে গেলেন। 'দ্বীপ ? বলো কী হান্‌স্ ?'

আমার তো বিস্ময়ে বাকরোধ হ'য়ে গেলো একেবারে। হান্‌স্ কি পাগল হ'য়ে গেলো নাকি ? কিন্তু পরক্ষণে শুনলাম কাকামণি বলছেন, 'না, হান্‌স্ ঠিকই বলেছে। দ্বীপই। ঐ জলের ফোয়ারাটা হ'লো উষ্ণ প্রস্রবণ।'

একটু পরেই বোঝা গেলো যে কাকামণির ধারণা মোটেই মিথ্যে নয়। স্পষ্ট হ'তে থাকার সঙ্গে-সঙ্গে উষ্ণ প্রস্রবণটিকে সুন্দর দেখাতে লাগলো। দ্বীপের গড়নটুকুও ভারি অদ্ভুত। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা অতিকায় জলজন্তু জলের উপরে ভাসছে। আর সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, সেই ফোয়ারার চারদিকে বারে-বারে নীল রঙের বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে উঠছিলো।

প্রস্রবণটি যেদিকে ছিলো, তার বিপরীত দিকে ভেলাটিকে বাঁধা হ'লো। দ্বীপটি গ্রানাইট পাথরের। দ্বীপকে দেখলাম থরথর ক'রে কাঁপছে স্টিম-ইঞ্জিনের বয়লারের মতো ; দেখা গেলো দ্বীপটা ফাঁপা, ভিতরটা কেবল গরম বাষ্পে ভরা।

খানিকটা এদিক-ওদিক ঘুরে ভেলায় ফিরে দেখি, হান্‌স্ ইতিমধ্যে ভেলার হালটা মেরামত ক'রে নিয়েছে। সেদিন একটু খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল কিনা জলের ঝাপটায় ! ভেলায় উঠে আবার সেই প্রস্রবণটির দিকে তাকালাম, একটা অদ্ভুত ব্যাপার নজরে পড়লো। ফোয়ারার জল একবার খুব জোরে উঠছে, আর পরের বারে উঠছে খুব আস্তে-আস্তে—ঠিক যেন ইঞ্জিনের ভাল্‌ভ্ থেকে ভলকে-ভলকে বাষ্প বেরোচ্ছে।

banglabooks.in

এইসব লক্ষণ দেখে বুঝতে বাকি রইলো না যে এটা একটা ভয়াবহ আগ্নেয় দ্বীপ।

সারারাত্রি ভেলায় ক'রে অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিলাম আমরা, তাই পরদিন ভোরবেলায় সেই উষ্ণ প্রস্রবণটি আর চোখে পড়লো না।

জোরালো হাওয়ার মুখে প'ড়ে বেশ দ্রুতবেগেই ভেলা চলছিলো। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিলো ঘন-ঘন। মেঘের নিবিড় রঙ দেখে বোঝা গেলো, শিগগিরই একটা ভয়ংকর ঝড় উঠবে। এ-ঝড় তো আর আমাদের পরিচিত পৃথিবীর ঝড় নয় যে, খানিকক্ষণ ধুলোবালি উড়িয়ে গাছ-পালা ভেঙে চারদিক লণ্ড-ভণ্ড ক'রে থেমে যাবে—এ হ'লো শুধু বিদ্যুতের তাণ্ডবলীলা।

ধারণাটি যে মোটেই মিথ্যে নয় তা বুঝতে পারলাম, যখন হঠাৎ আমার দম বন্ধ হ'য়ে যেতে চাইলো। সারা শরীরের মধ্যে কিসের যেন উন্মাদ নৃত্য চলতে লাগলো। স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে চঞ্চল হ'য়ে উঠলো রক্ত। মাথার চুল খাড়া হ'য়ে উঠলো, কাঁটা দিয়ে উঠলো গায়ে। আমার খালি মনে হ'তে লাগলো, এখন যদি কেউ আমাকে ছোঁয়, তবে তখুনি সে ভীষণ শক্ খাবে। এমন প্রবল বিদ্যুতের স্রোত আমার শরীরের মধ্য দিয়ে ব'য়ে যেতে লাগলো, অথচ এমনি স্থানকালের মাহাত্ম্য, যে আমার মৃত্যু হ'লো না।

বাতাসের বেগও বেড়ে চললো দ্রুতগতিতে। মনে হ'তে লাগলো, দিগন্ত-বিসারী মেঘ ফেটে এখনি বুঝি ভলকে-ভলকে আগুন বেরোবে।

কাকামণি আর হান্‌সের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম যে তাঁদের অবস্থাও আমারই মতো।

ঠিক এমন সময়ে আকাশ ফেটে মুষলধারে নামল বৃষ্টি। ভীষণ বেগে ঝড় এলো। ঝড়ের পাল্লায় প'ড়ে নৌকোর মুখ ঘুরে গেলো, পাগলা হ'য়ে গেলো যেন সে। কাকামণি আর আমি ভেলার উপর কাত হ'য়ে প'ড়ে গেলাম। শুধু হান্‌স্ কোনোমতে হালটিকে শক্ত ক'রে ধ'রে ব'সে রইলো। হাওয়ায় তার চুল উড়তে লাগলো, আর চুলের ডগায় জ্বলতে লাগলো বিদ্যুৎ। ভেলা বিদ্যুতের মতো অজানার উজানে ছুটে চললো।

দোসরা সেপ্টেম্বর, রোববার। আজও তেমনি ভয়ংকর হ'য়ে আছে ঝড়ের প্রতাপ। ভেলা ঠিক আগের মতোই তীব্রগতিতে ধেয়ে চলেছে। আমরা তিন-জনেই নিঃঝুম হ'য়ে প'ড়ে আছি ভেলার উপরে। শুধু সকালের দিকে একবার যেন সম্বিত ফিরে এসেছিলো, বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার নাক আর কান

banglabooks.in

দিয়ে দরদর ক'রে রক্তধারা ছুটছে। তারপর যেন বোধশক্তি পর্যন্ত প্রায় সম্পূর্ণ লোপ পেয়ে গেলো।

তেসরা সেপ্টেম্বর, সোমবার। আজ ঝড় যেন আরো ভয়ংকর হ'য়ে উঠেছে। উন্মাদ সমুদ্রের উপর দিয়ে আমাদের ভেলা হু-হু ক'রে ছুটে চলেছে। আমরা তিনজনে কোনোমতে প'ড়ে আছি ভেলার উপরে। ভেলাটি যে এখনো কেন চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে না, তা বুঝবার ক্ষমতা পর্যন্ত আমাদের নেই। তিনদিন ধ'রে আহার, নিদ্রা, কথা বলা—সমস্ত বন্ধ। যেন আমরা সবাই মৃত।

এমন সময়ে ঘটলো একটি অপার্থিব ব্যাপার। তার বর্ণনা দিই, এমন শক্তি আমার নেই। দূর থেকে নক্ষত্রবেগে একটা গোল আগুনের গোলা এসে পড়লো আমাদের ভেলার উপর। তারপর যে কী হ'তে লাগলো, তা যেন ঠিক বুঝতেই পারলাম না। তবে মনে হ'লো সেই আগুনের বলটার রঙ উজ্জ্বল শাদা, আর তাতে নীল রঙের ঈষৎ আভাস। ভেলার উপরে বলটা তীব্রবেগে ছুটোছুটি করতে লাগলো। মাস্তুল, পাল, ছই—সব উড়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গে আমরা মৃত্যুর জন্যে তৈরি হ'য়ে নিলাম। সেই গোল অগ্নিপিণ্ড একবার কাকামণির দিকে এগোয়, আবার কখনো-বা আমার দিকে ছুটে আসে, হঠাৎ আবার হান্‌সের দিকে ধায়। সেই ভয়াবহ নীলাভ উজ্জ্বল উত্তপ্ত বলটির দিকে তাকালেও চোখ ঝলসে যায়। আর আশ্চর্য, কী-এক অদৃশ্য অলৌকিক ক্ষমতায় তখন ভেলার উপরকার সমস্ত লোহার জিনিশপত্র পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করতে লাগলো। তারপর হঠাৎ সেই অগ্নিপিণ্ড ভয়ংকর শব্দে ফেটে গেলো। চারদিকে ছুটতে লাগলো আগুনের ফুলকি। উগ্র নাইট্রোজেন গ্যাসে ভরে গেলো চারদিক। দম বন্ধ হ'য়ে আসতে চাইলো আমাদের।

একটু সম্বিত ফিরলে পর তাকিয়ে দেখি, সেই অগ্নিপিণ্ড অদৃশ্য হয়েছে। কাকামণি ভেলার উপরে অজ্ঞান হ'য়ে প'ড়ে আছেন। হান্‌স্ হিস্টিরিয়া রোগীর মতো মৃত চোখে তাকিয়ে আছে দিগন্তের দিকে।

চৌঠা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার। সকাল হ'তেই দেখা গেলো আকাশে তখনো নিবিড় মেঘের অন্ধকার লীলা, তখনো ঝড়ের তেমনি তাণ্ডব। এরই মধ্যে কাকামণি হিশেব ক'রে এক সময়ে চিঁ-চিঁ করে নিস্তেজ গলায় জানালেন যে, আমরা ঠিক জার্মেনির নিচে আছি। এ-কথা শুনে হ্যামবুর্গের কথা মনে পড়লো আমার, মনে পড়লো, আমাদের ছোটো বাড়িটার কথা, মার্থার কথা, গ্রোবেনের কথা। আর, ঠিক এমন সময়ে একটা ভয়ংকর শব্দ কানে এলো।

banglabooks.in

কী হ'লো বুঝে ওঠার আগেই প্রবলবেগে ভেলা থেকে ছিটকে পড়লাম সমুদ্রের জলে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তেই হান্‌স্ জলে লাফিয়ে প'ড়ে তার সবল বাহুতে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে আমাকে ফিরিয়ে আনলো হান্‌সের সেই সুঠাম, সবল চেহারা আমি কখনো ভুলবো না। কিন্তু তারপরে কী ঘটেছিলো, তা আমার মনে নেই। জ্ঞান ফিরে এলে দেখি আমি ডাঙায় শুয়ে আছি। আমার চারিদিকে সকালবেলার অনাবিল আলো।

আমাকে চোখ খুলতে দেখে কাকামণি বললেন, 'যাক, শেষ অবধি এই নচ্ছার সমুদ্র-যাত্রা শেষ হ'লো। শেষ হ'লো, তো যেন বাঁচা গেলো! এবার ডাঙার উপর দিয়ে চলবো, আর তাও সোজা নিচের দিকে।'

বললাম, আচ্ছা কাকামণি, দিনের পর দিন তো এগিয়েই চলেছি; কিন্তু ফিরবো কী করে? আর কবে?'

কাকামণি হেসে বললেন, 'আগে তো পৌঁছুই, তারপরে কবে ফিরবো সে-কথা ভাবা যাবে। চল, ভেলার হাল-চাল কী-রকম দেখে আসি।'

ভেলার কাছে গিয়ে দেখি, অনেক খাবার ভেসে গেছে, বন্দুকগুলো অকেজো হ'য়ে গেছে, আর ভেলার যা হাল, তাতে মেরামত না করলে জলে ভাসানো চলবে না। খাবার যা আছে তাতে অনায়াসে মাসচারেক চ'লে যাবে। যন্ত্রপাতির মধ্যে কাকামণি দিকবীক্ষণ যন্ত্রটা (কম্পাস) তুলে নিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর চোখ-মুখের ভাব বদলে গেলো। অবাক হ'য়ে তাঁর দিকে তাকাতেই নীরবে তিনি কম্পাসটি আমার হাতে তুলে দিলেন। লক্ষ ক'রে দেখি, কী আশ্চর্য, যে দিক দক্ষিণ ব'লে ভেবেছিলাম, যন্ত্রের কাঁটা সে দিককে উত্তর ব'লে নির্দেশ করছে!

বিমূঢ়ভাবে কাকামণি খানিকক্ষণ ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর নিষ্ফল আক্রোশে কাঁপতে লাগলেন শুধু। সামনে না গিয়ে এতদিন তবে আমরা শুধু পিছিয়েই চলেছি! ভাগ্যের এ কী পরিহাস!

ইতিমধ্যে কাকামণি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। নিশ্চিত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আবার তবে নতুন ক'রে রওনা হবো আমরা!'

আমি থ' হ'য়ে গেলাম। কাকামণি তবে কোনোমতেই হাল ছাড়বেন না!

কাকামণি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে হান্‌স্‌কে নির্দেশ দিলেন ভেলাটি খুব শিগগির মেরামত ক'রে ফেলবার জন্য, তারপর আমায় বললেন, 'আয় একবার দ্বীপটা ঘুরে আসা যাক।'

প্রতিবাদ করবার কোনো চেষ্টা করলাম না আমি। জানতাম নিষ্ফল হবে।

banglabooks.in

নীরবে কাকামণির সঙ্গে দ্বীপ-ভ্রমণে বেরোলাম। সামনেই একটা ছোটো টিলা পড়লো। টিলাটি ছাড়িয়ে একটা ঢালু জায়গা। সেখানে রাশি-রাশি সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল। যতোই এগোতে লাগলাম, ততোই এই কঙ্কালের সংখ্যা বাড়তে লাগলো। এদের বিবর্ণ ধূলি-ধুসর অবস্থা দেখে বোঝা গেলো, বহু সহস্র বছর ধ'রে এরা প'ড়ে আছে। কাকামণি এক পা চলেন, তারপর থামেন, হেঁট হ'য়ে সেইসব কঙ্কাল পরীক্ষা করেন, আর বিস্ময়ে আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে তাঁর চোখ-মুখ। মাঝে-মাঝে এই কারণে তিনি আমার পিছনে প'ড়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তাঁর বিহ্বল চিৎকার শুনে কাছে ছুটে গিয়ে দেখি, দু'হাতের চেটোর উপর একটা মানুষের মাথার খুলি নিয়ে স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

'এ যে মানুষের মাথার খুলি!'

অনেকক্ষণ আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না।

বৈজ্ঞানিকদের মত যাই হোক না কেন, স্পষ্টই বুঝতে পারছিলাম যে, কোটি-কোটি বছর আগে হাতি গণ্ডার বা অন্য কোনো ভূচর প্রাণীর সৃষ্টির আগেই মানুষ জন্ম নিয়েছিলো। খানিকক্ষণ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে থেকে আবার কাকামণি এগোতে লাগলেন। আমিও নীরবে তাঁকে অনুসরণ করলাম। এইমাত্র নিজের চোখে যা দেখলাম, তা যেন আমার নিজেরই বিশ্বাস হতে চাইছিলো না। এরপর পথে অসংখ্য নর-কঙ্কাল দেখতে পেলাম। পশু-কঙ্কালও। চারদিকেই যেন মৃত্যু সদাজাগ্রত প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে—এমনি দেখাতে লাগলো সেই কঙ্কালময় শ্মশানভূমিকে।

দু'মাইল চলবার পর এক বিশাল ঘন-সন্নদ্ধ অরণ্যের কাছে এসে দাঁড়ালাম। গাছপালা যে এতো বড়ো, এতো সতেজ হতে পারে, সে ধারণা ছিলো না। পাইন, বার্চ, সাইপ্রেস, ফার, ওক প্রভৃতি আকাশ-ছোঁয়া নানান জাতের গাছের সমারোহ। তবে একটা জিনিশ দেখলাম যে, গাছগুলি সমস্তই বিবর্ণ। বুঝতে পারলাম, সূর্যালোকের অভাবই এর প্রচ্ছন্ন কারণ।

কাকামণি নির্ভয়ে অরণ্যের মধ্যে প্রবেশ করলেন। বাধ্য হয়ে আমিও তাঁকে পায়ে-পায়ে অনুসরণ করলাম। আর খানিকক্ষণ চলার পর যা চোখে প'ড়লো, তা দেখে ভূত দেখার মতো চমকে উঠলাম আমি। তাড়াতাড়ি থমকে দাঁড়িয়ে গতিরোধ করলাম কাকামণির। উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে সব কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিলো।

দেখা যাচ্ছিলো যে, অরণ্যের মধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অতিকায় সব মূর্তি

banglabooks.in

ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই অতিকায় জন্তুগুলো আর কিছুই নয়,—হাতি আঠারোশো এক সালে ওডিও শহরে ভূগর্ভ থেকে যে জাতের হাতির বিরাট একটি কঙ্কাল সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিলো, এই হাতিগুলোও সেই অধুনালুপ্ত আদিম পৃথিবীর হাতির দলের।

আমার জন্যে কিন্তু আরো বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো। স্তম্ভিত বিস্ময়ে নিষ্পলক চোখে হাতিগুলোর দিকে তাকিয়ে আছি, এমন সময়ে কাকামণি অরণ্যের এক-প্রান্তের দিকে তর্জনী নির্দেশ করলেন। নির্দেশিত দিকে তাকিয়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হ'লো না। কোনো সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তি এ-কথা কল্পনায় আনতে পারে না। দেখতে পেলাম, একটি আকাশ-ছোঁয়া ওক গাছের নিচে একটি জীবন্ত মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে দানবের মতো, লম্বায়-চওড়ায় আমাদের চারগুণ হবে, হাতে তার রীতিমতো বড়ো-সড়ো একটি গাছ। বুঝতে পারলাম, সে হাতিগুলোর রাখাল। মাথায় তার এলোমেলো বড়ো-বড়ো চুল, মাথাটি দেখতে অনেকটা মহিষের মতো, মুখের ভাব যেন কোনো বনমানুষের।

ভয়ে বিস্ময়ে আমার গলা শুকিয়ে গেলো। ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলাম আমি হতবাক হ'য়ে। আর, ঠিক এমন সময়ে কাকামণি আমার হাতে চাপ দিয়ে ফিসফিসিয়ে বললেন : 'শিগগির, এখুনি আমাদের পালাতে হবে!'

তারপর সে কী ছোটা! এক নিশ্বাসেই যেন ভেলার কাছে এসে পৌঁছলাম আমরা। হান্‌স্—যে হান্‌স্ কখনও অবাক হয় না—সে পর্যন্ত আশ্চর্য হ'য়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলো। তখনো আমাদের কথা বলবার শক্তি ফিরে আসেনি। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাঁফাচ্ছিলাম আমরা। এইমাত্র যা দেখে এলাম, তা কি সত্যি, না আমাদের বিকৃত কল্পনা? সত্যিই কি পৃথিবীর অনেক নিচে যে আরেক পৃথিবী, সেখানে এখনো আদিম যুগের মানুষদের বাস?

অনেকক্ষণ পর যখন একটু সুস্থ হলাম, তখন কাকামণি হিশেব ক'রে জানালেন যে, পোর্ট গ্রোবেন থেকে আমরা বেশি দূরে নেই। কেননা ঝড়ের জন্যে আমরা দিক ভুল ক'রে আবার সেই আগের দ্বীপেই ফিরে এসেছি।

এবার তাই হান্‌স্‌কে নিয়ে আমরা অন্য দিকে হেঁটে চললাম। যে ক'রেই হোক, পোর্ট গ্রোবেন খুঁজে বার করতে হবে।

অল্পক্ষণ চলবার পর বেলাভূমির উপরে কী একটা চকচকে জিনিশ দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে কুড়িয়ে নিলাম। দেখি, একটি ছোরা, তার কোনো-কোনো

banglabooks.in

স্থানে মরচে পড়ে গেছে। কাকামণিকে দেখাতে তিনি বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে বললেন : 'কোথেকে এলো এটা ? আমরা তো এদিকে আগে আসিনি ! এরকম ছোরাও তো আমাদের নেই !' ছোরাটা হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা করলেন কাকামণি। শেষে বললেন : 'না, এ আমাদের ছোরা নয়। এর গড়ন দেখে বোঝা যাচ্ছে এ অনেক দিন আগেকার ছোরা। আর যতোদিন আগেকারই হোক না কেন, এ তো আর নিজে থেকে এখানে আসেনি, একজন কেউ নিয়ে এসেছিল নিশ্চয়ই।'

'কিন্তু কে সেই ব্যক্তি ?' শুধোলাম আমি।

'ছোরার ডগাটা কী রকম অসমানভাবে ক্ষয়ে গেছে, দেখেছিস ? ঠিক মনে হয় কেউ এটা দিয়ে পাথরের উপরে নিজের নাম খোদাই ক'রে গেছে। এখন সেইটেই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

কাকামণির কথা শুনে কৌতূহলী হ'য়ে চারদিকের পাথরের গা পরীক্ষা করতে-করতে চললাম। ঘণ্টাখানেক পরে সমুদ্র-সৈকতে একটা পাথরের উপরে দেখলাম দুটি অদ্ভুত ধরনের হরফ খোদাই করা রয়েছে। সেই অক্ষর-দুটো দেখে কাকামণি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ, এস্ ! তার মানে, আরন্ সাকৃন্যুউজম্ !'

বলা বাহুল্য, খোদিত হরফ-দুটো রুনিক। আর যে পাথরটার উপরে তা খোদাই করা, তার পাশেই রয়েছে একটা সুড়ঙ্গপথ।

১২

জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে

আমাদের এই অবিস্মরণীয় ভ্রমণ যেদিন থেকে শুরু হয়েছে সেদিন থেকে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছিলাম। কারণ, পাতালে প্রবেশ করবার পর থেকে এতোসব আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আসছি যে, ভেবেছিলাম আমাকে স্তম্ভিত করতে পারে এমন বোধহয় আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। কিন্তু যখন দেখলাম এই গভীর পাতালে, এই অন্য পৃথিবীতেও আরন্ সাকৃন্যুউজম বিরাজ করছেন, তখন একেবারে হতবাক হ'য়ে গেলাম। যে-ছোরাটা নিয়ে আমরা এতক্ষণ মাথা ঘামাচ্ছিলাম, সেটি যে তাঁরই তা স্পষ্টই বোঝা গেলো, কেননা পাথর কেটে নাম

banglabooks.in

লেখবার দরুন এর ফলা স্থানে-স্থানে ভেঙে গিয়েছিলো।

সঙ্গে-সঙ্গে ভেলায় ফিরে গেলাম আমরা। ভেলাটা তাড়াতাড়ি মেরামত ক'রে ঘণ্টাখানেক পরে সেখানটায় আবার ফিরে এলাম। বাতাস অনুকূল না থাকলে হয়তো আরো দেরি হ'তো। ভেলাটা ঐ সুড়ঙ্গের কাছে নিয়ে আসবার কারণ হ'লো, একবার ঐ সুড়ঙ্গের ভিতর ঢুকে কী-কী জিনিশ সুড়ঙ্গ-অভিযানে দরকার হ'তে পারে তা সঙ্গে নিয়ে বাকি সবকিছু ভেলায় রেখে যাওয়া যেতে পারে।

তখনি টর্চ জেলে সেই অজানা সুড়ঙ্গের অন্ধকারে পদার্পণ করলাম। কাকামণি আর হান্‌স্‌ এবার আমার পিছনে পড়লেন, স্যাকৃন্যুউজমের নাম আমার মনে এবার সত্যি-সত্যি উদ্দীপনার মশাল জেলে দিয়েছিলো। কাকামণির হিশেবমতো তখনো পৃথিবীর একেবারে কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছুতে সাড়ে চার হাজার মাইল বাকি ছিলো। সেটুকুই বা আর বাকি থাকে কেন? একেবারে শেষ দেখে যাওয়াই ভালো। এবং সেই শেষের পথ যে এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়েই এগিয়েছে, তা সুড়ঙ্গের বাইরে ঐ নাম খোদাই দেখেই বুঝতে পেরেছিলাম।

সুড়ঙ্গের পথ চওড়ায় হাত-চারেক হবে,—দু'ধারে সুদৃঢ় পাথরের দেয়াল। একটু এগোতে-না-এগোতেই আমার মাথায় যেন বাজ পড়ল। দেখতে পেলাম, সুড়ঙ্গ-পথের মুখ বন্ধ ক'রে একটি বিরাট পাথর সামনে প'ড়ে আছে। সে পাথর সরানো মানুষের পক্ষে অসম্ভব।

হতাশ হ'য়ে আমরা সেই সুড়ঙ্গের মেঝেয় ব'সে পড়লাম।

সাকৃন্যুউজম্‌ নিশ্চয়ই এখান থেকে ফিরে যাননি। পাতালে তিনি শেষাবধি নিশ্চয়ই পৌঁছেছিলেন, আর পৌঁছেছিলেন এই সুড়ঙ্গপথ ধ'রে এগিয়েই। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পরে বোধহয় কোনো ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতে পাথর প'ড়ে এই পথ বন্ধ হ'য়ে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ আমার চোখে আশার আলো ঝিকিয়ে উঠলো। বললাম: 'কাকামণি, বারুদ দিয়ে এই পাথরটা উড়িয়ে দিলে হয় না?'

সঙ্গে-সঙ্গে উল্লসিত হ'য়ে উঠলেন কাকামণি: 'ঠিক বলেছিস!

তখনি বারুদ ঢালবার জন্য গর্ত খুঁড়তে শুরু ক'রে দিলাম। পঁচিশ সের বারুদে আগুন দেবার ব্যবস্থা করতে অনেক সময় লাগলো। নাইট্রিক অ্যাসিড আর সালফিউরিক অ্যাসিডে তুলো ভিজিয়ে বারুদ তৈরি করেছিলাম আমরা। সাধারণ বারুদের চেয়ে এই বারুদের শক্তি অনেক বেশি। হান্‌স্‌ গর্ত করতে

banglabooks.in

লাগলো। আমি আর কাকামণি বারুদে আগুন দেবার জন্যে লম্বা শলতে তৈরি করতে লাগলাম। ক্রমে রাত্রি হ'য়ে এলো। তারপর যখন সকল আয়োজন শেষ ক'রে বারুদ দিয়ে গর্ত ভরাট ক'রে শলতের এক প্রান্ত বারুদের মধ্যে রেখে অন্য প্রান্ত সুড়ঙ্গের বাইরে আনলাম, তখন কাকামণি বললেন : 'আজ আর কাজ নেই, কাল দিনের আলোয় শলতেয় আগুন দেয়া যাবে।'

পরদিন সকালবেলা ছ'টার সময় আমরা তৈরি হ'য়ে সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়ালাম, কাকামণিকে ব'লে-ক'য়ে শলতেয় আগুন দেবার ভারটা আমিই নিলাম। কাকামণি আমাকে বারবার সতর্ক করে দিলেন : 'সাবধান, এক সেকেণ্ডও যেন দেরি না হয়, আগুন দিয়েই প্রাণপণে দৌড়ে এসে ভেলায় উঠবি! তুই ভেলায় এলেই আমরা সমুদ্রের মধ্যে ভেলা ঠেলে দেবো। পাহাড় যে কতোখানি ধ্ব'সে যাবে, কে জানে! শলতের আগুন বারুদের কাছে যেতে লাগবে প্রায় দশ মিনিট। এর মধ্যেই আমাদের নিরাপদ দূরত্বে স'রে যেতে হবে।'

আমাকে এইভাবে বারবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হান্‌স্‌কে নিয়ে কাকামণি ভেলায় গিয়ে উঠলেন। ভেলাকে সমুদ্রপথে ঠেলে দেবার জন্য তৈরি হ'য়ে দাঁড়ালেন ওঁরা। একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমি শলতের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর একহাতে লণ্ঠন ধরে অন্য হাতে শলতের আগা ধরলাম। একবার হাত কাঁপলো। কাকামণি হাঁকলেন : 'হুঁশিয়ার! দাও আগুন!'

তক্ষুনি শলতেয় আগুন দিলাম। দপ ক'রে জ্বলে উঠলো শলতেটা, তীব্রবেগে অগ্নিশিখা অগ্রসর হ'লো সুড়ঙ্গের দিকে। আমিও বিদ্যুদ্বেগে ভেলায় এসে উঠলাম। সঙ্গে-সঙ্গে কাকামণি আর হান্‌স্‌ কোনোরকমে ভেলাটিকে তীর থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে সরিয়ে নিলেন। আর, ঠিক তখনি—

ঠিক তখনি আকাশ-পাতাল কেঁপে উঠলো। বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম কি না মনে নেই, শুধু এইটুকুই মনে আছে যে, যেখানে পাথর ছিলো, পলকের মধ্যেই সেখানে একটি অতল গহ্বর দেখা দিল। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে ফুঁশে উঠলো। যে সাংঘাতিক ধাক্কায় আমরা তিনজনেই ভেলার উপরে ছিটকে পড়লাম, আর নিবিড় অন্ধকার এসে আমাকে ঢেকে ফেলবার আগে শুধু এটুকুই বুঝতে পারলাম যে, আমরা নিচের দিকে নামছি।

সম্বিত যখন ফিরলো, তখন বুঝতে পারলাম যে ঐ বিপুল পাথরটার ওপাশে ছিলো একটি অতল গহ্বর। বিস্ফোরণের ফলে পাথরটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেলে বিপুল একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং সেই কারণেই সমুদ্রের জল প্রবল একটি

banglabooks.in

জলপ্রপাতের মতো সেই গহ্বরটির ভিতর প্রবেশ করতে থাকে। স্রোতের সেই প্রবল আকর্ষণ আমাদের ভেলাটিকেও রেহাই দেয়নি। জলস্রোতের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ভেলাও গহ্বরের ভিতর দিয়ে নামতে শুরু ক'রে দিয়েছে। এবার যে আর বাঁচোয়া নেই, সে-কথা বুঝতে পেরে ভয়ে চোখ বুজে রইলাম। দু'পাশের পাথরের গায়ে ঘা লাগলে ভেলার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও নিঃসন্দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবো।

প্রচণ্ড বেগে পাতালে নামতে লাগলাম। আশ্চর্য যে, একবারো পাথরের দেয়ালের সঙ্গে ভেলার সংঘর্ষ বাধলো না। বুঝলাম যে, গহ্বরের বিস্তার বিরাট ব'লেই এমন কোনো সংঘর্ষ ঘটলো না। স্যাকনুসউজমের পাতালের পথে আমাদের দুর্বুদ্ধি একটি তীব্র জলস্রোতকে আমাদের অদৃষ্টের সঙ্গে গেঁথে নিয়ে এলো। যে-রকম প্রবল বেগে হাওয়া আমাদের ঝাপটা মারছিলো, তাতে বুঝতে পারছিলাম যে দ্রুততম যানের চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতগতিতে আমরা পাতালের দিকে নামছি। টর্চটা ভেঙে গিয়েছিলো ব'লে গহ্বরটা পরীক্ষা করতে পারছিলাম না অন্ধকারে।

কতোক্ষণ ধ'রে যে নেমেছিলাম, আজকে তা আমি সঠিক বলতে পারবো না, তবে এ-কথা মনে আছে যে, অনেক—অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়ে ভেলাটা থেমে গেলো, তারপর একটা জলধারা তীব্রবেগে আমাদের উপর পড়তে লাগলো। বোধহয় মিনিটখানেক পড়েছিলো সেই জলধারা,—তারপরেই আবার ভেলাটা চলতে শুরু করে দিলে। এবার কিন্তু জলের গর্জন আর শোনা গেলো না।

এমন সময় কাকামণি আমাকে ডেকে বললেন : 'অ্যাকজেল, আমরা কিন্তু নামছি না, উপরে উঠছি!'

বিস্মিত হ'য়ে শুধোলাম : উপরে উঠছি! কোথায়? কী ক'রে?'

'কী ক'রে জানি নে, কিন্তু সত্যিই উপরে উঠছি।' বললেন কাকামণি। 'কোনোমতে যদি একটা আলো জ্বালা যায়, তবেই ভালো ক'রে বোঝা যাবে।,

একটামাত্র টর্চলাইটই তখন সম্বল ছিলো ভেলায়। হান্‌স্ অনেক চেষ্টা ক'রে হাতড়ে-হাতড়ে সেটা বার ক'রে জ্বাললে। একটুখানি আলো অনেকখানি আশা আনলে মনে।

কাকামণি বললেন : 'যা ভেবেছিলাম! জলে গহ্বরের তলা ভ'রে যাওয়ায় জল এবারে অন্য পথ দিয়ে উপরে উঠছে, আমরাও সেই জলের সঙ্গে-সঙ্গে উপরে

banglabooks.in

উঠছি। কিন্তু হুঁশিয়ার,—প্রতি মুহূর্তেই একটা-না-একটা বিপদ আসতে পারে! এখন বোধহয় আমরা ঘণ্টায় দশ মাইল বেগে উঠছি। যদি এইভাবে উঠতে থাকি—'

'আর যদি এই সুড়ঙ্গের একটা বহির্মুখ থাকে—'

'তাহ'লে ভালোই হয়। কিন্তু না থাকলে পাথরে ঘা লেগে চূর্ণ হ'য়ে যাবো', বললেন কাকামণি। 'কিন্তু সে তো আরো খানিকক্ষণ পরের ব্যাপার। এখন তো খেয়ে নিই কিছু!'

এতোক্ষণ খবরটা চেপে রেখেছিলাম, কিন্তু এবার খুলে বলতে হ'লো। আগেই আমি লক্ষ্য ক'রে দেখেছিলাম, ভেলায় কোনো খাবার নেই, সব জলে ছিটকে প'ড়ে গেছে। খুঁজে-পেতে দু-এক টুকরো শুকনো মাংস পাওয়া যেতে পারে হয়তো।

এই কথা শুনে শূন্য চোখে আমার দিকে তাকালেন কাকামণি।

যেমন বেগে উঠছিলাম, তেমনি উঠতে লাগলাম। ক্রমশ যেন উত্তাপ বাড়ছে ব'লে মনে হ'লো। হঠাৎ এমনটা কেন হ'লো বুঝতে পারছিলাম না। এতোদিন তো পাতালে কেটেছে, তবু কখনো এতো উত্তাপ দেখিনি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে উত্তাপ ভয়ানক বেড়ে গেলো। আমি শুধু কাকামণিকে একবার বললাম: 'নেহাৎ যদি ডুবে না মরি, পাথরের সঙ্গেও যদি ঘা না খাই, খিদের হাত থেকেও যদি রেহাই পেয়ে যাই,—তবু বাঁচবো ব'লে তো আশা হচ্ছে না! হয়তো-বা পুড়েই মরতে হবে আমাদের!'

কাকামণির চোখে-মুখে এই প্রথমবার ভয়ের চিহ্ন দেখলাম। কোনো কথা বললেন না তিনি, শুধু তাঁর ঠোঁটদুটো একবার কাঁপলো।

আরো এক ঘণ্টা কাটলো। উত্তাপ ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তারপর হঠাৎ হু-হু ক'রে আরো বেড়ে গেলো অনেকখানি। সঙ্গে-সঙ্গে ভেলার গতিও যেন অনেকখানি বেড়ে গেল। ভেলার চারপাশে টগবগ করে জল ফুটতে লাগলো। উত্তাপ ক্রমশ সহ্যাতীত হ'য়ে উঠলো। দম বন্ধ হ'য়ে আসতে চাইলো আমার। গন্ধকের উগ্র গন্ধে ভ'রে উঠলো চারপাশ। আগুনের চেয়েও গরম যেন গহ্বরটি! কাকামণির দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর ভুরু কুঁচকে গেছে, কপালে পড়েছে চিন্তার রেখা। বুঝলাম, সাংঘাতিক একটি অনর্থ আসন্ন।

আর তার প্রমাণও পেলাম প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই। মশালের ক্ষীণ, চঞ্চল আলোয় দেখলাম, দেয়াল ফেটে চৌচির হ'য়ে গেছে, আর সেই ফাটল থেকে বেরুচ্ছে

banglabooks.in

গ্যাস। আর তখন শুনতে পেলাম একটা গুরু-গুরু গর্জন।

ঠিক সেই মুহূর্তে বিবর্ণ, নিরুত্তাপ একটি হাসি ফুটলো কাকামণির ঠোঁটে। বললেন : 'সুড়ঙ্গপথে অগ্ন্যুদগার শুরু হয়েছে, অ্যাকজেল, এ-সব তারই অগ্রদূত। আগ্নেয়গিরির উদ্গার আমাদের ঠেলে উপরের দিকে তুলছে।'

'সর্বনাশ!' ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। 'তাহ'লে কি আমরা অগ্নিময় তরল ধাতু-স্রোতের মধ্যে এসে পড়েছি?'

আবার কাকামণির ঠোঁটে সেই প্রাণহীন হাসিটা দেখলাম।

ভয়ংকর তীব্রবেগে উঠছে আমাদের ভেলা। একটি জ্বলন্ত ধাতুস্রোত তাকে ঠেলে তুলছে উপরে। পাথরের দেয়াল তখন একবার ফাটছে, আবার পরমুহূর্তেই জোড়া লাগছে। সব-কিছু ছাপিয়ে উঠছে একটা প্রলয়-গর্জনের শব্দ।

এত দ্রুতবেগে আমাদের ভেলা উপরের দিকে উঠছিল যে, আমরা আগুনে ঝলসে যাইনি। ক্রমশ যেন ভেলার গতিবেগ প্রচণ্ড থেকে প্রচণ্ডতর হচ্ছিলো।

তারপর যে কী হয়েছিলো, মনে নেই। জ্ঞান হারিয়ে ফেলার আগের মুহূর্তে শুধু এইটুকুই দেখেছিলাম যে, হান্‌সের সুগঠিত গ্রীক স্ট্যাচুর মতো দেহ আগুনের লালে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। আমার মস্তিষ্কের মধ্যে একাকার হ'য়ে গেলো জীবন আর মৃত্যু, আর তার পরক্ষণেই কে যেন আমাকে কামানের মুখে বেঁধে কামান দাগলো। অমনি আমি মহাশূন্যে উড়ে গেলাম।

১৩

সেই পুরাতন পৃথিবী

জ্ঞান যখন ফিরলো তখন দেখতে পেলাম, হান্‌স্‌ এক হাতে আমাকে, অন্য হাতে কাকামণিকে ধ'রে রেখেছে, আর আমাদের সামনে পাহাড়টি সোজা নেমে গেছে নিচের দিকে। হান্‌স্‌ ধরে না রাখলে সেই উঁচু পাহাড় থেকে প'ড়ে গিয়ে নিশ্চিতই মৃত্যু ঘটতো আমাদের।

অবসন্ন গলায় হান্‌স্‌কে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কোথায়? আইসল্যাণ্ডে?'

হান্‌স্‌ ঘাড় নেড়ে বললে, 'না।'

'তবে কোথায়?'

banglabooks.in

হান্‌স্‌ কোনো উত্তর দিলে না।

নিজের দেহের পানে তাকিয়ে দেখি, অর্ধনগ্ন দেহ, ধুলো-বালি-কালিতে ভূতের মতো দেখাচ্ছে। একটু দূরে পাঁচশো ফুট উঁচু একটি পর্বতশিখর থেকে পনেরো মিনিট অন্তর প্রচুর ধোঁয়া আর ছাই উঠছিলো তখন। আমাদের পাহাড়টি আর চারপাশের জমিও কাঁপছিলো বেশ।

ভালো ক'রে চারদিকে তাকিয়ে দেখি, নিলীম নীল আকাশে পাঁজা-পাঁজা তুলোর মতো শাদা মেঘ, চারদিকে সূর্যের সোনালি। আকাশে, বাতাসে, মাটিতে অপর্যাপ্ত অজস্র আলো। সূর্যের প্রসন্ন আশীর্বাদকে যেন হৃদয়ের গহন প্রদেশে টেনে নিলাম আমি নিশ্বাসের সঙ্গে। কতোদিন যে আকাশ দেখিনি!

বুঝতে পারলাম, আবার ফিরে এসেছি পৃথিবীতে। ফিরে এসেছি সেই পুরাতন পৃথিবীর কোনো এক দ্বীপে, যেখানে প্রাণ আছে, আলো আছে, প্রকৃতির সবুজ স্নেহ আছে। কিন্তু জায়গাটির নাম কী হ'তে পারে তা বুঝতে পারলাম না।

কাকামণি বললেন, 'কম্পাসের নির্দেশ অনুযায়ী জায়গাটা উত্তরমেরু হওয়া উচিত। কিন্তু তা যে নয়, স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু জায়গাটার নাম যাই হোক, এখানে আর থাকা ঠিক হবে না, নিচে নামতে হবে আমাদের, এক্ষুনি।'

ঘণ্টা-দু'এক বাদে খুব আস্তে-আস্তে হেঁটে আমরা পাহাড়ের নিচে এসে দাঁড়ালাম। পাহাড়ের নিচে অজস্র ফল-মূলের গাছ। বোধহয় কারো বাগান। মালিকের অনুমতি নেবারও তর সইলো না। সেই ফল-মূল পেড়ে প্রাণ ভ'রে খেলাম আমরা। সামনেই একটা ঝরনা বন-হরিণীর মতো নৃত্যচপল ভঙ্গিতে ছুটে চলছিলো। আকণ্ঠ পান করলাম তার ঠাণ্ডা জল।

জল খেতে-খেতে লক্ষ্য করলাম, অদূরে একটি গাছের আড়াল থেকে একটি কিশোর ছেলে কৌতূহলী চোখে আমাদের দেখছে। ছেলেটি আমাদের দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলো। ভয় পাওয়ারই কথা। আমাদের তখন যা চেহারা, তাতে ভয় না পাওয়াটাই ছিলো তার পক্ষে অস্বাভাবিক। ছেলেটি প্রাণের ভয়ে দৌড় দেবার উপক্রম করতেই হান্‌স্‌ তাকে পাকড়াও করলো।

কাকামণি ছেলেটিকে অনেক আদর ক'রে প্রথমে জার্মান ভাষায় শুধোলেন, 'এ জায়গাটার নাম কী খোকা?'

কোনো জবাব নেই।

বোঝা গেলো এটা জার্মানির কোনো এলাকা নয়। এবারে কাকামণি ইংরেজিতে প্রশ্ন করলেন, 'জায়গাটার নাম কী বলো তো?' ছেলেটি তবুও কোনো

banglabooks.in

উত্তর দিলে না দেখে ইতালীয় ভাষায় কাকামণি একই প্রশ্ন উচ্চারণ করলেন। তবুও সে চুপ ক'রে রইলো।

এবারে কাকামণি চ'টে-মটে ধমক দিয়ে উঠলেন।

অমনি ছেলেটি রুদ্ধশ্বাসে ব'লে উঠলো, 'স্ট্রম্বলি, স্ট্রম্বলি।' আর তারপরেই সে কোনোমতে নিজেকে মুক্ত ক'রে পড়ি-কি-মরি ক'রে দৌড় দিলো।

আমরা তিনজনেই সমস্বরে বিস্মিত কণ্ঠে বললাম, 'স্ট্রম্বলি!'

কোথায় আইসল্যাণ্ডের স্নেফেল পর্বত, আর কোথায় সিসিলির এট্না আগ্নেয়গিরি! একশো কি দু-শো নয়, তিন হাজার মাইলের ব্যবধান! স্তম্ভিত হ'য়ে এট্নার দিকে তাকালাম আমি।

কাকামণি ব'লে উঠলেন, 'কম্পাসটা ফেলে দে তো—ওটা আগাগোড়া আমাদের ভুল পথ দেখিয়েছে!'

...

মাস-ছ'য়েক পরে জার্মেনির হামবুর্গের কনিগস্টাসের সেই ছোট্টো বাড়িটায় অধ্যাপক হের লিডেনব্রকের পড়বার ঘরটা ঝেড়েমুছে সাজাচ্ছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ আমার চোখ পড়লো সেই পুরোনো কম্পাসটার উপর। পাতাল-ভ্রমণের সঙ্গী ছিল ব'লে ওটাকে আর ফেলে দিইনি। দেখতে পেলাম, কম্পাসের কাঁটা যাকে দক্ষিণ দিক ব'লে নির্দেশ করছে, তা আসলে উত্তর দিক।'

অবাক হলাম আমি। কাকামণিকে খবর দিতেই তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'সত্যিই কম্পাসের কাঁটাটা দিক বদল ক'রেছে। যেদিন আমরা এট্নার মুখ দিয়ে বেরোই, সেদিনেও কাঁটাটা আসলে দক্ষিণ মুখেই ছিলো।'

'কিন্তু কী করে এমনটা হ'লো?' বিস্মিত কণ্ঠে শুধোলাম আমি।

কাকামণি বললেন, 'পাতালের সমুদ্র পাড়ি দেবার সময় একটা বৈদ্যুতিক বল আমাদের ভেলায় ফেটেছিলো, তোর মনে আছে সে-কথা? সেদিন ভেলার সকল লোহাই চুম্বক হ'য়ে গিয়েছিলো। কম্পাসের কাঁটাটাও বাদ যায়নি। সেই থেকেই সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গিয়েছিল।' এই ব'লে হো-হো ক'রে হেসে উঠলেন তিনি।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো, অন্তহীন পাতাল-সমুদ্রে খড়্কুটোর মতো ভাসছে আমাদের ছোট্টো ভেলাটি, আর তার উপর ছুটোছুটি করছে শাদা-নীল একটি গোল অগ্নিচক্র; ঝড়ে সমুদ্র ফুঁশছে, উদ্দাম হাতে করতালি দিচ্ছে ঝড়!!

banglabooks.in

লাগলো। আমি আর কাকামণি বারুদে আগুন দেবার জন্যে লম্বা শলতে তৈরি করতে লাগলাম। ক্রমে রাত্রি হ'য়ে এলো। তারপর যখন সকল আয়োজন শেষ ক'রে বারুদ দিয়ে গর্ত ভরাট ক'রে শলতের এক প্রান্ত বারুদের মধ্যে রেখে অন্য প্রান্ত সুড়ঙ্গের বাইরে আনলাম, তখন কাকামণি বললেন : 'আজ আর কাজ নেই, কাল দিনের আলোয় শলতেয় আগুন দেয়া যাবে।'

পরদিন সকালবেলা ছ'টার সময় আমরা তৈরি হ'য়ে সুড়ঙ্গের মুখে এসে দাঁড়ালাম, কাকামণিকে ব'লে-ক'য়ে শলতেয় আগুন দেবার ভারটা আমিই নিলাম। কাকামণি আমাকে বারবার সতর্ক করে দিলেন : 'সাবধান, এক সেকেণ্ডও যেন দেরি না হয়, আগুন দিয়েই প্রাণপণে দৌড়ে এসে ভেলায় উঠবি! তুই ভেলায় এলেই আমরা সমুদ্রের মধ্যে ভেলা ঠেলে দেবো। পাহাড় যে কতোখানি ধ্ব'সে যাবে, কে জানে! শলতের আগুন বারুদের কাছে যেতে লাগবে প্রায় দশ মিনিট। এর মধ্যেই আমাদের নিরাপদ দূরত্বে স'রে যেতে হবে।'

আমাকে এইভাবে বারবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে হান্‌স্‌কে নিয়ে কাকামণি ভেলায় গিয়ে উঠলেন। ভেলাকে সমুদ্রপথে ঠেলে দেবার জন্য তৈরি হ'য়ে দাঁড়ালেন ওঁরা। একটা লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমি শলতের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর একহাতে লণ্ঠন ধরে অন্য হাতে শলতের আগা ধরলাম। একবার হাত কাঁপলো। কাকামণি হাঁকলেন : 'হুঁশিয়ার! দাও আগুন!'

তক্ষুনি শলতেয় আগুন দিলাম। দপ ক'রে জ্বলে উঠলো শলতেটা, তীব্রবেগে অগ্নিশিখা অগ্রসর হ'লো সুড়ঙ্গের দিকে। আমিও বিদ্যুদ্বেগে ভেলায় এসে উঠলাম। সঙ্গে-সঙ্গে কাকামণি আর হান্‌স্‌ কোনোরকমে ভেলাটিকে তীর থেকে প্রায় চল্লিশ গজ দূরে সরিয়ে নিলেন। আর, ঠিক তখনি—

ঠিক তখনি আকাশ-পাতাল কেঁপে উঠলো। বিস্ফোরণের শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম কি না মনে নেই, শুধু এইটুকুই মনে আছে যে, যেখানে পাথর ছিলো, পলকের মধ্যেই সেখানে একটি অতল গহ্বর দেখা দিল। সমুদ্রের জল ফুলে ফেঁপে ফুঁশে উঠলো। যে সাংঘাতিক ধাক্কায় আমরা তিনজনেই ভেলার উপরে ছিটকে পড়লাম, আর নিবিড় অন্ধকার এসে আমাকে ঢেকে ফেলবার আগে শুধু এটুকুই বুঝতে পারলাম যে, আমরা নিচের দিকে নামছি।

সম্বিত যখন ফিরলো, তখন বুঝতে পারলাম যে ঐ বিপুল পাথরটার ওপাশে ছিলো একটি অতল গহ্বর। বিস্ফোরণের ফলে পাথরটা চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে গেলে বিপুল একটি আলোড়নের সৃষ্টি হয় এবং সেই কারণেই সমুদ্রের জল প্রবল একটি

banglabooks.in

জলপ্রপাতের মতো সেই গহ্বরটির ভিতর প্রবেশ করতে থাকে। স্রোতের সেই প্রবল আকর্ষণ আমাদের ভেলাটিকেও রেহাই দেয়নি। জলস্রোতের সঙ্গে-সঙ্গে আমাদের ভেলাও গহ্বরের ভিতর দিয়ে নামতে শুরু ক'রে দিয়েছে। এবার যে আর বাঁচোয়া নেই, সে-কথা বুঝতে পেরে ভয়ে চোখ বুজে রইলাম। দু'পাশের পাথরের গায়ে ঘা লাগলে ভেলার সঙ্গে-সঙ্গে আমরাও নিঃসন্দেহ চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাবো।

প্রচণ্ড বেগে পাতালে নামতে লাগলাম। আশ্চর্য যে, একবারো পাথরের দেয়ালের সঙ্গে ভেলার সংঘর্ষ বাধলো না। বুঝলাম যে, গহ্বরের বিস্তার বিরাট ব'লেই এমন কোনো সংঘর্ষ ঘটলো না। স্যাক্‌নুসেমজের পাতালের পথে আমাদের দুর্বুদ্ধি একটি তীব্র জলস্রোতকে আমাদের অদৃষ্টের সঙ্গে গেঁথে নিয়ে এলো! যে-রকম প্রবল বেগে হাওয়া আমাদের ঝাপটা মারছিলো, তাতে বুঝতে পারছিলাম যে দ্রুততম যানের চেয়েও অনেক বেশি দ্রুতগতিতে আমরা পাতালের দিকে নামছি। টর্চটা ভেঙে গিয়েছিলো ব'লে গহ্বরটা পরীক্ষা করতে পারছিলাম না অন্ধকারে।

কতোক্ষণ ধ'রে যে নেমেছিলাম, আজকে তা আমি সঠিক বলতে পারবো না, তবে এ-কথা মনে আছে যে, অনেক—অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা খেয়ে ভেলাটা থেমে গেলো, তারপর একটা জলধারা তীব্রবেগে আমাদের উপর পড়তে লাগলো। বোধহয় মিনিটখানেক পড়েছিলো সেই জলধারা,—তারপরেই আবার ভেলাটা চলতে শুরু করে দিলে। এবার কিন্তু জলের গর্জন আর শোনা গেলো না।

এমন সময় কাকামণি আমাকে ডেকে বললেন : 'অ্যাকজেল, আমরা কিন্তু নামছি না, উপরে উঠছি!'

বিস্মিত হ'য়ে শুধোলাম : উপরে উঠছি! কোথায়? কী ক'রে?'

'কী ক'রে জানি নে, কিন্তু সত্যিই উপরে উঠছি।' বললেন কাকামণি। 'কোনোমতে যদি একটা আলো জ্বালা যায়, তবেই ভালো ক'রে বোঝা যাবে।,

একটামাত্র টর্চলাইটই তখন সম্বল ছিলো ভেলায়। হান্‌স্ অনেক চেষ্টা ক'রে হাতড়ে-হাতড়ে সেটা বার ক'রে জ্বাললে। একটুখানি আলো অনেকখানি আশা আনলে মনে।

কাকামণি বললেন : 'যা ভেবেছিলাম! জলে গহ্বরের তলা ভ'রে যাওয়ায় জল এবারে অন্য পথ দিয়ে উপরে উঠছে, আমরাও সেই জলের সঙ্গে-সঙ্গে উপরে

banglabooks.in

এ সায়ান্টিস্ট কিডন্যাপ্‌ড

banglabooks.in

এ সায়ান্টিস্ট কিডন্যাপ্‌ড

banglabooks.in

১

আরোগ্য নিকেতন

১৮৯০ সালের ১৫ই জুন 'হেল্‌থফুল হাউস' ব'লে একটি আরোগ্য নিকেতনের অধ্যক্ষ একটি কার্ড পেলেন, তাতে কোনো বংশচিহ্ন নেই, শুধু নাম লেখা :

লে কোঁৎ দাতিগাস

তলায় পেনসিলে লেখা : 'পামলিকো সাউণ্ডের নিউ-বার্নে নোঙর ফেলা "এব্বা" নামক স্কুনার থেকে।'

উত্তর-ক্যারোলাইনার নিউ-বার্ন নয়জে নদীর শাখার একেবারে শেষ প্রান্তে অবস্থিত। নদীটা পামলিকো সাউণ্ড নামে একটা বিশাল হ্রদে এসে পড়েছে : হ্রদের চারপাশে ছোটো-ছোটো কয়েকটা দ্বীপ।

হঠাৎ কেন কোঁৎ দাতিগাস এ-কার্ড পাঠালেন, সেটা অধ্যক্ষ সহজে বুঝতে পারতেন না, যদি-না তার সঙ্গে একটা ছোট্ট চিরকুটে কাউণ্ট তাঁর এই আরোগ্য নিকেতন দেখতে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করতেন। দয়া ক'রে যদি অধ্যক্ষ তাঁকে পরিদর্শন করার অনুমতি দেন তাহ'লে কাউণ্ট আজ বিকেলেই 'এব্বা'র কাপ্তেন স্পেডকে নিয়ে একবার ঘুরে যেতে চান।

ও-রকম বিখ্যাত আরোগ্য নিকেতন দেখতে অনেক বিদেশীই এর আগে এসেছেন ; মারকিন মুলুকের ধনকুবেররা ছাড়া আর-কেউই বড়ো-একটা এখানে থাকার সুযোগ পায় না। অধ্যক্ষ জানালেন যে কাউণ্টের মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এলে তিনি অনুগৃহীত ও কৃতার্থ বোধ করবেন।

সেরা লোকেরা চাকরি করে হেল্‌থফুল হাউসে, আমেরিকার সেরা ডাক্তাররা এর সঙ্গে জড়িত। এটা একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান, সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা তত্ত্বাবধান —কোনোটাই এর পিছনে নেই। শুধু ধনকুবেররা যাতে আরামে থাকেন, সেই-জন্যেই এখানে সব ব্যবস্থা করা আছে।

এর চাইতে ভালো জায়গাও বাছা যেতো না। একটা টিলার আড়ালে ঢাকা মূল ভবনটি, চারপাশে দুশো একর-জোড়া একটা বীথিকা, চমৎকার সব গাছ বসানো সেখানে। বীথিকার নিচের ঢাল থেকে শুরু হয়েছে নয়জের মস্ত শাখা-

banglabooks.in

নদী, দূর থেকে আসে সমুদ্রের নোনা হাওয়া, সারাক্ষণ থাকে পামলিকো সাউণ্ডের কোমল বাতাস।

চমৎকার স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে এখানে ধনী রোগীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করা হয়; আরোগ্যলাভের সংখ্যাও সাধারণ স্বাস্থ্যনিবাসের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি যদিও দীর্ঘস্থায়ী দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসার জন্য স্থাপিত হয়েছে, এখানে মনোবিকারের রোগীদেরও ভর্তি করার বাধা নেই—বিশেষ ক'রে যে-সব ক্ষেত্রে রোগ মনে হয় সারবে না, সে-সব ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ রোগী নিয়ে থাকেন।

যখনকার কথা বলা হচ্ছে, তখন একজন মস্ত নামজাদা লোককে সেখানে দেড় বছর ধ'রে বিশেষ পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছিলো। কাউণ্ট দার্তিগাস হয়তো সেজন্যেই এই স্বাস্থ্যনিবাসে আসতে চাচ্ছেন।

সেই বিরাট মানুষটি একজন ফরাশি বৈজ্ঞানিক, তমাস রশ, বয়েস চল্লিশ। তাঁর যে মনোবিকার ঘটেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই; কিন্তু এখনো কোনো ডাক্তার তাঁকে পুরোপুরি উন্মাদ ব'লে ঘোষণা করেননি। বেঁচে থাকতে গেলে যে-সব সোজা-সহজ কাজকর্ম করতে হয়, সেগুলো তিনি করতেই পারেন না, অথচ যেটা তাঁর প্রতিভার ক্ষেত্র, সেখানে তাঁর যুক্তি ও বোধ স্বচ্ছ, প্রচণ্ড ও অপ্রতিরোধ্য-ভাবে ক্রিয়াপরায়ণ। আর এটা কে না জানে 'প্রতিভার সঙ্গে অনেক সময়েই অপ্রকৃতিস্থতার মিলন' ঘ'টে থাকে। কিন্তু যখন তাঁর প্রতিভাকে কাজে খাটাতে বলা হয়, তখুনি তিনি প্রলাপ বকেন, অসংলগ্ন এলোমেলো কথা বলেন। যুক্তির বালাই থাকে না, এমনকী জন্তুদের মধ্যে স্বজ্ঞার যে-প্রকাশ ঘটে, অর্থাৎ আত্ম-রক্ষার যে-চেষ্টা দেখা যায়, তাও যেন তখন তাঁকে ত্যাগ করে। তখন তাঁকে প্রায় যেন ছেলেমানুষের মতো সামলাতে হয়। হেল্‌থফুল হাউসের বীথিকার ১৭ নম্বর মণ্ডপে তিনি আছেন—দিনরাত থাকেন তাঁর শুশ্রূষাকারীর চোখে-চোখে।

সাধারণ উন্মাদনা অনেক সময় নৈতিক উপায়ে সেরে যায়। ওষুধপত্তর এ-ক্ষেত্রে অক্ষম, এটা সবাই জানে। কিন্তু তমাস রশের বেলায় কি নৈতিক চাপ কাজ করবে? তাতে সন্দেহ আছে। অস্থিরতা, ক্ষণে-ক্ষণে মতিপরিবর্তন, সহজেই উত্ত্যক্ত হ'য়ে-পড়া, নানান অদ্ভুত বাতিক ও ঝোঁক, বিষাদ, অনীহা, আমোদপ্রমোদে বীতরাগ—এ-সব হচ্ছে তাঁর রোগের লক্ষণ। এর কোনো চিকিৎসাই নেই।

উন্মাদরোগ আসলে তীব্র ও প্রচণ্ড মানসজীবনেরই প্রকাশ। মানুষ যখন বড্ড বেশি ক'রে নিজের অন্তর্জীবন নিয়ে মগ্ন হ'য়ে পড়ে, তখনই পারিপার্শ্বিক থেকে

banglabooks.in

আস্তে-আস্তে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যায়। বহির্জগৎ সম্বন্ধে রশের ঔদাসীন্য একেবারে পূর্ণাঙ্গ। কেবল নিজেকে নিয়েই তিনি ব্যস্ত, নিজের মধ্যেই মগ্ন; কেবল একটা স্থির ভাবনা, সব-কিছু সম্বন্ধে নিঃসাড় একটা প্রচণ্ড ভাবনাই, তাঁকে এই অবস্থায় এনে ফেলেছে। কোনো প্রচণ্ড নাড়া খেয়ে আবার যদি বাস্তবে ফিরে আসেন—তবে সেটা অবশ্য একেবারে অসম্ভব নয়, কিন্তু সুদূরপরাহত।

দেড় বছর আগে ওয়াশিংটনে মারকিন মুলুকের নৌসচিব তমাস রশের কাছ থেকে একটি সাক্ষাৎকারের আবেদন পেয়েছিলেন। তিনি যদিও জানতেন তমাস রশ কী বলবেন, তবু তিনি তক্ষুনি সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেন। রশের খ্যাতি বা কুখ্যাতি এতই বিপুল ছিলো যে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করার মতো অবস্থা নৌসচিবের ছিলো না।

তমাস রশ একজন আবিষ্কারক—প্রতিভাবান উদ্ভাবক। পর-পর অনেকগুলো বড়ো-বড়ো আবিষ্কার তাঁর ব্যক্তিত্বকে এর মধ্যেই জগৎবিখ্যাত ক'রে তুলেছিলো। এমন কতগুলো সমস্যার ব্যবহারিক সমাধান তিনি দিয়েছিলেন যে বৈজ্ঞানিক সমাজে তাঁর খ্যাতি তুঙ্গে পৌঁছেছিলো। কত লোক তাঁর বিরোধিতা করেছে, অপমান করেছে কতজনে, খবরকাগজে তাঁকে নিয়ে কত রটনা কত জল্পনা কত কটুকাটব্য ঠাট্টা-টিটকিরি হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। হয়তো তারই জের হিশেবে এখন তিনি এই শোচনীয় অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন।

তাঁর নতুন আবিষ্কারের নাম 'রশ ফুলগুরেটর'—একটা প্রচণ্ড ক্ষেপণাস্ত্র। তাঁর নিজের কথা যদি বিশ্বাস করতে হয় তাহ'লে বলতেই হয় এই মারণাস্ত্র যেদেশের হাতে থাকবে জলে-স্থলে সে-দেশের শ্রেষ্ঠতা তর্কাতীত হ'য়ে উঠবে।

সবসময়েই আবিষ্কর্তাদের দুর্ধর্ষ সব শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে হয়। প্রথমত কেউ সহজে তাঁদের দাবি মানতে চায় না। তারপর দেশের সচিবরা কিছুতেই তাঁদের পাত্তা দিতে চায় না। কিন্তু তমাস রশের বেলায় সচিবদের ততটা দোষারোপ করা যায় না—নিজের আবিষ্কারের জন্যে এমন-একটা বাড়াবাড়ি দাম তিনি হেঁকে বসলেন যে তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চালানোই দায় হ'য়ে উঠলো। রশেরও কোনো দোষ নেই। কারণ আগেকার আবিষ্কারগুলোর জন্য কেলেঙ্কারি-রকম কম টাকা পেয়েছিলেন তিনি, প্রায় জলের দরেই সব বেচে দিয়েছিলেন; অথচ তাঁর চেয়ে অনেক আজেবাজে ছলছুতোয় অনেকেই সেই সময় সরকার-গুলোকে দোহন ক'রে নিচ্ছিলো। সেই জন্যেই রশ একেবারে অবিশ্বাসে ভ'রে গিয়েছিলেন, স্থির করেছিলেন এবার নিজের বয়ান অনুযায়ীই চুক্তি করবেন, তাঁর

banglabooks.in

শর্তকেই মানতে হবে সকলকে—এমনকী আবিষ্কারটা সর্বসমক্ষে পরীক্ষা করার আগেই তাঁকে টাকা দিতে হবে।

ফরাশি ব'লে রশ প্রথমে ফরাশি সরকারকেই ফুটগুরেটর বিক্রির প্রস্তাব করেন। স্বয়ংচল একটি বিস্ফোরক, উড়োন চাকতির মতো একটা ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে ভরা, নতুন ধরনের জোরালো বিস্ফোরকওলা এই ফুলগুরেটর আদ্যোপান্ত তাঁরই আবিষ্কার। তাঁর মতে, বহু দূরবর্তী লক্ষ্যকে পর্যন্ত সে মুহূর্তে ধুলোয় মিশিয়ে দিতে পারবে। কেল্লা, যুদ্ধজাহাজ, সেনাব্যারাক—কোনো-কিছুই তাঁর সামনে প্রতিরোধ নিয়ে দাঁড়াতে পারবে না। কাজেই এই অস্ত্র হাতে পেলে ফরাশি সরকার কোনো যুদ্ধবিগ্রহে আর পরাস্ত হবে না, যেমন প্রতিরোধ, তেমনি আক্রমণ—দু-ক্ষেত্রেই তার শ্রেষ্ঠতা হবে তর্কাতীত। কেউ এ-কথা বিশ্বাস করলো না। পরীক্ষা ক'রে না-দেখলে, সত্যি, তারা বুঝবে কী ক'রে? তমাস রশ বললেন কোটি-কোটি মুদ্রা হাতে পেলেই তিনি সর্বসমক্ষে পরীক্ষার ব্যবস্থা করবেন।

বোঝা যাচ্ছে তখনই তিনি খেপে উঠেছেন। পুরোপুরি সব-কিছু অনুধাবন করার ক্ষমতা আর তাঁর নেই; হয়তো পুরো পাগল হননি, কিন্তু হ'তে কতক্ষণ? না-হ'লে কি কোনো সরকারকে এ-রকম একটা অদ্ভুত প্রস্তাব তিনি করতে পারতেন? ফরাশি মন্ত্রীসভা তো দরদস্তুরের কোনো চেষ্টাই আর করলো না। সবগুলি খবর-কাগজে রশকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করা হ'লো। কোনো দেশই যে এই শর্তে তাঁর সঙ্গে চুক্তি করতে রাজি হবে না, এটা সবাই মানতে বাধ্য হ'লো।

রশ প্রত্যাখ্যান পেয়ে যতটা চটেননি, খবর-কাগজের কৌতুকে একেবারে অগ্নিশর্মা হ'য়ে উঠলেন। দেশপ্রেম মাথায় উঠলো। সীমান্ত পেরিয়ে তিনি আলেমান দেশে গিয়ে জর্মান সরকারকে ফুলগুরেটর বিক্রি ক'রে দিতে চাইলেন। আলেমান সরকার তাঁর শর্ত শুনেই পিছিয়ে গেলো। তাছাড়া তখন জর্মান বৈজ্ঞানিকরাও গোলন্দাজ বিদ্যা নিয়ে গবেষণা করছিলো, কাজেই তারা তাঁর আবিষ্কারকে ততটা গুরুত্বই দিলে না।

এবার রশ শুধু যে রুষ্ট হলেন তাই নয়, প্রচণ্ড ঘৃণায় ভ'রে গেলেন। বিশেষ ক'রে ইংরেজরাও যখন তাঁকে ফিরিয়ে দিলো তখন তিনি যেন প্রায় অন্ধ ও বধির হ'য়ে উঠলেন। তখন শেষ চেষ্টা করবার জন্যে তিনি এলেন মারকিন মুলুকে।

মারকিনরা অনেক কাণ্ডজ্ঞান রাখে। তারা দরদাম নিয়ে টানাহেঁচড়া করলো না; তারা তাঁর কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিলো। বুঝেছিলো এটা নিশ্চয়ই অভূতপূর্ব কোনো প্রবল শক্তিশালী বিস্ফোরক। তিনি যে প্রতিভাবান, এটা তারা মেনে

banglabooks.in

নিলে, কিন্তু ভাবলে যে সাময়িকভাবে মনোবিকারে ভুগছেন—সেরে উঠলে তাঁর সঙ্গে একটা আপোষে পৌঁছোনো যাবে, এই ভেবে তাঁরা তাকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করালো। তাঁর মনের সমতা যে ভেঙে পড়েছে, এটা সবাই একবাক্যে বললে। তখন তাঁকে কোনো উন্মাদাশ্রমে না-পাঠিয়ে এই হেল্‌থফুল হাউসে পাঠিয়ে দেয়া হ'লো।

জোর ক'রে পাগল ঠাওরানো হয়েছে, রশের নিজের অভিমত ছিলো এটাই। এতে তিনি আরো ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠলেন। সেই জন্যে হাজার শুশ্রূষাতেও কোনো কাজ হ'লো না। শুধু যখন নিজের আবিষ্কার সম্বন্ধে কথা ওঠে, তখনই বোঝা যায় তিনি যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞান ধরেন, না-হ'লে সবসময়েই তিনি ক্ষিপ্ত থাকেন। জেদ, একগুঁয়েমি, টান-টান রোষ ও ঘৃণা—সবসময়েই এই অনুভূতিগুলোই তাঁকে আচ্ছন্ন ক'রে রাখে। কিন্তু বিস্ফোরকটি সম্বন্ধে কথা উঠলেই তিনি পুরোপুরি সুস্থ মানুষ। তাই ব'লে তার সূত্রগুলো কিন্তু তিনি কিছুতেই ফাঁস ক'রে দেন না, সেদিক থেকে পুরো সেয়ানা, সব চেপে রেখে দেন। একবার-দুবার যখন প্রচণ্ডভাবে বিক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিলেন তখন মনে হয়েছিলো, এই বুঝি সবগুলো সূত্র ব'লে দেবেন, তক্ষুনি লোকজন ডেকে সব টুকে নেবার ব্যবস্থাও করা হয়েছিলো। কিন্তু মিথ্যে চেষ্টা। তমাস রশ যদিও বাচ্চাদের মতো নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় কিছুই বোঝেন না, গোপন তথ্যগুলো ঠিক চেপে রাখতে পারেন।

হেল্‌থফুল হাউসের বীথিকায় ১৭ নম্বর মণ্ডপটির চারপাশে ঝোপ দিয়ে ঘেরা একটা বাগান আছে, শুশ্রূষাকারীর রক্ষণাবেক্ষণে সেখানে রশের রোজ হাঁটা-চলার কথা, যাতে ব্যায়াম হয়, শরীর ভালো থাকে। তাঁর শুশ্রূষাকারীও তাঁরই সঙ্গে থাকে এই মণ্ডপে, একই ঘরে ঘুমোয়, দিনরাত্রি তাঁকে চোখে-চোখে রাখে, কখনও এমনকী এক ঘণ্টার জন্যও তাঁকে ছেড়ে চ'লে যায় না। বিকারের ঘোরে রশ যখন মাঝে-মাঝে তোড়ে কথা বলেন, তার প্রত্যেকটি শব্দ সে যেন গোগ্রাসে গেলে, এমনকী রশ ঘুমের ঘোরে কিছু বললেও সে-সব মন দিয়ে শোনে।

রশের শুশ্রূষাকারীর নাম গেডন। রশকে হেল্‌থফুল হাউসে আনবার পরেই যখন জানা গেলো যে ফরাশি-জানা একজন শুশ্রূষাকারী চাই তখনই গেডন চাকরির জন্য দরখাস্ত করে ও তাকেই সঙ্গে-সঙ্গে চাকরিতে বাহাল করা হয়। তথাকথিত গেডন কিন্তু আসলে একজন ফরাশি এনজিনিয়ার, সিমোন আর্‌ৎ। নিউ-জারসির এক রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে তিনি কয়েক বছর ধ'রে চাকরি করছিলেন। সিমোন আর্‌ৎ-এর বয়েস চল্লিশ, কপালটা খুব চওড়া, সরল খাড়া রেখায় মুখটা তৈরি;

banglabooks.in

বোঝা যায় কিছুই যাঁর চোখ এড়ায় না, তিনি সেই ধরনের মানুষ ; তাঁর শক্ত গড়ন একই সঙ্গে স্বাস্থ্য, জেদ আর অধ্যবসায়ের ইঙ্গিত দেয়।

সিমোন আর্‌ৎ কিন্তু নিজেই আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র ও তাদের সমস্যা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। ইদানীন্তন কালে গোলন্দাজবিদ্যায় যত নতুন আবিষ্কার হয়েছে, সব তাঁর নখদর্পণে। তমাস রশের মেজাজমরজি বোঝার যোগ্য মানুষটি। ফুলগুরে-টরের ক্ষমতা সম্বন্ধে সিমোন আর্‌ৎ-এর সন্দেহ ছিলো না ; তিনি বিশ্বাস করতেন যে এই নতুন আবিষ্কার যুদ্ধবিদ্যায় যুগান্তর এনে দেবে।

সিমোন আর্‌ৎ বুঝেছিলেন যে উন্মাদরোগও এই বৈজ্ঞানিকটিকে রেয়াৎ ক'রে চলে ; আংশিক উন্মাদ তিনি, সন্দেহ নেই, কিন্তু এখনো তাঁর ভিতর একটা তীব্র আলো জ্বলছে, জ্বলছে একটা শিখা, প্রতিভার দীপ্তি ; সেইজন্যেই রশ যদি বিকারের ঘোরে কখনো নিজের আবিষ্কারের কথা ফাঁস ক'রে দেন, তাহ'লে একজন ফরাশি বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার হয়তো বৈদেশিক রাষ্ট্রের কুক্ষিগত হয়ে যাবে। সেইজন্যেই তিনি বৈজ্ঞানিকের শুশ্রূষাকারী হবার জন্য আবেদন করে-ছিলেন ; যেন একজন মারকিন, চোখে-মুখে ফরাশি কইতে জানেন, এই পরিচয়ে তিনি এখানে চ'লে আসেন। ইয়োরোপে ফিরে যাচ্ছেন, এই ওজুহাতে রাসায়নিক প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে নাম পালটে তিনি এসে আবেদন করেছিলেন ; ঘটনাচক্র ছিলো তাঁর অনুকূল ; গত পনেরো মাস ধ'রে হেল্‌থফুল হাউসে তিনি তমাস রশের শুশ্রূষাকারীর পদে কাজ ক'রে যাচ্ছেন।

দুর্লভ স্বার্থহীনতা ও জ্বলন্ত দেশপ্রেমই তাঁকে এ-কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। না-হ'লে সিমোন আর্‌ৎ যে-শ্রেণীর মানুষ ও যে-রকম শিক্ষিত, তাতে এই তুচ্ছ কাজ তাঁর মনঃপূত হবার কথা নয়। কিন্তু এ-কথা ভুললে চলবে না যে, এনজিনিয়ার কখনো তমাস রশের আবিষ্কার মেরে দিয়ে নিজের নামে চালাবার কথা স্বপ্নেও ভাবেননি। যদি সত্যিই কখনো তিনি সব সূত্র জেনে যান, তাহ'লে সব খ্যাতি ও বিত্ত যাতে তমাস রশেরই উপর বর্তায়, তার ব্যবস্থা করাই ছিলো তাঁর অভিপ্রায়।

কাজেই গেডন, ওরোফে সিমোন আর্‌ৎ, পনেরো মাস ধ'রে ছায়ার মতো এই আবিষ্কারকের সঙ্গে-সঙ্গে রয়েছেন ; সবসময়েই তাঁর উপর তিনি নজর রেখে যাচ্ছেন, রক্ষা করছেন তাঁকে সব-কিছু থেকে, মাঝে-মাঝে এমনকী নিরুত্তর প্রশ্নও ক'রে যাচ্ছেন। যতই গেডন তাঁকে আবিষ্কার সম্বন্ধে কথা বলতে শোনেন ততই এই আবিষ্কারের অসাধারণ গুরুত্ব সম্বন্ধে তাঁর বিশ্বাস বদ্ধমূল হ'য়ে ওঠে ; আর

banglabooks.in

সেই জন্যেই এই ভয়ে তিনি ম'রে যান যে যদি এই আংশিক উন্মত্ততা একদিন পুরোপুরি রশকে দখল ক'রে বসে! যদি একদিন কোনো আঘাতে রশ সম্পূর্ণ পাগল হ'য়ে যান! তখন এই আবিষ্কার তো চিরতরে জগৎ থেকে হারিয়ে যাবে! কিন্তু তবু এই আশাহীন কর্তব্যেই সিমোন আর্‌ৎ এই পনেরো মাস ধ'রে আত্ম-নিয়োগ করেছেন।

সুখের কথা, রশের দৈহিক স্বাস্থ্য খুবই ভালো থেকে গেছে। হয়তো তার স্নায়ুর তীব্র ও প্রচণ্ড সপ্রাণতাই যাবতীয় শারীরিক আক্রমণ থেকে তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মাঝারি উচ্চতা রশের, দেহের তুলনায় মাথাটি বড়ো, উন্নত বিশাল কপাল, মাথার খুলির গড়ন সুদৃশ্য, মাথার চুলে পাকধরা, বিষণ্ণ অবসন্ন দুটি চোখ যা মাঝে-মাঝে স্থির জ্বলন্ত ও রাজকীয় হ'য়ে ওঠে, স্ফীত ও কম্পিত নাসারন্ধ্রের তলায় পুষ্ট গোঁফ জোড়া, ঠোঁট দুটি যেন কুলুপের মতো বন্ধ থেকে আটকে রেখেছে যাবতীয় গোপন কথা, চিন্তাকুল মুখচ্ছবি, প্রচুর ঝড়ঝাপটা সইতে হয়েছে এমন চেহারা—এই হলেন তমাস রশ। হয়তো তিনি এটাই জানেন যে পাগল ব'লে তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে হেল্‌থফুল হাউসে. আর তাঁর দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন এনজিনিয়ার সিমোন আর্‌ৎ—এই আরোগ্য নিকেতনে যাঁর নাম গেডন।

২

কাউন্ট দার্তিগাস

কে এই কাউন্ট দার্তিগাস? কোনো এস্পানিওল? মাতাদোর-এর দেশের লোক? নাম শুনে প্রথমে তা-ই মনে হয়। অথচ তাঁর স্কুনারের গায়ে সোনালি হরফে নাম লেখা: 'এব্বা'—আর এ-নামটা পুরোদস্তুর নরোয়ের। জাহাজের কাপ্তেনের নাম স্পেড, আর সারেঙের নাম এক্করনডাট—আর প্রধান বাবুর্চিকে ডাকা হয় সেলিম—একেক নাম একেক দেশের, বোঝা যায় সবাই ভিন্ন-ভিন্ন দেশের লোক।

কাউন্টের চেহারা দেখে কিচ্ছুটি বোঝবার জো নেই। গায়ের চামড়ার রঙ, কুচকুচে কালো চুল, নড়াচড়ার ভঙ্গির সহজ লাবণ্য দেখে মনে হয় সত্যি বুঝি

banglabooks.in

এস্পানিওল, অথচ এমনি তাঁকে দেখে মোটেই এস্পানিয়ার লোক ব'লে মনে হয় না। উচ্চতায় মাঝারির একটু বেশি, মজবুত জোয়ান কাঠামো, বয়েস বেশি হ'লে চল্লিশ। তাঁর শান্ত ঔদ্ধত্য দেখে মনে হয় বুঝি-বা কোনো ভারতীয় রাজরক্তে মালয় শোণিতের সংমিশ্রণ হয়েছে, তাঁর ভাবভঙ্গি বা কথা বলার ধরন মালয়ের লোকেদের মতো। তাঁর জাহাজের মাঝি-মাল্লারা যে-ভাষায় কথা বলে. তার উৎপত্তি ভারত মহাসাগরেরই কোনো-একটা দ্বীপে। অথচ যখনই ইয়োরোপ বা মারকিন মুলুকের কোনো বন্দরে তাঁর জাহাজ ভেড়ে, কাউন্ট চমৎকার ইংরেজিতে চারপাশে খই ফোটান—কেবল কতগুলো কথার ঝোঁক থেকে বোঝা যায় যে ইংরেজি তাঁর মাতৃভাষা নয়।

এই রহস্যময় কাউন্টের অতীত ইতিহাস কী? কীই বা তাঁর খেতাবের উৎস, আর এত অর্থাগমই বা তাঁর হয় কোথেকে? বিপুল তাঁর বিত্ত, জাঁকজমক ও জমকালো ধরনধারণ দেখে তাই বোঝা যায়। তাঁর দেশ কোথায়? অন্তত তাঁর স্কুনারটা কোন দেশের? কেউ জানে না, আর এ বিষয়ে তিনি এমনিভাবে নীরব থাকেন যে জিগেশ করারও কারু সাহস হয় না। মারকিন সাংবাদিকদের খাতিরেও তিনি নিজের কথা সাতকাহন ব'লে বেড়াবেন, এটা বিশ্বাস হয় না।

মাঝে-মাঝে কেবল খবর-কাগজে স্কুনার 'এব্বা'র আগমন-সংবাদ বেরোয়—সাধারণত মারকিন দেশের পূর্ব উপকূলেই 'এব্বা' এসে ভেড়ে—এসেই দীর্ঘ যাত্রার জন্য প্রচুর রশদ কিনে নেয়, বেশ চড়া দামেই কেনে—ডলার, গিনি বা ফ্রাঙ্ক বা মার্ক-যে-কোনো মুদ্রাতেই দাম চুকিয়ে দেয়া হয়। তার ফলে কাউন্টের ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে কেউ কিছু না-জানলেও ফ্লরিডা থেকে নিউ-ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত সবগুলো বন্দরেই তিনি বেশ পরিচিত। সেইজন্যই তাঁর আগমন-সংবাদে হেল্‌থফুল হাউসের অধ্যক্ষ বেশ-একটু গৌরবই অনুভব করলেন।

নিউ-বার্ন বন্দরে এই প্রথম এসে ভিড়েছে 'এব্বা'; কেবলমাত্র কাউন্টের খেয়ালেই নয়জের মোহানায় এসে সে নোঙর ফেলেছে। হঠাৎ কেন এখানে কাউন্টের আবির্ভাব হ'লো? জিনিশপত্র কেনাকাটার জন্যে নিশ্চয়ই নয়, কেননা তাহ'লে আশপাশেই আরো বড়ো বন্দরে গিয়ে তিনি নামতে পারতেন এবং সেখানে সুবিধে-দরে পণ্য পাওয়া যেতো। তাছাড়া কয়েক সপ্তাহ আগেই চার্লস্‌টনে দশ দিন নোঙর ফেলেছিলো 'এব্বা', তখনই সে এক অজ্ঞাত ও দীর্ঘ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে বিস্তর মালপত্র কিনে নিয়েছিলো। তাহ'লে কি কেবল হেল্‌থফুল হাউসেই বেড়িয়ে যেতে এসেছেন কাউন্ট? তা হ'তে পারে—কারণ সত্যিই এই আরোগ্য

banglabooks.in

নিকেতনের খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

হয়তো তমাস রশের সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছে আছে কাউন্টের। রশের খ্যাতি দেশে-বিদেশে এমনিভাবে ছড়িয়ে পড়েছিলো, যে তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। উন্মাদ বৈজ্ঞানিকের আবিষ্কার নাকি যুদ্ধবিদ্যায় বিপ্লব আনবে—একথা শুনে কার না মানুষটিকে দেখতে ইচ্ছে করে?

বিকেলবেলা নির্দিষ্ট সময়ের কাঁটায়-কাঁটায় 'এক্বা'র কম্যাণ্ডার কাপ্তেন স্পেডকে সঙ্গে নিয়ে কাউণ্ট দার্তিগাস হেল্‌থফুল হাউসে পদার্পণ করলেন। তক্ষুনি তাঁদের অধ্যক্ষের কাছে নিয়ে যাওয়া হ'লো। অধ্যক্ষ বিগলিত বচনে কাউণ্টকে আপ্যায়ন করলেন, জানতে চাইলেন এই মহানুভব অতিথির জন্য তিনি কী করতে পারেন, এবং বললেন তিনি স্বয়ং তাঁর সম্মানিত অতিথিদের সব-কিছু ঘুরে-ঘুরে দেখাবেন। কাউণ্ট কৃতজ্ঞ বচনে তাঁর ইচ্ছাকে সম্মান জানাতেই অধ্যক্ষ তাঁকে নিয়ে সব জায়গায় টহল দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। একেক জায়গায় যাচ্ছেন, একটা করে জিনিশ দেখিয়ে হেল্‌থফুল হাউসে চিকিৎসা-রীতির গুণগান করছেন, আর কাউণ্ট নিঃশব্দে বিনা প্রতিবাদে সব শুনে যাচ্ছেন। হয়তো নিজের আসার কারণটা কাউণ্ট চাপা দিয়ে রাখতে চাচ্ছিলেন, তাই অধ্যক্ষের বাগাড়ম্বরে কোনো বাধা দেননি। এক ঘণ্টা পরে কথাপ্রসঙ্গে কাউণ্ট জিগেশ করলেন, 'আচ্ছা, আপনাদের এখানে নাকি একজন মস্ত নামজাদা রোগী ভর্তি হয়েছেন, লোকে যা শুনে আপনার প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে খুব কৌতূহলী হ'য়ে উঠেছে?'

অধ্যক্ষ জিগেশ করলেন, 'মঁসিয় লা কোঁৎ বোধহয় তমাস রশের কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ, সেই ফরাশি বৈজ্ঞানিক, যিনি উন্মাদ হ'য়ে গেছেন ব'লে জনরব।'

'উন্মাদই বটে; আর একদিক দিয়ে সেটা ভালোই হয়েছে। আমার মতে, ও-সব ধ্বংসের উপায় কেবলই বাড়িয়ে গিয়ে মানবজাতির কোনো উপকারই হবে না—মানুষমারা কল এখনই প্রচুর আছে।'

'তা সত্যি,' বললেন কাউণ্ট, 'এবং এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত। যথার্থ প্রগতি ও-পথে নেই—ও-সব চেষ্টাই আমার কাছে নীতিবিগর্হিত ব'লে মনে হয়। কিন্তু ইনি—ইনি কি একেবারেই পাগল হয়ে গেছেন?'

'একেবারে পাগল? না, মঁসিয় লা কোঁৎ, একেবারে পাগল তিনি হননি। কেবল দৈনন্দিন কাজকর্ম তিনি কিছুই করতে পারেন না। কিন্তু, তাঁর উদ্ভাবনীশক্তি পুরোপুরি অটুট আছে—এই মানসিক বিপর্যয়েও তাঁর নব-নব উন্মেষশালিনী

banglabooks.in

প্রতিভার কোনো ক্ষতি হয়নি। ওই অসম্ভব দাম দিলে যে আমাদের সরকার একটা প্রচণ্ড হাতিয়ার পেতো, তাতে আমি নিঃসন্দেহ, তবে বুঝি না ওই হাতিয়ারের খামকা কী দরকার আছে?'

'মোটেই নেই, মোটেই নেই,' কাউণ্ট একবাক্যে সায় দিলেন। এবং কাপ্তেন স্পেডও সায় দিয়ে ঘাড় নাড়লেন।

'আপনি নিজের চোখে দেখলেই বুঝতে পারবেন, মঁসিয় লা কোঁৎ। এই মণ্ডপটাতেই তমাস রশ থাকেন। নিরাপত্তার জন্য তাঁকে সবসময়ে চোখে-চোখে রাখতে হয় বটে, কিন্তু তাঁর সেবাযত্নের কোনো ত্রুটি হয় না। তাছাড়া তাঁকে বাইরের কারুর সঙ্গে কথা বলতে দেয়া হয় না—' ব'লে অধ্যক্ষ অর্থপূর্ণভাবে মাথা নাড়লেন এবং তা দেখে কাউণ্টের মুখে সূক্ষ্ম হাসির রেখা ফুটে উঠলো।

'কিন্তু,' কাউণ্ট জিগেশ করলেন, 'মঁসিয় রশ কি ককখনো একা থাকেন না?

'কখনো না, মঁসিয় লা কোঁৎ। শুধু তাঁরই শুশ্রূষার জন্য একজনকে বাহাল করা হয়েছে। তার উপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে, সে-ই অহোরাত্র তার সঙ্গে থাকে। যদি কখনো প্রলাপের ঘোরেও মঁসিয় রশ তাঁর আবিষ্কার সম্বন্ধে কিছু ব'লে ফ্যালেন, তক্ষুনি তা লিপিবদ্ধ করা হ'য়ে যাবে—তারপর দেখা যাবে তার কোনো অর্থোদ্ধার করা যায় কি না!'

কাউণ্ট দার্তিগাস একবার চট ক'রে কাপ্তেন স্পেডের দিকে তাকিয়ে নিলেন। কাপ্তেন স্পেড মাথা নেড়ে এমন একটা ইঙ্গিত করলে, যার অর্থ দাঁড়ালো এই রকম, 'সব বুঝতে পারছি।' যে-কেউ সে-সময় কাপ্তেন স্পেডকে লক্ষ করতো তো দেখতে পেতো গভীর মনোযোগ দিয়ে স্পেড ১৭ নম্বর মণ্ডপের সব খুঁটিনাটি নিরীক্ষণ ক'রে যাচ্ছে—যেন কোনো একটা মতলব ভাঁজছে সারাক্ষণ। মণ্ডপের পাশ ঘেঁষেই গেছে দেয়াল, একেবারে নদীর তীরের টিলার ঢাল পর্যন্ত। একটা একতলা বাড়ি, আর বারান্দা, দুটি ঘর ও একটা হলঘর বাড়িটায়, জানলায় লোহার গরাদ বসানো। বাড়িটার চারপাশে মস্ত সব গাছ উঠেছে, লতাগাছ ফুলগাছও আছে; গাছে-গাছে ডালে-ডালে বসন্তকালের সৌন্দর্য শোভা পাচ্ছে। সবশুদ্ধ আধ একর জায়গা জুড়ে গড়া হয়েছে মণ্ডপটা, শুধু তমাস রশই এখানে তাঁর শুশ্রূষাকারীর সঙ্গে থাকেন।

হাঁটতে-হাঁটতে বাড়িটার কাছে যেতেই দরজায় গেডনের সঙ্গে তাঁদের দেখা হ'য়ে গেলো।

কাউণ্ট স্থির চোখে গেডনকে নিরীক্ষণ ক'রে নিলেন। ১৭ নম্বর মণ্ডপে এর আগেও কারু-কারু পদার্পণ ঘটেছে, কাজেই এদের দেখে গেডনের খুব অবাক

banglabooks.in

হবার কথা নয়। কিন্তু তবু এই দুই অতিথিকে তার একটু কেমন যেন লাগলো। কাউণ্ট দার্তিগাসের নাম সেও আগেই শুনেছিলো, কিন্তু কখনো চর্মচক্ষে তাঁকে সে দ্যাখেনি।

'গেডন,' অধ্যক্ষ বললেন, 'তমাস রশ কোথায় ?'

'ওই-যে,' আঙুল দিয়ে দেখালো গেডন। তমাস রশ মণ্ডপের বাইরে গাছ-তলায় পায়চারি করছেন।

'কাউণ্ট দার্তিগাস আমাদের স্বাস্থ্যনিবাস দেখতে এসেছেন। তমাস রশকে উনি একবার স্বচক্ষে দেখতে চান।'

গেডন শুধু একবার কাউণ্টের দিকে চোখ তুলে তাকালে, কোনো কথা বললে না। সে তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো। কয়েক পা এগুতেই তমাস রশের সামনে গিয়ে পড়লেন কাউণ্ট দার্তিগাস। খ্যাপা মানুষটি কিন্তু এদের আসতেই দ্যাখেননি—এমনকী কাছে যাবার পরও তিনি যে আগন্তুকদের উপস্থিতি টের পেয়েছেন, তা মোটেই মনে হ'লো না।

কাপ্তেন স্পেড কিন্তু একমনে ১৭ নম্বর মণ্ডপের অবস্থান ও জমিজমা ভালো ক'রে দেখে নিচ্ছিলো! ঢালু পথ দিয়ে যেতে-যেতে সে দেয়ালের উপর দিয়ে একটা মাস্তুলের ডগা দেখতে পেলে। চিনতে তার ভুল হ'লো না—'এক্বা'রই মাস্তুলের ডগা—'এক্বা' ঠিক ১৭ নম্বর মণ্ডপের পাশেই নোঙর ফেলেছে।

কাউণ্ট দার্তিগাস চুপচাপ দাঁড়িয়ে ফরাশি বৈজ্ঞানিকটিকে লক্ষ করছিলেন। আঠারো মাস ধ'রে আটক আছেন রশ, তবু স্বাস্থ্য তাঁর অটুট আছে। কিন্তু তাঁর চোখমুখের অদ্ভুত ভাব, হাত-পায়ের অসংলগ্ন আন্দোলন, ক্লান্ত ও অবসন্ন চক্ষু, আশপাশ সম্বন্ধে পরম ঔদাসীন্য—সবকিছুই মানসিক বিপর্যয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিলো।

তমাস রশ তখন সবে একটা আসনে ব'সে প'ড়ে হাতের ছড়ি দিয়ে মাটিতে একটা কেল্লার ছবি আঁকছিলেন। তারপর হাঁটু গেড়ে ব'সে তিনি ধুলোবালি দিয়ে ছোটো-ছোটো ঢিপি বানালেন, পাশের ঝোপ থেকে কতগুলো পাতা ছিঁড়ে ঢিপির উপর পতাকার মতো বসিয়ে দিলেন। কারু দিকে কোনো লক্ষ নেই, একমনে নিজের খেলা নিয়েই তিনি ব্যস্ত। ছেলেমানুষি খেলা, কিন্তু কোনো বাচ্চা ছেলে এ-রকম তীব্র গাম্ভীর্য নিয়ে এ-খেলা খেলতো না।

'তাহ'লে কি ভদ্রলোক পুরো খেপে গিয়েছেন ?' এই প্রথম কাউণ্টের গলার স্বরে হতাশার ছাপ দেখা গেলো।

'মঁসিয় লা কোঁৎকে তো আগেই বলেছিলুম যে তাঁর সঙ্গে আলাপ করার

banglabooks.in

চেষ্টা করা বৃথা', বললেন অধ্যক্ষ।

'উনি কি আমাদের দিকে ফিরেও তাকাবেন না?'

'কী জানি।' গেডনের দিকে ফিরে অধ্যক্ষ বললেন, 'গেডন, একবার ওঁর সঙ্গে কথা বলো তো! হয়তো তোমার কথার জবাব উনি দেবেন।'

'তা দেবেন,' ব'লে গেডন রশের কাঁধে হাত দিয়ে নিচু গলায় রশের নাম ধরে ডাকলে।

ডাক শুনে রশ মাথা তুলে তাকালেন; গেডনকে ছাড়া আর কেউ যে তাঁর চোখে পড়লো, তা মনে হ'লো না।

'তমাস রশ,' গেডন ইংরেজিতে বললে, 'কয়েকজন ভদ্রলোক আপনাকে দেখতে এসেছেন। আপনার সম্বন্ধে···আপনার কাজ সম্বন্ধে এঁরা খুবই উৎসুক!'

'আমার কাজ সম্বন্ধে উৎসুক?' একটা ঢিল তুলে নিয়ে তমাস রশ ওই বালির ঢিবিগুলোর দিকে ছুঁড়ে মারলেন—বালি ছিটিয়ে দিয়ে ঢিবিটা ভেঙে পড়লো। 'গেলো! গেলো! কেল্লা গেলো! এক বিস্ফোরকেই সাবাড় ক'রে দিয়েছি!' পরম আহ্লাদে রশ হাততালি দিয়ে উঠলেন।

'দেখছেন তো?' কাউন্ট দার্তিগাসকে বললেন অধ্যক্ষ, 'নিজের আবিষ্কারের কথা উনি কখনোই ভোলেন না। ···গেডন, ছাখো না, ফুলগুরেটর সম্বন্ধে ওঁকে কোনো কথা বলাতে পারো কি না।

'আপনি বললে একবার চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি,।'

'তাহ'লে একবার চেষ্টা ক'রে ছাখো।'

'কিন্তু তাতে যদি আবার রোগের ঝোঁক বেড়ে যায়?'

'যখন দরকার মনে করবে, তক্ষুনি কথা বন্ধ ক'রে দিয়ো। ওঁকে বলো যে একজন তাঁর ফুলগুরেটর কিনতে চাচ্ছেন।'

'তাতে উনি সব সূত্র ফাঁশ ক'রে দেবেন না তো?' উৎসুকভাবে ব'লে উঠলেন কাউন্ট দার্তিগাস।

কাউন্টের আগ্রহ দেখে তাঁর দিকে একবার সন্দেহের চোখে তাকালে গেডন, বললে, 'ভয়ের কিছু নেই। পুরো দাম হাতে না-পেলে উনি কোনো কথাই বলবেন না।

কাউন্ট ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'আমার সঙ্গে কোনো টাকা নেই।'

গেডন আবার রশের কাঁধে হাত রেখে বললে, 'তমাস রশ, এঁরা তোমার আবিষ্কারটা কিনে নিতে চাচ্ছেন।'

banglabooks.in

সবেগে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন তমাস রশ। চেঁচিয়ে বললেন, 'আমার ফুলগুরেটর? আমার বিস্ফোরক!' এত তীব্র উত্তেজনা দেখে মনে হ'লো গেডনের আশঙ্কাই ঠিক : বুঝি রোগের প্রকোপ হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে যাবে।

'কত দেবেন আমাকে?' কত?' রশ জানতে চাইলেন।

প্রতিশ্রুতি দিতে আপত্তি কী। যত চড়া দামই হোক, একটা ব'লে দিলেই হয়।

'কত? কত?' রশ চেঁচিয়ে জিগেশ করলেন।

গেডন বললে, 'এক কোটি ডলার!'

'এক কোটি! মাত্র!' রশ চেঁচিয়ে উঠলেন 'যে-কোনো বিস্ফোরকের চেয়ে কোটিগুণ সেরা ফুলগুরেটরের জন্য মাত্র এক কোটি ডলার! ফুঃ! দশ হাজার বর্গগজ দূরের যাবতীয় বস্তুকে যে-স্বয়ংচল ক্ষেপণাস্ত্র মুহূর্তে ধূলিসাৎ ক'রে দিতে পারে, তার জন্য মাত্র এক কোটি ডলার! যখন তার দাম হওয়া উচিত দশ হাজার কোটি ডলার, লক্ষ কোটি ডলার!'

সত্যি রশের সঙ্গে এখন আর কোনো দরদস্তুরই করা চলে না। কোনো মাত্রারই ঠিক নেই। গেডন যদি লক্ষ-কোটি ডলার দিতে চায় উনি হয়তো এক্ষুনি তার ডবোল দাম দাবি ক'রে বসবেন।

কাউন্ট দার্তিগাস সারাক্ষণ তাঁকে তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ ক'রে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ রশ উত্তেজিতভাবে 'লক্ষ কোটি ডলার! লক্ষ কোটি ডলার!' ব'লে চ্যাঁচাতে-চ্যাঁচাতে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে গেলেন।

গেডন অধ্যক্ষের দিকে ফিরে কাটা-কাটা গলায় বললে, 'আমি আপনাকে আগেই বলেছিলুম!' ব'লে সেও তার দায়িত্বের পিছনে ছুটলো। কাছে গিয়ে রশের হাত ধ'রে নানাভাবে প্রবোধ দিতে-দিতে তাঁকে নিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢুকে প'ড়ে দরজায় চাবি লাগিয়ে দিলে।

কাপ্তেন স্পেড মণ্ডপের চারপাশে ঘুরে-ঘুরে সব দেখতে লাগলো, আর কাউন্ট দার্তিগাসকে অধ্যক্ষ বললেন, 'দেখলেন তো, মোটেই কিছু বাড়িয়ে বলিনি। রশের অসুখ রোজই বেড়ে চলেছে। শেষটায় হয়তো আর সারবেই না কোনোদিন। ওঁকে অত টাকা দিয়েই বা কী হবে?'

'তা ঠিক। তবে ওই অসম্ভব দাম তিনি হাঁকতে পারেন, কারণ তাঁর আবিষ্কারের ক্ষমতা শুনেছি অসীম, গগনভেদী!'

banglabooks.in

'যোগ্য লোকেদের তা-ই মত, ম'সিয় লা কোঁৎ। কিন্তু হয়তো তাঁর আবিষ্কার একদিন তাঁর সঙ্গে-সঙ্গেই পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। যেভাবে আজকাল ঘন-ঘন রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পাচ্ছে—শেষটায় এই ফুলগুরেটরের কথাও না তাঁর মন থেকে মুছে যায়!'

'হয়তো ঘৃণা ও দ্বেষ কোনোদিন মুছবে না!' মৃদু স্বরে বললেন কাউণ্ট দার্তিগাস। প্রধান ফটকের কাছে আসতেই কাপ্তেন স্পেডও কোত্থেকে এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলে।

৩

জোড়া গুমখুন

রাস্তায় বেরিয়ে অনেকক্ষণ পরে কাউণ্ট দার্তিগাস মুখ খুললেন। জিগেশ করলেন, 'ভালো ক'রে আশপাশ সব দেখে নিয়েছো? জরুরি-কিছু চোখে পড়েনি, এমন হয়নি তো?'

'না, ম'সিয় লা কোঁৎ,' খেতাবটার উপর অহেতুক ঝোঁক দিলে কাপ্তেন স্পেড, 'পিছনের দেয়ালটা থাকায় মণ্ডপে পৌঁছুতে সুবিধেই হবে। তবে সব দেখেশুনে এখনো কি আপনি কাজটা করবেন?'

'করবো, স্পেড।'

'এই মানসিক অবস্থা সত্ত্বেও?'

'তা সত্ত্বেও। আর যদি একবার তাঁকে নিয়ে আসতে পারি—'

'সে-ভার আমার উপর ছেড়ে দিন। রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে ঠিক গিয়ে ১৭ নম্বর মণ্ডপে পৌঁছবো—ওই পিছন দিককার দেয়াল বেয়ে উঠবো। তারপর রশকে নিয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসতে কতক্ষণ?' নদীর ধারের একটা ছোটো দরজাকে দেখালে স্পেড—স্বাস্থ্যনিবাসের কর্মচারীরা নদীর দিকে যেতে হ'লে মাঝে-মাঝে ও-দরজাটা ব্যবহার করে। 'ওই দরজা দিয়েই ভিতরে ঢুকে যাবো—দড়ির সিঁড়িও লাগবে না।'

banglabooks.in

'কিন্তু দরজাটা তো বন্ধ।'

'খুলে যাবে। আমি যখন একা বাগানে ঘুরছিলুম তখন খিলটা খুলে রেখে এসেছি। আর এই দেখুন চাবি,' ব'লে স্পেড একগোছা চাবি বার ক'রে দেখালে।

'বাঃ, চমৎকার!' স্পেডের পিঠ চাপড়ে দিলেন কাউন্ট, 'হয়তো অপহরণকর্ম খুব-একটা কঠিন হবে না। চলো, এখন স্কুনারে ফিরে যাই। রাত আটটার সময়, অন্ধকার হ'লে, পাঁচজন লোক নিয়ে তুমি নৌকো ক'রে নেমে পোড়ো—'

'পাঁচজনই যথেষ্ট। ওই গেডন হতভাগা ট্যাঁ-ফোঁ করলে ওকে শায়েস্তা করতে এর বেশি লোক লাগবে না।'

'শায়েস্তা?' কাউন্ট বললেন, 'মোটেই না। ওকেও সঙ্গে নিয়ে এসো "এব্বা"য়। কে জানে সে এর মধ্যেই সব কথা জেনে ফেলেছে কি না।'

'তা ঠিক।'

'আর তাছাড়া রশ ওর সঙ্গে থাকতেই অভ্যস্ত। আমি ওঁর অভ্যাসের নড়চড় করতে চাই না।'

কথা বলতে-বলতে দুজনে নদীর পাড়ে এসে পড়েছিলেন। 'এব্বা'র একটা নৌকো অপেক্ষা করছিলো সেখানে ওদের জন্য—স্কুনারটা দাঁড়িয়েছিলো তীর থেকে একটু দূরে। হলদে ঢাকায় পাল আটকে রাখা, কেবল বড়ো মাস্তুলটায় একটা রক্ত-লাল নিশেন উড়ছে। কাপ্তেনকে নিয়ে কাউন্ট নৌকোয় উঠতেই দু-জোড়া দাঁড় তাঁদের নিয়ে স্কুনারের পাশে চ'লে এলো। পাশে ঝোলানো দড়ির সিঁড়ি দিয়ে সসঙ্গী কাউন্ট স্কুনারে উঠে পড়লেন। জাহাজের পাশেই জোয়ারের জলে একটা ছোট্ট বয়া ভাসছে।

রাত ক'রে আসছে। বাঁকা নদীর বাম তীরে নিউ-বার্ন এর মধ্যেই ঝাপশা হ'য়ে এসেছে। দিগন্তের গায়ে ঘর-বাড়িগুলোকে কালো দেখাচ্ছে, পশ্চিমে আকাশ এখনও একটু রাঙা।

আটটা নাগাদ কাউন্ট জাহাজের ডেকে দেখা দিলেন। এবার তাঁর সঙ্গে বছর পঞ্চাশ বয়েসের একজন লোক। তাকেই তিনি বললেন, 'সময় হয়েছে, সেরকো।'

'যাই, স্পেডকে গিয়ে ব'লে আসি,' সেরকো বললে। কিন্তু তাকে আর কোথাও যেতে হ'লো না, কাপ্তেন স্পেড স্বয়ং তক্ষুনি এসে হাজির।

'তাহ'লে তৈরি হয়ে নাও,' কাউন্ট দার্তিগাস বললেন।

'আমরা তৈরিই আছি।'

banglabooks.in

'দেখো, হেল্‌থফুল হাউসে কেউ যেন টের না-পায়। গেডন আর তমাস রশকে যে "এব্বা"য় এনে ওঠানো হয়েছে, এটা যেন কেউ জানতে না-পারে।'

'জানলেই বা কী। হাজার খুঁজলেও "এব্বা"য় ওদের কেউ পাবে না,' ব'লে সেরকো হেসে উঠলো।

'তবু,' কাউন্ট বললেন, 'মিছেমিছি সন্দেহ জাগিয়ে লাভ কী!

স্পেড ও তার পাঁচজন অনুচর ঝুপঝাপ ক'রে নেমে পড়লো নৌকোয়।

'শুভেচ্ছা, স্পেড,' সেরকো হাসলো, 'টুঁ শব্দটি করবো না।'

'তা করবো না—তবে গেডন—'

'রশ, গেডন—দুজনকেই চাই,' দার্তিগাস মনে করিয়ে দিলেন।

'তাই হবে।'

ঝপাঝপ দাঁড় পড়লো; একটু পরেই অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো নৌকোটা।

+

১৭ নম্বর মণ্ডপের বাইরে সব চুপচাপ। একটা গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না।

নদীর ধারের দরজার সামনে গিয়ে দু-সার ক'রে দাঁড়ালে স্পেড আর তার দলবল। পকেট থেকে চাবি বার ক'রে স্পেড তালায় ঢোকালে, ছোট্ট ক্লিক ক'রে আওয়াজ হ'লো, আস্তে ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেলো।

কেউ কোথাও নেই; ভালো ক'রে চারপাশ দেখে নিয়ে কাপ্তেন স্পেড ভিতরে ঢুকে পড়লো। বাকিরা তাকে অনুসরণ করলে। দরজাটায় তালা না-লাগিয়ে তারা শুধু ভেজিয়ে গেলো, যাতে ফেরবার সময় চটপট বেরিয়ে পড়া যায়।

একটা জানালায় শুধু আলো জ্বলছে, বাকি সবখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওটাই বোধহয় তমাস রশ আর তাঁর শুশ্রূষাকারীর ঘর। গেডন নাকি কক্‌খনো তার রোগীকে ছেড়ে যায় না; তাহ'লে এখনও নিশ্চয়ই ঘরেই আছে।

এফরনডাট নৌকোয় অপেক্ষা করছে, স্পেডের বাকি চারজন সঙ্গী পা টিপে-টিপে এগিয়ে এলো। রোগীর ঘরের কাছে পৌঁছে তারা একটু বেকায়দায় পড়লে; ভিতরে ঢুকবে কী ক'রে, দরজা যে বন্ধ। তাহ'লে জানলার শার্শি ভেঙে ছিটকিনি খুলে একজন ভিতরে ঢুকে দরজা খুলে দেবে? কিন্তু গেডন? সে যদি দেখে ফেলে চেঁচিয়ে লোক জড়ো করে?

ইঙ্গিতে সবাইকে চুপচাপ দাঁড়াতে ব'লে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে কাপ্তেন স্পেড জানলা দিয়ে উঁকি মারলে।

সেই যে বিকেলে রশ খেপে গিয়েছিলেন, এখনো নিজেকে সামলে তুলতে

banglabooks.in

পারেননি। গেডন শেষটায় ডাক্তার ডেকে পাঠিয়েছে; ডাক্তার এসে বিশেষ চেষ্টা ক'রে রশকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন। রশ শুয়ে আছেন সোফায়, পুরো পোশাক-আশাক শুদ্ধ্। গেডন ফিশফিশ ক'রে ডাক্তারকে কী যেন বলছে—ডাক্তার তাঁর ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন, এবার তিনি বিদায় নেবেন। স্পেড তক্ষুনি ইঙ্গিতে তার অনুচরদের গাছের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে বললে: তারা সাঁৎ ক'রে একেকজন অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

পরক্ষণেই ডাক্তারকে এগিয়ে দেবার জন্য গেডনও ডাক্তারের সঙ্গে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো। যেতে যেতে ডাক্তার বলছিলেন, 'ও-রকম ধাক্কা যদি আরো-কয়েকটা আসে, তাহ'লে আর দেখতে হবে না—রোগী এই বকলেই কাৎ হবে!'

'তবেই দেখুন! কেন-যে অধ্যক্ষ বাইরের লোককে নিয়ে আসেন! কে একজন কাউণ্ট দার্তিগাস এসেছিলেন, তার জন্যই এত ঝামেলা!' বললে গেডন।

দুজনে রাস্তা এগিয়ে গেলো। ভাগ্যিস গেডন আলোটা টেবিলেই রেখে এসেছে, নইলে মুশকিলে পড়তে হ'তো।

গেডনরা এগিয়ে যেতেই স্পেড তার দলবল নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো, শুধু দুজন রইলো গাছের আড়ালে, গেডনের অপেক্ষায়।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'লো না। গেডন যেই বাড়ির সিঁড়ির কাছে পৌঁছেছে অমনি তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। কোনো চীৎকার করার আগেই যারা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো তার মুখে রুমাল গুঁজে মুখ বেঁধে দিলে, চোখে পরিয়ে দিলে একটা পট্টি, তারপর পিঠমোড়া ক'রে এমনভাবে তার হাত-পা বেঁধে ফেললে যে তার আর নড়বারও শক্তি রইলো না।

+

দার্তিগাস রেলিঙের গায়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়েছিলেন। ঝপাঝপ দাঁড়ের শব্দ শুনে তিনি জিগেশ করলেন, 'কাজ হাসিল, স্পেড?'

'হাসিল!'

'দুজনকেই এনেছো?'

'দুজনকেই।'

'হেল্‌থফুল হাউসে কেউ টের পায়নি তো?'

'কাকপক্ষীতেও না।'

গেডন বা রশকে কিন্তু 'এব্বা'য় তোলা হ'লো না। স্কুনারের পাশে কী-একটা অদ্ভুত খশখশ শব্দ হ'লো—গেডন শব্দটা শুনতে পেলে। টের পেলে তাকে ধরাধরি

banglabooks.in

ক'রে কোথায় নিয়ে গিয়ে যেন ধপ ক'রে নামিয়ে রাখা হ'লো।

আশ্চর্য! রাত বেড়েই চললো, 'এব্বা' ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো যথাস্থানে। জাহাজ ছাড়বার কোনো লক্ষণই দেখা গেলো না।

জোড়া গুমখুন ক'রেও এরা পালাবার চেষ্টা করছে না কেন? এরা কি তবে সব সন্দেহের উপরে?

৪

স্কুনারের নাম 'এব্বা'

পরের দিন সকালবেলায় কোনো তাড়াহুড়ো না-ক'রেই 'এব্বা' যাত্রার আয়োজন শুরু করলে। প্রথমে ধোয়ামোছা হ'লো স্কুনারের ডেক, ঢাকা খুলে পালগুলো বার ক'রে সারেঙের হুকুমে ভাঁজ খুলে-খুলে পাল মেলে দেবার ব্যবস্থা হ'লো, পালের দড়ি দেওয়া হ'লো ছুঁড়ে, কলকব্জা পরিষ্কার করা হ'লো, সাফ করা হ'লো ঢাকা, নৌকোগুলো টেনে-টেনে তোলা হ'লো পাল খাটাবার জন্যে—আর এই অলস, নিয়মিত, অনুত্তেজিত চাঞ্চল্য দেখা গেলো একেবারে নিউ-বার্ন-এর জেটি থেকেই।

আটটা বেজে গেলো, তবু ডেকে কাউণ্টের দেখা নেই। এনজিনিয়ার সেরকোও তার কামরা ছেড়ে বেরোয়নি। তবে কাপ্তেনের হাঁকডাক শুনে বোঝা গেলো যে শিগগিরই স্কুনারটি রওনা হ'য়ে পড়বে।

'এব্বা' একটা ইয়াট; এত চমৎকার তার কলকব্জা যে ইচ্ছে করলেই প্রতিযোগিতায় নামতে পারে সে যদিও উত্তর-মারকিন বা ব্রিটেনের কোনো নৌ-দৌড়ের প্রতিযোগিতায় 'এব্বা' কস্মিনকালেও যোগ দেয়নি। লম্বা তার মাস্তুল, তার ক্যানভাসের বিস্তার, তার পালিদণ্ডের দৈর্ঘ্য; সব পাল টাঙিয়ে যখন সে তরতর ক'রে ছুটে চলে তখনও অহেতুক সে দোলে না; ছিপছিপে তাঁর গড়ন: সব-কিছু দেখে বোঝা যায় যে সাত সমুদ্রে দ্রুত পাড়ি দেবার ক্ষমতা আছে তার—এমনকী আবহাওয়া খারাপ হ'লেও ভয়ের কিছু নেই, প্রচণ্ড হাওয়ার মধ্যেও অনায়াসেই সে ঘণ্টায় বারো নট পাড়ি দিতে পারবে।

পালতোলা জাহাজগুলোকে সবসময়েই আবহাওয়ার খেয়ালখুশির উপর নির্ভর

banglabooks.in

করতে হয়। হাওয়া না-থাকলে চুপচাপ হাওয়ার অপেক্ষায় ব'সে-থাকা ছাড়া তার আর কোনো গতি নেই। কাজেই কোনো পালতোলা জাহাজের নাব্যতা বাষ্প-চালিত পোতের চেয়ে অনেকগুণ বেশি হ'লেও বাষ্পনামক শক্তির সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তার থাকে না। কারণ বাষ্প দেয় নিশ্চয়তা; আর পাল ফেঁপে ওঠে তখনই, যখন হাওয়া আসে। সব-কিছু ভেবে-চিন্তে দেখলে তাই বলা যায় যে জাহাজের শ্রেষ্ঠতা নির্ভর করে পাল, চাকা আর কলকব্জার উপর। কিন্তু কাউন্টের মত যে তা নয় এই 'এব্বা'ই তার প্রমাণ—কারণ তিনি দিব্যি একটা স্কুনার নিয়েই পরিতুষ্ট—এমনকী অতলান্তিক মহাসমুদ্র পেরুতে গেলেও এই স্কুনার ছাড়া আর-কিছুই তিনি ব্যবহার করেন না।

সেদিন সকালবেলায় পশ্চিম থেকে একটা মৃদু হাওয়া বইছিলো। এই হাওয়াতে 'এব্বা'র সুবিধেই হ'লো, কারণ নয়জে থেকে বেরিয়ে গিয়ে পামলিকো সাউণ্ডে গিয়ে পড়তে পারে সে—আর সেখান থেকে খোলা সমুদ্রে গিয়ে পড়তে তার কোনোই অসুবিধে হবে না।

দু-ঘণ্টা পরেও দেখা গেলো 'এব্বা'র লোঙর নামানোই রয়েছে; ভাটার তোড়ে টান-টান হ'য়ে আছে লোহার শিকল, আর জাহাজের মুখটা নয়জের মোহানার দিকে ফেরানো। আগের দিন সন্ধেবেলায় যে - ছোট্ট বয়াটা স্কুনারের পাশেই ভাসছিলো, সেটাকে আর এখন দেখা যাচ্ছে না—সম্ভবত বাত্তিরে স্রোতের টানে সেটা ভেসে গিয়েছে।

হঠাৎ মাইল খানেক দূর থেকে কামানের আওয়াজ ভেসে এলো, আর তীরের দুর্গের ধার থেকে সারি-সারি কামানের মধ্য থেকে লাফিয়ে উঠলো কুণ্ডলিত ধোঁয়া। আর যেন সেই কামান গর্জনকে সাড়া দিয়েই আশপাশের দ্বীপের অন্য কামানগুলো থেকে পর-পর আওয়াজ উঠতে লাগলো।

কাউণ্ট আর এনজিনিয়ার তক্ষুনি ডেকে এসে দাঁড়ালেন।

সামনে এসে দাঁড়ালো কাপ্তেন। 'কামানের শব্দ'!

'শুনেছি,' এনজিনিয়ার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে একবার কাঁধ ঝাঁকালে।

'তার মানে হেল্‌থফুল হাউসে কী হয়েছে, তা এতক্ষণে সব্বাই জেনে গিয়েছে,' বললে কাপ্তেন।

'তাতে আর সন্দেহ কী,' উত্তর দিলে সেরকো, 'কামান ছুঁড়ে তাই প্রণালী থেকে বেরুবার পথগুলো বন্ধ ক'রে দেয়া হচ্ছে।'

'তো আমাদের সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী?' ঠাণ্ডা গলায় জিগেশ করলেন কাউণ্ট।

banglabooks.in

"কিছুই না," উত্তর দিলে এনজিনিয়ার।

কাপ্তেন স্লেড ঠিকই বলেছিলো। হেল্‌থফুল হাউস থেকে রশ আর তার প্রহরীর উধাও হবার খবরটা ততক্ষণে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছিলো।

সকালবেলা রোজকার মতোই ১৭ নম্বরে গিয়েছিলেন ডাক্তার। গিয়েই দ্যাখেন ঘর শূন্য। তক্ষুনি খবর পৌঁছুলো অধ্যক্ষের কানে—আশপাশের জমিতে খোঁজ নিতে বললেন তিনি। আর তখুনি ধরা পড়লো যে টিলাটার তলায় পাচিলের গা ঘেঁষে যে ছোট্ট দরজাটা রয়েছে তাতে তখনো তালা ঝুলছে বটে কিন্তু চাবির ফোকর থেকে চাবিটা উধাও আর তার ভিতরের দিকের ছিটকিনি খোলা।

এই দরজা দিয়েই যে তমাস রশ ও তার রক্ষী গায়েব হয়েছে, তাতে আর কোনো সন্দেহই রইলো না।

কিন্তু কার এই অপকর্ম? কেউই এ-বিষয়ে কোনো ইঙ্গিত দিতে পারলে না। সন্ধে সাড়ে-সাতটার সময়ও রেসিডেন্ট ডাক্তার শেষবার দেখে গেছেন তমাশ রশকে; তখন নাকি তিনি প্রচণ্ডভাবে উত্তেজিত ও মত্ত হ'য়ে উঠেছিলেন—এছাড়া আর কোনো খবরই পাওয়া গেলো না।

কিছুটা শুশ্রূষার পর রোগী যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলো তখনই ডাক্তার ১৭ নম্বর মণ্ডপ থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁকে রাস্তার শেষ পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে যায় গেডন।

তারপর যে কী হ'লো, কেউ জানে না।

নিউ-বার্ন আর র‍্যালেতে তারবার্তায় নিরুদ্দেশের খবর জানানো হ'লো। তক্ষুনি উত্তর-ক্যারোলাইনার রাজ্যপাল তারবার্তায় কড়া হুকুম জারি ক'রে দিলেন : তন্নতন্ন ক'রে না-খুঁজে কোনো জাহাজকে যেন পামলিকো সাউণ্ড থেকে বেরুতে দেয়া না-হয়। 'ফ্যালকন' ক্রুজারে আরেকটা তারবার্তা গেলো : সবগুলো জাহাজ খানাতল্লাশি করার ভার দেয়া হ'লো এই ক্রুজারকেই, সেই সঙ্গে পুরো তল্লাট জুড়ে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হ'লো—যাতে কর্তৃপক্ষের চোখে ধুলো দিয়ে মক্কেল ছিনতাইবাজ ক'লে বেরুতে না-পারে।

তারই জের দেখতে পেলেন কাউণ্ট দাতিগাস ডেকে দাঁড়িয়ে। দেখতে পেলেন দূরবিনে চোখ রেখে দূরে খুব তোড়জোড় ক'রে মোড় তুলছে ক্রুজার 'ফ্যালকন'। বাষ্প তৈরি করার আগেই স্কুনার 'এক্সাইটেবল' কয়েক ঘণ্টা দিব্যি পালাতে পারতো—অন্তত যতক্ষণে ক্রুজার কাছে আসবার চেষ্টা করতো ততক্ষণে 'এক্সাইটেবল'-এর।

banglabooks.in

'তুলবো না কি নোঙর ?' কাপ্তেন জিগেশ করলে।

'তোলো, হাওয়া বেশ অনুকূলে। তবে তাড়াহুড়োর কোনো লক্ষণ দেখিয়ো না,' বললেন কাউণ্ট দাতিগাস।

'ঠিক কথা,' সেরকো সায় দিলে, 'সাউণ্ডের সব-কটা খাড়িতেই এখন কড়া পাহারা বসবে—এবং কোনো জাহাজই কোনো নির্বোধ ও কৌতূহলী মহোদয়ের দর্শন ব্যতিরেকে যেতে পারবে ব'লে মনে হয় না।'

'তাহ'লেও পাল তুলে দাও,' বললেন কাউণ্ট, 'ক্রুজারের অফিসারেরা অথবা শুল্ক বিভাগের লোকেরা স্কুনার খানাতল্লাশ ক'রে নেমে গেলেই বন্দর থেকে বেরুবার ছাড়পত্র পাওয়া যাবে। তারপর আর আমাদের ঠেকাবে কে। শেষ অব্দি হয়তো বিনে মাশুলেই ছেড়ে দেবে !'

'সেই সঙ্গে বিস্তর ক্ষমাভিক্ষা, নির্বিঘ্ন সাগরপাড়ি আর তাড়াতাড়ি ফিরে আসার শুভেচ্ছাও থাকবে এনতার,' হেসে উঠলো সেরকো।

এদিকে নিউ-বার্নে খবর পৌঁছুতেই কর্তৃপক্ষ বিষম সংকটে পড়েছিলো। তমাস রশ নিজে থেকেই পালিয়েছেন, না তাঁকে গুম করা হয়েছে, এটা তারা বুঝতে পারছিলো না। গেডনের সাহায্য ছাড়া পালানো সম্ভব ছিলো না, কিন্তু অধ্যক্ষ ও কর্তৃপক্ষর মতে গেডনের ব্যবহার সন্দেহের অতীত : কাজেই অনুমান করা চলে যে তমাস রশ পালাননি।

আর না-পালিয়ে থাকলে নিশ্চয়ই তিনি গুম হয়েছেন। শহর জুড়ে মস্ত হৈ-হৈ ! এ-রকম জোড়া গুমখুনের প্রতিক্রিয়াটাও অনুমান করা যায়। এমন কড়া পাহারা সত্ত্বেও কিনা ফরাশি আবিষ্কারক একেবারে কর্পূরের মতো বেমালুম উবে গেলেন ? আর তাঁরই সঙ্গে-সঙ্গে চিরতরে উধাও হয়েছে 'ফুলগুরেটর'-এর গুপ্ত রহস্য—এখনও যে-রহস্যটা কাক-পক্ষীতেও টের পায়নি ! এর পরিণামটা যে কতখানি গুরুতর, এটা ভেবেই চারদিকে হুলুস্থুল প'ড়ে গেলো। নতুন আবিষ্কারটা চিরকালের মতো মারকিন মুলুকের হাতছাড়া হ'য়ে গেলো। কার কাজ এটা ? অন্য-কোনো রাষ্ট্রের ? এত দিনেও যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যে-বিপুল শক্তি লাভ করতে পারেনি, তা কি এই অপহারক রাষ্ট্র মুহূর্তে হস্তগত ক'রে ফ্যালেনি ? কিংবা হয়তো কোনো রাষ্ট্রই এই অপহরণ-কর্মে জড়িত নেই—হয়তো কোনো ব্যক্তিবিশেষের নির্দেশেই তমাস রশকে চুরি ক'রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আর তা যদি হয়, তাহ'লে কী চায় সেই মানুষটি ?

উত্তর-ক্যারোলাইনার সবখানেই সাবধানি পাহারা বসলো। রাস্তাঘাট, রেল-

banglabooks.in

পথ, শহর, গ্রাম—সর্বত্র কড়া পাহারার ব্যবস্থা হ'লো। উইলমিংটন থেকে নরফোক অব্দি উপকূলের সব ক-টা ঘাঁটিতে সবাই সজাগ হ'য়ে রইলো। নৌ-বাহিনী ও আরক্ষাবাহিনী একজোট হ'য়ে সব-ক-টা জাহাজকে তল্লাশ করবে—যতক্ষণ-না খানাতল্লাশি শেষ হয়, ততক্ষণ কোনো জাহাজকেই তারা ছাড়পত্র বা রেহাই দেবে না—বিন্দুমাত্র সন্দেহ হ'লেই যে-কোনো জাহাজকে যতক্ষণ-খুশি আটকে রেখে দেবে। শুধু 'ফ্যালকন'ই নয়, পামলিকো সাউণ্ডের জলে আরো-কতগুলো বাষ্পেচলা জাহাজ তৈরি হ'য়ে আছে সাগরের জল তোলপাড় ক'রে তমাস রশকে খুঁজে বেড়াবার জন্য। সব-ক-টা জাহাজের খোল-নলচে শুদ্ধু খুঁজে দেখবার নির্দেশ এলো। সদাগরি জাহাজ, প্রমোদতরণী, জেলেদের পোত—কাউকেই রেহাই দেয়া হবে না। নোঙর-ফেলা জাহাজ কি চলন্ত পোত—সব জাহাজকেই তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখা হবে।

স্কুনার 'এব্বা' কিন্তু তা সত্ত্বেও নোঙর তোলবার তোড়জোড় করতে লাগলো। 'এব্বা'র আগাপাশতলা খুঁজে দেখা হবে, এ-কথা টের পেয়েও কাউণ্টকে একটুও উদ্বিগ্ন বা চিন্তাকুল দেখালো না। এমনকী তমাস রশ ও তাঁর রক্ষীকে স্কুনারে পাওয়া গেলে পরিণামটা যে কী হবে, সে-সম্বন্ধে তিনি যেন মোটেই ভাবিত নন।

যাত্রার আয়োজন শেষ হ'লো ন-টার সময়। তার পরেই স্কুনারের মুখ পুবদিকে ঘুরে গেলো—অর্থাৎ নয়জে নদীর বামতীর ঘেঁষে এবার রওনা হবে 'এব্বা'।

নিউ-বার্নের পনেরো মাইল উত্তর-পশ্চিমে নয়জে একটা আচম্বিত বাঁক ফিরেছে, তার পরেই খাড়ি বেশ চওড়া হ'য়ে গেছে। বাঁকটার মুখে পৌঁছে হাওয়ার টানে তরতর ক'রে ভেসে চললো 'এব্বা'। বেলা গড়িয়ে যাচ্ছে। এগারোটা বাজে। 'ফ্যালকন' বা অন্য-কোনো বাষ্পেচলা তল্লাশি জাহাজের কোনো সাড়া-শব্দ নেই। অনুকূল হাওয়ায় পালগুলো টান হ'য়ে আছে। সিভান দ্বীপের অন্তরীপ ঘুরে 'এব্বা' গিয়ে অবশেষে পামলিকো সাউণ্ডে এসে পড়লো।

সিভান দ্বীপ থেকে রোডওক দ্বীপ পর্যন্ত সমুদ্রের বিস্তার হবে প্রায় ষাট মাইল। প্রকৃতিঠাকরুন একের পর এক ছোটো-ছোটো দ্বীপ গড়েছেন এখানে, এলো-মেলোভাবে দ্বীপগুলো সব সাজানো। অবিশ্রাম এই দ্বীপগুলোর গায়ে সিন্ধুতরঙ্গ আছড়ে পড়ে। দ্বীপগুলো যেন একটা সরলরেখায় সারি-সারি দাঁড়িয়ে : উত্তর থেকে দক্ষিণে লুকআউট অন্তরীপ থেকে হ্যাটেরাস অন্তরীপ হ'য়ে একেবারে হেনরি অন্তরীপ অব্দি গেছে এই দীর্ঘ রেখা, প্রতিবেশীরাজ্য ভারজিনিয়ার নরফোক শহর থেকে একটা সরলরেখা টানলে এখানে এসে পৌঁছোনো যায়।

banglabooks.in

একাধিক প্রণালী দিয়েই পামলিকো সাউণ্ড থেকে অতলান্তিক মহাসাগরে গিয়ে পৌঁছোনো যায়। সিভান দ্বীপের বাতিঘর ছাড়িয়ে গেলেই পড়ে ওক্রাকোক প্রণালী, তারও ওপাশে হ্যাটেরাস খাল ও আরো দু-তিনটে পথ। 'এব্বা' এগুচ্ছিলো ওক্রাকোক প্রণালীর দিকেই। গতিপথ না-পালটালে এই প্রণালীতে গিয়েই পড়বে স্কুনারটি। অথচ 'ফ্যালকন' পাহারা দিচ্ছে এদিকটাতেই। যে-জাহাজই বন্দর ছেড়ে বাইরে যেতে চাচ্ছে, 'ফ্যালকনে'র কর্মচারীরা তাকে বাধা দিচ্ছে। বাকি সব-কটা প্রণালীর মুখেই মারকিন মুলুকের কতগুলো জাহাজ পাহারা দিচ্ছে আর সমর-বাহিনীর তদারকিতে জোর খানাতল্লাশি হচ্ছে।

'এব্বা' কিন্তু নির্বিঘ্নেই ওক্রাকোক প্রণালী পেরিয়ে এলো। পামলিকো সাউণ্ডের জল তোলপাড় ক'রে কতগুলো বাষ্পেচলা জাহাজ চরকির মতো পাক খাচ্ছিলো আর পাহারা দিচ্ছিলো। 'এব্বা' যে এদের এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে, তা নয়; কিন্তু জাহাজগুলোর মুখোমুখি পড়ারও বোধহয় তার ইচ্ছে নেই। যেমন যাচ্ছিলো, তেমনি সোজাসুজি সে এগিয়ে গেলো হ্যাটেরাস প্রণালীর দিকে। কে জানে কেন কাউণ্ট দার্তিগাস এই পথেই অতলান্তিকে পাড়ি জমাবার মৎলব এঁটেছেন।

তখনও শুল্কবিভাগ কি নৌবাহিনী 'এব্বা'র গতিরোধ করার চেষ্টা করেনি, আর 'এব্বা'ও তাদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেনি। তাছাড়া প্রকাশ্য দিবালোকে এই খোলা সমুদ্রে এদের চোখে ধুলো দিয়ে অতবড়ো একটা স্কুনার চম্পটই বা দেবে কী ক'রে? কিন্তু খানাতল্লাশি হ'লে 'এব্বা' কী করবে? সজাগ অফিসার-দের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দেবে কী ক'রে? না-কি কাউণ্ট দার্তিগাসের মতো অভিজাত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে কর্তৃপক্ষ খামকা উত্যক্ত করতে চাচ্ছে না? ঘণ্টা-খানেকের জন্যও হয়তো অফিসাররা তার মতো মস্ত ও নামজাদা লোককে আটক রাখতে চাচ্ছে না। কিন্তু না, তা-ই বা কী ক'রে হবে। হ'তে পারে কাউণ্ট দার্তিগাস একজন কেউকেটা মানুষ, কিন্তু তিনি বিদেশী—যতই তাঁর টাকাকড়ি থাক, কেউ তাঁর সত্যি পরিচয় তো জানে না। কে তিনি, কোথেকে এসেছেন, কোথায় যাবেন—এ-সব প্রশ্নের উত্তর কারু জানা নেই। এই সুযোগে তারা হয়তো সেই কৌতূহলই মেটাবার চেষ্টা করবে।

'এব্বা' কিন্তু রাজার চালে তরতর ক'রে নির্বিকার ভঙ্গিতে এগিয়ে চললো। মাস্তুলের ডগায় পৎ-পৎ ক'রে উড়ছে নিশেন : রক্ত লাল জমির উপর নতুন চাঁদের বাঁকা ফালি।

গলুইয়ে একটা বেতের ডেকচেয়ারে বসেছিলেন কাউণ্ট দার্তিগাস। এ-ধরনের

banglabooks.in

আরামচেয়ার দেখা যায় প্রমোদতরীগুলোতেই। পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলো কাপ্তেন স্পেড আর এনজিনিয়ার সেরকো।

'বরনবারণ দেখে মনে হচ্ছে দর্শন দেবার জন্য হুজুরদের তেমন তাড়াহুড়ো নেই,' বললে সেরকো।

কাউন্ট দার্তিগাস উদাসীনভাবে বললেন, 'দরকার হ'লেই আসবে আর-কি।'

'হয়তো তাগ ক'রে আছে আমরা কখন হ্যাটেরাস প্রণালীতে ঢুকি,' মন্তব্য করলে কাপ্তেন স্পেড।

'তা, করুক অপেক্ষা,' কাটা-কাটা ভাবে বললেন কাউন্ট। পরক্ষণেই তাঁর চোখ দুটি নিমীলিত হ'য়ে এলো।

ঠিকই আন্দাজ করেছিলো কাপ্তেন স্পেড। 'এব্বা' কোন দিক দিয়ে যেতে চাচ্ছে, সে-সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশই ছিলো না কারুর। এখনও অবশ্য 'ফ্যালকন'-এর ডেক থেকে জাহাজ থামাবার সংকেত আসেনি, কিন্তু সে-সংকেত আসার আর খুব-বেশি দেরি নেই। হয়তো ঠিক প্রণালীর মুখটাতে পৌঁছুলেই সেই ধুন্ধুমার সংকেত এসে হাজির হবে। তখন আর সমরবাহিনীর লোকদের এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় থাকবে না। খানাতল্লাশি শেষ না-হ'লে পামলিকো সাউণ্ড থেকে বেরুবারও নির্দেশ পাওয়া যাবে না।

তা সত্ত্বেও কিন্তু 'এব্বা' গতি বাড়াবার কোনো চেষ্টাই করলে না। সমর-বিভাগের চোখে ধুলো দেবার কোনো লক্ষণই তার নেই। তবে কি তমাস রশ আর গেডনকে এমন-কোনো গোপন জায়গায় বন্দী ক'রে রাখা হয়েছে, বাঘা-বাঘা গোয়েন্দারাও যার কোনো সন্ধান পাবে না?

রকমসকম দেখে তা-ই তো মনে হচ্ছে। তবে 'এব্বা'র উপর যে বিশেষ নজর দেবার নির্দেশ এসেছে, এ-খবরটা জানা থাকলো কাউন্টের। আত্মবিশ্বাস কতখানি অটল থাকতো, সে-সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বিশেষ নির্দেশের কারণও ছিলো। হেল্‌থফুল হাউসে হঠাৎ একজন অজ্ঞাত পরিচয় বিদেশী কাউন্টের পদার্পণ অনেকেরই চোখে পড়েছে। তাঁর হাবভাব দেখে আরোগ্য নিকেতনের অধ্যক্ষের মনে অবশ্যি কোনো সন্দেহই হয়নি, এটা খুবই সত্যি কথা, কিন্তু সপার্ষদ কাউন্ট বিদায় নেবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তমাস রশ ও তার রক্ষীর উধাও হ'য়ে যাওয়াটা একে-বারে কাকতাল ব'লেও আবার মনে হয় না। তাছাড়া তাঁরা চ'লে যাবার পর ১৭ নম্বর মণ্ডপটিতে আর-কোনো বাইরের লোক ঢোকেনি। একবার যখন সন্দেহ জেগেছে, তখন তার আশু নিরসন অত্যন্ত জরুরি। এই রহস্যময় অপহরণের পিছনে

banglabooks.in

বিদেশী কাউন্টটির কোনো হাত আছে কি না, এটাই ভাবছিলো গোয়েন্দা-বিভাগ। বাগানে ঢুকেই কাউন্টের সঙ্গী দরজার ছিটকিনি নামিয়ে চাবিটা খুলে নিয়ে যায়নি তো? তারপর রাতের আঁধারে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে এসে মানুষ গুম করা তো নেহাৎই ছেলেখেলা, বিশেষ ক'রে স্কুনার 'এব্বা' যখন তীরের একেবারে কাছেই দাঁড়িয়েছিলো।

গোড়ায় অবিশ্যি কারু মাথাতেই সন্দেহ উঁকি কি দেয়নি, কিন্তু যেই দেখা গেলো সাতসকালে 'এব্বা' ঘড়ঘড় ক'রে নোঙর তুলে মোহানা পেরিয়ে পামলিকো সাউণ্ডের একটা প্রবেশমুখের দিকে চলেছে, তখুনি সন্দেহটা একেবারে ডালপালা মেলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

আর তাই 'ফ্যালকন' আর শুল্কবিভাগের জাহাজে উপর থেকে নির্দেশ এলো —'এব্বা'র পাছু নিতে হবে: যখুনি 'এব্বা' কোনো-একটা প্রণালীতে ঢুকবে, তক্ষুনি তার গতিরোধ ক'রে একেবারে খোল-নলচে খুলে ফেলে তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে দেখতে হবে! সন্তোষজনকভাবে খানাতল্লাশি শেষ হবার আগে পর্যন্ত ছাড়পত্র দেবার কোনো প্রশ্নই উঠবে না।

তাঁর প্রমোদতরীর উপরে যে বিশেষ নজর রাখা হয়েছে, তা কি তবে কাউন্ট দার্তিগাস জানতেন না? তাঁর উপরেই যে গোয়েন্দাবিভাগের সব সন্দেহ পড়বে, এই সহজ কথাটাও কি তাঁর মাথায় ঢোকেনি? না কি সবই জানতেন—জেনেশুনেও সহজাত দম্ভ ও ঔদ্ধত্যের বশেই তিনি এতখানি বেপরোয়া হ'য়ে উঠেছেন?

বেলা তিনটের সময় হ্যাটেরাস প্রণালীর এক মাইলের মধ্যে এসে পড়লো 'এব্বা'—একেবারে মাঝখান দিয়ে সে এগিয়ে চললো সমুদ্রের দিকে।

কতগুলো ছোট মাছধরা জাহাজ তল্লাশি ক'রে 'ফ্যালকন' তখন প্রণালীর মুখেই অপেক্ষা করছিলো। চুপি-চুপি এক ফাঁকে স'রে পড়ার কোনো উপায়ই ছিলো না 'এব্বা'র। আর সবগুলো পাল খাটিয়ে দ্রুত পালাবার চেষ্টা করাও অসম্ভব—কারণ পালতোলা জাহাজ কী ক'রে বাষ্পোচলা যুদ্ধজাহাজের সঙ্গে পাল্লা দেবে? সংকেত অনুযায়ী কাজ না-করলে দু-একটা কামানের গোলা এসে পড়তে পারে।

হঠাৎ 'ফ্যালকন-এর পাশ থেকে 'এব্বা'কে লক্ষ্য ক'রে একটা ছোটো নৌকো এগিয়ে এলো। নৌকোটায় দুজন অফিসার আর দশজন নাবিক ব'সে আছে।

গলুইয়ে ডেকচেয়ারে ব'সে শান্ত মুখে ধাবমান নৌকোটাকে অবলোকন করতে-করতে আস্তে একটা চুরুট বরিয়ে নিলেন কাউন্ট দার্তিগাস।

banglabooks.in

প্রায় দুশো হাত দূরে থাকতেই নৌকো থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে নিশেন নাড়তে লাগলো।

'থামতে বলছে,' বললে সেরকো।

'তা-ই তো দেখছি,' উত্তর দিলেন কাউন্ট।

'অপেক্ষা করতে বলছে।'

'তাহ'লে অপেক্ষাই করা যাক।'

অমনি কাপ্তেন স্পেড স্কুনার থামিয়ে ফেলবার নির্দেশ দিয়ে দিলে। ভাঁটার টান তখনও বেশ প্রখর, তাই থামিয়ে ফেলা সত্ত্বেও স্রোতের টানে 'এব্বা' আস্তে-আস্তে ভেসে যেতে লাগলো।

ছপছপ ক'রে দাঁড় পড়ছে। দেখতে-দেখতে 'ফ্যালকন'-এর নৌকো পাশে এসে ভিড়লো। বাঁধা হ'লো দড়ি, নামিয়ে দেয়া হ'লো রজ্জুর সিঁড়ি, আর তক্ষুনি অফিসার দুজন আটজন নাবিককে নিয়ে 'এব্বা'য় উঠে এলো—বাকি দুজন নাবিক নৌকোতেই র'য়ে গেলো।

মাস্তুলের সামনে উঁচু পাটাতনটায় সার দিয়ে দাঁড়ালে 'এব্বা'র মাঝিমাল্লারা।

'ফ্যালকন'-এর লিউটেনাণ্ট লম্বা পা ফেলে ভারিক্কি চালে স্কুনারের মালিকের দিকে এগিয়ে এলো অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। কাউন্ট দার্তিগাসও ততোধিক চালিয়াতির সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন।

'আপনিই তো কাউন্ট দার্তিগাস? স্কুনারের মালিক?'

'হ্যাঁ।'

'স্কুনারের নাম?'

'"এব্বা"।'

'কাপ্তেন?'

'স্পেড।'

'জাতি?'

'ইন্দো-মালয়।'

লিউটেনাণ্ট একবার স্কুনারের নিশেনের দিকে তাকালে।

কাউন্ট দার্তিগাস জিগেশ করলেন, 'আমার ছোট্ট স্কুনারটায় আপনার পায়ের ধুলো পড়লো কেন জিগেশ করতে পারি কি?'

'উপর থেকে হুকুম এসেছে পামলিকো সাউণ্ডের সব নৌযান তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে

banglabooks.in

তা আর লিউটেনাণ্ট খুলে বলা দরকার ব'লে মনে করলে না। 'আশা করি আপনার তাতে কোনো আপত্তি নেই, ম'সিয় লা কোঁৎ ?'

'না, না, আপত্তি কীসের। আপনি স্বচ্ছন্দেই মাস্তুলের ডগা থেকে খোলের তলা অবধি খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে আসতে পারেন। কিন্তু হঠাৎ পামলিকো সাউণ্ডে এই কড়াকড়ির কারণ কী, জানতে পারি কি ?'

'কারণটা গোপন করার কিছু নেই, ম'সিয় লা কোঁৎ,' বললে লিউটেনাণ্ট, 'ক্যারোলাইনার রাজ্যপালের কাছে বার্তা গেছে কাল রাত্তিরে হেল্‌থফুল হাউস থেকে জোড়া মানুষ গুমখুন হয়েছে। রাতারাতি কোনো জাহাজে ক'রে যে তাঁদের পাচার করার চেষ্টা হচ্ছে না, সে-সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হ'তে চান।'

'অ্যাঁ! তাও কি সম্ভব ?' দার্তিগাসের চোখেমুখে বিস্ময় জেগে উঠলো। 'কারা উধাও হয়েছেন হেল্‌থফুল হাউস থেকে ?'

'একজন পাগল আবিষ্কারক, সেই সঙ্গে তাঁর রক্ষী!'

'পাগল ? তমাস রশ নন তো ?'

'তিনিই।'

'তমাস রশ! তাঁর সঙ্গে তো কালকেই আমরা দেখা ক'রে এসেছি। অধ্যক্ষের সামনেই তো তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হ'লো। তিনি নিখোঁজ! তাজ্জব ব্যাপার! কাপ্তেন স্পেড আর আমি ফিরে আসার সময়ে অবিশ্যি দেখে এসেছি রশ বেজায় খেপে গিয়েছিলেন।'

লিউটেনাণ্ট তীক্ষ্ণ চোখে কাউণ্টকে লক্ষ করছিলো। সন্দেহজনক কিছু যদি চোখে প'ড়ে যায়।

'অবিশ্বাস্য! তাজ্জব ব্যাপার!' কাউণ্ট দার্তিগাসের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হ'লো তিনি বুঝি এইমাত্র এই দুর্ধর্ষ অপহরণের খবরটা শুনলেন। 'ওঃ, তাই! এতক্ষণে কর্তাদের উদ্বেগের কারণটা বুঝতে পারলুম। ব্যক্তি হিশেবে তমাস রশের গুরুত্ব বিবেচনা করলে এই কড়াকড়ির কারণটা বোঝা যায়। তা আপনারা কি ভেবেছেন নাকি আমরাই তাঁকে লুকিয়ে রেখেছি! রশ বা তাঁর রক্ষী যে "এক্বা"য় নেই, তা নিশ্চয়ই না-বললেও চলে। তবু আপনি নিজেই সব একবার তন্নতন্ন ক'রে দেখে নিন। ক্যাপটেন, তুমি এঁদের নিয়ে গিয়ে সব ভালো ক'রে দেখিয়ে দাও!' ব'লে কেতাদুরস্তভাবে লিউটেনাণ্টকে অভিবাদন ক'রে কাউণ্ট দার্তিগাস আবার তাঁর ডেকচেয়ারে ব'সে পড়লেন; পরম ঔদাসীন্য ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে আবার ঠোঁটের ফাঁকে চুরুটটা গুঁজে দিয়ে হেলান দিয়ে ব'সে রইলেন তিনি।

banglabooks.in

কাপ্তেন স্পেড অফিসার দুজন ও আটজন নাবিককে 'এক্সা'র সর্বত্র নিয়ে গেলো। খানাতল্লাশিতে যথাসম্ভব সাহায্যও করা হ'লো। জাহাজের পিছন দিককার সেলুনে গিয়ে তাক লেগে গেলো অফিসারদের। মস্ত ঘরটি একই সঙ্গে বৈঠকখানা, মাচঘর ও পানগৃহ। দামি-দামি বিলাসদ্রব্যে সাজানো, ঘরের চারপাশে দামি কাঠের প্যানেল, মেঝেয় সেরা জাতের গালচে পাতা, দেয়ালে নানারকম দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছবি, কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে দামি পরদা। সেলুনের আশ-পাশের কামরাগুলো, কাউন্ট দার্তিগাসের খাশকামরা—সবই তন্নতন্ন ক'রে দেখলো অফিসাররা। প্রত্যেকটা ছোটো জিনিশ পর্যন্ত উলটে-পালটে নেড়ে-চেড়ে দেখা হ'লো, যদি কোনো-কিছুর হদিশ পাওয়া যায়। মনিব সম্বন্ধে কারু মনে যাতে কোনো সংশয় না-থাকে, সেইজন্য কাপ্তেন স্পেডও তাদের সঙ্গে হাত লাগালে। কিন্তু তমাস রশ বা গেডনের চুলের ডগাটুকুও কোথাও দেখা গেলো না।

সবগুলো ঘর যখন খোঁজা শেষ হ'য়ে গেলো, বাকি রইলো কেবল খোল আর পিপেগুলো খোঁজা। অনেক সময় লাগবে এতে—তাছাড়া সতর্কতাও চাই বিশেষ। ঘুলঘুলির ঢাকাগুলো তুলে প্রবেশপথ উন্মুক্ত ক'রে খানাতল্লাশির সুবিধের জন্যে খোলের মধ্যে দুটো জ্বলন্ত লণ্ঠন নামিয়ে দেয়া হ'লো।

খোলের মধ্যে পাওয়া গেলো মস্ত সব পিপেভর্তি পানীয় জল, নানারকম খাবারদাবার, ছোটো-ছোটো পিপেভর্তি অনেক রকম মদিরা ও সুরা, রাশি-রাশি কয়লা—সব-কিছুই পরিমাণে এত বেশি যে দেখে বোঝা যায় 'এক্সা' একটা মস্ত পাড়ি দেবার জন্য তৈরি হ'য়েই বেরিয়েছে। সেই মালপত্রের স্তূপের মধ্যেকার ছোটো-ছোটো ফাঁক দিয়ে নিচু হ'য়ে গিয়ে সবগুলো কোনাথামচিই খুঁটিয়ে দেখা হ'লো—অতীব সরু ও ছোট্ট ফাঁকগুলো পর্যন্ত বাকি রাখা হ'লো না। কিন্তু মিথ্যেই এত হয়রানি। বেশ বোঝা গেলো, এই অপহরণ রহস্যে আর যারই হাত থাক, কাউন্ট দার্তিগাসের কোনো সম্পর্ক নেই—মিথ্যেই তাঁকে অন্যায়ভাবে সন্দেহ করা হয়েছে।

দু-ঘণ্টা ধ'রে সরেজমিন তদন্ত ক'রে খালি হাতেই ডেকে উঠে এলো অফিসাররা ও তাদের দলবল। বিকেল তখন সাড়ে-পাঁচ। তমাস রশ আর গেডন যে জাহাজের মধ্যে কোথাও নেই, এ-বিষয়ে তাদের তখন কোনো সংশয় নেই। বাকি ছিলো নৌকোগুলো দেখা। কিন্তু সেখানেও যখন বৈজ্ঞানিকের কোনো পাত্তা পাওয়া গেলো না, তখন গোয়েন্দা-বিভাগ যে কোথাও একটা মস্ত ভুল করেছে, সে-সম্বন্ধে তাদের আর কোনো সংশয় ছিলো না। যাবার আগে

banglabooks.in

কাউণ্টকে তারা সেই কথাই ব'লে গেলো।

'ম'সিয় লা কোঁৎ,' লিউটেনাণ্ট বললে, 'খামকা আপনাকে এতটা উত্ত্যক্ত ক'রে গেলুম। ক্ষমা করবেন।'

'আরে ছী-ছি, সে কী কথা!' কাউণ্ট দার্তিগাস বিনয়ে একেবারে নুয়ে পড়লেন। 'আপনারা তো শুধু কর্তাদের হুকুম তামিল করলেন।'

'তাছাড়া নিছক নিয়মরক্ষা যাকে বলে,' লিউটেনাণ্ট জানালে।

কাউণ্ট দার্তিগাস মাথা হেলিয়ে কৈফিয়ৎটা মেনে নিলেন। 'আগেই তো বলেছিলুম, ঐ গুমখুনের ব্যাপারে আমার কোনোই হাত নেই·· '

'আমরা কখনোই আপনাকে সন্দেহ করিনি, ম'সিয় লা কোঁৎ। আচ্ছা···এখন আমরা চলি!'

'সে আপনাদের ইচ্ছে। তা "এব্বা" এবার ছাড়তে পারি তো?'

'নিশ্চয়ই।'

'ও রেভোয়া!' পুর্নদর্শনায় ব'লে বিদায় জানালেন কাউণ্ট, 'আমাকে প্রায়ই এদিককার উপকূলে আসতে হয়—হয়তো শিগগিরই ফিরে আসবো। আশা করি তার আগেই চক্রান্তকারীদের আপনারা গ্রেফতার ক'রে ফেলবেন, আর তমাস রশকেও আরোগ্য নিকেতনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। শুধু মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেই নয়, আস্ত জগতের কথা ভেবেই আমি এই আশা প্রকাশ করছি।'

নম্রভাবে অভিবাদন ক'রে অফিসাররা বিদায় নিলে। কাউণ্টও মাথা হেলিয়ে বিদায় দিলেন। কাপ্তেন স্পেড জাহাজের কিনার অব্দি গেলো তাদের সঙ্গে। শিগগিরই সদলবলে নৌকোয় নেমে গেলো অফিসাররা, অমনি নৌকোটা ছেড়ে দিলে।

কাউণ্ট দার্তিগাস ইঙ্গিত করতেই কাপ্তেন স্পেড আগের মতো পাল খাটিয়ে দিতে হুকুম দিলে। হু-হু ক'রে জোর হাওয়া বইছে তখন। দেখতে দেখতে 'এব্বা' হ্যাটেরাস প্রণালীতে ঢুকে পড়লো—তারপর খোলা সমুদ্রে পৌঁছতে তার আধ ঘণ্টাও লাগলো না।

বাতাস প'ড়ে গেলো ঘণ্টাখানেক পরেই। তীর থেকে কয়েক মাইল গেলেই তীরের হাওয়া এমনিভাবেই মৃদু হ'য়ে যায়। কাজেই 'এব্বা'ও গতি হারিয়ে নিশ্চল ভাসতে লাগলো সমুদ্রে। ফেঁপে-ওঠা পালগুলো সব নেতিয়ে পড়েছে। 'এব্বা' এই অবস্থায় এগোয় কী ক'রে?

গলুইয়ের কাছে ঠায় দাঁড়িয়েছিলো কাপ্তেন স্পেড। হ্যাটেরাস প্রণালী

banglabooks.in

পেরিয়ে আসার পর থেকেই সে তীক্ষ্ণচোখে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কী যেন লক্ষ করবার চেষ্টা করছিলো—বোধহয় চাচ্ছিলো এমন-কিছু দেখতে যেটা হঠাৎ জলের উপর ভেসে উঠবে। আচম্বিতে সে একসময় চেঁচিয়ে উঠলো, 'পালের দড়ি টানো!'

সঙ্গে-সঙ্গে মাল্লারা শশব্যস্তে হুকুম তামিল করলে। ঝুলে-পড়া পালগুলো তক্ষুনি আড়াআড়ি কাঠের উপর টেনে তুলে দেয়া হ'লো, কিন্তু বস্ত্রবন্ধনী দিয়ে ঢেকে রাখা হ'লো না।

তবে কি সকালবেলার বাতাস পালে না-লাগা পর্যন্ত কাউন্ট এখানেই দাঁড়িয়ে থাকবেন ব'লে ঠিক করেছেন? কিন্তু এ-রকম অবস্থায় তো সব্বাই পাল টাঙিয়েই ব'সে থাকে বাতাসের জন্য। তাহ'লে? কাউন্টের মৎলব কি অন্য-কিছু?

তা-ই সম্ভবত। কারণ ততক্ষণে সমুদ্রে একটা নৌকো নেমে পড়েছে। কাপ্তেন স্পেড একজন নাবিক নিয়ে তাতে নেমে গেলো। দেখতে-দেখতে নৌকো গিয়ে পৌঁছুলো 'এব্বা'র বামদিকে খানিকটা দূরে, যেখানে জলের উপরে একটা ছোট্ট বয়া ভাসছে, ঠিক যেমনটি ভাসতে দেখা গিয়েছিলো নয়জের জলে, হেল্‌থ-ফুল হাউসের কাছে, 'এব্বা'র পাশেই।

বয়াটা তক্ষুনি নৌকোর উপর টেনে তোলা হ'লো। বয়ার সঙ্গে বাঁধা শিকলটাও উঠে এলো নৌকোয়। তারপর নৌকোটা আবার 'এব্বা'র গলুইয়ের কাছে ফিরে এলো।

নৌকোটা ফিরতেই জাহাজ থেকে একটা গুণটানা মোটা দড়ি ছুঁড়ে ফেলা হ'লো; দড়িটা বাঁধা হ'লো বয়ার শিকলের সঙ্গে; তারপর নাবিকটিকে নিয়ে কাপ্তেন স্পেড স্কুনারের উপর উঠে এলো। তক্ষুনি বাঁকা একটা ডাণ্ডার উপর নৌকোটাকে তুলে নেয়া হ'লো।

সঙ্গে-সঙ্গে গুণটানা দড়িটা টান-টান হ'য়ে গেলো। পাল গুটিয়ে আছে, কিন্তু তবু কম ক'রেও অন্তত দশ 'নট' বেগে 'এব্বা' পুবদিকে এগিয়ে চললো।

রাত ক'রে এলো; দিগন্তে কুয়াশার মধ্যে মারকিন উপকূলের আলোগুলো একে-একে হারিয়ে গেলো।

banglabooks.in

৫

'আমি কোথায় ?'

[এনজিনিয়ার সিমোন আর্‌ৎ-এর ডায়েরি থেকে]

আমি কোথায় ? মণ্ডপের কয়েক পা দূরেই হঠাৎ কারা যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। তারপর কী হ'লো ?

দরজার পাশেই ঘর ; ডাক্তারকে বিদায় জানিয়ে ঘরের দিকে ফিরে আসছিলুম ; উদ্দেশ্য ছিলো ফিরে এসেই আবার তমাস রশের কাছে গিয়ে বসবো। ঠিক এমন সময়ে কারা যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, তৎক্ষণাৎ আমাকে মাটিতে পেড়ে ফেললো। কারা তারা ? তক্ষুনি চোখে কাপড় বেঁধে দিয়েছিলো তারা, তাই কাউকেই চিনতে পারিনি। কাপড় ঠেশে দিয়েছিলো মুখে, তাই চেঁচিয়ে-মেচিয়ে লোকজনও জড়ো করতে পারিনি। আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছিলো ব'লে এমনকী কোনোরকম বাধা দিতেও পারিনি। আর সেই অবস্থাতেই মনে হ'লো কারা যেন আমাকে ধরাধরি ক'রে শূন্যে তুললো, চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে গেলো কিছুদূর। খানিকটা গিয়েই আবার আমাকে নামিয়ে দেয়া হ'লো, শুইয়ে চিৎ ক'রে রাখলো আমাকে—

কোথায় ? কোনখানে ?

কী হ'লো রশের ? নিশ্চয়ই রশের ক্ষতি করাটাই ওদের আসল মৎলব—আমি কোথাকার কে, যে আমাকে ওরা খামকা টেনে-হিঁচড়ে কোথাও নিয়ে যাবে ? জগতের চোখে আমি তো সামান্য গেডন, তমাস রশের রক্ষক—তাছাড়া আমার আর-কোনো পরিচয় নেই, তমাস রশকে সারাক্ষণ চোখে-চোখে রাখাই আমার কাজ। সিমোন আর্‌ৎ নামে আমাকে কেউ চেনেই না। কেউ জানে না আমি সত্যি কে, কী আমার পরিচয়, কোন দেশের লোক আমি আর আমার চরিত্রই বা কী-রকম। কাজেই সামান্য একজন হাসপাতালের নার্সকে খামকা কেন আততায়ীরা পাকড়াও করতে যাবে ?

ফরাশি বৈজ্ঞানিকটিকে যে গুম করা হয়েছে, তাতে আর আমার কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু হেল্‌থফুল হাউস থেকে খামকা তাকে অপহরণ করতেই বা চাইবে কেন কেউ, যদি-না তাঁর আবিষ্কারের গোপন রহস্য জানবার জন্য কেউ অত্যন্ত উৎসুক হ'য়ে উঠে থাকে।

banglabooks.in

তমাস রশও আমার সঙ্গে-সঙ্গে গায়েব হয়েছেন, এই ধারণার বশবর্তী হ'য়েই কিন্তু এ-সব কথা ভাবছি আমি। কিন্তু সত্যি কি তা-ই ঘটেছে?...নিশ্চয়ই তা-ই। তমাস রশও আমার সঙ্গেই অপহৃত হয়েছেন। এতে আর আমার কোনো সংশয় নেই! যে ষণ্ডা-বদমায়েশের খপ্পরে এসে আমি পড়েছি, শুধু মানুষ চুরি করাটাই নিশ্চয়ই তাদের আসল মৎলব নয়। তাই যদি হ'তো, তাহ'লে এত ঝামেলা পুইয়ে এভাবে তারা কাজ হাঁসিল করতো না। আমার মুখে কাপড় ঠেশে, হাত-পা-চোখ বেঁধে বাগানের কোণে ফেলে রেখে রশকে নির্বিঘ্নে নিয়ে গেলেই পারতো—আমাকে শুদ্ধু এইভাবে চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে আসতো না।

কিন্তু কোথায় এনে রাখলে আমাদের? ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে কেবল এই প্রশ্নটারই উত্তর খুঁজছি আমি। পাকেচক্রে শেষটায় এক মস্ত রহস্যের জালে জড়িয়ে পড়লুম···জানি না এই রগরগে অ্যাডভেনচার কীভাবে ও কোথায় গিয়ে শেষ হবে। ভবিষ্যতের কথা ভাবতেও কোনো সাহস হচ্ছে না। কিন্তু যা-ই ঘটুক না কেন, যত সাংঘাতিক বা মারাত্মকই হোক না কেন তার জের, প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি, সমস্ত অনুপুঙ্ক্ষ আমি স্মৃতিতে ধ'রে রাখতে চাই। একটা মুহূর্তকেও ভুলে গেলে চলবে না, মনে রাখতে হবে রোজকার কথা। কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে কী সঞ্চিত আছে! কে জানে, সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এই পরিস্থিতিতে আমি হয়তো একদিন রস-ফুলগুরেটরের গোপন সূত্রই আবিষ্কার ক'রে ফেলবো। যদি কোনোদিন ছাড়া পাই, তাহ'লে সেই রহস্য আমি জগৎকে জানিয়ে দেবো। আর সেই সঙ্গে জানিয়ে দেবো কারা এই দুষ্কর্মের হোতা—কারা আমাদের এভাবে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছে!

কিন্তু···কিন্তু আমি কোথায়? এই মুহূর্তে এই প্রশ্নটার উত্তর পাওয়াই আমার কাছে সবচেয়ে জরুরি।

গোড়া থেকেই শুরু করা যাক বরং। চেষ্টা করা যাক কোথায় আছি সেটা কোনো-কিছু থেকে বুঝতে পারি কি না।

হেল্‌থফুল হাউস থেকে চ্যাংদোলা ক'রে নিয়ে এসে যেখানে আমাকে চিৎপাত ক'রে শুইয়ে দেয়া হ'লো, যদ্দুর মনে হ'লো সেটা একটা বেঞ্চির মতো কিছু। বেঞ্চিটা দুলছিলো। সম্ভবত কোনো নৌকোর পাটাতনই হবে সেটা—বেঞ্চি নয়। খুবই ছোটো একটা নৌকো—হয়তো কোনো জাহাজের।

আমাকে শোয়াবার সঙ্গে-সঙ্গে পাটাতনটা দুলে উঠছিলো। সেই দুনুনি থামতে না-থামতেই আবার দুম ক'রে দুলে উঠেছিলো পাটাতনটা। নিশ্চয়ই

banglabooks.in

আরো-কাউকে তুলে আনা হ'লো এই নৌকোয়। তমাস রশ নন তো? তাঁর মুখে কাপড়ের ফালি ঠাশারও দরকার নেই, হাতা-পা-চোখ বাঁধারও দরকার নেই। তাঁর ক্ষিপ্ত ও মুহ্যমান অবস্থা কাটতে এখনো অনেক দেরি। কাজেই বাধা দেয়া তো দূরের কথা, রাতের অন্ধকারে তাঁকে নিয়ে যে কী খেলাই চলেছে তাও তিনি টের পাবেন না। আমার অনুমান যে মিথ্যে নয়, তক্ষুনি তার প্রমাণ পাওয়া গেলো। মুখে কাপড়ের পুঁটুলি ঠাশা থাকা সত্ত্বেও নাকে ঈথারের গন্ধ এসে লাগলো। কাল রাতে চ'লে যাবার আগে ডাক্তার রশকে কয়েক ফোঁটা ঈথার দিয়ে গিয়েছিলেন। ওষুধ দেবার সময় বড্ড ঝটাপটি করেছিলেন রশ, সেই সময়ে ধস্তাধস্তিতে একটু ঈথার তাঁর জামায় ছলকে প'ড়ে গিয়েছিলো। কাজেই গন্ধটা পেয়ে এখন আমি মোটেই আশ্চর্য হলুম না। এই নৌকোতেই আছেন তমাস রশ—আমার পাশেই প'ড়ে আছেন। আমি যদি কোনোরকমে এখন ১৭ নম্বর মণ্ডপে ফিরেও যাই, তমাস রশকে যে আর আমি সেখানে দেখতে পাবো না, তাতে আমার আর কোনো সন্দেহ নেই।

একটা হিংটিংছট প্রশ্নই কেবল মাথার মধ্যে কামড়াচ্ছিলো: হঠাৎ হেল্‌থফুল হাউস দেখতে যাবার খেয়াল কাউণ্ট দার্তিগাসের মাথায় চাপলো কেন? তাঁর সঙ্গে তমাস রশের দেখা না-হ'লে এ-সব কিছুই ঘটতো না। দিব্যি ছিলেন খোশ-মেজাজে, হঠাৎ আবিষ্কার নিয়ে কথাবার্তা হ'তেই রশ একেবারে খেপে গেলেন। দোষটা অধ্যক্ষেরই—আমার সাবধানবাক্য তাঁর কানেই গেলো না। কানে গেলে মণ্ডপে রাত্তিরে ডাক্তারও আসতেন না, দরজাও বন্ধ থাকতো, এই কুচক্রীদের মৎলবও ফেঁসে যেতো।

রশকে অপহরণ ক'রে লাভ কার, কোনো ব্যক্তিবিশেষের না কি কোনো ইওরোপীয় রাষ্ট্রের—তা নিয়ে আলোচনা ক'রে লাভ নেই। তবে আমি একটা কথা বিশেষ জোর দিয়ে বলতে চাই; আমি যা নিয়ে গত পনেরো মাস ধ'রে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি আর কারু পক্ষেই ততখানি কষ্ট করা সম্ভব হবে না। রশের এই মাথার ব্যামো না-সারা অব্দি তাঁর মুখ থেকে গুপ্তরহস্য বার করতে যাবার সব চেষ্টাই বিফল হবে। বরং চেষ্টা করতে গিয়ে আরো ক্ষতি হ'তে পারে: পুরোপুরি খেপে যেতে এখনো যেটুকু তাঁর বাকি আছে, তাও এই খোঁচাখুঁচিতে শেষ হ'য়ে যাবে—এখনো তাঁর চিন্তায় মাঝে-মাঝে যে-স্বচ্ছতা ও যে-তীক্ষ্ণতা দেখা যায়, তাও যাবে।

কিন্তু সমস্যাটা এই মুহূর্তে তমাস রশকে নিয়ে নয়, আমাকে নিয়ে।

banglabooks.in

হঠাৎ মস্ত একটা ঝাঁকুনি, তারপরেই দাঁড়ের ছপ-ছপ শব্দ। বুঝলুম নৌকো ছাড়লো। কিন্তু সেই জলযাত্রা শেষ হ'লো মিনিট খানেকের মধ্যেই। তারপরেই আবার একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি ; বুঝতে পারলুম নৌকোটা একটা জাহাজের পাশে গিয়ে ঠেকলো···এই-তো, নৌকাটাকে টেনে তোলা হ'লো। একটা চাপা শোরগোল শোনা গেলো, উত্তেজনায় ভরা কাদের গলার স্বর···কারা যেন কথা বলছে, কে কাকে কী হুকুম দিলে, কারা সে-হুকুম তালিম করলো···কিন্তু কথাবার্তার এক বর্ণও বুঝতে পারলুম না—কী-যে এক দুর্বোধ্য ভাষায় এরা কথা বলছে !

আন্দাজ করলুম, এই নৌকোটা যে-জাহাজের, আমাকে সেই জাহাজেই তোলা হবে, তারপরে একেবারে জাহাজের খোলের মধ্যে পাচার ক'রে দেয়া হবে। যতক্ষণ-না খোলা সমুদ্রে গিয়ে এ-জাহাজ পৌঁছোয় ততক্ষণ আমাকে এক ভ্যাপশা কালো গর্তেই বন্দী থাকতে হবে। পামলিকো সাউণ্ডে জাহাজ চলবে, আর আমরা ডেকে হাওয়া খাবো, তা তো হয় না। সেখানে সব মারকিন রণতরী গিশগিশ করছে কি না !

হঠাৎ কারা যেন আমার ঘাড় আর পা চেপে ধরলে। মুখের ঠুলিটা খশলো না। কী আশ্চর্য ! কর্কশ হাতগুলো আমাকে তো জাহাজের ডেকে তুললো না, বরং যেন নৌকো থেকে আরো নিচেই নামিয়ে দিচ্ছে ! কিন্তু কোথায় নামাচ্ছে আমাকে? জলের মধ্যে ? জলে ফেলে দেবে নাকি আমাকে ? সত্যি-তো, আমাকে তারা খামকা চাইবে কেন, আমি তো আর তমাস রশ নই , তবে তারা আমাকে সলিল সমাধি দিয়ে রেহাই পেতে চাচ্ছে ? তক্ষুনি আমার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অব্দি শিউরে উঠলো। প্রায় যেন জন্তুর মতো কাপড়ঠাশা মুখে হা ক'রে নিশ্বাস নিলুম আমি, জানি ফুশফুশে একটু পরেই আর হাওয়া ঢুকবে না।

কই, না তো ! জলে ফেললো না তো আমাকে, বরং শুইয়ে দিলে নিরেট মেঝের উপর। কনকনে ঠাণ্ডা মেঝে—কঠিন ধাতুর মতো ঠাণ্ডা। হাত-পা টান করতে গিয়েই আরো অবাক হ'য়ে গেলুম—আরে ! আমার বাঁধন দেখছি খুলে দিয়েছে ! পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেলো আশপাশ থেকে। পরক্ষণেই সশব্দে ধাতব আওয়াজ ক'রে দরজাটা বন্ধ হ'য়ে গেলো।

আমি কোথায় ? শেষকালে এ কোনখানে এসে পড়লুম ? একা আছি না কি ? মুখ থেকে কাপড়ের পুঁটুলিটা খুলে নিলুম, চোখ থেকে খুলে নিলুম পট্টিটা।

অন্ধকার ! ঘুটঘুট্টে অন্ধকার। যেন নিরেট একটা অন্ধকারের দেয়াল ঘিরে আছে আমাকে। কোথাও আলোর ক্ষীণতম রশ্মিও নেই। এমনকী একেবারে বন্ধ

banglabooks.in

ঘরেও সাধারণত চোখের তারায় একটু-না-একটু আলো ধরা পড়ে—এখানে যেন তাও নেই।

চেঁচিয়ে হাঁক দিলুম—বার-বার কয়েকবার। কোনো সাড়া নেই। কোনো প্রতিধ্বনি নেই। যেন একটা প্রতিধ্বনিহীন বন্ধ ঘরে আমার চীৎকার-চ্যাঁচামেচি ম'রে গেলো।

তাছাড়া নিশ্বাসের সঙ্গে যে বাতাস টানছি তাও গরম। কী-রকম একটা দমবন্ধ-করা চাপা ভাব। এ-রকমভাবে কিছুক্ষণ চললেই ফুশফুশ জখম হ'য়ে যাবে।

হাৎড়ে দেখবো নাকি কোথায় এসেছি? দু-হাত বাড়িয়ে দিলুম সামনে। হাৎড়ে-হাৎড়ে দেখলুম : লোহার চাদর দিয়ে গড়া চার দেয়ালের একটা কোঠায় রেখে গেছে আমাকে—এই বন্দীকে। হাত বুলিয়ে-বুলিয়ে অনুভব করলুম অগুনতি নাট-বলটু দিয়ে আঁটা লোহার পাতগুলো—ঠিক যে-রকম দেখা যায় হাওয়া-নিরোধ-করা ঘরে।

শুধু একদিকে কী-যেন-একটা রয়েছে—দরজার একটা কাঠামোর মতো। কব্জাগুলো দেয়ালের উপর দিয়ে অনেক দূর অব্দি চ'লে গিয়েছে। বুঝতে পারলুম দরজার পাল্লাটা ভিতর দিকে খোলে ; এই পথেই যে আমাকে এ-ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে, তাতে আর মোটেই কোনো সন্দেহ নেই।

দরজার গায়ে এসে কান পেতে রইলুম। টুঁ শব্দটি নেই কোনোখানে। এ-ঘরের মধ্যে অন্ধকার যেমন নিরেট, এই চাপা দমবন্ধ-করা স্তব্ধতাও ঠিক তেমনি। সেই ভারি স্তব্ধতা ভেঙে যাচ্ছে কেবল আমারই হাত-পা নাড়ার শব্দে—ধাতুর মেঝের উপর জুতোর আওয়াজে। সাধারণত জাহাজে ডেকের উপর থেকে যে-রকম শব্দ ভেসে আসে, সে-রকম ভারিক্কি ও গম্ভীর আওয়াজও নেই কোথাও। নেই ঢেউয়ের অবিশ্রাম আছড়ানি, কি জলের উপর দিয়ে ছ্ছলাৎ-ছ্ছলাৎ ক'রে এগিয়ে যাওয়ার একঘেয়ে আওয়াজ। নয়জে নদীর মোহানায় জল ভারি চঞ্চল—সেখানে ঢেউয়ের দোলায় বড়ো-বড়ো জাহাজও ঝাঁকুনি খায়—কিন্তু সে-রকম কোনো দুলুনিও তো টের পাচ্ছি না।

তবে আমি কোথায়? এটা কি কোনো জাহাজেরই কামরা, না কি অন্য-কিছু? তীর থেকে নৌকোয় ক'রে এখানে আসতে লেগেছে বড়োজোর মিনিট খানেক। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাকে কি বিশ্বাস করতে হবে যে নয়জের জলেই আমি ভাসমান? এমনও তো হ'তে পারে যে হেল্‌থফুল হাউসের কাছে কোনো জাহাজই ছিলো না,

banglabooks.in

নৌকোটা আবার গিয়ে শুকনো ডাঙাতেই ভিড়েছিলো ! সেক্ষেত্রে আমি নিশ্চয়ই শুকনো ডাঙার কোনো মাটির তলার ঘরে বন্দী হ'য়ে আছি। কোনো হুলুনি যে টের পাচ্ছি না, তার কারণও নিশ্চয়ই তা-ই। লোহার দেয়াল অবিশ্যি আছে, আছে নাট-বলটু আঁটা পাত, আর আছে তীব্র নোনা গন্ধ। এ-গন্ধ চিনতে তো কক্ষনো ভুল হয় না। সাধারণত জাহাজগুলোই এমনি নোনা আমিষ গন্ধে ঝিম ধ'রে থাকে।

বন্দী হবার পর বোধহয় পনেরো মিনিট কেটেছে, কিন্তু তাকেই মনে হচ্ছে ক ত ক্ষ ণ ! এখন নিশ্চয়ই মাঝরাত্তির। সকাল হওয়া অব্দি কি এখানেই থাকতে হবে ? ভাগ্যিশ সন্ধে নাগাদ নৈশভোজ সেরে নিয়েছিলুম ! হেল্‌থফুল হাউসের নিয়মই অবশ্য তাই—সকাল-সকাল নৈশভোজ সেরে নেয়া। খিদে এখন নেই বটে, কিন্তু বড্ড ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু ঘুমুলে চলবে না, ঘুমকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। বরং কিছু ভাবা যাক। কী ভাববো ? লোহার এই অদ্ভুত তোরঙ্গ ফুড়ে শব্দ বা আলো —কিছুই তো আসবে না। কিন্তু অপেক্ষা করা যাক। হয়তো কোনো আওয়াজ —তা সে যতই হালকা আর মোলায়েমই হোক না-কেন—কানে আসতে পারে। সব ইন্দ্রিয়ের শক্তি গিয়ে স্থাপন করলুম কানে। এখন থেকে আমাকে ভারি সাবধান থাকতে হবে। ডাঙায় যদি না-থাকি, তাহ'লে একবার-না-একবার একটু হুলুনি টের পাবোই ! জাহাজ যদি নোঙর ফেলাও থাকে, অল্পক্ষণের মধ্যেই তাকে রওনা হ'তে হবে—না-হ'লে আমাদের গুম ক'রে রাখার কোনো মানে হয় না।

না, ভুল হয়নি···অল্পক্ষণের মধ্যেই হালকা একটা হুলুনি টের পেলুম। যাক, নিশ্চিন্ত, এটা অন্তত জানা গেলো যে আর যেখানেই থাকি না কেন, ডাঙায় প'ড়ে নেই। কিন্তু হুলুনিটা এতই সামান্য যে প্রায় ধরা যায় না বললেই চলে। এতটুকু ঝাঁকুনি নেই, কাঁপুনি নেই, কেবল একটু দোলা লাগা—ঠিক যেন উপর দিয়ে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছি।

নাঃ, মাথা ঠাণ্ডা ক'রে একটু ভাবা যাক। নয়জের মোহানায় নোঙর-করা অনেকগুলো জাহাজের একটাতেই আমি আছি। হয়তো এই গুমখুন করার জন্যেই জাহাজটা এখানে এসেছিলো। পালতোলা জাহাজও হ'তে পারে, বাষ্পচলা কলের জাহাজও হ'তে পারে। যে-নৌকোটায় ক'রে আমাকে নিয়ে আসা হ'লো, তা থেকে আমাকে তো জাহাজের উপরে তোলা হয়নি। জাহাজের পাশ থেকে কোনো ফোকর দিয়ে আমাকে খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়নি তো ? তাতে অবিশ্যি কিছুই এসে-যায় না। জাহাজের খোলেই থাকি বা অন্য কোথাও থাকি—এটা

banglabooks.in

ঠিক জানি যে আমি যাতে শুয়ে আছি, সে-জিনিশটা ভাসে আর নড়ে।

শিগগিরই নিশ্চয়ই মুক্তি পাবো। তমাস রশকেও যদি আমারই মতো কোনো ঘরে বন্দী ক'রে রাখা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তিনিও শিগগিরই নিশ্চয়ই ছাড়া পাবেন। ছাড়া পাওয়া মানে ইচ্ছেমতো ডেকে-ওঠার অনুমতি পাওয়া। কিন্তু ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে সেটুকু স্বাধীনতা পাবারও সম্ভাবনা নেই। কারণ যারা আমাদের ধ'রে এনেছে, তারা আপাতত আমাদের লোকচক্ষুর আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চাইবে। সেইজন্যেই মারকিন উপকূলের সমুদ্র থেকে দূরে না-চ'লে এলে বাইরের খোলা হাওয়ায় নিশ্বাস নেয়া মোটেই সম্ভব নয়। হয়তো এটা একটা পালতোলা জাহাজ। তাই বাতাস না-ওঠা পর্যন্ত সবুর ক'রে আছে। ভোরবেলায় টাটকা জোরালো হাওয়ায় নিশ্চয়ই পামলিকো সাউণ্ডের উপর দিয়ে রাজহাঁসের মতো ভেসে যাবে। আর যদি বাষ্পেচলা কলের জাহাজ হয়···কিন্তু না; কলের জাহাজের মধ্যে সবসময়ে তেলকালির গন্ধ থাকে। এনজিন ঘরের সে-গন্ধ এতক্ষণে একবার নিশ্চয়ই পেতুম অন্তত। তাছাড়া চাকার ঘুরুনি, কলচলার গুমগুমে আওয়াজ, পিস্টনের ধাক্কা—এ-সব নিশ্চয়ই টের পেতুম।

যাই হোক না কেন, অধীর হ'লে চলবে না। কাল সকালে এই লোহার খাঁচা থেকে আমাকে বার ক'রে নিয়ে যাওয়া হবে। যদি বার না-ই করে, খাবার তো নিয়ে আসবে। না-খাইয়ে নিশ্চয়ই আমাকে মারবে না। তার চাইতে তো সোজাসুজি জলে ফেলে দিলেই পারতো—যদি মেরে ফেলাই তাদের উদ্দেশ্য হ'তো। কেউ আমার গলা শুনতে পেতো না: কেউ জানতে পেতো না কী হয়েছিলো ১৭ নম্বর মণ্ডপে।

তাছাড়া আমার সম্বন্ধে এরা কতটুকুই বা জানে? জানে যে আমি হাসপাতালের একজন নার্স। কোথাকার কে-এক গেডন, তাকে নিয়ে আবার মাথা-ব্যথা! আসলে এদের মৎলবই ছিলো তমাস রশকে নিয়ে আসা—আমি এদের খপ্পরে পড়েছি কেবল তখন মণ্ডপে ছিলুম ব'লে।

এই অনুমানই যদি ঠিক হয়, তাহ'লে কিছুতেই আমার সত্যি পরিচয় ফাঁস করা চলবে না: তমাস রশের রক্ষকের ভূমিকাতেই আমাকে অভিনয় ক'রে যেতে হবে। ঘূণাক্ষরেও এদের টের পেতে দেয়া হবে না যে গেডনের ছদ্মবেশে আমি হলুম এনজিনিয়ার সিমোন আর্‌ৎ। তাতে আমার সুবিধে দুটো: এক, তমাস রশের রক্ষকের মতো একটা নিরীহ মানুষকে নিয়ে কারুর কোনো মাথাব্যথা থাকবে না; দুই, এই ছদ্মবেশেই হয়তো একদিন সমস্ত প্যাঁচালো জট খুলে, এই দুর্ভেদ্য রহস্য

banglabooks.in

ভেদ ক'রে, চম্পট দিতে পারবো।

ধুত্তোর! কী ভাবছি এলোমেলো? কোথায় যাচ্ছি, তাই জানি না, তো চম্পট দেবো! সুযোগ যখন আসবে, তখন পালাবার কথা ঢের ভাবা যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমি যে কে, তা যেন ঘূণাক্ষরেও কেউ টের না পায়—সেইটেই হচ্ছে আমার একমাত্র লক্ষণীয়, একমাত্র কর্তব্য।

একটা বিষয়ে কিন্তু আমার আর সংশয় নেই। দ্রুতবেগে এগিয়ে চলেছি। তাহ'লে কি···না, এটা বাষ্পেচলা জাহাজ নয়, পালতোলা জাহাজও তো নয় পালের জাহাজ তো এত জোরে চলতে পারে না। তাহ'লে কি জোরালো এনজিনে এই জাহাজ চলে? নিশ্চয়ই তাই। কিন্তু চাকা ঘোরাবার কলকব্জা চললে যে-আওয়াজ হ'তো, তা কানে আসছে না কেন? ভারি আশ্চর্য তো! একটানা অবিরাম গতিতে ছুটে যাচ্ছে জাহাজটা, এনজিনের শক্তিটা যেন পিস্টনের সাহায্য ছাড়াই সরাসরি চাকায় গিয়ে পৌঁছোচ্ছে। না, আমারভুল হয়নি।নিশ্চয়ই বিশেষ-কোনো এনজিনের দ্বারা এই রহস্যময় জাহাজ চালানো হচ্ছে। কিন্তু কী সেটা?

তাহ'লে কি এটা সেই জাতীয় কোনো টারবাইন, যা নিয়ে সম্প্রতি তুলকালাম প'ড়ে গেছে? প্রপেলারের দিন আর নেই, তার বদলে বসবে টারবাইন—এমনি জল্পনা শোনা গিয়েছিলো বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে। জলের বাধাকেই কাজে লাগিয়ে জাহাজকে প্রচণ্ড গতিতে ঠেলে নিয়ে যাবার ক্ষমতা থাকবে এই টারবাইনের—এই কথাই তো শোনা যাচ্ছিলো ইদানীং! তাহ'লে কি তাই-ই?

আর তো মাত্রই কয়েক ঘণ্টা! তারপরেই জানতে পারবো এই দুর্ধর্ষ গতির মূল রহস্যটা কী।

আরো তাজ্জব! জাহাজ ছুটছে, অথচ কোনো ধাক্কা নেই, দুলুনি নেই। পামলিকো সাউণ্ড এমন শান্ত ও নিস্তরঙ্গ হ'লো কবে থেকে? এখানে ঢেউ তো কম নয়, তাছাড়া জোয়ার-ভাঁটার জন্যেও জল সব সময়েই অশান্ত ও চঞ্চল!

চিন্তা-ভাবনায় মাথার মধ্যেটায় ভারি লাগছে। ক্লান্তও লাগছে এখন। এদিকে আবার ঘুম পাচ্ছে। কিছুই তো করার নেই। ঘরের মধ্যেটায় দম বন্ধ হ'য়ে আসতে চাচ্ছে। না, ঘুমুলে চলবে না আমার। এভাবেই ব'সে থাকবো দিনরাত্তির। যদিও আলো নেই ব'লে কি-বা দিন কি-বা রাত্তির—দুইই আমার কাছে সমান।

দেয়ালে হেলান দিয়ে ব'সে রইলুম। ঘরে বসবার কোনো বালাই নেই। ঢুলুনি এলেই উঠে খাড়া হ'য়ে বসি। আর এক অকথ্য রাগে সর্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়। লোহার দেয়ালে ঘুষিই কষিয়ে দিলুম কয়েকবার। গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচালুম। কিন্তু

banglabooks.in

মিথ্যেই সব চেষ্টা। নিরেট লোহায় ঘুষি মেরে আঙুলের গাঁটে ব্যথাই হ'লো কেবল, চ্যাঁচানি শুনেও কেউ সাড়া দিলে না। নাঃ, কী করছি আমি ছেলে-মানুষের মতো! হাস্যকর আর অনর্থক যত কাণ্ড! ও-রকম চ্যাঁচামেচি আর ঘুষো-ঘুষি ক'রে লাভটা কী? এমনও তো হ'তে পারে নয়জে নদী বেয়েই চলেছি এখন! না, তা কেন হবে! এই দুষ্কর্মের ধাড়িগুলো যত তাড়াতাড়ি পারবে মারকিন যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে অতলান্তিক মহাসাগরে পাড়ি জমাবারই চেষ্টা করবে: নাঃ, আসলে রয়েছি পামলিকো সাউণ্ডেরই জলে! কিন্তু তাজ্জব রকম শান্ত তো পামলিকো সাউণ্ডের জল—এ-রকমটি তো কস্মিনকালেও দেখা যায়নি!

আরে! ঐ কার পায়ের শব্দ! হ্যাঁ, পায়ের শব্দই তো—ভুল হয়নি। শব্দ এসে থামলো লোহার দেয়ালের ওপাশে। কাদের যেন চাপা গলা শোনা যাচ্ছে। কিন্তু দুর্বোধ্য হিজিবিজবিজ ভাষা—কোনো অর্থ ধরতে পারলুম না। কারা যেন লোহার দেয়ালের ওপাশে কোনো অজানা ভাষায় ফিশফিশ ক'রে কথা বলছে।

চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললুম। লোহার দেয়ালে ঘুষি মারতে-মারতে হাত দুটোই অবশ আর অসাড় হ'য়ে এলো। কিন্তু কেউ কোনো সাড়া দিলে না। বরং এই-তো আবার আগের মতো ভারি ও চাপা স্তব্ধতা নেমে এসেছে।

তাহ'লে এভাবেই ব'সে থাকতে হবে আমাকে—কতক্ষণ কে জানে! মাথার মধ্যেটা অমনি তাজ্মিম মাজ্মিম ক'রে উঠলো।

কতক্ষণ কেটেছে হিশেব করি তো! জাহাজটা যখন প্রথম নড়েছে, তারপর থেকে এতক্ষণে অন্তত চারঘণ্টা সময় কেটে গেছে। ঘড়ি দেখে কটা বাজে বোঝবার জো নেই—আমার ঘড়ির ডায়াল অন্ধকারে জ্বলে না। আচ্ছা, চার-পাঁচ ঘণ্টা ধ'রেই যদি এক নাগাড়ে যাওয়া যায়, তাহ'লে তো এতক্ষণে পামলিকো সাউণ্ড পেরিয়ে গেছি! অর্থাৎ তাহ'লে প্রবল মহাসমুদ্রে এসে পড়ার কথা। কিন্তু কোথায় সেই সমুদ্রের উত্তাল উদ্বেল ঢেউয়ের তোড়—সেই ভীষণ আন্দোলন, ঝাঁকুনি, নাচুনি? তাজ্জব ব্যাপার! পুরোটাই কি তবে আমার বিভ্রম! তাহ'লে কি আমি চলন্ত জাহাজের খোলে বন্দী নই?

হালকা যে-কাঁপুনি ছিলো, ঘণ্টাখানেক পরে তাও হঠাৎ বন্ধ হ'য়ে গেলো। তবে কি পামলিকো সাউণ্ডেরই কাছে কোনো বন্দরে গিয়ে ভিড়েছে জাহাজ? তা-ই যদি হয় তাহ'লে এমন ধুন্ধুমার কাণ্ড ক'রে হেল্‌থফুল হাউস থেকে তমাস রশকে অপহরণ করারই বা দরকার হ'লো কেন?

আর জাহাজ যদি নোঙরই ফ্যালে, তাহ'লে লোহার ঘড়ঘড়ানি তো শোনা

banglabooks.in

যাবে ! নোঙরে টান পড়লে ঝাঁকুনিও তো লাগবে একটা !

উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলুম—যদি শব্দ শুনি, যদি ঝাঁকুনি টের পাই !

কিন্তু মিথ্যেই এই প্রতীক্ষা। শব্দও নেই, ঝাঁকুনিও নেই। তাহ'লে—হঠাৎ এ-কথা ভেবেই আমার গায়ের লোম খাড়া হ'য়ে উঠলো।—তাহ'লে কি এই ভৌতিক জলযানে আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো যাত্রী নেই ?

কেমন যেন ঝিমঝিম করছে মাথা, কেমন যেন আচ্ছন্ন লাগছে। ঘুমে দু-চোখের পাতা ভারি হ'য়ে এসেছে। ফুশফুশের উপর চাপা আর ভারি একটা-কিছু যেন চাপিয়ে দিয়েছে কেউ। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

চেষ্টা ক'রেও সজাগ থাকতে পারছি না। বুঝতে পারছি চেতনা লোপ পাচ্ছে। নিদ্রা, না মূর্ছা ?

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম, জানি না। এখন দিন, না রাত—তাও জানা নেই। কিন্তু এখন তো আর নিশ্বাসের কষ্ট নেই, ফুশফুশের উপর কোনো চাপা ভারও নেই আর। তবে কি যখন ঘুমিয়েছিলুম, তখন এ-ঘর কেউ খুলেছিলো ? কেউ এসেছিলো নাকি ? হয়তো তখনই এই ঘরে টাটকা বাতাস ঢুকেছিলো. তাই আর আগের মতো কষ্ট হচ্ছে না।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই কেউ এ-ঘরে ঢুকেছিলো। অন্ধকারেই হাতে ঠেকলো প্রমাণ। একটা পাত্র—তরল পদার্থে ভরা। লোভনীয় গন্ধ এলো নাকে। তক্ষুনি পাত্রটা গলায় উপুড় ক'রে দিতুম—যদি পাত্রভরা দুর্গন্ধ জলও থাকতো, তাহ'লেও তখন আমি দ্বিধা করতুম না। আর এ তো বিয়ার। ঢকঢক ক'রে পুরো পাত্তরটা নিঃশেষ ক'রে ফেললুম।

যাক, তৃষ্ণা মিটলো এতক্ষণে। এবার খিদে মিটবে তো ?

এরা যখন বিয়ারের পাত্র রেখে গেছে, তখন খাবারও নিশ্চয়ই দেবে। অন্ধকারেই হাৎড়ে দেখলুম আবার। এককোণে একটা ঝুড়ির মধ্যে পাওয়া গেলো একটুকরো রুটি আর ঠাণ্ডা শুকনো মাংস। দারুণ খিদের মধ্যে তাকেই ঠেকলো মস্ত ভোজসভার মুখরোচক খাবার ব'লে।

যাক, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া গেলো। এই রহস্যময় জলযানে আমি তাহ'লে একা নই। এরা আমাকে অনাহারেও মারতে চায় না। তাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, এ-ঘরে ঢুকে এরা খাদ্য আর পানীয় রেখে গেছে।

কিন্তু কতদিন চলবে এই বন্দীত্ব ? কত দিন ? কত মাস ?

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম, জানি না। কটা বাজে এখন ? অন্ধকারের মধ্যেই ঘড়ির

banglabooks.in

কাঁটায় হাত বুলিয়ে আন্দাজ করার চেষ্টা করলুম। আটটা বাজে! তার মানে, নিশ্চয় সকাল আটটা!

জাহাজটা এখন আর চলছে না। এই লোহার দেহে তাই মৃদুতম কম্পনও আর নেই।

কতক্ষণ যে কেটে গেলো, কত ঘণ্টা! জানি না, এরা আবার রাত্তিরে আসবে কি না। বন্ধ ঘরের দূষিত বাতাস দূর ক'রে তাজা বাতাস ঢুকবে কি না আবার কে জানে! যখনই আসুক—এবার আমি ছাড়বো না। ঘুমের ভান ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে চিৎপাত প'ড়ে থাকবো। তারপর দেখা যাবে কথার জবাব না-দিয়ে বাছাধনেরা যায় কোথায়! ঘুমকে এবার যে-ক'রেই হোক ঠেকাতেই হবে!

ডেকের উপর

খোলা হাওয়ায় আছি এখন, ফুশফুশ ভ'রে টেনে নিচ্ছি টাটকা ও সতেজ বাতাস, অন্তত সেই দমবন্ধ-করা বাক্সটায় আর বন্দী হ'য়ে নেই—বরং আমাকে নিয়ে আসা হয়েছে ডেকের উপর। উদগ্রীবভাবে তাকিয়ে দেখছি দিগন্ত, কিন্তু ডাঙার চিহ্ন নেই কোথাও। যেখানে আকাশ আর সমুদ্র এসে মিশেছে, সেখানে কেবল একটা বর্তুল রেখা।

না, পশ্চিমে কোথাও ডাঙার চিহ্ন নেই। অথচ হাজার-হাজার মাইল ধ'রে সেখানে উত্তর আমেরিকার জমি থাকার কথা ছিলো!

সূর্য ডুবে যাচ্ছে, সমুদ্রের জলে ঝিকিয়ে উঠছে লালচে বাঁকা রশ্মিগুলো। ছটা বাজে বোধহয়। হাতঘড়ি দেখে জেনে নিলুম। হ্যাঁ, সাড়ে-ছটা বাজে।

সেদিন, সেই ১৬ই জুন, রাত্রে যা ঘটেছিলো, তা এই রকম :

প্ল্যান অনুযায়ী ব'সেছিলুম ঘাপটি মেরে। জোর ক'রে ঘুম তাড়াচ্ছিলুম চোখ থেকে আর অপেক্ষা করছিলুম কখন ঘরে লোক ঢোকে। সারা দিন গেলো, কারু পাত্তা নেই। খিদেয় জঠর মোচড়াচ্ছে। ভাগ্যিশ খানিকটা বিয়ার ছিলো, তাই তৃষ্ণা অতটা ছিলো না।

banglabooks.in

সেই যখন ঘুম ভেঙেছিলো, তারপর একটা মৃদু কম্পন থেকে টের পেয়েছিলুম যে সারা রাত থেমে থাকার পর আবার জলযান চলতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

ছটা নাগাদ সেই লোহার খুপরির ওপাশে পায়ের শব্দ হ'লো। কেউ আসছে নাকি? তালা খোলবার ঝনৎকার শুনলুম পরক্ষণে। খুলে গেলো দরজার পাল্লা। লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকার দূর হ'তেই দেখতে পেলুম দুটি ষণ্ডামার্কা লোক দাঁড়িয়ে। কিন্তু ভালো ক'রে তাদের মুখ দেখবার আগেই তারা আমাকে চেপে ধ'রে একটা কাপড়ে মাথা ঢেকে দিলে—আর কিছুই দেখতে পেলুম না।

সহজে ছেড়ে দিইনি তবু, ধস্তাধস্তি চালিয়েছিলুম। কিন্তু ষণ্ডা দুটোর গায়ে অমানুষিক জোর, কঠিন হাতে আমাকে তারা টেনে নিয়ে চললো। তখন আমি কথা পাড়লুম। কিন্তু কোনো উত্তর পেলুম না। বরং তারা দুটিতে নিজেদের মধ্যে এমন একটা দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলতে লাগলো যার বিন্দুবিসর্গও আমার মাথায় ঢুকলো না।

এবার অবিশ্যি আমায় তারা একটু দয়াই করেছিলো—হাত-পা-মুখ বাঁধবার দরকার বোধ করেনি।

একটা সরু গলির মধ্যে দিয়ে তারা আমায় টানতে-টানতে নিয়ে এসেছিলো। পায়ের তলায় অনুভব করেছিলুম ধাতুর সিঁড়ি উঠে গেছে। পরক্ষণেই মুখে সতেজ হাওয়ার ঝাপটা এসে লেগেছিলো। চোখ ঢাকা, কিন্তু, তবু বুক ভ'রে সেই টাটকা বাতাস টেনে নিয়েছিলুম।

তারপর তারা হিঁচড়ে আমাকে তুলেছিলো উপরে। না, ধাতুর মেঝে তো নয়। চোখ ঢাকা, কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু তবু বুঝতে পেরেছিলুম মেঝেটা আসলে কোনো জাহাজের ডেক।

ষণ্ডা দুটো আমাকে ছেড়ে দিতেই এক ঝটকায় মাথার ঢাকনিটা খসিয়ে দিয়েছিলুম।

আর আবিষ্কার করেছিলুম, একটা স্কুনারের ডেকে দাঁড়িয়ে আছি। তরতর ক'রে সাবলীল ভঙ্গিতে ছুটে যাচ্ছে স্কুনার—পিছনে ফেনিল জলের মধ্যে শাদা রেখা আঁকা হ'য়ে যাচ্ছে।

অতক্ষণ অন্ধকারে ছিলুম—প্রথমটায় দিনের আলোয় চোখ যেন একেবারে ধাঁধিয়ে গেলো। প'ড়েই যেতুম অন্ধের মতো, যদি-না তাড়াতাড়ি একটা মাস্তুল ধ'রে নিজেকে সামলে নিতুম।

জাহাজের ডেকে গোটা বারো লোক শশব্যস্তভাবে কাজ করছিলো। অদ্ভুত

banglabooks.in

চেহারা লোকগুলোর—কোন দেশের লোক বুঝতেই পারিনি। আমার দিকে তারা ফিরেও তাকায়নি, যে-যার কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিলো।

স্কুনারটা বেশ মজবুত, আড়াইশো টনের বোধহয়। মাস্তুল আর পালের বিস্তার দেখে বোঝা যাচ্ছিলো বেশ জোরেই যেতে পারে। গড়ন দেখে মনে হয় প্রতিযোগিতাতেও নামতে পারে। কী নাম স্কুনারটার?

গলুইয়ের কাছে জাহাজের হালে দাঁড়িয়ে একজন চাকা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সাগর-দোলা কমিয়ে আনতে চাচ্ছিলো। গলুইয়ের কাছে নিশ্চয়ই কোনো ফলকে জাহাজের নাম লেখা আছে। কী নাম, জানবো ব'লে এগিয়ে গেলুম। একজন মাল্লাকে জিগেশ করলুম কী নাম জাহাজের। সে কোনো জবাব না-দিয়ে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে রইলো। কী? আমার কথা কি বুঝতে পারছে না? জিগেশ করলুম, 'কাপ্তেন? কাপ্তেন কোথায়?'

মাল্লাটি এবারও কোনো জবাব দিলে না।

ধুত্তোর! আমি এগিয়েই গেলুম। চাকার গায়ে একটা ঘণ্টা ঝোলানো; হয়তো ঘণ্টার গায়ে জাহাজের নাম লেখা আছে! কিন্তু হা হতোস্মি! সেখানেও সব ভোঁ-ভাঁ—কিছু লেখা নেই। হালের লোকটাকে জিগেশ করলুম। কেমন একটা অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে লোকটা শুধু কাঁধ ঝাঁকালে—কোনো জবাব দিলে না।

ভারি মুশকিলে পড়লুম তো! এ আবার কোন ভুতুড়ে জাহাজ! তমাস রশ কোথায়? তাঁকে কি এ-জাহাজে আনা হয়নি? নিশ্চয়ই তিনিও আছেন এই জাহাজে। না-হ'লে মিছেমিছি তাঁর রক্ষককে গুম ক'রে এনে কার কোন পরমার্থ সিদ্ধ হবে? হয়তো এখনো তিনি কোনো কামরায় বন্দী হয়ে আছেন।

আরে! তাজ্জব ব্যাপার! এটা তো এতক্ষণ লক্ষই করিনি! পালগুলো মাস্তুলে জড়ানো, তেমন হাওয়াও নেই, তবু কেমন স্বচ্ছন্দে বেশ জোরেই জাহাজটা জলের উপর দিয়ে পিছলে ছুটে চলেছে! গলুইটা একটু ঝুঁকে পড়েছে—দু-পাশে ফেনিল শাদা জল ছলাৎ-ছলাৎ ক'রে উঠছে। তাহ'লে কি এটা বাষ্পে চলে? কই, তাহ'লে কোথায় ধোঁয়া বেরুবার নল, কোনখানে তার চিমনি? তবে কি বিদ্যুৎকে কাজে লাগিয়েছে? হয়তো কোথাও কতগুলো জোরালো তড়িৎ-কোষ বা ব্যাটারি রয়েছে—না-হ'লে এত জোরে জাহাজ যাবে কী ক'রে?

ছুটে গিয়ে রেলিঙে ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালুম। চোখে দেখেই সন্দেহভঞ্জন করা যাক। চাকার লোকটা ঠাট্টার ভঙ্গিতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমার কাণ্ড দেখছে। আমি ঝুঁকে প'ড়ে তাকালুম।

banglabooks.in

কিন্তু কিছুই দেখতে পেলুম না। নেই কোনো প্রপেলারের তীব্র ঘুরুনি, অথচ পিছনে অনেকদূর পর্যন্ত জলের উপর ফেনিল শাদা রেখা ছড়িয়ে পড়েছে—যেমন দেখা যায় পুরোদমে ছুটন্ত পালতোলা জাহাজের পিছনে : তাহ'লে ? কোথেকে আসছে এই প্রচণ্ড শক্তি ? বাতাস স্থির, সমুদ্র তরঙ্গহীন। অথচ স্কুনার তবু তীব্রবেগে ছুটে যাচ্ছে। হালের লোকটাও কিন্তু সমুদ্রের দিকে তাকাচ্ছে না—জাহাজের সামনের দিকে কারা যেন দাঁড়িয়ে আছে—এদেরই নির্দেশমতো সে চাকা ঘোরাচ্ছে ! এ কী রহস্য ?

যেমন ভাবেই হোক এই হেঁয়ালির জট আমাকে খুলতেই হবে। এবার সামনে এগুতেই একজনের সঙ্গে দেখা হ'লো, ছোটো একটা বুরুজের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে আমাকে লক্ষ করছিলো। দেখবামাত্র চিনতে পারলুম। কাউণ্ট দার্তিগাসের সঙ্গে এই লোকটাই তো হেল্‌থফুল হাউস দেখতে এসেছিলো।

তাহ'লে এই বিদেশী ধনকুবেরেরই কর্ম এটা ? কাউণ্ট দার্তিগাসই তবে তমাস রশকে অপহরণ ক'রে এনেছেন ? আর এই হ'লো তাঁর নামজাদা স্কুনারটি : 'এব্বা' !

এই লোকটাই বোধহয় জাহাজের কাপ্তেন। দেখে তাই মনে হয়। জিগেশ করলুম, 'চিনতে পারছেন কাপ্তেন। হেল্‌থফুল হাউসে আমাদের দেখা হয়েছিলো।'

কোনো জবাব না-দিয়ে একদৃষ্টে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

'আমার নাম গেডন। তমাস রশের দেখাশুনো করি। কেন আমাকে এভাবে ধ'রে এনেছেন, জানতে পারি ?'

আমার দিকে দৃক্‌পাত না-ক'রে কাপ্তেন ক-জন মাল্লাকে কী যেন ইশারা করলে। অমনি আমাকে তারা ডেক থেকে নিচে নামিয়ে নিয়ে গেলো, সরু গলির মধ্যে দিয়ে একটা কামরার মধ্যে এনে ঢুকিয়ে দিলো।

একটা মাত্র ঘুলঘুলি সেই কামরায়। আশবাব বলতে আছে একটা ঝোলানো খাট, ড্রেসিং টেবিল, টেবিল, আরামচেয়ার, আর কাবার্ড : সব খুব ঝকঝকে চকচকে। টেবিলে খাবার সাজানো। তক্ষুনি ব'সে পড়লুম। বাকি খাবার যে নিয়ে এলো, তার সঙ্গে কথা বলবার একটা নিরুত্তর ও ব্যর্থ চেষ্টা করলুম—লোকটা অবশ্য নিগ্রো, আমার ভাষা না-ও জানতে পারে।

খাবারদাবার দিয়ে সে দরজা বন্ধ ক'রে চ'লে গেলো। খেতে-খেতে আমি নানা কথা ভাবতে লাগলুম। কে এই কাউণ্ট দার্তিগাস ? কোথাকার লোক তিনি ? নামটা এস্পানিওল, কিন্তু ধরনধারণ এশিয়ার লোকদের মতো ! তমাস

banglabooks.in

রশকে চুরি ক'রে নিয়ে তাঁর লাভটা কী? রশ ফুলগুরেটরের রহস্য জানাই কি তাঁর মৎলব? নিশ্চয়ই তাই। এবং সেই জন্যেই আমাকে আরো সাবধান থাকতে হবে। কোনোরকমে একবার যদি আমার সত্যি পরিচয় বেরিয়ে পড়ে, তাহ'লে আর কিছুতেই পালানো যাবে না।

ওই ঘরেই বন্ধ হ'য়ে রইলুম সারা দিন। 'এব্বা' নিঃশব্দে কিন্তু অবিরাম দ্রুত-বেগে সারা দিন ছুটে গেছে। কিছুতেই বুঝতে পারলুম না কোথেকে এই শক্তি সংগ্রহ করছে জাহাজ।

কতরকম ভাবনাই যে খেলছিলো মাথায়। শেষকালে কখন যে সন্ধে নাগাদ ঘুমিয়ে পড়লুম, উঠলুম একেবারে সেই ভোরে। কী খেয়াল হ'লো, দরজায় গিয়ে ধাক্কা দিলুম। আরে! খোলাই তো ছিলো দেখি। হুম ক'রে পাল্লাটা খুলে গেলো। তক্ষুনি বাইরে বেরিয়ে এলুম। লোহার সিঁড়ি বেয়ে তিন লম্ফে তারপরে সোজা গিয়ে ডেকে।

মাল্লারা তখন ডেক ধুচ্ছে। গলুইয়ের কাছে দুজন হোমরা-চোমরা লোক দাঁড়িয়ে: তাদের একজন কাপ্তেন, অন্যজন অচেনা। বছর পঞ্চাশ বয়স। চুলে-দাড়িতে রুপোলি ছোপ, কিন্তু সব চুল বা সব দাড়ি পেকে যায়নি। ধূর্ত মুখ, ঠোঁটের কোণায় শ্লেষের ছাপ, দৃষ্টি চঞ্চল ও তীক্ষ্ণ, মুখে বুদ্ধির দীপ্তি। চেহারা দেখেই বোঝা গেলো লোকটি গ্রীক। কাপ্তেন যখন তাকে সেরকো ব'লে ডাক দিলে তখুনি বুঝতে পারলুম যে আমার অনুমান মিথ্যে নয়। সেরকো জাহাজের এনজিনিয়ার, আর স্পেড জাহাজের কাপ্তেন। স্পেড নামটা এসেছে নিশ্চয়ই ইতালিয়ান স্পাদা থেকে। তাহ'লে এই জাহাজে রয়েছে গ্রীক রয়েছে ইতালিয়ান, মাল্লারা জোগাড় হয়েছে জগতের নানা দিক থেকে—আর জাহাজের নাম নরোয়ে দেশের, 'এব্বা'। বড্ড গোলমেলে ব্যাপার, সন্দেহ নেই। আর আছেন কাউণ্ট দার্তিগাস, তাঁর নাম এস্পানিওল অথচ এশিয়ার লোকের মতো চালচলন—কোথাকার লোক তিনি?

কাপ্তেন আর এনজিনিয়ার দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিচু গলায় কথা বলছিলেন।

ডেকহাউসের কাছেই ওখানে ছিলেন তমাস রশ। বিপুল নির্জন সমুদ্রের দিকে তাকিয়েছিলেন, দিগন্তে ডাঙ্গার কোনো চিহ্নই নেই। রশের পাশেই দুটি মাল্লা দাঁড়িয়ে আছে, মুহূর্তের জন্যও রশকে তারা চোখের আড়াল করছে না, যে-কোনো অবস্থার জন্যে তারা তৈরি। খ্যাপা মানুষ, যদি জলেই ঝাঁপিয়ে পড়েন, তাহ'লে?

banglabooks.in

জানি না আমার প্রাক্তন রোগীর কাছে আমাকে যেতে দেয়া হবে কি না। তাঁর দিকে এগিয়ে যেতেই স্পেড আর সেরকো আমার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে রইলো, কিন্তু আমাকে কোনো বাধা দিলে না। তমাস রশ আমাকে আসতে ছাখেননি; আমি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালুম। রশ আমাকে চিনতে পেরেছেন ব'লে মনে হ'লো না। আগের মতোই একভাবে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলেন দিগন্তের দিকে। মুখ দেখে মনে হ'লো ওজোন-মাখা এই সতেজ হাওয়া তাঁর ভালোই লাগছে। ঝকঝকে রোদ-জ্বলা দিন, আকাশ সোনালি-নীল। কী ভাবছেন তমাস রশ? পারিপার্শ্বিকের বদল সম্বন্ধে তিনি কি সজাগ? তাহ'লে কি তাঁর স্মৃতি থেকে হেল্‌থফুল হাউস ও তাঁর রক্ষক গেডনের কথা একেবারে মুছে গেছে? অসম্ভব নয়। হয়তো অতীতকে একেবারে ভুলে গিয়ে এই আলো-হাওয়াভরা ঝকঝকে বর্তমান নিয়েই তিনি তন্ময় হ'য়ে আছেন।

'তমাস রশ··· ?' আমি ডাক দিলুম।

যেন রশের চেতনা ফিরে এলো। একবার অনিমেষ লোচনে আমাকে দেখলেন তিনি, পরক্ষণেই চোখ ফিরিয়ে নিলেন। চিনতে পেরেছেন কি আমাকে? ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধ'রে মোলায়েমভাবে চাপ দিলুম। আমার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে রশ এগিয়ে গেলেন গলুইয়ের দিকে—সেরকো আর স্পেড যেখানে দাঁড়িয়ে আছে।

তাহ'লে কি রশ ওদের সঙ্গে কথা বলতে চাচ্ছেন? কিন্তু চৈতন্যের আচম্বিত ঝিলিক লেগে তাঁর চোখ দুটি তখন ঝিকিয়ে উঠেছে। জলজলে চোখে তিনি তাকালেন গোটানো পালের দিকে। তক্ষুনি বুঝতে পারলুম যে স্কুনারের রহস্যময় গতি তাঁকেও বিস্মিত করেছে। মাস্তুলের ডগা থেকে তলা পর্যন্ত রশ একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন: পালগুলো উপরে গোটানো। তারপরেই তাকালেন জাহাজের পাশের দিকে: রাজহাঁসের মতো জল কেটে মসৃণভাবে স্কুনার এগিয়ে যাচ্ছে। দেখেই রশ পিছিয়ে এলেন। বাষ্পেচলা জাহাজ হ'লে চিমনি যেখানে থাকতো, ছুটে গেলেন সেখানে: বাষ্পেচলা জাহাজ হ'লে সেখানে কুণ্ডলিত ধোঁয়া উঠতো। কাল সারাদিন যা নিয়ে ভেবে কোনো সমাধান পাইনি, বুঝলুম রশের মগজেও সেই হেঁয়ালি জট পাকাচ্ছে। রশ ততক্ষণে ছুটে গেছেন গলুয়ের কাছে—প্রপেলার আছে কিনা দেখতে।

কতগুলো শুশুক ভুউশ ক'রে ভেসে উঠছিলো, ডিগবাজি খাচ্ছিলো, স্কুনারের সঙ্গে ছুটছিলো। রশ তাদের দিকে দৃকপাতও করলেন না, বুকুজের উপর ঝুঁকে

banglabooks.in

পড়লেন। এমনিভাবে ঝুঁকে পড়লেন যে সেরকো আর স্পেড ভয় পেয়ে ছুটে গিয়ে দু-দিক থেকে তাঁকে চেপে ধরলো। আমিও ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম : খ্যাপা মানুষ, স্কুনারের গতি-রহস্য ভেদ করার জন্য এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়েন জলে।

রশ ক্রমেই তেতে উঠছেন। উত্তেজনায় চোখ দুটো তীব্রভাবে জ্বলন্ত। লক্ষণটা আমার খুবই চেনা। আবার একটা উন্মাদনার মুহূর্ত আসন্ন। এক্ষুনি সাবধান না-হ'লে পরে তাঁকে সামলানো মুশকিল হবে। রশ তখন হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে বড়ো মাস্তুলটির কাছে চ'লে এসেছেন। মিথ্যেমিথ্যি আবার তিনি পালটাকে খুঁজলেন উপর-নিচে তাকিয়ে। যখন পালটাকে দেখতে পেলেন না, সজোরে আঁকড়ে ধরলেন মাস্তুলটা, প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকুনি দিতে লাগলেন সেটাকে, যেন মাস্তুলের ডাণ্ডাটা পেড়েই ফেলবেন ডেকে। তারপর হঠাৎ সেটাকে ছেড়ে সামনের মাস্তুলটাকে নিয়ে পড়লেন। আর ক্রমেই তাঁর উত্তেজনা বেড়ে চললো। জড়ানো গলায় চ্যাঁচাচ্ছেন, কী-যে বলছেন কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।

হঠাৎ মাস্তুল বাঁধবার মোটা দড়িটা আঁকড়ে তিনি ঝুলে পড়লেন। এবার যদি দড়িটা বেয়ে উঠবার চেষ্টা করেন! কী সর্বনাশ! এক্ষুনি না-আটকালে একবার হাত ফসকে নিচে পড়লেই, বাস্!—সর্বনাশ!

কাপ্তেন ইঙ্গিতে তক্ষুনি দুটি মাল্লা তাঁর দিকে ছুটে গেলো। নিচে থেকে তারা রশকে জড়িয়ে ধরলো, তারপরেই শুরু হয়ে গেলো টানা-হ্যাঁচড়া পাছড়াপাছড়ি। রশও দড়িটা ছাড়বেন না মাল্লারাও তাঁকে ছাড়বে না। আগেও দেখেছি যখনি রশ খেপে ওঠেন, তখনি তাঁর দেহে মত্ত হাতির বল আসে। একা এঁটে উঠতে পারতুম না ব'লে সে-সব ক্ষেত্রে আমাকে আরো লোক ডাকতে হ'তো। এখন অবশ্য তার কোনো দরকার হ'লো না। মাল্লা দুটিও দশাসই, মত্ত তাগড়াই। ধস্তাধস্তি সত্ত্বেও তারা অনায়াসেই তমাস রশকে নিচে নামিয়ে আনলে।

এক্ষুনি রশকে তাঁর কামরায় নিয়ে যেতে হবে। ঘুম পাড়াতে হবে তাঁকে—ঘুমিয়ে না-পড়লেই ক্রমেই উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে—খ্যাপামির একেবারে শেষ সীমায় গিয়ে পৌঁছুবেন।

কী করবো ভাবছি, হঠাৎ এমন সময় কার রাশভারি গম্ভীর গলা কানে এলো।

ফিরে দাঁড়িয়েই চিনতে পারলুম তাঁকে : কাউণ্ট দার্তিগাস। ছায়া ভরা মুখ, বিষাদমগ্ন ; হাবভাব রাজকীয়—ঠিক যেমন দেখেছিলুম হেল্‌থফুল হাউসে।

তক্ষুনি তাঁর কাছে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলুম আমি জোর গলায় : 'জানতে চাই

banglabooks.in

কোন অধিকারে—'

'শক্তিমানের অধিকারে,' উত্তর দিলেন কাউণ্ট। ব'লেই আমার দিকে দৃক্‌পাত না-ক'রে গলুইয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। আর মাল্লারা তমাস রশকে ধরাধরি ক'রে তাঁর কামরায় নিয়ে গেলো।

৭

নাগরদোলা সাগরদোলা

আমিই যে এনজিনিয়ার সিমোন আর্‌ৎ হয়তো—যদি বলা দরকার হ'য়ে পড়ে সেটা বলতে হবে কাউণ্ট দার্তিগাসকে, কে জানে সামান্য রক্ষক গেডনের চেয়ে এই তথ্যটা বেরিয়ে গেলে বেশি খাতির পাবো না! কিন্তু বিষয়টা আরো ভেবে দেখতে হবে। তমাস রশকে এরা চুরি ক'রে এনেছে কেন? রশ-ফুলগুরেটরের সূত্রটা জানতে চায় ব'লেই নিশ্চয়ই? জগতের কোনো রাষ্ট্র এই সূত্র জানবার জন্যে যে-দাম দিতে পারেনি, এই কাউণ্ট কি পারবেন সেই দাম দিতে? তমাস রশ যদি গুপ্ত রহস্য ফাঁস ক'রে দেন? তাঁর পাশেই থাকা উচিত আমার। কখন কী জরুরি কথা ব'লে বসবেন। হেল্‌থফুল হাউসে অ্যাদ্দিনেও যে-কথা জানতে পারিনি, হয়তো এবার তা জানা যাবে।

কিন্তু গোড়ায় যেটা জানতে হবে সেটা এই: স্কুনার 'এব্বা' যাচ্ছে কোথায়?

আর, দ্বিতীয়, কে এই কাউণ্ট দার্তিগাস? ভারি রহস্যময় মানুষ, পুরো ব্যক্তিত্বটাই হেঁয়ালিতে ভরা। অনর্গল ইংরেজি বলেন, কিন্তু এমন এক ঝোঁক আছে উচ্চারণে যাতে বোঝা যায় তিনি এশিয়ার মানুষ—সাধারণত মালয়ের লোকেদের উচ্চারণেই এই ঝোঁকটা থাকে। কালো রঙের মানুষ, তামার উপর যেন জলপাইয়ের পোঁচ বোলানো; কুচকুচে কালো তাঁর চুল; চোখের তারা দুটি নিষ্কম্প, তাকালে মনে হয় শুধু যেন অন্তস্তল দেখে নিচ্ছে; ঢ্যাঙা গড়ন, কাঁধ চাওড়া, মাংসপেশী ডুমোডুমো—সব মিলিয়ে মনে হয় এশিয়ার পূর্ব প্রান্তের মানুষ। কিন্তু নামটা? হয়তো দার্তিগাস তাঁর আসল নাম নয়—নিছকই একটা বেনামিত্ব; এই কাউণ্ট খেতাবও তাই! স্কুনারের নাম নরোয়ের, কিন্তু

banglabooks.in

তিনি যে ভাইকিংদের বংশধর নন, তাতে সন্দেহ নেই। উত্তর ইওরোপীয়দের সঙ্গে তাঁর কোনো মিলই নেই। তাদের মতো হালকা নীল চোখ বা ফুরফুরে সোনালি চুল নয় তাঁর, মুখের গড়নটাও তেমন নয়।

তমাস রশ আর আমাকে যখন তিনি চুরি ক'রে এনেছেন, তখন তাঁর অভিপ্রায় যে খুব-একটা সৎ নয়, তাতে সন্দেহ নেই। এমনও হ'তে পারে যে কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের হ'য়ে এই অপকর্ম করেছেন তিনি। কিন্তু সেই থেকে একটানা আগের মতো রহস্যময় দ্রুতবেগে 'এব্বা' ছুটেই বা যাচ্ছে কোথায়?

জাহাজের সামনের দিকে যেতে গেলেই বারে-বারে বাধা পেয়েছি। পিছনে যেতে পারি, পাশে যেতেও আপত্তি নেই, কিন্তু সামনে কিছুতেই নয়। মাল্লারা বেশ রূঢ়ভাবেই আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। ভাঙাভাঙা ইংরেজিতে কর্কশ-ভাবে ব'লে উঠেছে, 'তফাৎ যাও। কাজের সময় গোল কোরো না!'

কাজ? কাজ যে এরা কী করে, ভগবান জানেন। চর্মচক্ষে অন্তত কোনো কাজ তাদের করতে দেখি না। তবে এরা আমাকে বাধা দেয় কেন? তবে কি তারা বুঝতে পেরেছে যে আমি 'এব্বা'র গতিরহস্য ভেদ করতে চাই? হয়তো তাই। সত্যি, 'এব্বা' কেমন ক'রে এত জোরে ছুটে যাচ্ছে, ভেবে-ভেবেও তার কোনো হদিশ পাচ্ছি না। হাওয়া এলে পাল তুলে দেয়া হয় সত্যি; কিন্তু পালে যত হাওয়া লাগে, 'এব্বা' তার চেয়েও অনেক দ্রুত ছুটে যায়।

দিনের মধ্যে স্বয়ং কাউণ্টকে কয়েকবার ডেকে পদার্পণ করতে দেখলুম। কাপ্তেনের সঙ্গে সেই অজানা দুর্বোধ্য ভাষায় কত-কী বলাবলি করলেন, তার একটা বর্ণও আমার মাথায় ঢুকলো না।

লক্ষ ক'রে দেখেছি, এদের মধ্যে এনজিনিয়ার সেরকো একটু বেশি কথা বলে, অতটা চাপা স্বভাবের নয়। আর কেন যেন মনে হচ্ছে, সেরকো আমার উপর একটু প্রসন্ন। তবে মনের ভাব সে চেপেই রেখেছে।

তমাস রশকে সারা দিনেও আর দেখতে পেলুম না। কালকের সেই প্রবল উন্মাদনার জের নিশ্চয়ই এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

বিকেলের দিকে কাউণ্টের কাছে আমার তলব পড়েছিলো।

কাছে যেতেই জিগেশ করেছিলেন, 'তমাস রশের পাগলামি কতক্ষণ বাড়াবাড়ি অবস্থায় থাকে?'

'তা প্রায় আটচল্লিশ ঘণ্টা।'

'ওষুধ কী?'

banglabooks.in

'ওষুধ কিছু নেই—শুধু ঘুম। একবার ঘুমিয়ে উঠলেই অনেকটা ঠাণ্ডা হ'য়ে যান। তারপর অবিশ্যি অনেকক্ষণ ঝিম ধ'রে চুপচাপ ব'সে থাকেন।'

'গেডন, দরকার হ'লে তুমি আগের মতোই ম'সিয় রশের দেখাশুনো করবে।'

'দেখাশুনো করবো?'

'হ্যাঁ, যতক্ষণ-না ডাঙায় পৌঁছুচ্ছি।'

'কোথায় পৌঁছুবো?

'দেখতেই পাবে। কাল বিকেলেই গিয়ে পৌঁছুবো।' কাউণ্ট কথা বাড়াতে চাননি। কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। জিগেশ করেছিলুম, 'কোথায় যাচ্ছি, তা জানার অধিকার আমার আছে—'

'মোটেই না। আমি নিজে তোমার সঙ্গে কথা না-বললে আমার সঙ্গে কথা বলার অধিকারও তোমার নেই।'

'আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি।'

'জানাতে পারো।' উদ্ধতভাবে কাউণ্ট তারপর চ'লে গিয়েছিলেন।

পিছন থেকে সেরকো বলেছিলো, 'মিস্টার গেডন, আমি হ'লে এ-অবস্থায় চুপ ক'রেই থাকতুম!'

কিন্তু পুরো সাক্ষাৎকারটায় আমার মুখের স্বাদ ম'রে গিয়েছিলো। আমি সেরকোর সঙ্গে আর-কিছু বলিনি। সেও তো ওই কাউণ্টেরই লোক।

চারটে নাগাদ মাইল ছয়েক দূরে একটা মস্ত জাহাজ দেখা গেলো। মারকিন রণতরী। এ-অবস্থায় অন্যান্য জাহাজ সাধারণত তোপ দেগে অভিবাদন জানায়, কিন্তু 'এব্বা' সে-সব নিয়মকানুনের ধার দিয়েও গেলো না। গলুইয়ের কাছে নোঙর ভোলবার ক্যাপস্টান, তার কাছেই রয়েছে ছোট্ট-একটা কল; সম্ভবত এটা দিয়ে সংকেত করা হয়, কারণ অনেকটা টেলিগ্রাফের মতো দেখতে—সারি-সারি বোতাম বসানো। কাপ্তেন স্পেড মারকিন রণতরীটা দেখেই সেখানে গিয়ে একটা বোতামে চাপ দিলে অমনি 'এব্বা'র মুখ ঘুরে গেলো দক্ষিণ-পুবে—আর মাল্লারা পালগুলো নামিয়ে নিলে। যে-বিশেষ ধরনের মোটর 'এব্বা'কে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, এই বোতাম টিপে যে তাকেই নির্দেশ পাঠানো হ'লো, তা বুঝতে আমার বাকি রইলো না। আর তারই ফলে সেই রণতরীকে, টেরচাভাবে পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলো স্কুনার 'এব্বা'—সেই রণতরী তাকে বাধাও দিলে না। কেনই বা বাধা দেবে? 'এব্বা' তো সামান্য একটা প্রমোদতরী ছাড়া আর-কিছু নয়।

banglabooks.in

কিন্তু সন্ধে ছ-টা নাগাদ যখন দূরে আরেকটা জাহাজ দেখা গেলো তখন আর 'এব্বা' তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করলে না। বরং দূরের জাহাজটা বাঁদিকে দেখা গিয়েছিলো ব'লে বোতাম টিপে নির্দেশ পাঠিয়ে 'এব্বা' সরাসরি তার দিকেই মুখ ঘুরিয়ে নিলে, আর এক ঘণ্টার মধ্যেই জাহাজ দুটোর মধ্যে ব্যবধান দাঁড়ালো মাইল তিনেক।

হাওয়া ছিলো না ব'লে সেই ত্রিমাস্তুল সদাগরি জাহাজ তখন পাল গোটা-চ্ছিলো। 'এব্বা'র তো সে-সব বালাই নেই, সে দিব্যি সামনের জাহাজটির দিকে ছুটে চললো।

রাতের অন্ধকার যখন গাঢ় হ'লো তখন দুটি জাহাজের মধ্যে দূরত্ব দাঁড়ালো মাত্র মাইল দেড়েক। আর ঠিক তক্ষুনি কাপ্তেন স্পেড এসে কোনো ভণিতা না-ক'রেই কাটা-কাটা গলায় আমাকে আমার কামরায় চ'লে যেতে হুকুম করলে।

মান্য না-ক'রে উপায় ছিলো না। কী-রকম একটা অলুক্ষুণে ভাব ঘুরপাক খাচ্ছে মনে, কী-রকম একটা অমঙ্গলের বোধ। কামরায় গিয়ে দেখি টেবিলে খাবার সাজানো রয়েছে—কিন্তু ভীষণ অস্বস্তি লাগছিলো ব'লে কিছু না-খেয়েই চুপচাপ শুয়ে পড়লুম।

সেই বিষম অস্বস্তির মধ্যেই ঘণ্টা দুয়েক কেটে গেলো। বাইরে অবিশ্রাম জলের শব্দ হচ্ছে, ঢেউয়ের নিয়মিত একটানা গরজানি—তাছাড়া আর-কোনো সাড়া-শব্দ নেই। 'এব্বা' বোধহয় একেবারেই থেমে পড়েছে এখন। হাতঘড়িতে তাকিয়ে দেখি রাত বাজে দশটা। 'এব্বা' থেমে গেলো কেন? কাপ্তেন স্পেড যখন ডেক থেকে আমাকে কামরায় পাঠিয়ে দিয়েছিলো তখন-তো কাছেপিঠে কোথাও ডাঙার চিহ্নও দেখা যায়নি! তবে? 'এব্বা' এতক্ষণে হয়তো তাহ'লে সদাগরি জাহাজটার দু-চারশো হাতের মধ্যেই এসে গেছে।

আরে! এই তো পালাবার সুযোগ। একবার ডেকে পৌঁছুতে পারলেই তো কেল্লা ফতে!

বিছানা থেকে ধড়মড় ক'রে নেমে পড়লুম। কিন্তু দরজা ঠেলে দেখলুম সেটা বাইরে থেকে বন্ধ।

হতাশ হ'য়ে ফিরে এলুম। বড্ড অবসন্ন লাগছিলো। কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে-ছিলুম তা নিজেই জানি না।

ঘুম ভাঙলো শোরগোলে আর ধুপধাপ আওয়াজে। এ-রকম আওয়াজ তো কক্ষনো 'এব্বা'য় শুনিনি। ঘুলঘুলি দিয়ে তখন কামরার মধ্যে ভোরের আলো

banglabooks.in

আসছে। ঘড়িতে সাড়ে-চার বাজে। 'এব্বা' তখনও এই বারদরিয়ায় থেমে আছে।

ডেকের উপর কারা যেন শশব্যস্তভাবে চলাফেরা করছে, আমার ঘুম ভেঙেছে তারই শব্দে। কারা যেন ভারি-ভারি মোট ব'য়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার কামরার মেঝের তলাতেই জাহাজের খোল—ওরোফে গুদোমঘর। সেখানেও যেন চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে।

জাহাজের পাশেই অদ্ভুত শব্দ জলের উপর। নৌকোর শব্দ নয়-তো? হয়তো মালপত্তর নামাচ্ছে।

কিন্তু এখন-তো ডাঙায় পৌঁছবার কথা নয়। কাউণ্ট দাতিগাস বলেছিলেন গন্তব্যস্থলে পৌঁছুবো বিকেলবেলায়। সারারাত যে স্কুনার চলেনি সেটা আমি ঠিক জানি।

কী-যে সব হেঁয়ালি, বুঝি না!

আরো-একটি ঘণ্টা কেটে গেলো। আমার ছোট্ট কামরায় রোদ এসে পড়েছে ঘুলঘুলি দিয়ে। হঠাৎ শুনি দরজার তালায় চাবির শব্দ। তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে দিলুম দরজায় ধাক্কা—অমনি দরজা খুলে গেলো! সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় ক'রে ডেকে গিয়ে হাজির হলুম। দেখি মাল্লারা জাহাজের খোলে ঢোকবার পাল্লাগুলো সবে বন্ধ করেছে। আর কাপ্তেন স্পেড আর সেরকো দাঁড়িয়ে খবরদারি করছে। ডেকের একপাশে কয়েকটা বাণ্ডিল সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। রাত্তিরে নিশ্চয়ই খোল থেকে বার ক'রে এনেছিলো। তার মানে আমাদের যাত্রা শেষ হ'তে আর বেশি দেরি নেই—তাই ডেকে মালপত্তর সাজানো হচ্ছে। কিন্তু কাউণ্ট দাতিগাস কোথায়? তাঁকে তো আশপাশে দেখতে পাচ্ছি না।

সদাগরি জাহাজটাও পাশে কোথাও নেই। এমন-কী তার মাস্তুলের ডগাটুকুও দিগন্তে দেখা যাচ্ছে না। তবে কী আমি যখন ঘুমিয়েছিলুম, তখনি 'এব্বা' দূরে স'রে এসেছে? সদাগরি জাহাজটি না-হয় হাওয়া না-থাকলে চলতে পারে না, কিন্তু 'এব্বা'র তাতে কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়। কিন্তু স্কুনার ছুটলে তো দুলুনিতে রাত্তিরে আমার ঘুম ভেঙে যেতো। দুলুনি তো অন্তত টের পেতুম একবার।

কাপ্তেন স্পেড ততক্ষণে সেই রহস্যময় বোতামগুলির একটাতে চাপ দিয়েছে, অমনি 'এব্বা' দুলে উঠলো। পাল গোটানো, কিন্তু তবু সে পুবমুখো এগুচ্ছে।

কাউণ্ট দাতিগাস ডেকে দেখা দিলেন ঘণ্টা দু-এক পরে। কাপ্তেন স্পেড আর

banglabooks.in

সেরকো অমনি গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালে। চোখে দুরবিন এঁটে তিনজনেই পুব দিগন্তটা বার-বার নিরীক্ষণ করতে লাগলো।

ডাঙার ঝাপশা কালো রেখা দেখা গেলো বেলা সাড়ে-তিনটেয়। ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো একটা পাহাড়। তার চুড়ো থেকে গলগল ক'রে কুণ্ডলীপাকানো ভারি কালো ধোঁয়া বেরুচ্ছে!

এখানে আগ্নেয়গিরি? তবে কি…তবে কি এটাই সেই…

৮

পেয়ালার উলটো দিক

অতলান্তিকের এদিকটায় বারমুডা ছাড়া আর-কোথায় পৌঁছুতে পারে 'এক্সা'? পামলিকো সাউণ্ড থেকে বেরুবার পর যেদিকটা লক্ষ্য ক'রে স্কুনার এগিয়েছে আর যতটা পথ পেরিয়ে এসেছে, তাতে বারমুডা ছাড়া এ-জায়গাটা আর-কিছুই নয়। পুব-দক্ষিণপুবে একটানা এগিয়েছে স্কুনার, আর অন্তত পাঁচ-ছশো মাইল পেরিয়ে এসেছে।

অথচ তবু কিন্তু স্কুনারের গতি কমলো না। সারেঙের পাশেই সেরকোকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন কাউণ্ট দার্তিগাস, কাপ্তেন স্পেড এগিয়ে গেছেন সামনের দিকে। তাহ'লে কি এই নির্জন দ্বীপটিকে পেরিয়ে আরো-পুবদিকে এগুবো আমরা? তা-তো মনে হয় না। কারণ কাউণ্ট দার্তিগাস যা বলেছিলেন তাতে এটাই তো আমাদের গন্তব্য হওয়ার কথা। মাল্লারা সবাই ডেকে দাঁড়িয়ে, সবাই তৈরি—আর এক্ষরনডাট নোঙর ফেলবার তোড়জোড় করছে।

'যাকগে,' নিজেকে বোঝালুম আমি, 'আর দু-ঘণ্টার মধ্যেই সব জট খুলে যাবে। শিগগিরই আমি বুঝতে পারবো কী ক'রে এত অল্প সময়ে এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছে "এক্সা"।'

কিন্তু ইংরেজ অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জের কোনো-একটায় গিয়ে যে 'এক্সা' ভিড়বে তা কিছুতেই সম্ভবপর মনে হচ্ছে না—অবশ্য কাউণ্ট যদি তমাস রশকে গ্রেট-ব্রিটেনের হ'য়ে চুরি ক'রে আনেন, তাহ'লে অন্য কথা। কিন্তু সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য একটি সম্ভাবনা।

banglabooks.in

একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত ; অদ্ভুত মানুষটি যেভাবে সমানে আমার উপরে খুবই কড়া নজর রাখছেন, সেটা খুবই আশ্চর্য সত্যি, তবে আমি যে সিমোন আর্‌ৎ, এনজিনিয়ার, তা নিশ্চয়ই তিনি জানেন না। এই অ্যাডভেনচার সম্বন্ধে আমি কী জানি, হয়তো তা জানবার জন্যেই তাঁর এত কৌতূহল। তমাস রশের রক্ষী গেডন হয়তো নেহাৎই হেজিপেজি লোক, কিন্তু তাকে নিয়ে কাউণ্ট দার্তিগাস কেন উদ্বেগ বোধ করবেন। তবু সত্যি-বলতে তাঁর সেই অস্বস্তিকর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমাকে বেশ বিস্মিতই করেছিলো। এক্ষুনি আমার মাথায় যে-কথাটা ঝিলিক খেলে গিয়েছে সেটা জানতে পেলে কাউণ্ট দার্তিগাস নিশ্চয়ই আমাকে জলে ছুঁড়ে ফেলতে হুকুম দেবেন। না, আমাকে আরো হুঁশিয়ার হ'তে হবে। সবসময় মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। জটগুলো যে খুলে যাচ্ছে, এটা যেন কিছুতেই টের পেতে না-দিই।

রহস্যের পরদা একটু উঠেছে এতক্ষণে। সামনে আশার একটা ঝাপশা আলো দেখতে পাচ্ছি। বিশেষ ক'রে 'এব্বা' যতই কাছে আসছে, যেভাবে পাহাড়টার অদ্ভুত গড়ন স্বচ্ছ আকাশের গায়ে ফুটে উঠছে, ততই আমি মনে-মনে একটু একটু ক'রে আশ্বস্ত হ'য়ে উঠছি।

সত্যি অদ্ভুত গড়ন পাহাড়টার, ঠিক যেন একটা ওলটানো পেয়ালা! পাঁজা পাঁজা ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কুণ্ডলী পাকিয়ে, পাহাড়টার চুড়ো দিয়ে। চুড়োটা—কিংবা পেয়ালার তলার দিক—সমুদ্রতল থেকে তিনশো ফুটেরও বেশি হবে। খাড়া ঢাল তার, বন্ধ্যা, অনুর্বর ; ঢেউ আছড়াচ্ছে তলায়। পশ্চিম থেকে জাহাজিরা দ্বীপটাকে দেখেই চিনতে পারে। প্রকৃতিঠাকরুনের নিজের হাতে গড়া একটা পাথুরে খিলান রয়েছে সেদিকে, যেটাকে ঠিক একটা পেয়ালার হাতলের মতো দেখায়। সকালের রোদে আর ফেনিল জলের পিচকিরির ছিটেয় তাকে সত্যি একটা ওলটানো পেয়ালার মতোই মনে হয়। আর তাই দূর থেকে দেখেই জাহাজিরা তাকে চিনতে পারে। তারাই এর নাম দিয়েছে 'ব্যাকাপ' বা ওলটানো পেয়ালা।

চিনতে আমারও ভুল হয়নি, কারণ এদিকটা আমার আগে থেকেই চেনা ছিলো। বারমুডা দ্বীপপুঞ্জের বাইরে, ঠিক তার গা ঘেঁষেই, এই ছোট্ট দ্বীপ। কয়েক বছর আগে আমাকে একবার এদিকটায় আসতে হয়েছিলো। না, আমার ভুল হয়নি। এই দ্বীপের পাথুরে জমির উপর দিয়ে নিজের পায়ে আমি হেঁটে গেছি। হ্যাঁ, এটা ব্যাকাপই বটে!

আগে থেকেই সাবধান না-থাকলে নিশ্চয়ই পরিচয়ের অস্ফুট নিনাদ বেরুতো

banglabooks.in

আমার মুখ দিয়ে, আর তাতে কাউণ্ট দার্তিগাসও নিশ্চয়ই আরো অস্বস্তিতে পড়তেন।

বারমুডা দ্বীপপুঞ্জে এসে কেন আমি এই ব্যাকাপে অভিযান চালিয়েছিলুম সেটা এখানে ব'লে রাখি।

বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত উত্তর ক্যারোলাইনার প্রায় দুশো মাইল দূরে ৬৪° মধ্যরেখা আর ৩২° দ্রাঘিমায়। ছোটো-বড়ো প্রায় দুশোটা দ্বীপ মিলে এই দ্বীপ-পুঞ্জ গঠিত। ১৬০৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই বারমুডা দ্বীপপুঞ্জ ইংরেজদের দখলে ছিলো। কেবল যে তার প্রকৃতির সম্পদের জন্যেই ইংরেজরা এখানে ঘাঁটি গেড়েছিলো তা নয়, যুক্তরাষ্ট্রের কাছাকাছি একটা নৌঘাঁটি হিশেবেও তার গুরুত্ব ছিলো যথেষ্ট — আর অন্য-কোনো রাষ্ট্রও এ নিয়ে কোনোখানে কোনো ঝামেলা করেনি। দ্বীপ-পুঞ্জের রাজধানী হ'লো সেণ্ট জর্জ, ওই নামেরই একটা দ্বীপে সেটা অবস্থিত। বারমুডার আবহাওয়া এমনিতে মৃদু হ'লে কী হবে, শীতকালে অতলান্তিকের বিষম সব ঝড় এই দ্বীপগুলোর উপর দিয়ে ব'য়ে যায়, আর তখন এদিকে জাহাজের আনাগোনা ভারি কঠিন হ'য়ে পড়ে। দ্বীপগুলোর একটা বৈশিষ্ট্য হ'লো এই যে এখানে কোনো নদী বা স্রোতস্বিনী নেই, কিন্তু মুষলধারে বৃষ্টি হয় ব'লে এখানকার বাসিন্দারা মস্ত সব কৃত্রিম জলাধার গ'ড়ে জলের অভাব মিটিয়ে নিয়েছে। এই জলাগারগুলো যিনি বানিয়েছেন তাঁর উদ্ভাবনীশক্তি ও কল্পনা সোচ্চারে প্রশংসা-যোগ্য ; তাঁর প্রতিভাকে সম্মান জানাবার উদ্দেশ্যে জলাগারগুলো স্বচক্ষে দেখবার জন্যেই আমি এই দ্বীপপুঞ্জে এসেছিলুম। নিউজারসিতে যে-কম্পানির এনজিনিয়ার ছিলুম তার কর্তাদের কাছ থেকে কয়েক সপ্তাহের ছুটি নিয়ে আমি নিউ-ইয়র্ক থেকে বারমুডার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিলুম।

আমি বারমুডায় থাকতে-থাকতেই কতগুলো অদ্ভুত ভৌগোলিক ঘটনা ঘ'টে-ছিলো, যার ফলে ওখানকার ধীবর বাসিন্দাদের আবালবৃদ্ধবনিতা বিষম ভয় পেয়ে পালাতে শুরু ক'রে দিয়েছিলো। পঞ্চাশ বছর ধ'রে এরা ব্যাকাপের পুব-দিকের উপকূলে বসবাস করেছে, বানিয়েছে কাঠের বাড়ি কি পাথরের দালান। এখানকার জলে সহজেই প্রচুর মাছ মেলে, তাই তারা দিব্যি দিন কাটাচ্ছিলো এখানে। ধীবরদের ফলাও মৎস্যশিল্প এতকাল শান্তিতেই ফেঁপে উঠেছে। জীবন-যাত্রা মোটেই কঠোর ছিলো না। বারমুডা দ্বীপপুঞ্জের সঙ্গেও সহজেই যোগাযোগ করা যেতো। মজবুত সব বড়ো-বড়ো নৌকো ছিলো তাদের—তাতেই মাছ চালান দিতো তারা আর বাইরে থেকে সব জরুরি জিনিশ আমদানি করতো। কেন তাহ'লে সব্বাই একদিন তাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে হুড়মুড় ক'রে পালিয়ে

banglabooks.in

গিয়েছিলো ? কারণ তারা আর সেখানে নিরাপদ বোধ করছিলো না।

মাস দু-এক আগে হঠাৎ-একদিন আচম্বিতে ভীত ও সন্ত্রস্ত ধীবরকুল শুনলে ব্যাকাপের তলা থেকে অদ্ভুত ও ভয়-ধরানো একটা গুমগুম আওয়াজ আসছে, আর পাহাড়ের চুড়ো থেকে বেরিয়ে আসছে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর গনগনে শিখা ; কেউ এতদিন স্বপ্নেও ভাবেনি যে এই ওলটানো পেয়ালার মতো দ্বীপটা আসলে একটা আগ্নেয়গিরি আর পাহাড়ের চুড়োটা তারই জ্বালামুখ। কারণ চুড়োর ঢাল এমন মসৃণ আর খাড়া যে হাজার চেষ্টা ক'রেও তারা কোনোদিন তার উপরে উঠতে পারেনি। কিন্তু ব্যাকাপ যে আসলে একটা সুপ্তোত্থিত আগ্নেয়গিরি এবং ছোট্ট বসতিটির যে আশু সর্বনাশ আসন্ন, এ-বিষয়ে এখন আর কারু কোনো সন্দেহ রইলো না।

দু-মাস ধ'রে ভিতরকার সেই গুমগুম আওয়াজ বেড়েই চললো, দ্বীপের পাথুরে ভিৎটা শুধু মাঝে-মাঝে থরথর ক'রে কেঁপে উঠতে লাগলো—আর বিশেষ ক'রে রাত্তিরে চুড়োর সেই জ্বালামুখ দিয়ে বেরুতে লাগলো তীব্র লকলকে ও লোলুপ আগুনের জিহ্বা, আকাশ আর হাওয়া চাটতে লাগলো আগুনের শিখা, মাঝে-মাঝে এমনকী বিষম সব বিস্ফোরণের শব্দও শোনা যেতে লাগলো। একটা ভয়ংকর অগ্ন্যুদ্গার যে আসন্ন ও অবশ্যম্ভাবী, এটা সবাই বুঝতে পারলে। গলন্ত লাভা-স্রোতের হাত থেকে তারা যে বাঁচবে, এই ফাঁকা পাথুরে জমিতে তেমন-কোনো বিপুল বাধাও নেই। আস্ত ব্যাকাপ দ্বীপটাই না বিস্ফোরণে একেবারে ভুড়শ ক'রে উড়ে যায় একদিন ! তাই সব জিনিসপত্র নিয়ে একদিন সবাই অন্যান্য দ্বীপে কেটে পড়লো। ঐ দ্বীপে বসবাস করার কথা ভুলেও আর-কেউ ভাবলে না।

কিন্তু বারমুডার সবগুলো দ্বীপেই ওই সুপ্তোত্থিত আগ্নেয়গিরির সমাচারে হুলু-স্থুল প'ড়ে গেলো। অনেকে যেমন বিষম ভয় পেলে, তেমনি অনেকেরই কৌতূহল একেবারে চেতিয়ে উঠলো। আমিও ছিলুম কৌতূহলীদের একজন। তাছাড়া জেলেরা তো ভুলও ক'রে থাকতে পারে। একবার সরেজমিন তদন্ত ক'রে আসা উচিত জেলেরা কতটা ফেনিয়ে-ফাঁপিয়ে খবরটা দিচ্ছে।

বারমুডার দ্বীপগুলোর পশ্চিমে হঠাৎ জল থেকে মাথা তুলে উঠেছে ব্যাকাপ, মূল দ্বীপগুলোর সঙ্গে অসমান কতগুলো ছোটো-ছোটো দ্বীপ আর প্রবালপ্রাচীর দিয়ে সে জোড়া—সেই জন্যে পুব থেকে দ্বীপটা একেবারেই অনধিগম্য। চুড়োটা যেহেতু তিনশো ফুটের উঁচু নয়, সেইজন্যে অন্যান্য দ্বীপ থেকে সহজে এটা চোখেও পড়ে না।

banglabooks.in

সাদামটন বন্দর থেকে একটা ছোটো পোতে ক'রে কয়েকজন অভিযানকারীর সঙ্গে আমিও একদিন ব্যাকাপে গিয়ে হাজির হলুম। তীরে ধীবরদের ফাঁকা ঘর-বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে; মাটির তলা থেকে সত্যিই আসছে গম্ভীর গুমগুমে আওয়াজ, আর জ্বালামুখ থেকে ধোঁয়ার মেঘ বেড়িয়ে এসে দ্বীপটাকে ঢেকে রেখেছে। সন্দেহ সত্যিই ছিলো না। ভূগর্ভে কোনো কারণে আগুন জ্ব'লে উঠছে, ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিটা জেগে উঠেছে আড়মোড়া ভেঙে, যে-কোনো মুহূর্তে বিস্ফোরণ আসন্ন।

আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখের কাছে পৌঁছুবার জন্যে খামকাই চেষ্টা করেছিলুম আমরা কিন্তু পঁচাত্তর ডিগ্রি কোণ ক'রে ওঠা সেই খাড়া, পিছল, মসৃণ ঢাল বেয়ে ওঠে কার সাধ্যি। ও-রকম ফাঁকা জমি আমি কস্মিনকালেও দেখিনি। কয়েকবার চুড়োয় ওঠবার ব্যর্থ চেষ্টা ক'রে হাল ছেড়ে দিয়ে আমরা দ্বীপটাই ঘুরে দেখবো ব'লে ঠিক করেছিলুম। কিন্তু জেলেদের বসতি ছাড়া দ্বীপের অন্য-সবখানেই এলোমেলো সব পাথরের চাঁই প'ড়ে থেকে গোটা দ্বীপটাকে দুর্গম ও দুরতিক্রম্য ক'রে রেখেছে—সেইজন্যে আমাদের সরেজমিন তদন্ত শেষটায় একটা প্রহসনে পরিণত হ'য়েছিলো। ধোঁয়া, আগুনের শিখা, থরহরি-কম্প, গম্ভীর গড়ানো গর্জন—এইসব দেখে বুঝেছিলুম সময় থাকতেই জেলেরা দ্বীপ ছেড়ে গিয়ে খুবই দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে।

সেই সময়ে ব্যাকাপে এসেছিলুম ব'লেই দ্বীপটাকে দেখেই আমার চিনতে কোনো ভুল হ'লো না। এখানে তো জাহাজ ভেড়াবার কোনো বন্দর নেই, 'এব্বা' কি এখানে সত্যিই ভিড়বে! তা, গেডন নামক নগণ্য নার্সটি যে দ্বীপটাকে চেনে, এই তথ্য নিশ্চয়ই কাউন্ট দার্তিগাসের মোটেই মুখরোচক ঠেকবে না। বারমুডার কোনো লোকই তো আর এই দ্বীপে ফেরেনি। তাহ'লে কেন 'এব্বা' এখানে ভিড়তে চাচ্ছে, সেটাই আমার ভারি দুর্বোধ্য ঠেকতে লাগলো। হয়তো কাউন্ট দ্বীপে নামতেই চান না। হয়তো কোনো সরু খাড়িতে 'এব্বা' সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতে চাচ্ছে! পশ্চিম অতলান্তিকের ঝড়-ওঠা কোনো ফাঁকা দ্বীপে কেন কোনো বড়োলোক তার প্রমোদতরী ভেড়াতে চাইবেন খামকা? সাধারণ জেলেরা না-হয় সেখানে থাকতে পারে, কিন্তু কাউন্ট দার্তিগাস, এনজিনিয়ার সেরকো, কাপ্তেন স্পেড বা এই মাঝিমাল্লারা খামকা কেন এখানে থাকতে আসবে?

অথচ 'এব্বা' দ্বীপটাকে লক্ষ্য ক'রেই ছুটে যাচ্ছে।

প্রায় চারশো হাত দূরে একটা খাড়ির মুখে এসে স্কুনারটা দাঁড়িয়ে গেলো,

banglabooks.in

আর তক্ষুনি সেরকো আর স্পেডকে নিয়ে জাহাজের সামনের গলুইয়ে গিয়ে দাঁড়ালেন কাউন্ট দার্তিগাস। আর চোখের সামনেই একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘ'টে গেলো।

একটা ছোট্ট বয়া ভাসছিলো গলুইয়ের নিচে। মাল্লারা সব হেই-হেই ক'রে সেটাকে ডেকের উপর টেনে তুলছিলো। হঠাৎ দেখি মস্ত কালো ছায়ার মতো কী একটা জলে ভেসে উঠলো। তিমি মাছ নাকি? ভীষণ চমকে উঠলুম আমি: শেষকালে কি তিমির ল্যাজের আছড়ানি খেয়ে 'এব্বা' গিয়ে পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়বে?

কিন্তু পরক্ষণেই ব্যাপারটা বুঝতে পেরে একেবারে তাজ্জব হ'য়ে গেলুম। অমনি স্কুনার 'এব্বা'র এই তীব্র দ্রুতগতির রহস্য তক্ষুনি আমার কাছে উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে গেলো। মারকিন উপকূল থেকে কার টানে এত তাড়াতাড়ি এই পালতোলা জাহাজ ছুটে এসেছে সেটা বুঝতে আর দেরি হ'লো না। কারণ আমার চোখের সামনেই জল তোলপাড় ক'রে যে-অতিকায় কালো বস্তুটি ভেসে উঠলো তা আসলে একটি ডুবোজাহাজ। নতুন আবিষ্কার-করা জোরালো তড়িৎসঞ্চয়ক থেকে পাওয়া বিদ্যুৎশক্তির জোরেই জলের তলায় থেকে ছুটেছে এই ডুবোজাহাজ আর পিছন-পিছন ল্যাংবোটের মতো টেনে নিয়ে এসেছে স্কুনার 'এব্বাকে'! 'এব্বা' আসলে একটা গাধাবোট ছাড়া আর-কিছু নয়;—মাস্তুল, পাল, হাল—এ-সবই হ'লো লোকদেখানো। আসল গতির উৎস জলের তলার এই ডুবোজাহাজটিই।

ডুবোজাহাজের উপরেই একটা পাটাতন; পাটাতনের পাশে ঢ্যাঙা একটা লোহার পাতে গড়া চোঙা। পাটাতনের মাঝখানটায় ডুবোজাহাজের ভিতরে ঢোকবার পথ। সামনের দিকে একটা পেরিস্কোপ বসানো, আর আছে একটা সন্ধানী বুরুজ, যেখান থেকে চারদিকেই নজর রাখা যায়। বুরুজের চারিদিকে কতগুলো ঘুলঘুলি বসানো, আর আছে সন্ধানী আলোর বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা, যাতে বোতাম টিপলেই জলের তলাশুদ্ধ আলো হ'য়ে ওঠে। দিনের বেলায় এই ডুবোজাহাজ হয়তো জলের তলাতেই লুকোনো থাকে, কখনও হয়তো ভেসে ওঠে রাতের অন্ধকারে। তখন হয়তো জলের উপর দিয়ে 'এব্বা'কে টেনে দ্রুতবেগে ছুটে চলে।

সব জট কিন্তু তবু খুললো না। ডুবোজাহাজটা না-হয় ধরলুম বিদ্যুৎ-শক্তিতেই চলে, কিন্তু সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কোথায়। নিশ্চয়ই একটা জেনারেটর কোথাও আছে। কিন্তু কোথায় সেই জেনারেটরটি বসানো। সে কি এই

banglabooks.in

ব্যাকাপে ? তাছাড়া ডুবোজাহাজ দিয়ে স্কুনার টেনে নিয়ে যাবারই বা মানে কী ? 'এব্বা'র এনজিনঘরেই তো সব কলকব্জা বসানো যেতো।

হেঁয়ালি ব'লে মনে হ'লেও ব'সে-ব'সে ভাববার সময় কই তখন ? ডুবো-জাহাজটি ততক্ষণে স্কুনারের পাশে এসে ভিড়েছে। পাটাতনের ঝাপ্পা খুলে ঘুলঘুলি দিয়ে বেরিয়ে এসেছে কয়েকটি লোক। কাপ্তেন স্পেড স্কুনার থেকে বোতাম টিপে নির্দেশ দিয়েছে, আর সেই অনুযায়ী এরাই নিশ্চয়ই ডুবোজাহাজ চালিয়ে স্কুনারকে টেনে নিয়ে গেছে।

'চটপট নেমে পড়ুন,' গলা শুনে তাকিয়ে দেখি সেরকো এসে পাশে দাঁড়িয়েছে।

'কোথায় ?'

'ডুবোজাহাজে।'

বিনাবাক্যব্যয়ে ডুবোজাহাজের পাটাতনে গিয়ে দাঁড়ালুম। তমাস রশও পরক্ষণেই আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে কোনো বিকার নেই, কেমন-একটা শান্তির ভাব। সেরকোও ততক্ষণে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কাউন্ট দার্তিগাসও 'এব্বা' থেকে ডুবোজাহাজে নেমে এসেছেন।

মাল্লাদের নিয়ে কাপ্তেন স্পেড কিন্তু 'এব্বা'তেই র'য়ে গেলো। চারজন মাল্লা ওদিকে গুণটানা লম্বা দড়ি নিয়ে একটা নৌকো নামিয়েছে। পাহাড়ে গাঁথা লোহার আংটার মধ্যে কাছিটা গলিয়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে স্কুনারটাকে তারা খাড়ির মধ্যে টেনে নিয়ে গেলো। একটু পরেই পাহাড়ের আড়ালে অত-বড়ো স্কুনারটা হারিয়ে গেলো—বাইরে থেকে দেখে মোটেই বোঝবার জো নেই যে এখানে এসে কোনো জাহাজ ভিড়েছে।

আধঘণ্টার মধ্যেই মাল্লারা নৌকোটা নিয়ে ফিরে এলো। সবাই ডুবোজাহাজে উঠতেই নৌকোটা ডুবোজাহাজের মধ্যে টেনে তোলা হ'লো। তারপর ব্যাকাপকে পাশ কাটিয়ে ডুবোজাহাজটা ডানদিকে ছুটে চললো। কয়েকশো হাত যাবার পরেই দ্বীপের ভিতরটায় ঢোকবার আরেকটা পথ পাওয়া গেলো। ডুবোজাহাজটা সেই সরু পথ দিয়েই ভিতরে ঢুকে পড়লো ; কিন্তু অল্প কিছু দূর যাবার পরেই পথটা এসে শেষ হ'লো খাড়াই পাহাড়ের ঢালের গায়ে।

সেরকোর নির্দেশে লোহার সিঁড়ি বেয়ে ডুবোজাহাজের ভিতরে নেমে পড়লুম। নিচের ঘরে গিয়ে দেখলুম সেটা মালপত্তরে বোঝাই হ'য়ে আছে। জাহাজের খোলে যে-সব মাল আঁটেনি তা-ই হয়তো এখানে জড়ো ক'রে রাখা

banglabooks.in

হয়েছে। আমাকে পাশেরই একটা কামরায় ঠেলে ঢুকিয়ে দেয়া হ'লো। ভিতরে ঢুকেই ঘরটা চিনতে পারলুম। এই-তো সেই লোহার খুপরিটা, যেখানে নিকষ-কালো নিরেট আঁধারের মধ্যে আমাকে অনেকক্ষণ বন্দী হ'য়ে থাকতে হয়েছে।

ঝনঝন আওয়াজ হ'লো পর-পর; নিশ্চয়ই ঘুলঘুলির ঢাকাগুলো বন্ধ করা হ'লো। ডুবোজাহাজ এবার জলের নিচে ডুবে যাচ্ছে। নিশ্চয়ই তার জমাবার মস্ত চৌবাচ্চাগুলো হু-হু ক'রে জলে ভর্তি হ'য়ে যাচ্ছে।

মৃদু কম্পন থেকে এটাও বোঝা গেলো যে নিচে নামার সঙ্গে-সঙ্গে ডুবো-জাহাজ সামনের দিকে এগুতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

গেলো বোধহয় মাত্র দু-তিন মিনিট, তার পরেই ঝাঁকুনি খেয়ে টের পেলুম ডুবোজাহাজ আবার জলের উপর ভেসে উঠেছে। আবার ঘুলঘুলির ঢাকা খোলার ধাতব ঝনৎকার কানে এলো। আমার ঘরের দরজাও পরক্ষণেই খুলে গেলো। হুড়মুড় ক'রে ছুটে বাইরের পাটাতনে গিয়ে দাঁড়িয়েই একেবার হতভম্ব হ'য়ে গেলুম।

কারণ জলের তলা দিয়ে ব্যাকাপের একেবারে ভিতরে এসে পৌঁছেছে ডুবোজাহাজ—ঠিক একেবারে পেয়ালার কানা পেরিয়ে মধ্যের ফাঁকায়।

এই-ই তা'হলে কাউণ্ট দাতিগাসের রহস্যময় আস্তানা? এখানেই তাহ'লে তিনি তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে মনুষ্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হ'য়ে গিয়ে তাঁর ডেরা বসিয়েছেন!

পেয়ালার মধ্যেটায়

জল থেকে একশো পা দূরেই আমার আস্তানা। ছ-ফুট চওড়া আর ষোল ফুট লম্বা একটা ঘর; ঘরে টেবিল, চেয়ার, বিছানা, সাজগোজের শরঞ্জাম—কোনো কিছুরই অভাব নেই। সবই ঝকঝকে তকতকে, প্রায় যেন আনকোরা। টেবিলে দোয়াত, কলম, কাগজ সাজানো আছে। মাথার উপরে জ্বলছে বিদ্যুৎ-বাতি। এই বিদ্যুৎ কোথায় উৎপাদিত হয়, জেনারেটরটা কোথায় বসানো, তা আমাকে জানতেই হবে।

banglabooks.in

খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত খুবই ভালো। প্রথম দিনে পাওয়া গেলো টাটকা মাছ, নোনা মাংস, রুটিটা ছিলো চমৎকার, আর ছিলো হুইস্কি আর বিয়ার—কিন্তু বড্ড অস্বস্তিতে ভুগছিলুম ব'লে কিছুই দাঁতে কাটতে পারিনি।

দুর্ভাবনায় আর নানা জল্পনায় রাত কেটে গেলো। বিছানা ছেড়ে উঠলুম সকাল সাতটায়। এই মস্ত গুহাটায় বন্দী হ'য়ে আছি বটে, তবে নিশ্চয়ই কেবল এই ছোটো কোঠাতেই আমাকে সারাদিন কাটাতে হবে না।

সব ঘুরে-ঘুরে দেখলুম। সেই অতিকায় গহ্বরের মধ্যে কী-যে এক এলাহি কারবার চলেছে, দেখে একেবারে তাজ্জব হ'য়ে গেলুম।

জলের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ গেছে; 'এব্বা'র ডুবোজাহাজ যে-শুঁড়িপথটা দিয়ে এখানে এলো। শুঁড়িপথের শেষেই এই গুহাটা। সুড়ঙ্গটার দৈর্ঘ্য হবে কম ক'রেও চল্লিশ গজ। কাজেই কোনো ডুবোজাহাজ ছাড়া ও-পথ দিয়ে পালাবার চেষ্টা করাই মূর্খতা। আমি অবশ্য পালাবার কথা ভাবছিলুম না। তাছাড়া পালিয়ে যাবোই বা কোথায়? প্রথমে আমাকে দেখতে হবে ওই সুড়ঙ্গ ছাড়া এখান থেকে বেরুবার আর-কোনো পথ আছে কি না। যদি কোনো পথ থাকে, তাহ'লে সেটা আমাকে খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু সেই পথেও যদি এই গুহা ছেড়ে পালাতে পারি, বাইরে গিয়ে আশ্রয় নেবো কোথায়? ব্যাকাপ তো আর মস্ত কোনো দ্বীপ নয়—উপরন্তু ওলটানো পেয়ালার মতো মস্ত পাহাড়টাই পুরো দ্বীপটা জুড়ে আছে। যেই এরা টের পাবে যে আমি পালিয়েছি, অমনি চারদিকে লোক ছুটবে—ঠিক আমাকে খুঁজে বার করবে। তারপর নিশ্চয়ই নানাভাবে এরা আমাকে যন্ত্রণা দেবে। কাজেই সে-চেষ্টা আপাতত না-করাই ভালো।

তার চেয়ে বরং কাউণ্ট দাতিগাসের এই এলাহি কাণ্ডকারখানাটি একবার টহল দিয়ে দেখা যাক। একটা বিষয়ে এখন আর কোনো সন্দেহ নেই। ব্যাকাপে কস্মিনকালেও কোনো আগ্নেয়গিরি ছিলো না—এখনও নেই। নিশ্চয়ই দৈবাৎ ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়েছিলেন কাউণ্ট, তারপর এমন একটা চমৎকার ও দুরধিগম্য গুপ্ত নিবাস আবিষ্কার ক'রে দ্বীপের লোকদের দ্বীপছাড়া করার জন্যই ওলটানো পেয়ালাকে একেবারে আগ্নেয়গিরি বানিয়ে ছেড়েছেন।* অর্থাৎ অজস্র শুকনো শ্যাওলা পুড়িয়ে ধোঁয়া সৃষ্টি করেছেন, বোমা ফাটিয়ে বিকট সব আওয়াজ

---

* জুল ভের্ন রচিত ও মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনূদিত 'দুর্বারগতি বিভীষিকা', নামক রুদ্ধশ্বাস, রোমাঞ্চকর ও রহস্যময় সায়ান্স ফিকশনে এমনি-এক ঘটনার কথা বিবৃত হয়েছে; কৌতূহলী পাঠক প'ড়ে দেখতে পারেন।

banglabooks.in

শুনিয়েছেন, আর কৃত্রিমভাবে এমনভাবে অগ্ন্যুদ্গারের আশঙ্কা জাগিয়ে দিয়েছেন যে অর্ধ-শতাব্দীকালের আবাস ছেড়ে জেলেরা পালাতে বাধ্য হয়েছে—আর দিব্যি নিশ্চিন্ত মনে কাউণ্ট দাতিগাস দ্বীপটার মালিক হ'য়ে বসেছেন, কোনোরকম ঝক্কি-ঝামেলা বা ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয়নি।

আমার ছোটো কোঠাটা ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেখলুম ডুবোজাহাজটা গহ্বরের মধ্যেকার মস্ত হ্রদের নিস্তরঙ্গ শান্ত জলে ভাসছে। পাশেই রয়েছে ডুবোজাহাজ দাঁড়াতে পারে, এমনি একটা পাথরের চাতাল—অর্থাৎ ছোটো-একটা জেটি। একদিকে কুড়ি হাত চওড়া একটা পাথরের কার্নিশে শশব্যস্ত লোক-জনেরা মালপত্তর নামাচ্ছে।

হ্রদের পাশেই জায়গায়-জায়গায় যত রাজ্যের শুকনো শ্যাওলা জড়ো করা। দরকার হ'লেই এই শ্যাওলার স্তূপে আগুন দেয়া হবে, আর ওলটানো পেয়ালার চুড়োয় (বা তলায়) কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখে আতঙ্কিত লোকজন ভাববে বুঝি সুপ্তোত্থিত আগ্নেয়গিরি। দাহ্য পদার্থ যে কেবল এই স্তূপীকৃত শ্যাওলাই শুধু, তা নয়—একপাশে কয়লার স্তূপ রয়েছে, যেন ছোটোখাটো একটা পাহাড়। নিশ্চয়ই স্কুনারের খোল থেকে ডুবোজাহাজটি এই কয়লার স্তূপ নিয়ে এসেছে এখানে।

পাহাড়ের চুড়োটা ফাঁকা আর খোলামেলা। ফাঁক দিয়ে দিনের আলো এসে পড়ছে।

হ্রদের পশ্চিম তীর দিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে দেখলুম গুহাবাসীদের আশ্রয়নিবাস। নিরেট চুনাপাথর কেটে মৌচাকের মতো খুপরি বানানো, সেই জন্যেই এটার নাম নাকি 'মৌচাক'। খুপরিগুলোর অজস্র সংখ্যা দেখে বুঝতে পারলুম কাউণ্টের শাগরেদরা সংখ্যায় প্রায় শ-খানেক হবে। কাউণ্টের নিজের ঘর অবশ্য আলাদা—সাঙ্গোপাঙ্গদের মৌচাক থেকে একটু দূরে।

হ্রদের অন্যতীরে পাহাড়ের গা কেটে বানানো হয়েছে বিপুল ভাঁড়ার ঘর। মালপত্তর নামিয়ে নিয়ে লোকজনেরা নৌকো বোঝাই ক'রে সেই গুদোমের দিকে রওনা হ'লো। আর সেরকো আর কাপ্তেন স্পেডের সঙ্গে কী-যেন বলাবলি করতে-করতে কাউণ্ট দাতিগাস সেই ভাসমান ডুবোজাহাজের দিকে চ'লে গেলেন।

ফাঁপা পাহাড়ের ভিতরটা অবিকল উলটে-পড়া পেয়ালার ভিতর-দিককার মতোই। কিন্তু সে-যে কতবড়ো গহ্বর, সত্যিকার পেয়ালা হ'লে সেটা যে কত বড়ো পেয়ালা হ'তো, তা নিজের চোখে না-দেখলে আন্দাজ করা যাবে না।

banglabooks.in

প্রকৃতিঠাকরুনের নিজের হাতে গড়া একটা প্রকাণ্ড গম্বুজ উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। পুবদিকের গড়নটা অবিশ্যি একটু অন্যরকম। সেদিকটায় অসংখ্য পাথরের থাম এঁকেবেঁকে উপরে উঠে গেছে। আর সেই থামগুলোর মধ্য দিয়ে পেঁচিয়ে-পেঁচিয়ে অনেকগুলো ছোটো-ছোটো পথ ব্যাকাপের শেষ অব্দি চ'লে গিয়েছে। মৌচাকটা রয়েছে হ্রদের উত্তর দিকের তীরে। তার ঠিক অন্যতীরেই কাউণ্ট দার্তিগাসের গুদোমঘর। সেখানে যত-রাজ্যের লেবেল-লাগানো, বাক্স-প্যাঁটরা, মদের পিপে, রশদপত্র ঠাশা বোঝাই—যেন বিশটা সদাগরি জাহাজের মাল এক জায়গায় জড়ো ক'রে রাখা হয়েছে।

একটু দূরে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরাও ক'রে একটা জায়গা দেখতে পেলুম, ভিতরে মস্ত কী-সব যেন খাড়া করা। জায়গাটা যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে মোটেই বেগ পেতে হ'লো না—ওই বেড়াই তো বিশেষভাবে সে-কথা ব'লে দিচ্ছে। তাছাড়া ঠিক মাঝখানের একটা উঁচু খুঁটি থেকে মাকড়শার তন্তুর মতো মোটা-মোটা তামার তার বেরিয়েছে—ফাঁপা পাহাড়ের ভিতরে সব দিকে চ'লে গেছে সেই তার। তারের মধ্য দিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে জোরালো বিদ্যুৎশক্তি; খুপরিগুলোয় বিজলিবাতি জ্বলছে. গুহার ভিতরে, থামের মধ্যকার গোলকধাঁধার মধ্যেও সারি-সারি বিজলি বাতি জ্বলছে।

এটাই তাহ'লে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। এখানেই বসানো হয়েছে ডায়-নামো, অ্যাকুমুলেটার, সব কলকব্জা? বেশ, বেশ!

আমি নিজের মনেই ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম। কেউ বাধা দিচ্ছিলো না—সত্যি বলতে কেউ আমার দিকে ফিরেই তাকাচ্ছিলো না। কাছে থেকে তাদের খুব ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে নিলুম আমি। জগতের নানা দেশ থেকে এসেছে তারা, কারু সঙ্গে কারু কোনো মিল নেই। প্রত্যেকের গায়ের রঙ আলাদা—কারু শাদা, কারু-বা ব্রন্জের মতো, কেউ-বা কালো। কাফ্রিদের মতো কালো হয়তো নয়, বরং অস্ট্রেলিয়ার আদি বাসিন্দাদের মতো। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের লোকও নিশ্চয়ই অনেকে। স্বয়ং কাউণ্ট দার্তিগাসই হয়তো ওলন্দাজ পূর্বভারতের মানুষ। সেরকো এসেছে লেভান্ট থেকে, আর স্পেডের উৎস সম্ভবত ইতালি।

কিন্তু, আবারও প্রশ্নটা করলুম নিজেকে, কে এই কাউণ্ট দার্তিগাস? কী তাঁর পরিচয়? কেন তিনি এ-রকম একটা সৃষ্টিছাড়া জায়গায় এসে আস্তানা গেড়েছেন? কেন জনসমাজ থেকে এত-দূরে এমন গোপনে তিনি লুকিয়ে থাকতে চাচ্ছেন? যা ভেবেছি, তাই যদি ঠিক হয় তাহ'লে খেতাব ও নামটা তাঁর

banglabooks.in

একটা বেনাম মাত্র। কিন্তু কেন এই ছদ্মনাম নিয়েছেন তিনি? কেন তিনি নিজের পরিচয় গোপন রাখতে চাচ্ছেন? তাহ'লে কি তিনি কোনো দাগি বদমায়েশ, নামজাদা কোনো সমাজ-বিরোধী ব্যক্তি? তাই স্বদেশ ছেড়ে এসে এমন সৃষ্টিছাড়া জায়গায় এসে ঘাপটি মেরে ব'সে আছেন! হয়তো অপরাধের নেশা তাঁর রক্তের মধ্যে মিশে গিয়েছে। তাই এমন-একটা গোপন ঘাঁটি বানিয়েছেন, যেটা কেউ কোনোদিন হদ্দে হ'য়ে গেলেও খুঁজে বার করতে পারবে না। মানুষটি যে সহজসোজা বা শাদাশিধে নয়, তা তো তাঁর কাণ্ডকীর্তি দেখেই বোঝা যায়। আমাদের চুরি ক'রে আনাটা তো খুব-একটা নিরীহ ও নির্দোষ কর্ম নয়।

কিন্তু বুকের পাটা আছে তাঁর। এটা-তো ঠিক যে চিরকাল তিনি ভোল পালটে সজ্জন সেজে থাকতে পারবেন না, একদিন-না-একদিন জগতের সবগুলো বন্দরেই তাঁকে নিয়ে ধুন্ধুমার বেঁধে যাবে—স্কুনার 'এক্সা'কে দেখলেই তখন 'পুলিশ' ব'লে হাঁক পাড়বে। সেক্ষেত্রে তমাস রশের মারণাস্ত্রটির সূত্র থেকে তাঁর কী আর এমন লাভ হবে?

তাঁর শাগরেদরা সবাই এসেছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে, সত্যি, কিন্তু প্রত্যেকেরই স্বভাব প্রায় একই রকম। গাঁট্টাগোট্টা ষণ্ডামার্কা একেকজন লোক, নিশ্চয়ই স্বদেশে প্রত্যেকেরই নামে পুলিশের হুলিয়া আছে—প্রাক্তন কুকর্মের জন্য তাড়া খেয়ে নিশ্চয়ই সবাই এসে এখানে জড়ো হয়েছে—এখানে তো আর পুলিশের তাড়া নেই, এখানে সবাই বেশ নিশ্চিন্ত। আর এই সমাজছাড়া দেশছাড়া লোকগুলো জড়ো ক'রেই নিশ্চয়ই কাউন্ট দাতিগাস তাঁর দুর্ধর্ষ ভয়ংকরের দল সৃষ্টি করেছেন। কাপ্তেন স্পেড আর এনজিনিয়ার সেরকো হ'লো তাঁর ডান ও বাম হাত—আর ব্যাকাপ হ'লো তাদের নিভৃত বিবর।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের পাশ দিয়ে যেতে-যেতে ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে একেবারে আনকোরা সাম্প্রতিক কলকব্জা দেখতে পেলুম। সেকেলে যন্ত্রপাতির মতো ভারি আর জবড়জং নয়, হালকা সপ্রতিভ চেহারার ঝকঝকে চকচকে সব অত্যাধুনিক যন্ত্র চালাতে কয়লা লাগে না ব'লে ব্যবহারবিধিও জটিল নয়, খুবই সরল। গহ্বরের সবগুলো বাতিই বিদ্যুৎ পাচ্ছে জোরালো কতগুলো তড়িৎকোষ থেকে। এদের সব প্রাত্যহিক কাজকর্মই নিশ্চয়ই এই বিদ্যুতেই সারা হয়।

পাশের একটা খুপরিতে সমুদ্রের জল ছেঁকে পরিস্রুত ক'রে, লবণ বার ক'রে ফেলে, পানীয় জল তৈরি হচ্ছে, আর কাছেই একটা জলাধারে সেই টলটলে

banglabooks.in

জল জমানো হচ্ছে।

পাথরের থামের সেই গোলকধাঁধার মধ্যেও ঢুকে পড়েছিলুম। রাজকারিগর বিশ্বকর্মার খামখেয়ালিতে গড়া এই থামগুলো এঁকেবেঁকে অদ্ভুতভাবে উপরে উঠে গেছে, যেন প্রকৃতির কোনো দুঃস্বপ্নের মধ্যে এই ভীষণ-সুন্দর জটিল জায়গাটা তৈরি হয়েছিলো। মাঝে-মাঝেই বিদ্যুৎ-বাতি জ্বলছে—রাত্রে নিশ্চয়ই কোনো অতিকায় ভীষণ-সুন্দর আলোছায়া নেমে আসে এখানে।

অনেক পশুপক্ষীও রয়েছে সেই গহ্বরের মধ্যে: গাংচিল, সারস, নানা জাতের সিন্ধুপাখি ঘুরে বেড়ায় চারধারে। গোরু-বাছুর, শুয়োর-ভেড়ার খোঁয়াড় আছে, কুঁকড়ো পরিবারের জন্য আস্তানাও বানানো। হ্রদের জলে প্রচুর মাছ আছে। গুদোমের মধ্যে রয়েছে মস্ত-সব মদের পিপে। জলাধারে রয়েছে পরিস্রুত পানীয় জল। ব্বাস! বেঁচে থাকবার জন্য আর-কী চাই!

প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য ভালো। রোদে-পোড়া ব্রন্‌জে-গড়া মূর্তি যেন একেকজন। সমুদ্রের খোলা হাওয়ায় অসুখ-বিসুখ সহজে কাছে ঘেঁষে না। সবাই প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারে। সকলেরই বয়েস তিরিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে—একেবারে ছেলেমানুষও কেউ নয়, আবার থুরথুরে বুড়োহাবড়াও নয় কেউ।

কিন্তু ওই জীবন তারা বেছে নিলে কেন? আর ব্যাকাপ ছেড়েও কি বাইরের খোলামেলা পৃথিবীতে কেউ যায় না?

হয়তো সে-প্রশ্নের উত্তর পেতে খুব একটা দেরি হবে না আমার।

কের কারাইয়ে

কাউণ্ট দার্তিগাসের বাসা থেকে আমার কোঠা প্রায় দুশো হাত দূরে। সেটাই মৌচাকের শেষ দিককার খুপরির একটা। হয়তো তমাস রশের সঙ্গে এক ঘরেই আমাকে রাখা হবে না, কিন্তু আমি ভেবেছিলুম আমাকে নিশ্চয়ই অন্তত তাঁর কাছাকাছি কোথাও রাখা হবে; কারণ আমাকে যদি রশের শুশ্রূষা করতে হয়, তাহ'লে দুজনের কুঠি পাশাপাশি থাকাই উচিত। এটা অবিশ্যি শিগগিরই জানা যাবে।

banglabooks.in

কাপ্তেন স্পেড আর এনজিনিয়ার সেরকো কাউণ্ট দার্তিগাসের ভবনের পাশেই আলাদা-আলাদা আস্তানায় থাকে।

কাউণ্টের ভবন···? হ্যাঁ, কেন তাকে ভবন বলবো না, যখন তাঁর আবাস অতীব যত্নের সঙ্গে সুরুচিশোভনভাবে সাজানো-গোছানো? পাথর কেটে-কেটে অলংকৃত খিলেন বানিয়েছে দক্ষ মিস্ত্রিরা, চওড়া দরজা রয়েছে সামনে। চুনাপাথর কেটে-কেটে জানলা বসানো হয়েছে; পাল্লাগুলোর কাচ রঙিন। ভিতরে কয়েকটা ঘর: খাবার ঘর আর বৈঠকখানায় মস্ত জানলা দিয়ে আলো ঢোকে—হাওয়া চলাচলের জন্য নিখুঁত ব্যবস্থা করা ঘরগুলোয়। আশবাবগুলোর কোনোটা ফরাশি, কোনোটা-বা ইংল্যাণ্ডের, কোনোটা এসেছে মারকিনমুলুক থেকে—সবই খুব জমকালো ধরনের। রশুইখানা ও অন্যান্য আপিশগুলো মৌচাকের পাশাপাশি খুপরিতে বসানো।

বিকেলবেলায় কাউণ্ট দার্তিগাসের সঙ্গে একবার সরাসরি কথা বলবোই—এই সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিলুম। দেখি, তিনি স্বয়ং হ্রদের পাশ দিয়ে হনহন ক'রে মৌচাকের দিকে চলেছেন। হয় তিনি আমাকে দ্যাখেননি, নয় আমাকে এড়িয়ে চলতে চাচ্ছিলেন, কারণ আমি খুব তাড়াতাড়ি পা চালিয়েও তাঁকে ধরতে পারলুম না।

'কথা তাঁকে আমার সঙ্গে বলতেই হবে,' আমি নিজেকে বললাম। আমিও হুড়মুড় ক'রে এগোলুম। গিয়ে দেখি তাঁর ভবনের দরজা তখন বন্ধ হচ্ছে। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়েছে ষণ্ডামার্কা এক মালয়, কাটাকাটাভাবে সে আমাকে চটপট কেটে পড়তে বললে। আমি অবিশ্যি তার ফতোয়ায় কোনো পাত্তাই দিলুম না, বরং দু-দুবার খুব সরল ইংরেজিতে নাছোড়বান্দার মতো আমার মৎলব খুলে বললুম: 'কাউণ্ট দার্তিগাসকে গিয়ে বলো আমি এক্ষুনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

কথাগুলো ব্যাকাপের পাষাণকে বললেও হ'তো। বর্বর লোকটা বোধহয় একবর্ণও ইংরেজি জানে না। চেঁচিয়ে-মেচিয়ে সে হুলুস্থুলু বাধিয়ে বসলো। জোর ক'রে ঢুকে প'ড়ে কাউণ্টের নাম ধ'রে চীৎকার ক'রে ডাকলে হয়তো তিনি শুনতে পেতেন, কিন্তু সে-চেষ্টা করতে গেলে শুধু সেই পালোয়ানটির রোষই বাড়ানো হবে। কাজেই আপাতত কৈফিয়ৎ দাবি করা থেকে মানে-মানে বিরত হলুম বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে কিছুতেই ছাড়বো না—এটাই মনে-মনে ঠিক ক'রে নিলুম।

banglabooks.in

মৌচাকের সামনে দিয়ে পুবদিক ধ'রে এগিয়ে যেতে-যেতে আবার ঘুরে-ফিরে তমাস রশের কথাই ভাবলুম আমি। প্রথম দিন তাঁকে কোথাও না-দেখতে পেয়ে আমার ভারি আশ্চর্য লেগেছিলো। আবারও খেপে গেছেন নাকি তিনি? কিন্তু তা তো মনে হ'লো না, তাহ'লে কাউণ্ট দার্তিগাস নিশ্চয়ই শুশ্রূষার জন্য গেডনকে ডেকে পাঠাতেন। একশো পা যেতে-না-যেতেই হঠাৎ সেরকোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেলো।

সেরকো বেশ ফুর্তিবাজ লোক। ব্যবহারও ভালো। আমাকে দেখে মিটিমিটি হাসে বটে, কিন্তু আমাকে এড়িয়ে চলার কোনো চেষ্টা করে না। আমিও যে এনজিনিয়ার এটা জানলে আমাকে এত সাদরে সে অভ্যর্থনা করতো কি না জানি না। কিন্তু আমার পরিচয় তাকে বলতে যাচ্ছে কে? আমি তো সবই চেপে যাচ্ছি।

আমাকে দেখেই সেরকো থেমে কুশল জিগেশ করলে। তার চোখ দুটোয় কৌতুক ঠিকরোচ্ছে, ঠোঁটের ফাঁকে ঠাট্টার হাসি।

আমি বেশ ঠাণ্ডাভাবেই তার কথার উত্তর দিলুম। কিন্তু সে-সব সে পাত্তাই দিলে না। 'সন্ত জনাথান আপনাকে রক্ষে করুন, মিস্টার গেডন। এই চমৎকার গুহা দেখে আপনি নিশ্চয়ই ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছেন না। এত সুন্দর জায়গা আপনি ইহজগতে পেতেন কোথায়, বলুন!'

'নালিশ করার কিছুই থাকতো না, যদি এই গুহা দর্শন করার সৌভাগ্যর পর আমাকে চ'লে যাবার সুযোগ দেয়া হ'তো!'

'আরে! আপনি কি এর মধ্যেই আমাদের ছেড়ে চ'লে যাবার কথা ভাবছেন নাকি, মিস্টার গেডন—হেল্‌থফুল হাউসের সেই মন-খারাপকরা মণ্ডপটায় ফিরে যেতে চাচ্ছেন আবার? আপনি তো এই চমৎকার জায়গাটার কিছুই এখনও ছাখেননি! একবার দেখুন প্রকৃতিঠাকরুনের রাজমিস্তিরি কী অপূর্ব জিনিশ বানিয়ে রেখেছে!'

'যা দেখেছি তা-ই যথেষ্ট। আর আপনি যদি সত্যি সিরিয়াসভাবে কথা ব'লে থাকেন তো আপনাকেও আমি অতীব সিরিয়াসভাবে বলতে চাই যে আর-কিছুই আমি দেখতে চাই না!'

'না, না, গেডন, আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন। আরে, আপনি তো এখনও এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় দিন কাটাবার সুবিধেগুলোও লক্ষ করেননি। দেখুন-না, বেশ নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট জায়গা, অহেতুক দুশ্চিন্তা নেই, ভবিষ্যতের ভাবনা নেই,

banglabooks.in

জল-হাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, অতলান্তিকের বিষম ঝড়ও নেই, কনকনে ঠাণ্ডাও পড়ে না, গরমেও গা ঝলশে যায় না। ঋতু বদল এখানে আপনি টেরই পাবেন না। না বরুণ, না পবন—কারুই এখানে প্রতাপ নেই।'

পৌরাণিক নামগুলোর কি দরকার ছিলো? সেরকো আমায় নিয়ে মজা করছে। গেডনের মতো লোক কস্মিনকালেও নিশ্চয়ই পবন বা বরুণদেবের কাহিনী জানে না।

'আপনার হয়তো এই জলহাওয়া ভালো লাগতে পারে—আপনি হয়তো—' 'ব্যাকাপের গুহার ভিতরে বাস করেন' এ-কথা বলতে গিয়ে আমি ঘুম ক'রে থেমে গেলুম। আমি যে দ্বীপটার নাম জানি, দ্বীপটা কোথায় অবস্থিত তাও জানি, এটা এরা সন্দেহ করলে কী দুর্গতি হবে আমার কে জানে। কাজেই কথা পালটে ফেললুম, 'কিন্তু এই জলহাওয়া যেহেতু আমার পছন্দ হচ্ছে না, সেজন্যে হাওয়াবদল করার অধিকার নিশ্চয়ই আমার আছে। অন্তত আমার তো তা-ই মনে হয়।'

'অধিকারের কথা বলছেন? তা-তো নিশ্চয়ই।'

'আমাকে দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যেতে দেয়া হোক। মারকিন মুলুকে ফিরে যাবার একটা ভদ্র ব্যবস্থা আমি দাবি করছি।'

'সত্যি, আপনার দাবির বিরুদ্ধে আমার কোনো যুক্তি নেই, কোনো কথাও মুখে জোগাচ্ছে না। আপনার দাবি যে সংগত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা বুঝতে চেষ্টা করুন—এখানে আমাদের দৃপ্ত ও মহান স্বাধীনতা আছে। কোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের তাঁবেদার বা তল্পিবাহক নই আমরা। বাইরের সব কর্তৃত্ব কি খবরদারির হাত থেকে আমরা মুক্ত। আমেরিকা বা ইওরোপের ঔপনিবেশিকতার দাস আমরা নই। এ-সবই আত্মসম্মানওলা মানুষের বিবেচনা দাবি করে।... আপনার কি দেখে মনে হয় না এই গুহা বিশ্বকর্মার নিজের হাতে গড়া—সেই অতীতে যখন আকাশবাণী হ'তো তখনই কি মানুষের দুর্দশা দেখে দেবতারা এই গুহাটা বানিয়ে যাননি?'

সেরকো দেখা যাচ্ছে পুরাণের উদ্ধৃতি খুবই পছন্দ করে। কিন্তু সে যদি ভেবে থাকে যে-কোনো হাসপাতালের শুশ্রূষাকারী পুরাণ প'ড়ে মুখস্থ ক'রে রেখেছে তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে তার ঠাট্টা করার ইচ্ছেটা এখনও পুরোদস্তুর আছে। বহু কষ্টে আত্মসংবরণ ক'রে বললুম, 'একটু আগে কাউন্ট দার্তিগাসের ভবনে ঢুকতে চাচ্ছিলুম, কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি!'

'কে ঢুকতে দেয়নি?'

banglabooks.in

'কাউণ্টের কোনো ভৃত্য বোধহয়।'

'তাহ'লে আপনার সম্বন্ধে তাকে বোধহয় বিশেষ আদেশ দেয়া ছিলো।'

'তিনি চান বা না-চান, আমি কাউণ্ট দাতিগাসের সঙ্গে স্পষ্টাস্পষ্টি কথা ব'লে নিতে চাই।'

সেরকো মুচকি হাসলো। 'সেটা একটু কঠিন হবে ব'লে মনে হচ্ছে···অসম্ভবই বোধহয়!'

'কেন?'

'কারণ এখানে কাউণ্ট দাতিগাস ব'লে কেউ থাকেন না।'

'আপনি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন। এই-তো, একটু আগেই তাঁকে দেখলুম।'

'আপনি যাঁকে দেখেছেন, তিনি মোটেই কাউণ্ট দাতিগাস নন।'

'তাহ'লে তিনি কে?'

'জলদস্যু—কের কারাইয়ে!'

নামটা যেন বন্দুকের গুলির মতো আমার গায়ে লাগলো। ব'লেই সেরকো চটপট পা চালিয়েছে—আমি তাকে থামাবারই কোনো সুযোগ পাইনি।

জলদস্যু! কের কারাইয়ে!···হুম! নামটাই একটা আলোর ঝিলিক! কে-না শুনেছে এই নাম? কে-না জানে এই নামের সঙ্গে কী রক্তারক্তি জড়ানো! যত জট পাকিয়েছিলো, সব মুহূর্তে খুলে গেলো। কার খপ্পরে পড়েছি, এবার তা পুরোপুরি টের পেলুম!

আট-ন বছর আগে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম অংশ এক বিষম সাহসী বোম্বেটের উৎপাতে তোলপাড় হ'য়ে গিয়েছিলো। মরীয়া এক দল বোম্বেটে—জেল-পালানো কয়েদি, দেশছাড়া সব ষণ্ডাগুণ্ডা, জাহাজ-পালানো মাল্লা—এ-সব লোকরা মিলে এক দুর্ধর্ষ দলপতিকে ঘিরে একটা ভয়ংকরের দল গ'ড়ে তুলেছিলো। গোড়ায় দলের সূত্রপাত হয়েছিলো ইওরোপ আর মারকিন দেশের যে-সব ডাকাবুকো লোককে নিয়ে যারা নিউ-সাউথ-ওয়েলসে সোনা আছে শুনে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলো। সেই স্বর্ণসন্ধানীদের মধ্যে ছিলো কাপ্তেন স্পেড আর এনজিনিয়ার সেরকো—এরা দুজন কিছুতেই আর উন্নতি করতে পারছিলো না। কিন্তু পরস্পরকে দেখবামাত্র রতনে রতন চিনে ফেললো, স্বভাবে আর ভাবনায় তাদের এতই মিল ছিলো যে তারা চটপট অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ হ'য়ে উঠলো। দুজনেই সবজান্তা, একরোখা, বুদ্ধিমান—যে-কোনো পেশাতেই তাদের চড়চড় করে উন্নতি হ'তো। কিন্তু তাদের না-ছিলো বিবেক, না-ছিলো কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞান,

banglabooks.in

যে-ক'রেই হোক চটপট বড়োলোক হ'তে হবে, এই জন্যে কেউই ধৈর্য ধ'রে কোনো নিয়মিত কাজে হাত দিতে পারছিলো না, জুয়ো আর ফাটকাবাজারই তাদের খেয়েছিলো। তার ফলে এমন সব দুর্ধর্ষ ও বেপরোয়া অ্যাডভেনচারে তারা জড়িয়ে পড়েছিলো যে ফেরবার আর-কোনো উপায় ছিলো না। সেই সব সোনার খনিতে বেশির ভাগ ভবঘুরেদের মতো তারাও আজ হয়তো বাদশা কিন্তু কালকেই আবার ফকির। সেই সময়ে সেই খনি এলাকায় একটা ভারি উদ্ধত ও বেপরোয়া লোক ছিলো, ভয় কাকে বলে সে জানতো না, কোনো-কিছুতেই সে পেছপা হ'তো না। তার নাম ছিলো কের কারাইয়ে। সব গুণ্ডাবদমাশদের উপর তার ছিলো অপ্রতিরোধ্য প্রভাব। হাজার চেষ্টা ক'রেও কেউ কোনোদিনও তার জাতীয়তা জানতে পারেনি। কিন্তু সব গোয়েন্দার চক্ষুকে সে ফাঁকি দিলেও তার নাম—অন্তত যে নামে সে আত্মপরিচয় দিতো—সারা জগতে ঝলশে উঠেছিলো। প্রায় যেন কোনো কিংবদন্তির মানুষ—তেমনি অদৃশ্য, তেমনি স্পর্শাতীত সব ভয়ংকর কাহিনী তাকে ঘিরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

কের কারাইয়ে—আমার মনে হচ্ছিলো—আসলে মালয়ের মানুষ। সে কোথাকার লোক তাতে অবিশ্যি কিছুই এসে যায় না। আসল কথা হ'লো সে ছিলো দুর সিন্ধুজলে বহু রক্তারক্তির নায়ক। অস্ট্রেলিয়ার সেই খনিগুলোয় কয়েক বছর কাটিয়ে দেবার পর সেরকো আর স্পেডের সঙ্গে তার চেনা হয়, আর তার পরেই সে মেলবোর্ন বন্দরে একটা পোত দখল ক'রে বসে। তার শাগরেদ গোড়ায় ছিলো তিরিশ জন বদমায়েশ—শিগগিরই তাদের সংখ্যা তিন গুণ হ'য়ে উঠলো। প্রশান্ত মহাসাগরের সেদিকটায় জলদস্যুতা তখনও ছিলো ভারি সহজ ও লাভের ব্যবসা। কত-যে জাহাজ সেখানে লুঠপাট হয়েছে, কত লোক যে বধ হয়েছে, কত ছোটো-ছোটো দ্বীপে যে নিরীহ বসতির উপর আক্রমণ চালানো হয়েছে, তার কোনো লেখাজোখা নেই। কাপ্তেন স্পেডই কের কারাইয়ের জাহাজ চালাতো; মাঝে-মাঝে সেটা লোকের চোখেও পড়েছে দুর থেকে—কিন্তু কেউই তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পারেনি। ছোটো-ছোটো দ্বীপগুলোর গোলকধাঁধার মধ্যে কোথায় যে সেটা হুউশ ক'রে মিলিয়ে যেতো, তা কেউই টের পেতো না। আর সেই জন্যেই সেখানকার সিন্ধুজলে হতাশা নেমে এসেছিলো। এই ছায়াবাজির পিছু নেবার জন্য জগতের কত দেশ থেকে কত মানোয়ারি জাহাজ পাঠানো হয়েছে—ইংরেজ, ফরাশি, আলেমান, রুশ, মারকিন, কেউ বাদ যায়নি; কিন্তু ছায়ার মতো একেক জায়গায় সেই বোম্বেটে জাহাজ দেখা দিতো, অবাধে লুঠপাট

banglabooks.in

চালিয়ে পরক্ষণেই আবার কোথায় সেটা মিলিয়ে যেতো।

কিন্তু হঠাৎ-একদিন আকস্মিকভাবেই এই অরাজকতার শেষ হ'লো। কের কারাইয়ের কথা হঠাৎ-একদিন আর শোনা গেলো না। তাহ'লে কি প্রশান্ত মহাসাগর ছেড়ে অন্য-কোনো সমুদ্রে গিয়ে সে হাজির হয়েছিলো? তবে কি অন্য কোথাও বোম্বেটেগিরির উৎপাত শুরু হবে? যখন বেশ-কিছু দিন কেটে যাবার পরেও তার কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না তখন সবাই ধরে নিলে যে কের কারাইয়ে ও তার দলদল নিশ্চয়ই এখন এত লুঠপাটের ফলে যে কুবেরের ধন সংগ্রহ করেছিলো তাই ভোগ করছে। কিন্তু বোম্বেটেরা কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিলো? সব সন্ধানই বিফল হ'লো। সিন্ধুজল নিরাপদ হ'তেই লোকে আস্তে-আস্তে প্রশান্ত মহাসাগরের এই অশান্তির কথা ভুলে গেলো।

এ-সব কথা সবাই জানে। যদি কোনোদিনও ব্যাকাপ থেকে পালাতে না-পারি, তাহ'লে এর পরের ঘটনাটুকু হয়তো কোনোদিনই কেউ জানতে পাবে না।

লুঠপাট ক'রে অতুল ঐশ্বর্য পেয়েছিলো তারা। পশ্চিম প্রশান্ত সাগর ছেড়ে তারা নানা দিকে ছড়িয়ে পড়েছিলো—ঠিক ছিলো সবাই গিয়ে মারকিন মুলুকে জড়ো হবে। এনজিনিয়ার সেরকো ছিলো নিজের বিষয়ে মস্ত পণ্ডিত। কারিগরি বিদ্যায় তার সবিশেষ দক্ষতা ছিলো। ডুবোজাহাজ নিয়ে বিস্তর পড়াশুনো করেছিলো সে। সে-ই একদিন কের কারাইয়েকে একটা ডুবোজাহাজ বানাবার পরামর্শ দেয়—একটা ডুবোজাহাজ হাতে থাকলে কিছুতেই আর-কোনো ভয় থাকবে না তাদের। তক্ষুনি পরামর্শটা লুফে নিয়েছিলো কের কারাইয়ে। টাকার অভাব তাদের ছিলো না, তাই চটপট তারা কাজে লেগে গেলো।

গোটেনবুর্গ জেটিতে যখন কাউণ্ট দার্তিগাস নামে এক ভদ্রলোক 'এক্বা' নামে স্কুনার বানাবার হুকুম দিচ্ছিলেন, সেরকো ঠিক তখনই ফিলাডেলফিয়ার জাহাজ কারখানায় একটা ডুবোজাহাজ বানাবার প্ল্যান পাঠিয়েছিলো। সেখানে এই ডুবোজাহাজটা কারুই কোনো সন্দেহ উদ্রেক করেনি। কারণ জাহাজের প্ল্যানটা ছিলো সেরকোর, জাহাজটা বানানোও হচ্ছিলো সেরকোর তত্ত্বাবধানে, নৌবিদ্যার অত্যাধুনিক বিকাশকে পর্যন্ত তাতে কাজে লাগানো হচ্ছিলো। নবাবিষ্কৃত তড়িৎ-কোষ থেকে উদ্ভূত বিদ্যুৎশক্তি তার এনজিনকে বিপুল শক্তি দিয়েছিলো।

বলাই বাহুল্য কাউণ্ট দার্তিগাসই যে কের কারাইয়ে, এটা কেউ ধরতে পারেনি। বা কেউ বুঝতে পারেনি এনজিনিয়ার সেরকোই হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরের অশান্তির

banglabooks.in

ধনকুবের,তাঁর প্রমোদতরীতে ক'রে মারকিন মুলুকের বন্দরে-বন্দরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সেরকোর ডুবোজাহাজ তৈরি হবার এক বছর আগেই 'এব্বা' জলে ভেসেছিলো। ডুবোজাহাজটা শেষ হ'লো আঠারো মাসে। শেষ হবার পরেই এই নতুন পোতটি ডুবোজাহাজ নির্মাতাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিলো। বাইরে থেকে দেখে, ভেতরের ব্যবস্থা লক্ষ্য ক'রে, তার হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা, দৃঢ়তা, চটপট জলে ডুবে যাবার ক্ষমতা, তার স্বাচ্ছন্দ্য, আর প্রচণ্ড গতি দেখে সবাই মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো। যে-কোনো ডুবোজাহাজের চেয়ে সেটা ছিলো সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। প্রাথমিক কতগুলো পরীক্ষার পর ঘোষণা করা হ'লো অগুনতি মানোয়ারি জাহাজ, সদাগরি পোত ও প্রমোদতরীর মধ্যে চার্লস্টনের চার মাইল দূরে খোলা সমুদ্রে সর্বসমক্ষে জাহাজটিকে চালিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখা হবে।

'এব্বা'ও ডুবোজাহাজের কেরামতি দেখবার জন্য সেখানে হাজির হয়েছিলো। কাউন্ট দার্তিগাস ছাড়া 'এব্বা'য় হাজির ছিলো সেরকো, স্পেড ও অন্যান্য মাল্লারা— কেবল ছ-জন ছিলো ডুবোজাহাজে, তারাই ডুবোজাহাজ চালাবে; তাদের সঙ্গে ছিলো গিবসন নামে একজন যন্ত্রবিৎ, ভারি চালাক মানুষ এই ইংরেজ, রগরগে সব অভিযানের নেশা তাকে ছেলেবেলা থেকেই পেয়ে বসেছিলো।

ঠিক ছিলো ডুবোজাহাজটি কয়েকবার জলের উপরে ভেসে বেড়াবে, তারপর কয়েক ঘণ্টা জলের নিচে ঘুরে বেড়িয়ে বারদরিয়ায় কয়েক মাইল দূরে একটা বয়ার কাছে ভেসে উঠবে, আর তাহ'লেই বোঝা যাবে যে জাহাজটি পরীক্ষায় পাশ করেছে।

যাত্রার সময় এগিয়ে এলো। ওঠা-নামার খুলঘুলিটা বন্ধ ক'রে ফেলা হ'লো, তারপর ডুবোজাহাজটা জলের উপরে ভেসে-ভেসে এমন সব কসরৎ দেখালে যে সবাই তারিফ না-ক'রে পারলে না। পরে 'এব্বা' থেকে একটা সংকেত করা হ'তেই জাহাজটা আস্তে-আস্তে ডুবে যেতে লাগলো, ক্রমে দৃষ্টি থেকে মিলিয়ে গেলো। যেখানে তার ভেসে-ওঠবার কথা, সেখানে আগেভাগেই কতগুলো জাহাজ গিয়ে হাজির হ'য়ে ছিলো। কেটে গেলো এক, দুই, তিন ঘণ্টা— কিন্তু ডুবোজাহাজটা আর জলের উপর ভেসে উঠলো না। ভেসে উঠলো না বটে, কিন্তু এটা কেউই জানতে পেলে না যে কাউন্ট দার্তিগাস আর এনজিনিয়ার সেরকোর মধ্যে আগে থেকেই শলাপরামর্শ হ'য়ে আছে যে এই গোপন স্কুনার-টানা ডুবোজাহাজ নির্দিষ্ট স্থান থেকে আরো কয়েক মাইল দূরে গিয়ে ভেসে উঠবে। যারা এই গোপন চক্রান্তের শরিক, তারা ছাড়া সবাই ভাবলে যে

banglabooks.in

জাহাজের হালে বা কলকব্জায় নিশ্চয়ই একটা বিষম গলতি ছিলো, তারই ফলে তার সলিল সমাধি হয়েছে। 'এব্বা' জাহাজের উপরে একটা চমৎকার শোকান্তিক নাটকের অভিনয় হ'য়ে গেলো—অন্য জাহাজগুলো অবশ্য অভিনয় করলে না, তারা সত্যিই দুঃখিত হয়েছিলো। তক্ষুনি জলের তলায় খোঁজ-খোঁজ রব প'ড়ে গেলো। ডুবুরিরা দীর্ঘস্থায়ী ডুব দিলে। চারদিক তোলপাড়। কিন্তু সব সন্ধানই বিফল হ'লো: অতলান্তিকের বিপুল জলই যে এই নতুন আবিষ্কারটিকে গিলে খেয়েছে, এ-বিষয়ে কারু আর-কোনো সন্দেহ রইলো না।

দু-দিন পরে কাউণ্ট দার্তিগাস বেরুলেন সাগর-পাড়িতে; এবং তারও আট-চল্লিশ ঘণ্টা পরে পরিকল্পনানির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তিনি এই স্কুনার টানা ডুবো-জাহাজের সন্ধান পেলেন। এইভাবেই কের কারাইয়ে স্কুনার চালাবার ও বিপন্ন জাহাজকে আক্রমণ করার একটা চমৎকার ব্যবস্থা ক'রে নিলে। এই বিষম বিধ্বংসী জাহাজের অস্তিত্বও কেউ কখনো কল্পনা করেনি, কাজেই অচিরেই কাউণ্ট দার্তিগাস নিজেকে এক যুগপৎ নিশ্চিন্ত ও উদ্ধত অবস্থায় আবিষ্কার করলেন।

এ-সব খুঁটিনাটি আমি পরে সেরকোর মুখে শুনেছিলুম। তার আবার অহংকার বড্ড, পুরো পরিকল্পনাটা তারই তো উর্বর মগজে গজিয়েছিলো। আর ব্যাকাপের বন্দী যেহেতু কোনোদিনই পালাতে পারবে না, কাজেই তার কাছে কিছু লুকিয়ে রাখার কোনোই মানে হয় না, বিশেষত যেখানে জাঁক দেখাবার সুযোগ আছে।

কের কারাইয়ে যে কী-বিষম বিধ্বংসী ক্ষমতা হাতে পেয়েছে, তা অনুমান করতে মুশকিল হয় না। রাত্তিরে ডুবোজাহাজ গিয়ে একেকটা জাহাজকে আক্রমণ করে: নিরীহ প্রমোদতরীকে যারা কক্‌খনো সন্দেহ করেনি তারা ছ্যাখে যখন ডুবোজাহাজের আক্রমণে জাহাজ বেসামাল, তখনই হঠাৎ 'এব্বা' এসে পাশে দাঁড়ায়, খুনজখম লুঠপাট চলে অবাধে, আর একের পর এক জাহাজগুলো বারদরিয়া থেকে রহস্যময়ভাবে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়।

চার্লসটন উপসাগরের সেই জঘন্য প্রহসনের পর এক বছরের মধ্যেই কের কারাইয়ের উৎপাতে মারকিন মুলুকের অতলান্তিক সাগরে ধুন্ধুমার বেধে গেছে। জাহাজের পর জাহাজ ডুবেছে আর জলদস্যুদের রত্নগুহা বিস্ফারিত হয়েছে। যে-সব পণ্য কের কারাইয়ের নিজের কাজে লাগে না, সে-সব সে বেচে দেয় দূর বিদেশে, কাজেই সোনারুপোতেই তার ধনভাণ্ডার ক্রমশ ভ'রে গেছে। কিন্তু তখনও জলদস্যুদের এমন-কোনো গোপন আশ্রয় জোটেনি যে সব ধনরত্ন তারা নিরাপদে রাখবে।

banglabooks.in

দৈবই তাদের এই গোপন আশ্রয় জুটিয়ে দিলে। বারমুডার সিন্ধুতলে সন্ধান চালাবার সময়েই একদিন সেরকো আর গিবসন ব্যাকাপে ঢোকবার এই সুড়ঙ্গটি আবিষ্কার ক'রে ফ্যালে। আর-কোনখানেই বা কের কারাইয়ে এত নিরাপদ আশ্রয় পেতো ? কেউ-যে এখানে লুকিয়ে আছে তা তো কাকপক্ষীতেও টের পাবে না। এইভাবেই বারমুডার একটা দ্বীপ অতীতের মতোই আবার এক বোম্বেটেদের ঘাঁটি হ'য়ে উঠলো।

এখানেই আশ্রয় নেবেন, এটা ঠিক করবামাত্র কাউন্ট দাতিগাস সদলবলে এই বিশাল ছাতের তলায় এসে জড়ো হলেন। এনজিনিয়ার সেরকো চটপট এখানে একটি বিদ্যুৎ তৈরির কারখানা তৈরি ক'রে ফেললে : বিদেশ থেকে ভারি-ভারি কলকব্জা আনলে, লোকের চোখে প'ড়ে যাবার ভয় ছিলো ব'লে কেবল কতগুলো তড়িৎকোষ বা ব্যাটারি বসানো হ'লো : তড়িৎকোষ বানাতে লাগে কেবল ধাতুর পাত আর কয়েক রকম রাসায়নিক দ্রব্য—'এব্বা' সে-সব সহজেই মারকিন মুলুক থেকে আমদানি ক'রে আনলে।

১৯-২০র রাত্তিরে কী ঘটেছিলো, সেটা এখন সহজেই বোঝা যায়। হাওয়ার অভাবে তিন মাস্তলের সেই জাহাজটি, কোথাও যেতে পারছিলো না, অথচ সকাল-বেলায় সেটাকে যে আমি আশপাশে কোথাও দেখতে পাইনি, তার রহস্য আর-কিছুই নয়, প্রথমে ডুবোজাহাজটা সেটাকে জখম ও বেশামাল ক'রে দেয়, তারপর 'এব্বা'র মাল্লারা লুঠপাট ক'রে সেটাকে ডুবিয়ে দেয়। পরের দিন সকালে আমি তারই মালপত্তর নিয়ে এদের সবাইকে শশব্যস্ত দেখেছিলুম।

কার হাতে এসে পড়লুম তবে শেষকালে ? এই রগরগে অভিযানের শেষই বা কী হবে ? তবে কি কোনোদিনও এই অদ্ভুত জেলখানা থেকে আমি পালাতে পারবো না ? কোনোদিনই কি এই ভুঁইফোঁড় কাউন্ট দাতিগাসের আসল পরিচয় কাউকে খুলে বলতে পারবো না ? কের কারাইয়ের বোম্বেটেদলের হাত থেকে কি তবে সমুদ্রের আর মুক্তি নেই ! একেই তো তার মতো দুর্দান্ত বেপরোয়া ও ভীষণ লোক আর দ্বিতীয় নেই, তার উপর রশ-ফুলগুরেটর হাতে পেলে আর কে তার সঙ্গে এঁটে উঠবে ? এমনকী কোনো মানোয়ারি জাহাজও তো তখন তার সঙ্গে মোটেই এঁটে উঠতে পারবে না ?

এ-সব ভাবনায় যে কতক্ষণ কেটে গিয়েছিলো, হিশেব নেই। ওই ভীষণ নামটা শোনবামাত্রই আমার যেন দফারফা হ'য়ে গিয়েছিলো ! যেন মন্ত্রবলে এই

banglabooks.in

ভেবেছিলো বুঝি অবশেষে তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে ! কিন্তু সম্প্রতি অতলান্তিকে পর-পর যে-জাহাজগুলো হারিয়ে গেছে, এখন আমি তার বিষম কারণ বুঝতে পারলুম।

'কের কারাইয়ে আর ব্যাকাপ,'—নিজেকে বললুম বারে-বারে, এখন সব জট খুলে গেছে। আর-কোনো খটকা নেই। কিন্তু সেরকো যে আমাকে তার নামটা ব'লে দিলে, সেটা নিশ্চয়ই কের কারাইয়ের বিনা অনুমতিতে নয়। তার মানে আমাকে বোঝাতে চাচ্ছে যে আমি যেন মিথ্যে আর মুক্তির আশা না-করি।

নামের প্রতাপ স্বচক্ষেই দেখেছিলো সেরকো। আমি কী-রকম আঁৎকে উঠেছিলুম, সেটা তার নজর এড়ায়নি। পরক্ষণেই সে তো হনহন ক'রে কের কারাইয়ের ডেরার দিকেই পা চালালো—তার মানে নিশ্চয়ই তাকে বলতে গেলো সেই মহাত্মনের নামের গুণে আমি কী রকম ভির্মি খেয়েছি !

হ্রদের পাশে অনেকক্ষণ পায়চারি করেছিলুম আমি। ফিরে আসবো ভাবছি, এমন সময় পিছনে তাকিয়ে দেখি কাপ্তেন স্পেড আর কাউন্ট দার্তিগাস। কাউন্ট আমার দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাতেই আমি বোমার মতো ফেটে পড়লুম: 'আপনি আমাকে জোর ক'রে এখানে আটক ক'রে রেখেছেন। এ-রকম জুলুম করার কোনো অধিকারই আপনার নেই ! যদি তমাস রশের শুশ্রূষা করার জন্যই আমাকে হেল্‌থফুল হাউস থেকে জবরদস্তি ধ'রে এনে থাকেন, তো জানবেন আমি কিছুতেই আর তাঁর শুশ্রূষা করবো না। আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন আপনি —এটা আমি দাবি করছি !'

দস্যুসর্দার কোনো কথা না-ব'লে চুপচাপ স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে রইলো।

আর আমি রাগ চাপতে পারলুম না: 'কী', কথার জবাব দিন—কাউন্ট দার্তিগাস। না কি কের কারাইয়ে ব'লেই ডাকবো এখন থেকে !'

সরল সোজা উত্তর এলো: 'কাউন্ট দার্তিগাসই কের কারাইয়ে—ঠিক যে-রকম গেডন নামক শুশ্রূষাকারীই হ'লো এনজিনিয়ার সিমোন আর্‌ৎ। সিমোন আর্‌ৎ যেহেতু সব গোপন কথাই জেনে গেছে, সেই জন্যে কের কারাইয়ে আর কোনোদিনই তাকে মুক্তি দেবে না।'

banglabooks.in

১১

পাঁচ সপ্তাহ

ব্যাস ! সব জট খুলে গেলো।

আমি-যে কে, তাহ'লে কের কারাইয়ে তা জানে ! তমাস রশ আর তার শুশ্রূষাকারীকে অপহরণ করার সময় থেকেই তা সে তবে জানতো। কিন্তু আন্ত হেল্‌থফুল হাউসের কাছে আমি যে-পরিচয় লুকিয়ে রেখেছিলুম, সে তা জানতে পেলে কী ক'রে ? তমাস রশের শুশ্রূষাকারী যে একজন ফরাশি এনজিনিয়ার, এই তথ্যটা সে পেলে কোথায় ? একটা হেঁয়ালি চুকলো বটে, কিন্তু এ-তো দেখছি আরেকটা ধাঁধা ! বোঝাই যাচ্ছে কাউন্টের বার্তাবিভাগ খুবই কাজের, নিশ্চয়ই এজন্যে তাঁকে বিস্তর অর্থ ব্যয় করতে হয়। অবশ্য শেষটায় অত টাকা খরচা ক'রেও তাঁর লাভই হয় ষোলো আনার উপর আঠারো আনা। আর তাছাড়া তাঁর মতো মানুষের পক্ষে কাজ হাসিল করার জন্য খোলামকুচির মতো টাকা ছড়ানো খুবই সম্ভব।

এখন থেকে তাহ'লে এই কের কারাইয়ে বা তার শাগরেদ এনজিনিয়ার সেরকোই আমার বদলে রশের দেখাশুনো করবে ? ওদের চেষ্টায় কি আমার চেয়ে বেশি কাজ দেবে ? রশ কি ওদের হাতে প'ড়ে সেরে উঠবেন ? ভগবান না-করুন, কিন্তু তাহ'লে সভ্য জগতের দুর্দশার সীমা থাকবে না।

কের কারাইয়ের শেষ কথার কোনো জবাবই আমি দিইনি। বন্দুকের গুলির মতো কথাগুলো আমার বুকে এসে বিঁধেছিলো। তথাকথিত কাউন্ট দার্তিগাস হয়তো ভেবেছিলেন ও-কথা শুনেই আমি ধরণীতলে ধপাৎ পড়বো আর মরবো, কিন্তু তা হ'লো না। বরং তাঁর জলন্ত চোখের দিকে সরাসরি তাকালুম আমি। তিনি অবশ্য চোখ নামালেন না বা পলকও পড়লো না। আমিও তাঁরই মতো বুকের উপর হাত ভাঁজ ক'রে রেখেছিলুম। কিন্তু তবু তিনিই এখন আমার দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা। কেবল একটা ইঙ্গিত, অমনি পিস্তলের গুলি আমার ফুশফুশ ফুটো ক'রে দেবে। তারপর আমার মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলা হবে হ্রদে ; সুড়ঙ্গের মধ্যে ভাসতে-ভাসতে সেটা গিয়ে অবশেষে পৌঁছবে স্বাধীন সমুদ্রে।

সেই দৃশ্যের পরেও অবিশ্যি আগের মতোই চলাফেরা করতে পারছিলুম আমি। আমার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই অবলম্বন করা হয়নি। এমনকী গহ্বরের সেই

banglabooks.in

স্তম্ভ অরণ্যের শেষ মাথা অব্দি যেতে পারি আমি, কেউ বাধা দেয় না। অবশ্য সেখানে পালাবার কোনোই রাস্তা ছিলো না—তাই বাধা দেবার চেষ্টা করাটাই নেহাৎ ঝামেলা বাড়ানো—বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগের উপায় ছিলো একমাত্র সুড়ঙ্গটাই।

তবে আমিই যে সিমোন আর্‌ৎ এটা কের কারাইয়ের অজ্ঞাত না-রইলেও ব্যাকাপের অবস্থান যে আমার কাছে লুকোনো নেই, এটা নিশ্চয়ই এখনও সে টের পায়নি। মৌচাকের শেষ মাথায় নিজের কোঠায় ফিরে যেতে-যেতে তা-ই ভাব-ছিলুম, আমার আসল পরিচয় জানে ব'লে সে নিশ্চয়ই কিছুতেই তমাস রশকে আমার হাতে ছেড়ে দেবে না। ভারি খারাপ লাগলো। এই খ্যাপা বৈজ্ঞানিকের উপর যে বিষম চাপ দেয়া হবে, সেটা ভাবামাত্র ফলাফল কল্পনা ক'রে আমি শিউরে উঠলুম। সেরকো নিশ্চয়ই ছলে-বলে-কৌশলে ওই বিস্ফোরক তৈরির সূত্রটা জেনে নেবার চেষ্টা করবে, যাতে ভবিষ্যতে জলদস্যুতার সময় তাকে জঘন্য-ভাবে কাজে লাগাতে পারে। হ্যাঁ, হেল্‌থফুল হাউসের মতো এখানেও যদি তমাস রশের শুশ্রূষার ভার আমার উপরে থাকে, তাহ'লেই সব দিক থেকে ভালো।

এর পরের পক্ষকালের মধ্যেও একবারও আমার সঙ্গে আগেকার রোগীর দেখা হ'লো না। রোজ আমি হেঁটে বেড়াই ইচ্ছেমতো, কেউ বাধা দেয় না। এমনিতে আমার কোনো কষ্টও নেই। খাবারদাবার ভালো, কাঁটায়-কাঁটায় পাওয়া যায়। আমার অবশ্য খাওয়া-দাওয়া নিয়ে খুব বাছবিচার নেই, মোটামুটি সুস্বাদু হ'লেই হ'লো—কাজেই এ-বিষয়ে আমার কোনো নালিশ ছিলো না।

ভাগ্যিশ এ-সব লম্বা অলস দিনগুলোয় আমার লেখার সুযোগের কোনো অভাব ছিলো না। কাজেই হেল্‌থফুল হাউস ছেড়ে দেবার পর থেকে আমার নোটবইতে এমনকী অতিতুচ্ছ খুঁটিনাটিও লিখে রাখতে পারছিলুম। রোজ কিছু-না-কিছু লিখে রাখি। যতক্ষণ না আমার হাত থেকে এরা কলম ছিনিয়ে নিচ্ছে, ততক্ষণ তা-ই ক'রে যাবো। হয়তো ভবিষ্যতে এই লেখা থেকেই ব্যাকাপের জটিল রহস্য উদ্‌ঘাটিত হবে।

+

৫ থেকে ২৫ জুলাই

দু-সপ্তাহ কেটে গিয়েছে, অথচ যতবারই তমাস রশের কাছাকাছি আসবার চেষ্টা করেছি, ততবারই বিফল হয়েছি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে আমার কাছ থেকে তাঁকে দূরে সরিয়ে রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে—কিছুতেই আমি যাতে তাঁকে প্রভাবিত

banglabooks.in

করতে না-পারি, সেই জন্যই এত কড়াকড়। আমার একমাত্র ভরশা হচ্ছে যে রশ-ফুলগুরেটরের সূত্র বার করার জন্য কাউণ্ট দাতিগাস, এনজিনিয়ার সেরকো আর কাপ্তেন স্পেড-এর যাবতীয় চেষ্টাই ব্যর্থ হবে—সময় ও চেষ্টার অপচয়ই হবে তাতে কেবল।

আমি নিজেই দেখেছি অন্তত তিন-চারবার রশ সেরকোর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে হ্রদের ধারে পায়চারি করছেন। দূর থেকে দেখে মনে হ'লো যে এই আলাপশালাপের মধ্যে রশ শ্রোতা আর সেরকো বক্তা। সেরকো তাঁকে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে আস্ত গহ্বরটা দেখিয়েছে, তাঁকে নিয়ে গেছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, দেখিয়েছে সেই স্কুনারটানা ডুবোজাহাজের সব খুঁটিনাটি ও কলকব্জা।···হেল্‌থফুল হাউসে রশের মন-মেজাজ যে-রকম ছিলো, এখন তার চাইতে অনেক ভালোই দেখাচ্ছে।

কের কারাইয়ের বাড়িরই একটা কোঠায় একা থাকেন রশ। আমার অবিশ্যি সন্দেহ নেই যে সারাক্ষণই কেউ-না-কেউ তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছে, বিশেষ ক'রে সেরকো। রশ যদি এখনো টাকাকেই মূল্যবান ব'লে ভাবেন, রশ তাঁর আবিষ্কারের জন্য যত টাকা চান, এবং তা-ই যদি এরা দিতে রাজি যাকে, তাহ'লে তিনি কি প্রলোভন ঠেকাতে পারবেন? এত বছর ধ'রে লুটপাট ক'রে এরা যত সোনা জমিয়েছে, সব তাঁকে উজাড় ক'রে দেখালে তো রশের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে!··· এ-রকম মানসিক অবস্থায় তিনি কি ফুলগুরেটর বানাবার সূত্রটা ফাঁস ক'রে দেবেন না? রাসায়নিক পদার্থগুলো ব্যাকাপে আনলেই হ'লো, বাস্, তারপর তো তিনি ইচ্ছেমতো নিজের গবেষণা নিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারবেন। আর ওই ক্ষেপণাস্ত্র? কোনো মারকিন কারখানায় সেগুলো বানাবার হুকুম দিলেই হয়—আর নয়তো কারু সন্দেহ না-জাগিয়েই নানা জায়গা থেকে নানা অংশ বানিয়ে আনা যায়। যখনই ভাবি যে দস্যুদের হাতে কী বিষম মারণাস্ত্র গিয়ে পড়ছে, তক্ষুনি আমার গায়ের লোম খাড়া-খাড়া হ'য়ে যায়!

আর এই অলুক্ষুনে আশঙ্কা আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও শান্তি দিচ্ছিলো না। আমার ভিতরটা কুরে-কুরে খাচ্ছিলো এই অমঙ্গলবোধ, আর শরীর ভেঙে পড়ছিলো। ব্যাকাপের ভিতরে খোলা হাওয়া যথেষ্টই আছে, তবু মাঝে-মাঝে আমার যেন দমবন্ধ হ'য়ে যেতে চাইতো। এই অতীব পুরু দেয়ালগুলো যেন বিপুল ভার নিয়ে আমাকে পিষে মারতে চাচ্ছে। জগৎ থেকে আমি বিচ্ছিন্ন—যেন অন্য কোনো গ্রহে আছি—কোথায় কী হচ্ছে না-হচ্ছে কিছুই জানি না! হ্রদের উপরেই হাঁ

banglabooks.in

ক'রে আছে উপুড় পেয়ালার তলা (ওরোফে শীর্ষদেশ)—ঈশ, যদি সেই ফোকর দিয়েই পালিয়ে যেতে পারতুম !

হঠাৎ ২৫ জুলাই সকালবেলায় রশের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে গেলো। তিনি বসেছিলেন হ্রদের অন্য তীরে, একাই—গত রাত্রে কের কারাইয়ে, সেরকো বা স্পেন্ডকে দেখিনি—হয়তো তারা কোনো 'অভিযানে' বেরিয়েছে, আর রশকে নজরবন্দী রাখার কেউ নেই। চটপট তাঁর পাশে চ'লে গেলুম আমি ; আমার উপস্থিতি তিনি টের পাবার আগেই তাঁকে মনোযোগ দিয়ে লক্ষ ক'রে দেখলুম। চিন্তিত ও ব্যাকুল দেখাচ্ছে তাঁকে, মোটেই আর খ্যাপা মানুষ ব'লে মনে হচ্ছে না ; নত মুখে আস্তে হাঁটছেন, বগলে একটা ছোট্ট ড্রয়িংবোর্ডে এক পাতা কাগজ শাঁটা, তার উপর কী-কতগুলো নকশা। হঠাৎ চোখ তুলে তাকিয়েই তিনি আমায় দেখতে পেলেন। দেখেই চিনতে পারলেন। এক পা এগিয়ে এসে বললেন : 'আরে ! গেডন, তুমি ! যাক্, শেষকালে তোমার হাত এড়িয়ে আসতে পেরেছি। এখন বাপু আমি স্বাধীন !'

স্বাধীন ব'লেই ভাবতে পারতেন তিনি নিজেকে—ব্যাকাপে তিনি হেল্‌থফুল হাউসের চেয়ে বেশি স্বাধীন তো বটেই। কিন্তু আমাকে দেখে হয়তো তাঁর বিরূপ ও বিরস স্মৃতি জেগে উঠছে, হয়তো আবার খ্যাপামির ধাক্কা আসতে পারে—আর তাইতেই আমি ভারি বেকায়দায় প'ড়ে গেলুম। ঠিক কী করা উচিত, বুঝতে পারছিলুম না।

'তুমিই তো, গেডন ! খবরদার, আমার কাছে এসো না—কিছুতেই না—আবার তুমি আমাকে পাকড়াতে এসেছো, ভেবেছো আবার আমায় নিয়ে গিয়ে জেল-খানায় পুরবে ! উঁহু, কিছুতেই না ! এখানে আমার অনেক বন্ধু আছে, তারাই আমাকে রক্ষা করবে। ভীষণ ক্ষমতা তাদের, তাছাড়া মস্ত বড়োলোক ! কাউণ্ট দাতিগাসই আমার পৃষ্ঠপোষক। আর এনজিনিয়ার সেরকো হ'লো আমার শরিক। এখানেই আমার রশ-ফুলগুরেটর বানিয়ে নেবো। তুমি এখান থেকে কেটে পড়ো —যাও, কেটে পড়ো !'

সত্যিকার একটা খ্যাপামির চোট ! যতই গলা চড়ছে, ততই হাত-পা নাড়ছেন, ক্ষিপ্তভাবে পকেট থেকে বার ক'রে আনছেন মুঠো-মুঠো ব্যাঙ্কনোট আর কাগজের ডলার। তারপর পকেট থেকে বার ক'রে আনলেন সোনার টাকা—ইংল্যাণ্ডের, ফরাশি দেশের, আমেরিকার, আলেমানদের—সব তিনি ছড়াতে লাগলেন নিজের চারপাশে। কোথেকে এত টাকা পেলেন রশ ? নিশ্চয়ই কের

banglabooks.in

কারাইয়ের কাছ থেকে—রশ-ফুলগুরেটরের নির্মাণসূত্র ব'লে দেবার দাম !

তাঁর রুষ্ট ও ক্ষিপ্ত চীৎকার শুনে ততক্ষণে কিন্তু কয়েকটা লোক ছুটে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। তারা নিশ্চয়ই এতক্ষণ কাছেই কোথাও দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করছিলো। তমাস রশকে জাপটে ধ'রে তারা সরিয়ে নিয়ে গেলো। আমি চোখের আড়াল হ'য়ে যেতেই রশ কিন্তু আবার শান্ত হ'য়ে গেলেন—দেহে বা মনে, কোথাও খ্যাপামির কোনো চিহ্নই আর রইলো না।

+

২৭ জুলাই

আজ সকালে সেই পাথরের থামগুলোর একেবারে শেষ অব্দি গিয়েছিলুম আমি।

পাথরের গায়ে যেখানে স্কুনারটানা ডুবোজাহাজটা থাকতো সেখানে সেটা ছিলো না—হ্রদের কোথাও সেটাকে দেখতে পাইনি। আগে যে ভেবেছিলুম কের কারাইয়ে আর সেরকো বুঝি ডুবোজাহাজে ক'রে কোথাও গেছে, তা কিন্তু অথচ ঠিক নয়, কারণ কাল রাতেই তাদের এখানে দেখেছি। অবিশ্যি আজ ভোরেই যে কাপ্তেন স্পোড ও মাল্লাদের নিয়ে তারা বেরিয়ে পড়েছে, সে-রকম ভাবার যথেষ্ট কারণ আছে। পরে নিশ্চয়ই খাড়ি থেকে স্কুনারটা নিয়ে গিয়ে তারা রওনা দিয়েছে —হয়তো এই মুহূর্তে 'এব্বা' বারদরিয়ায় তরতর ক'রে ভেসে যাচ্ছে।

আবার কোনো দস্যুতার মৎলবে নাকি ? হয়তো ; কিন্তু এটাও সম্ভব যে কের কারাইয়ে—প্রমোদতরীতে যার পরিচয় কাউণ্ট দার্তিগাস—রশ-ফুলগুরেটর বানাবার জিনিশপত্তর কিনতেই কাছে কোথাও গেছে। একবার যদি ডুবো-জাহাজটার মধ্যে লুকিয়ে থাকবার সুযোগ পেতুম, তাহ'লে অলক্ষিতে 'এব্বা'র খোলে গিয়েও লুকিয়ে থাকা যেতো ; তারপর বন্দরে গিয়ে ভিড়লেই 'এব্বা' থেকে সটান লম্বা দিয়ে জগৎকে এই দস্যুদের কথা জানিয়ে দিতে পারতুম ! একগুঁয়ের মতো এই ভাবনাটাই ফিরে-ফিরে আমাকে পেয়ে বসে—পালাতে হবে, এই ডেরা থেকে যে-ক'রেই হোক চম্পট দিতে হবে। কিন্তু পালাতে গেলেই তো জলের তলার সুড়ঙ্গটা পেরুতে হবে—আর সেই ডুবোজাহাজ ছাড়া সেটা কী ক'রে সম্ভব ?

এ-সব ভাবনায় আমি যখন বিমর্ষ ও ব্যাকুল হ'য়ে আছি, তখন জেটি থেকে প্রায় চল্লিশ হাত দূরে হ্রদের জল তোলপাড় হ'য়ে উঠলো ও ভুউশ ক'রে ডুবো-জাহাজটি ভেসে উঠলো। তক্ষুনি খুলে গেলো পাটাতনের ঘুলঘুলি, আর সদলবলে উপরে উঠে এলো গিবসন। অন্যরা পাথরের ফাঁকে-ফাঁকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিলো নোঙরের দড়িটা ধরবার জন্য ছুঁড়ে মারতেই তারা দড়িটা লুফে নিয়ে ডুবো-

banglabooks.in

জাহাজকে টেনে নিয়ে এলো।

এবার তাহ'লে ডুবোজাহাজের সাহায্য ছাড়াই 'এব্বা' চলেছে। ডুবোজাহাজটা কেবল কের কারাইয়ে ও তার সঙ্গীদের স্কুনারে তুলে দিতে গিয়েছিলো। তাহ'লে আমার সন্দেহটাই ঠিক। কাউন্টের উদ্দেশ্য হ'লো একটা মারকিন বন্দর থেকে বিস্ফোরকের জন্য জরুরি জিনিশগুলো কিনে আনা আর কোনো কারখানায় ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির হুকুম দেয়া। তারপর যেদিন স্কুনারের ফেরবার কথা, ডুবো-জাহাজটা আবার সুড়ঙ্গ পেরিয়ে বাইরে যাবে, ও কের কারাইয়েদের সবাইকে আবার এই উপুড় পেয়ালায় নিয়ে আসবে।

তাহ'লে আমি যা ভেবেছিলুম, তার চেয়েও তাড়াতাড়ি ঘটনাগুলো এগুচ্ছে।

কী সর্বনাশ!

+

৩ আগস্ট

আজ হ্রদের মধ্যে একটা তাজ্জব ব্যাপার ঘ'টে গিয়েছে। কেবল যে অপ্রত্যাশিত ছিলো তা-ই নয়, ভারি দুর্লভ ব্যাপারও বটে।

বেলা তিনটে নাগাদ হঠাৎ মিনিট খানেকের জন্য হ্রদের জল তোলপাড় হ'য়ে গেলো, যেন তলায় কোনো দারুণ হুলুস্থুল চলেছে, তারপর দু-তিন মিনিট সব চুপচাপ, তারপর আবার হ্রদের মাঝখানে সেই রকম জলের আছড়ানি।

এই দুর্বোধ্য ব্যাপারটা দস্যুদেরও অনেকের চোখে পড়েছিলো। খানিকটা অবাক হ'য়ে ও খানিকটা ভয় পেয়ে তারা গিয়ে হ্রদের পাশে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। না, ডুবোজাহাজ নয়, সেটা-তো তীরে ভেড়ানো, জেটিতে নোঙর বাঁধা। আরেকটা ডুবোজাহাজ হঠাৎ সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে এখানে ঢুকে পড়েছে, এটাও তেমন সম্ভব মনে হয় না। তাহ'লে?

হঠাৎ এমন সময় অন্য তীর থেকে ভারি-একটা শোরগোল উঠলো। কেউ-কেউ কী-একটা দুর্বোধ ভাষায় কী-সব যেন জিগেশ করলে, তারপর কাটা-কাটা কয়েকটা কথার পর একদল লোক হুড়মুড় ক'রে মৌচাকে ফিরে গেলো।

জলের তলায় কোনো অতিকায় সামুদ্রিক প্রাণী দেখেছে নাকি তারা, কোনো ভীষণ সিন্ধুদানব? অস্ত্রশস্ত্র আনতে গেলো ভিতরে? জন্তুটাকে জল থেকে তুলে নিয়ে ধরতে চায় তারা?

ঠিকই ভেবেছিলুম। মিনিটখানেক পরেই দেখি আবার সবাই উত্তেজিত ও ক্ষিপ্র পায়ে ছুটে আসছে, হাতে বন্দুক আর হারপুন।

banglabooks.in

একটা তিমি আসলে—বারমুডার একটা তিমিঙ্গিল। কেমন ক'রে যেন সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ভিতরে চুকে পড়েছে, আর এখানে জলের মধ্যে ল্যাজ আছড়াচ্ছে। তাহ'লে কি তিমিমারা জাহাজ তাড়া করেছে এটাকে—না-হ'লে এটা কেন হঠাৎ এই উপুড় পেয়ালার মধ্যে আশ্রয় নিতে আসবে?

তিমিঙ্গিলটা কয়েক মিনিট পরেই জলের উপর ভেসে উঠলো। পিছল সবুজ তার অতিকায় পিঠ, সারা গা মোচড়াচ্ছে, ল্যাজ ঝাপটাচ্ছে—যেন কোনো দুর্ধর্ষ শত্রুর সঙ্গে লড়াই করছে। আবার যখন তিমিঙ্গিলটা ভেসে উঠলো তখন স্তম্ভের মতো দুটি জলের ধারা ছিটিয়ে দিলো সে।

'তিমিশিকারীদের খপ্পর থেকে বাঁচবার জন্যেই যদি তিমিটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ছুটে এসে থাকে,' নিজেকে আমি বোঝালুম, 'তাহ'লে নিশ্চয়ই ব্যাকাপের আশপাশে কোথাও কোনো জাহাজ ঘুরে বেড়াচ্ছে—হয়তো তীর থেকে একটু দূরেই সেটা ঘোরাফেরা করছে। হয়তো পশ্চিমের খাড়ি দিয়ে জাহাজের নৌকোগুলো দ্বীপের দিকেই এগিয়ে এসেছে। অথচ আমি কিনা কিছুতেই তাদের কাছে পৌঁছুতে পারছি না! তা-ই যদি হয়, তাহ'লে ব্যাকাপের এই পাথুরে পাঁচিল পেরিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করতে পারি না?'

তিমিঙ্গিলের আকস্মিক আবির্ভাবের কারণটা বার করতে অবিশ্যি বেশি দেরি হ'লো না। না, তিমিশিকারীরা ওকে তাড়া করেনি, ওকে তাড়া করেছে একদঙ্গল হিংস্রভীষণ হাঙর—এখানকার জলে যাদের বিষম প্রাদুর্ভাব। টলটলে জলের মধ্যে স্পষ্টই হাঙরগুলোকে দেখতে পাচ্ছিলুম: পাঁচ-ছটা হাঙরের শাদা পেট আর হিংস্র বুভুক্ষু দাঁত দেখা যাচ্ছে। লাফিয়ে পড়ছে তারা বারে-বারে তিমিটার উপর, আর ওই মস্ত সবুজ পিছল নিরীহ মাছটি কেবল ল্যাজের ঝাপটেই নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। এর মধ্যেই তার গায়ে জায়গায়-জায়গায় মাংস খুবলে নিয়েছে হাঙরগুলো; তিমিটা যতবারই ডুবছে আর ভাসছে, হ্রদের জলে লাল ছোপ লেগে যাচ্ছে রক্তের।

কিন্তু হাঙরগুলোকে আর এই অসমান লড়াইয়ে জিততে হয় না। তাদের শিকার একেবারে গ্রাস থেকেই পালিয়ে যাবে, কারণ সশস্ত্র মানুষ হচ্ছে হাঙরদের চেয়েও দুর্ধর্ষ ও পরাক্রান্ত। তীরেই দাঁড়িয়ে আছে কের কারাইয়ের অনুচরেরা, সিন্ধু-নেকড়েদের চেয়ে তারা মোটেই কম নয়। তারাই বরং তিমিটাকে দখল করার চেষ্টা করবে—একটা আস্ত তিমি ব্যাকাপের বাসিন্দাদের কাছে যে খুবই দামি,

banglabooks.in

কাউণ্ট দার্তিগাসের সেই মালয় অনুচরটি জেটিতে আরো-কয়েকটি দস্যুর সঙ্গে দাঁড়িয়েছিলো। লম্বা একটা দড়ি ও একটা হারপুন তার হাতে—তিমিটা কাছে এগিয়ে আসতেই দক্ষ ও সবল হাতে সে হারপুনটা ছুঁড়ে মারলে। ঠিক বাম পাখনার কাছে গিয়ে বিঁধলো হারপুনটা, আর তিমিটা, ঘা খেয়েই, প্রচণ্ড বেগে জলের নিচে ডুব মারলে। বেগে পঞ্চাশ-ষাট গজ পর্যন্ত দড়ি বেরিয়ে এলো—এবারে তিমিটা যখন শেষ নিশ্বাস ফেলবার জন্যে জলের উপর ভেসে উঠবে, তখন তাকে টেনে আনলেই, বাস, কেল্লা ফতে!

মালয়টি আর তার সঙ্গীরা বেশ সাবধানে কাজ করছে, যাতে হারপুনটা তিমির গা থেকে খ'সে না-পড়ে। তিমিটা শিগগিরই সুড়ঙ্গের ঠিক মুখটায় আবার ভেসে উঠলো। মরণান্তিক ঘা খেয়েছে. মরবার আগে কী-ভয়ানক ছটফট করছে তিমিটা, রক্তের ছিটে-লাগা জলের স্তম্ভ উগরে দিচ্ছে সে শেষ মুহূর্তে। হাঙরগুলো ছেঁকে ধরেছে তাকে, শেষবার সে ল্যাজ ঝাপটালে সজোরে, একটা হাঙর পাথরের গায়ে ছিটকে প'ড়ে ম'রে গেলো—আর এই ল্যাজের ঝাপটাতেই হারপুনটা হঠাৎ খ'সে পড়লো।—তক্ষুনি তিমিটা আবার জলের তলায় মিলিয়ে গেলো। আবার যখন তিমিটা ভেসে উঠে ল্যাজ আছড়ালে, তখন এত জোরে জল ছিটকে গেলো যে সুড়ঙ্গের মুখটা অব্দি স্পষ্ট দেখা গেলো। হাঙরগুলো আবার গিয়ে তাঁকে ছেঁকে ধরলে, কিন্তু তক্ষুনি তীর থেকে অনেকগুলো পিস্তল গ'র্জে উঠলো—কতগুলো হাঙর গুলি খেয়ে অক্কা পেলে, বাকিগুলো ভেগে পড়লো।

আবার কি হাঙরগুলো ব্যাকাপ থেকে বেরিয়ে যাবার পথটা বার করতে পারবে, যাতে খোলা সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে? পারবে নিশ্চয়ই, কিন্তু আগামী কয়েকদিন হ্রদে স্নান করা মোটেই নিরাপদ হবে না। তিমিটাকে দখল করবার জন্যে ততক্ষণে দুটি লোক নৌকো ক'রে বেরিয়ে পড়েছে। তারা যখন তিমিটাকে জেটির কাছে নিয়ে এলো, তখন সেই মালয় সেটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে কেটে ফেললে! এমন অভ্যস্ত হাতে সে কুড়ুল চালালে যে বোঝা গেলো এ-কাজে সে মোটেই নবিশ নয়।

পশ্চিমের দেয়ালে ঠিক কোনখানে যে সুড়ঙ্গের মুখ, সেটা কিন্তু আমি এখন সঠিক জেনে গিয়েছি। জলের তিন-চার গজ নিচেই সুড়ঙ্গের মুখটা।

কিন্তু জেনেই বা আমার কী লাভ?

+

৭ আগস্ট

banglabooks.in

বারো দিন হ'য়ে গেলো এনজিনিয়ার সেরকো ও কাপ্তেন স্পেডকে নিয়ে কাউণ্ট দার্তিগাস সাগরপাড়ি দিতে বেরিয়েছেন, কিন্তু এখনও তাদের ফেরবার কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না। অথচ ডুবোজাহাজটা দেখছি পাড়ি দেবার জন্য তৈরি ; গিবসন সবসময়েই তড়িৎকোষগুলো চার্জ ক'রে রাখে। যদিও প্রকাশ্য দিবা-লোকে মারকিন মুলুকের বন্দরে গিয়ে ভিড়বার কোনো বাধাই নেই 'এব্বা'র, তবু ব্যাকাপের খাড়িতে ঢুকতে সে নিশ্চয়ই রাতের অন্ধকারই পছন্দ করবে। ডুবোজাহাজের উপরে আজকের তোড়জোড় দেখে মনে হচ্ছে যে সম্ভবত আজ রাত্তিরেই 'এব্বা' ফিরে আসবে।

+

১০ আগস্ট

কাল রাত্তিরে আটটা নাগাদ ঠিক যেমন ভেবেছিলুম তেমনি হঠাৎ ডুবোজাহাজটা ডুব মেরেছিলো, তারপর সুড়ঙ্গ পেরিয়ে গিয়ে 'এব্বা'কে খাড়ির মধ্যে রেখে এসে যাত্রীদের নিয়ে এসেছে।

আজ সকালে বেরিয়েই দেখি হ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে রশ আর সেরকো কথা বলছে। কী নিয়ে তাদের এই কথাবার্তা, সেটা বুঝতে আমার বাকি ছিলো না। প্রায় কুড়ি পা দূরে দাঁড়িয়ে আমি আমার প্রাক্তন রোগীকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলুম।

জ্বলন্ত তাঁর চোখের তাড়া, মুখটা উজ্জ্বল—সেরকোর একেকটা কথার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গে একটা অস্থির উৎসাহ জেগে উঠছে। কিছুতেই স্থির থাকতে পারছিলেন না রশ, প্রায় যেন হুড়মুড় ক'রেই জেটির দিকে চ'লে গেলেন ডুবোজাহাজে ওঠবার জন্যে।

সেরকোও তাঁর অনুসরণ করলে। দুজনে গিয়ে জলের ধারে দাঁড়ালেন।

মাল্লারা মালপত্তর নামাতে ব্যস্ত। পাথরের উপরে ততক্ষণে তারা দশটা কাঠের বাক্স নামিয়েছে। বাক্সের গায়ে লাল-লাল হরফে কী-সব লেখা : রশ ব্যগ্রভাবে গিয়ে কী লেখা, তা পড়লেন।

সেরকো হুকুম দেবামাত্র মাল্লারা বাক্সগুলো বামতীরের ভাঁড়ার ঘরে নিয়ে গেলো। নৌকোয় ক'রেই গেলো তারা।

নিশ্চয়ই বাক্সগুলোয় বিস্ফোরক বানাবার রাসায়নিক দ্রব্য রয়েছে। ক্ষেপণাস্ত্র-গুলো বানাবার হুকুম নিশ্চয়ই কোনো মারকিন কারখানা পেয়েছে—বানানো হ'য়ে গেলেই স্কুনার গিয়ে সেগুলো নিয়ে আসবে।

banglabooks.in

তাহ'লে অন্তত একবার 'এব্বা' লুঠের মাল ছাড়াই দ্বীপে ফিরে এসেছে। কী-বিষম ধ্বংসের ক্ষমতা এবার দস্যুরা পাবে। রশের কথা বিশ্বাস করলে তো বলা যায় তাঁর বিস্ফোরকের প্রতাপে জগৎটাই একদিন ধ্বংস হ'য়ে যাবে! কে জানে কী হবে? একদিন তিনি যে খেপে গিয়ে সব উড়িয়ে দিতে চাইবেন না, তাই বা কে জানে?

১২

সেরকোর পরামর্শ

তমাস রশ আজকাল বামতীরের কারখানাতেই নিজের কাজে সারাদিন কাটিয়ে দেন! সে-কারখানায় তিনি ছাড়া আর-কেউ ঢোকে না। সেটাই তাঁর ল্যাবরেটরি। তবে কি একাই তিনি কাজ করতে চান? কাউকেই কি নিজের আবিষ্কারের গোপন কথা খুলে বলতে চান না রশ? হয়তো তাই। আমার ধারণা ফুলগুরেটর খুব সহজেই বানানো যায়: এ-রকম ক্ষেপণাস্ত্রর জন্য কামান বা বোমা-ছুঁড়িয়ে কোনো উৎক্ষেপক দরকার হয় না। স্বয়ংচল এই ক্ষেপণাস্ত্র নিজেরই উৎক্ষেপশক্তিতে চলে—এটা ছুঁড়লে, হাওয়ার মধ্যে যে-মস্ত আলোড়ন হবে তাতে-তো একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সব জাহাজেরই ভীষণ বিপদ উপস্থিত হবে। এ-রকম একটা ভয়ানক অস্ত্র হাতে পেলে কের কারাইয়ের সঙ্গে এঁটে উঠবে কে?

+

১১ থেকে ১৭ আগস্ট

সারা সপ্তাহ ধ'রে রশ একটানা অবিশ্রাম কাজ করেছেন। রোজ সকালে গিয়ে ল্যাবরেটরিতে ঢোকেন, গভীর রাত অব্দি সেখান থেকে আর বেরোন না। কাছে গিয়ে কথা বলবার লোভ যে ছিলো না তা নয়—কিন্তু বহু কষ্টে নিজেকে সামলে রেখেছি। নিজের কাজ ছাড়া আর সবকিছু সম্বন্ধেই তিনি পরম উদাসীন। মনে হয় পুরোমাত্রায় সুস্থ আছেন এখন। আর কেনই বা তাঁর মস্তিষ্ক সুস্থ ও সক্ষম থাকবে না? যা তিনি চাচ্ছিলেন, তা-ই তো হয়েছে। আর-তো তাঁর ক্ষিপ্ত

banglabooks.in

হবার কোনো কারণ নেই।

+

১৭ থেকে ১৮ আগস্ট

রাত একটার সময় বাইরে একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ শুনে ধড়মড় ক'রে জেগে উঠেছিলুম। ব্যাপক আক্রমণ করেনি তো কেউ? কাউণ্ট দার্তিগাসের স্কুনারটার স্বরূপ ফাঁস হ'য়ে গেছে না কি তা'হলে? তবে কি স্কুনারটার পিছু নিয়েছিলো কোনো গোয়েন্দা জাহাজ? তারা কি কামান-বন্দুক দেগে গোটা দ্বীপটাকেই উড়িয়ে দিতে চাচ্ছে? রশের বিস্ফোরক তৈরি হবার আগেই কি ন্যায়দণ্ড নেমে এসেছে এই বোম্বেটেদের উপর? মুহূর্তের মধ্যে এই ভাবনাগুলো আমার মাথার মধ্যে খেলে গেলো।

একটু পরে-পরেই নিয়মিতভাবে প্রচণ্ড সব বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছিলো। হঠাৎ আমার মনে হ'লো 'এক্সা' ধ্বংস হ'য়ে গেলে তো মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগা-যোগের সব উপায়ই বিচ্ছিন্ন হ'য়ে যাবে—কী ক'রে তখন এরা রশদ জোগাড় করবে?

এটা ঠিক যে ডুবোজাহাজটা মার্কিন উপকূলের কোথাও কাউণ্ট দার্তিগাসকে নামিয়ে দিয়ে আসতে পারবে, আর নতুন প্রমোদতরী কিনে নেবার টাকারও তাঁর অভাব নেই! কিন্তু কের কারাইয়ের হাতে রশ-ফুলগুরেটর পড়ার আগে ব্যাকাপ ধ্বংস হ'য়ে গেলে সম্ভবত সবদিক থেকেই ভালো।

দিনের আলো ফুটতেই আমি আমার কোঠা থেকে ছুটে বেরিয়ে এলুম।

মৌচাকে নতুন কিছুই ঘটছে না। লোকেরা নিয়মিতভাবে প্রাত্যহিক কাজে ব্যস্ত। ডুবো জাহাজটা জেটিতেই বাঁধা। দেখলুম, রশ তাঁর ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ঢুকলেন। কের কারাইয়ে আর সেরকো হ্রদের পাশে দাঁড়িয়ে কী-যেন দেখছে। রাত্তিরে কেউই এ-দ্বীপের উপর চড়াও হয়নি। ···তবু সেই গোলাগুলির আওয়াজ আমার মনের শান্তি একেবারে নষ্ট ক'রে ফেললো।

কের কারাইয়ে তার আস্তানায় চ'লে যেতেই সেরকো আমার পাশে এসে দাঁড়ালে। হাসিমুখটিতে তেমনি টিটকিরির ভঙ্গি: 'তারপর, মঁসিয় সিমোন আর্ৎ, এই নিরিবিলিটা অভ্যেস হ'য়ে যাচ্ছে তো আপনার? এই ঐন্দ্রজালিক গুহাটার কত সুবিধে, সেটা টের পেয়েছেন তো? এখান থেকে চ'লে যাবার ইচ্ছেটা কি এখনও বদ্ধমূল, না কি জায়গাটার সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছেন?'

মিথ্যে রাগারাগি ক'রে কী লাভ? শান্ত গলায় বললুম, 'না, এখান থেকে

banglabooks.in

চ'লে যাবার আশা এখনও আমি ছাড়িনি। আশা করি শিগগিরই একদিন মুক্তি পাবোই।'

'কী আশ্চর্য! আপনার মতো শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির সঙ্গ থেকে আমাদের আপনি বঞ্চিত করবেন? তাছাড়া তমাস রশের প্রলাপের মধ্য থেকে আমি যে-কটা সূত্র পেয়েছি, তা নিয়ে যে আপনার সঙ্গে আলাপ করবো ব'লে ভেবেছিলুম। দূর, আপনি মোটেই সিরিয়াস নন, ম'সিয় আর্‌ৎ!'

হুম্! তাহ'লে এই জন্যই এরা আমাকে ব্যাকাপে বন্দী ক'রে রেখেছে? তাদের ধারণা যে আমি এই আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক-কিছু জানি। তমাস রশ যদি কথা বলতে না-চান তো ভেবেছে যে আমাকে দিয়ে সব বলিয়ে নেবে। তাহ'লে এই জন্যই রশের সঙ্গে-সঙ্গে আমাকেও অপহরণ ক'রে নিয়ে এসেছে! সেই জন্যই গলায় পাথর বেঁধে আমাকে জলে ছুঁড়ে মারা হয়নি? যাক, জেনে ভালোই হ'লো। মুখে সেরকোর শেষ কথার জবাব দিলুম আমি: 'আমি খুবই সিরিয়াস, জেনে রাখবেন।'

'কিন্তু আমি যদি এনজিনিয়ার সিমোন আর্‌ৎ হবার সম্মান ও সৌভাগ্য পেতুম, তাহ'লে আমি হয়তো ভাবতুম যে হোক-না কের কারাইয়ে জলদস্যু, আর এই গুপ্তগুহাটা তার আস্তানা, আমি যখন তার সত্যি পরিচয় ও রত্নসিন্দুকের হদিশ পেয়ে গিয়েছি, তখন এটা-তো ঠিক যে আমাকে এরা কিছুতেই ছেড়ে দেবে না—তখন পুরো অবস্থাটার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নেওয়াই ভালো।'

প্রসঙ্গ পালটে আমি জিগেশ করলুম, আচ্ছা গেডনই যে এনজিনিয়ার সিমোন আর্‌ৎ, এটা আপনারা টের পেলেন কী ক'রে?

'এ-কথা আপনাকে না-বলার কোনো কারণ নেই। জানতে পেরেছিলুম নেহাৎই দৈবাৎ। আপনি যে-কম্পানিতে কাজ করতেন, কোনো-একটা সূত্রে তাদের সঙ্গে আমাদের কারবার হয়েছিলো। আপনি একদিন হুম ক'রে সে-কাজ ছেড়ে দিয়ে চ'লে যাওয়ায় সবাই ভারি আশ্চর্য হয়েছিলো। পরে একবার হেল্‌থফুল হাউসে গিয়েছিলুম আমি—কাউন্ট দার্তিগাস সেখানে যাবার কয়েকমাস আগে—সেখানে আপনাকে দেখেই আমি চিনতে পেরেছিলুম।'

'আপনি?'

'হ্যাঁ, আমি। আর তক্ষুনি আমি ঠিক করে ফেলেছিলুম যে "এক্সা"য় আপনাকে সহযাত্রী হিশেবে না-পেলে আর চলবেই না।'

কখনও তাকে হেল্‌থফুল হাউসে দেখেছিলুম কি না, আমি অবিশ্যি তা

banglabooks.in

কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। তবে হয়তো সত্যি কথাই বলেছে সে। 'আশা করি এই খামখেয়ালের জন্যে আপনাকে যথেষ্ট দাম দিতে হবে।...আচ্ছা, ফুলগুরেটরের রহস্য তো আপনি রশের কাছ থেকে জেনে ফেলেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, মঁসিয় আর্‌ৎ, কয়েক কোটি টাকার বদলে অবিশ্যি। তা কোটি কোটি টাকা তো নিয়ে এলেই হ'লো—সে-আর এমন মুশকিল কী? তাই আমরা কোনো দ্বিরুক্তি করিনি।'

'তা ও-টাকা দিয়ে উনি করবেন কী? বাইরে গিয়ে যদি ভোগই না করলেন তো লাভ কী?'

'এ-প্রশ্নটা ওঁর মাথায় খেলেইনি। ও-রকম প্রতিভা কখনও ভবিষ্যতের ভাবনায় কাতর হ'য়ে পড়ে না। এই মুহূর্তটি ছাড়া আর কিছুকে নিয়েই তিনি উদ্বিগ্ন নন। মারকিন মুলুকের কারখানায় তৈরি হচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্র, আর উনি এখানে রাসায়নিক পদার্থ মিশোল করছেন। আঃ, কী চমৎকার ক্ষেপণাস্ত্র! স্বয়ংচল, কত জোরে যাবে তা পর্যন্ত নিজেই ঠিক ক'রে নিতে পারে, লক্ষ্যে না-পৌঁছুনো অব্দি গতি তার বেড়েই চলবে। রশ একটা জিনিশ আবিষ্কার করেছেন—সেটা ক্রমবর্ধমানভাবে জ্বলতে থাকে! এই আবিষ্কার যুদ্ধ-বিগ্রহে একেবারে যুগান্তর এনে দেবে!'

'তমাস রশের কাছ থেকে কেউ যে-কথা বার করতে পারেনি—'

'আমরা সেটা সহজেই জেনে নিয়েছি।'

'দাম দিয়েছেন—'

'অভূতপূর্ব দাম! তাছাড়া সেই স্পর্শাতুর লোকটিকে তাতিয়ে আর চেতিয়েও দেয়া গেছে!'

'তার মানে?'

'মানে আমরা তাঁর মধ্যে প্রতিশোধের স্পৃহা জাগিয়ে দিয়েছি?'

'প্রতিশোধ—কীসের প্রতিশোধ?'

'যারা তাঁকে নিরুৎসাহ করেছে, ফিরিয়ে দিয়েছে, বার ক'রে দিয়েছে, ভিখিরির মতো আবিষ্কারটা হাতে নিয়ে যেজন্য তাঁকে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে? স্বদেশপ্রেমের এক চিলতেও আর তাঁর মধ্যে নেই। এখন কেবল একটাই তাঁর ধ্যানজ্ঞান, একটাই হিংস্রভীষণ কামনা: সারা জগতের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। সত্যি, মঁসিয় আর্‌ৎ, আপনাদের ইওরোপ ও আমেরিকার সরকার উচিত মূল্যে রশ-ফুলগুরেটর না-কিনে মস্ত আহাম্মুকি করেছেন!' এই ব'লে সেরকো সোৎসাহে রশ-ফুলগুরেটরের তাবৎ তথ্য দিলে আমাকে—'এ রকম

banglabooks.in

অস্ত্র আর হয়নি, ম'সিয় আর্‌ৎ, এ-রকম বিধ্বংসী অস্ত্র আর নেই। যাবতীয় গোলাবারুদের চেয়ে সহস্র-গুণ বেশি তার শক্তি। কোনো উৎক্ষেপকলও চাই না এর জন্য, কারণ সে নিজের পাখায় ভর ক'রেই আকাশে উড়ে যেতে পারে।'

চুপ ক'রেই সব শুনছিলুম, যদি সেরকো সূত্রটা ব'লে ফ্যালে। কিন্তু সেরকো সে-পাত্রই নয়। বিস্তর কথা বললেও সূত্রটা সে পুরোপুরি চেপে গেলো।

'ম'সিয় রশ কি বিস্ফোরকের উপাদান ও মাত্রাগুলো বলেছেন?'

'হ্যাঁ, ম'সিয় আর্‌ৎ। এবং সে-বিস্ফোরক আমরা বিপুল পরিমাণে গুদোমের মধ্যে রেখে দেবো।'

'কিন্তু অত বিস্ফোরক এক সঙ্গে রাখা কি ভালো? যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘ'টে যায় তো আস্ত—'

বলতে যাচ্ছিলুম 'ব্যাকাপ দ্বীপটাই উড়ে যাবে,' কিন্তু চট ক'রে নিজেকে সামলে নিলুম। সেরকো অবিশ্যি আমার হঠাৎ চুপ ক'রে যাওয়াটা খেয়ালই করেনি। সে বললে, 'না, না, ভয়ের কিছু নেই। একটা বিশেষ ধরনের ডেটোনেটর ছাড়া সেটা ফাটবেই না। সংঘর্ষ বা আগুন—কোনোটাই এটাকে ফাটাতে পারবে না।'

'তমাস রশ কি এই ডেটোনেটরের সূত্রও বিক্রি করেছেন?'

'এখনও করেননি বটে, তবে করতে কতক্ষণ?' সেরকো বললে, 'আপনার কোনো ভয় নেই, ম'সিয় আর্‌ৎ, আপনি নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারেন। আমরাও নিশ্চয়ই সব টাকাকড়ি নিয়ে গহ্বরশুদ্ধ টুকরো টুকরো হ'য়ে উড়ে যেতে চাই না! আরো কয়েক বছর লাভের ব্যাবসা চালিয়ে নিয়ে আমরা সব টাকা ভাগ-বাঁটোয়ারা ক'রে দেবো—প্রত্যেকেই মোটা-মোটা অঙ্ক পাবে, যেমন-ইচ্ছে তেমনি ভোগ করতে পারবে এবং তারপরেই কের কারাইয়ে অ্যাণ্ড কম্পানি পটোল তুলবে। আমরা-যে কেবল বিস্ফোরকের ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত, তা-ই নয়—কেউ আমাদের নামে যাতে নালিশ না-করে, সে বিষয়েও নির্ভয়—আর কেবল আপনিই আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ করতে পারেন, ম'সিয় আর্‌ৎ। কাজেই আমার পরামর্শ হ'লো স্থিরভাবে ব'সে বিচার-বিবেচনা ক'রে দেখুন, সমঝদার হোন, কম্পানি অক্কা-পাওয়া অব্দি অপেক্ষা করুন। তারপর তখন আমরা ভেবে দেখবো আপনাকে নিয়ে কী করা যাবে।'

কথাগুলো শুনে অবিশ্যি মোটেই নিশ্চিন্ত লাগলো না। তবে সে-সম্বন্ধে পরে ভেবে দেখা যাবে। মোদ্দা কথাটা আপাতত এই দাঁড়াচ্ছে যে তমাস রশ তাঁর

banglabooks.in

বিস্ফোরক কের কারাইয়ে অ্যাণ্ড কম্পানিকে বেচে দিয়েছেন, কেবল ডেটোনেটরটার কথা গোপন রেখেছেন—ওই ডেটোনেটর ছাড়া তাঁর বিস্ফোরক তো বড়ো রাস্তার ধুলোবালি।

সেরকোকে বললুম, 'তা আপনি তো এখন বিস্ফোরকটার সূত্র জেনে ফেলেছেন। সত্যিই কি রশ যতটা দাবি করেন, ততটাই বিধ্বংসী ক্ষমতা তার আছে? কখনো তার শক্তি কি পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন? কী ক'রে বুঝলেন নশ্চির মতো নিরীহ-কিছু কিনে বসেননি?'

'আপনার দেখছি এ-সম্বন্ধে আমাদের চেয়েও বেশি উৎকণ্ঠা। তবু আমাদের ব্যাবসা সম্বন্ধে খোঁজখবর নিচ্ছেন দেখে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, মঁসিয় আর্‌ৎ। কাল রাতে আমরা কয়েকবার পরীক্ষা ক'রে দেখেছি। ওই বিস্ফোরকের কয়েক দানা ফাটাতেই তীরের মস্ত-মস্ত সব পাথর একেবারে মিহি ধুলো হ'য়ে গেছে।'

ওঃ, এই তাহ'লে কাল রাত্তিরের উপর্যুপরি বিস্ফোরণের রহস্য!

'কাজেই,' সেরকো ব'লেই চললো, 'আপনাকে আশ্বাস দিচ্ছি—এ থেকে আপনার কোনোই ভয় নেই। বিস্ফোরকের ক্ষমতা আপনার কল্পনাকেও ছাড়িয়ে যাবে। এতটাই তার শক্তি যে কয়েক টন বিস্ফোরক ফাটালেই আস্ত গ্রহটাকে টুকরো-টুকরো ক'রে মহাশূন্যে উড়িয়ে দেয়া যাবে। ওই মঙ্গল আর বৃহস্পতির মধ্যে যে-রকম ধুলোবালির মতো গ্রহ ছাখেন, ঠিক সে-রকম।* কাজেই

* জুল ভের্ন এ-বইতে রশ-ফুলগুরেটরের যে-বিবরণ দিয়েছেন, তা আধুনিক আণব অস্ত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বয়ংচল ক্রমবর্ধমান গতি রকেটের কথা মনে পড়ায়। আর এই অমোঘ ও মোক্ষম পাশুপত অস্ত্রটি আজকের মানুষের সমস্যাকেই ফুটিয়ে তোলে। সেইজন্যেই এনজিনিয়ার সিমোন আরৎ-এর মধ্যে আমরা এ-যুগের বিচলিত, বিমূঢ়, হতাশ ও দ্বিধান্বিত মানুষকে আবিষ্কার করতে পারছি। যে-ভাবে বৈজ্ঞানিককে চুরি ক'রে নেয়া হয়েছে, তা গত মহাযুদ্ধের সময়কার বিভিন্ন বৈজ্ঞানিককে অপহরণ করার কথা মনে পড়ায়। নাৎসি জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এই দুই দেশই এ-সব ব্যাপার সবচেয়ে ভালো ক'রে রপ্ত করেছে। জুল ভের্ন কের কারাইয়েকে মানুষের শত্রু ব'লে বর্ণনা করেছেন; কিন্তু এই সরকারগুলো তাহ'লে কী? জুল ভের্ন-এর দূরদৃষ্টি যে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে-সঙ্গে জড়ানো জাগতিক সমস্যাগুলোকে গত শতাব্দীতে অত্যন্ত নিখুঁত-ভাবে ভেবেছিলো, এই রোমাঞ্চকর উপন্যাসটি তারই একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এর সঙ্গে তুলনীয় আরেকটি রগরগে উপন্যাস জুল ভের্ন লিখেছিলেন, তার নাম 'মারজাক মিশন'; ২০ বছর ধ'রে লেখা এই মস্ত উপন্যাসটি জুল ভের্ন-এর নির্দেশে তাঁর মৃত্যুর পরে ১৯০৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিলো। [অনুবাদকের টীকা।]

banglabooks.in

এ-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে অনেক দূরের জাহাজকেও আমরা এটা দিয়ে নিকেশ ক'রে ফেলতে পারবো। আবিষ্কারটার সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হচ্ছে তাগ—এখনও ঠিকমতো তাগ করা যাচ্ছে না। তা সেটাও সময়ে পুষিয়ে নেয়া যাবে।' যেন হঠাৎ খেয়াল হ'লো বড্ড বেশি কথা ফাঁস ক'রে দেয়া হ'লো, এই-ভাবে সেরকো চুপ ক'রে গেলো। তারপর কথা ঘুরিয়ে বললে, 'কাজেই আবারও বলি, ম'সিয় আর্‌ৎ, মিথ্যে অস্থির হবেন না। কোনো নালিশ না-পুষে এখানকার সঙ্গে মানিয়েই নিন না। ভূগর্ভের নিরিবিলি জীবনকে ভোগ ক'রে নিন। এখানে স্বাস্থ্যবানের স্বাস্থ্য টেঁকে, দুর্বলেরা বল পায়। আপনার তমাস রশেরও তা-ই হয়েছে। মেনে নিন ভাগ্যকে, দেখবেন সেটাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ।'

এই ব'লে আমার হিতৈষী ও উপদেষ্টা আমাকে সহাস্য বদনে বিদায় জানিয়ে চ'লে গেলো। কিন্তু এই ঠাট্টা, এই টিটকিরি, এই তাচ্ছিল্য—এ-কি আমি কোনো-দিনও ভুলবো? একদিন এর শোধ আমি নেবোই নেবো। কিন্তু কতগুলো কথা তার কাছ থেকে জেনে নেয়া গেলো; বোঝা গেলো যে ওই ক্ষেপণাস্ত্র তাগ-মতন লাগানো খুব মুশকিলের ব্যাপার। কিন্তু ক-দিন আর তা থাকবে। ঈশ! এই বিষম অস্ত্রটির কথা যদি কর্তৃপক্ষকে আগেই জানানো যেতো।

+

২০ আগস্ট

এই দু-দিনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটেনি। আমি প্রাত্যহিক হাঁটুনির সীমা আরো বাড়িয়ে দিয়েছি—একেবারে ব্যাকাপের শেষ মাথা অব্দি চ'লে যাই আজ-কাল। রাত্তিরে যখন পাথরের থামগুলোর ফাঁকে-ফাঁকে বিজলি বাতি জ্ব'লে ওঠে, প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে আমি মুগ্ধ হ'য়ে যাই: এটা আমার বন্দীশালা, কিন্তু সৌন্দর্য দেখে আমার মধ্যে ঐশ্বরিক অনুভূতি জেগে ওঠে। তবু এরই মধ্যে রোজই আমি খোঁজ করি কোথাও যদি কোনো ফাটল দেখা যায়। এমনও তো হ'তে পারে যে কোথাও কোনো ফাটলের মধ্য দিয়ে এখান থেকে চ'লে যাওয়া যায়, যেটা এখনো দস্যুদের চোখে পড়েনি। একবার যদি এখান থেকে পালাতে পারি, তাহ'লে—এটা ঠিক যে—আমাকে তীরে ব'সে কোনো জাহাজের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। মৌচাকে তা চট ক'রেই জানাজানি হ'য়ে যাবে যে পালিয়েছি, আর অমনি খোঁজ-খোঁজ রব প'ড়ে যাবে···অবিশ্যি যদি খাড়ির মাথা থেকে 'এক্বা'র নৌকোটা নিয়ে একবার বারদরিয়ায় বেরিয়ে পড়তে পারি! একবার যদি খাল পেরিয়ে বারমুডায় গিয়ে পৌঁছুনো যায়···

banglabooks.in

সন্ধে ন-টা নাগাদ একটা থামের পাশে বালির উপরে শুয়েছিলুম, হ্রদের পুব-দিকে মৌচাক থেকে প্রায় দুশো হাত দূরে। হঠাৎ কাছেই কোথাও পায়ের শব্দ শুনলাম, তারপর কাদের যেন গলা। তক্ষুনি থামের আড়ালে লুকিয়ে প'ড়ে আমি আড়ি পাতলুম।

গলাদুটি চিনতে ভুল হয়নি। কের কারাইয়ে আর সেরকো। দু-জনে দাঁড়িয়ে ইংরেজিতে কী-সব বলছে। ব্যাকাপে ইংরেজিরই চল বেশি। ইংরেজিতে বলছে ব'লেই তাদের কথার সারমর্ম ধরতে পারলুম আমি। কথা হচ্ছিলো রশ, তথা তাঁর ফুলগুরেটর নিয়ে।

'আট দিনের মধ্যেই "এব্বা" নিয়ে বেরিয়ে পড়বো,' কের কারাইয়ে বলছে, শুনতে পেলুম: 'অ্যাদ্দিনে নিশ্চয়ই ভারজিনিয়ার কারখানায় জিনিশগুলো সব বানানো হ'য়ে গেছে।'

'টুকিটাকিগুলো পেলেই সেগুলো জুড়ে দেবার ব্যবস্থা করবো,' সেরকো বললে, 'আর উৎক্ষেপবেদী তৈরি ক'রে নেবো। কিন্তু তার আগে একটা অনিবার্য কাজ আমাদের ক'রে নিতে হবে।'

'কী-সেটা, শুনি?'

'দ্বীপের পাঁচিলের মধ্যে একটা সুড়ঙ্গ বানানো।'

'পাঁচিলের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গ?'

'খুবই ছোটো আর সরু সুড়ঙ্গ, যাতে একবারে কেবল একজনই যেতে পারে। বাইরে তীরের পাথর চাপা দিয়ে মুখটা সহজেই ঢেকে রাখা যাবে।'

'কিন্তু সেটা দিয়ে আমরা করবো কী, সেরকো?'

'জলের তলার সুড়ঙ্গটা ছাড়াও বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা থাকা ভালো। কখন কী হয়, কিছুই বলা যায় না।'

কের কারাইয়ে আপত্তি তুললো, 'কিন্তু এই পাথুরে পাঁচিলগুলো কী পুরু আর কঠিন, সেটা ভেবেছো?'

'রশ-বিস্ফোরকের কয়েক দানাতেই আমাদের কাজ হাঁসিল হ'য়ে যাবে।'

'বাঃ,' আমি উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলুম, 'হয়তো এটাই আমার পালাবার রাস্তা হবে। কে জানে কখন কী সুযোগ পাবো।'

শুনলুম, কের কারাইয়ে বলছে, 'ঠিক আছে, তাহ'লে তা-ই হবে। যদি ভবিষ্যতে কখনো চড়াও-জাহাজের আক্রমণ ঠেকাতে হয়, তখন এটা খুব কাজে লাগবে।...অবিশ্যি আমাদের ডেরাটার কথা কেউ জেনে ফেললেই সে-কথা

banglabooks.in

ওঠে। নেহাৎ দুর্ঘটনা না-ঘটলে বা কেউ ফাঁস ক'রে না-দিলে তার অবিশ্যি কোনো সম্ভাবনা নেই।'

'ফাঁস ক'রে দেবার ভয় নেই।'

'না, আমাদের দলের কেউ অমন কর্মও করবে না। কিন্তু এই সিমোন আর্‌ৎ —এই লোকটা…'

'ওঃ, সিমোন আর্‌ৎ! তাকে তো আগে এখান থেকে বেরুতে হবে! আর ব্যাকাপ থেকে পালাবে কে? তাছাড়া, সত্যি বলছি, লোকটাকে আমার বেশ লাগে। একে-তো সহব্যবসায়ী, তাছাড়া আমার ধারণা সে নিশ্চয়ই অনেক-কিছু জানে—সব চেপে যাচ্ছে। দেখি কথাবার্তা ব'লে। পদার্থবিদ্যা, যন্ত্রবিদ্যা ক্ষেপণাস্ত্র—এ-সব নিয়ে তার সঙ্গে গলাগলি বন্ধুর মতো আলাপ ক'রে দেখি, হয়তো একটা সমঝোতা গ'ড়ে উঠবে।'

'তাতে অবিশ্যি সত্যি কিছু এসে-যায় না, বদান্য ও সহৃদয় কাউণ্ট দার্তিগাস বললেন, 'সব গুপ্তকথা জেনে ফেলবার পর নিকেশ ক'রে দিলেই হ'লো—'

'তার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে, কের কারাইয়ে!'

'সেরকো, আমরা তো এখন বিস্ফোরক কী ক'রে বানাতে হয়, জেনে গিয়েছি —এবার দেখতে হবে ডেটোনেটরের গোপন কথাটি কী—যত দাম লাগে লাগুক—'

সেরকো সায় দিলে, 'হুঁ, সেটাই সবচেয়ে জরুরি। আমি-তো আপ্রাণ চেষ্টা করছি যাতে গুপ্তকথাটি জেনে নেয়া যায়। কিন্তু রশ ও-নিয়ে কথাটিও কয় না। অবিশ্যি পরীক্ষা করার জন্য কয়েকটা ডেটোনেটর বানিয়ে দিয়েছিলো। যদি সুড়ঙ্গ বানাতে চাই, তাহ লে নিশ্চয়ই আরো বানিয়ে দেবে।'

'কিন্তু…আমাদের অভিযান? তার কী হবে?'

'ধৈর্য ধরো। শেষটায় আমরা নিজেরাই রশ-ফুলগুরেটর বানাতে শিখে যাবো।'

'তুমি ঠিক বুঝছো তো, সেরকো?'

'ঠিক?—সে-তো দাম দিলেই চুকে যাবে।'

এই কথার পরেই তাদের আলাপ ও শলাপরামর্শ শেষ হ'য়ে গেলো। ভাগ্যিশ এরা আমাকে দেখতে পায়নি। সেরকো মাঝে-মাঝে আমাকে সহকর্মী ব'লে ভাবে, কিন্তু কাউণ্ট দার্তিগাস আমার প্রতি মোটেই প্রসন্ন নন। বিন্দুমাত্র সন্দেহ হ'লেই আমাকে হ্রদের জলে ছুঁড়ে ফেলা হবে। তারপর যদি সুড়ঙ্গ দিয়ে বাইরে

banglabooks.in

বেরিয়ে যাই তো সে ভাঁটার টানে—আমার মৃতদেহটাই শুধু জলে ভাসবে তখন।

+

২১ আগস্ট

পরের দিন সেরকো সুড়ঙ্গ বানাবার জায়গা বাছতে গেলো—এমন জায়গা চাই যে সুড়ঙ্গের অস্তিত্বটা বাইরে থেকে টের পাওয়া যাবে না। অনেক দেখে-শুনে সে ঠিক করলে মৌচাকের কোঠাগুলোর বিশ হাত দূরে উত্তর দিকের দেয়ালে সুড়ঙ্গটা গড়া হবে।

সুড়ঙ্গটার জন্যে সবচেয়ে উৎসুক হ'য়ে আছি আমিই। কে জানে, হয়তো এটাই আমার পালাবার পথ। সাঁতার জানলে তো এর মধ্যেই আমি জলের তলার সুড়ঙ্গ দিয়ে সাঁৎরে পালাবার চেষ্টা করতুম—কারণ সুড়ঙ্গের মুখটা ঠিক কোথায়, তা আমি জানি। নিশ্চয়ই বাসন্তী ভাঁটার টানে মুখটা থেকে জল স'রে যায়। দেখতে হবে। অমাবস্যা পূর্ণিমায় জল সব-চেয়ে নিচে চ'লে যায়—হয়তো তখুনি দেখতে পাওয়া যাবে।

+

২৯ আগস্ট

আজ সকালে ডুবোজাহাজটা যখন রওনা হ'লো, আমি হাজির ছিলুম। নিশ্চয়ই মারকিন উপকূল থেকে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো আনতে গেলো। যাবার আগে কাউন্ট দার্তিগাস সেরকোর সঙ্গে কিছুক্ষণ কী আলাপ করলেন। সেরকো যাচ্ছে না, কাজেই দার্তিগাস বোধহয় তাকে সব নির্দেশ দিয়ে গেলেন। হয়তো আমার সম্বন্ধেই কিছু ব'লে গেলেন। কাপ্তেন স্পেড আর 'এব্বা'র মাল্লারাও তাঁর সঙ্গে গেছে।

এখন বিকেল। অথচ ডুবোজাহাজটা সেই যে চ'লে গেলো আর ফেরেনি। বোধহয় স্কুনারের সঙ্গেই সাগর পাড়ি দিতে বেরিয়েছে। হয়তো এবার কিছু লুঠতরাজের মতলবও আছে।

'এব্বা' নিশ্চয়ই বেশি-দিনের জন্যে যায়নি। যেতে-আসতে নিশ্চয়ই এক সপ্তাহের বেশি লাগবে না। তাছাড়া বারমুডার দিকে বছরের এ-রকম সময়ে আবহাওয়া খুবই ভালো থাকে। ঈশ! কোনোরকমে যদি এই বন্দীশালা থেকে বেরুবার পথ পেতুম!

+

banglabooks.in

১৩

আশা ভেসে গেলো

তেরো দিন কেটে গেছে, কিন্তু 'এব্বা' এখনও ফেরেনি। হয়তো সরাসরি মারকিন উপকূলে যায়নি সে—না কি ব্যাকাপের বাইরে কোথাও দস্যুতায় ব্যস্ত? আমার কিন্তু মনে হচ্ছিলো, কের কারাইয়ে সর্বাগ্রে ওই ক্ষেপণাস্ত্র আনতেই চাচ্ছে। হয়তো ভারজিনিয়ার কারখানা এখনও কাজটা শেষ করতে পারেনি।

সেরকো কিন্তু মোটেই অস্থির বা অধীর হচ্ছে না। সব-সময়েই সহাস্য বদনে সে আমাকে নমস্কার জানায়—আমি অবিশ্যি তার এই গায়ে-পড়া ভাবটাকে বিশ্বাস করি না, আর বিশ্বাস না-করার যথেষ্ট কারণও আছে। স্বাস্থ্য কেমন আছে, এটাই সে প্রথমে জিগেশ করে, তারপর অনুরোধ করে সব মানিয়ে নিতে, ঠাট্টা ক'রে আমাকে ডাকে আলিবাবা ব'লে, বলে যে এক 'আলিফ লায়লা' ওরোফে 'আরব্য রজনী' ছাড়া আর-কোথাও নাকি এ-রকম ঐন্দ্রজালিক গুহা নেই। এখানে কী-মজা আমার—কোনো কর দিতে হয় না, কোনো দাম দিতে হয় না, অথচ দিব্যি খাচ্ছি -দাচ্ছি, আরামে-গরমে আছি, বসন-অশন সবই পেয়ে যাচ্ছি—এমনকী মোনাকোর যুবরাজও নাকি এমনি রাজার হালে থাকেন না।

মাঝে-মাঝে এই টিটকিরি শুনে আমার চোখমুখ লাল হ'য়ে ওঠে, মাথায় রক্ত চ'ড়ে যায়, পারলে একেবারে টুঁটি টিপে ধ'রে নিকেশ ক'রে দিতে ইচ্ছে করে। পরে এরাও আমাকে খতম ক'রে দেবে, সত্যি···কিন্তু···কী এসে-যায়? ব্যাকাপের বন্দীশালায় দিনের পর দিন কাটিয়ে দেবার চেয়ে তা-ই কি ভালো নয়? কিন্তু পরক্ষণেই আবার বুদ্ধিশুদ্ধি ফিরে আসে, আমি কিছু না-ব'লে কেবল দু-কাঁধ ঝাঁকাই।

আর তমাস রশ? 'এব্বা' চ'লে যাবার পর গোড়ায় কয়েকদিন তো তাঁকে দেখতে পাইনি। ল্যাবরেটরিতেই থাকেন তিনি সারাক্ষণ, অবিশ্রাম পরিশ্রম করেন তিনি সেখানে। যত রাসায়নিক তাঁকে এনে দেয়া হয়েছে, সব ব্যবহার করলে ব্যাকাপ-শুদ্ধু আস্ত বারমুডাই বোধহয় উড়ে যাবে।

আমি তো কেবল এই আশাটাকেই আঁকড়ে ধ'রে আছি যে কিছুতেই তিনি ডেটোনেটর বানাবার কৌশলটা খুলে বলবেন না, সেরকোর যাবতীয় উশকানিই আশা-করি ব্যর্থ হবে। কে জানে এই আশা কদ্দিন টিঁকবে!

banglabooks.in

+

১৩ সেপটেম্বর

নিজের চোখেই আজ দেখতে পেলুম বিস্ফোরকের শক্তি কতটা। ডেটোনেটরটা কী-ক'রে কাজে লাগায়, সেটাও লক্ষ করলুম।

সকালবেলায় সব লোকজন গিয়ে সুড়ঙ্গের কাজে লেগে পড়েছিলো। সেরকোর তত্ত্বাবধানে মজুররা প্রথমে দেয়ালের নিচে কাজ শুরু করেছিলো—সেখানে ওই চুনাপাথর এতই কঠিন নিরেট যে প্রায় গ্র্যানাইট পাথরের মতো মনে হচ্ছিলো।

প্রথম আক্রমণটা হ'লো সবল হাতে শাবল নিয়ে—কিন্তু কেবল যদি তা দিয়েই কাজ করতে হ'তো তাহ'লে বিষম খাটুনিই সার হ'তো, কাজ মোটেই এগুতো না। কারণ সেই পাথর ব্যাকাপের ভিতের কাছে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাত পুরু। কিন্তু রশ-ফুলগুরেটরের দৌলতে এই দুঃসাধ্য কাজটাও চটপট শেষ হয়ে যাবে।

যতটুকু দেখলুম, তাতেই আশ্চর্য হ'য়ে গেলুম। শাবল দিয়ে বা তুরপুন দিয়ে যে-কাজ করতে গিয়ে প্রচুর সময় ও প্রচুর ঘাম লাগতো, সেটা ওই বিস্ফোরক সহজেই সেরে ফেললো। অত্যন্ত অল্প পরিমাণ বিস্ফোরক দিয়েই পুরো পাথরটা মিহি ক'রে গুঁড়ো ক'রে ফেলা হ'লো—এত মিহি ধুলো যে ফুঁ-দিলেই বুঝি উড়ে যাবে। হ্যাঁ, মাত্র ছ-টা দানা, কিন্তু তাই ফাটিয়েই পাথরের মধ্যে এক ঘন-গজ ফাটল বানিয়ে নেয়া গেলো—হঠাৎ বাতাস স্থানচ্যুত হ'তেই বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার মতো একটা আওয়াজ হ'লো, তারপর ধুলো উড়লো, তারপরেই দেখি পাথরের গায়ে এক ঘন-গজ ফাটল। প্রথমবার বিস্ফোরকটা ব্যবহার করার সময়—একটা ছোটো গমের দানার মতো বিস্ফোরক ছিলো কেবল—কয়েকজনে বড্ড-কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে-ছিলো—তারা সব চিৎপাত হ'য়ে পপাত ধরণীতলে। দুজন তো ভীষণভাবে আহতই হ'লো, এমনকী সেরকো নিজেই এত জোরে গিয়ে ছিটকে পড়লো যে তার গায়েও জায়গায়-জায়গায় ছ'ড়ে গেলো।

দু-ইঞ্চি লম্বা আর তিন ভাগের এক ইঞ্চি চওড়া একটা গর্ত হ'লো পাথরে প্রথমবার; বাকি কয়েক দানা বিস্ফোরক ব্যবহার করার পরেই সেই গর্ত বেশ বড়ো হ'য়ে গেলো—র‍্যাদা, তুরপুন এ-সব কিছুই ব্যবহার করতে হ'লো না।

তারপরেই এগিয়ে এলেন তমাস রশ স্বয়ং। তাঁর হাতে ছোট্ট একটা কাচের নল, তাতে তেলতেলেমতো কী-একটা নীলচে তরল পদার্থ, হাওয়া লাগলেই চট ক'রে জ'মে যায়। গর্তের মুখে কয়েক ফোঁটা সেই নীল তেল তিনি ঢেলে দিয়ে ধীরে-সুস্থে পেছিয়ে এলেন। বিস্ফোরকের সঙ্গে মিশতে সেই ডেটোনেটরের প্রায় পঁয়ত্রিশ

banglabooks.in

সেকেণ্ড লাগলো। কিন্তু পঁয়ত্রিশ সেকেণ্ড পরে সেটা যখন ফাটলো, তখন তার অসীম বিধ্বংসী ক্ষমতা দেখে আমি হকচকিয়ে গেলুম : এই বিস্ফোরক যে ইতো-পূর্বে আবিষ্কৃত যাবতীয় বিস্ফোরকের চেয়ে সহস্র-সহস্র গুণ ক্ষমতা ধরে, সেটা আবারও এখানে ব'লে রাখছি।

এই বিস্ফোরকের সাহায্যে সুড়ঙ্গটা বানাতে এক সপ্তাহের বেশি কিছুতেই লাগবে না—অথচ এমনিতে এ-কাজে যে কদ্দিন লাগতো কে জানে।

১৯ সেপটেম্বর

কয়েক দিন ধ'রেই লক্ষ করছি যে জোয়ার-ভাঁটার সময় সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে এত জোরে জল ঢোকে বা বেরিয়ে যায় যে উলটো দিকের জলে চব্বিশ ঘণ্টায় দু-বার ক'রে জলের মধ্যে ভীষণ তোড় জেগে ওঠে। কাজেই কোনো ভাসমান জিনিশ যে ভাঁটার টানে সুড়ঙ্গ দিয়ে বেরিয়ে যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। অবশ্য সুড়ঙ্গের মুখটার উপর দিকটা ভেসে না-উঠলে তা হবে না।

পরন্তু তো ২১ সেপটেম্বর, ক্রান্তিলগ্ন। সেদিন ভাঁটার টান বেশি থাকবে। সেদিন মুখটা বেরিয়ে পড়ে কি না দেখা যাবে।

আমি নিজে না-হয় ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে পালাতে পারবো না, কিন্তু ভাঁটার টান থাকতে-থাকতে একটা বোতল ছুঁড়ে ফেললে সেটা কেন খোলা সমুদ্রে ভেসে যাবে না? আর কেনই-বা কোনো দুর্ঘটনায়—দৈব দয়ায় ঘটা কোনো দুর্ঘটনা, সন্দেহ নেই—সেই বোতলটা কোনো চলমান জাহাজ তুলে নেবে না? কেন, স্রোতে সেটা তো একেবারে বারমুডার তীরে গিয়েই লাগতে পারে! আর যদি সেই বোতলে কোনো বিবরণ থাকে—

এই ভাবনাটাই কেবল আমার মগজের মধ্যে সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছে, কিন্তু তার বিরুদ্ধে কতগুলো আপত্তি আছে। যেমন বোতলটা সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে যাবার সময়, কোনো পাথরে ঘা লেগে ভেঙে যেতে পারে। যদি বোতলের বদলে একটা পিপের মুখ খুব ক'রে এঁটে ভাসিয়ে দিতে পারি, তাহ'লে সেটা নিশ্চয়ই ভাঙবে না, আর সেটার খোলা সমুদ্রে গিয়ে পড়ার সম্ভাবনাও বেশি।

২০ সেপটেম্বর

আজ রাত্তিরে সকলের অলক্ষিতে গুদোম ঘরে গিয়েছিলুম। সেখানেই লুঠের মাল থাকে। একটু খুঁজতেই একটা ছোট্ট কাঠের বাক্স পেলুম, আমার উদ্দেশ্যের পক্ষে

banglabooks.in

যেটা ভারি কাজে লাগবে। আমার কামিজের আড়ালে সেটাকে লুকিয়ে আমি মৌচাকে ফিরে এলুম। নিজের কোঠায় ফিরে এসেই আমি কাজে লেগে গেলুম।

কাগজ, কলম, কালি—কিছুরই আমার অভাব নেই। গত তিন মাস ধ'রে রোজই আমি কী ঘটছে না-ঘটছে লিখে রাখছিলুম।

একটা কাগজে আমি নিচের বিবরণটা চট ক'রে লিখে ফেললুম:

১৫ জুন রাত্তিরে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর-ক্যারোলাইনায় নিউবার্নের কাছে হেল্‌থফুল হাউসের ১৭ নম্বর মওপ থেকে তমাস রশ ও তাঁর শুশ্রূষাকারী গেডন, ওরোকে ফরাশি এনজিনিয়ার সিমোন আর্‌ং অপহৃত হয়েছিলেন, তারপর থেকে কাউন্ট দার্তিগাসের প্রমোদতরী 'এব্বা'য় ক'রে তাঁদের নিয়ে ১৯ জুন থেকে সাগরপাড়ি দেয়া হয়। দুজনেই এখন তথাকথিত কাউন্টের বন্দী: এই কাউন্ট আসলে পশ্চিম-প্রশান্ত মহাসাগরের দুর্ধর্ষ জলদস্যু কের কারাইয়ে—প্রায় একশো জন শাগরেদ নিয়ে তার দুর্ধর্ষ বোম্বেটে দল নীল সিন্ধুর বিভীষিকা জাগিয়ে তুলেছিলো। একটা দ্বীপের গহ্বর হ'লো এই কের কারাইয়ের গুপ্ত আড্ডা ও বন্দীশালা।

অসীম শক্তিশালী রশ-ফুলগুরেটর হাতে পেয়ে গেলে কের কারাইয়ে নিশ্চয়ই আরো-নিরাপদে ও আরো-পরাক্রান্তভাবে সাত সমুদ্রে রাজত্ব করবে।

সেইজন্যেই যে সব দেশের স্বার্থ সে বিঘ্নিত করবে, তাদের উচিত কালবিলম্ব না-ক'রে তার আড্ডাটা ধ্বংস ক'রে ফেলা। যে-গহ্বরটায় কের কারাইয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, সেটা ব্যাকাপ দ্বীপের একেবারে মধ্যখানে—লোকে সেটাকে সুপ্তোত্থিত আগ্নেয়গিরি ব'লে ভুল করে। বারমুডার একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত দ্বীপটা, তার পুবদিকে পাথরের দেয়াল, কিন্তু উত্তর, দক্ষিণ, পশ্চিম খোলা।

গহ্বরটার মধ্যে যাবার উপায় হ'লো একটা অন্তঃসলিলা সুড়ঙ্গ—পশ্চিমে সুড়ঙ্গের সংকীর্ণ প্রান্তে জলের তলের কয়েক গজ নিচে তার মুখ। ব্যাকাপের মধ্যে যেতে হ'লে একটা ডুবো-জাহাজ থাকা সবচেয়ে জরুরি—এখন অবিশ্যি উত্তর-পশ্চিম দিকে দেয়াল কাটিয়ে নতুন একটা সুড়ঙ্গ বানানো হচ্ছে, কিন্তু তা যদ্দিন না-হয়, ততদিন ডুবোজাহাজ ছাড়া এখানে পৌঁছনো যাবে না।

কের কারাইয়ের একটা ডুবোজাহাজ আছে; কাউন্ট দার্তিগাস যে-ডুবোজাহাজটা বানিয়ে-ছিলেন, এবং পরীক্ষা চালাবার সময় চার্লসটন উপসাগরে যেটা ডুবে গিয়েছে ব'লে রটানো হয়েছিলো, সেটাই এই ডুবোজাহাজ। এটা দিয়ে যে কেবল তারা সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢোকে বা বাইরে যায়, তা নয়, সেটা আবার স্কুনারটাকে টেনে নিয়ে যায় আর এখানকার সমুদ্রে সদাগরি জাহাজে আক্রমণ ও লুঠপাট চালায়।

মারকিন মুলুকের পশ্চিম কূলে কাউন্ট দার্তিগাসের প্রমোদতরী স্কুনার "এব্বা"কে অনেকেই চেনে। এই "এব্বা" ব্যাকাপ দ্বীপে একটা খাড়ির মধ্যে মস্ত পাথরের আড়ালে লুকোনো থাকে— বাইরে থেকে দেখে বোঝাই যায় না যে দ্বীপের পশ্চিমদিকে এ-রকম কোনো

banglabooks.in

বন্দর আছে।

ব্যাকাপে নামবার চেষ্টা করার আগে—নামতে হ'লে পশ্চিম দিকেই ভালো, সেখানে বারমুডার জেলেরা থাকতো—ডাইনামাইট দিয়ে দ্বীপের পাথর উড়িয়ে দিয়ে একটা পথ ক'রে নেবার চেষ্টা করা ভালো।

দ্বীপে জাহাজ ভেড়াবার পর লোকজনেরা এই পথ দিয়েই ব্যাকাপের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবে।

এটাও আগে থেকে জেনে রাখা ভালো যে দস্যুরা রশ-ফুলগুরেটর ব্যবহার করার চেষ্টা করতে পারে; হয়তো আকস্মিক আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য কের কারাইয়ে এই বিস্ফোরক ব্যবহার করতে কোনো দ্বিধাই করবে না। সেইজন্যেই এটাও জানাচ্ছি যে যদিও রশ-ফুলগুরেটরের বিধ্বংসী ক্ষমতা যে-কোনো বিস্ফোরকের চেয়ে হাজার গুণ বেশি, তবু এর জের মাত্র মাইল খানেক জুড়ে থাকে—১৭০০ গজের ওপাশে তার কোনো প্রভাব টের পাওয়া যাবে না। কতটুকু জায়গা জুড়ে বিপদ থাকবে, তার হয়তো একটু-আধটু অদলবদল হতে পারে, কিন্তু একবার পাল্লাটা ঠিক ক'রে নিলে সেটা বদলাতে অনেক সময় লাগে—এবং কোনো জাহাজ একবার তার পাল্লা থেকে বেরুতে পারলে অনায়াসেই দ্বীপে এসে পৌঁছুতে পারবে—আর-কিছুই তাকে ঠেকাতে পারবে না।

আজ ২০ সেপটেম্বর রাত আটটায় এই দলিলটা লিখে আমি নিজের নাম দস্তখৎ ক'রে দিচ্ছি।

সিমোন আর্‌ৎ, এনজিনিয়ার

বিবরণটা এভাবেই প্রস্তুত করলুম। দ্বীপ সম্বন্ধে যাবতীয় তথ্যই তাতে লিখেছি—তাছাড়া যে-কোনো মানচিত্রেই দ্বীপের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা জেনে নেয়া যাবে। তাছাড়া কের কারাইয়ে ব্যাকাপে কী প্রতিরোধ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে এবং কেন আশু সাহায্যের এই জরুরি প্রয়োজনীয়তা—সবই এই দলিলে লিখে দিলুম। সেই সঙ্গে একটা নকশা এঁকে দিলুম গহ্বরের—হ্রদ, মৌচাক, কের কারাইয়ের বাসস্থান, আমার ঘর, তমাস রশের ল্যাবরেটরি, সব এই নকশায় এঁকে দিলুম।

কেউ এই দলিলটা জল থেকে তুলে নেবে তো? সত্যি কি কোনোদিন সেই সৌভাগ্য হবে?

মোটা রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে কাগজটাকে সেই বাক্সে রাখলুম, লোহার কব্জা বসানো ডালা—বাক্সটা ছ-ইঞ্চি লম্বা আর তিন-ইঞ্চি চওড়া। জলনিরোধ-করা বাক্স, পরীক্ষা ক'রে দেখলুম; তাছাড়া খুব মজবুত।

কিন্তু এই ছোটো বাক্সটা ভাসিয়ে দেবার একটা বিপদও আছে। হয়তো কোনো বিশ্বস্ত হাতে না-প'ড়ে ঢেউয়ের ধাক্কায় বাক্সটা এই দ্বীপেরই তীরে গিয়ে ঠেকে রইলো, তারপর 'এব্বা' ফেরবার সময় 'এব্বা'র মাল্লারাই এটা কুড়িয়ে পেলে!

banglabooks.in

একবার যদি দলিলটা কের কারাইয়ের হাতে পড়ে, তাহ'লে আমাকে আর ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবতে হবে না।

রাত গভীর হ'য়ে এলো। যেন জ্বরাতুরভাবে রাত নিশুত হবার অপেক্ষা করছিলুম আমি। আগেকার দিনগুলোয় লক্ষ ক'রে দেখেছিলুম বলেই বুঝেছিলুম ভাঁটা শুরু হবে সোয়া নটায়—আর সুড়ঙ্গের মুখের প্রায় কুড়ি ইঞ্চি উদ্‌ঘাটিত হবে। এই ছোট্ট ডিবেটা তার মধ্যে দিয়ে গ'লে যাবে নিশ্চয়ই। ভাঁটা শেষ হবার আধঘণ্টা আগে এটাকে ভাসিয়ে দেবো—জলের টানে এটা ভেসে চ'লে যাবে।

সাড়ে-আটটা নাগাদ আমার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লুম। তীরে কেউ নেই। সুড়ঙ্গটার যেখানে শুরু, সেই পাথরটার দিকে এগিয়ে গেলুম। এদিককার শেষ বিজলি বাতির আলোয় দেখলুম গোল খিলেনের মতো সুড়ঙ্গের মুখটা জলের উপরে জেগে উঠেছে, আর তোড়ে হ্রদের জল সুড়ঙ্গটা দিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

জলের ধারে গিয়ে আমি আমার একমাত্র আশাকে ভাসিয়ে দিলুম।

ছোট্ট ডিবেটা প্রথমে নিশ্চল রইলো; ঢেউয়ের ধাক্কায় তারপর তীরের দিকেই চ'লে আসছিলো, আমি এক ধাক্কা দিয়ে সেটাকে নাড়িয়ে দিলুম। বাস! কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যেই সেটা সুড়ঙ্গের মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

আমার শেষ আশা ভেসে গেলো এইভাবেই।

১৪

জলযুদ্ধ

সেই নির্ঘুম সারারাত ধ'রে আমার ভাবনা সেই ভাসানো ডিবেটাকেই অনুসরণ ক'রে গেলো। কখনও মনে হ'লো এই বুঝি মস্ত পাথরের গায়ে ধাক্কা খেয়ে বাক্সটা ভেঙে গেলো, কখনও মনে হ'লো খাড়ির মধ্যে কোনো ঘূর্ণিপাকে পড়লো বুঝি বেচারি, আবার কখনও মনে হ'লো সেটা কোনো ফাটলের ফাঁদে আটকে গেলো না তো! পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অব্দি ঘামে ভিজে গেলো আমার। অবশেষে ডিবেটা পেরুলো সেই সুড়ঙ্গ, ভাঁটার টান তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে সাগরে! জোয়ার সেটাকে আবার ব্যাকাপেই ফিরিয়ে আনবে না তো? দিনের বেলায় গিয়ে সেটাই প্রথমে দেখতে হবে!···

banglabooks.in

সকাল হ'তে-না-হ'তেই বেরিয়ে পড়লুম। শান্ত নিস্তরঙ্গ নীল জল হ্রদে—কোথাও-কিছু দেখা যাচ্ছে না।

পরের কয়েক দিন সমানে পাথর ফাটানোর কাজ চললো। আজ ২৩ সেপটেম্বর বিকেল চারটেয় সেরকো শেষ শিলাস্তর ফাটিয়ে ফেললে। বাইরের সঙ্গে সংযোগ সাধিত হ'লো। ছোটো সরু একটা শুঁড়িপথ—কোনোমতে একজন লোক এর মধ্য দিয়ে গ'লে যেতে পারে, কিন্তু যোগাযোগের পক্ষে তা-ই তো যথেষ্ট। বাইরের দিকে তীরের পাথর ও আবর্জনার স্তূপে সুড়ঙ্গের মুখটা ঢাকা রইলো—দরকার হ'লে মুখটা পাথর চাপা দিয়েও রাখা যাবে।

বলাই-বাহুল্য এটার মুখে কড়া পাহারা বসলো। বিনা-অনুমতিতে কারুই সেটা দিয়ে যাওয়া-আসা করার সুযোগ নেই। কাজেই এদিক দিয়ে পালানো একেবারেই অসম্ভব।

+

২৫ সেপটেম্বর

আজ সকালে হঠাৎ ডুবোজাহাজটা হ্রদের জলে ভেসে উঠলো। কাউন্ট দাতিগাস সদলবলে জেটিতে পদার্পণ করলেন। মাল্লারা 'এক্বা'র আনা মালপত্তর নামাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো। খাবারদাবার এসেছে কয়েক বস্তা, এসেছে মাংসবোঝাই বাক্স, মদের পিপে—আর তমাস রশের জন্য কয়েক বাক্স কী-সব। সেই সঙ্গে লোকেরা ক্ষেপণাস্ত্রের কলকব্জাও দ্বীপে ধীরে-ধীরে নামিয়ে আনলে—তাদের আকার হচ্ছে থালার মতো।

ক্ষেপণাস্ত্রগুলো নামাবার সময় রশ নিজেই উপস্থিত ছিলেন। অদ্ভুতভাবে জ্বলছিলো তাঁর চোখ দুটো। একটা হাতে নিয়ে দেখলেন তিনি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, তারপর সন্তোষের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। কিন্তু উৎসাহে ও আনন্দে মোটেই কোনোরকম অসংলগ্ন ব্যবহার করলেন না। হেল্‌থফুল হাউসের প্রাক্তন বাসিন্দার খ্যাপামির কোনো চিহ্নই আর নেই। যে-আংশিক উন্মত্ততা দুরারোগ্য ব'লে ভাবা গিয়েছিলো, তা বোধহয় পুরোটাই সেরে গিয়েছে।

রশ তারপরে হ্রদ পেরুবার নৌকোটায় চেপে বসলেন। সেরকো তাঁকে ল্যাবরেটরি অব্দি পৌঁছে দিতে গেলো। এক ঘণ্টার মধ্যেই ডুবোজাহাজের সব মালপত্তর অন্য তীরে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

কের কারাইয়ের সঙ্গে সেরকোর তখন বেশি কথা হয়নি। বিকেলে তারা মৌচাকের সামনে পায়চারি করতে-করতে অনেকক্ষণ ধ'রে কী-সব বলাবলি করলে।

banglabooks.in

তারপর দুজনে মিলে সেই নতুন-গড়া সুড়ঙ্গটার দিকে এগিয়ে গেলো। এবার কাপ্তেন স্পেডও তাদের সঙ্গে যোগ দিলে। যাবো নাকি তাদের পিছন-পিছন? চুপিসাড়ে গিয়ে অন্তত একবারও বুক ভ'রে নেবো নাকি অতলান্তিকের তাজা হাওয়া?

+

২৬ সেপটেম্বর থেকে ১০ অক্টোবর

সেরকো আর রশের তত্ত্বাবধানে ক্ষেপণাস্ত্রের উপকরণগুলো জোড়া হ'য়ে গেছে। তারপর শুরু হয়েছে উৎক্ষেপ-ভিৎ প্রতিষ্ঠা। উৎক্ষেপ-ভিৎ মানে কতগুলো ঢালু কাঠামো, ইচ্ছেমতো বদল করা যায় এমন প্যাঁচ লাগানো তাতে, 'এব্বা'র উপরে এগুলো বসাতে কোনো অসুবিধেই হবে না; এমনকী জলের সমতলে থাকলে ডুবোজাহাজের পাটাতনেও এই উৎক্ষেপ-ভিৎ বসানো যাবে।

তাহ'লে কের কারাইয়ে সমুদ্রের রসদ হ'তে চলেছে। সম্পত্তি বলতে একটা মাত্র স্কুনার, কিন্তু তাতেই আস্ত নীল সিন্ধুজল তার দখলে চ'লে আসবে। এরপর এই বিপজ্জনক গণ্ডি পেরিয়ে কাছে আসবে কোন মানোয়ারি জাহাজ? ওদিকে তাদের কামানের পাল্লার বাইরে নির্ভয়ে বিচরণ করবে 'এব্বা'। ঈশ! যদি আমার সাবধানবাণী কারুর হাতে প'ড়ে থাকে! ব্যাকাপে যে দস্যুদের আড্ডা আছে, সেটা যদি কেউ জানতো! তাহ'লে অন্তত ধ্বংস করতে না-পারলেও এদের না-খাইয়ে মারবার চেষ্টা করতে পারতো!

+

২০ অক্টোবর

অবাক কাণ্ড! আজ সকালে আর ডুবোজাহাজটাকে তার জেটিতে দেখতে পাচ্ছি না। কাল রাত্তিরে অবিশ্যি তার তড়িৎ-কোষগুলি চার্জ ক'রে নেয়া হচ্ছিলো, কিন্তু ভেবেছিলুম সে কেবল তৈরি থাকার জন্যই করা হচ্ছে। এখন যখন ডাঙার উপরেই সুড়ঙ্গ আছে, তখন ডুবোজাহাজটার অনুপস্থিতির মানেই হ'লো কোনো সাগর-পাড়ির মৎলব আছে। এখন তমাস রশের আর কোনো-কিছুরই চাহিদা নেই। এখন আমরা বিষুব কালের নিকটবর্তী ব'লে বারমুডায় এ-রকম সময় মাঝে-মাঝে ভীষণ ঝড় ওঠে। ঝড়ের প্রচণ্ডতা তো সহজেই টের পাই—কী জোরে পেয়ালার তলা বা পাহাড়ের শীর্ষ দিয়ে হাওয়া ঢোকে এখানে। বৃষ্টিভেজা প্রচণ্ড ঘূর্ণি-হাওয়ায় গহ্বর চমকে-চমকে ওঠে একেকদিন, আর হ্রদ দুই তীরে পিচকিরির জল ছিটোয়। স্কুনার কি এই অবস্থায় খাড়ি ছেড়ে বেরুবে? তুলনায় সে তো বেশ হালকা আর পলকা। ওই ডুবোজাহাজের সাহায্যেও তার পক্ষে কি এ-রকম

banglabooks.in

ভীষণ আবহাওয়ায় সাগরপাড়ি দেয়া সম্ভব? না কি ডুবোজাহাজটা সমুদ্রের তলদেশে শান্ত জল পাবে ব'লে একাই গেছে? কেন-যে ডুবোজাহাজটা বেরিয়েছে, তা জানি না – কিন্তু সেটা আর ফিরে আসেনি।

এবারও সেরকোই ব্যাকাপে থেকে গেছে। বাকি সবাই – কের কারাইয়ে, কাপ্তেন স্পেড, 'এক্বা' ও ডুবোজাহাজের মাল্লারা – সবাই দ্বীপ ছেড়ে চ'লে গিয়েছে।

একঘেয়েভাবে দিনগুলো কেটে যাচ্ছে। নিজের কোঠাতেই ব'সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভাবি, আশা করি, হতাশায় ভ'রে যাই, আঁকড়ে ধ'রে থাকি দুর্বল মিরকুটে একটা আশা, যে-আশাটা ক্রমেই দুর্বলতর হ'য়ে উঠছে। স্রোতের খেয়ালের উপর নির্ভর ক'রে ছোট্ট ডিবেটা ভেসে গিয়েছে—কী হ'লো তার। জানি না কেন এই রোজনামচা লিখছি। আমার মৃত্যুর পর এই রোজনামচা কি আর আস্ত থাকবে?

তমাস রশ সারা দিন তাঁর ল্যাবরেটরিতে ব্যস্ত থাকেন – ডেটোনেটর বানান। আমার কেন-যেন দৃঢ় বিশ্বাস তিনি কিছুতেই কুবেরের ঐশ্বর্যের বিনিময়েও ডেটোনেটর বানাবার কৌশলটা ফাঁস ক'রে দেবেন না। কিন্তু এটাও জানি যে নিজের আবিষ্কারকে কের কারাইয়ের কাজে লাগাতে দিতে তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি হবে না।

মাঝে-মাঝে মৌচাকের দিকে বেড়াতে গেলে সেরকোর সঙ্গে দেখা হয়। দেখা হ'লেই সে খুব বোলচাল ঝাড়ে, সারাক্ষণ মুখে খৈ ফোটায়। এটা-সেটা নিয়ে কথা হয় কিন্তু কিছুতেই আমার অবস্থার কথা তুলতে দিইনি। নতুন গঞ্জনা বা টিটকিরি সইবার মতো মনোবল আর অবশিষ্ট নেই আমার।

+

২২ অক্টোবর

আজ সেরকোকে জিগেশ করেছিলুম স্কুনারটাও ডুবোজাহাজের সঙ্গে গেছে কি না। উত্তরে সে বললে, হ্যাঁ, মঁসিয় আর্‌ৎ। বাইরে আবহাওয়া যদিও জঘন্য, তবু "এক্বা"র জন্যে ভয়ের কোনো কারণ নেই।'

'অনেক দিন পরে ফিরবে নাকি?'

'আশা করছি আর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসবে। শীতকালে ঝড়ঝাপটায় এখানকার সমুদ্রে জাহাজই চালানো যায় না—এটাই হ'লো কাউন্ট দার্তিগাসের শেষ সাগরপাড়ি – এরপর শীতকালটা এখানেই কাটাবেন।'

banglabooks.in

'প্রমোদভ্রমণ ? না কি কোনো কাজ ছিলো ?'

সেরকো মুচকি হাসলো। 'কাজ, ম'সিয় আর্‌ৎ, কাজ। আমাদের ক্ষেপণাস্ত্র তো তৈরি—এবার আবহাওয়া ভালো হ'লেই, ব্যাস, গুড়ুম গুম !'

'আশা করি অত-অনায়াসে দস্যুবৃত্তি চালানো যাবে না।'

'শান্ত হোন, ম'সিয় আর্‌ৎ, শান্ত হোন। আপনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে এটা ভালো ক'রেই জানেন কারু সাধ্য নেই আমাদের এই আড্ডা খুঁজে বার করে। আর তাছাড়া ওই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো তো কোনো জাহাজকেই দ্বীপের ধারে-কাছেই ঘেঁষতে দেবে না।'

'অবিশ্যি ম'সিয় রশ যদি ফুলগুরেটরের সঙ্গে-সঙ্গে ডেটোনেটর বানাবার কৌশল ব'লে দেন।'

'ব'লে দিয়েছেন, ম'সিয় আর্‌ৎ। কাজেই এ-সম্বন্ধে আপনার উৎকণ্ঠা আমি দূর করতে পারি।'

এই সরল-সোজা উত্তর শুনে হয়তো বুঝতুম যে জগতের চূড়ান্ত দুর্দশা উপস্থিত, কিন্তু সেরকোর গলার দ্বিধাই আমাকে ব'লে দিলে যে তার কথা ঠিক নয়।

+

২৫ অক্টোবর

আরেকটু হ'লেই প্রাণ যেতো। ভীষণ-একটা রগরগে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি। আটচল্লিশ ঘণ্টা পরে যে আবার এই রোজনামচা নিয়ে বসতে পেরেছি, এটাই একটা অঘটন। দৈব আরেকটু সদয় হ'লে একেবারে উদ্ধারও পেয়ে যেতুম—এতক্ষণে থাকতুম বারমুডার কোনো বন্দরে, আর ব্যাকাপের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যেতো। সব দেশের লোক একযোগে নজর রাখলে 'এক্সা' আর দেখা দিতেই পারতো না কোথাও, আর কের কারাইয়ের বোম্বেটেরা শেষকালে রশদ না-পেয়ে উপোশ ক'রে মরতো।

কী-হয়েছিলো বলছি।

২৩ তারিখ রাত্তির আটটা নাগাদ হঠাৎ কেন যেন ভারি অস্থির লাগছিলো, শেষকালে আর থাকতে না-পেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিলুম। বোধহয় আগে থেকেই টের পেয়েছিলুম কিছু-একটা গুরুতর ঘটবে। স্বজ্ঞার এই ক্ষমতার কথা আগেও শুনেছি।

বাইরে সমুদ্রে নিশ্চয়ই তাণ্ডব চলছিলো, কারণ গহ্বরের মধ্যে প্রচণ্ড হাওয়ার ঝাপটা আসছিলো, আর হ্রদের জল ফুলে-ফেঁপে চরকি দিয়ে-দিয়ে উঠছিলো।

banglabooks.in

মৌচাকের পাশ দিয়ে হ্রদের তীর ধ'রে হাঁটছিলুম, কেউ কোথাও নেই। বড্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, আর একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব। মৌচাকের সব মাছিরা যে-যার চাকে ঢুকে ব'সে আছে।

ডাঙ্গার সুড়ঙ্গটার মুখে কেবল একজন পাহারা দিচ্ছে, যদিও সুড়ঙ্গের অন্য প্রান্তটায় পাথর চাপা দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিলো। পাহারা যেখানে দাঁড়িয়ে-ছিলো, সেখান থেকে হ্রদের তীর দেখা যায় না। তাছাড়া হ্রদের দু-তীরে দুটো বাতি জ্বলছিলো কেবল, আর সব আলোগুলো নেভানো ব'লে চারপাশে ছিলো ঘুটঘুটে অন্ধকার।

অন্ধকারের মধ্যে ঢুকে পড়তেই কে-যেন ছায়ার মতো পাশ দিয়ে চ'লে গেলো। কোনো রকমে ঠাহর ক'রে দেখি : তমাস রশ। রশ আমাকে গ্যাখেননি। কী-যেন ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্কভাবে চলেছেন।

হঠাৎ মনে হ'লো এই-তো তাঁর সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ—হয়তো এখনও যে-সব কথা তিনি জানেন না, তা তাঁকে খুলে বলতে পারবো।...কার হাতে পড়েছেন, এটা বোধহয় তিনি এখনও আন্দাজ করতে পারেননি। কাউণ্ট দাতিগাসই যে দস্যু কের কারাইয়ে এটা হয়তো তাঁর জানা নেই। কার সঙ্গে কারবার করছেন জানেন না তো, কী ক'রে বুঝবেন যে এই কোটি-কোটি টাকা ভোগ করার সত্যিকার কোনো সুযোগই তাঁর জুটবে না।...হ্যাঁ, তাঁর মানবিক বোধের কাছে আমি আবেদন জানাবো, কাকুতি-মিনতি ক'রে বোঝাবো কী চরম দুর্দশা তিনি ডেকে আনতে যাচ্ছেন, ডেটোনেটরের সূত্র ফাঁস ক'রে দিলে কী সর্বনাশই যে হবে, সেটা তাঁকে বুঝিয়ে বলবো, বলবোই...এই পর্যন্ত যেই ভেবেছি অমনি হঠাৎ পিছন থেকে কে যেন আমাকে গায়ের জোরে জাপটে ধরলো।

দুটি লোক আমাকে সজোরে চেপে ধ'রে আছে—হঠাৎ মাটি ফুঁড়ে সামনেই তৃতীয় একজনের আবির্ভাব হলো। আমি চ্যাঁচাতে গেলুম।

'টুঁ শব্দটিও নয়,' তৃতীয়জন ইংরেজিতে বললে, 'আপনিই তো সিমোন আয়ৎ, তাই না?'

'আপনি জানলেন কী ভাবে?'

'আপনাকে যে আপনার ঘর থেকে বেরুতে দেখলুম।'

'তাহ'লে আপনি কে?'

'রয়্যাল নেভির লিউটেনাণ্ট ডেভন—"স্ট্যাণ্ডার্ড" জাহাজের অফিসার—এখন বারমুডায় আছি।'

banglabooks.in

হঠাৎ নানা ধরনের অনুভূতি মিশোলে এতই আপ্লুত হ'য়ে গেলুম যে মুখ দিয়ে কোনো বাকস্ফূর্তি হ'লো না !

'আমরা আপনাকে ও ফরাশি বৈজ্ঞানিক তমাস রশক কের কারাইয়ের হাত, থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে এসেছি।' লিউটেনাণ্ট ডেভন বিশদ করলেন, 'আপনার নাম লেখা একটা বিবরণ একটা দ্বীপের তীরে কুড়িয়ে পাওয়া গেছে।'

'একটা ছোটো কাঠের ডিবে ? যেটা হ্রদের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলুম ?'

'হ্যাঁ, তাতে সব লেখা ছিলো। কের কারাইয়ে আর কাউণ্ট দার্তিগাস যে একই লোক, সে-ই যে হেল্‌থফুল হাউসের অপহরণকর্মের হোতা এবং এই দ্বীপটাই যে তার আড্ডা—সব তাতে লেখা ছিলো।'

'ওঃ, লিউটেনাণ্ট ডেভন···'

'আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করলে চলবে না। এই অন্ধকারের সুযোগ নিতে হবে আমাদের !'

'একটা কথা, লিউটেনাণ্ট। ব্যাকাপের মধ্যে আপনারা ঢুকলেন কী ক'রে ?'

'আমাদের ডুবোজাহাজ "সোর্ড"-এ ক'রে—ছ-মাস ধ'রে এই ডুবোজাহাজটা বারমুডায় এসে ব'সে আছে।'

'ডুবোজাহাজ ?'

'হ্যাঁ। সেটা ওই পাথরের আড়ালে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মঁসিয় আর্নৎ কের কারাইয়ের ডুবোজাহাজটা কোথায় ?'

'তিন সপ্তাহ হ'লো কোথায় যেন গেছে।'

'তাহ'লে সে এখন ব্যাকাপে নেই।'

'এখন নেই, তবে যে-কোনো মুহূর্তে এসে পড়তে পারে।'

'আসুক গে, কিচ্ছু এসে-যায় না। আমরা কের কারাইয়েকে চাই না, আমরা চাই তমাস রশকে। আপনার সঙ্গে তাঁকেও নিয়ে যাবার হুকুম আছে। আপনাদের দুজনকে না-নিয়ে "সোর্ড" এই হ্রদ ছেড়ে নড়বে না। "সোর্ড" না-ফিরলে বারমুডা ধ'রে নেবে যে আমি বিফল হয়েছি—তখন এই উদ্দেশ্যে আবার আরেকজন আসবে।'

'কোথায় আপনার ডুবোজাহাজ ?'

'ওই যে, পাথরের আড়ালে ছায়ার মধ্যে। কেউ যাতে না-দেখতে পায়, সেজন্যেই ওখানে রাখা হয়েছে। আপনার বিবরণে সব নিখুঁত লেখা ছিলো—তাই সহজেই সুড়ঙ্গটা খুঁজে পেয়েছি। দশ মিনিট আগে "সোর্ড" জলের উপর ভেসে

banglabooks.in

উঠেছে। আমার সঙ্গে শুধু দুজন অনুচর এসে তীরে নেমেছে। নকশা দেখে বুঝলুম যে আপনিই বেরিয়েছেন কোঠা ছেড়ে। আপনি জানেন তমাস রশ এখন কোথায় আছেন?'

'আর কয়েক পা আগেই। এইমাত্তর ল্যাবরেটরির দিকে গেলেন আমার পাশ দিয়ে।'

লিউটেনান্ট, তাঁর দুই অনুচর আর আমি হ্রদের পাশের রাস্তা ধরলুম। কুড়ি হাত গেছি কি না-গেছি, দেখি তমাস রশ। তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে প'ড়ে, কোনো শব্দ করার আগেই, মুখে কাপড় গুঁজে, তাঁকে বেঁধে ফেলে পাঁজাকোলা ক'রে পাথরের আড়ালে 'সোর্ড'-এর কাছে নিয়ে যেতে বোধহয় এক মিনিটও লাগলো না। 'সোর্ড' খুবই ছোট্ট ডুবোজাহাজ, মাত্র বারো টনের; স্কুনারটানা ডুবো-জাহাজটির চেয়ে অনেক ছোটো আর অনেক-কম শক্তিশালী। বারো ঘণ্টা আগে তড়িৎকোষে বিদ্যুৎ চার্জ করা হয়েছিলো, তারই জোরে দুটি ডায়নামো চলে আর জাহাজের চাকা ঘোরায়। কিন্তু যতই ছোটো হোক না কেন, এই ডুবোজাহাজটাই আমাদের বন্দীশালা থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে পারবে—যে-মুক্তি পাবো ব'লে আমি আশাও করিনি। অবশেষে তাহ'লে কের কারাইয়ে আর সেরকোর কবল থেকে মুক্তি পাবেন তমাস রশ। আর তাঁর আবিষ্কারকে ওই বদমায়েশগুলো কাজে লাগাতে পারবে না, আর কেউই দ্বীপের দিকে ধাবমান জাহাজগুলোকে ঠেকাতে পারবে না—সব জাহাজ এসে তীরে ভিড়বে, তারপর সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকে প'ড়ে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করতে আর কতক্ষণ! অনুচর দুজন তমাস রশকে ব'য়ে নিয়ে গিয়ে তুললো 'সোর্ড'-এ—আমরাও ডুবোজাহাজে ওঠবার সময় কাউকে দেখতে পেলুম না। চটপট ভিতরে ঢুকে পড়লুম সবাই, ঘুলঘুলির জল-নিরোধ করা ঢাকা এঁটে দেয়া হ'লো, জলের চৌবাচ্চাগুলো ভ'রে গেলো, ডুবে গেলো জাহাজটি। যাক, আর ভয় নেই।

'সোর্ড' জাহাজটার তিনটে জল-নিরোধ-করা অংশ: প্রথম অংশে আছে তড়িৎ-কোষ আর কলকব্জা। দ্বিতীয় অংশে থাকে চালক, জাহাজের ঠিক মাঝখানে; তার পাশেই পেরিস্কোপ বসানো, আর দু-পাশে অনেকগুলি কাচবসানো ঘুলঘুলি: বৈদ্যুতিক আলো প'ড়ে জলের তলা আলো হ'য়ে ওঠে আর এই ঘুলঘুলিগুলো দিয়ে বাইরের সব কিছু দেখা যায়। তৃতীয় অংশটা হচ্ছে পিছনের গলুই: আমাকে আর রশকে সেখানেই রাখা হ'লো। বলাই বাহুল্য, রশের মুখের কাপড় খুলে নেয়া হয়েছে তখন, কিন্তু হাত-পায়ের বাঁধন খোলা হয়নি। মুখ দেখে মনে হ'লো

banglabooks.in

তিনি বুঝি ঘোরের মধ্যে আছেন – কী ঘটছে না-ঘটছে কিছুই যেন বুঝতে পারছেন না, কেমন অদ্ভুতভাবে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে আছেন শুধু।

ভীষণ তাড়া ছিলো : কোনো বাধা না-পেলে আজকেই যাতে বারমুডায় পৌঁছনো যায়, তারই চেষ্টা করা হচ্ছিলো। কামরার দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলুম আমি তারপর দরজাটা আবার ভালো ক'রে বন্ধ ক'রে দিলুম। সারেঙের কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন লিউটেনান্ট ডেভন। আমি গিয়ে তাঁর কাছে দাঁড়ালুম। বললুম, 'লিউটেনান্ট ডেভন, রশকে একা রেখে এলে কোনো ক্ষতি হবে না। আমি বরং আপনাদের সুড়ঙ্গের মুখটা দেখিয়ে দিই।'

'আচ্ছা, আমার পাশে দাঁড়ান।'

তখন কাঁটায়-কাঁটায় আটটা বেজে সাঁইত্রিশ মিনিট। আমাদের সামনের জল বৈদ্যুতিক আলোয় উদ্ভাসিত হ'য়ে আছে। 'সোর্ড' যেখানে নোঙর ফেলেছিলো, সেখান থেকে আস্ত হ্রদটাই পেরুতে হ'লো। সুড়ঙ্গের মুখটা খুঁজে পাওয়া কঠিন বটে, কিন্তু অনতিক্রম্য নয়। শুধু তীর ঘেঁষে ঘুরে বেড়ালেই একসময়-না-একসময় মুখটা খুঁজে পাওয়া যাবেই। তারপর আস্তে-আস্তে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে খোলা সমুদ্রে পৌঁছেই 'সোর্ড' জলের উপর ভেসে উঠবে – তারপর সোজা বারমুডার দিকে এগুবে।

'জলের কত নিচে আছি এখন?' আমি জিগেশ করলুম।

'প্রায় দুই বাঁও হবে।'

'তাহ'লে আর নিচে নামার দরকার নেই। ক্রান্তিলগ্নের ভাঁটার দিন যতটুকু দেখেছিলুম, তাতে মনে হয় আমরা এখন সুড়ঙ্গের ঠিক মুখ বরাবর আছি।'

'ঠিক আছে।'

হ্যাঁ, ঠিকই আছে। আমি কেবল দৈবের দয়ার কথা ভাবছিলুম। জলের তলায় ঝাপশা আলোয় লিউটেনান্টের দিকে তাকিয়ে দেখলুম একবার। বছর তিরিশ বয়েস হবে তাঁর – ঠাণ্ডা গোছের মানুষ, নিরীহমতো, অথচ মুখে তবু দৃঢ়তার ছাপ। অর্থাৎ যাকে বলে পুরোদস্তুর ইংরেজ সৈনিক : প্রায় যেন যন্ত্রের মতো নিখুঁতভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছেন, কোনো উত্তেজনা নেই।

'সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে আসবার সময় মনে হচ্ছিলো দৈর্ঘ্য আশি হাতের বেশি হবে না।'

আমারও তা-ই ধারণা ছিলো। জাহাজ চালাবার হুকুম দেয়া হ'লো। অত্যন্ত আস্তেই এগুতে লাগলো 'সোর্ড' – অচেনা তীর, পাছে কোনো পাথরে ঘা লেগে

banglabooks.in

যায়। মাঝে-মাঝে তড়িৎ-লণ্ঠনের আলোয় পাথরের দেয়ালের শ্যাওলা-কালো গা দেখা যাচ্ছে, অমনি জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে আবার জলের দিকে ফেরানো হচ্ছে। পাঁচ মিনিট কেটে গেলো, তবু কিন্তু সুড়ঙ্গের মুখটার পাত্তা পাওয়া গেলো না।

আমি পরামর্শ দিলুম, 'জলের উপর ভেসে উঠলে হয় না? তাহ'লে হয়তো সুড়ঙ্গের মুখটা বার করতে সুবিধে হবে।'

'আমিও তাই ভাবছিলুম, ম'সিয় আর্‌ৎ। আপনি ঠিক ক'রে দেখাতে পারবেন তো মুখটা কোথায়?'

'পারবো।'

'ব্বাস, ঠিক আছে।'

সতর্কতা স্বরূপ আলো নিভিয়ে দেয়া হ'লো। চৌবাচ্চাগুলো থেকে সব জল বার ক'রে ফেলা হ'লো তারপর, আর 'সোর্ড' অমনি আবার জলের উপর ভেসে উঠলো। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে পেরিস্কোপের মধ্য দিয়ে সব দেখতে লাগলুম। তীরের আলোয় দেখি 'সোর্ড' মৌচাকের পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে।

'কী দেখছেন?' ডেভন জিগেশ করলেন।

'আমরা বড্ড-বেশি উত্তরে এসে পড়েছি। সুড়ঙ্গটা হচ্ছে গহ্বরের ঠিক পশ্চিম দিকে।'

'কেউ আছে তীরে?'

'না।'

'ভালোই হ'লো। তাহ'লে জলের উপর ভেসেই থাকবো। আপনার যেই মনে হবে সুড়ঙ্গের মুখে এসে পড়েছি, তখুনি ডুবে গেলে চলবে।'

তাই ভালো। বিশ হাত যেতে-না-যেতেই আমি থামতে বললুম। আবার জল ভরা হ'লো চৌবাচ্চায়, 'সোর্ড' আবার ডুবে গেলো জলের তলায়। বোতাম টিপে আলো জ্বালানো হ'লো আবার; অমনি দেয়ালের গায়ে দেখা গেলো একটা বর্তুল দুয়ার।

'ওই তো! ওই তো সুড়ঙ্গের মুখ!'

এটাই মুক্তির দুয়ার—এই সুড়ঙ্গের বাইরেই তো স্বাধীনতা—খোলা হাওয়া, খোলা আকাশ, খোলা সমুদ্র।

আস্তে-আস্তে সেই বর্তুল দুয়ারের দিকে এগিয়ে গেলো 'সোর্ড'।

হঠাৎ সুড়ঙ্গের মধ্যে দেখা গেলো ঝাপশা একটা আলোর রেখা। বোধহয় চল্লিশ হাতও দূরে হবে না। আলোটা ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। নিশ্চয়ই

banglabooks.in

কের কারাইয়ের ডুবোজাহাজের আলো—না-হ'লে সুড়ঙ্গের মধ্যে এই ধাবমান আলো এলো কোত্থেকে !

'সর্বনাশ ! কের কারাইয়ের ডুবোজাহাজটা ফিরে আসছে !' আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

ডেভন চীৎকার ক'রে হুকুম দিলেন, 'পেছিয়ে আনো জাহাজ, পেছিয়ে আনো !'

ঠিক সুড়ঙ্গের মুখে ঢুকতে যাবার আগটাতেই 'সোর্ড' আবার পেছিয়ে আসতে লাগলো।

হয়তো এখনো পালাবার উপায় আছে। চট ক'রে 'সোর্ড'-এর সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হ'লো ! হয়তো কাপ্তেন স্পেড বা তার মাল্লাদের কেউই আমাদের দেখতে পায়নি। আমরা যদি পাশেই স'রে থাকি, কের কারাইয়ের ডুবোজাহাজ হয়তো আমাদের দেখতে পাবে না, সোজা গিয়ে জেটিতে নোঙর ফেলবে। হয়তো আলো নেভানো 'সোর্ড'-কে জলের মধ্যে আলাদা ক'রে দেখাই যাবে না।

দক্ষিণ দিকের তীরের পাশে ফিরে এসে 'সোর্ড' থামলো।

কিন্তু না ! ডুবোজাহাজটা কাপ্তেন স্পেডের চোখে ঠিকই পড়েছিলো। হ্রদের জলে সেটাকেই হন্যে হ'য়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে দস্যুজাহাজ—আর তার সঙ্গে এই দুর্বল 'সোর্ড' এঁটেই বা উঠবে কী ক'রে।

ডেভন আমাকে বললেন, 'রশ যে-কামরায় আছেন, চটপট সেখানে চ'লে যান। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিন—আমি গিয়ে অন্য-সব কামরার দরজা বন্ধ ক'রে দিচ্ছি। ওরা যদি সোজা এসে ধাক্কা লাগাতে চায়, তাহ'লে "সোর্ড"-এর খোলটা হয়তো শেষ পর্যন্ত আমাদের জলের তলায় আশ্রয় হবে।'

লিউটেনাণ্ট ডেভনের মুখে কিন্তু কোনো বিচলিত ভাব দেখা গেলো না। শান্ত, সংযত, স্থিরভাবেই তিনি কথাগুলো বললেন। তাঁর হাতে একটু চাপ দিয়ে আমি তমাস রশের কামরায় গিয়ে ঢুকে পড়লুম। দরজা বন্ধ ক'রে দিতেই নিকষ অন্ধকারে কামরাটা ভ'রে গেলো !

সেই অন্ধকারেই টের পেলুম 'সোর্ড'-এর চালকরা জাহাজকে কের কারাইয়ের ডুবোজাহাজের হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে এদিক-ওদিক যাবার চেষ্টা করছে—কখনো জলের উপর ভেসে উঠছে, কখনো আবার জলেই ডুবে যাচ্ছে, এদিকে যাচ্ছে, ওদিকে যাচ্ছে, সবরকম চেষ্টা করছে যাতে ধাক্কা না-লাগে। আমার মনে হ'লো এই অস্থির জলের মধ্যে বুঝি দুই অসমান সিন্ধুদানবে একটা ভীষণ

banglabooks.in

প্রতিযোগিতা শুরু হ'য়ে গেছে।

কেটে গেলো কয়েকটা রুদ্ধশ্বাস মিনিট। তবে কি পিছু-ধাওয়া শেষ হ'লো? 'সোর্ড' কি সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে পালাতে পারবে? যেই এইসব ভাবছি, অমনি ধাক্কাটা লাগলো। খুব-যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ লাগলো, তা নয়, কিন্তু তবু ধাক্কার জেরটা টের পেতে ভুল হ'লো না। 'সোর্ড'-এর গায়ে সত্যি ধাক্কা লেগেছে—জানি না ইস্পাতের খোল তাতে জখম হ'লো কি না। জখম হ'লেই গলগল ক'রে একটা কামরায় তো জল ঢুকে যাবে! ঠিক তক্ষুনি আরেকটা ধাক্কা লাগলো—এবারকার ধাক্কাটা ভয়ংকর হ'লো। কের কারাইয়ের ডুবোজাহাজের চোখা গলুই যেন 'সোর্ড'কে এফোঁড়-ওফোঁড় ক'রে দিলে। টের পেলুম 'সোর্ড' কাৎ হ'য়ে গেলো, যেন ডিগবাজিই খেলো জলের মধ্যে। আর আমি আর রশ এ ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে গেলুম। তারপরেই তৃতীয় ও শেষ ধাক্কার পর 'সোর্ড' যেন হ্রদের তলায় একেবারে গেঁথে গেলো—ঝনঝন শব্দ হ'লো কাচ ভাঙার—তারপরেই সব স্থির, কেবল চরকি দেয়া জলের শব্দ।

তারপরে যে কী হ'লো, জানি না। আমি ঠিক তখনই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলুম। এই মাত্র জানতে পেলুম যে তারপরে অনেক—অনেক ঘণ্টা কেটে গিয়েছে! শুধু জানি যে জ্ঞান হারাবার আগে আমি ভাবছিলুম আমার সঙ্গে তমাস রশ ও তাঁর রহস্যেরও অবসান হ'য়ে গেলো—আর ব্যাকাপের দস্যুরা এই-বারে অন্তত শাস্তি না-পেয়ে রেহাই পাবে না।

অপেক্ষা

জ্ঞান ফিরে আসতেই দেখি আমার নিজের কোঠায় শুয়ে আছি। আর মূর্ছার মধ্যে তিরিশ ঘণ্টা সময় কেটে গেছে।

ঘরের মধ্যে আমি একা নই। দেখি, সেরকো ব'সে আছে পাশে। সে-ই আমাকে এতক্ষণ শুশ্রূষা করছিলো—বন্ধু ব'লে নয়, আসলে আমাকে এত যত্ন করার কারণ হ'লো পুরো ব্যাপারটার একটা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা চাই এক্ষুনি—না-হ'লে আমার প্রতি তাদের মোটেই দরদ নেই; দরকার হ'লে এক্ষুনি আমাকে

banglabooks.in

নিকেশ ক'রে ফেলতে তারা মোটেই ইতস্তত করবে না।

এখনও বড্ড দুর্বল লাগছে, সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি না। বোধহয় জলের তলায় 'সোর্ড'-এর সেই বন্ধ কামরাটায় বাতাস দূষিত হ'য়ে এসেছিলো, নিশ্বেস বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছিলো। সেরকো তো আমাকে প্রশ্ন করার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'য়ে আছে—উত্তর দিতে পারবো তো তার কথার? হ্যাঁ, তা পারবো, তবে একটু ধীরে-সুস্থে, সংক্ষেপে।

প্রথমেই লিউটেনাণ্ট ডেভন আর তাঁর অনুচরদের কথা মনে পড়লো আমার। কী হয়েছে তাঁদের? বেঁচে আছেন তো? না কি সংঘর্ষের সময় মারা গেছেন এই দুঃসাহসী ইংরেজ? রশের কথা ভাবছিলুম না—কারণ আমি আর রশ একই কামরায় ছিলুম, আমি যদি উদ্ধার হ'য়ে থাকি, তাহ'লে রশও নিশ্চয়ই প্রাণে বেঁচেছেন।

সেরকো প্রথমেই জিগেশ করলে, 'কী হয়েছিলো, আমাকে বলবেন মঁসিয় আর্‌ৎ?'

উত্তর না-দিয়ে আমি পালটা প্রশ্ন করলুম, 'তমাস রশ কেমন আছেন?'

'ভালো আছেন। কিন্তু কী হয়েছিলো, বলুন এবার।'

'প্রথমে বলুন অন্যদের কী হয়েছে?'

'কোন অন্যরা?' সেরকোর চোখে-মুখে রাগের ছাপ।

'যে-লোকগুলো আমার আর তমাস রশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো। মুখে কাপড় গুঁজে যারা আমাদের ব'য়ে নিয়ে গিয়ে বন্ধ ক'রে রাখে—কোথায় বন্ধ ক'রে রেখেছিলো, কে জানে!'

ভেবে দেখলুম, রাতে অতর্কিতে আক্রান্ত হয়েছিলুম, এটা বলাই ভালো। তাতে এটাও বলা যাবে যে সব-কিছু ঠিকমতো মনে করতে পারছি না বা আক্রমণকারী-দেরও চিনতে পারিনি।

'তাদের কী দশা হয়েছে, তা শিগগিরই জানতে পাবেন। কিন্তু তার আগে আমি জানতে চাই কীভাবে এ-সব ঘটনা ঘটলো?'

ভয়-দেখানো তার গলা; বুঝলুম আমাকে গভীরভাবে সন্দেহ করা হচ্ছে। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ তোলার কোনো প্রমাণই তো এদের হাতে নেই—ছোট্ট ডিবেটা যদি এদের হাতে পড়তো, তাহ'লে অবিশ্যি অন্যরকম হ'তো—এই জেরার কোনো দরকারই হ'তো না। সেই জন্যেই আমি বললুম যে কাল রাত্তির আটটা নাগাদ আমি যখন হ্রদের তীর দিয়ে হাঁটছিলুম তখন

banglabooks.in

হঠাৎ পিছন থেকে কারা যেন আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চট ক'রে মুখে কাপড় গুঁজে দেয় তারা, তাই চ্যাঁচাতে পারিনি, এদিকে চোখে একটা পট্টি পরিয়ে দেয়ার কোনো কিছুই দেখতে পাচ্ছিলুম না। আমাকে টেনে নিয়ে যায় তারা, তারপর মনে হয় আমাকে যেন কার সঙ্গে কীসের মধ্য দিয়ে নিচে নামিয়ে দেয়া হচ্ছে, কাৎরানি শুনে বুঝেছিলুম যে তমাস রশের গলা। মনে হচ্ছিলো যেন ভাসমান-কিছুর উপর রাখা হ'লো আমাকে—নিশ্চয়ই কের কারাইয়ের ডুবো-জাহাজ, তাছাড়া আর কীই-বা হবে? তারপর সেটা জলের তলায় ডুবে গেলো, আর তারপরেই পর-পর কতগুলো ধাক্কা লাগলো যেন কীসের সঙ্গে, কামরাটা থেকে হাওয়া ফুরিয়ে যাওয়ায় আমি শেষটায় মূর্ছিত হ'য়ে পড়েছিলুম। আর-কিছুই আমি জানি না।

গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনছিলো সেরকো। কঠিন তাঁর চোখের দৃষ্টি, কপালে ভাঁজ প'ড়ে আছে। আমি যে সত্যি বলছি না এটা বোঝবার অবস্থা তার ছিলো না। শুধু জিগেশ করলে, 'আপনার উপর তিনজন লোক ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, তা-ই তো বললেন, না?'

'হ্যাঁ। আমি ভেবেছিলুম তারা বুঝি আপনাদেরই লোক। কিন্তু তাদের কাছে আসতে দেখিনি আমি। কারা তারা?'

'অচেনা কতগুলো লোক। আপনি নিশ্চয়ই কথা শুনে বুঝতে পেরেছেন তারা কারা?'

'তারা কোনো কথাই বলেনি।'

'তারা কোন দেশের লোক জানেন না?'

'না তো।'

'পুরো ব্যাপারটা থেকে আপনার কী মনে হয়?'

'আমার কী মনে হয়, জানতে চাচ্ছেন? তখন ভেবেছিলুম কাউন্ট দাতিগাস বুঝি তাঁর অনুচরদের বলেছেন আমাকে জলে ছুঁড়ে মারতে—আর তমাস রশকেও বুঝি তাই করা হবে—তাঁর আবিষ্কারের সব কথা জেনে ফেলার পর তাঁকে বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ? সব জেনে ফেলবার পর আমাদের নিকেশ ক'রে ফেলাই তো আপনাদের ইচ্ছে ছিলো, কাজেই আমি তা-ই ভেবেছিলুম।'

'সত্যি, মঁসিয় আর্‌ৎ আপনার মাথায় ও-ধারণাটা ঢোকালে কে?' সেরকোর সেই সদাহাস্যবয়ান আর নেই।

'কিন্তু তা-ই তো হবে! আমার চোখের বাঁধন খুলতেই যে দেখলুম তারা

banglabooks.in

আমাকে ডুবোজাহাজের ভিতরে একটা কামরায় নামিয়ে নিলে।'

'ওটা মোটেই আমাদের ডুবোজাহাজ নয়। অন্য-কারু ডুবোজাহাজ—সুড়ঙ্গের মধ্যে দিয়ে ঢুকে পড়েছিলো।'

'আরেকটা ডুবোজাহাজ?' আমি অবাক হবার ভান করলুম।

'হ্যাঁ। আপনাকে আর তমাস রশকে চুরি ক'রে নিয়ে যাওয়াই তার উদ্দেশ্য ছিলো।'

'আমাদের চুরি ক'রে নিতে এসেছিলো!' আমি আরো-অবাক হ'য়ে যাবার ভান করলুম।

'এবং,' কঠিন গলায় সেরকো জিগেশ করলে, 'আমি জানতে চাই গোটা ব্যাপারটা থেকে আপনার কী মনে হয়।'

'আমার কী মনে হয়? কিন্তু আমার তো মনে হয় এর একটাই ব্যাখ্যা হ'তে পারে। আপনাদের এই আড্ডার কথা যদি কেউ না-ই জানে, কেউ যদি বিশ্বাস-ঘাতকতা ক'রে এর কথা ফাঁস ক'রে না-দিয়ে থাকে—এবং সেটা আমার সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব'লেই মনে হয়, কারণ দলের লোক ছাড়া এর কথা আর কেই-বা জানে?—তাহ'লে আমার মতে ডুবোজাহাজটা দৈবাৎই সুড়ঙ্গের মুখের মধ্যে এসে পড়েছিলো—তারপর হ্রদের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে সেটা ভেসে ওঠে, আর তার মাঝি-মাল্লারা পাতালের মধ্যে লোকজন দেখে এতই অবাক হ'য়ে যায় হাতের কাছে যাদের পায়, তাদেরই পাকড়ে নিয়ে যায়—তমাস রশ, আমি—হয়তো আর-কাউকেও ধ'রে থাকবে—কারণ আমি-তো সব জানি না।'

সেরকো ভীষণ গম্ভীর হ'য়ে আছে। আমি যে-ব্যাখ্যাটা দিচ্ছি, তার ফাঁক-গুলো তার চোখে পড়েছে না কি? আমি অনেক কথা লুকোচ্ছি, এটা ভাবছে নাকি সে? কিন্তু মনে তার যা-ই হোক, এই ব্যাখ্যাটা আপাতত গ্রহণ না-ক'রে তার উপায় কী। মুখে বললে, 'হয়তো তা-ই হয়েছিলো। সত্যিই হয়তো তা-ই ঘটেছিলো। সেই অচেনা জাহাজটি সুড়ঙ্গ ছেড়ে চ'লে যাবার সময় আমাদের ডুবোজাহাজটি সুড়ঙ্গ দিয়ে ফিরছিলো, আর দুটোর মধ্যে আচমকা মস্ত ধাক্কা লেগে যায়—তাতে ওই ডুবোজাহাজটা একেবারে টুকরো-টুকরো হ'য়ে যায়। কিন্তু আমরা চুপচাপ ব'সে কি লোকদের ডুবে-মরা দেখবো? তাছাড়া আপনার আর তমাস রশের নিখোঁজ হ'য়ে-যাওয়াটাও ততক্ষণে আমরা জেনে ফেলেছিলুম। ও-রকম মূল্যবান দুটি জীবনকে তো বেঘোরে হারানো চলে না। কাজেই তক্ষুনি আমরা কাজে লেগে যাই। আমাদের মধ্যে কেউ-কেউ আবার ওস্তাদ ডুবুরি—

banglabooks.in

তারা তক্ষুনি জলে ঝাঁপ দেয়, "সোর্ড"-এর হালের মধ্য দিয়ে দড়ি চালিয়ে দেয় তারা—'

"'সোর্ড"? মানে, তরোয়াল?' আমি হাঁদা সেজে জিগেশ করলুম।

'ওই ডুবোজাহাজটা উপরে তোলা হ'লে দেখি তার খোলে ওই নামটাই লেখা। আপনাদের ফিরে পেয়ে কী-ভালোই যে লাগলো আমাদের—অবিশ্যি অচৈতন্য ছিলেন, কিন্তু নিশ্বেস পড়ছিলো তখনও। দুর্ভাগ্যবশত "সোর্ড"-এর লোকদের কাউকেই বাঁচানো যায়নি। তারা যে-কামরায় ছিলো সেটার সঙ্গেই গিয়ে ধাক্কা লেগেছিলো কি না, তাই এই দুষ্কর্মের জন্য তারা জীবন দিয়ে দাম দিয়েছে। দৈবাৎ আমাদের আড্ডাটা দেখে ফেলেছিলো ব'লেই এইভাবে বেঘোরে তাদের মরতে হ'লো।'

লিউটেনাণ্ট ও তাঁর অনুচরদের মৃত্যুসংবাদে আমার বুকটা ভেঙে যাচ্ছিলো, কিন্তু আমাকে শোকাতুর হ'য়ে পড়লে চলবে না। আমি যদি তাঁদের না-ই চিনি, তাহ'লে তাঁদের জন্য আমার অত বিমর্ষ হ'য়ে-পড়া উচিত নয়। তাঁদের সঙ্গে যে আমার যোগাযোগ হয়েছিলো এটা কিছুতেই জানতে দেয়া চলবে না।

এইভাবে আমার মুক্তির অপ্রত্যাশিত সুযোগটা শেষ মুহূর্তে এসে ভেস্তে গেলো। কী হবে এখন? কের কারাইয়ে সম্বন্ধে সব কথা এখন লোকে জানে, কারণ আমার বিবরণ কর্তৃপক্ষের হাতে গিয়ে পড়েছে। 'সোর্ড'কে বারমুডায় ফিরতে না-দেখলে নিশ্চয়ই ব্যাকাপের বিরুদ্ধে নতুন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে! ঠিক যখন 'সোর্ড' সুড়ঙ্গ থেকে বেরুবে, তক্ষুনি যদি সেই স্কুনারটানা ডুবোজাহাজটা না-ফিরতো, এই কাকতালটা যদি না-ঘটতো, তাহ'লে এতক্ষণে আমি মুক্ত হ'তে পারতুম।

আবার সেই একঘেয়ে বন্দীজীবন শুরু হ'লো আমার। যেহেতু আমাকে বিশেষভাবে সন্দেহ করার কোনো সংগত কারণ নেই, সেই জন্যেই আগের মতোই আমি যথেচ্ছ বিচরণ করতে পারি গহ্বরের মধ্যে—কেউ আমাকে বিরক্ত করে না।

তমাস রশের উপর এই ঘটনার কোনো প্রভাবই পড়েনি। তাঁকেও আমারই মতো প্রচুর সেবাযত্ন ক'রে বাঁচানো হয়েছে। এবং তিনি আবার দিনরাত নিজের গবেষণা নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে আছেন। আগের মতোই সারাক্ষণ তিনি ল্যাবরেটরিতে কাটিয়ে দিচ্ছেন।

'এব্বা' প্রচুর মালপত্তর নিয়ে ফিরেছে দেখে অনুমান করলুম পথে নিশ্চয়ই এনতার লুঠতরাজ হয়েছে।

banglabooks.in

উৎক্ষেপ-ভিৎ স্থাপন করার কাজ যথারীতি চলছে। ক্ষেপণাস্ত্রের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ। কখনও যদি ব্যাকাপ থেকে আক্রমণ ঠেকাতে হয়, তাহ'লে কের কারাইয়ের অবিশ্যি মাত্র তিন চারটেতেই কাজ চ'লে যাবে। বিপৎসূচক অঞ্চল পেরিয়ে কোনো জাহাজেরই আসার সাধ্য থাকবে না। এখন থেকেই দস্যুরা নিশ্চয়ই প্রতিরোধ ব্যবস্থায় তৎপর হ'য়ে উঠবে। 'সোর্ড' যদি দৈবাৎই হ্রদের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে থাকে, তাহ'লে তারা জানে ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু কোনোমতে যদি এ-তথ্য কর্তৃপক্ষ জেনে থাকে যে ব্যাকাপই কের কারাইয়ের গোপন আড্ডা, এবং 'সোর্ড'-এর আবির্ভাব যদি তারই ইঙ্গিত হ'য়ে থাকে, তাহ'লে তাদের দুটো বিপদ আসন্ন : এক. হয় দ্বীপে একটানা বোমাবর্ষণ হবে ; দুই. না-হ'লে জোর ক'রে নৌবাহিনী দ্বীপে নামতে চেষ্টা করবে। কাজেই সব লুঠপাটের মাল নিয়ে ব্যাকাপ থেকে পাততাড়ি গুটোবার আগে রশ-ফুলগুরেটর দিয়েই দ্বীপের উপর আক্রমণ ঠেকাবার চেষ্টা করবে তারা। তারা আরো হয়তো ভাববে : 'হেল্‌থফুল হাউসের জোড়া গুমখুনের সঙ্গে কের কারাইয়ের সম্বন্ধ আছে ব'লে জানে নাকি জগৎ? লোকে কি জানে যে রশ আর তার রক্ষক ব্যাকাপে বন্দী হ'য়ে আছে? লোকে কি জানে যে এ-দ্বীপ আক্রমণ করার সব চেষ্টাই বিফল হ'তে বাধ্য?' এটা অবিশ্যি ঠিক যে সব ভেস্তে যাবে জেনেও জগতের নৌশক্তিগুলো চুপচাপ ব'সে থাকবে না। নিরাপত্তা ও মানবিকতার খাতিরেই তারা এই আড্ডা ধ্বংস ক'রে দিতে চাইবে। পশ্চিম-প্রশান্ত মহাসাগরে অশান্তি সৃষ্টি ক'রে হাত পাকাবার পর পশ্চিম-অতলান্তিকেও নৌযাত্রা বিপন্ন ক'রে তুলেছে কের কারাইয়ে—যেন তেন প্রকারেণ তাকে ধ্বংস করা ছাড়া নৌশক্তিগুলোর কোনো উপায় নেই। আর এইজন্যই সারাক্ষণ তারা সজাগ থাকবে।

দস্যুরা নিশ্চয়ই তা-ই ভেবেছিলো, কারণ পাহারার ভীষণ কড়াকড়ি দেখলুম। ডাঙার সুড়ঙ্গ দিয়ে সারাক্ষণ বাইরে গিয়ে তারা সমুদ্রের উপর নজর রাখছিলো। তীরের পাথরের আড়ালে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে ব'সে থেকে তারা অহোরাত্রি দিগন্তের দিকে চোখ রাখছিলো। বারো ঘণ্টা পর-পর পাহারা বদল হচ্ছে। দূরে কোনো জাহাজ দেখলেই পাগলা ঘন্টি বেজে উঠবে।

একঘেয়েভাবে দিনগুলো কাটছে। কিছুই হচ্ছে না। শুধু দস্যুদের মধ্যে সাড়া প'ড়ে গেছে। ব্যাকাপ আর আগেকার মতো নিরাপদ নেই, এই আশঙ্কায় তারা সারাক্ষণ অস্বস্তিতে কাটাচ্ছে। তীরের পাহারা 'বিপদ' জানালেই, ব্যস, যুদ্ধ শুরু হ'য়ে যাবে। এটা ঠিক যে রশ-ফুলগুরেটর অজস্র টরপেডোর

banglabooks.in

চেয়েও শক্তিশালী—কিন্তু তবু কের কারাইয়ে সেরকো আর স্পেড প্রায়ই কী-সব আলোচনা ও শলাপরামর্শ করে। হয়তো দ্বীপ ছেড়ে চ'লে যাবে কিনা, তা-ই তারা ঠিক করতে চাচ্ছে। একবার যদি বহির্জগৎ তাদের আড্ডার সন্ধান পায়, তাহ'লে এমনকী উপোশ করিয়েও মারতে পারে তাদের।

আমাকে অবিশ্যি এখনো এরা সন্দেহ করেনি। এরা জানেই না যে আমারই ভাসানো ডিবে থেকে বিবরণ উদ্ধার ক'রে কর্তৃপক্ষ 'সোর্ড'কে পাঠিয়েছিলেন। একটু সন্দেহ হ'লেই, ঠিক জানি, কের কারাইয়ের নির্দেশে, লিউটেনাণ্ট ডেভনদের মতো আমারও সলিল সমাধি হ'তো।

আজকাল রোজই ঝড় হয়। চুড়োর ফোকর দিয়ে রাগি হাওয়া গর্জায় কেবল। স্তব্ধ অরণ্যে ঘূর্ণিহাওয়া ওড়ে, আর অদ্ভুত-সব গুমগুমে আওয়াজ ওঠে গহ্বরে। ঝড়ের হাত থেকে পালিয়ে গাংচিলেরা এসে গহ্বরে আশ্রয় নিয়েছে—তাদের বিলম্বিত তীক্ষ্ণ চীৎকারে মাঝে-মাঝে স্তব্ধতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে যায়।

এই বিশ্রী আবহাওয়ায় 'এব্বা' কিছুতেই সাগরপাড়ি দিতে পারবে না। তবে আপাতত তার তাড়াও নেই, কারণ এই মুহূর্তে গুদোমভর্তি রশদ আছে। তাছাড়া ভবিষ্যতেও মারকিন উপকূলে 'এব্বা'র আনাগোনা নিরাপদ হবে কিনা, সে-বিষয়ে নিশ্চয়ই তাদের সন্দেহ আছে। 'সোর্ড' কি দৈবাৎ এসে পড়েছিলো, না কি সব শুলুকসন্ধান জানতো? এটাই সবচেয়ে জরুরি প্রশ্ন। এরই সঙ্গে ব্যাকাপের ভবিষ্যৎ ওতপ্রোতভাবে জড়ানো!

সেদিন সেরকোর সঙ্গে ল্যাবরেটরির পাশে দেখা হ'য়ে গেলো। সেরকোই 'সোর্ড'-এর কথা পাড়লে। তার অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবকে এখন নাকি তার সজ্ঞান আক্রমণ ব'লেই মনে হচ্ছে।

'আমার কিন্তু তা মনে হয় না', আমি বললুম।

সেরকো জিগেশ করলে, 'কেন?'

'কারণ, যদি এরা এই আড্ডার খবরই জানতো তাহ'লে অ্যাদ্দিনে আরেকটা আক্রমণ হ'তো—হয়তো গহ্বরে আর ঢুকতো না, কিন্তু বোমা মেরে দ্বীপটাকেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা হ'তো।'

'বোমা মেরে দ্বীপটা উড়িয়ে দেবে! অসম্ভব—আমাদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা এ-রকম জোরালো যে সে-চেষ্টাই কেউ করবে না!'

'কিন্তু তা কি তারা জানে? ইওরোপ-আমেরিকায় কেউই তো এটা জানে না যে তমাস রশকে কারা চুরি করেছে—কারা তাঁর আবিষ্কারটা নগদ দামে কিনে

banglabooks.in

নিয়েছে।'

সেরকো এ-কথার কোনো উত্তর দিলে না। সত্যি-বলতে এই অকাট্য যুক্তির উপর কোনো কথাই চলতো না। আমি আবার বললুম, 'কাজেই নৌশক্তিগুলো যদি দ্বীপটা ধ্বংস করতে অনেকগুলো জাহাজ পাঠাতো, তাহ'লে দ্বীপের কাছে এসে বোমা বর্ষণ করতে তারা মোটেই দ্বিধা করতো না। কিন্তু সেটা যখন ঘটেনি, তখন বোঝাই যাচ্ছে যে তারা এখনও কের কারাইয়ের হদিশ পায়নি।'

'হয়তো তাই। কিন্তু তারা জানুক বা না-জানুক, দ্বীপের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যেই কোনো মানোয়ারি জাহাজ এলে তাকে আমরা রশ-ফুলগুরেটর দিয়ে উড়িয়ে দেবো।'

'তা পারবেন। কিন্তু তারপর?'

'তারপর? তারপর আর-কার এত স্পর্ধা হবে?'

'তাও হয়তো ঠিক—আর-কারু সে স্পর্ধাই হবে না। কিন্তু তারা দ্বীপটার চারপাশে হয়তো অবরোধ গড়ে ব'সে থাকবে। আর "এব্বা"ও সে-ক্ষেত্রে কাউন্ট দ্যাতিগাসকে নিয়ে কোনো বন্দরে গিয়ে ভিড়তে পারবে না। তখন আপনারা লোকেদের খাওয়াবেন কী?'

সেরকো এ-কথার কোনো জবাব দিলে না। তারাও নিশ্চয়ই এ-কথা আগে ভেবেছে। দস্যুরা যে ব্যাকাপ ছেড়ে পাততাড়ি গুটোবে, তাতে আর আমার সন্দেহ রইলো না। কোনঠাশা হ'য়ে গিয়ে সেরকো বললে, 'কিন্তু আমাদের তো ডুবোজাহাজটা আছে। "এব্বা" যা পারবে না, তা সে পারবে নিশ্চয়ই।'

'ডুবোজাহাজ? কের কারাইয়ের সব গোপন কথাই যদি লোকে জেনে থাকে, তাহ'লে তো ডুবোজাহাজের কথাটাও তো কারু আর অজানা নেই।'

সন্দেহের চোখে আমার দিকে তাকালে সেরকো। 'মঁসিয় সিমোন আর্‌ৎ, আপনি দেখছি অনেক-দূর অব্দি ভেবে ফেলেছেন! আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যত কথা বলছেন, তার চেয়েও ঢের বেশি তথ্য জানেন। ভঙ্গিটা তো সবজান্তার।'

এ-কথা শুনেই আমি চুপশে গেলুম। জলন্ত ক্রুদ্ধ চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে সেরকো, যেন আমার মগজটা তন্নতন্ন ক'রে দৃষ্টি দিয়ে হাৎড়াতে চাচ্ছে। তবু আমি উপস্থিত বুদ্ধি হারালুম না, ঠাণ্ডা মাথায় বললুম, 'মিস্টার সেরকো, আমার পেশা ও স্বভাব দুইই আমাকে যুক্তির প্রতি অনুরক্ত করেছে। আপনিই ভালো ক'রে ভেবে দেখুন—যুক্তি খাটালে এ-কথাই কি মনে হয় না।'

banglabooks.in

এ-কথার পর সেরকো চলে গেলো। কে জানে আমাকে কতটা সন্দেহ করেছে। পুরো ব্যাপারটায় আমার হাত আছে ব'লে ভাবছে নাকি? তাহ'লেই তো সর্বনাশ!

আবহাওয়া এদিকে ক্রমেই খারাপ হচ্ছে। আগের চেয়েও ভয়ঙ্কর ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে রোজ। এইজন্যেই কি ব্যাকাপের উদ্দেশে আর কোনো অভিযান শুরু হচ্ছে না? 'সোর্ড'কে ফিরতে না-দেখে নিশ্চয়ই এটা সবাই বুঝেছে যে দস্যুরা তাকে ধ্বংস ক'রে ফেলেছে। এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই নতুন অভিযানের উদ্যোগ হওয়া উচিত!

দূর বারমুডার দিগন্ত আমাকে যেন শয়নে-স্বপনেও হাতছানি দিয়ে ডাকে। কবে মুক্তি পাবো? কবে?

+

১৭ সেপ্টেম্বর

আজ বিকেলে মৌচাকে ঢিল পড়েছে। হুলুস্থুল পড়ে গেছে চারদিকে। যে-যার কোঠা ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে—হইচই, চ্যাঁচামেচি, শোরগোল—কান পেতে কিছু শোনাই দায়।

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠে আমিও বাইরে বেরিয়ে এলুম।

দস্যুরা সবাই ডাঙার সুড়ঙ্গটার দিকে ছুটেছে। কের কারাইয়ে, সেরকো, স্পেড, গিবসন, এফরনডাট, সেই ষণ্ডামার্কা মালয়—কেউ বাকি নেই, সবাই সেই সুড়ঙ্গের কাছে উত্তেজিতভাবে দাঁড়িয়ে।

উত্তেজনার কারণটা তক্ষুনি জানা গেলো। পাগলা ঘন্টি বেজেছে। তীরের পাহারারা বিপদ জানিয়েছে।

উত্তর-পশ্চিমে নাকি কয়েকটা মানোয়ারি জাহাজ দেখা গেছে—সশস্ত্র যুদ্ধজাহাজ—আর সব-কটা জাহাজই পুরোদমে ব্যাকাপের দিকে ছুটে আসছে।

১৬

এখনও কয়েক ঘণ্টা

খবরটা শোনবামাত্র আমার বুকের ভেতরটায় যে কী-রকম ক'রে উঠলো কী বলবো! তাহ'লে এই হচ্ছে শেষের সময়—সংকটকাল, তুঙ্গ মুহূর্ত, জিরো-আওয়ার! এতদিন

banglabooks.in

আমি রোজনামচা লিখেছি। এখন থেকে ঘণ্টায়-ঘণ্টায় কী হচ্ছে, লিখতে হবে—প্রতি মুহূর্তে কী-হচ্ছে লেখা চাই। কে জানে তমাস রশের আবিষ্কারের শেষ সূত্রটা এখন জানা যাবে কি না—তারপর যদি সেটা লিখে রাখার অবসর না-পাই। যদি এই ভীষণ যুদ্ধে ম'রে যাই, তাহ'লে এই পাঁচ মাসের বিবরণ তো পাবে আমার এই লেখায়—তাতেই সবাই সব কথা জানতে পারবে!

কের কারাইয়ে দলবল নিয়ে বাইরে উপকূলে চ'লে গেছে। যাবো নাকি তাদের পিছন-পিছন? গিয়ে লুকিয়ে থাকবো পাথরের আড়ালে!

মনস্থির করার আগেই তারা আবার মৌচাকে ফিরে এলো। তীরে কুড়ি-জনের কড়া পাহারা রেখে এসেছে তারা। আজকাল আবার দিনগুলো বড্ড ছোটো, কালকের আগে ভয়ের কিছু নেই। আপাতত জোর ক'রে কেউই দ্বীপে নামবার চেষ্টা করবে না। আর যেহেতু তারা জানে ব্যাকাপের প্রতিরোধব্যবস্থা কী-ভীষণ, সেই জন্য নৈশ আক্রমণের চেষ্টাও তারা করবে না।

সন্ধে অবধি তীরের নানা জায়গায় উৎক্ষেপ-ভিৎ বসানোর কাজ চললো। ছ-টা উৎক্ষেপ-ভিৎ বসানো হয়েছে: কোথায় সেগুলো বসানো হবে, তা তারা আগেই ঠিক ক'রে রেখেছিলো।

এ-কাজগুলো শেষ হ'তেই সেরকো চ'লে গেলো তমাস রশের ল্যাবরেটরিতে। সে কি সব খুলে বলতে গেলো? যুদ্ধজাহাজ আসছে দ্বীপের দিকে, প্রতিরোধের জন্য রশ-ফুলগুরেটর চাই—এটাই কি সে জানাতে গেলো?

একটা জিনিশ ঠিক জানি। ক্ষেপণাস্ত্রর সংখ্যা হচ্ছে পঞ্চাশ—প্রত্যেকটার মধ্যে কয়েক পাউণ্ড ক'রে বিস্ফোরক ভরা। উড়োন-চাকতির মতো এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো; স্বয়ংচল ব্যবস্থা আছে ব'লে অন্য গোলাগুলির চেয়ে অনেক-বেশি দূর যেতে পারে, তারপর লক্ষ্যে পৌঁছে ব্যুমেরাং-এর মতো একবার পাক খেয়েই তা ফেটে পড়ে।*

কয়েকটা কাচের নল ভর্তি ডেটোনেটর তৈরি করেছেন রশ, আর আমি এটা

---

* জুল ভের্ন-এর এই বর্ণনা থেকে অবশ্য বোঝা যায় যে তিনি পরমাণু ফাটাবার কথা বলছেন না। রশ-ফুলগুরেটর যখন ভীষণ শব্দে ফাটে, তখন আগুনও জ্বলে না, ধোঁয়াও ওঠে না—শুধু এক ঝলক প্রচণ্ড গ্যাস বেরিয়ে আসে, আর এই গ্যাসের জোরেই সে চ'লে যায় তার লক্ষ্যের দিকে। রকেটের মতো উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয় না, বরং বাঁকাভাবে ক্রমবর্ধমান গতিতে নিচু দিয়ে উড়োন-চাকতির মতো লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যায়। এটা ফাটাতে চাই তরল ডেটোনেটর—এই ডেটোনেটর জমতে সময় লাগে মোট পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড—আর তারপরেই গ্যাস বেরোয়, স্বয়ংচল প্রপেলার বেগে ঘুরে ওঠে। [অনুবাদকের টীকা।]

banglabooks.in

ভালো ক'রেই জানি যে দস্যু কের কারাইয়ের সহযোগিতা করতে তিনি একটুও দ্বিধা করবেন না।

সাজ-সাজ রবের মধ্যেই রাত ক'রে এলো। গহ্বরের মধ্যেটায় ঝাপশা অন্ধকার, কারণ কেবল মৌচাকের খুপরিগুলোতেই আলো জ্বলছে, বাইরের আলোগুলো আর জ্বালানো হয়নি।

আমি নিজের কোঠায় ফিরে এলুম। এখন আর কারু চোখে পড়তে চাই না। কে জানে এই ধাবমান জাহাজগুলোকে দেখে আমার উপর সেরকোর সন্দেহটাই দৃঢ়তর হয়েছে কি না?

কিন্তু কোন দেশের জাহাজ এগুলো? এই অভিযানটা কি 'সোর্ড'-এর মতোই ইংরেজচালিত? না কি এদের মধ্যে সব দেশেরই জাহাজ আছে? জানি না। আমার পক্ষে তা জানাও অসম্ভব।···কিন্তু কী-ই বা এসে-যায় তাতে? দস্যুদের আড্ডাটা ধ্বংস করতে হবে, এটাই হচ্ছে সব জাতির একমাত্র লক্ষ্য।

সেরকোর তত্ত্বাবধানে ঠাণ্ডাভাবে প্রতিরোধব্যবস্থার কাজ চলছে। পাল্লার মধ্যে এলেই দস্যুরা যে জাহাজগুলোকে ধ্বংস করবে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। রশ-ফুলগুরেটরের উপর তাদের অসীম আস্থা। এই জাহাজগুলো যেহেতু তাদের কোনোই ক্ষতি করতে পারবে না, সেইজন্যে এগুলোকে তারা পরমানন্দেই ধ্বংস ক'রে দেবে।

ন-টা নাগাদ কোঠা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম—আর থাকতে পারছিলুম না ভিতরে। এই মুহূর্তে কেউ আমার কথা ভাবছে না, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে হয়তো স'রে পড়তে পারবো। ঈশ! একবার যদি সুড়ঙ্গটা দিয়ে বাইরে গিয়ে পাথরের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে পারতুম! কেন, অসুবিধে কোথায়? সব্বাই তো বাইরে যে-যার কাজে ব্যস্ত। গা ঢাকা দিয়ে স'রে পড়লেই হয়।

হ্রদের পাশে কেউ নেই, কেবল সুড়ঙ্গের মুখে সেই ষণ্ডামার্কা মালয়টা দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে এগুতে-এগুতে ল্যাবরেটরির কাছে এসে পড়লুম। তমাস রশ কী করছেন এখন? হয়তো তাঁকে যুদ্ধ-জাহাজগুলোর কথা বলাই হয়নি। হয়তো একেবারে শেষ মুহূর্তে সেরকো তাকে এ-কথা ব'লে প্রতিশোধ নেবার জন্য ভীষণভাবে চেতিয়ে তুলবে।

কিন্তু আমি গিয়ে সব কথা খুলে বললে পারি না? কী-ভীষণ কাণ্ডের দায়িত্ব তাঁর উপর বর্তাতে চলেছে, সেটা বোঝালে কি তাঁর মতি পরিবর্তিত হবে না?

banglabooks.in

স্তম্ভিত তাঁর বুকের মধ্যে দেশপ্রেম যদি জাগিয়ে তুলতে পারি, যদি তাঁর মানবিকতায় ঘা দিতে পারি ?...

একাই তাঁর ল্যাবরেটরিতে ব'সে-ব'সে কাজ করছেন রশ, ডেটোনেটর বানাচ্ছেন।

সন্তর্পণে চট ক'রে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়লুম আমি।

একেবারে একাই আছেন রশ, এখন তিনি হেল্‌থফুল হাউসের ১৭ নম্বর মণ্ডপের উন্মাদ রোগী নন, এখন তিনি উদ্ভাবক, প্রতিভাবান বৈজ্ঞানিক : এইমাত্র দুটি কাচের নল নামিয়ে রাখলেন তিনি টেবিলে। একটা কাচের নল আলোয় তুলে ধ'রে দেখতে লাগলেন। সেই টলটলে নীল জল দেখে আমার মন শঙ্কায় ভ'রে গেলো।

ডাক দিলুম, 'তমাস রশ।'

মাথা তুলে ঘুরে দাঁড়ালেন তিনি, তাকিয়ে দেখলেন আমাকে। 'আহা! তুমি, সিমোন আর্‌ৎ!' তাঁর গলার স্বর চরম ঔদাসীন্যে ভরপুর।

তাহ'লে তিনি আমার নাম জেনে ফেলেছেন? নিশ্চয়ই সেরকো তাঁকে আমার সব কথা খুলে বলেছে। 'আপনি জানেন আমাকে?'

'খুব জানি। কেন তুমি আমার দেখাশুনো করছিলে, তাও জানি। তুমি চাচ্ছিলে আমার আবিষ্কারের সব সূত্র জেনে নিতে!'

সব জানেন ব'লে ভালোই হ'লো। সব কথা তাঁকে খুলে বলতে সুবিধে হবে।

'তা তুমি সফল হ'তে পারোনি, সিমোন আর্‌ৎ,' কাচের নলটা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে রশ বললেন, 'এ-যাবৎ কেউই এর কোনো কথা জানে না—কেউ কোনোদিন জানবেও না।'

আরো-ভালো ; ডেটোনেটর বানাবার উপায় তিনি তাহ'লে খুলে বলেননি। সরাসরি তাঁর চোখের দিকে তাকালুম আমি। 'আমি কে, তা তো জানেন। কিন্তু আপনি কোথায় আছেন, তা কি জানেন?'

'আমি আমার বাড়িতে আছি!'

হুম! কের কারাইয়ে এটাই তাঁর মাথায় ঢুকিয়েছে। এই ব্যাকাপকে তিনি নিজের বাড়ি ব'লেই ভাবছেন। এই-যে কুবেরের ঐশ্বর্য এখানে জড়ো আছে, তাঁর ধারণা এ-সব তাঁরই। যদি ব্যাকাপ কেউ আক্রমণ করে তো এ-সব কেড়ে নিতেই। এবং সেক্ষেত্রে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা তাঁর পক্ষে মোটেই

banglabooks.in

অসংগত নয়। 'আমার কথা শুনুন, ডেম্বাস রশ!'

'আমাকে তুমি কী বলতে চাচ্ছো, সিমোন আর্‌ৎ?'

'এই যে-গুহায় আমাদের জোর ক'রে ধ'রে-আনা হয়েছে, এটা একটা জল-দস্যুর আড্ডা।'

তক্ষুনি আমাকে থামিয়ে দিলেন রশ: 'আমি তোমাকে বলছি, সিমোন, এই যে-ঐশ্বর্য দেখছো, এ-সবই আমার আবিষ্কারের দান। আমারই ঐশ্বর্য এ-সব। রশ-ফুলগুরেটরের জন্য যে-দাম চাচ্ছিলুম, যে-দাম কেউ আমাকে দিতে চায়নি, এমনকী আমার নিজের দেশও যে-দাম দিতে চায়নি—সেই দামই আমি পেয়েছি। আমি কাউকে এর একটা কানাকড়িও স্পর্শ করতে দেবো না!'

এই প্রলাপের উত্তরে আমি কী বলতে পারি? তবু আরেকবার চেষ্টা করলুম, 'হেল্‌থফুল হাউসের কথা আপনার মনে আছে?'

'মনে নেই আবার। সেখানেই তো আমাকে বন্দী ক'রে রাখা হয়েছিলো আর গেডন এসেছিলো আমার সব আবিষ্কার মেরে দিতে!'

'মোটেই না। আপনি যদি সূত্রগুলো বলতেন, তাহ'লে তার জন্য সব সম্মান ও ঐশ্বর্য আপনিই পেতেন। আমাকে অতটা নীচ ভাববেন না। কিন্তু আপনি তখন অসুস্থ ছিলেন। আপনার মনের বিকার হয়েছিলো। অথচ আপনি যে-আবিষ্কার করেছেন, মানবজাতি তা হারালে মানবতারই ক্ষতি। হ্যাঁ, আপনি যদি বিকারের ঘোরে কখনও সূত্রটা বলতেন তাহ'লে সব খ্যাতি ও বিত্ত আপনিই পেতেন!'

'সত্যি, সিমোন আর্‌ৎ।' রশের গলা ঘৃণায় ভ'রে গেলো। 'বিত্ত আর খ্যাতি! ফুঃ! এখন ও-সব কথা বলার সময় নয়, সিমোন—বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে। তুমি ভুলে যাচ্ছো যে তারা আমাকে একটা ঘরে বন্দী ক'রে রেখেছিলো, পাগল ঠাউরেছিলো আমাকে। ঠাউরেছিলো, কারণ আমি কখনো বিচারবুদ্ধি হারাইনি, ককখনো না। দেখছো তো স্বাধীন হবার পর কী বানিয়েছি!'

'স্বাধীন? আপনি নিজেকে স্বাধীন ভাবছেন? এই গর্তের মধ্যে? এ-তো হেল্‌থফুল হাউসের চৌহদ্দির চেয়েও ছোটো জায়গা।'

'এটাই আমার ঘরবাড়ি! যখন-খুশি বেরুবো, যখন-খুশি এখানে থাকবো। মুখ থেকে একটা কথা খশালেই দেখবে আমার জন্য সব দরজা খুলে যাবে! এটা আমার বাড়ি! কাউন্ট দাতিগাস সব সমেত এটা আমাকে দিয়ে দিয়েছেন। যারাই এটা আক্রমণ করতে আসবে, তারাই মরবে। এই ছাখো, এই নলটা

banglabooks.in

সব্বাইকে ধ্বংস ক'রে দেবে !'

'কাউণ্ট দার্তিগাস আপনাকে ঠকিয়েছে। জানেন সে কে? ভীষণ দস্যু—কের কারাইয়ে !'

জানি না এই নাম শুনে রশ মোটেই বিচলিত হলেন কি না। কিন্তু তাঁর মুখে কোনো রেখাপাতই হ'লো না। বললেন, 'কের কারাইয়ে কে, তা আমি জানি না। আমি চিনি কেবল কাউণ্ট দার্তিগাসকে।'

আমি শেষ চেষ্টা করলুম, 'তমাস রশ ! কাউণ্ট দার্তিগাস আর কের কারাইয়ে একই লোক ! ও যে রশ-ফুলগুরেটর কিনেছে, তা কেবল দস্যুতার সুবিধের জন্য ···সে হ'লো দস্যুদের সর্দার !'

'দস্যু ?' রশ ক্রমেই ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠছিলেন, 'দস্যু হ'লো তারা, যারা আমাকে জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে যেতে এসেছিলো, "সোর্ড"-এর লোকগুলো—সেরকো আমাকে সব খুলে বলেছে !'

'না, তমাস রশ। দস্যু হ'লো তারাই, যারা আপনাকে ব্যাকাপের গহ্বরে বন্দী ক'রে রেখেছে, আপনার প্রতিভা দিয়ে যাদের আপনি রক্ষা করতে চাচ্ছেন। আপনার আবিষ্কারের সব সূত্র একবার জেনে ফেললেই দেখবেন তারা আপনাকে কী করে ?'

ভীষণ ক্রুদ্ধভাবে রশ আমাকে বাধা দিলেন। আমার কথা তিনি শুনতেই চাচ্ছেন না। নিজের ভাবনাতেই তিনি তন্ময়—সেই প্রতিশোধের ইচ্ছাটাকেই তিনি তীব্রভাবে লালন করেছেন এতদিন, আর সেরকো তাকেই সুদে-আসলে কাজে খাটিয়েছে। ঘৃণায় ভ'রে গিয়ে তিনি বললেন, 'বদমায়েশ হ'লো তারাই যারা আমাকে ফিরিয়ে দিয়েছে, যারা আমার উপর অবিচার করেছে, যারা আমাকে দেশে-দেশে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে ! কেন ? না, প্রতিদানে আমি কিনা তাদের শ্রেষ্ঠতা চাচ্ছিলুম, দিতে চাচ্ছিলুম অসীম ক্ষমতা, অপরাজেয় গৌরব !'

আবিষ্কর্তার সেই চিরন্তন অভিযোগ : কেউ কথা শুনতে চাচ্ছে না ; যারা বুদ্ধিতে খাটো, যারা ঈর্ষাতুর তাদের প্রত্যাখান, এমনকী তাদের বিষম অবহেলা। ···সব জানি আমি। এ-সম্বন্ধে কী-না জানি আমি ! কিন্তু তমাস রশের সঙ্গে এখন এ-সম্বন্ধে কথা বলার আর অবসর কই ? সেই মোচড়-খাওয়া দুমড়ে-যাওয়া মনে কোনো যুক্তিতর্কই এখন ছাপ ফেলবে না। তাঁর বুকে কেবল ঘৃণাই এখন প্রজ্বলন্ত ; হতাশাপ্রসূত ঘৃণা আর সেরকোর চতুর পরামর্শ—এই দুটি বিষয় তাঁকে এমনভাবে অন্ধ ও বধির ক'রে রেখেছে যে আমার কোনো কথাই তাঁর কাছে পৌঁছুচ্ছে না।

banglabooks.in

কী করবো তাহ'লে আমি ? মানবতার এই বিষম শোচনীয়তার সামনে নিরস্ত্র দাঁড়িয়ে কী করতে পারি আমি ? পোকায়-কাটা তাঁর বিবেকের ঠিক কোনখানে যা দিলে তিনি সাড়া দেবেন ? যা ঘটবার তা-ই ঘটবে, আমি বাধা দেবার কে ? কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যে-ভীষণ সর্বনাশ উৎপন্ন হবে, আমি তাতে কোনো বাধাই দিতে পারবো না। পারবো না, কারণ রশ আমার দিকে তাকাতে পর্যন্ত চাচ্ছেন না। আমি যে ঘরেই আছি, তা-ই যেন তিনি ভুলে গেছেন ; যেন এইমাত্র তাঁর সঙ্গে আমার কোনো কথাই হয়নি। আবার একমনে তিনি নিজের কাজে ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন।

একটাই কেবল উপায় খোলা আছে। এই অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় রোধ করবার একটাই মাত্র রক্তাপ্লুত উপায় : তাঁকে ধ'রে বেঁধে, চাই কি হত্যা ক'রে ডেটোনেটর বানানো থেকে রোধ করতে হবে।…হ্যাঁ, হত্যা ক'রে…এটা আমার কর্তব্য। এটা আমার অধিকার।

কিন্তু কোনো অস্ত্র নেই আমার। দেখি বেঞ্চির উপরে একটা হাতুড়ি ও বাটালি প'ড়ে আছে।…তুলে নেবো ? মারবো মাথায় সজোরে ? তাঁকে হত্যা ক'রে কাচের নলগুলো ভেঙে ফেললেই তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর আবিষ্কারও চিরতরে লুপ্ত হ'য়ে যাবে। জাহাজগুলো তখন অনায়াসে দ্বীপে ভিড়তে পারবে, ব্যাকাপে নেমে আসবে সবাই, দস্যুদের হঠিয়ে দেবে। একজনকে হত্যা করলেই যদি অগুনতি নিরীহ ও অসহায় মানুষদের বাঁচানো যায়, তাহ'লে কী আমার ইতস্তত করা উচিত ?

এগিয়ে গেলুম টেবিলের দিকে। ইস্পাতের তৈরি তীক্ষ্ণ একটা ফলা প'ড়ে আছে। হাত বাড়ালুম আমি।…আর রশ আমার দিকে ফিরে দাঁড়ালেন ! বড্ড দেরি হ'য়ে গেছে। এখন তাঁকে মারতে গেলেই ধস্তাধস্তি হবে, যার অর্থ চীৎকার চ্যাঁচামেচি ! আর তক্ষুনি দস্যুরা এসে আমাকে ধ'রে ফেলবে। তারপর…

আবারও তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম জাগাবার চেষ্টা করলুম। বললুম, 'তমাস রশ ! কতগুলো জাহাজ আসছে দ্বীপের দিকে, দস্যুদের আড্ডা ধ্বংস ক'রে ফেলতে আসছে। হয়তো তাদের একটার মাস্তুলে উড়ছে ফ্রান্সের পতাকা !'

ফ্যালফ্যাল ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন রশ। জানতেন না যে দ্বীপটা আক্রান্ত হ'তে চলেছে। যেই কথাটা তাঁর মাথায় ঢুকলো, অমনি ধ্বক ক'রে তাঁর চোখ দুটো জ্ব'লে উঠলো।

'তমাস রশ, আপনি কি নিজের দেশের পতাকার উপর বোমা ছুঁড়বেন ? সেই

banglabooks.in

তেরঙ্গা ঝাণ্ডা ?'

রশ মাথা তুললেন। একটু যেন অস্বস্তি বোধ করলেন, তারপরেই সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেললেন যেন একঝটকায়।

'নিজের দেশের উপর বোমা ফেলবেন ?'

'কোনো দেশ নেই আমার,' চেঁচিয়ে উঠলেন রশ, 'প্রত্যাখ্যাত বৈজ্ঞানিকের কোনো দেশ থাকে না। যেখানে সে আশ্রয় পায়, সেটাই তার দেশ। এরা আমার সম্পত্তি কেড়ে নিতে চায়···আমি আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করবো। কার সাধ্য আমার দ্বীপ আক্রমণ করে ?'

তারপর দরজার দিকে ছুটে গেলেন তিনি, জোরে দরজা খুলে চেঁচিয়ে উঠলেন : 'বেরিয়ে যাও !···বেরিয়ে যাও।' এত-জোরে চিৎকার ক'রে উঠলেন যে যেন একেবারে মৌচাক পর্যন্ত তাঁর গলা পৌঁছুলো।

এক মুহূর্তও নষ্ট করার নেই আর। আমি চট ক'রে বেরিয়ে এলুম।

১৭

একলা, পাঁচজনের বিরুদ্ধে

প্রায় এক ঘণ্টা ধ'রে অস্থিরভাবে ব্যাকাপের বিমর্ষ গিলেনের তলায় স্তব্ধ অরণ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি, একেবারে গহ্বরের শেষ মাথায় এসে পড়েছি। দেয়ালগুলো যেন আরো-পুরু আরো-নিরেট আরো-ভারি হ'য়ে উঠেছে, কেমন-যেন বুকের উপর চেপে বসতে চাচ্ছে। যেন আমাকে সম্পূর্ণ নিষ্পিষ্ট ক'রে ফেলে তবেই তারা শান্ত হবে।

কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ নিজেকে আবার মৌচাকের কাছে আবিষ্কার করলুম, ঠিক নিজের কোঠার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু কী পাবো আমি ওই খুপরিতে ? বিশ্রাম ? সুষুপ্তি ? সব অস্থিরতার অবসান ? অসম্ভব, এত অস্থির হ'য়ে আছি যে ঠিক জানি ঘুম আমার আসবে না।

কিন্তু কী হবে এই সংকটের ফলাফল ? তমাস রশকে কিছুতেই বুঝিয়ে-শুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারলুম না—কোন কাজে লাগবো আমি তাহ'লে অনিবার্য শোচনীয়-তার সময় ? যেই পাল্লার মধ্যে জাহাজগুলি ঢুকবে, অমনি তাদের লক্ষ্য ক'রে ছুটে

banglabooks.in

যাবে তীব্রভীষণ হিংস্র ক্ষেপণাস্ত্রগুলি—সরাসরি গায়ে গিয়ে না-লাগলেও সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণে সব জাহাজই—ঠিক জানি—ধ্বংস হ'য়ে যাবে।

অথচ এই অবশ্যম্ভাবী মুহূর্তের আগে শেষ রাতে এখন আমাকে গিয়ে আবার ঢুকতে হবে ওই দমবন্ধ-করা ছোটো খুপরিটায়। কীই-বা করতে পারি তাছাড়া? সকাল হ'লে দেখতে হবে কী করা যায়। কিন্তু কী ক'রে জানবো যে রাত্তিরেই রশ-ফুলগুরেটর দিয়ে ধাবমান জাহাজগুলিকে উড়িয়ে দেয়া হবে না?

শেষবার তাকালুম মৌচাকের দিকে। উলটো দিকে কেবল একটাই আলো জ্বলছে, ল্যাবরেটরির আলো, আর হ্রদের জলে তারই প্রতিবিম্ব কাঁপছে! তীরে কেউ নেই—জেটি প'ড়ে আছে ফাঁকা ও পরিত্যক্ত। নিশ্চয়ই মৌচাকের খুপরি-গুলোতেও কেউ আর ব'সে নেই—সবাই গেছে তীরে, আক্রমণের প্রস্তুতির জন্য।

হঠাৎ আমার স্বজ্ঞার মধ্যে একটা অদম্য ও অপ্রতিরোধ্য চাপ জেগে উঠলো। নিজের সেই শ্বাসরোধী খুপরিটায় না-ঢুকে দেয়াল ধ'রে-ধ'রে পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেলুম : উৎকর্ণ, সতর্ক—কারু পায়ের শব্দ বা গলা শুনতে পেলেই সাঁৎ ক'রে কোনো থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়বার জন্যে তৈরি। আর এইভাবেই এগুতে-এগুতে গিয়ে পৌঁছলুম ডাঙার সুড়ঙ্গের মুখটায়! আরে! কেউ-তো নেই পাহারায়! মুখটা ফাঁকা প'ড়ে আছে!

অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না-ক'রেই চট ক'রে সেই অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লুম; হাৎড়ে-হাৎড়ে এগোচ্ছি, হঠাৎ এক ঝলক তাজা হাওয়া এসে ঝাপটা মারলে মুখে—নোনা হাওয়া, সিন্ধুবাতাস, সতেজ পবন, দীর্ঘ পাঁচ মাস পরে এই প্রথম খোলা হাওয়া পেলুম : ফুশফুশ ভ'রে গেলো আরামে। আহ্!

সুড়ঙ্গের দূর মুখটায় জেগে আছে তারা-ছিটানো রাতের আকাশ। কোনো ছায়ামূর্তি বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়ে নেই। তাহ'লে কি ব্যাকাপ থেকে বেরিয়ে যেতে পারবো? সটান লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লুম সুড়ঙ্গের মেঝেয়। বুকে হেঁটে এগুতে লাগলুম নিঃশব্দে। খোলা মুখটার কাছে এসে প্রথমে মাথা বাড়িয়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখলুম।

নেই, কেউ নেই!

দ্বীপের বুনিয়াদটার পাশ কেটে পশ্চিমের দিকে এগিয়ে গেলুম। সেখানে পাহাড়ের ঢাল অনধিগম্য, সেই জন্যে সেদিকে কোনো পাহারা বসানো হয়নি। একটা সংকীর্ণ ফাটলের কাছে গিয়ে পৌঁছলুম আমি, তীরের উত্তর-পশ্চিম বিন্দুর চেয়ে সেটা দুশো ফিট দূরে।

banglabooks.in

তাহ'লে সেই গহ্বর থেকে সত্যি আমি বেরিয়ে এসেছি—এখনো পুরোপুরি স্বাধীন নই, কিন্তু মুক্তির দেহলিতে দাঁড়িয়ে আছি একা ও অসহায়। উপরে, পাহাড়ের অন্যদিকে, দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল পাহারা—দেখে মনে হয় বুঝি পাথরের মূর্তি। ঠাণ্ডা হিম রাত্রি, আকাশে জ্বলন্ত তারা, খোলা বাতাস ব'য়ে যাচ্ছে মৃদু, প্রাণভরা। উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে আলোর উদ্ভাস দেখা যাচ্ছে—মানোয়ারি জাহাজ-গুলোর লণ্ঠনের আলো। পুব আকাশটা ফিকে হ'য়ে আসছে। 'ভোর পাঁচটা বাজে,' বললো আমার কব্জির ঘড়ি।

+

১৮ নভেম্বর

এর মধ্যেই বেশ আলো হ'য়ে গেছে। রশের ল্যাবরেটরিতে যাবার ব্যাপারটা চট ক'রে লিখে ফেলতে পারবো বোধ হয়—হয়তো আমার রোজনামচার শেষ লাইন-গুলো লিখে যাচ্ছি এখন।

যে-হালকা ভিজে বাষ্প পর্দার মতো সমুদ্রকে ঢেকে রেখেছিলো, সকালবেলার হাওয়ায় আস্তে-আস্তে তা স'রে যাচ্ছে, এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি জাহাজগুলোকে —পাঁচটা জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে পর-পর, তীর থেকে অন্তত ছ-মাইল দূরে, অর্থাৎ রশ-ফুলগুরেটরের পাল্লার বাইরে। দাঁড়িয়ে আছে তারা স্থির নিশ্চল উৎসুক, দিনের আলোয় তারা এগিয়ে আসবে ব্যাকাপের দিকে।

তীরে সাড়া জাগছে। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসেছে তিন-চারজন দস্যু। দ্বীপের একেবারে শেষ মাথার পাহারা ফিরে এলো। সব্বাই এখন গিয়ে জড়ো হচ্ছে উৎক্ষেপ-ভিৎএর চারপাশে।

আমি যে-ফাটলটার মধ্যে ঢুকে ব'সে সব দেখছি, সেটাকে বাইরে থেকে দেখা যায় না। কাজেই আমাকে যে কেউ হঠাৎ দেখে ফেলবে, সে-ভয় নেই। তবে সেরকো বা কেউ যদি আমার খুপরিতে ঢুকে প'ড়ে আমাকে না-পায়, তাহলে হয়তো খোঁজ-খোঁজ রব প'ড়ে যাবে···তবে আমাকে তাদের ভয় পাবার কী আছে?

সাতটা পঁচিশ মিনিটের সময় কের কারাইয়ে, সেরকো আর স্পেড ঠিক অন্তরীপটার মুখটায় গিয়ে দাঁড়িয়ে উত্তর-পশ্চিম দিগন্তকে ভালো ক'রে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। তাদের ঠিক পিছনটাতেই বসানো হয়েছে উৎক্ষেপ-ভিৎ—স্বয়ংচল উড়োচাক্তির মতো ক্ষেপণাস্ত্রগুলো ঝকঝক করছে। ডোটোনেটর দিয়ে তাদের সক্রিয় ক'রে তোলবামাত্র দীর্ঘ উত্তল রেখায় তারা লক্ষ্যের দিকে ছুটে যাবে, তার-পর নিনাদ, হুলুস্থুল, আর্তরব, ধ্বংস, সমুদ্রের জলে ঘূর্ণি আর জলস্তম্ভ···

banglabooks.in

+

সকাল সাতটা পঁয়ত্রিশ

ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে জাহাজগুলোর উপর, এক্ষুনি নিশ্চয়ই ব্যাকাপের দিকে রওনা হ'য়ে পড়বে। আর তা-ই দেখে দস্যুরা উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলো, যেন শিকার দেখে গরগর ক'রে উঠলো বন্য জন্তুরা।

কের কারাইয়ে আর স্পেডকে রেখে সেরকো চটপট সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকে পড়লো। নিশ্চয়ই তমাস রশকে ডেকে আনতে গেলো।

কের কারাইয়ে যখন জাহাজগুলোকে তাগ ক'রে ফুলগুরেটর ছুঁড়তে বলবে, রশের কি তখন মনে পড়বে আমি তাঁকে কী বলেছি? নিজের চোখে পুরো ব্যাপারটা দেখে তিনি কি বুঝতে পারবেন না কী ভীষণ কাজ করতে যাচ্ছেন? তখন কি তিনি কোনো প্রতিবাদই করবেন না? না কি মুখ বুজে হুকুম তামিল ক'রে যাবেন?

না, কেন মিথ্যে নিজেকে ঠকাচ্ছি! আমি-তো ঠিক জানি রশ কী করবেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি নিজের ঘর-বাড়িতে আছেন—এরা এসেছে তাঁকে আক্রমণ করতে, তিনি করবেন আত্মরক্ষা!

ইতিমধ্যে জাহাজ পাঁচটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে, দ্বীপ লক্ষ্য ক'রে অনিবার্যভাবে তারা এগিয়েই আসছে। হয়তো জাহাজের লোকেরা ভাবছে যে রশ এখনও তাঁর আবিষ্কারের সব কথা দস্যুদের কাছে ফাঁস ক'রে দেননি—অন্তত আমি যখন হ্রদের জলে আমার বার্তা ভাসিয়ে দিয়েছিলুম, তখনও পর্যন্ত তিনি তা খুলে বলেননি। কিন্তু এখন যদি জাহাজগুলো আরেকটু এগোয়, তাহ'লে আকার-হীন অবয়বহীন ধ্বংস ছাড়া আর-কী থাকবে সমুদ্রের উপর?

এই তো সেরকোর সঙ্গে তমাস রশ এসে পড়েছেন, এগিয়ে যাচ্ছেন উৎক্ষেপ-ভিতের দিকে। উৎক্ষেপ-ভিতের মুখগুলো ঠিক জাহাজগুলোর দিকেই ফেরানো। তার পাশেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কের কারাইয়ে ও কাপ্তেন স্পেড। দূর থেকে রশকে বেশ শান্ত ও চিন্তিত দেখাচ্ছে। কী করতে যাচ্ছেন, তা তিনি ঠিকই জানেন। তাঁর মনের মধ্যে যে-তীব্র ঘৃণা ফেনিয়ে উঠছে, তাতে তিনি একটুও দ্বিধা করবেন না। তাঁর হাতে কাচের নলের মধ্যে আলো প'ড়ে ঝিলিক দিচ্ছে তরল ডেটোনেটর। সব-চেয়ে কাছের জাহাজটার দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি—সেটা বোধ হয় এখন পাঁচ মাইল দূরে রয়েছে, মাঝারি আকারের একটা ক্রুজার, বেশি হ'লে আড়াই হাজার টন হবে। মাস্তুলে কোনো পতাকা উড়ছে না, তবে

banglabooks.in

জাহাজটার গড়ন দেখে তাকে ফরাশি জাহাজ ব'লে মনে হয় না। বাকি জাহাজ চারটে তার পিছনেই সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আক্রমণটা শুরু করবে প্রথমে এই ক্রুজারটিই। দস্যুরা তাকে যখন এগুতে দিচ্ছে সে-তো কামান দাগলেও পারে —না-হ'লে যে এক্ষুনি রশ ফুলগুরেটর ছোঁ মেরে পড়বে তার উপর!

তমাস রশ গিয়ে উৎক্ষেপ-ভিতের পিছনে তৈরি হ'য়ে দাঁড়ালেন। তিনটে ক্ষেপণাস্ত্র পর-পর সাজানো, হিংস্র থাবার মতো উদ্যত ও রক্ত-লোলুপ, স্বয়ংচল বিস্ফোরকভরা উড়োন-চাক্তি তিনটি যেন কোনো ভীষণ সর্বনাশের জন্য উৎসুক।

'তমাস রশ!' ক্রুজারটাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে ব'লে উঠলো সেরকো। জাহাজটা মাত্র চার-পাঁচ মাইল দূরে আছে এখন, ধীরে-ধীরে এখনো এগিয়ে আসছে।

রশ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন। হাত নেড়ে ইঙ্গিতে বললেন উৎক্ষেপ-ভিতের মধ্যে তিনি একাই থাকতে চান। কের কারাইয়ে তার শাগরেদদের নিয়ে প্রায় পঞ্চাশ পা পেছিয়ে গেলো। রশ তারপর কাচের নলের ছিপি খুললেন, ক্ষেপণাস্ত্রের ফোকরে ফেললেন কয়েক ফোঁটা ডেটোনেটর আর বিস্ফোরকের সঙ্গে সেই তরল পদার্থ মিশে গেলো।

পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ড— আমার হৃৎস্পন্দন যেন পঁয়তাল্লিশ সেকেণ্ডের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে গেলো।

বাতাসের মধ্যে তীব্র একটা শিশের শব্দ উঠলো। ক্ষেপণাস্ত্র তিনটে প্রায় একশো গজ উপরে উঠে গেলো, তারপর ছিটকে এগিয়ে গেলো ক্রুজারের দিকে। ঠিক ক্রুজারের উপরে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বুমেরাং-এর মতো ঘুরে গেলো মুহূর্তে, আর তারপরেই একটা মেলিনাইটের মস্ত স্তূপ ফেটে পড়লো। সেই বিস্ফোরণের জের পৌঁছালো ব্যাকাপ দ্বীপ পর্যন্ত; দ্বীপটা যেন ভিৎসুদ্ধ থরথর ক'রে কেঁপে উঠলো।

শামলে নিয়ে তাকালুম, উৎসুক ও উত্তেজিত! ক্রুজারটার চিহ্ন মাত্র নেই সমুদ্রে, অন্য বিস্ফোরকও এই কাজটাই করতো হয়তো, কিন্তু রশ-ফুলগুরেটর যেন ধ্বংসের প্রচণ্ডতা কয়েকশো গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে!

সে-কী হর্ষ আর উল্লাস উঠলো দস্যুদের গলায়! নিজেদের চোখকে যেন তারা বিশ্বাস করতে পারছিলো না।

কিন্তু রশ—তিনি দাঁড়িয়ে আছেন একা, একই রকম, বুকের উপর হাত দুটো আড়াআড়ি ভাঁজ করা, আর চোখের দৃষ্টি জলন্ত।

banglabooks.in

অন্য জাহাজগুলো যদি এর পরেও এগোয়, তবে তাদের দশাও এই ক্রুজারটার মতোই হবে। কিছুতেই তারা এই শোচনীয় পরিণাম এড়াতে পারবে না? কী করছে এরা? পালিয়ে যাচ্ছে না কেন? জানি-তো, এদের সঙ্গে-সঙ্গে আমার শেষ আশাও হারিয়ে যাবে, কিন্তু যে-চেষ্টা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য, কী দরকার তার জন্য ও-রকমভাবে মিছেমিছি ধ্বংস ডেকে আনবার। দ্বীপটাকে ধ্বংস করার অন্য উপায় বার করতে হবে তাদের, এভাবে হবে না। অবরোধ গড়তে পারে তারা দ্বীপের চারপাশে, যাতে মাছিটিও গ'লে যেতে না-পারে—আর তাহ'লে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় তিলে-তিলে মরবে এরা, আর সেই হবে এদের উচিত শাস্তি।

কিন্তু এরা-তো যুদ্ধজাহাজ, আমি জানি এরা পলায়ন কাকে বলে জানে না—তার চেয়ে বরং নিশ্চিত ও অনিবার্য ধ্বংসকে বরণ ক'রে নেবে, তবু এরা একটুও পিছু হঠবে না। একটার পর একটা এগিয়ে আসবে, আর রাক্ষুসে সমুদ্রে একের পর এক জাহাজগুলোকে গিলে খাবে। এর মধ্যেই জাহাজগুলো পরস্পরের মধ্যে সংকেত বিনিময় ক'রে নিলে, তার পরেই কুণ্ডলিত কালো ধোঁয়া উঠলো উত্তর-পশ্চিম দিগন্তে, আর একসঙ্গে এগোলো চারটে জাহাজ। তাদের মধ্যে একটা এগিয়ে আসছে পুরোদমে, যাতে পাল্লায় এসেই কামান দাগতে পারে। অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে দেখছে না পর্যন্ত।

আর থাকতে না-পেরে আমার গোপন আশ্রয় ছেড়ে বেরিয়ে এলুম আমি। যেন জ্বরের ঘোরের মধ্যে দ্বিতীয় শোচনীয় পরিণাম দেখবো ব'লে অপেক্ষা ক'রে আছি—বাধা দেবার কোনো ক্ষমতা পর্যন্ত নেই।

জাহাজটা যেন আমার চোখের সামনে ক্রমেই অতিকায় হ'য়ে উঠতে লাগলো—ঠিক আগের জাহাজটার মতোই একটা ক্রুজার, তারও মাস্তুলে কোনো পতাকা নেই, দেখে বোঝা যাচ্ছে না কোন দেশের জাহাজ। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ক্রমেই তার গতি বেড়ে উঠছে, সে যেন হুড়মুড় ক'রে দ্বীপে এসে পৌঁছুতে চাচ্ছে। কিন্তু রশ ফুলগুরেটরের বিস্ফোরণ সে ঠেকাবে কী ক'রে?

রশ ততক্ষণে দ্বিতীয় উৎক্ষেপ-ভিতের মধ্যে দাঁড়িয়েছেন। ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়া আর-কিছু নেই, চারদিকে কেমন একটা থমথমে স্তব্ধতা।

হঠাৎ ক্রুজারের উপরে বেজে উঠলো দামামা, শিঙার তীব্র শব্দে স্তব্ধতা যেন ছিঁড়ে গেলো।

আরে! ওই শিঙার শব্দ তো আমার চেনা। এই সুর চিরদিনের মতো আমার রক্তের মধ্যে মিশে আছে। লা মার্সাঈ। আমার দেশের জাহাজ—আর

banglabooks.in

এটাকে ধ্বংস করবে কি না একজন ফরাশি বৈজ্ঞানিক !

না ! না ! কিছুতেই তা হ'তে দেয়া হবে না। ঝাঁপিয়ে পড়বো আমি রশের উপর, চেঁচিয়ে বলবো, 'চিনতে পারছো না, এটা-যে ফরাশি জাহাজ !' চিনতে পারেননি তিনি, কিন্তু চিনতে তাঁকে হবেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে সেরকোর ইঙ্গিতে রশের হাতের কাচের নলটি ডেটোনেটর ঢালবার জন্য উদ্যত হ'য়ে উঠলো।

আরো-স্বচ্ছ আরো-তীব্রভাবে বেজে উঠলো শিঙা। পতাকার অভিবাদনের সুর বাজছে—সঙ্গে-সঙ্গে হাওয়ায় পতাকার ভাঁজ খুলে গেলো, পৎপৎ উড্ডীন তেরঙ্গা—তার নীল, শাদা, লাল যেন আকাশের গায়ে তীব্র-তিন বাণীর মতো ঝলশে উঠেছে !

হঠাৎ জাতীয় পতাকা দেখে রশ যেন কী-রকম মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে পড়লেন। পতাকাটা ক্রমশ মাস্তুলের ডগায় উঠে আসছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর হাতটা যেন আস্তে মন্ত্রবলে ঝুলে পড়ছে। তার পরেই তিনি যেন কুঁকড়ে পিছিয়ে এলেন। দু-হাতে চোখ ঢেকে ফেলেছেন তিনি, যেন সেই তেরঙ্গা-ওড়ানো জাহাজের কাছ থেকে লুকিয়ে পড়তে চান।

ভগবান ! ভগবান ! তাহ'লে সেই তীব্র জর্জর বুকটিতে এখনও দেশপ্রেম সম্পূর্ণ নিভে যায়নি, এখনও দেশের পতাকা দেখে তাঁর হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন দ্রুত হ'য়ে ওঠে !

আমিও কম আপ্লুত হইনি, কী এসে-যায়, দেখুক না—আমিও বেরিয়ে এলুম পাথরের আড়াল থেকে। লাফিয়ে পাথর ডিঙিয়ে এগিয়ে গেলুম। তমাস রশকে সমর্থন করবার জন্য পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে আমাকে, আর কিছুতেই তাঁকে ট'লে পড়তে দেবো না। বলবো, 'ফ্রান্সের মানুষ, দেখছো না, জাহাজের মাস্তুলে ওটা তেরঙ্গা-পতাকা—দ্বীপের দিকে যে-আসছে, সে ফ্রান্স। ফ্রান্সের মানুষ। তুমি কি ফ্রান্সের গায়ে বোমা ফেলবে !'

কিন্তু না, আমাকে কিছুই বলতে হবে না। রশ স্বাধীনচেতা, কারু দাস নন। তেরঙ্গার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে তিনি চিনতে পেরেছেন। পেছিয়ে আসছেন তিনি উৎক্ষেপ ভিৎ থেকে !

দস্যুরা তাঁর দিকে ছুটে গেলো, জোর ক'রে হিঁচড়ে তাঁকে নিয়ে যেতে চাইলো তারা, কিন্তু হ্যাঁচকা টান মেরে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিলেন রশ—একা তিনি তাঁদের সঙ্গে যুঝছেন।

banglabooks.in

সেরকো আর কের কারাইয়ে এগিয়ে এলো তাঁর দিকে। ধাবমান জাহাজটিকে দেখালো তারা আঙুল দিয়ে, তাঁকে হুকুম করলে ফুলগুরেটর ছুঁড়তে। রশ সব প্রত্যাখ্যান করলেন।

কাপ্তেন স্পেড আর আরো-কয়েকজন তাঁকে ভয় দেখাচ্ছে—কটুকাটব্য, গালিগালাজ কে-একজন মারলে রশকে···তারা তাঁর হাত থেকে কাচের নলটা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করছে···

রশ নলটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিলেন।

আর তক্ষুনি আতঙ্কে দস্যুরা নীল হ'য়ে গেলো। ক্রুজার ততক্ষণে 'এলাকা-মারাত্মক' ছাড়িয়ে এসেছে: কামান দাগছে মুহুর্মুহু, দ্বীপের উপর গোলাগুলি পড়তে শুরু করেছে···

কিন্তু তমাস রশের কী হ'লো···কামানের গোলা পড়লো কি তাঁর গায়ে। না, ওই-তো, ছুটে গিয়ে ঢুকলেন তিনি সুড়ঙ্গে! কের কারাইয়ে, সেরকো ও অন্তরা তাঁর পিছন-পিছন ছুটে গেলো! ব্যাকাপের গহ্বরই তাদের শেষ আশ্রয়।

আমি?···আমি আর-কিছুতেই ওই গহ্বরে ফিরে যাবো না। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে যদি ম'রেও যাই, তবু না···ফরাশি জাহাজটি যখন দ্বীপে ঠেকবে তখনই আমি শেষ কথাগুলো লিখবো নোটবইতে···

[এনজিনিয়ার সিমোন আর্ৎ-এর বিবরণ এখানেই শেষ]

উড্ডীন তেরঙ্গা

'সোর্ড' নিয়ে ব্যাকাপের মধ্যে ঢুকে পড়বার নির্দেশ পেয়েছিলেন লিউটেনাণ্ট ডেভন, কিন্তু তিনি যখন আর ফিরলেন না তখন ইংরেজ কর্তৃপক্ষর আর সন্দেহ রইলো না যে এই তরুণ নাবিক সদলে নিহত হয়েছেন। কিন্তু সে কি সুড়ঙ্গে ঢোকবার সময়ে ডুবোপাহাড়ে ঘা খেয়ে, না কি কের কারাইয়েই সেই নিধন কর্মের হোতা? এটা অবশ্য কেউ বুঝতে পারেননি।

ভাসমান কৌটোটিতে যে-বার্তা এসেছিলো, সেই অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ স্থির

banglabooks.in

করেছিলেন রশ-ফুলগুরেটর তৈরি হবার আগেই রশকে ধ'রে নিয়ে আসতে হবে -- লিউটেনাণ্ট ডেভনকে ঠিক এইজন্যই পাঠানো হয়েছিলো। তমাস রশ ও সিমোন আর্‌ৎকে একবার দস্যুদের হাত থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে আসতে পারলে আর রশ-ফুলগুরেটরের ভয় থাকবে না। কিন্তু যখন বেশ কয়েক দিন কেটে যাবার পরও 'সোর্ড' ফিরলো না, তখন কর্তৃপক্ষ স্থির করলেন এবার দ্বিতীয় অভিযান যাবে যুদ্ধের জন্য পুরোপুরি সশস্ত্র হ'য়ে।

কিন্তু সব স্থির করতে-করতে প্রায় আট সপ্তাহ কেটে গেলো। এর মধ্যে কের কারাইয়ে হয়তো তমাস রশের আবিষ্কারটি কুক্ষিগত ক'রে ফেলেছে। সেইজন্যই বিভিন্ন নৌ-শক্তির মধ্যে একটা চুক্তি হ'লো যে সব দেশেরই একটা ক'রে, মোট পাঁচটা, যুদ্ধজাহাজ বারমুডার জলে ভাসানো হবে। ব্যাকাপের মধ্যে একটা মস্ত গহ্বর আছে, তার চার পাশের দেয়াল আধুনিক গোলন্দাজ বিদ্যার সাহায্যে উড়িয়ে দিতে হবে প্রথমে, তারপর দস্যুদের নির্মূল করতে হবে।

জাহাজগুলো জড়ো হ'লো ভারজিনিয়ার চেসাপিক-এ। বারমুডায় এসে তারা যখন পৌঁছুলো তখন ১৭ নভেম্বর সন্ধ্যা। পরদিন সকালবেলায় প্রথম জাহাজটা ব্যাকাপের দিকে এগুতেই -- জাহাজটা যখন দ্বীপ থেকে প্রায় সাড়ে-চার মাইল দূরে -- উড়োন-চাক্তির মতো তিনটে ক্ষেপণাস্ত্র শোঁ ক'রে উড়ে এলো, জাহাজের উপরে একবার পাক খেয়েই তারা ফেটে পড়লো, জাহাজটা ডুবতে লাগলো কয়েকটা মাত্র সেকেণ্ড। এই বিস্ফোরণের ফল হ'লো তাৎক্ষণিক -- এ-যাবৎ কোনো গোলন্দাজ শাস্ত্রই এ-রকম কোনো বিস্ফোরকের সন্ধান পায়নি। বেশ-কিছু দূরে থেকেও বাকি জাহাজগুলো সেই বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা বেশ অনুভব করেছিলো -- আরেকটু হ'লে তারাও হয়তো ডুবে যেতো।

এই আচম্বিত ও প্রচণ্ড ধ্বংস দেখে দুটো তথ্য বোঝা গেলো : এক. কের কারাইয়ে এখন রশ-ফুলগুরেটর ব্যবহার করছে ; এবং দুই. এই নতুন অস্ত্র সত্যিই অসীম বিধ্বংসী ক্ষমতা রাখে।

পুরোভাগের ক্রুজারটা মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যেতেই বাকি জাহাজগুলো প্রথমে কয়েকটা নৌকো নামিয়ে দিলে -- যদি জাহাজিদের কেউ তখন বেঁচে থাকে, তাদের উদ্ধার করা হবে। তারপর নিজেদের মধ্যে সংকেতে যোগাযোগ ক'রে তারা একযোগে ব্যাকাপের দিকে এগুলে।

এদের মধ্যে সব-চেয়ে দ্রুত জাহাজটি হ'লো 'তর্ণাৎ' -- একটি ফরাশি মানোয়ারি জাহাজ। সব বাষ্প কাজে খাটাতেই সে অন্যদের ছাড়িয়ে হুড়মুড় ক'রে এগিয়ে

banglabooks.in

এলো—এমনকী আগের জাহাজটা যেখানে মুহূর্তে উড়ে গিয়েছিলো, সে-জায়গাটাও সে পেরিয়ে এলো। দ্বীপ লক্ষ্য ক'রে কামান দাগার ঠিক আগের মুহূর্তে সে তার মাস্তুলে তেরঙ্গা উড়িয়ে দেয়। জাহাজের পাটাতন থেকে তক্ষুনি অফিসাররা দুরবিন ক'ষে তাকিয়ে ছাখেন কেন যেন কের কারাইয়ের দলবল ছত্রভঙ্গ হ'য়ে যাচ্ছে। তাতে দস্যুদের উপর কামান ছুঁড়তে আরো সুবিধে হ'লো: এবার যদি দস্যুরা প্রতিরোধ করতে চায় তবে তাদের গহ্বরের মধ্যে ঢুকে পড়তে হবে।

কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই আচম্বিতে জল-স্থল-অন্তরিক্ষ এমন ভাবে কেঁপে উঠলো যেন অতলান্তিকের জলে আস্ত আকাশটা ভেঙে পড়েছে।

যেখানে ছোট্ট দ্বীপটা ছিলো, তাকিয়ে দেখা গেলো সেখানে কেবল সধূম পাথর ছাড়া কিছু নেই—আভালাঁশ বা হিমবাহের মতো শিলাবৃষ্টি হচ্ছে চারপাশে। যেখানে ছিলো উপুড়-পেয়ালা; সেখানে প'ড়ে আছে একটা ভাঙাচোরা তোবড়ানো-পেয়ালা। ব্যাকাপের যা অবশিষ্ট আছে তা কেবল অসংলগ্ন কতগুলো শৈলশ্রেণী, যার চারপাশে ফেনিয়ে চরকি দিয়ে রাগি জল ফুঁশছে।

হঠাৎ এই বিস্ফোরণ হ'লো কী ক'রে? তা'হলে কি দস্যুরা প্রতিরোধ অসম্ভব বুঝে গোটা দ্বীপটাই উড়িয়ে দিলে?

শিলাবৃষ্টিতে 'তনাঁৎ'ও একটু জখম হয়েছিলো। কম্যাণ্ডারের নির্দেশে নৌকোগুলো নামানো হ'লো, সবাই তাড়াতাড়ি ব্যাকাপের ধ্বংসাবশেষের দিকে এগিয়ে এলো।

দ্বীপে নেমে সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে নাবিকেরা জখম মানুষদের সন্ধান করতে লাগলো। কিন্তু এখানে-সেখানে ছিন্নভিন্ন দেহ প'ড়ে আছে, কোথাও একটা থ্যাঁৎলানো কাটা মুণ্ড, কোথাও একটা ছিন্ন হাত, কোথাও পায়ের একটা টুকরো, কোথাও রক্তমাখা মাংস শুধু···কিন্তু গহ্বরের কোনো চিহ্নও কোথাও নেই। আস্ত গহ্বরটাকেই গিলে খেয়েছে গর্জমান ক্ষুব্ধ সিন্ধুজল।

একটি মাত্র আস্ত মনুষ্যদেহ পাওয়া গেলো উত্তর-পূর্ব দিকে পাহাড়ের তলে। নিশ্বাস পড়ছে কি পড়ছে না। তবে চেষ্টা করলে হয়তো এখনও তাকে বাঁচানো যাবে। চিৎপাত হ'য়ে সে প'ড়ে আছে সেখানে, হতচেতন, মরণোন্মুখ, হাতে তার খোলা নোটবই আর পেনসিল, তার শেষ পঙ্‌ক্তিটা অসম্পূর্ণ।

ফরাশি এনজিনিয়ার সিমোন আর্‌ৎ! তাঁকে ধরাধরি ক'রে 'তনাঁৎ'-এ এনে তোলা হ'লো: কিন্তু জাহাজের ডাক্তার হাজার চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই অন্তত তাঁর জ্ঞান ফেরাতে পারলেন না।

banglabooks.in

তবে তাঁর বিবরণ প'ড়ে সব জানা গেলো, ঠিক বিস্ফোরণটার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সিমোন আর্‌ৎ সব লিপিবদ্ধ ক'রে রাখছিলেন।

শেষ অব্দি সিমোন আর্‌ৎ প্রাণে বাঁচলেন—তিনি একাই বাঁচলেন। সেরে উঠলে যখন তাঁকে জিগেশ করা হ'লো তিনি যা বললেন মনে হ'লো তা-ই ঠিক। তাঁর অনুমান : তেরঙ্গা পতাকা দেখে তমাস রশ এতই নাড়া খেয়েছিলেন যে অনুতাপে তিনি একেবারে জর্জর হ'য়ে গিয়েছিলেন, ছুটে গহ্বরের মধ্যে ঢুকে প'ড়ে কেউ বাধা দেবার আগেই তাই তিনি গুদামে ভর্তি বিস্ফোরকের মধ্যে তরল ডেটোনেটর ছড়িয়ে দেন—আর আস্ত দ্বীপটা যেন তাঁরই প্রায়শ্চিত্ত হিশেবে উড়ে যায়।

কিন্তু সব ভেবে-চিন্তে মনে হয় সিমোন আর্‌ৎ-এর এই অনুমান মিথ্যে নয়। কের কারাইয়ে আর তার দস্যুদল উড়ে গিয়েছে সত্যি, কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গে চিরকালের মতো হারিয়ে গেছেন তমাস রশ, তাঁর এই দুর্লভ আবিষ্কার নিয়ে। নির্যাতিত, উপহাস্য এই পথভ্রষ্ট বৈজ্ঞানিক শোধ নিতে চাচ্ছিলেন জগতের উপর, নিজেকে সত্যি তিনি চিনতেন না। কিন্তু তবু ছিলো তাঁর বিবেক, তাঁর জলন্ত দেশপ্রেম—তাই আত্মাহুতি দিয়ে তিনি তাঁর প্রায়শ্চিত্ত সেরে গেলেন। তেরঙ্গা দেখে যেভাবে তমাস রশ কুঁকড়ে গুটিয়ে গিয়েছিলেন, সে-দৃশ্য সিমোন আর্‌ৎ জীবনেও কখনও আর ভুলতে পারবেন না।

—